অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
অজয় দাশগুপ্ত
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ১৩

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

ভূমিকা

ছোট গল্পের যদি কোনো জ্যামিতিক চেহারা থাকতো তবে সে সরলরেখা হতো না, হতো বৃত্তরেখা। গল্প যদি খালি সোজা চলে তবে হয় সে শুধু বৃত্তান্ত, কিন্তু যদি চলে বৃত্তরেখায়, তার বৃত্তের অন্তে সে হয়ে ওঠে সত্যিকারের ছোট গল্প। যেখানে বৃত্ত যত বেশি সম্পূর্ণ সেখানে ছোট গল্প তত বেশি সার্থক। যতদূর সোজা যাক, এক সময়ে গল্পকে মোড় ঘুরতে হবে, নিতে হবে তির্যক বাঁক, উড্ডীন বিহঙ্গের বঙ্কিম ও ত্বরিত প্রত্যাবর্তনের আকারে; সোজা পথটা যে পরিমাণে মন্থর ছিল, ফিরতি পথটা হতে হবে ততোধিক ত্বরান্বিত। প্রতিক্ষেপ বা প্রতিঘাতের এই বেগবলটাই হচ্ছে ছোটগল্পের প্রাণশক্তি। অর্থাৎ, কাহিনী যেখানে এসে বাঁক নেবে, সেখানে প্রতিঘাত যত বেশি প্রবল হবে ও যত বেশি দ্রুত সে ফিরে আসবে তার পরিক্রমা শেষ করে তার প্রথম প্রারম্ভবিন্দুতে, তত বেশি সে রসোত্তীর্ণ হবে। এক কথায়, গল্প যদি না ঘুরলো তবে সে বেঘোরে পড়লো; যদি চলতে চায় সে সিধে তবেই সে অসিদ্ধ।

তাই ছোট গল্প লেখবার আগে চাই-ছোট গল্পের শেষ, কোথায় সে বাঁক নেবে, কোন কোণে। আর কোনো রচনায় আরম্ভেই আমরা শেষ জেনে বসি না, না উপন্যাসে, না কবিতায়, না বা নাটকে। আমাকে কতগুলি চরিত্র দাও আমি উপন্যাস সুরু করে দিতে পারবো; দাও একটা সঙ্ঘাতসংকুল ঘটনা, তুলে দিতে পারবো নাটকের প্রথম অঙ্কের যবনিকা—তিন ক্ষেত্রেই রচনার উত্তেজনায় লেখনীর দুর্বারতায় পথ কেটে চলে যেতে পারবো এগিয়ে, কিন্তু শেষ না পেলে ছোট গল্প নিয়ে আমি বসতেই পারবো না। শুধু ঘটনা যথেষ্ট নয়, শুধু চরিত্র যথেষ্ট নয়; চাই আমার সমাপ্তির সম্পূর্ণতা। সব জিনিস সমাপ্ত হলেই কোনো সম্পূর্ণ হয় না কিন্তু ছোট গল্পের সমাপ্তিটা সম্পূর্তি হয়ে ওঠা চাই। তাই ছোট গল্পের কল্পনা কৃতারম্ভ নয়, কৃতশেষ। যতক্ষণ না আমি শেষ জানি ততক্ষণ আমি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার—আর সবকিছু; কিন্তু ছোট গল্প লেখক নই, ছোট গল্পের বেলায় চাই আমার শেষ, তাই হয়তো ছোট গল্প শেষ বা শ্রেষ্ঠ শিল্প।

গল্পকে বৃত্ত বলেছি বটে, কিন্তু তা অত্যন্ত লঘুবৃত্ত। তার বেষ্টনী বক্র, গতি দ্রুত, পরিসর ক্ষীণ, সমাপ্তি তীক্ষ্ন। বেশি ভার বইবার মতো তার জায়গা নেই, বেশি কথা কইবার মতো তার স্পৃহা নেই, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার মতো তার সময় নেই। সে এসেছে চোরের মতো চুপি-চুপি, চোর বলে তাকে কেউ ধরতে না পারে। তার বেশবাস অল্প, আয়োজন সামান্য, পরিধি পরিমিত। শুধু তাকে ঘুরলেই চলবে না, কোন কেন্দ্রের উপরে কতটুকু জায়গা নিয়ে ঘুরবে তারো আগে থেকে নির্ধারণ চাই। এই নির্ধারণে যত বেশি নিষ্ঠা তত বেশি রসস্ফূর্তি। বৃত্তের বাইরে অর্থাৎ উদ্বৃত্তে সে পরাঙ্মুখ। উপন্যাসে সহ্য হয় উদ্বৃত্তি, সহ্য হয় অপচয়, কবিতায় সহ্য হয় ইঙ্গিত;

সহ্য হয় অস্পষ্টতা, কিন্তু ছোট গল্পে যেমন চাই স্পষ্টতা, তেমনি চাই সংযম, যেমন চাই সংকোচ তেমনি চাই সুব্যাপ্তি। জীবনের বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতের মধ্যে থেকে সংক্ষেপে গ্রহণ বা এক কথায় সংকলনই হচ্ছে ছোট গল্পের উদ্দেশ্য, তার বাণ শব্দভেদী নয় লক্ষ্যভেদী। অর্থাৎ শব্দ শুনে অনুমানে সে তীর ছোঁড়ে না, সে জানে তার কি লক্ষ্য, সে লক্ষ্যবেধী। সত্যি করে বলতে গেলে, ভেদ করার চেয়ে বিন্ধ করাই হচ্ছে ছোটগল্পের কাজ। ভেদ করা অর্থাৎ ছেদন করা বা বিদারণ করার মধ্যে শক্তির অপচয় আছে; কিন্তু লক্ষ্যমাত্র বিন্ধ করা ঠিক তার পরিমিত শক্তির পরিচিতি।

কী আমার শেষ ঠিক করলুম, কী আমার চরিত্র ছুঁকে নিলুম, তার পর এঁকে ফেললুম আমার বৃত্ত। যতদূর সংকুচিত করা সম্ভব ততদূর ঘনিয়ে নিলুম বক্রিমা। ব্যস, এর বাইরে আর পদার্পণ নেই। অবান্তর সব বাদ দিয়ে দিয়ে এসেছি, ফেলে ফেলে এসেছি অকারণ ভার। (এত মৃদু যে কুসুমহার সেও ভার হয়ে ওঠে) এখন এক পা গণ্ডীর বাইরে যাওয়াই জলের মাছ ডাঙায় ওঠা, রাবণের ছোঁয়া লেগে সীতার পাতালে তলানো। এই যে স্খলন এইটেই ছোট গল্পের পক্ষে অধর্ম, অসংযম, অবিচার। পদ্মপাতায় নিটোল যে সম্পূর্ণ শিশিরবিন্দু, আপনার বৃত্তের মধ্যে সে সংহত, তেমনি হবে ছোট গল্প আপনার বৃত্তের মধ্যে বিধৃত পরিমিত; অকিঞ্চিৎকর চঞ্চল্যে তার ভারকেন্দ্র যাবে টলে, সে তার ধর্ম হারিয়ে হয়ে উঠবে হয়তো উপন্যাসের অংশবিশেষ। এই পরিমাণবোধ হচ্ছে ছোট গল্পের নিরিখ। সংস্কৃত সাহিত্যে যাকে বলেছে 'লাঘবান্বিত' অর্থাৎ '[illegible]শূন্য'—চাই সেই সংযম, সেই নিবৃত্তি। আমার যদি গাছ দরকার তবে তাতে আমি পাতা দেব না, যদি পাতা দরকার তবু আমি ছায়া বিছাবো না তার তলায়। ঘোড়া যদি বা একটা ছোটাই তবে সেই সঙ্গে তার ল্যাজও ধাবিত হয়েছিল কিনা এ খবরে আমার দরকার নেই। যদি সোনার প্রজাপতি উড়ে বসে আমার কাদামাখা জুতোর উপর তবে দরকার নেই জানিয়ে সেই জুতো আমার চীনে বাড়ির না বাটা কোম্পানির থেকে কেনা। চাই নির্মম শাসন, ব্রতোদ্‌যাপনের নিষ্ঠা। প্রত্যেক আর্টই সজ্ঞান সক্রিয় সৃষ্টি। থিয়েটারের রঙ মাখার চেয়ে তোলাই কঠিন, তবু মেজে-ঘসে তুলে ফেলতে হবে রঙ, প্রগল্‌ভ কৃত্রিমতা। ব্যূহ-নির্গমের পথ না জেনে ব্যূহ-প্রবেশের স্পর্ধাটা রূঢ়তার নামান্তর। তাই লেখবার আগে জেনে নিতে হবে কি লিখতে হবে না। ব্যূহপ্রবেশের আগে জেনে নিতে হবে ব্যূহনির্গমের কৌশল। ছোট গল্প সেই লিখতে জানে যে লেখার মাঝে থাকতে পারে না লিখে। স্তব্ধতা অনেক সময় বাক্যের চেয়ে মুখর, সংযম অনেক সময় সংগ্রামের চেয়ে প্রবল, তেমনি ছোট গল্পের বেলায় অল্পতাই হচ্ছে বহুলতা, নির্ভূষণতাই অলঙ্কার। তার প্রয়োগফল সামান্য কিন্তু যোগফল বৃহৎ।

এই সম্পর্কে ব্যাঘ্রাক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যটা কল্পনা করা যেতে পারে। উপমাটা যদিও সম্ভোগ্য নয় তবু সার্থক উপমা। ধরুন আপনাকে বাঘে কামড়ে ধরেছে, মুখে করে টেনে নিয়ে চলেছে ছুটে। যদি আপনার তখনো জ্ঞান থাকে, আপনি কি দেখবেন, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে, সেই দোদুল্যমান মুহূর্তে? বর্তমানে দেখবেন বাঘ ও তার বেগ, ভবিষ্যতে অবধারিত

মৃত্যু, আশে পাশের গাছ-পালা ঝোপঝাড় নয়, নীল নির্মল আকাশ নয়, নয় বা আর কোনো নিসর্গ শোভা। আক্রমণ থেকে সংহার, এই দুই অন্তঃসীমার মধ্যেকার যে পথ সে পথ যত দীর্ঘ বা বক্রই হোক না কেন তার অস্তিত্ব আর সমাপ্তি সেই সংহারে। তেমনি ছোট-গল্পের সে পথ তাতেও উদ্যোগ থেকে নির্ভুল উপসংহারের মাঝখানে কোনদিকে তাকাবার জো নেই' কোথাও বিশ্রাম করবার স্থান নেই, বিস্ময়কে বাঘের মতন কামড়ে ধরে একোদ্দিষ্ট হয়ে ছুটে আসতে হবে স্থিরীকৃত লক্ষ্যস্থলে। শরব্যে বা লক্ষিত বিষয়ে বিন্ধ করতে হবে শরমুখ। আরো একটা উপমা নেয়া যেতে পারে। ধরুন, এক জায়গায় বোমা পড়ছে, আপনি পালাবেন, এমন সময়ে এলো একটা এরোপ্লেন, বললে, চলুন শিগগির। আপনি হতবুদ্ধি হয়ে তাড়াতাড়ি নিতে গেলেন আপনার ক্যাশবাক্সটা, জামা-কাপড় ভরতি আপনার সুটকেস, আপনার প্রয়োজনীয় পাথেয়, কিন্তু জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন এরোপ্লেন গেছে চলে, আপনাকে নিতে সে এসেছিল কিন্তু আপনার ভার নিতে সে আসে নি, তাই আপনার আর পালানো হলো না। সোনার তরী গেল চলে' আপনি পারে পড়ে রইলেন। কিন্তু যে জিনিস গুছোতে কালক্ষেপ করে নি, চলে গেছে তখনকার সেই অবস্থাতেই, এক বস্ত্রে, সেই পেল মুক্তি, পেঁছুতে পারলো তার স্বদেশে। উপন্যাসের বেলায় আমাদের দুচোখ খুলে রাখতে হবে কিন্তু ছোটগল্পের বেলায় হতে হবে আমাদের এক চক্ষু হরিণ' ব্যাধকে রাখতে হবে সর্বদা চোখের দিকে, যাতে দ্রুতবেগে পেঁাছে যেতে পারি নিরাপদ আশ্রয়ে। দুচোখ খুলতে গেলেই দৃষ্টিভ্রমে পড়বো গিয়ে ব্যাধের শরসীমায়।

এই যে একরোখা হয়ে ছোটা প্রারম্ভবিন্দু থেকে পরিশেষবিন্দুতে, এর মাঝে ফুটবে রসের এককত্ব এবং সেইখানেই কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের মিল। অর্কেস্ট্রা তো নয়ই, বাজবে একতারা এবং তার সঙ্গে থাকবেও না কোনো সঙ্গীত। বিষয়ে ও ব্যঞ্জনায় থাকবে শুধু এক সুর। আগাগোড়া এক ব্যবহার' এক বিধি। চলবে না রসের কোনো দ্বৈধ উপাদানের কোনো মিশেল। বিষয় আমার যাই হোক' আঙ্গিক আমার যে প্রকারের হোক, সংক্ষিপ্ত সারভাগ নিয়ে আমার কারবার, এবং যা সার তাতে কখনো ভেজাল থাকতে পারে না।

তারপরে সবচেয়ে যা বিস্ময়ের, গল্পের যা শৃঙ্গভাগ, তা হচ্ছে বিস্ময়-উৎপাদন। এক কথায় যাকে বলা যায় বিস্মাপন। গল্পের সেই তির্যককোণে একটি অভাবিত বিস্ময় থাকবে লুকিয়ে, এই বিস্ময়ই গল্পের প্রাণবস্তু। ইংরিজিতে খড় ছাড়া যেমন ইট হয় না' তেমনি এই বিস্ময় ছাড়া হতে পারে না ছোটগল্প। পাঠককে চমকে দিতে হবে খোঁচা মেরে, এই আঘাতের থেকে ফুটবে আনন্দ, এই চমকের থেকে উদ্ভাসন। এই বিস্ময় বাইরে থেকে আমদানি করা আকস্মিক কোনো চমক হবে না, এই বিস্ময়, রুধিরে যেমন যন্ত্রণা, তেমনি গল্পের মধ্যেই নিহিত ও অনুস্যূত হয়ে থাকবে। এই বিস্ময় হবে যত অন্ধকারে যত অপ্রত্যাশিত অবহেলিত স্থলে, ততই খুলবে তার শোভা, জমবে তার রস। এই বিস্ময়শৃঙ্গ যদি পাঠক আগের থেকেই আভাসে বুঝতে পারে তবে ছোটগল্পের আসর যাবে ভেঙে' পথশ্রম হবে পণ্ডশ্রম। এই চমক দেয়াটুকুই

যখন ছোটগল্পের রসাধার তখন তাকে সযত্নে সমস্ত কৌতূহলের থেকে সংরক্ষিত করাই হচ্ছে কৌশল। পুকুরের মধ্যে মাছ, মাছের পেটে কৌটো এবং সেই কৌটোর মধ্যে প্রাণ তেমনি করে এই বিস্ময়টুকু রাখতে হবে লুকিয়ে এবং যখন তার দ্রুত উদ্ঘাটন হবে তখন বহু বিদ্যুদ্দীপ্ত এক সঙ্গে জ্বলে উঠেই মিলিয়ে যাবে না, স্থির হয়ে থাকবে আকাশের চিরস্থায়িতায়। ক্ষণিক একটি মুহূর্ত এক মুহূর্তে এসে উপনীত হবে।

তবে আমরা কী পেলাম—বাঁক বা বৃত্তরেখা, শেষের প্রতি আরম্ভের শাণিতাগ্র ধাবমানতা, বিস্তরবর্জন বা ভারলাঘব। রসের এককত্ব এবং অপ্রত্যাশিত বিস্ময়-সৃষ্টি। এবং সর্বশেষে চাই সেন্স অব ফর্ম বা আকার-চেতনা; এই আকারের পরিমিতি থেকেই রসের সমগ্রতা আসে। আকারে যদি শৃঙ্খলা না থাকে, আনুপাতিক সৌষ্ঠব না থাকে, তবে রসে পড়ে ব্যাঘাত। প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে পরিশিষ্ট। অনেক গল্প শুধু এই বিন্যাসের সামঞ্জস্যের দোষে, প্রমিত সংস্থাপনার অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। গল্পের আর সব উপাদান পেলেই আমরা রচনায় প্রবৃত্ত হই, কিন্তু আকার সম্বন্ধে আমাদের কোনো পরিমাণজ্ঞান থাকে না। পরিমাণ জানলেই চলে না, পরিণাম সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া দরকার। গল্পের ধর্মনাশ হয় শুধু অসংযমে বা রসদ্বৈধে নয়, বেশির ভাগ হয় এই কেন্দ্রচ্যুতিতে।

তাই রসসমগ্রতার জন্যেই চাই যথার্থ আঙ্গিক, লিখনশৈলী, পর্যাপ্ত ও সমীচীন ভাষা। শিল্পে রূপ না হলে রস হয় না। এই রসস্ফুর্তির জন্যেই রূপদক্ষতার প্রয়োজন। সৌষ্ঠব না থাকলে ঐশ্বর্যকে ধরবে কী করে?

গত চল্লিশ বছরেরও উপর গল্প লিখছি, ১৯২১ সাল থেকে ১৯৬৫—লিখে চলেছি সমস্ত খণ্ডকালকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, ক্রমবাহিতার সঙ্গে তাল রেখে। 'দুইবার রাজা' (৯১) 'কল্লোল'-কালে লেখা, প্রথম সাড়া জাগানো গল্প, একটি রুগ্ন দরিদ্র ব্যর্থ যুবকের জীবনের স্বপ্ন ও সংগ্রামের কাহিনী। তবু যে কোনো মানুষই বুঝি জীবনে দু বার রাজা হয়, একবার যখন সে বিয়ে করে, আরেকবার যখন সে মরে। তাই গল্পের অমরও দুবার রাজা হল। আর সেই ছোট ছাত্র-ছেলেটিকে তো স্বচক্ষে দেখা, যে পেন্সিল দিয়ে বালি কাগজের খাতায় তার মৃত দিদির কথা ভেবে কবিতা লিখেছিল—'বড়দি বা বড় তারা।'

মুনসেফি নিয়ে বাঙলা দেশের দূর মফস্বলে, গ্রামে-শহরে, পুরে-গঞ্জে, চৌকিতে-মহকুমায় ঘুরেছি—দু যুগেরও বেশি—তার কত দৃশ্য, কত শোভা, ঘটনার কত বিচিত্র সম্পদ। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বদলি হয়েছি, নতুন জায়গার দূরত্ব ও চরিত্র ভেবে মন বিষণ্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই জায়গায় পৌঁছে দেখেছি, গল্পের কত শত উপাদান। চিরজন্মের যে পরিচিত সেই সাহিত্যের সঙ্গেই সাক্ষাৎকার হয়েছে। দেখেছি শুধু নদী-নালা খাল-বিল মাঠ-খেত গাছ-গাছালি নয়, দেখেছি মানুষ, কত রকমের মানুষ, আর কত তার মহিমা। শুধু শহুরে সভ্য শিক্ষিতেরাই নয়, গ্রামের চাষাভুষা হাড়ি-মুচি ডোম-ডোকল সারেঙ-খালাসী মেথর-ধাঙড় সবাইকে ডেকে এনেছি সমান পঙক্তিভোজে। দেখেছি যা কিছু মানবীয় তাই মাননীয়, তাই প্রাণের পরম আদরের ধন, পরম সন্ধানের বস্তু।

প্রকৃতিও আছে বৈ কি, অব্যাহত হয়ে আছে। জন্ম হয়েছিল নোয়াখালিতে, কত কারণেই ভূগোলে ও ইতিহাসে সে স্থান প্রসিদ্ধ, আর তারই উত্তাল ভাঙন-নদীর ছবি এঁকেছিলাম 'রুদ্রের আবির্ভাবে'। তবু মানুষের মত কিছু নয়, প্রকৃতিরও উজ্জীবন এই মানুষে। একটা মানুষ কম করে পাঁচটা উপন্যাস, পঞ্চাশটা ছোট গল্প ও পাঁচশোটা কবিতা বয়ে নিয়ে বেড়ায়—কে তা উদ্ধার করে? মানুষের হৃদয়ের একটা টুকরো কুড়িয়ে পাওয়াই যেন এক সাম্রাজ্যের রাজা হয়ে যাওয়া।

নইলে 'ছুরি' গল্পের (১) গৌরীয়া কী দিয়েছিল? একটা টুকরোর চেয়েও কম—একটি কটাক্ষ একটু হাসি। তাই বুঝি অনন্ত কালের বৈভব হয়ে রয়েছে। নেত্রকোনা রেলস্টেশনের নির্জন পথের ধারে মুদিখানায় তাকে দেখেছি। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছে দেশ ছেড়ে, একটা ধারালো ছুরি সঙ্গে রাখে আত্মরক্ষার জন্যে অথচ তার কালো চোখে যে ছুরি ঝিলিক মারে তার রক্তের নিমন্ত্রণ আরেক ভাষায়। তার দোকানে অনেক বাজে খদ্দেরের ভিড় হতে পারে, তাই বলে মহকুমার হাকিমসাহেব এসে শুকনো মুখে মোড়া পেতে বসে থাকবে? কিন্তু গৌরীয়ার ভাগ্যে তো এ পরমপ্রাপ্তি। তবু সে কিনা বলছে : 'তুমি বাড়ি যাও বাবুসাহেব। আমি ছোট আছি কিন্তু তুমিও ছোট হবে এ দেখতে আমার বুক ফেটে যাবে।' কিন্তু বিস্ময়টা কি শুধু প্রত্যাখ্যানে? না, বিস্ময়টা একটু হাসিতে। যখন এস-ডি-ও বদলি হয়ে চলে যাচ্ছে তখন রাস্তায় চোখাচোখি হতেই গৌরীয়া অল্প একটুখানি হাসল। কিন্তু সে কি হাসি? না এক শাশ্বত কান্নারই অনুলিখন?

'হরেন্দ্র'-কেও (৪১) দেখেছি নেত্রকোনায়। কোর্টে পাখা টানত। ছ ফুট লম্বা, শুকনো দড়ি-পাকানো চেহারা। নিরন্তন মাথা-ধরায় ভুগছে। রোগের বুঝি প্রতিকার হয় যদি সে বেগুনীকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু বেগুনীর বাবা সমাজ মানে, বিনাপণে মেয়ের বিয়ে দেবে না অথচ ছকুড়ি টাকা পণ দিতে পারে হরেন্দ্রের সেই সাধ্য নেই। তারপর গুণ্ডারা এসে যখন বেগুনীকে সমাজের বাইরে এনে ফেলে দিল তখনও হরেন্দ্র তাকে বিয়ে করতে পেল না। 'কাউকে রাজি করাতে পারলাম না হুজুর।' হরেন্দ্রের সেই কান্না উপবাসী বুভুক্ষু মানুষেরই নিরুপায় যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

'সাহেবের মা' ও (৩৪) সেই ময়মনসিং-এর মেয়ে। সেখানেই দেখেছি চাষী গরিব মুসলমান মেয়ের নাম সাহেবের মা রাখে, কখনো বা ইংরেজের মা, বিলাতের মা। সাহেবের মার ছেলে মারা গেছে কিন্তু যেহেতু সে সাহেবের মা, কে তাকে শিখিয়ে দিল ইনস্পেকশনে আসা ছোকরা এস-ডি-ও সাহেবই তার হারানো ছেলে। এস-ডি-ও-র বাঙলোতে এসে তার স্বপ্ন ভাঙল, দেখল সাহেবের এক সত্যিকার মা আছে, 'পিরতিমের মত সুন্দর', তাকেই সাহেব মা ডাকে। ফিরে গেল সাহেবের মা কিন্তু তার ছেলে সাহেবের জন্যে রেখে গেল একটা কাগজের ঠোঙায় কটি গুঁড়ো-গুঁড়ো চিনির বাতাসা।

'অপূর্ণ'-র (১১) কিশোর দেবেন্দ্রকে দেখেছি খুলনার ফুলতলায়। টেবিলের নিচে সাবরেজিস্ট্রারের পায়ের কাছে বসে দু হাতের থাবড়ায় সে মশা মারত। দুষ্টুমিতে টলটল করা চোখে এমন একটা ভাব ছিল যেন

কোন এক নদীর পার থেকে এসেছে, আবার চলে যাবে অন্য পারে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আশ্চর্য, তাই সে গেল একদিন, তার ক বছরের জমানো মাইনের—দুশো টাকারও বেশি—একটা আধলার জন্যেও সে ফিরল না।

'আরোগ্য'র (৪) কিশোর সরলকে বারুইপুরের লাইনে দেখেছি। বিনাটিকিটে ট্রেন চড়ে সে ধরা দিত যাতে জেলে গিয়ে বিনা পয়সায় তার টি-বি-র চিকিৎসা হয়। বিনা টিকিটের জন্যে জেল তো বেশি দিনের হয় না, তাই ডাক্তার বললে বেশি দিনের জন্যে আসার মত কিছু ব্যবস্থা করতে। সরল পকেট মারতে সুরু করল। ক্রমান্বয়ে জেলে গিয়ে-গিয়ে তার রোগ সারাল কিন্তু নতুন ব্যাধি পকেট-মারাও সারল কি?

'ওষুধ' গল্পের (৩৬) আক্কেলালির জ্বর সারল না। সারল না, গাঁয়ে সেই ওষুধ নেই। আক্কেলালির বাবা হুকুমালি, জোরদার তালুকদার, গ্রাম্য ডাক্তারকে হুকুম করেছে শহর থেকে ইনজেকশান নিয়ে আসতে। ইনজেকশানের বাক্স খুলতে দেখা গেল ভেতরের খোপে য়্যামপিউল নেই, আছে কাগজের টিপলে। সবাই ভাবলে হুকুমালি এবার ডাক্তারের মাথা নেবে। কিন্তু কী করল হুকুমালি? এক তোড়া টাকা দিল ডাক্তারকে। বললে, 'তিন গাঁয়ের মধ্যে তোমার একটামাত্র ডিসপেনসারি। এই টাকা দিয়ে ভালো দোকান থেকে ভালো ওষুধ কিনে তোমার ডিসপেনসারি সাজিয়ে ফেল। আমার আক্কেলালি গেছে কিন্তু আশানুল্লা মানেরদ্দি সোনামদ্দি গহরালির ছেলেরা যেন না মরে।'

'পরাজয়'-এও (৫৬) মনোমোহনের ব্যথা সারলনা। গত জন্মের বাপ-মায়ের কাছে এসেছিল পাদোদক খেয়ে রোগমুক্ত হতে, শেষে মুনিবের ওষুধ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। অন্য কিছু চুরি নয়, ওষুধ চুরি। 'মা গো আমি হেরে গেলাম হারিয়ে দিলাম তোমাকে। তোমার পায়ের অমৃত, হাতের অমৃত আমার এই পেটের ব্যথা সারাতে পারল না।'

'চোর'-এর (৪৮) তারাপদকে দেখেছি কলকাতায় বইয়ের দোকানে। অভাবে পড়ে চুরি করেছে, তার জন্যে শাস্তিও পেয়েছে। কিন্তু নদী মরে গেলেও তার নাম মরে না—ঘা শুকোলেও তার দাগ যায় না। কেউ মুদি থেকে মণিহারী হতে পারে, সেলসম্যান থেকে মিনিস্টার, কিন্তু তারাপদ আজও চোর কালও চোর। চুরি না করলেও চোর।

তেমনি 'ডাকাত' গল্পের (৭৭) দর্জন আলিকে দেখেছি বরিশালে, বিষখালির নদীতে। দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে বেরিয়েছে, লক্ষ্য সোনা-রুপো টাকা পয়সা আর মেয়ে। সাপ্লাইঘরের বড়বাবু আর খাসমহলের তশিলদারের নৌকোয় হানা দিয়েছে, নৌকোয় শুধু কাপড়ের গাঁটরি, 'এউগাও মাইয়া নাই।' বাড়ি ফিরে এসে দর্জন দেখল তার বাড়ির ঘাটের মুখে খালের কচুরিপানার মধ্যে একটা কাঁচা মেয়েমানুষ মরে আছে। গায়ে লজ্জার তন্তুমাত্র নেই। দর্জন আলি অধর্ম করতে পারে না, মেয়েটাকে গোর দিতে হয়, কিন্তু দাফনের কাপড় কই? কাপড়ের বাণ্ডিলটা ছেড়ে দিয়ে গোখুরি করেছে, কিন্তু এখন সে অনুতাপ অর্থহীন। 'সাজিয়া বিবি'-র কাছ থেকে একখানা নতুন কাপড় চেয়ে এনে মেয়েটার গায়ের উপর বিছিয়ে দিল। আর অমনি সরমের পুঁটলি হয়ে উঠে বসল মেয়েটা। দর্জন

দেখল তার মনে যে একটা সদিচ্ছা জেগেছিল—বিনাবস্ত্রে তাকে গোর দেবে না—সেই সদিচ্ছার জোরেই মেয়েটা বেঁচে উঠেছে। দলের লোকদের বললে নৌকো করে মেয়েটাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে। 'শোন, খবরদার বেডির গায়ে হাত ছোয়াইতে পারিবি না। যে কাপড় দিছি অর গায়ে হ্যা যেন নিটুট থাহে।'

কথা আছে যদি মানুষ দেখতে চাও তো দু'জায়গায় যাও, আদালতে আর যুদ্ধক্ষেত্রে। দু জায়গাতেই মানুষ যেমন হীন তেমনি মহান, যেমন দয়ালু তেমনি নৃশংস। খুলনার কোর্টেই দেখেছি 'সাক্ষী'-কে (২৯), সার্ট চাই, গায়ের কাপড় চাই, টিপবাতি চাই, নইলে মামলা ফাঁসিয়ে দেবে। আর পটুয়াখালির কোর্টে দেখেছি 'তসবির'-এর (১২) শরিফনকে, গায়ে বাপের হাতের মার দেখিয়ে যে স্বামীর থেকে তালাক নেয়, গরিব বাপের সাহায্যে, যাতে টাকা নিয়ে আবার তাকে নিকা দিতে পারে। শেষবারের মার পড়ল শরিফনের মুখের উপর। 'মুখটি যেন ছবিখ্যান।' শেষ প্রার্থী আহম্মদ পেশকার পছন্দ করল না। 'একটা চোখ কানা, নাকটা বেঁকে গেছে, যখন হাসল একটা দাঁত ফাঁক।'

'ঘর' গল্পের (৮৭) মোজাহারকে তো আদালতেই দেখেছি, আলিপুরে। স্ত্রী শহরবানুকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সদরালি, মোজাহার মুগুর দিয়ে বসাল এক ঘা। ঘা পড়ল শহরবানুর মাথায়, শহরবানু খুন হয়ে গেল। বিচার হচ্ছে মোজাহারের—জুরির বিচার। ছেলে কোববাত বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছে, দশবারো বছরের শিশু। তাকে জেরা করতে উঠেছে মোজাহার। ঘটনার কথা কিছু জিজ্ঞেস করছে না, জিজ্ঞেস করছে, 'কেমন আছিস? বিল্লাত কার কাছে শোয়! খোরাকি পাস কোথায়?' বিচারে ছাড়া পেল মোজাহার, কিন্তু ছাড়া পেয়ে কোথায় সে যাবে—তার ঘর কোথায়? পাবলিক প্রসিকিউটরকে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি তো সব জানেন কিন্তু বলুন তো আমি কাকে মেরেছি, সদরালিকে না শহরবানুকে?'

জুরির বিচারের একটি মর্মান্তিক ছবিই 'জারিজুরি' (১৯)। যেহেতু আসামীর চোখদুটো ড্যাবডেবে সেই হেতু সে নিশ্চয়ই ডাকাতি করেছে। অত ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে কে যায়, কে তলায়, সরাসরি লটারি করে দেখা যাক লোকটা দোষী না নির্দোষ। যেমন অদৃষ্ট করে এসেছে তেমনি হবে।

সরবানু ও রোস্তম-এর (৩৭) মধ্যে তালাকের মামলা চলেছে। তারা পরস্পরে মিলতে চায়, তাদের উকিলেরা সোলেনামা সই করছে না। প্রাণের মিলের কাছে কিসের মামলা, কিসের সোলেনামা? খাসকামরায় ওদের ডাকিয়ে এনে বললাম, কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যাও নৌকো করে। মামলায় যখন ফের ডাক পড়ল ওদের পাওয়া গেল না। শোনা গেল টাবুরে নৌকো করে ইছামতী দিয়ে দুজনে চলে গিয়েছে।

কিন্তু 'আপোস'-এর (৪০) সুষমা ও অনাদি মিলতে পারলে না, না বা দীপালি আর দেবেশ। আপোসের চেষ্টায় জজসাহেব তাদের ছোট একটা ঘরের নিভৃতিতে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ দিলে। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে ঘরে গিয়ে বন্ধ হল অনাদির স্ত্রী সুষমা আর দীপালির স্বামী দেবেশ। তেমনি পরিহাস বুঝি 'দুর্মদ'-এ (৮৫)। মামলার গতি-প্রকৃতি দেখে আসামীর ধারণা

হয়েছে সে ছাড়া পাবে, রায়ের দিন সে কোর্টে আসেনি, তার বদলা খাটতে মনুহরি অনাথ মন্ডল উঠেছে কাঠগড়ায়। কিন্তু এমনি কর্মবন্ধ, ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে বসল। অনাথকে ধরে নিয়ে চলল কনস্টেবল আর অনাথ আর্তনাদ করতে লাগল : আমি কোনো দোষ করিনি, আমি অনাথ স্যার, অনাথ। এ কান্না শুধু ঘরের মধ্যে নয়, ঘরের বাইরে, আকাশের নিচে, দড়িদড়াবাঁধা মানুষের কন্ঠে।

'মৃত্যুদন্ড' (৯৯) তো এই আদালতেরই পরম উপঢৌকন। জুরিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে জজ রামেশ্বরের ফাঁসির হুকুম দিয়েছে। কিন্তু আপিলে জজের রায় উলটে গিয়েছে, রামেশ্বর খালাস। জজের মনোবেদনার অন্ত নেই, তার রায় উলটে গেল। 'কী হয় রামেশ্বরের মত একটা বাজে লোক যদি মরে যায়! ওর বাঁচার জন্যে আমার একটা চার্জ—রায়কে ভুল হয়ে যেতে হবে?' পরদিন সকালে উঠে জজ দেখল 'রামেশ্বরের নমস্কারের মতই সমস্ত আকাশ আনন্দিত। ক্ষতি নেই ক্ষোভ নেই প্রাণের রোদে মৃত্যুদন্ড মুছে গিয়েছে।'

আর সেই মৃত্যুদন্ডদাতা জজ রিটায়ার করে কী রকম স্তিমিত হয়ে যায় তারই নিদারুণ কাহিনী 'ঘর কইনু বাহির' (৮৯)। স্ত্রী মায়ালতা শোক করছে : 'বিদেশে ট্রান্সফার হয়ে চলেছ। তুমি তো জানো ছ মাস পর্যন্ত স্ত্রীর টি-এ ভ্যালিড থাকে। এই ছমাসের মধ্যেই নিয়ে যাবে আমাকে। টি-এ খেলাপ করবে না।' আর রিটায়ার-করা জজেরই 'আর্দালি নেই' (৬৫)। কিন্তু মহীমোহন বললে, 'না থাক, আমি তো আছি।'

জজ রিটায়ার করে তবু মামলা রিটায়ার করে না, অনবরতই দিন পড়ে, এক্সটেনসান পায়। তারই গল্প 'দিন' (২৬)। 'আজও আমার মামলা হবে না? আবার দিন পড়ল?' দক্ষিণ বারাসতে নেমে আট মাইল মেঠো রাস্তা পার হতে-হতে একবার থামল মনোরথ। নির্জনে একবার শূন্যের দিকে তাকাল। কান্নাভরা গলায় বললে, ভগবান, আর কতদিন? ভগবান হাসলেন, বললেন, আমার আদালত আরো আস্তে।

এবার প্রেমের গল্পে আসি। গ্রাম্য প্রেমের গল্প দাঙ্গা (১৭), নুরবানু (৫১) লক্ষ্মী (৫২) 'যশোমতী' (৬০) আর 'জমি' (৬৩)। দাঙ্গাবাজ শত্রুপক্ষের ছেলে জিন্নাত আলিকে আটক করেছে মকবুল। মকবুলের মেয়ে মমিনা জিন্নাতের মনের মানুষ। মমিনা গোপনে এসে জিন্নাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে, ঠিক হয়েছে নদীর ঘাটে যে নৌকো আছে তাতে করে পালাবে দুজনে। দুজনে ঘাটে এসে দেখল নৌকোয় হাল দাঁড় নেই। মমিনা গেল বাঁশ আনতে। বাঁশ নিয়ে এসে দেখল জিন্নাত একাই চলে গিয়েছে হাত দিয়ে জল কেটে-কেটে। শত্রুপক্ষের মেয়ের চেয়ে স্বাধীনতাই বুঝি তার বড় কাম্য। নদীর নামটি আঁধারমানিক। সেই নদী আর মমিনা আমার চোখের উপর। রাগের মাথায় নুরবানুকে তালাক দিয়েছিল কুরমান। যখন প্রত্যাবর্তনের জন্যে নুরবানু বৈধ হল তখন কুরমান আবিষ্কার করল স্নানের জল ঘোলা হয়ে গিয়েছে। বললে, 'নুরবানু, ফিরে যা। আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই।' কিন্তু যশোমতী দুগগোচরণকে ফিরিয়ে দিল না। সে খালধারের বস্তিতে ঘর নিয়েছে, কেন আর তবে তাড়িয়ে দেবে?

শুধু বলেছে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আসতে। আইনের চোখে লক্ষ্মী নাবালক, তাকে ভাগিয়ে নেবার জন্যে গৌরের জেল হয়েছে। জেলের মেয়াদ শেষ হবার আগেই লক্ষ্মীর বয়েস পুরবে। লক্ষ্মী তাই বাস্এ পকেট মেরে জেলে যেতে চেয়েছে গৌরের সঙ্গে মেলবার আশায় কিন্তু লক্ষ্মীর জেল হলনা আর গৌর জেল থেকে বেরিয়ে এসে বললে, একটা পকেটমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না। মহাজনের কাছে নিকা বসে স্বামীকে তার রায়তি-স্বত্বের জমি ফিরিয়ে দিয়েছে আমিরন। বলছে, 'আমিই কবলার পণ। আমার জন্যে মন খারাপ কোরো না। আমার চেয়ে তোমার জমির দাম অনেক বেশি। আমি গেলে কী হয়? তোমার জমি তো ফিরে এল। তার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারল না।'

'তাজমহল'-এ (৭৬) দুটি পাখির প্রেম আর তারই স্পর্শে এক বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধ দম্পতি পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে গেল। আর 'গাছ'-এ (৭৪) প্রেম গাছের সঙ্গে। বোবা মেয়ে গঙ্গামণির গাছের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। বাড়ির কাছে সরল সতেজ গাছ, যার অনেক পাতা অনেক ছায়া, কিছু ফুল, কিছু গন্ধ, যে সরু একটা ডাল পাঠিয়ে দিয়েছে গঙ্গামণির জানলার দিকে। কত শত ঝড়েও সে গাছ বিচ্যুত হয়নি কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে গঙ্গামণি যখন এ দেশে ফিরে এল তখন তার স্বামী তো তার সঙ্গে আসতে পারল না, বাড়ি আগলে যেমন-কে-তেমন দাঁড়িয়ে রইল। বর্ডারের অফিসর বললে' 'আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার স্বামী তো বেঁচে আছে। বেঁচে যখন আছে তখন আবার একদিন দেখা হবে আপনাদের।'

'ভক্ত'-র (৬২) প্রেমিক-প্রেমিকা তো কালীপদ আর জামিলা। 'যিনি সব সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষে মানুষে একটুখানি মিল-মিশ সৃষ্টি করতে পারেন না?' কালীপদের কষ্টিপাথরে জমিলা ফুটে উঠতে পারেনা সোনার রেখার মত? মুর্শিদাবাদ কান্দীতে ওদের দেখেছি—দেখেছি যখন পথের দেবতা জনগণের দেবতা পথে নেমেছেন। রুদ্রদেবের সেই মিছিল কে না দেখেছে? কতক রাস্তা তো মুসলমানরাই পাল্কি বইলে। পথহীনদের দেবতাই তো জামিলা-কালীপদকে পথের ধুলোয় মিলিয়ে দিলে। কিন্তু তারপর? পথের ঠাকুর রাত্রিশেষে আবার তার সিংহাসনে গিয়ে বসলেন, তাঁর পাকাস্বত্বের জমিদারিতে। বারের বামুন কালীপদ আর জামিলাকে মন্দিরের আঙন থেকে হটিয়ে দিলে।

শহরের প্রেমের গল্প 'পাশা' (৩), 'রং-নাম্বার' (২৩), বিন্দু (২৮), খিল (৩১), ওভারটাইম (৩৫), মণিবজ্র (৪৫), ত্রাণ (৪৯),, এক-রাত্রি (৫৭) আর পরাবিদ্যা (৮৮)। একটা রক্তাক্ত মিথ্যে দিয়ে রণেন প্রেমকে যাচাই করে নিল। যাকে টি-বি ভেবে মৃদুলা পালিয়ে গেল আসলে সেটা নড়া-দাঁতের রক্ত। কিন্তু অতসীর ভুল হল না। সে তো পাশা খেলতে বসেনি। রং-নাম্বারে অরুণিমা জয়ন্তকে ভালোবেসেছিল, জয়ন্তকে বিবাহিত জেনেই। প্রথমে সিঁদুর চেয়েছিল, পরে চেয়েছিল একটা শিশু, শেষে চেয়েছিল একটি চুম্বন। 'আমার দাবি কত, কত কমিয়ে এনেছি। পাইনা একটা হীরের টুকরো? অন্তত একটি চুম্বন। একটি সামান্য উপহার।' শেষ পর্যন্ত কী পেল অরুণিমা? 'কিছু চাই না। শুধু মনে রেখো। মনে স্থান দিয়ো।'

ভালোবাসার শুধু এইটুকুই কি ন্যূনতম সর্ত নয়? কাকে বলে পাওয়া, জয় করে পাওয়া, একান্ত করে পাওয়া তারই পরিচয় 'একরাত্রি'তে। কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে কত কলাকৌশল করে উপরতলার মেয়েকে ভবদেব নিচের ঘরে, নিজের ঘরে নিয়ে এল। রাত নির্জন, আসানসোলের গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড দিয়েও তখন বুঝি গাড়ি যাচ্ছে না, ক্ষণিকা বললে, 'আমি এসেছি।' তোমাকে কী দিই বলো তো?' উথলে উঠল ভবদেব। ঘ্রাণে-বর্ণে গদগদ নিবেদনের বেদনায় আনন্দময়, দিল একটি গোলাপফুল। ক্ষণিকার খোঁপার মধ্যে গুঁজে দিল।

প্রেম-করা বিয়ের কী পরিণাম তার প্রমাণ একদিকে শুক্তির দিদি মুক্তি আর তার স্বামী নবেন্দু, অন্য দিকে অনীকের দাদা প্রাণকুমার ও তার স্ত্রী তনিমা। প্রায় সর্বক্ষণই তাদের ঝগড়া, অবনিবনা—দু পরিবারেই যন্ত্রণায় একশেষ। তা হোক, তবু দুর্যোগের মধ্যেই স্নান করে নিতে হবে। তাই শুক্তি আর অনীক হটল না, যন্ত্রণাকে ধ্রুব জেনেই আনন্দে ডুব দিল। সবই ক্ষণস্থায়ী, তাই এই আনন্দটুকুই বা ছাড়ে কেন? 'জীবনটাও তো শুধু একটা মাত্র মুহূর্ত।' শুক্তির কথার উত্তরে অনীক বললে, 'একটা আশ্চর্য বিন্দু।' এটিই 'বিন্দু' গল্পের সংকেত। 'খিল'-এর সংকেত তো নিরুচ্চার। মফস্বল শহরে রাত্রে এক ঘরে বিপত্নীক সুরজিৎ, পাশের ঘরে চাকরিতে ইন্টারভিয়ু দিতে আসা এক রাত্রির অতিথি পূর্বপরিচিতা অশোকা। দু-ঘরের মাঝখানে একটা মাত্র দরজা যার খিল অশোকার দিকে। সকালে উঠে সুরজিৎ দেখল অশোকা বাইরের দরজা খুলে চলে গিয়েছে। ভিতরের দরজার খিল যেমন-কে-তেমন বন্ধ। কিন্তু সুরজিৎ একবার মনের মধ্যে হাতড়ে দেখুক নিশীথের কোনো অসহ্য মুহূর্তে টুক করে খিল খুলে দিয়েছিল কিনা অশোকা, কোনো বধির ঘুমকে আমন্ত্রণ করতে? তারপর প্রতীক্ষাকে মর্মন্তুদ প্রহার করবার জন্যে আবার তুলে দিয়েছিল খিল। আর, পরাবিদ্যা কী? ভালোবাসাকে জানার ও ভালোবাসতে জানার নামই পরা-বিদ্যা। এক মেয়ের কাছে যে লম্পট আরেক মেয়ের কাছে সে সর্বস্ব। ভালোবাসায় অশ্লীল বলে কিছু নেই। তাই বাঙাল নন্দিতা জানলা দিয়ে তার নিরীহ মিষ্টি মুখটা বার করে তার অভিযোক্ত্রীদের বললে, 'ভদ্রলোক বড় ক্লান্ত হইয়া আইছে। খাওনদাওন কিচ্ছু হয় নাই। তরা অখন যা। যদি পারস পরে আসিস।'

মেয়ে মালিনী যখন অসবর্ণ বিয়ে করল কান্তিবাবু ক্ষমা করলেন না, মালিনীকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলে শশাঙ্ক যখন অসবর্ণ বিয়ে করল তখন তাকে তাড়াতে পারলেন না। মালিনীর বিয়ের পর উইল করে ষোল আনা শশাঙ্ককেই দিয়েছিলেন, শশাঙ্কর বিয়ের পর ভাবলেন উইলটা ছিঁড়ে ফেলি ছেলে-মেয়েতে তফাৎ করি কেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছিঁড়লেন না, শুধু স্ত্রীকে বললেন, 'মালিনী আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে, আমাদের একটা পয়সাও খরচ করাল না।' 'ত্রাণ' পেলেন কান্তিবাবু। 'ওভারটাইম' খাটতে গিয়ে সোমনাথ আর মিত্রার সঙ্গে 'মিট' করতে পারে না, সোনার সন্ধ্যাগুলি মাটি হতে লাগল একে একে। তারপর এক নির্ধারিত ক্ষণে মিত্রা যখন চরম মিলনের জন্যে প্রস্তুত তখনও ওভারটাইমের দৌরাত্ম্যে সোমনাথের দেরি

হয়ে গেল। মিত্রা কথা দিল, আরেক দিন হবে। সে সুযোগ আসবার আগেই মিত্রার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল। এক দুরন্ত দুপুরে দুর্বহ নির্জনতায় সোমনাথ মিত্রার নতুন বাড়িতে এসেছে তার পাওনা আদায় করতে। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে মিত্রা বললে: 'কী করে দিই বলো। আমি ওভারটাইম খাটি না।'

'মণিবজ্র' ডাক্তার-ছাত্র অরিন্দম আর তার প্রেয়সী নার্স নন্দিনীর কাহিনী। তারা এখনো বিয়ের জন্যে তৈরি নয়, তবু পরস্পরের সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় তারা একত্র একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। তারা বিজ্ঞানজ্ঞ মানুষ, যন্ত্রে-অস্ত্রে কুশলী, জানে নিজেদের রক্ষা করতে। কিন্তু একদিন লখিন্দরের লোহার বাসরে সাপ ঢুকল প্রেমের কোটরে সন্দেহের সাপ। তাই নন্দিনীকে অকালে বন্দী করবার জন্যে মিলনলগ্নে নির্মুক্ত হল অরিন্দম। অরিন্দম বোঝাতে চাইল এ একটা দুর্ঘটনা মাত্র: কিন্তু নন্দিনী তা মানতে চাইল না, তার কাছে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা।

'তিরশ্চী'-তেও (৮৬) কি তাই? প্রার্থী পাত্রকে সুমিতা ফিরিয়ে দিল চিঠি লিখে যে সে আরেকজনকে ভালোবাসে। তারপর সেই সুমিতাকে দেখলাম মফস্বলের এক শহরে চুরির দায়ে ধরা পড়া এক আমলা, পশুপতির জন্যে সুপারিশ করতে। 'পশুপতিই তোমার স্বামী?' জিজ্ঞেস করল হাকিম, সেই প্রাক্তন পাত্র। পশুপতিই সুমিতার স্বামী বটে কিন্তু পশুপতি সুমিতার সেই মনোনীত প্রেমিক নয়। পশুপতিকে চিঠি লিখে নিরস্ত করা যায়নি, আর সুমিতা রণে ভঙ্গ দিয়ে পরাভূত হয়েছে। সুমিতার মধ্যে আর কিছুই তাই দেখবার নেই, না প্রেমের পবিত্রতা না বা বিদ্রোহের দীপ্তি। হাকিম ক্ষমা করতে পারল না।

কিন্তু 'অপরাধ'-এ (৪৬) দিনেশ স্ত্রী অসীমাকে অক্লেশে ক্ষমা করতে পারল। দেশের জন্যে অনেক লাঞ্ছনা সয়েছে অজয়, ডিটেনশান ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়ে বন্ধু দিনেশের বাড়িতে সাময়িক বিশ্রাম নিতে এসেছে। দিনেশ ছোট ছোট সাংসারিক ঋণে জর্জর, নিয়ত অপরাধবোধের ভয়ের মধ্যে বাস করছে। অজয় এসে ঠেকাল পাওনাদারদের, দিনেশের মনের থেকে উড়িয়ে দিল ঐ ভয়ের ভূতটাকে। বললে, অক্ষমতা অপরাধ নয়। কিন্তু যখন দেখল অজয়ের কোলের মধ্যে দু হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে অসীমা কাঁদছে তখন তার কি মনে হল: না, অক্ষমতাও অপরাধ?

এক হিসেবে 'প্রতিমা'-ও (৯৮) প্রেমের গল্প। প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পরিমল গণিকালয়ে এসেছে, কুড়িয়ে নিয়েছে প্রতিমাকে। তার জ্বালার শোধ তুলছে অহেতুক ঘৃণা দিয়ে—যেন সব মেয়েই প্রতিমা। তারপর, বেশ্যাও ভালোবাসতে পারে এই প্রমাণ রাখবার জন্যে প্রতিমা যখন আত্মহত্যা করল তখন কী বুঝল পরিমল? বুঝল, 'প্রথম প্রেমের পর আরো প্রেম আসে কিন্তু প্রথম মৃত্যুর পরে আর মৃত্যু নেই।'

'প্রাসাদশিখর' (৯২) অলৌকিক পরিবেশে মর্ত্য প্রেমের কাহিনী। সুপ্রিয় শক্তিশালী মিডিয়ম, সিয়ান্সে তার স্ত্রী মৃতা শাশ্বতীকে নিয়ে এসে কথা বলে। ক্ষণিকা তার স্বামীকে হারিয়ে এই সিয়ান্সের জন্যে ব্যাকুল যদি তার মৃত স্বামী শমীন্দ্রের সাক্ষাৎ পায়। প্রত্যাশিত আবির্ভাবের দিনে সুপ্রিয়

দেখল সিঁথিতে সিঁদুর নেবার জন্যে যে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে সে বিদেহিনী শাশ্বতী নয়, রক্ত-মাংসে গড়া শোকোত্তীর্ণা এক নারী।

বিশুদ্ধ প্রেতলোকের গল্প 'রক্তের ফোটা' (৬৩)।

এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা। সেসব দুর্দিনের গল্প 'যতনবিবি' (৭) বাঁশবাজি (৫৫), কালনাগ (৩৮), বস্ত্র (৪৪), হাড় (৫৮) আর চিতা (১৮)। ইনস্পেক্টর সাহেবের চাকর হানিফ ভিখিরি-মেয়ে যতনকে খাইয়ে-পরিয়ে জীয়ন্ত করে তুলল কিন্তু যতন বুঝল এ সবই হানিফের মনিব ইনস্পেক্টর সাহেবের করুণা। তাই চরমমুহূর্তে হানিফ যখন দেখল যতন সাহেবের নৌকোতে গিয়ে উঠছে, আপত্তি জানাতে চাইল, কিন্তু যতন বললে, 'যে আমাকে এত দিন খাওয়ালো-পরালো যার পয়সায় আমার এই শাড়ি-জামা চুড়ি-বালা তাকে আমি ফেরাতে পারব না, আমি নেমকহারাম নই।' 'বাঁশবাজি'তে গাজনের মেলায় মন্তাজ তার দ-পড়া পেটের উপর বাঁশ বসিয়ে ডগায় ছেলে ইন্তাজকে তুলে দিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। বাঁশটাকে বেশিক্ষণ রাখতে পারল না পেটের উপর, ইন্তাজ ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। ছোট ছেলে আক্কাছ ভাবলে এবার বুঝি তার পালা। ভয় পেয়ে আর্তনাদ করছে, 'না, আমি না—আমি পড়ে যাব, মরে যাব।' ছেলের কান্নার উত্তরে মন্তাজের রেখাহীন কাঠিন্য। 'কালনাগ'-এ বস্তির ঝি সেজে চালের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সুধা। যখন সন্ধের দিকে চাল নিয়ে ফিরছে একটা লোক তাকে গুটি গুটি অনুসরণ করছে। স্বামী ভবতোষ তা দেখতে পেয়ে মারমুখো হয়ে তেড়ে এসেছে : এটা বস্তি নয়, গেরস্ত-বাড়ি। যাকে ঝি ভেবে পিছু নিয়েছেন সে ঝি নয়, ভদ্রলোকের স্ত্রী। কিন্তু ভবতোষ কি জানে সুধা তাকে কটি চাল দেবে বলেই ডাকিয়ে এনেছিল? 'বস্ত্র' গল্পের শাশুড়ি-বৌকে পটুয়াখালিতে দেখেছি একখানা নতুন ধুতির দুই ছিন্ন অংশ পরে ছাদেম ফকিরের জন্যে শোক করছে। ছাদেম ফকির ঐ নতুন ধুতিই গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করেছে। সে জানত একখানা ধুতি ছিঁড়ে তিনজনের লজ্জা নিবারণ হত না। আর যতক্ষণ সেই ধুতি ছাদেমের গা থেকে খালাস হয়নি ততক্ষণ প্রকাশ্যে তার মা আর বউ শোক করতে পারেনি। 'হাড়' বুঝি আরো ভয়াবহ। রুগ্ন স্বামীর মত নিয়েই মানদা মেলায় গিয়েছিল রোজগার করতে। কিন্তু কেউ তাকে পছন্দ করল না। যখন বাড়ি ফিরে এল দেখল কান্তরামের দেহ নেই, শেয়ালকাঁটার ঝোপের আড়ালে কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে। মানদা শোক করতে পারল কই? কঙ্কাল কিনতে এসেছে সাহেব-সুবোরা—জ্যান্ত মানুষের দাম না থাক কঙ্কালের দাম আছে। 'চিতা'-র ছেলেটাকে তো বসিরহাটের কোর্টের হাতায় মরে থাকতে দেখেছি। দুই রাজনৈতিক দলের লোক এসেছে তার সৎকারের ব্যবস্থা করতে। একজন বলছে চাঁদা তুলে বাঁশ দড়ি কিনে আনি, আরেকজন বলছে সামন্তদের বাঁশঝাড় থেকে দু খানা কেটে নিচ্ছি, আর ঐ খোঁটায় বাঁধা গরুর গলার দড়িটা খুলে নিলেই চলে যাবে। মিউনিসিপালিটির ডোম এসে হাজির, সে ছেলেটাকে বুকে করে নিয়ে চলল শ্মশানে। এমন ছেলের জন্যে অত সাজসরঞ্জাম লাগে নাকি? মানুষের বুক আছে কী করতে?

'কাক' (২৫) আর 'কালোরক্ত' (৮০)-এও ঐ অদিনের ছায়া। 'কাক'-এ

বরিশালের নবান্ন আর 'কালো রক্ত'-এ কলকাতার ডাস্টবিন। নবান্নের কাকবলি নিতে কাক এলনা, তারা অন্য ভোজের খোঁজ পেয়েছে আর বিভা কিনা তার মাতৃত্বের ক্ষুধায় লালরক্তকে কালো করে দিল। আর দাঙ্গার স্বাক্ষর স্বাক্ষর-এ (৩২)। জহরালি আর দীননাথ দুজনেই দাঙ্গা করেছে লুটতরাজ করেছে আর এখন মিলিটারির ভয়ে দুজনেই লুকিয়েছে এক অগ্নিদগ্ধ পরিত্যক্ত বাড়িতে, অন্ধকারে, দোতলায় সিঁড়ির নিচে। তারা যে পরস্পর শত্রু এ কথা আর বিশ্বাস করছে না, বুঝতে পেরেছে তাদের দুজনের একই শত্রু, যে এখন বন্দুক কাঁধে নিয়ে ভারি বুটে রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। 'তোর কাছে দেয়াশলাই আছে?' 'তোর কাছে বিড়ি?' দুজনের শরীর একই যন্ত্রণায় ঝঙ্কৃত, একই শান্তিতে প্রতিশ্রুত। 'টান'-গল্পেও (৭২) এই শান্তির ইঙ্গিত। একে পীর-বংশ তায় জমিদার তারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল আল্লারাখা, প্রতিবেশী উমেশের জমিটুকু বাঁচিয়ে দিতে। পীরের শাপে নিজের ছেলে মরে গেলেও প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলে, উমেশের ছেলে বেঁচে থাক, আর উমেশের ছেলের হাস-হাসন্ত মুখখানা মনে করে তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠল : ঝাঁ গুড়গুড় বাদ্যি বাজে।'

দাঙ্গা ও মন্বন্তরের মত আরো অনেক ক্ষত আছে সমাজে, প্রকাশ্যে না হোক অন্তরালে। সেসব ছবিই 'কুমারী'-তে (৮৪), 'ঘুষ'-এ (৭৩) 'ছাত্রী'-তে (৬), 'পাপ'-এ (৫৪), 'মা নিষাদ'-এ (৭১) ও 'সিঁড়ি'-তে (৪৩)। 'সিঁড়ি'-তে নিজের শোবার ঘরটাই ভাড়া দিয়েছে সুধাময়, সেখানে জুয়ো-খেলা চলে আর যতক্ষণ চলে ততক্ষণ স্ত্রী কেতকী অন্ধকারে সিঁড়ির উপর বসে থাকে। খেলায় মন্মথই বেশি জেতে আর তার ভারি পকেট হালকা করবার জন্যে আরো কোনো খেলায় সুধাময় কেতকীকে প্ররোচিত করতে চায়। অবশেষে সিঁড়ির উপর যাকে পাশে বসিয়ে পকেটে হাত ঢোকায় কেতকী, সে, দেখা যায়, মন্মথ নয়, আর কেউ। ভাগ্যের পরিহাস এমনি 'পাপ'-এ। পরস্ত্রীর আমন্ত্রণে অমিতাভ তার ঘরে গিয়ে ঢুকল, জুতো সিঁড়ির নিচে, বাইরে রেখে। হরবিলাসের বউ চাপা গলায় বলে উঠল : 'জুতো—' সত্যিই তো, জুতোর প্রমাণ কেউ বাইরে রেখে আসে? অমিতাভ ফিরল জুতো পরে আসতে। আর তার যাওয়া হলনা। সেই তীক্ষ্ন মুহূর্তটি আর নেই। 'ঘুষ'-এ ঘুষ কি শুধু টাকায়, জিনিসে নয়, কিংবা মানুষে? যে ঘুষের বিরুদ্ধে নালিশ করে সেই কি নিজে ফের ঘুষ খেয়ে মুখ মোছে না? 'কুমারী'-তে দেখা যাচ্ছে চরম ফলাফল দিয়েই বুঝি আজকের সমাজে চরিত্রবিচার। এক-স্তূপ টাকা যদি আনতে পারো তাহলে আর প্রশ্ন থাকেনা, কোন পথ দিয়ে আনলে? হাসপাতালের পরীক্ষায় যদি দেখা গেল চরম বিপদ হয়নি তাহলে সম্ভ্রান্ত বংশের কুমারী মেয়ে গৌরী যদি মোটর ড্রাইভারের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে থাকে সেটা দোষের নয়। চারদিকে যা উত্তেজনা, সে বাড়িতে স্থির থাকে কী করে? বিপদ যখন হয়নি তখন পুলিশের উপর উলটো তম্বি— বেড়াতে যাওয়াটাকে বেরিয়ে যাওয়া বলতে পারেন না। 'ছাত্রী'-তে মাতাল জজ একটি দুঃস্থ-দুর্গত গরিব ছাত্রী চায় যে তাকে কটি তপ্ত-নিভৃত রঙিন মুহূর্ত দিতে পারে। আবেদন করছে তারই মেয়ের প্রাইভেট-টিউটর বিমানের কাছে। বাঞ্ছিততম ছাত্রীর ঘরে শিবতোষকে পৌঁছে দিল বিমান। কিন্তু সে,

কে? ছাত্রী আলো জ্বালল, শিবতোষ ফিরলনা, আলো নিবিয়ে দিল। 'মা-নিষাদ'-এর শিবদাস সান্ধ্যবিহারের গাড়িতে যে উদ্বাস্তু মেয়েটিকে পেয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে, তাকে নিছক দুঃস্থ জেনেই সে কটা টাকা দিয়েছিল। অনীতার সাধ্য ছিল না টাকাটা না নেয়। ছেলের বিয়ের পাত্রী দেখতে গিয়ে শিবদাস দেখল এ সেই অনীতা। শিবদাস স্থির করল দৈন্যের থেকে মুক্তি দিয়ে অনীতাকে পুত্রবধূ করবে, তাকে স্থান দেবে, প্রতিষ্ঠা দেবে। কিন্তু অনীতা রাজি হলনা : 'আমি এক বাড়িতে দুজনের হয়ে থাকতে পারবনা কিছুতেই।'

মামলা জেতবার ফিকিরে মানুষে কত না তদবির করে এবং কী বিচিত্র উপায়ে তারই গল্প 'তদবির' (৯৬) আর এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ পাবার জন্যে সুমিতা কতদূর গিয়েছিল তারই গল্প 'থার্ডক্লাশ' (১৫)।

কত ক্লিষ্ট মানুষ দেখেছি, কত মহিমান্বিত মানুষ। কখনো কখনো ক্লেশেই মানুষ মহিমান্বিত। 'ঘোড়া'-গল্পের (৫) জবানখাঁকে দেখেছি। বড়লোক হয়ে সম্ভ্রান্ততার টিকিট খুঁজছে। লোকে বলবে দরজায় ঘোড়া বাঁধা, জনাব খাঁ ঘোড়া কিনল। ঢাকার রেসের ঘোড়া, প্রিন্স অফ আগ্রা। সে ঘোড়া জবান খাঁকে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে মারা গেল। সবাই বললে, শালাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। জবান খাঁ বললে, 'না, মাটি দেব। ওকে আমি অসম্মানী হতে দেব না।' দেখেছি 'জনমত'-এর (৩০) কাবলিওয়ালা মামুদ খাঁকে। দেশে মহাজনী আইন এসেছে, দিন বদলে গিয়েছে, খাতকেরা একজোট হয়ে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মারছে। যারা মারছে তারাই কি কম রক্তচোষা জানোয়ার? রক্তমাখা উপরের ঠোঁটটা চাটছে মামুদ খাঁ, রক্তের স্বাদটা জেনে রাখছে অনাগত দিনে ওদের কপাল ফেটে যে রক্ত ঝরে পড়বে, তার। নিত্যগোপী জল দিতে চাইল, খেল না, পাছে এই টক-টক নোনতা-নোনতা স্বাদটা ধুয়ে যায়। দেখেছি 'বিড়ি' গল্পের দলিলদ্দি জমির জন্যে লড়তে গিয়ে বুকে বর্শা খেল। বর্শা বেঁধা অবস্থায় নৌকো করে হাসপাতালে যাচ্ছে আর যেটুকু জ্ঞান আছে তারই মধ্যে বিড়ি টানছে। পাঁচ-ছ বছরের নাতি, আলি, সঙ্গে ছিল, তারও কপালের দিকটা ফেটে গিয়েছে, সেলাই করতে হবে। হাসপাতালে পৌঁছে ডাক্তার দেখে দাদু-দাদু বলে কাঁদছে আলি। দলিলদ্দির তো সঙীন অবস্থা, বারান্দার আরেক প্রান্তে তার বুক থেকে বর্শা তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই আছে কি এই নেই। আলির কান্না কানে যেতেই ট্যাঁক থেকে শেষ বিড়িটা বার করে আলিকে দিতে বললে। বললে, 'ওকে বল, দাদু দিয়েছে। যেন না কাঁদে। যেন ভালো হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।' আলি চোখ ডাগর করে দেখল। একটা আস্ত বিড়ি। এক চুমুক ধোঁয়া নয়, একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড। দেখেছি 'কেরামত'-কে (২৪), আকাট মূর্খ কিন্তু বউ পেয়েছে সুন্দরী, নামটিও সুন্দর— মেহেরজান। এমদাদ জোরমন্ত লোক, মেহেরজানের উপর চোখ পড়েছে। একটা ক্ষুদ্দুর চাষা সে কোন অধিকারে সুন্দরী স্ত্রী ভোগ করে? মেহেরজানের কাছে প্রস্তাব পাঠাল এমদাদ। কেরামতের ঘুমও প্রচণ্ড। হাঁ করে বাঁ হাত মেলে দিয়ে ঘুমুচ্ছে, ভুষো তৈরি করে তার বুড়ো আঙুলের মাথায় মেখে দিয়েছে মেহেরজান। দলিলে টিপ নিয়েছে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। আদালতে এসে কেরামত জানল সে দলিল তালাকের দলিল, প্রতি পৃষ্ঠায়

তারই হাতে টিপ দেওয়া। দেখেছি 'মাটি'-র আমানতকে চাপাই-নবাবগঞ্জে, যে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মন্ত্রী করবার দুরাশায় সমস্ত জমি বেচে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে দর্জি হয়েছে। লাঙল না চালিয়ে এখন সে সেলাইয়ের কল চালায়, আজিজ আর চাষার ছেলে নয়, খলিফার ছেলে। কিন্তু যেদিন আকাশ কালো করে টিনের চালের পরে বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম করে, আমানতের পা-কল থেমে যায়, শুনতে পায় তার মাটির ডাক—বলে, আমানত, চলে আয়।

'কাঠ'-গল্পে মঙ্গল আর্দালির মুখটা তো এখনো ভুলিনি। মাঝিরা নৌকো করে কাঠ বেচে, তাদেরই থেকে কয়েক আঁটি কাঠ কিনেছিল মঙ্গল। দর নিয়ে তর্ক উঠল। পার্টির লোক যারা এসেছিল ফয়সালা করতে তারা গরিব মাঝিদের দরই ঠিক বলে মানলে। মঙ্গলকে তার মাইনে ও মাগগি-ভাতার পুরো সাতাশ টাকাই দিয়ে যেতে হল। মঙ্গল যে এ কাঠ নিজের জন্যে কেনেনি, তার হাকিমের জন্যে কিনেছে, এ কে দেখে, কে বিচার করে? 'নতুন দিন'-এ (৬৮) দেখেছি গ্রামাঞ্চলে ভোটের প্রবঞ্চনা। ভোটার জোনাবালিকেও স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল সুদিনের সূর্য উঠবে, দিকে-দিকে বসে যাবে দৌলতখানা। শেষে কী দেখল জোনাবালি? দেখল নিলেমের পরবর্তী দায়ে সে জেল খাটতে চলেছে। কিন্তু 'কেরাসিন'-এর (২৭) রমজান অত সহজে জেলে যেতে রাজি নয়। কেরাসিনটুকুও নেই যে রাতে বউ হাস্য বিবির হাসিটুকু দেখে। হাসি না দেখুক, কান্নাটা তো দেখবে, এখন যখন সে অসুখে কাতরাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকারের পাথর সরায় এমন এককণা আলো কই? হাতেমশার গুড়ের আড়তে আগুন লেগেছে, তার গুড়ের হাঁড়ির মধ্যে লাল কেরাসিন যে আলোতে রমজান এখন হাস্যকে দেখবে, যে হাস্য এখন ঘুমে, যার মুখ এখন অন্ধকার।

'শিল্কের ব্যান্ডেজ'-এ (৭০) স্বামী স্ত্রী ঝগড়া মারামারি করছে, আবার বিচিত্র উপায়ে মিলে যাচ্ছে, কিন্তু 'ছেলে' গল্পে (৭৯) ঝগড়ার পরিণতি হল বিবাহবিচ্ছেদে। শুধু বন্ধন ছিন্ন করেই ক্ষান্ত হলনা তপতী, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে, কিন্তু মন্তু রইল যার ছেলে সেই প্রথম স্বামী হিমাদ্রির হেপাজতে। ডিক্রিতে সর্ত ছিল প্রতি রবিবার বেলা দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত দুঘন্টা তপতী তার প্রথম স্বামীর বাড়িতে মন্তুর সঙ্গে কাটিয়ে যেতে পারবে, মন্তুকে নাইয়ে খাইয়ে দিয়ে যেতে পারবে। এই নিয়ে আবার হিমাদ্রির সঙ্গে তপতীর ঝগড়া। অবশেষে মন্তু, যে রবিবার হলেই মা-মণির জন্যে এক পায়ে খাড়া, তপতীকে বললে, 'তুমি আর এস না। তুমি এসেই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করো অশান্তি করো। তোমার হাতে তাই আর নাব না, খাবনা।' তপতী হিমাদ্রির কাছে গিয়ে কাঁদতে বসল। সেই অবস্থায় তাকে দেখল অমিতাভ, দ্বিতীয় স্বামী। তপতী বললে, 'আমি এতক্ষণ ছেলের জন্যে কাঁদছিলাম। আর 'ডিসক'-এ (৬৬) শুনেছি একটি গানহারা মেয়ের কান্না। 'নিজের জন্যে তো চোখের জলই আছে, কিন্তু গান তো সকলের জন্যে, আমার সেই গান কই?' যে সকলকে নিয়ে আমি আমার সেই সকল কই?

দেখেছি কীর্তনখোলা নদীর উপরে স্টিমারের সেই মহান 'সারেঙ'-কে

(৪৭) যে সহসা একটা চোর খালাসী ছেলের বাপ হয়ে দাঁড়াল। 'আপনার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছে কেউ?' নতুন বৌকে জিজ্ঞেস করল সারেঙ। 'না, ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়।' নতুন বৌ যে চিনতে পেরেছে চোরকে, সে যে তার প্রথম স্বামীর সন্তান নাসিম। বরের পার্টি নেমে যাবে লতাবাড়ি স্টেশনে কিন্তু আজ সিঁড়ি ধরবে কে? সারেঙ হুকুম দিল : আজ থেকে নাসিম সিঁড়ি ধরবে। বলে দরাজ গলায় নাসিমকে উৎসাহিত করতে লাগল সারেঙ। যে নাসিমকে এতদিন নানা ভাবে পীড়ন করেছে তারই এই মহত্ত্ব! নাসিম তাকাল সারেঙের দিকে। দেখল দিন রাত করে যে সুয্যি, সারেঙের যেন তার মত চেহারা। 'হাড়ি হাজরা'র (১৯) লালু, ক্ষীণ ও অক্ষম, তার স্ত্রীর অপমানে অন্তত এক-বারের মত গর্জে উঠল, প্রতিবিধানের সংকল্পে উঠল আগুন হয়ে। 'আমার কত্তাবাবার গাঙাড়ি শুনলে পাহাড়ে ফাট ধরত, গর্ভিনীর গর্ভপাত হত—আমরা সেই হাজরার ঝাড়।' বলে বার কতক মুখে 'আবা' দিয়ে বিকট আওয়াজ ছাড়ল লালচাঁদ। বাই ঠুকে লাফ দিয়ে হাতের খেঁটে ঘোরাতে লাগল বনবন করে। 'সূর্যদেব'-এর (৬৯) ঠাকুরদাস অন্ধ হয়েও দেখে এল—কাকে দেখে এল তা কে জানে—সেই দর্শনের আনন্দে সেই মহান হয়ে উঠল। 'কেমন তাঁকে দেখতে বলো না?' রুগ্ন নাতি জিজ্ঞেস করলে। 'ঠিক সূর্যের মত। যেই এসে দাঁড়ান অমনি চারদিক আলো হয়ে ওঠে। ভয়ের দুঃখের বিবাদের লেশমাত্র থাকে না।' 'তুমিও দেখতে পেলে?' 'হ্যাঁ রে, ভারি আশ্চর্য। যে অন্ধ যার চোখ নেই সেও তাঁকে দেখতে পায়।'

আর শোকে মহান সেই পিতা, ব্যারিস্টার রাজেন্দ্রনাথ, যুক্তিনিষ্ঠ যথার্থবুদ্ধি, 'বৈজ্ঞানিক' (২১)। শুধু শোকে মহান নন ক্ষমায় মহান। কিন্তু শোকের উত্তর কোথায়, কোথায় বা ক্ষমার প্রতিধ্বনি? গুডস ট্রেনের 'গার্ডসাহেব' (৯) নিবারণ ট্রেনের ছেঁড়া আধখানা নিয়ে পড়ে রইল একাকী, পড়ে রইল এক পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে, এক অনন্ত শূন্যে। ভয়ঙ্করের মহান নিমন্ত্রণে নিবারণ সহসা তার ক্ষুদ্র লোভ ক্ষুদ্র সঞ্চয় ক্ষুদ্র ভবিষ্যতের বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল পূর্ণিমার চাঁদ লাল হয়ে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে আর পুবে লাল হয়ে জাগছে সুগোল সূর্য। মনে হল কোন এক বিরাট পুরুষ দুই হাতে সোনার খঞ্জনি বাজাচ্ছেন,—জন্মমৃত্যুর খঞ্জনি।

তারপর আছে হাসির গল্প। উকিল হাকিম হয়ে দেখতে পাচ্ছে অন্য প্রান্ত (৭৮), শেষ পর্যন্ত কুকুরের গলায় 'সেকেন্ড মুন্সেফ' প্ল্যাকার্ড ঝোলানো। 'পিক-আপ'-এ (৫০) সভাপতির পলায়ন। 'একটুকু বাসা'য় (৬১) বাসা না পাওয়ার সরকারী প্রহসন। 'ইনি আর উনি'-তে (৯৬) তো তুমুল ব্যাপার—এক মুন্সেফের সঙ্গে এক সার্কেল-অফিসরের ঝগড়া—হাঁটু-ঢাকার সঙ্গে হাঁটু-কাটার—এক সপরিসর সপরিবার ঝগড়া, আর পরিণামে কী রমণীয় মিতালি! 'আর্টিস্ট'-(১৪)ও কি ব্যঙ্গ গল্প? এক ব্যর্থ লেখক নিজের মৃত্যু রটিয়ে দিয়ে কী করে কিছু পয়সা কামাল তারই কাহিনী। 'ফুটনোট'-এর (৪২) আরেক লেখকের কথা, সিনেমায় যার বই হচ্ছে তার নিমন্ত্রণ নেই। 'সারপ্রাইজ ভিজিট'-এ (৭৫) হাকিম অফিসে সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে গিয়ে দেখল তার বদলিতে খুশি হয়ে আমলারা

ফিস্টি লাগিয়েছে। 'কই আমার প্লেট কই?' হাকিম গিয়ে দাঁড়াল মাঝখানে। ত্রাসে ও লজ্জায় আমলারা ছত্রখান হয়ে গেল। হাকিম বদলির অর্ডার রদ করাল, তারপর আরেকবার সারপ্রাইজ ভিজিট দিল আফিসে!

আরো কত দেখেছি, করুণ আর ভীষণ, আর্ত ও প্রসন্ন। গাঁয়ে পাঠশালা নেই, মক্তব-মাদ্রাসা নেই, অশিক্ষিত গরিব চাষীদের বাস, 'মুন্সি' (২০) এসেছে ছেলে পড়াতে। ঠিক সময়ে এসেছে, ধানের সময়। মাইনে যা পারে তো নিয়েইছে, নিয়েছে ধান বোঝাই করে নৌকোয়। খেয়েও গেছে বাড়ি-বাড়ি। সোনাউল্লা 'সনা' পর্যন্ত শিখেছে, ইজ্জত আলি শুধু ই। মুন্সি বললে 'যদি আল্লাতালা বাঁচায় সামনের বছর আপনাগো খেদমতে দাখিল অমু। পোলাপানগুলো না সোমস্ত বুলিয়া যায়।' দেখেছি 'মেথর-ধাঙড়' (৮) কী করে ভেতো মদে ডুবে থাকে, শুয়োরের মাংস শুনলে লাফিয়ে ওঠে হা-রা-রা-রা-রা। কী ভাবে ট্যাক্সো-দারোগা ধনপত তাদের শোষণ করে। বাইরে থেকে কেউ ভালো করতে চাইলেও গা করে না। কাড়ে তো ধনপত, ছাড়ে তো ধনপত, আঁচায়-বাঁচায় ধনপত। 'ধান' গল্পে (১৬) দেখেছি মজুত ধান লুট করতে এসেছে গ্রামবাসীরা, কিন্তু দেখা গেল এরা লড়িয়ে হয়ে আসেনি, এসেছে মুটে মজুর হয়ে। এসেসরবাবু যে সরকারী এক্তেলায় ধান ধরতে এসেছেন এরা তাঁরই দালাল। কোথায় লাল হয়ে আসবে, না, দালাল হয়ে এসেছে। 'জাত-বেজাত' (৩৯) তো পটুয়াখালির গল্প। বিল্লাতালি বলছে বিলাসকে, 'সংসারে ঐ দুই জাতই আছে। তা হিন্দু-মুসলমান নয়। তা গরিব আর বড়লোক। খাতক আর মহাজন। প্রজা আর মুনিব। দুর্বল আর জোরদার। মুই বুজছি এত দিনে। এক জাত যে খায় আরেক জাত যে খাওয়ায়। কও তুমি, ঠিক কই না? একজাত মোরা, আরেক জাত হ্যারা। বোঝলানা কাগো কতা কই?'

'খেলাওয়ালী' (৯০) নদীর জলের বাসিন্দে গান-গাওয়া বেবাজিয়া বাদিয়ানীদের গল্প। 'কই গো চাচীজান ভাবীজানরা, আমরা ব্যামো পীড়া সারাই, বিষ নামাই, ভূত ঝাড়ি ফকিরালি করি। নে আগে গান ধর।' এদের আনন্দকাকলীর নিচেও রয়েছে কান্নার ইতিহাস। কোর্টের ডিক্রিজারিতে ঘর-বাড়িতে কী করে উচ্ছেদ হয় তারই গল্প বেদখল (২)। ইমানদ্দি কিছুতেই ছাড়বেনা তার ভিটে, নখে-দাঁতে লড়বে, কোর্টের লোকদের ঘেঁসতে দেবে না। বুকের পাঁজর কখানা ছেড়ে দেওয়া কি যে-সে কথা? কিন্তু ইমানদ্দি কি জানে তার ভাই ফকিরদ্দিই নিলামী জমায় নতুন বন্দোবস্ত নিয়েছে, সেই লুকিয়ে জিনিস সরাচ্ছে, চাল বেড়া ভাঙছে? কী করে জানবে? সে তো শুধু চেঁচামেচি আর গালাগাল করতেই ব্যস্ত। 'মুচি-বায়েন'-এ (৮২) ভোলানাথ ময়ূরপুরের তারাপদের কাছে ঢোলের বাজনায় হেরে গেছে। সে যে কী দন্ধানি বউ গোরাশশী কী বুঝবে? তাই ভোলানাথ তারাপদকে বাড়ি নিয়ে এলে গোরাশশী নিরিবিলি তারাপদের ঘরে গেল। 'শুন, তুর জবালাতেই আমাদের সব যেতে বসেছে। ঘরে সুখ নাই মনে সুখ নাই। ক্যাবল ওজকারে কী হয় যদি নাম না হয় ভোমণ্ডলে? কথা দে, যদি পিতের পুত্র হোস এ মুলুক ছেড়ে চলে যাবি নিবুদ্দেদ হয়ে।' তারাপদ গোরাশশীকে টাকা দিতে চেয়েছিল গোরাশশী সেই ওজুহাতে তারাপদকে

তাড়িয়ে দিল। কিন্তু ভোলানাথ যে তারাপদকে নিয়ে এসেছে খোরপোষ দেবে বলে যাতে সে আর ঢোলের বাজনায় তার পাল্লাদার না হয় তা গোরাশশী কী করে জানবে? ভোলানাথ গোরাশশীকে পিটতে লাগল; হা টে শালি, আমার নাম বড়, না, তুর নাম বড়? 'গঙ্গাযাত্রা'-ও (৯৭) কান্দীর গল্প। মড়া গঙ্গায় দিয়ে আসা নিয়ে দুই দলে মারামারি। দুই দলে অনায়াসে ভাব হয়ে টাকা ভাগাভাগি হয়ে যেতে পারে যদি মড়াটাকে কষ্ট করে গঙ্গায় না টেনে নিয়ে এইখানে মাটির নিচেই পুঁতে দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাবে কোন দল? তা নিয়ে আবার কি মারামারি লেগে যাবে না? সে কলহ মিটবে কী দিয়ে?

'বৃত্তশেষ'-এ (৫৯) দেখা গেল শেষ পর্যন্ত সেই সাধারণ মানুষই সর্বশক্তিমান। ক্ষেত্র দুয়ারীর উপর তম্বি করতে এল কোর্টের পিওন মনোরথ, অস্থাবর ক্রোকের পরোয়ানা নিয়ে। মনোরথের উপর তম্বি করল কোর্টের নাজির অতুল। অতুলের উপর প্রভুত্ব খাটাল মুন্সেফ। মুন্সেফের উপর জজ। জজের উপর মন্ত্রী। মন্ত্রী আগে উকিল ছিল, নাম ভূতনাথ। মন্ত্রী আবার দ্বিতীয় টার্মে বহাল থাকবার জন্যে ভোটের জন্যে প্রার্থী হয়ে এল ক্ষেত্র দুয়ারীর দুয়ারে। 'এবার ভোট কিন্তু আমাকে দিতে হবে ক্ষেত্তর।' ভূতনাথ ক্ষেত্রর ঘেমো পিঠে হাত রেখে আদর করল। বৃত্ত শেষ হল। ফিরে এল সেই প্রথম বিন্দু, ক্ষেত্তরে। ক্ষেত্রনাথ মনে করল সেই শক্তিধর মহীধর। 'দস্তখৎ'-এ (৫৩) গ্রামে ইস্কুল করা নিয়ে দুই পাড়ায় মারমারি—ভদ্রপাড়া আর চাষা পাড়া। কে জেতে এবং কেন জেতে, তারই করুণ কাহিনী।

স্বামীর প্রতি মমতায় যূথিকা স্বামীর সামান্য ব্যভিচারে সাহায্য করছে তারই গল্প 'জানলা'। কিন্তু 'কলঙ্ক'-এ (৯৪) ডিভোর্স করা স্বামী স্ত্রীর ঘরে, ব্যভিচারের অভিসন্ধিতে এলে স্ত্রী তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে : না, তুমি যাও, তোমার টাকা কটাই শুধু আসুক।' আর যাই হোক, সে তার প্রাক্তন স্বামীর হাতে কলঙ্কিত হয়ে মাসোহারা খোয়াতে রাজি নয়।

'দ্বিতীয় জীবন'-এ অন্তহীন জীবনের ইশারা। নরহরির সঙ্গে তিন দিন পরে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হচ্ছে হিমানীর। দুজনে এক সঙ্গে বেরিয়ে সন্ধের দিকে এক দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে পড়ে হঠাৎ ঢুকে পড়ল একটা অসমাপ্ত বাড়ির অন্ধকারে। ঢুকেই দেখল সঙ্গের লোকটা নরহরি নয়, আরেকজন। তারই সঙ্গে সেই বাড়িতে রাত কাটাতে বাধ্য হল হিমানী। কারো কোনো পরিচয় নেবারও সুযোগ হল না। সকালে উঠে হিমানীর মনে হল তার রহস্যময় দ্বিতীয় জীবনের শেষ হতে আর মোটে তিনদিন বাকি। নরহরির সঙ্গে বিয়ে হতেই তো প্রথম জীবন সুরু হবে।

'অদৃশ্য নাটক' (৯৫) ফাঁসির আসামীর গল্প। আসামী জাগছে মৃত্যু দেখতে আর ম্যাজিস্ট্রেট জাগছে হত্যা দেখতে। আসামীর যন্ত্রণা লাঘব করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই আসামীর ফাঁসি দেওয়া হল। হোক দয়া, কিন্তু তুমি ম্যাজিস্ট্রেট, তুমি দয়া করবার কে? আসামীর জীবন থেকে পাঁচ মিনিট কেড়ে নেবার তোমার কী অধিকার? তুমি কি ঐ পাঁচ মিনিট জীবনের হত্যাকারী নও তোমার শাস্তি কোথায়? 'একটি আত্মহত্যা'-য় (৮৯) পাষন্ড জজই তো মৃন্ময়ীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী, আর

সতী সাধ্বী মৃন্ময়ী লিখে গেছে চিঠিতে—আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয় তারই উপর ধর্মাবতার গম্ভীর টিপ্পনী ঝাড়ছে; 'কত ডায়িং ডিক্লেরেশন দেখলাম। মৃত্যুর কাছাকাছি হয়ে মানুষ কেমন সত্য কথা বলে। কেমন হঠাৎ মহৎ হয়।' আর সমস্ত মহৎ দৃশ্যই নীরব। পাহাড় নীরব, আকাশ নীরব, সমুদ্রও নীরব। কিন্তু 'জ্যাম'-এ (৮৩) রিটায়ার্ড জজ যে নিরবকাশ নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকা পড়ে বসে আছে সে দৃশ্যও কি সমান মহৎ নয়? আকাশের দিকে তাকাও। সেখানে কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে চলেছে ডাইনে-বাঁয়ে উজানে-ভাঁটিতে, কখনো জ্যাম হচ্ছে না।

অচিন্ত্যকুমার

এই লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

অকাল বসন্ত, অখন্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (৩ খন্ড), অধিবাস, অনন্যা, অনিমিত্তা, অন্তরঙ্গ, অমাবস্যা, আকস্মিক, আকাশ প্রদীপ, আগে কহ আর, আজন্ম সুরভি, আধুনিক সোভিয়েট গল্প, আসমান জমিন, আসমুদ্র, ইতি, ইনি আর উনি, ইন্দ্রাণী, উঁচুনীচু, ঊর্ণনাভ, এক অঙ্গে এত রূপ, একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী, একরাত্রি, একেই বলে প্রেম, কল্লোলযুগ, কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, কাকজ্যোৎস্না, কাঠ খড় কেরাসিন, কালোরক্ত, কোর্ট-কাচারি, গরীয়সী গৌরী, গৃহদীপ্তি, গোপন পত্র, ঘোরপ্যাঁচ, চাষাভূষা, ছিনিমিনি, জননী জন্মভূমিশ্চ, ঝড়ের যাত্রী, টুটাফুটা, ডবলডেকার, ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস, ডাকাতের হাতে, ঢলঢল কাঁচা, ঢেউয়ের পর ঢেউ, তুমি আর আমি, তৃতীয় নয়ন, দময়ন্তীর শাড়ি, দিগন্ত, দুই পাখি এক নীড়, দুই ভাই, দেশের ছেলে, নতুন তারা, নবনীতা, নয়নে নয়ন, নায়ক-নায়িকা, নীল আকাশ, নেপথ্য, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (৪ খন্ড) পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি, পলায়ন, পাখনা, প্যান, প্রচ্ছদপট, প্রজাপতয়ে, প্রথম কদম ফুল, প্রথম প্রেম, প্রাচীর ও প্রান্তর, প্রিয়া ও পৃথিবী, বরবর্ণিনী, বিবাহের চেয়ে বড়, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (২ খন্ড), বেদে, ভক্ত বিবেকানন্দ, মগের মুলুক, মুক্তদ্বার, মুখোমুখি, মৃগ নেই মৃগয়া, মেমসাহেব, যতন বিবি, যায় যদি যাক, যে যাই বলুক, রতি ও আরতি, রত্নাকর গিরিশচন্দ্র, রাঙাধুলো, রুদ্রের আবির্ভাব, রূপসীরাত্রি, শেষ গ্রীষ্ম, সংকেতময়ী, সবুজ নিশান, সাপ খেলাবার বাঁশি, সারেঙ, স্বাদু স্বাদু পদে পদে, হাড়ি মুচি ডোম, হিয়ে হিয় রাখনু, হুইসল।

গল্পের বর্ণানুক্রমিক সূচী

কাজী নজরুল ইসলাম
বন্ধুবরেষু

১। ছুরি

আমি যে কেন এখনো বিয়ে করি নি তার একটা খুব সহজ কারণ আছে। কারণ আর কিছুই নয়, যতোই আয়ু যাচ্ছে পিছিয়ে, মেয়েরা ততোই যাচ্ছে এগিয়ে। আর আমি উদ্যততম মুহূর্তে অগ্রসরতম মেয়ে চাই।

কাজে-কাজেই ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীতে বিয়েটা ঘটে' ওঠেনি। সমস্ত কুমারীত্বের উপর একাধিপত্য করছি এমনি একটা গর্বে মনে-মনে বিস্ফারিত ছিলুম। মানে যে-কাউকে যে-কোনো মুহূর্তে বিয়ে করতে পারি এই যে একটা দিগন্তবিস্তৃত সুখ এটা পুরাকালের বহুপত্নিত্বের চেয়েও রোমাঞ্চকর।

এই পর্যন্ত যতো জায়গায় বদলি হ'য়ে গেছি, কতো যে মেয়ে দেখে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বলা বাহুল্য, আমার চাকরিটা মেয়ে দেখে বেড়ানোর পক্ষে ভারি অনুকূল ছিলো। আর সেটা এমন চাকরি, যেখানে আমার মতটাই প্রথম ও আমার মতটাই শেষ। তাই যেখানে পা দিয়েছি সেখানেই কন্যা-কণ্টকিত বাপের দল অনর্গল আমার দ্বারস্থ হয়েছেন। তাই বহু মেয়েই আমাকে দেখতে হয়েছে। এবং আশ্চর্য, সবাইকেই আমি অকায়ক্লেশে একে-একে পছন্দ করে' এসেছি।

প্রশস্ত রাস্তাটা যদি আমার মনঃপূত না হয় সেই জন্যে অনেক মেয়ে অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পথে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চেয়েছে। অবশ্যি তাদের মায়ের মত নিয়ে। কিন্তু নির্ভুল বিয়েই যখন করবো তখন কাকে ভালোবাসলুম কি বাসলুম না, কবিত্ব করলুম কি করলুম না, বিপদ ঘটালুম কি ঘটালুম না, কিছুতেই কিছু যায় আসে না। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, বিয়ে যেই করলুম অমনি বিস্তীর্ণ পৃথিবী একটা তক্তপোষ হ'য়ে উঠলো আর প্রকান্ড আকাশটা হ'য়ে দাঁড়ালো একটা মশারি।

এই চমৎকার আছি—আমি আর আমার সাইকেল।

কিন্তু বিধাতার চক্রান্তে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম, যেখানে পাট-শাক আর তামাক-পাতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। মাথার উপর আকাশ নেই তা আমি বরং কল্পনা করতে পারতুম, কিন্তু দিন-রাত্রে ঘুণাক্ষরেও একটি তরুণীর দেহ-রেখা দেখতে পাবো না এ একেবারে দুঃসহ দুর্দিনেও ধারণার অতীত ছিলো। জায়গাটা এমন বিশ্ববহির্ভূত যে মাইনর-ইস্কুলের উপর মেয়েদের এখানে ক্লাশ নেই। এমন একটা কোনো হল্লা বা হুজুগ নেই যে শাড়ির দুটো চঞ্চল খসখসানি অন্তত শোনা যায়। স্টেশনে যেতে হ'লে ঘোড়ার গাড়িটা এদের কাঠের একটা সিন্দুক হ'য়ে ওঠে। কারু বাড়ি থেকে কারু বাড়িতে বেড়াতে যাবার যে এদের রাস্তা সে আর-কারুরই

বাড়ির ভিতর দিয়ে। এখানে এখনো এমন একটা ঝড় উঠলো না যে মেয়েরা ত্রস্ত হ'য়ে দ্রুত হাতে ঘরের জানালাগুলো বা বন্ধ করে' দেবে। এখানকার অফিসারগুলোও এমন প্রাদেশিক, সস্ত্রীক বেড়াতে বেরুবার পর্যন্ত কারু সাহস নেই। রোদ্দুরে হলদে-হ'য়ে-যাওয়া শুকনো মাঠের উপর দিয়ে কেবল সাইকেল চালিয়ে চলেছি।

এমন যে মহিমাময় সূর্যোদয়, জীবনে তা কখনো দেখিনি, তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে' মনে হয় নি। কিন্তু আজ তিন মাস এই মহকুমায় এসেছি, সাইকেলে করে' কত চক্র আবর্ত্তন করলুম, কিন্তু ঘাটে, জানলায় বা উঠানে এমন একটি মেয়ে দেখলুম না যাকে ক্ষণকালের জন্যেও তার ইহজন্মের ঘোরতর দুর্ভাগ্যের কথাটা মনে করিয়ে দিতে পারি। কেননা এমন মেয়ে দেখতেই আমার ভালো লাগবে যে সঙ্গোপনে একবার ভাববে, অন্তত আমি ভাববো সে ভাবছে, এর যদি মিসেস হ'তে পারতাম— এবং তখুনিই সচেতন হ'য়ে ,ভাববে, অন্তত আমি বুঝবো সে ভাবছে, এখনো তো তার সময় যায়নি! আমি যে হ'বো না, কিন্তু আমি যে হ'তে পারি—এই দর্পণের ভিতর দিয়ে একটি সাধারণ মেয়েকেও আমি আজ অপরূপ সুন্দর করে' দেখতে পারতুম, কিন্তু মুখোমুখি না হ'লে সেই বা ভাববে কী, আর আমিই বা বুঝবো কী!

লাল-ফিতে-বাঁধা ফাইলগুলো অনিদ্রাক্রান্ত রাত্রির কদর্য্য ক্লেদের মতো অসহ্য হ'য়ে উঠলো, বৈকালিক ক্লাবটা একটা পিঞ্জরাবদ্ধ চিড়িয়াখানা, সাই-কেল-ঘূর্ণিত রাস্তাগুলি একটা ক্রমান্বিত কর্ত্তব্য। এমন যে এখানে প্রসারিত প্রকৃতি, নীলে আর শ্যামলে, তাতে পর্যন্ত এতটুকু প্রাণ নেই। কেননা, আমি ভেবে দেখেছি, অনুচ্চারিত মনে কোনো রমণীর স্মৃতির সুষমা না থাকলে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ সম্ভোগ করা যায় না, সে নিতান্তই তখন একটা মানচিত্র হ'য়ে ওঠে।

এমনি যখন কচুরিপানাধ্বংস ও পাটচাষনিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঘোরতর ব্যাপৃত আছি, হঠাৎ একটা অসম্ভব কাণ্ড ঘটে' গেলো। হ্যাঁ, সেটাকে ঘটনাই বলতে হয়। অবাক হ'য়ে ভাবলুম, এ আমি এতদিন ছিলুম কোথায়!

রেলোয়ে স্টেশনটা শহর থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। বসতিবিরল ক্ষেতের উপর দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সুরকির রাস্তাটা স্টেশন ছুঁয়ে লোকাল-বোর্ডের কাঁচা রাস্তা হ'য়ে গ্রামের মধ্যে চলে' গেছে। সেই সন্ধি-স্থলের কাছাকাছি ছোট একটা মুদি-দোকান। দোকানটা এর আগে কোনো-দিন আমার চোখে পড়েছে কিনা মনে করতে পারলুম না, যদিও টুর শেষ করে' বহুদিন এরই পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরেছি। আজ হঠাৎ সেই দোকানটা চৌরঙ্গির শো-কেসের চেয়েও জাঁকালো মনে হ'লো।

নিচু দোচালায় বাঁশের মাচা বেঁধে এই দোকান—ভিতরের দিকে দরজা দেখে বোঝা যায় অন্তরালে দোকানির অন্তঃপুর আছে। মাচার উপরে

কতকগুলি মাটির গামলায় নানারকমের ডাল, নুন, শুকনো লঙ্কা, আদা-হলুদ থেকে এলাচ সুপারি, জাপানি কিছু খেলনা, গৃহস্থালীর টুকিটাকি জিনিস, গ্রাম্য প্রসাধনের সস্তা সাজ-সরঞ্জাম। দোকানের লাগোয়া খানিকটা জমিতে ঘোড়ার একটা আস্তাবল, সন্ধের ট্রেনের সময় হ'য়ে এসেছে বলে' কোচোয়ান গাড়ি জুতছে।

দোকানের ভিড় দেখে হিসেব করে' দেখলুম আজ হাট-বার। পসারিরা শহরের বাজারে কেনা-বেচা করে' বাড়ি ফেরবার মুখে এখান থেকে কেউ রানি-মার্কা তেল, কেউ বা কড়াইয়ের ডাল কেউ বা এটা-সেটা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এত সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে না দেখে আমার উপায় ছিল না, যদিও দৃশ্যত সেখানে আমি নেমে পড়েছিলুম কাউকে দিয়ে একটা দিয়েশলাই কেনাবার জন্যে।

'এই ছোঁড়া, শোন্।' রাস্তায় একটা ছোকরাকে ডাকলুম।

আমার ডাক শুনে গ্রামিক ক্রেতার দল ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। নিরুপায় স্তব্ধ হ'য়ে গিয়ে এ ওর গা-টেপাটেপি করে' নিম্ন ভীত কণ্ঠে বলাবলি করতে লাগলো : 'সাহেব, বড়ো সাহেব।'

বড়ো ভালো লাগে নির্ব্বোধ জনতার এই সভক্তি ভীতি দেখে। কিন্তু মাচার উপর বসে' কালো ফিতেয় কেশমূল দৃঢ় আবদ্ধ করে' যে মেয়েটি আনত আয়নার উপর ঝুঁকে পড়ে' ক্ষিপ্র আঙুলে বেণী বাঁধছে, তার ভঙ্গিতে এতটুকু একটু ত্বরা বা কুণ্ঠা এলো না। শুধু কটাক্ষকুটিল কালো দু'টি আয়ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আবার কেশরচনায় মনোনিবেশ করলে।

ছোকরাটা কাছে এলে তার হাতে একটা পয়সা দিলুম। বললুম, 'একটা দেশলাই নিয়ে আয় তো।' বলে' কেস থেকে একটা সিগরেট বের করে' বুড়ো আঙুলের নখের উপর ঠুকতে লাগলুম।

মেয়েটি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হ'য়ে, মুখ না তুলে, তেমনি অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছোকরাকে বললে, 'এ দুকানে দিশালাই নেই।'

ছেলেটা পয়সা ফিরিয়ে দিলো।

হঠাৎ মনে হ'লো, সাইকেলের শেকল বা ব্রেক কোথায় যেন কী বিগড়েছে। তাই এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে' ওটাকে মিথ্যে সজুত করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। দেখলুম এর মধ্যে মেয়েটি একবারো আয়নার থেকে চোখ তুললো না, অমনি নির্লিপ্ত বসে'-বসে' হালকা হাসির ফোড়ন দিয়ে কারু-কারু সঙ্গে পরোক্ষে ফষ্টি-নষ্টি করছে। শুনলুম স্পষ্ট শুনতে পেলুম, কোচোয়ানকে সম্বোধন করে' ও বললে, 'এই জামাল, সাহেবের কল খারাপ হ'য়ে গেছে, গাড়ি করে' কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে আয় না।' বলে'ই দীর্ঘপক্ষ্মজাল তুলে ও আমার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিক্ষেপ করলো।

এর পর আর সাইকেল করে' ফেরা যায় না। তাই গম্ভীর মুখে

কোচোয়ানকে উদ্দেশ করে' বললুম, 'এই লাও গাড়ি।'

হুকুম শুনে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। সাইকেলটা নিজেই ছাদে তুলে দিলুম। গাড়িতে গিয়ে বসতেই সিগরেট ধরালুম। নিজের চার পাশে একটু নিভৃতি খুঁজে পেয়ে সন্তর্পণে তাকালুম মেয়েটি যদি একবার দেখে। কিন্তু তার অবজ্ঞাটা চমৎকার।

সেদিন কী ভাগ্যিস, ক্লাবে যেতে হ'লো না, আটটার আগেই ডিনার খেয়ে বাইরে লনে, ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লুম। দুই চোখ ভরে' একসঙ্গে কত যে তারা দেখলুম, কত যে আশা আর ব্যর্থতা, তার ইয়ত্তা নেই। ভাবলুম, এ কী করে' সম্ভব হ'তে পারে।

মেয়েটি হিন্দুস্থানি, বয়েস আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে। গায়ে পীড়াদায়ক আঁট একটা কাঁচুলি, সাদার উপরে কালোর ছাপ-তোলা ফুরফুরে পাতলা একটা শাড়ি পরনে। রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডের থেকে শুরু করে' রৌদ্রঝলকিত নিষ্কাশিত তলোয়ারের সঙ্গে নারীদেহের বহু উপমা দেখেছি, কিন্তু ওর সেই ছন্দোবন্ধ ভঙ্গিময় শরীর কথায় বোঝাতে পারি এমন কথা মানুষের ভাষায় তৈরি হয় নি। ওর সমস্ত অসাধারণত্ব ছিলো ওর দুই চোখে—সে কী আশ্চর্য চোখ—যেন গায়ের চামড়া ভেদ করে' হাড় পর্যন্ত এসে বিদ্ধ করে। সেই চোখে এতটুকু সুকোমল মোহ নেই, যেন বা কঠিন নিষ্ঠুর একটা বিদ্রূপ। যার দিকে তাকায় তাকেই যেন সে চোখ শাণিত সঙ্কেত করে : ধরা পড়ে গেছ।

তারপর আরো দু'তিন দিন নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে দোকানের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে এটা-ওটা ফরমাজ করতে হয়েছে, কিন্তু ততোবারই মেয়েটি অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততায় গম্ভীর খবর পাঠিয়েছে—এ দোকানে তা পাওয়া যাবে না।

দোকানের ধারে ছোট পঙ্কিল একটা ডোবা ছিলো। সেদিন সর্টস পরে' হাণ্টার হাতে নিয়ে অনাবশ্যক প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলুম। দেখি, মেয়েটি একটা গুঁড়ির উপর বসে' এক পাঁজা বাসি বাসন মাজছে। আস্কন্ধ অনাবৃত দুই বাহু, মাথার ঘোমটাটা পিঠের উপর বিশৃঙ্খল, সমস্ত ভঙ্গিটা কেমন যেন অসহায়।

আমাকে দেখতে পেয়ে উচ্চ কলহাস্যে ও ডেকে উঠলো : 'ও লখ্‌না রে।'

ছ-সাত বছরের একটা ছেলে কোত্থেকে এলো ছুটে। তাকে চাপা গলায় কি-একটা ইসারা করতেই দুই হাতে মেয়েটির মাথায় সে পিঠের আঁচলটা অগোছাল করে' তুলে দিলো। বাহু দিয়ে টেনে টেনে সেটাকে সুসঙ্গত করে' মেয়েটি তার বসায় একটা কাঠিন্য আনলে। ছেলেটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে উদ্ধত প্রহরীর মতো। মনে-মনে প্রচণ্ড একটা মার খেলুম।

অথচ তার সাধারণ যা হাব-ভাব তাতে তার এই কঠিন গাম্ভীর্যের কোথাও কোনো সমর্থন পাওয়া যেতো না। তাকে যখন প্রথম দেখেছি,

দেখেছি তরল হাসির ঢেউয়ে উছলে পিছলে পড়ছে, এর-ওর সঙ্গে হাল্কা চটুলতায় মুখর হ'য়ে উঠছে, ওর বসা ও দাঁড়ানো, ভেতরে চলে' যাওয়া ও দোকানে মাচার উপরে উঠে বসা ছোটখাটো সমস্ত ভঙ্গিতেই এমন একটা চাপল্য ছিলো যেটা সাদা চোখে ঠিক সুচারুসঙ্গত মনে হবার মতো হয়তো নয়, অথচ আমাকে দেখেই কিনা সে গাম্ভীর্যে নিটোল বা বিদ্রূপে ধারালো হ'য়ে ওঠে। হ'তে পারে, আমাকে সে ভয় করে; কিন্তু তার দোকান থেকে অপ্রাপ্য জিনিস কেনবার অনাবশ্যক ব্যস্ততা দেখে আমাকে আর তার ভয় করা উচিত ছিলো না। এবং আমি যে কত বড়ো অনুগ্রাহক এ-কথা তার অজানা নেই। সার্কেল-ইনস্পেক্টারকে গোপনে ডেকে জিগগেস করলেই ওর এই দোকান সম্বন্ধে অনেক রোমহর্ষক ইতিহাস হয়তো শোনা যায়; অন্তত কতবার ও-দোকান সার্চ হয়েছে এবং কত রাতে ওখানে 'বি-এল' কেস-এর গোড়াপত্তন হয়েছে। এ-দোকান যে কিসের দোকান তা বুঝতে সামান্যতম কৌতূহলেরও হয়তো অবকাশ ছিলো না। দোকানের এই পরিবেশ, মেয়েটির এই সাজ-গোজ, ছলা-কলা, চাল-চলতি, সব চেয়ে তার এই অদ্ভুত একাকীত্ব—সব কিছুতেই সে অতিমাত্রায় স্পষ্ট ও উদ্ঘাটিত। বলতে গেলে, এ-জানাটাই কিন্তু আমাকে সব চেয়ে বেশি বিঁধছে! অথচ তার দুই চোখের সেই অদৃশ্য রহস্যের সঙ্গে তার এই বিলসিত দেহসজ্জার কোনো সঙ্গতি পেতুম না। মনে হতো কোথাও একটা মস্ত বড়ো ভুল করে' বসেছি।

ভাবলুম, দূত পাঠাই। নির্জ্জন রাতে অন্ধকার বাঙলোয় ব'সে তাকে অভিসারিণী ক'রে তুলি। কিন্তু পাঠাই কাকে? যে আজ আমার অনুচর, আমি বদলি হয়ে গেলে সে-ই আবার আমার গুপ্তচর হ'য়ে উঠবে, অতএব কাউকে বিশ্বাস নেই। আমরা সব হারাতে পারি, খ্যাতি হারাতে পারিনে। কোনো ক্ষতিই ক্ষতি নয়, যদি খ্যাতি থাকে অব্যাহত। আর, এই খ্যাতি হচ্ছে আমাদের কাঁটার মুকুট। যতো সে শোভা ততো সে প্রতিবন্ধক।

অর্ডারলিকে বললুম, 'পায়ের রগে কেমন-একটা ব্যথা হয়েছে, সাইক্লে যেতে পারবো না। একটা গাড়ি চাই।'

অর্ডারলি জিগগেস করলে : 'ইস্টিশান?'

'না, চালনায় যাবো। মাইল আষ্টেকের পথ। ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা রাস্তা আছে।'

'নিয়ে আসি।'

'আর, শোনো।' তাকে বাধা দিলুম : 'জামালের গাড়িতে নতুন রং করেছে, নতুন টায়ার বসিয়েছে চাকায়। ওটা আনতে পারবে না?'

'পারবো।'

অর্ডারলি জামালের গাড়িই হাজির করলে। একটা পোর্টফোলিও নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে কাউকে নিলুম না।

জামালকে যদি ভিতরে বসিয়ে গল্প করি তবে গাড়ি চলে না, অতএব শহরের সীমানা পেরিয়ে যেতে আমিই কোচবাক্সে উঠে বসলুম। খুব একটা মজা হচ্ছে এমনি একখানা ছেলেমানসি ভাব দেখিয়ে লাগামটা তুলে নিলুম। জামাল পাশে বসে' পরম আপ্যায়িত বোধ করতে লাগলো।

জিগগেস করলুম, 'গাড়িটা বুঝি তোমার?'

জামাল কুন্ঠিত হ'য়ে বললে, 'আমার নয়। গৌরীয়ার গাড়ি।'

'কে গৌরীয়া? ঐ যার মুদি-দোকান?'

'হুঁ। আমি ঠিকে খাটি। মাইনে পাই। পনেরো টাকা মাইনে।'

'বটে! ওর তো তা হ'লে অনেক পয়সা!'

'তা হয়েছে অল্প-বিস্তর। আগে ছাগলের দুধ বেচতো, কিছু-দিন ইস্টিশানে ঝাড়াপোঁছারো নাকি কাজ করেছে।'

জিগগেস করলুম: 'ওর বাড়ি কোথায়?'

'ফয়জাবাদ না মজঃফরপুরে।'

'এখানে এসেছে কেন?'

'স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে।'

'বলো কি, ওর বিয়ে হয়েছিলো নাকি?'

'আজ দু' বছর। স্বামী ওকে একদিন নাকি খুব মেরেছিলো উনুনে রান্না বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে'। তাই সে রাগ করে' পালিয়ে এসেছে।'

'আর ফিরে যাবে না?'

'তা একবার দেখুন না বলে। মারতে আসবে।'

'ঠিকই তো। কেনই বা ফিরে যাবে বলো, যখন এখানে ওর কোনো দুঃখ নেই।' ঘোড়ার পিঠে টেনে একটা চাবুক কসলুম, বললুম, 'কিন্তু ওর স্বামী ওকে নিতে আসে না?'

'পাছে সে আসে সেই জন্যে বালিসের তলায় ও প্রকাণ্ড একটা ছুরি নিয়ে শোয়।'

একটু ভয় পেলুম বোধ হয়। বললুম, 'অন্যের বেলায় সে-ছুরি বুঝি তার চোখের তারায় ঝিল্‌কিয়ে ওঠে।'

কথাটা আস্বাদ করবার মতো জামালের ততো সূক্ষ্মতা ছিলো না। তাই ফের বললুম, 'ভেতরে তো ছোট্ট একটুখানি খোপরি, ঐখানে তোমাদের জায়গা হয় কি করে'?'

'কী সর্বনাশ', জামাল সর্বাঙ্গে শিউরে উঠলো: 'আমি থাকবো ও-ঘরে? বলেন কি, বাবুসাব, আমি যে ওর চাকর, মাইনে খাই।'

অনুভব করলুম যুবক জামালের বলদৃপ্ত কঠিন শরীর যেন মুহূর্তে সঙ্কুচিত, পাংশু হ'য়ে উঠলো।

'তবে ওখানে থাকে কে?'

'ওর দেশের বুড়ো এক ঝি আর ওর ঐ ছুরি।'

'আর কেউ না?'

'আমি তো কখনো দেখি নি।' বলে' জামাল আমার হাত থেকে লাগাম তুলে নিলো। আমি পরাভূতের মতো গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলুম।

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতেই ঘোরতর মেঘ করে' এলো। কলেজ ছাড়বার পর সেই প্রথম সেদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরলুম। অমাবস্যা বলতে যেমন অন্ধকার, আমাকে বলতেও তেমনি হ্যাট-কোট বোঝাতো। চিতেবাঘ যদি তার দাগগুলো মুছে ফেলে, সে একটা শেয়াল হ'য়ে ওঠে, আমিও তেমনি টাই-ট্রাউজার্স ফেলে মফস্বলে শ্বশুরবাড়ি-করতে-আসা শহরের ফলবাবুটি হ'য়ে উঠলুম। নিজেকে চিনতে নিজেরই অত্যন্ত দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, অন্যে পরে কা কথা!

ঈশ্বর সদয় ছিলেন, তাই তখুনিই বৃষ্টি নামলো যখন প্রায় দোকানটার কাছে এসে পড়েছি। বৃষ্টির থেকে ক্ষণিক পরিত্রাণ পাবার জন্যেই যেন আশ্রয়ের বাছ-বিচার না করে' দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

দেখলুম, আগেই দেখেছিলুম, ঝোলানো লন্ঠনের আলোতে গৌরীয়া মাচার উপরে পা টান করে' বসে' সুর করে' কি পড়ছে। বুড়ো-মতন কে-একটা স্ত্রীলোক, বোধহয় ওর দেশের সেই ঝি হ'বে, মাটিতে বসে' তাই শুনছে গদগদ হ'য়ে।

আমাকে দেখে গৌরীয়া থামলো, কিন্তু, আশ্চর্য্য, একটুও চমৎকৃত হলো না। ঝি-কে শুধু বললে, 'মাচার তলা থেকে মোড়াটা বার করে' দে।'

মোড়া বার করে' দিলো। ছাতাটা মাচার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে ওয়া-টার-প্রুফটা কোলে নিয়ে বসলুম। কিন্তু কী বলি ওকে? আমাকে দেখে কোথায় ও অভ্যর্থনায় অজস্র হ'য়ে উঠবে, তার বদলে এমন একখানা মুখ করে' আছে যেন আমি মধু-উৎসবে উদ্যত একটা মৃত্যুদণ্ডের মতো এসে বসেছি। কোথায় বা তার সেই ছলনা, কোথায় বা তার সেই ছুরি!

ঝি-কে ও ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'তুই ভেতরে যা, বাবুর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

নামের আগে বা পিছে বাবু-শব্দটা যে মোটেই পছন্দ করি না বাঙলা-ভাষানভিজ্ঞ গৌরীয়ার তা জানবার কথা নয়, তবু মনে হ'লো ও-কথাটার মধ্যে ও যেন ইচ্ছে করেই একটু অবজ্ঞা মিশিয়েছে। তবু বৃষ্টিমুখর মুহূর্তে ক্ষণিক একটু নিভৃতির সূচনা হ'ল মনে করে' খুসি হলুম।

কিন্তু গৌরীয়ার কথা গৌরীয়াই জানে। রাস্তার দু'পাশের নালাগুলি জলে ভরতি হ'য়ে গেলো। গৌরীয়া একমনে রামায়ণের পৃষ্ঠা উলটোচ্ছে।

শেষকালে আমিই কথা কইলুম। বললুম, 'সত্যি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বলবো?'

আনত চোখে কঠিন গলায় গৌরীয়া বললে, 'যদি অন্যায় না হয়, বলুন।'

না, সে কি কথা, অন্যায় আবার কী বলতে পারি আমি, তাই শুকনো একটা ঢোঁক গিলে বললুম, 'এত রাতে, এখনো তোমার দোকান খুলে রেখেছ যে?'

ও চোখ তুলে একটু হাসলো। বললে, 'খোলা না রাখলে বৃষ্টিতে ভিজে লোক এসে দাঁড়াবে কোথায়?'

কথাটা ঠিক আমাকেই নিক্ষেপ করেছে দেখলুম।

ঠিক সেই সময়টাতে কে-একজন বৃষ্টিতে গান ভাঁজতে-ভাঁজতে দোকানে এসে দাঁড়ালো। দোকানে ঢুকে সেই গানটা সাড়ম্বর নৃত্যের ভঙ্গিতে রূপান্তরিত হ'তে যাচ্ছিলো, আমাকে দেখে লোকটা হঠাৎ জিভ কেটে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো।

তাকের উপর থেকে একটা শিশি টেনে এনে গৌরীয়া বললে, 'এই তোমার তেল,' আরেকটা পুঁটলি বের করে' : 'এই তোমার নুন।' বলে'ই ঝিকে হাঁক দিলে। বললে, 'ঘরে একটা ছাতা আছে না? ওকে দিয়ে দে, ক্রোশ তিনেক দূরে ওর গাঁ, ও বাড়ি চলে' যাক।'

ঝি ছাতাটা বার করে' আনলো। গৌরীয়া লোকটাকে বললে, 'শিগ্‌গির পালা। এখুনি আবার চেপে আসবে।'

গৌরীয়া আমার দিকে ব্যথিত চোখে তাকালো। বললে, 'আপনিও এবার বাড়ি যান, বাবুসাহেব। নইলে, এরপর আবার কোনো লোক যদি আসে, তবে তাকে তাড়াবার জন্যে আপনার ছাতাটাই তাকে দিয়ে দিতে হ'বে। সেটা ভালো হবে না। আপনি বাড়ি যান।'

কথার চেয়ে কথার সুরটি ভারি ভালো লাগলো। বললুম, 'বৃষ্টিটা না ধরা পর্যন্ত তোমার এখানে একটু বসতে দিতেও তোমার আপত্তি আছে?'

'আছে।' গৌরীয়া নিষ্প্রাণ গলায় বললে, 'জায়গাটা ভালো নয়।'

'তাতে আমার কী! বাইরে জল পড়ছে, তাই এখানে আমি একটু বসে যাচ্ছি বই তো নয়।'

'কিন্তু গরিবের ঘরে মুক্তোর হার দেখলে লোকে তা চোরাই মাল ব'লেই সন্দেহ করে, বাবুসাহেব!' গৌরীয়ার সমস্ত ভঙ্গিটি বেদনায় যেন নম্র হ'য়ে এলো : 'তাতে গরিব আরো গরিব হয়, আর, তাতে মুক্তোরও সেই দাম থাকে না। আপনি বাড়ি যান।'

'বা, বিপদে পড়ে' তোমার এখানে এসে কেউ দাঁড়াতে পাবে না?'

'কিন্তু আমার ভয় হয় বাবুসাহেব, এখানে এসে না তুমি বিপদে পড়।' গৌরীয়া ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : 'এখনো অনেক পসারীর সওদা নিয়ে যেতে বাকি। বৃষ্টির জন্যে পথে কোথাও নিশ্চয় আটকা পড়েছে। তোমাকে তারা এখানে দেখবে, শুকনো ছাতা আর শুকনো বর্ষাতি নিয়ে মোড়ার ওপর শুকনো মুখে বসে' আছ, এ আমি কিছুতেই দেখতে পাবো না। আমি ছোট আছি, কিন্তু তুমিও ছোট হ'বে এ দেখতে বুক আমার ফেটে যাবে,

বাবুসাহেব।' বলেই সে ঝি-কে ডাকল, 'ডোঙাটা মাথায় করে' জামালকে ডেকে নিয়ে আয় তার বাড়ি থেকে। গাড়িটা বার করতে হ'বে। বাবুসাহেবকে পৌঁছে দিয়ে আসবে তাঁর কুঠি।'

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, 'না, গাড়ি কেন? হেঁটেই চলে' যেতে পারবো।'

রেইন-কোটটা গায়ে চাপিয়ে রাস্তায় নেমে আসছি, পিছন থেকে গৌরীয়া বললে, 'নমস্কার।'

তাকালুম না পর্যন্ত। প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এলুম। কুঠিতে গিয়ে কতক্ষণে সে এই ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে আবার পরিচিত সার্ট-ট্রাউজার্সে উপনীত হ'ব তারি জন্যে হাঁফিয়ে উঠলুম। মনে হ'লো একটা অতলান্ত অপমৃত্যু থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু সে কি ঈশ্বর?

শুধু ঐ দোকান নয়, এই শহরই আমাকে ছাড়তে হ'বে। ড্যালহৌসি স্কোয়ারে তাই অনেক সই-সুপারিশ করে' মাস তিনেক পর বদলি পেলুম।

মাল-পত্র আগেই রওনা হ'য়ে গেছে; পরে আমি, একা; বলা বাহুল্য, জামালের গাড়িতে নয়। স্টেশনে ছোটোখাটো একটা ভিড় হবে ও বহু লোকের সঙ্গে অনেক মুখস্ত করা মামুলি কথা বলতে হ'বে, সেই ভয়ে ট্রেনের খুব সংকীর্ণ সময় রেখেই আমি বেরুলুম।

গৌরীয়ার সেই দোকানের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। দেখলুম, মাচার উপরে গৌরীয়া নেই। গামলাগুলি খালি, এ ক'দিনে দোকানের শ্রী অনেক কমে' গেছে মনে হ'লো। ভাবলুম, যাবার সময় ওকে একটিবার দেখে গেলে ভালো লাগতো।

দেখলুম, পাশের সেই পুকুরধারে শাখাবাহুল্যবর্জিত কি একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সে আমার যাওয়া দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে অল্প একটুখানি হাসলো। সেই অল্প একটুখানি হাসা যে কী অপরূপ তা বুঝিয়ে বলি এমন শক্তি নেই। আজকের ভোরবেলাটির মতোই বিষাদে নির্মল, বিরহে সকরুণ সেই হাসি। দুঃখকে, ক্ষতিকে, অপরিসীম শূন্যতাকে সামান্য হাসি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে এমন যদি কোনো পরীক্ষা থাকে সংসারে, তবে সেই পরীক্ষায় গৌরীয়া ফুল-মার্ক পেয়েছে। একদৃষ্টে এতক্ষণ ধরে' ও কোনোদিন আমার দিকে তাকায়নি। আজ দেখলুম তাতে কত বিষাদ, কত স্নেহ, কত শান্তি!

গাড়িটা অনেক দূর চলে এসেছে। বললুম, 'চললুম গৌরীয়া।' গৌরীয়া হয়তো শুনতে পেলোনা, কিন্তু যাবার সময় কিছু একটা তাকে বলে' গেছি মনে করে সে আঁচলে চোখ চেপে ধরলো।

এত দিনে মনে হলো বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছি।

২। বেদখল

চার দাঁড় পান্‌সি হাঁকিয়ে ঐ কে যায়? নৌকোর ভিতরে হ্যাসাগ জ্বলছে, বাজছে গ্রামোফোন, চলেছে গুলতানি। বরযাত্রী চলেছে নাকি কারা? না, ছোট হিস্যার জমিদারবাবু বেরিয়েছেন ফুর্তি করতে?

ঘুমন্ত গ্রাম হকচকিয়ে ওঠে।

'কে যায় ও?' ঘাটের থেকে কে হেঁকে জিগগেস করে।

'আদালতের লোক। চলেছি দখল দিতে।'

'কোন গ্রাম?'

'গাজিপুর।'

'তা এত আমোদ কিসের?'

'সঙ্গে খোদ নাজির সাহেব আছেন যে।'

গাজিপুরে কাছারি বাড়ির সামনে নৌকো থামল পরদিন সন্ধেসন্ধি। নায়েবমশায় ও তার মুহুরি এসে হাজির, সঙ্গে কাছারির দুই পেয়াদা। মাথায় দুই ঝাঁকা। একটাতে চাল, ডাল, তেল, লঙ্কা, পেঁয়াজ, আলু; আরেকটাতে ফজলি আম গোটা কুড়ি, এক হাঁড়ি দুধ, সের পাঁচেক চিনি, সের দুই ঘি। আর একটা পেয়াদার হাতে চার চারটে মুরগি, দড়ি দিয়ে পা বাঁধা।

মাঝি বলে উঠল, 'তামাক?'

সামনের দোকান থেকে মাখা তামাক নিয়ে এল আধ সের।

নাজিরের সঙ্গে বাছা-বাছা চারজন পিওন। তার উপরে তার পরনে হফি-প্যান্ট, মাথায় টুপি। তার উপরে বন্দুক। প্রজা অত্যন্ত দুর্দান্ত।

পিওনদের মধ্যে ঝানু হচ্ছে অশ্বিনী। সে নায়েবের দিকে একটু হেসে বসে জিগগেস করে, 'কাজ কি করবেন, না মীমাংসা করবেন?'

'মীমাংসা?' নায়েব গর্জে উঠল, 'ওকে শায়েস্তা করতে না পারলে মালেকের জমিদারি এখান থেকে ইস্তফা দিয়ে যেতে হবে। ও কি কম জ্বালান জ্বালাচ্ছে! নিজে তো কোনো টাকা-পয়সা দেবেই না, উল্টে অন্যদের সলা-পরামর্শ দিচ্ছে ওরাও যাতে না দেয়। চব্বিশ হাজার টাকার মহাল একেবারে মাটি হবার জোগাড়!'

'বেশ, জমিদারি কায়েম রাখব, কিন্তু আমাদের, বুঝলেন কিনা—বিষয়টি তো আর সোজা নয়—আমাদের অন্তত—' অশ্বিনী তিন আঙুল দেখাল।

'আগে কাজ তো হোক—' নাজির উদাসীনের মতো বললে।

'আপনি কথা কইবেন না নাজির সাহেব।' অশ্বিনী ঝামটা দিয়ে উঠল, অন্তত তিনশ টাকা না পেলে এ কাজে যাচ্ছি না আমরা। ওরা তবে পুলিশ-যোগে দখল নিক।'

'না, না, দেব'খন খুশি করে। ঘর-ভাঙা দখল তো পাই আগে।' নায়েব গররাজি নয়।

'আপনার লোক-লস্কর, নিশানদার-মোকাবিলা, মায় ঘরামি-মিস্তিরি—সব জোগাড় রাখবেন সকাল বেলা। আর সমস্ত যন্ত্রপাতি।' নাজির গম্ভীর মুখে বললে, 'যত দুর্দান্তি হোক, দখল আমি দেবই।'

'আদাব মহারাজ', নায়েবকে এক সেলাম ঠুকল জবিরউদ্দিন, দ্বিতীয় পিওন। বললে, 'আমরা কিন্তু আপনার তাঁবেদার। ভুলবেন না তিন আঙুল। পুলিশ হলে ক' আঙুল লাগে তার ঠিক কি!'

ভোরবেলা। নাজির, পিওন সবাই হাজির হল কাছারিতে।

চাপরাশির চাপ দেখেই গাঁয়ের লোক সন্ত্রস্ত, এখন নাজিরের হ্যাট আর বন্দুক দেখে সবাই কুঁকড়িসুঁকড়ি হয়ে গেল। আদাব পড়তে লাগল চারদিক থেকে।

'এই আমাদের পাইক, নাম কালা গাজী। এ-ই নিশানদিহি করবে।' নায়েব গলা নামালেন, 'দেখুন, কাজ যদি হয় সহজেই হবে। দায়িকের দুই শালা আর এক মামু আছে—ভীষণ দাঙ্গাবাজ। গাঁয়ের সর্দারি করাই ওদের পেশা। শুনতে পেলাম, ওরা কুটুমসাক্ষাতে গেছে, ফেরেনি এখনো।'

'না বাবু, রাত্রেই ফিরে এসেছে নাকি?' কে একজন বললে, ভিড়ের মধ্য থেকে, 'উত্তরের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সঙ্গে ল্যাজা, শাবল, সড়কি, রামদা পর্যন্ত। আগে থেকে বেরুবে না নাকি, ঘরে ঢুকলেই বসিয়ে দেবে। ওরা একাই একশো লোক ফিরিয়ে দিতে পারে।'

'তবে আর কি! ফিরে আসব।' নাজির হতাশার ভঙ্গি করল : 'তুমি বুঝি কিছু হও ওদের?'

লোকটা লজ্জা পেল। মালিকের হয়ে কথা বলতে এসে বোধ হয় দায়িকের প্রতি অলক্ষ্যে একটু সহানুভূতি দেখিয়ে ফেলেছে। কিছুই হয় না সে দায়িকের। গ্রাম সুবাদে চাচা দাদা বলেও ডাকে না। তবু কেন কে জানে, মুখে মালিকের দিকে হলেও মন পড়ে আছে দায়িকের ঘরের দুয়ারে।

'দায়িকের বাড়ি কদ্দুর?'

'প্রায় ক্রোশখানেক। খাল দিয়ে যেতে হবে।'

'আপনার লোক সব খাঁটি তো? না মেকিও কিছু আছে?'

'আর বলবেন না অদৃষ্টের কথা। বেশির ভাগই মেকি। মুখে খুব আস্ফালন করবে, কিন্তু মনটা আসলে ওমুখো।'

কারু গায়ে গেঞ্জি, কারু ফতুয়া, কারু বা গা খালি, পরনে খাটো কাপড়, কারু লুঙ্গি, কারু বা গলায় একখানা গামছা—সবাই রওনা হলো দায়িকের

বাড়ির দিকে। চাপরাশিদের হাতে লাঠি, নাজিরের কাঁধে বন্দুক। পিছনে আর সব। সঙ্গে কৌতূহলী জনতা।

'কই হে ইমানদ্দি—'নাজির বন্ধুর মত হাঁক দিল।

'খবরদার শালারা, বাড়ির মধ্যে এলে মায়ের কোলে আর ফিরে যেতে পারবে না!' দায়িক' ইমানদ্দি ও তার ভাই বশিরদ্দি ল্যাজা হাতে করে ছুটে বেরিয়ে এল, ধাওয়া করল নাজিরের দিকে।

কাঁধের বন্দুক চট করে নামিয়ে বাগিয়ে ধরল নাজির। বাড়ির সীমানার বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'ভাই।

ইমানদ্দির গলায় শামুকের মালা, মাথায় বেঁধেছে লাল ফেটি। পাগল সেজেছে। একটা খুনখারাপি করতে তার আর বাধবে না একটুও। নাজির প্রমাদ গুনল।

'শালারা বুঝি ওদিক দিয়ে আসবে।' ঘর থেকে বেরিয়ে এল চেরাগ আলি, ইমানদ্দির ছেলে। বয়েস আঠারো-উনিশ। হাতে গেঁটে বাঁশ। বন-বনিয়ে ঘোরাচ্ছে মাথার ওপর। 'দেখি কোন শালা এগোয়। কার ঘাড়ে দুটো মাথা!'

জীবনে এই বোধ হয় প্রথম নাজির বেদখল হয়!

'দেখ, আমি আদালতের লোক, আইনের হুকুমে এসেছি।' নাজির ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'আমি তো আর তোমাদের শত্রু নই। পার যদি ওদেরকে ঠেকাও, ওদেরকে আসতে দিও না।'

ছল-চাতুরী জানে না, ইমানদ্দি জল হ'য়ে গেল। যে মহামান্য অতিথি এসেছে তার ঘরে সে তার শত্রু নয়—এ কথা সে অবিশ্বাস করে কি ক'রে?

'কে, নাজিরবাবু? আপনি? আদাব! আপনি আসবেন? আপনি আসুন, কিন্তু আর কোন শালা যেন আমার পলটে না ঢোকে।'

'না, না, অন্য লোক আসতে পারবে না। তবে কিনা'—নাজির ঢোক গিলল, 'চাপরাশিরাও তো আইনের কাজ করে ওদের আসতে দোষ নেই।'

'না, মহারাণীর দোহাই, ওদের আসতে কি দোষ?'

'আর এ তো আমার মাঝি—'

'দেখুন বাবু, যে শালা খুশি আসুক, কিন্তু ঐ হারামজাদা নিশানদার যেন না আসে!' বলে ল্যাজা সোজালো করে ইমানদ্দি ভিড়ের দিকে তেড়ে গেল। যে যেদিকে পারল ছুট দিল। জমিদারের পেয়াদা কালা গাজী, যে নিশানদিহি করতে এসেছে, লুকোল কচুবনের আড়ালে।

নাজির ও চাপরাশিরা এক-পা এক-পা ক'রে চলে এসেছে বাড়ির বাইরের উঠোনে। হঠাৎ কি একটা ভারি জিনিস সজোরে কে ছুঁড়ে মারল তাদের সামনে। ত্রস্ত হয়ে দেখলে সবাই, তিন চার বছরের একটা নগ্ন শিশু।

যে ছুঁড়ে ফেলেছে সে ঐ মেয়েটারই মা, ইমানদ্দির স্ত্রী। বললে চেঁচিয়ে, 'কেটে ফেল্ ঐ মেয়েটাকে। থানায় নিয়ে চলে যা সটান। দারোগাকে গিয়ে

বল, মালেকের পেয়াদা-মির্ধারা খুন করেছে আমার মেয়েকে। মেয়ে একটা গেলে আবার মেয়ে পাব, কিন্তু বাড়িঘর গেলে যাব কোথায়?'

ক্ষিপ্র হাতে নাজির তুলে নিল শিশুটিকে। অশ্বিনী জল ঢালতে লাগল। শিশু কাঁদতে লাগল 'মা' 'মা' বলে।

যেন কি সর্বনাশ ঘটতে বসেছে। কালবোশেখীর ঝড়, না আশ্বিনের বন্যা! সব ওলোটপালোট ছারখার হতে বসেছে। যেন আগুন ধরে গিয়েছে চারদিকে। বাড়ির মধ্যে সুরু হয়েছে মহামারের তান্ডব।

কি করবে দিশে পাচ্ছে না ইমানদ্দি। কখনো পাগলের মত সারা গায়ে কাদা মাখছে, গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকছে, রক্ত বের করে ফেলছে, কখনো বা আঁজলা করে কাদা থেকে জল তুলে খাচ্ছে। গলিত পুঁজের মত খিস্তি-খেউড় করছে। আর তাগবাগ নেই, ছোট ভাই বশিরদ্দি এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করছে আর লাঠি হাঁকড়াচ্ছে।

ইমানদ্দি আর বশিরদ্দির আলাদা ঘর, উত্তরের ভিটে আর পশ্চিমের ভিটে, সীমানা ভাগ করা। আলাদা হাঁড়ি, আলাদা দাখিলা, আলাদা চৌকিদারি ট্যাকসো। কিন্তু আজ যখন বিদেশী শত্রু তাদের ঘরের দরজায় উপস্থিত, তারা দু'ভাই আজ এক বাপের ছেলে, তারা আজ রাম লক্ষ্মণ।

কিন্তু সমস্ত আক্রোশ তাদের ঐ জনতার উপর। যারা মজা দেখতে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে আর পালপার্বণ নেই, দুর্গাডুবি নেই, পূর্বের সেই জেল্লা-জমক উঠে গেছে, তাই এরা এসেছে এখন উচ্ছেদ দেখতে। কি করে একটা গোটা সংসার উচ্ছন্নে চলে যায় মুহূর্তের মধ্যে। কি করে সমর্থ স্বামী তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে রাস্তা ছেড়ে মাঠের মাঝখানে।

'শালাচ্ছেলেরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি এখানে? এ বাড়ি তোমাদের—না আমার?' ইমানদ্দি আবার তেড়ে গেল জনতার দিকে। বশিরদ্দি এক-তাল কাঁদা ছুঁড়ে মারল।

জবিরউদ্দিন বাধা দিয়ে বললে, 'কি কর ছেলেমানুষের মত! নাজির সাহেব যে এদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। দখল হোক বা না হোক, তাঁকে একটু বসতে দাও।—তোমাদের একটা নাম-ডাক আছে, মান-ইজ্জত আছে, মাথা খারাপ করে সব খোয়ালে নাকি আজ? ভদ্রতাটাও ভুলে যাবে? তোমার মেয়েকে কোলে নিয়ে এত আদর করছেন আর তুমি এমন বেকুব, তাঁর একটু খোঁজ-খবর করছ না? আহম্মক কোথাকার!'

ইমানদ্দির যেন হুঁস হল। বেপরোয়া গালি ছুঁড়তে লাগল ছেলে চেরাগ আলিকে উদ্দেশ করে, 'শালার পো শালা, মেহমানকে বসতে দিতে পার না? ও মাগী করে কি? ও-ও তো বসতে দিতে পারে। সব ক'টাকে আজ খুন করব।' ইমানদ্দি ছুটল এবার ঘরের দিকে।

'আরে কর কি!' জবিরউদ্দিন তার হাত ধরে ফেলল, 'নাজির সাহেবের সঙ্গে কথা কও, যাতে কাজ হবে। মাথা ঠান্ডা কর।'

'মাথা ঠাণ্ডা করবো! ঐ শালার ছেলেদের যেতে বলেন শিগগির। আমি ভিটেছাড়া হব, আর ঐ শালারা তাই দেখবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে?' বলে ইমানদ্দি আবার মার-মার করে উঠল।

'থাক না দাঁড়িয়ে ওরা। কতক্ষণ থাকবে?' নাজির বললে প্রবোধের সুরে, 'শেষকালে হয়রানি হ'য়ে ফিরে যাবে এক সময়।'

একটা মোড়া ও খান কয়েক পিঁড়ি নিয়ে এল চেরাগ আলি। মেয়েটা নাজিরের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল চেরাগ আলির কোলে।

'একটু তামাক আনতে পার?' গলা নামিয়ে জিগগেস করলে অশ্বিনী।

'তামাক টামাক নেই। বসতে দিয়েছি এই বেশি।' গর্জে উঠল ইমানদ্দি।

'কি বাজে বকছ আহম্মকের মত।' জবিরউদ্দিন মুরুব্বি-মাতব্বরের মত বললে, 'এক ছিলিম তামাক তুমি কাকে না দাও শুনি?' একটা বৈঠক-সালিশ কোথাও বসলেই তো তামুকের শ্রাদ্ধ।'

এমনি সময় বাড়ির পেছন থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল বশিরদ্দি। বলছে, 'ওরা বেড়া খুলে আসবে—'

'কি?—বেড়া খুলবে? ও শালার পো চেরাগালি, দেখি তো আমার গুলিবাঁশটা।' ইমানদ্দি হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

চেরাগ আলি লাফিয়ে পড়ল গুলিবাঁশটা নিয়ে।

জবিরউদ্দিন কেড়ে নিল বাঁশটা। বললে, 'চোখে কিছু আর তোমরা দেখতে পাও না। কে খোলে তোমার বেড়া? আমরা এখানে সবাই বসে আছি, আর আমাদের সামনে কার হবে অমন আস্পর্দা? একটু বোস চুপ করে।'

কে কার কথায় চুপ করবে! ইমানদ্দির পরিবার বড় মেয়েটাকে হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। অন্য হাতে তার গাছ-কাটা দা। মেয়েটার বয়েস সাত-আট, রঙিন ছোট একখানা শাড়ি পরা। মুখে এতটুকু ভয় নেই। উজ্জ্বল চোখ দু'টো টলটল করছে।

'ওরা বাড়িতে ঢুকলেই কিন্তু এই দা বসিয়ে দেব তোর গলায়। পারবি?' মা বললে মেয়েকে।

মেয়েটা টলল না। গলায় দা বসালে তার কি হবে কিছু বুঝলও না হয়ত। শুধু এটুকু বুঝেছে বিদেশী শত্রু তাদের বাড়িঘর কেড়ে নিতে এসেছে। এ বাড়ি ঘর ছেড়ে দেয়া হবে না কিছুতেই। শত্রুকে যে করে হোক বাধা দেওয়াটাই এখন বড় কাজ। তার কাছে বাঁচামরাটাও তুচ্ছ। তাই সে বললে স্পষ্ট গলায়, 'পারব।'

নাজির অস্ফুট চীৎকার করে উঠল। পকেট থেকে ক্যামেরা বের করে তুলে নিল ওর ফটোগ্রাফ।

মুখে বিষণ্ণতার ভাব এনে বললে অশ্বিনী, 'তোমাদের মেয়ে, তোমরা কাটলে আমাদের কি হবে? একটা বিহিত করব ভেবেছিলাম, তা তোমরা আর করতে দিলে না।'

'কিসের বিহিত?' ইমানদ্দি তেড়েফুড়ে উঠল : 'বিহিত নেই। বেশি তেরিমেরি করবে না বলে দিচ্ছি। যাকে পাব তাকে মেরে বসব।' বলেই সুরু করলে গালাগাল।

'তা হলে নেহাৎই একটা গোলমাল বাধাবে দেখছি।' জবিরউদ্দিনও তেরিয়া হয়ে উঠল, 'বন্দুক ধরুন তো নাজির সাহেব, দেখি ওদের কতদূর ক্ষমতা। বলছি যে দখল দেব না, তবু কেবল গালিগালাজ করে।'

'যাক, ওতে যদি ও শান্তি পায় তো করুক।' নাজির নির্লিপ্তের মত বললে, 'বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাওয়া তো আর চারটিখানি কথা নয়। বলি ও ইমানদ্দি, তামাক-টামাক দেবে না একটু?'

'শালার পো শালারা তামাক দেয়নি এখনো?' ইমানদ্দি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে গ্যাদা, কি করিস বাড়ির মধ্যে? তোর মাও তো এক কলকি তামাক দিয়ে যেতে পারে। সে শালী করছে কি?' বলে সে আবার স্ত্রীর উদ্দেশে ছুটল।

অশ্বিনী বাধা দিয়ে বললে, 'ওদিকে গিয়ে কি লাভ? এদিক পানে থাক, কেউ যেন আসতে না পারে। তামাক দিয়ে যাবেখন।'

'কি, এদিকে লোক আসবে?' ল্যাজার মাথা দিয়ে খানিকটা জায়গায় ইমানদ্দি কুণ্ড তৈরি করল। তার মধ্যে বসে পড়ে আবোলতাবোল মন্ত্র আওড়াতে লাগল, 'দেখি কার সাধ্য বাড়িতে ঢোকে।'

গ্যাদা তামাক নিয়ে এল। তুষের আগুন দেওয়া এক কলকি তামাক, কলকিটা ডাবা হুঁকোর মাথায় বসানো। এক হাতে হুঁকা, অন্য হাতে দা। তার বয়স বারো-তেরো; কিন্তু সেও সশস্ত্র। শত্রুকে ঢুকতে দেবেনা তার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে। সেও প্রতিরোধ করবে।

'আরে, তোর হাতেও অস্ত্র! বেশ বেশ, কেউটের বাচ্ছা কেউটে হবি না তো কি!' নাজির এক গাল হাসল, 'বলি পান-টান খাওয়াবি, না, শুধু মুখেই ফিরব? যা, আমাদের খাবার-দাবার জোগাড় কর গিয়ে, দুটো মুরগি জবা দে।'

ছেলেটা একটাও কথা বলল না। একটু হাসল না। মুখ গম্ভীর করে চলে গেল।

উত্তরের ঘরে লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে আছে, তার একটা হদিস করা দরকার।

'কিগো, একটু পানি দেবে খেতে?' এই বলে জবিরউদ্দিন ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। দেখতে লাগল ইতি-উতি। ইসারায় জানাল নাজিরকে, ও সব মিথ্যে কথা।

বাইরে তখন প্রায় চার-পাঁচশো লোক জমা হয়েছে। রোদ্দুরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ঘণ্টা দুই। তারা আর কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে তীর্থ-কাকের মত।

নাজির একটা সিগারেট ধরাল। এদিক ওদিক ঘুরতে ফিরতে লাগল।

বলতে লাগল; 'না, এমন সুন্দর বাড়িঘর, এও মানুষে ভাঙতে চায়!' ইমানন্দির পরিবার দরজার গোড়ায় বসে আছে দা হাতে, তাকে লক্ষ্য করে বললে, 'শোনো মা, মালিকের সঙ্গে একটা মীমাংসা কর। আমি আছি, আমি দিই মীমাংসা করে।'

'আর কিসের মীমাংসা। এক থোকে গেল বার টাকা দিছি আশিটা, এবার দিছি একশো বারোটা, তার উপরে আরো টাকা চায় দুইশো। কি করব কও, জমি খাই দশ কুড়া আর এই বাড়িটা।'

'তোমাদের খাজনা কত?'

'চব্বিশ টাকা।'

'কার হাতে টাকা দিয়েছ বলতে পার?'

'পারি না? খুব পারি। আমি আর উনি দু'জনে মালিক-সেরেস্তায় গিয়ে নায়েবের কথামত কালা গাজীর হাতে টাকা দিয়ে এসেছি। গুনে গুনে দিয়ে এসেছি, একটি একটি করে। সেই কালা গাজী আজ এসেছে আবার দখল নিতে!'

'নায়েবের হাতে দাওনি কেন?'

'তাই চেয়েছিলাম দিতে, কিন্তু নায়েব বললে, ওর হাতে দাও।'

নিশ্চয়ই একটা কিছু অভিসন্ধি ছিল। হয়ত বেশি টাকায় আর কাউকে পত্তন দেবে, দুরন্ত প্রজা সরিয়ে বাধ্য প্রজা বসাবে। তাই টাকায় কোন আসান হয়নি। খাজনার ডিক্রি হয়েছে। নীলেম হয়েছে। বাঁশগাড়ি দখল হয়েছে। তবু টাকা দেয়ার সত্যের জোরে নড়েনি ইমানন্দি। পরে হয়েছে এই খাসদখলের ডিক্রি। হয়তো আছে কেউ আড়ালে-আবডালে। পত্তন নেবে বলে আগে থেকে সেলামী দিয়ে রেখেছে। শত চাপ দিলেও ইমানন্দির সাধ্য নেই সে টাকার নাগাল পায়।

কে জানে, যা বলছে, তাই সব সত্যি কিনা। গরিব হলেই সে সত্যবাদী হয় না। প্রজা হয়েও সে উৎপীড়ক হতে পারে।

হোক সে অবাধ্য, হোক সে মিথ্যাবাদী, হোক সে দেনদার, তবু সে তার বাড়ি ছেড়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বেরিয়ে যাবে—এর মধ্যে বিচার কোথায়!

লোকে চুরি-ডাকাতি করে, মেয়ে ফুসলায়, তবিল তছরুপ করে, জেল হয়, জেল খেটে ফের তার বাড়ি ফিরে আসে। তার বাড়িঘর লোপাট হয়ে যায় না। আর এ লোকটা হয়ত খাজনা বাকি ফেলেছে। গাফিলি করেই হোক বা দুর্বৎসরের জন্যেই হোক খাজনা দিতে পারেনি। সে কি চুরি-ডাকাতির চেয়েও খারাপ? আর তারি জন্যেই সে নির্বিবাদে বাড়ির বার হয়ে যাবে!

'আচ্ছা মা, আমরা এখন যাই। ভাত তো আর খাওয়াবে না, একটু পান-টান যদি খাওয়াও।' নাজির হালকা সুরে বললে।

ইমানন্দির স্ত্রী সবাইকে বারান্দায় বসতে বললে। বলে সে চলে গেল

ভিতরে। একটি থালায় করে কটা পান, কিছু কাটা সুপুরি ও সামান্য চুণ-খর এনে দিলে। নাজির পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'এবার তা হলে আসি। এমন ভাবে বিনা দাখিলায় টাকা-পয়সা আর দিও না।'

'আর দেব কোনো দিন? মরে গেলেও না।'

'তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়। কিন্তু কি করব? পরের চাকরি করি, পরের হুকুমে আমাদের চলতে হয়। আজ আর দখল হবে না বটে কিন্তু মালিক কি ছাড়বে? হয়তো এর পর পুলিশ নিয়ে আসবে। সে যে তখন কি কান্ড হবে কেউ বলতে পারে না।'

'একটা কিছু বুদ্ধি দাও বাবা, কি করি।' ইমানদ্দির বউ শূন্য, হতাশ চোখে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

কি বুদ্ধি দেয়া যায় তাই বোধ হয় নাজির ভাবছে, হঠাৎ সোরগোল উঠল। শোনা গেল, ইমানদ্দির দুই শালা পাশ-গ্রাম থেকে ছুটে এসেছে দখল ঠেকাবার জন্যে, কিন্তু ভিড়ের থেকে কারা আগে থেকেই তাদেরকে ঠেকিয়ে দিয়েছে, ছুটে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

নাজির বন্দুকে গুলি ভরবার ভঙ্গি করল। দেখল, দু'টো প্রমত্ত জোয়ান লোক ভিড় ছত্রখান করে দিয়ে বেরিয়ে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর নানা দিক থেকে তাদেরকে আটকে রাখছে জনতা।

বন্দুক বাগিয়ে ধরে নাজির বললে, 'এক পা এসেছ সীমানার মধ্যে, গুলি করব বলে রাখছি। কেউ আসতে পারবেনা, তোমরাও না—ওরা দু'জনও না।'

সবাই কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু ইমানদ্দি বোঝবার লোক নয়। তখন থেকে সে তার কুন্ডের মধ্যে বসে মন্ত্র আওড়াচ্ছে আর ছক কাটছে আঙুলের নখ দিয়ে। তার মন্ত্র-তন্ত্র এবার সব উড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল : 'আমার আত্মীয়-স্বজনকে আমার বাড়ির মধ্যে কে ঢুকতে দেবে না? কার ঘাড়ে কটা মাথা?' হাতের কাছে ল্যাজাটা খুঁজে পেল না ইমানদ্দি। কুন্ডে বসে মন্ত্র জপবার সময়ই কায়দা করে অশ্বিনী সেটা সরিয়ে রেখেছে।

দিগবিদিক না ভেবেই ইমানদ্দি খালি হাতে লাফিয়ে পড়ল জনতার উপর তার আত্মীয়দের ছিনিয়ে নিতে। আর যেই সে ঢুকে পড়ল সেই জনতার ব্যূহে, অমনি তাকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলল নায়েবের লোক।

ঘরের মধ্যে ঢুকে চেরাগ আলিকে চেপে ধরল জবিরউদ্দিন। ইমানদ্দির স্ত্রী কোনো জখম করে না বসে তারি জন্যে তার হাত বেঁধে ফেলা হল গামছা দিয়ে। দু-দুটো পিওন গ্যাদা আর বড় মেয়েটাকে পাহারা দিতে লাগল।

'শালা দুটো কোথায়?' নাজির জিগগেস করল উদ্বিগ্নভাবে।

'সব্বাইকেই তো তখন থেকে শালা বলছে। কার কথা বলছেন?' পাকা ভুরু তুলে প্রশ্ন করল অশ্বিনী।

'পাশ-গ্রাম থেকে যে লোক দুটো শেষকালে ছুটে এল হন্যের মত?'
'কেউ আসেনি।' অশ্বিনী বললে স্থির কণ্ঠে।
'কেউ আসেনি?'
'না। শুধু একটা রব তুলে দেয়া হয়েছে। যাতে ইমানদ্দিকে টেনে আনা যায় ভিড়ের মধ্যে। হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে যাতে তাকে ঘায়েল করা যায় সহজে।' অশ্বিনী চোখ টিপল।
সবাই হাসতে লাগল স্বচ্ছ মনে।
ওদিকে চক্ষের পলকে মিস্ত্রিরা কাজ প্রায় সমাধা করে এনেছে। খুলে ফেলছে চালের মটকা, খুলে ফেলছে টিন। নায়েবের ভাড়াটে লোকেরা হাতে-হাতে মালামাল সরিয়ে মজুত করছে এনে সীমানার বাইরে। সমস্তটা কেমন আস্তে আস্তে ফাঁকা, শাদা হয়ে যাচ্ছে।
একটি মেটে কলসীতে সামান্য কটি চাল। তাই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বড় মেয়েটা মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, 'চাল কটিও যে ওরা নিয়ে যায়! তবে আমরা খাব কি ওবেলা?'
ইমানদ্দির স্ত্রী একটিও আওয়াজ করল না। ইমানদ্দি বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বাইরের উঠানে। উপুড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে। দিনের দিকে আর তুলে ধরবে না তার মুখ।
কিন্তু বশিরদ্দি?
'সর্বনাশ, বশিরদ্দি গেল কোথায়?' নাজির বিবর্ণমুখে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাকে কে আটকেছে? সে কার নজরবন্দী?'
'ভয় নেই, সে কারু নজরবন্দী নয়।' বললে জবিরউদ্দিন।
'তার মানে?'
'তার মানে, সেও মিস্ত্রিদের সঙ্গে কাজে লেগেছে। ঘর ভাঙছে, জিনিস সরাচ্ছে।'
'কে, বশিরদ্দি?'
'হ্যাঁ, সেই নিয়েছে এ জমার নতুন বন্দোবস্ত। সেলামি দিয়েছে পাঁচশো টাকা। ঐ, ঐ যে বশিরদ্দি।'
বশিরদ্দির হাতে ল্যাজা-লাঠি নয়, হাঁড়িকুঁড়ি, হাতা-খুন্তি, কড়া গামলা। রান্না-ঘর ভাঙা হয়ে গেছে, তার মাল সরাচ্ছে সে এখন। সরা-সানকি, দেরখো-কুপি।
এখান দিয়ে যাচ্ছিল, শুনতে পেল কথাটা। হাসতে হাসতে বশিরদ্দি বললে, 'হ্যাঁ বাবু, ষোল আনাই এবার আমার হল।'
তার চকচকে দাঁত সে আর ঢাকল না ঠোঁট দিয়ে।

৩। পান্না

'এই, যাবি?' অতসীর গায়ে ঠেলা মারল মৃদুলা।

বইয়ের থেকে মুখ তুলে অতসী হাঁ হয়ে রইল। বললে, 'কোথায়?'

'সিনেমা।'

'সিনেমায়? এখন?'

'কেন, নাইট শোতে যায় না কেউ?'

'যায় হয়তো। কিন্তু হোস্টেলের মেয়েরা নয়।'

'কেন, হোস্টেলের মেয়েরা কি রাত জাগতে অপটু? তারা কি খুকি?'

'না, একশোবার নয়। কিন্তু তাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, আছে শালীনতার চেতনা—'থমথমে মুখ করল আতসী।

'হোস্টেলের কি-একটা বাজে আইন লঙ্ঘন করতে চাচ্ছি বলেই শালীনতার অভাব হল?'

'বাজে আইন মানে?'

'তাছাড়া আবার কি। রাত সাড়ে আটটার মধ্যে সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে আসা চাই, নটাতে গেট বন্ধ, এ বর্বর আইনের কোনও মানে হয়?'

'যখন হোস্টেলে নাম লিখিয়েছিলি, তখন এ-আইন ন্যায্য আইন, মেনে চলবি ষোলো আনা, এ স্বীকার করেছিলি। করিস নি?'

'একবার যা স্বীকার করা যায়, তা আর পরে খণ্ডন করা যায় না?'

'না।' আরও গম্ভীর হল অতসী।

'তবে সেদিন যে অরুণা বৃষ্টিতে আটকে গেল, সারা রাত কে-না-কে এক দিদির বাড়ি বলে বাইরে কাটাল—পরদিন সকালে এসে হাজির—'

'সেটা তো দুর্ঘটনা, বৃষ্টি—'

'কিন্তু শুধু তো দুর্ঘটনা নয় অঘটনাও তো আছে। কল্যাণী তো কত রাত্রি ফেরেই না হোস্টেলে। শুনতে পাই যাদবপুরে কোন এক ভদ্রলোকের—'

'থাম। শোনা কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।' অতসী ধমকে উঠল।

'কিন্তু কোনও কোনও রাত্রে যে হোস্টেলের বাইরে থাকে, বেড়াতে বেরিয়ে আর ফেরে না, এ তো আর শোনা কথা নয়। এ দেখা কথা। তুই দেখিস নি?'

'দেখলেই সমর্থন করতে হবে?' চোখ তেরছা করল অতসী। 'কিন্তু মেট্রন কী বলে?'

'কিছু বলে না। বলে হোস্টেলের মধ্যে কিছু না হলেই হল। বলে, আর যা কিছু কর, দেখো, গোল পাকিও না।' বলতে গিয়ে হেসে ফেলল মৃদুলা।

'কিন্তু প্রণতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছিল মনে নেই?'

'সে প্রণতি মুখে-মুখে তর্ক করেছিল বলে। রাত্রে স্টে-এওয়ে করবার জন্যে নয়।'

'বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ফেরে না, বুঝি, তার যা হক একটা প্লজিবল কৈফিয়তও তৈরী করা যায়। কিন্তু ফিরে এসে বেশি রাতে আবার বেরোয় কে? ফিরবি যখন, তখন তো মাঝ রাত, খুলে দেবে কে দরজা?'

'দারোয়ানকে বলা আছে। দেওয়া আছে বকশিশ। সেই খুলে দেবে। কিন্তু', অতসীর চেয়ারের পিঠটা ধরল মৃদুলা : 'কিন্তু আমি ফিরব না।'

'ফিরবি না মানে? রাত্রে সিনেমার হলে শুয়ে কাটাবি?'

'সিনেমায় যাব না।'

'সিনেমায় যাবি না? সে কি?' চেয়ারটা নড়ে উঠল শব্দ করে।

'ঘড়ি দেখেছিস? সিনেমায় যাবার সময় কোথায়? সরকারী আজে-বাজে ছবিগুলিও এখন শেষ হয়ে গেছে।'

'তবে তুই যাবি কোথায়?'

'আন্দাজ কর।'

'আন্দাজ করব? ছাত্রী-মেয়ে রাতে হস্টেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে গেট খুলে, সেটা ভাবাই তো কঠিন। শুনি না! যাবি কোথায়?'

চোখের পাতা নাচাল মৃদুলা। 'হোটেলে।'

'তার মানে? চাকরি নিয়েছিস সেখানে? ভোজনশেষে ভুক্ত লোকদের অবশিষ্ট হবার চাকরি?'

'চাকরি নিতে নয়, চাকরি দিতে যাচ্ছি। প্রধানতম চাকরি।'

'সে আবার কি।'

'তার মানে প্রগাঢ়তম। যাচ্ছি রণেনের হোটেলে।'

'ও তোকে বলেছে যেতে?'

'ও আবার বলবে!'

'তবে?'

'যাচ্ছি নিজের জোরে, নিজের গরজে।' চেয়ার থেকে দু পা সরে গেল মৃদুলা। 'আর ওকে বোঝাতে যে আমার গরজেই ওর গরজ।'

'হোটেলে আর-সকলে জেগে নেই? দেখবে না?'

'দেখুক। বয়ে গেল।'

'বয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, আমি তো আর কারু কাছে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি রণেনের ঘরে। তার একলার এক ঘরে।'

'তোর লজ্জা করছে না বলতে?' চেয়ারটা ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল অতসী।

'না আর করছে না।, যা সত্য, তাই নগ্ন। আমার গায়ে যদি আগুন

লাগে আর আমি যদি সব আবরণের আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিই, তা হলে তুই বলবি, তোর লজ্জা করে না নির্লজ্জ হতে? বলবি? চিকিৎসা করাতে এসে লজ্জা ঢাকবার কোনো মানে হয় না।'

'চিকিৎসা?'

'হ্যাঁ, অনেক টোটকা-টাটকি করেছি, অনেক ইঙ্গিত-ইশারা। হোমিও-প্যাথিক ছোট্ট গ্লবিউল থেকে শুরু করে এলোপ্যাথিক ঝাঁঝালো মিকশ্চার পর্যন্ত, কোনো সুরাহা হয় নি। এবার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরিকে যাব সঙ্গে করে।'

'কে সে?'

'শেষ চেষ্টা দেখতে হবে। সকলেই দেখে। যতই ক্লেশ হক মরীয়া হয়ে সবচেয়ে বড়, দ্রুত ডাক্তার ডাকে। আমিও মরীয়া, আমিও শেষ চেষ্টা দেখব।'

'কিন্তু ডাক্তারটা কে?'

'সেই ডাক্তার আর বেঁচে নেই।'

'বেঁচে নেই?' হাঁ হয়ে গেল অতসী।

'না। ভস্ম হয়ে গিয়েছে। পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী—'

অতসী চেয়ারটা ফিরিয়ে নিল আগের কোণে। বললে, 'ভস্মে ঘি ঢালতে চলেছিস।'

'মোটেই না। ভস্মের মধ্য থেকে খুঁচিয়ে স্ফুলিঙ্গ বার করতে চলেছি। আর, এককণা আগুন পেলেই দাবাগ্নি। অলসকে নিয়ে আসব বিলাসে—'

'বিলাসে?' ঘাড় বেঁকাল অতসী।

'নিয়ে আসব উল্লাসে। দেখছিস না আমার সাজগোজ?'

'তুই এমনি করে নিক্ষেপ করবি নিজেকে?'

'সুন্দর বলেছিস কিন্তু।' অতসীর কাঁধের উপর হাত রাখল মৃদুলা। 'নিক্ষেপ করব। লাফের আগে দেখব না তাকিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ব অন্ধকারে!'

'এতটুকু ধৈর্য নেই?'

'তুই কি বুঝবি? তুই তো পতঙ্গ হয়ে দেখিস নি বহ্নি। সংক্ষেপ করতে চাই, তাই আমি নিক্ষেপে প্রস্তুত।'

'রণেন জানে, যাবি?'

'জানতে দিই নি ঘুণাক্ষরে। ওকে এক-মুহূর্ত সতর্ক হবার সময় দেব না। ধ্বংসের মত নেমে পড়ব। অন্ধ সাইক্লোন হয়ে ধাঁধিয়ে দেব ওর অনুভবের শক্তি—আর যদি গিয়ে দেখি ও ফেরে নি, দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া, অপেক্ষা করব।'

'তোকে না যেতে বারণ করে দিয়েছে?'

'তখন ঝিরঝিরে হাওয়া ছিলাম।' একটু নড়লচড়ল মৃদুলা। 'ঝড়কে কে বারণ করে? বুক পেতে বরণ করবে। যা অবারণ তাই বরণীয়—আর যদি গিয়ে দেখি, ঘরে আছে—'

'নক্ করবি?'

'দুদ্দাড় শব্দ করে দরজা খোলাব।'

'যদি না খোলে?'

'লঙ্কায় কী আগুন লেগেছে জানি না, কিন্তু আমি লেজের আগুনে জ্বলছি, আমার উপশম কই? দরজায় মাথা কুটব, কাঁদব, মিনতি করব। কেন খুলবে না? রুগ্নের জন্য, বিপন্নের জন্য এতটুকু দয়া হবে না তার?'

'বেশ, যদি খোলে!'

'তক্ষুনি ঢুকে পড়ে দরজার খিল চাপিয়ে দেব। হাত বাড়িয়ে দেব সুইচ অফ করে। তাকে জড়িয়ে ধরব, বলব, এ রাত তোমার ঘরে ভোর করতে এসেছি—'

'ব্যাস, আর কোনো কথা নেই?'

'কী হবে অনর্থক প্রলাপে? অন্ধকারই কথা কইবে। উত্তুঙ্গের সঙ্গে গভীরের সম্ভাষণ।'

'ছি ছি ছি ছি। এই কি ভদ্রতা, শালীনতা?'

'আহা-হা, রাখ তোর টিপ্পনী। ভদ্র প্রেম, বৈধ প্রেম, শুদ্ধ প্রেম, এমন কিছু আছে নাকি সংসারে? ভদ্র প্রেম না সোনার পাথরবাটি। বৈধ প্রেম না কাঁঠালের আমসত্ব। আর শুদ্ধ প্রেম, কি বলব, অশ্বডিম্ব। প্রেম প্রেম। প্রেমের কোনও বিশেষ্য-বিশেষণ নেই।'

'কিন্তু, ধর, যদি তোকে গোড়াতেই তাড়িয়ে দেয়।'

'তারই জন্যে তো তোকে সঙ্গে নিতে চাইছি।'

'আমাকে?'

'নইলে তোর সঙ্গে এত বকবক করছি কেন?'

'আমি লঙ্কায়ও নেই, লেজেও নেই—এর মধ্যে আমি কোথায়?'

'তুই আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবি। ও তোকে দেখে বুঝবে, আমি হঠকারী নই, হিতৈষী বন্ধুদের সমর্থনেই আমার আসা, আমার দাবি।'

'বেশ, বলছিস যা হক।'

'হ্যাঁ, আরেকটি মেয়ে আমার সঙ্গে আছে, প্রথমটা ওর চোখে বেশ সরল দেখাবে। আমার মতলব সম্বন্ধে মোটেই হুঁশিয়ার হতে পারবে না। তারপর ঘরে ঢুকে ব্যগ্র হাতে যখন খিল চাপাব—'

'তখন আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি ফিরে আসব একা একা।'

'বন্ধুর জন্যে কষ্ট একটু না হয় করলিই বা। আর কষ্ট না ছাই! এই তো দু-তিন মিনিটের পথ—দারোয়ান গেট খুলে দেবে বলা আছে।'

'আমি তো ফিরে এলাম, কিন্তু তোকে, প্রথমে না হক, সব শেষ হবার শেষে, যদি তাড়িয়ে দেয় মাঝরাতে?'

একটুও ভয় পেল না মৃদুলা। বললে, 'তখন তো ফাঁসির দড়ি পরে নিয়েছি গলায়, তাড়িয়ে দিলে নিজেকেও বেরিয়ে পড়তে হবে সঙ্গে সঙ্গে।'

'হঠকারিতার একটা সীমা আছে।'

'হ্যাঁ, আছে। আত্মসমর্পণই তার সীমা। সর্বশ্রেষ্ঠ যে ধনী, সর্বোত্তম যে বীর, কী সে দিতে পারে শেষ পর্যন্ত? ওই, ওই আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণই সেরা ধন, সেরা শক্তি। তাই এবার আমি দিয়ে দেব উজাড় করে।' আবার দু পা হাঁটল মৃদুলা : 'যা অলঙ্ঘ্য অনিবার্য, তাকে নইলে পাই কি করে বল?'

'কেলেঙ্কারি করবি তুই। ও নিশ্চয়ই পুলিস ডাকবে।'

'ডাকবে?' চেয়ারের পিঠ ধরে থামল মৃদুলা : 'সত্যি? তাই ডাকুক। সত্যি-সত্যি একটা কেলেঙ্কারি হক। লোক-জানাজানি হক। উঠুক খবরের কাগজে। দরকার হয়তো দাঁড়াই গিয়ে আদালতে।'

'আর তুই ভাবছিস আমি যাব তোর সঙ্গী হয়ে, তোর ঘটকালি করতে?'

'না গেলি। নাই বা দূতী হলি।' আমি একাই যাব। তুই ক্ষুদ্র, তুই লঘু, তোর অল্পে তুষ্টি, তুই বুঝবি কি করে এই অধ্যবসায়ের সুখ? তুই তো এক বিধি-নিষেধের পুঁটলি, কি করে জানবি তুই এই সর্বস্বপণ পূর্ণাহুতির আস্বাদ? ভাণ্ডার লুঠ হয়ে যাবার স্ফূর্তি? নিঃস্বতার ঔজ্জ্বল্য?'

আলো নিবিয়ে দিল অতসী।

আশ্চর্য, অন্ধকারেই বেরিয়ে গেল মৃদুলা।

'হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র নিয়ে জাগব অথচ স্তব্ধ থাকব, উত্তাল হব অথচ উদ্বেল হব না, এ পারব না সইতে। আর চড়াই-উতরাই চলছে না, এবার স্থির লক্ষ্যে সেই পূর্ণতায়, সেই পরাকাষ্ঠায় গিয়ে পৌঁছুব।'

'শোন—'

'থামব না, ছাড়ব না, ফিরব না কিছুতেই। ঢিমেতেতালা ঢোঁড়া সাপ হব না, ফণাতোলা ছোবল-মারা কেউটে হব। দংশন না হলে গরল নেই। সজীব সংযোগ না হলে সিদ্ধি নেই।'

'খবরদার, যাসনি মৃদুলা।'

'তুই তো বারণ করবিই। তুই আমার শত্রু।'

মফঃস্বল কলেজ, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল মৃদুলা।

মাকে বললে, 'রণেনদাকে বলো না আমাকে একটু সাহায্য করবে। চারদিকে অন্ধকার দেখছি।'

মায়ের গ্রামসুবাদে কোন্ এক দাদার ছেলে রণেন। গেল বছর বেরিয়ে গেছে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে। হাতে একটা চাকরি এসে পড়তেই লুফে নিয়েছে চটপট।

'দেখিয়ে দিতে পারি মাঝে মাঝে। কিন্তু পিসিমা, ও একা নয়।' রণেন আবদারের সুরে বললে, 'অন্তত আরেকজন ওর সঙ্গে পড়ুয়া চাই।'

একা হবার সাহস নেই। যেন একাধিক হলেই ভিড় আর ভিড় হলেই

আলগোছা হবার সুবিধে। এক পাড়ার মেয়ে, অতসীকে জোটাল মৃদুলা।

অতসী বললে, 'গোড়াতে শখ করে নিয়েছি বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখতে পারব, এমন মনে হচ্ছে না।'

'গোড়াতেই শেষের কথা বলতে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। একদিন মরব বলে এখুনি কান্না জুড়ে দিই আর কি।'

কিন্তু যা ভেবেছিল, অনার্স ছেড়ে দিল অতসী। বললে, 'পায়ের ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে?'

'তুমিও ছেড়ে দেবে নাকি?' মৃদুলাকে জিজ্ঞেস করল রণেন।

'পরীক্ষা ছাড়তে পারি, কিন্তু পড়া ছাড়ব না।'

'তার মানে?'

'তার মানে যার বুদ্ধি আছে, সে বুঝুক।'

'যার বুদ্ধি নেই?'

'সে শুধু পড়াক।' হাসল মৃদুলা।

বই বন্ধ করল রণেন। বললে, 'আজ এই পর্যন্ত।' তবু মৃদুলা ওঠে না। 'সে কি? বাড়ি যাও এবার।'

'বলেছি তো, পরীক্ষা ছাড়লেও পড়া ছাড়ব না। তার মানে বোকাও বোঝে। তার মানে আপনাকে ছাড়ব না।'

'আজকে তো ছাড়।' চেয়ারে দুদ্দাড় শব্দ করে উঠে পড়ল রণেন।

আরেকদিন, পড়াচ্ছে, রণেন লক্ষ্য করল মৃদুলার পড়াতে কান নেই। গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

'ও কি, শুনছ না?' রণেন ধমকে উঠল।

'না। দেখছি।'

'কী দেখছ?'

'আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো। যেন তারা ফুটছে আকাশে। সত্যি আপনি কী সুন্দর—কথাসুন্দর!'

বই বন্ধ করল রণেন।

'এবার কী দেখছ?'

"শুধু আকাশ।"

দুদ্দাড় শব্দে আবার উঠে পড়ল রণেন। বললে, 'ফাঁকা আকাশে কিছু হবে না, শুকনো মাটি চাই, নিরেট মজবুত মাটি।'

কি বুঝল কে জানে, মৃদুলা পর দিন কাঁদতে বসল।

প্রথমে টের পায় নি, শেষে ফোঁপানির শব্দে চোখ তুলল রণেন। 'এর মানে? কান্না কিসের?'

সানাই আর বাজায় না, শুধু ধানাই-পানাই করে।

শেষে বললে অনেক কষ্টে, 'আমার পড়তে ভালো লাগে না।'

'খুব ভালো কথা। পড়ো না।' বই বন্ধ করল রণেন।

আশ্চর্য, কথার পিঠে একবারও জিজ্ঞেস করলে না, কী ভালো লাগে! মৃদুলা ভাবল, লোকটা কি আকাট?

বরং বললে উল্টো কথা : 'তবে আর বসে আছ কেন?'

'না, উঠব না।' ভীরুতাকে সংক্রামক হতে দেবে না মৃদুলা। দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'কথাটা শেষ করে যাব।'

'হায় হায়, কথার কি শেষ হয়?' একটু কি হাসল রণেন?

'তবু বলতে পারার শেষ হয়।'

'বলো।'

'আমি—আমি—' ঢোক গিলল মৃদুলা, তাকাল উপরে-নিচে। এর চেয়ে বোধহয় বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ। বললে, 'আমি ভালবাসি।'

'অপূর্ব কথা।' এবার কেন কে জানে জিজ্ঞেস করে ফেলল রণেন : 'কাকে?'

'তোমাকে।'

'আমাকে? না, তোমার নিজেকে?'

'তোমাকে।'

'বেশ তো, বাসো না।' যেন কোনও ঝঞ্ঝাটে রাজি নয় এমনি নিস্পৃহভাবে বললে রণেন। 'আপত্তি কি। মনে মনে বাসো। সে বাসায় কোনো দিন বাসি নেই।'

রণেনের পুরনো কথা আবৃত্তি করল মৃদুলা : 'ফাঁকা আকাশে আমি বিশ্বাসী নই, আমি শুকনো কঠিন মাটি চাই।'

'তার মানে?'

'তোমাকে চাই।'

'আমাকে?' আঙুলটা বুকে না রেখে পেটে রাখল রণেন : 'শেষকালে না উলটা বুঝিলি রাম হয়! চড়বার জন্যে ঘোড়া চেয়েছিল, বইবার জন্যে ঘোড়া পেল।'

'বেশ, বইবই সারা জীবন। কিন্তু ঘোড়া যদি আমাকে চায় তবে সে কাঁধে না উঠে নিজেই আমাকে পিঠে তুলে নেবে।'

'তার মানে শুধু তোমার একার চাওয়াতেই হচ্ছে না।' রণেন তাকাল স্থির চোখে।

'না, আমার একার চাওয়াতেই হবে। কেননা তুমি আমাকে চাও এও যে আমারই চাওয়া।'

'তবে হরেদরে, আমারও একটা চাওয়া আছে?'

'আছে।'

'তবে এই আমি চাই যে তুমি আর এসো না।' দরজার দিকে মুখ করল রণেন।

কিন্তু এই উপেক্ষার অর্থ কী? ব্রহ্মচর্য না অপৌরুষ? না কি নিষ্ক্রিয় নির্বুদ্ধ মূর্খতা!

যেচে প্রেম হয় না, নেচেও হয় না হয় তো, কিন্তু নিয়ত প্রযত্নে কী না হয়? মাটির কলসী রাখতে-রাখতে পাথর পর্যন্ত ক্ষয়ে যায়।

'এ কি, তুমি আবার এসেছ কেন?' ঘরের মধ্যে মৃদুলাকে দেখে বিরক্ত হল রণেন।

'পড়তে আসি নি। যেটুকু পড়িয়েছ তাতেই পুড়িয়েছ যথেষ্ট।' সাহসে ঝলমল করতে করতে চেয়ারে বসল মৃদুলা। 'তোমাকে একটু দেখতে এসেছি। যাকে ভালবাসা যায় তাকে একটু দেখাও কি দোষের?'

'ভালবাসা কি দূর থেকে হয় না? দেখতে চাও তো রাস্তা থেকেও তো দেখা যায়। এত কাছে এসে উপরপড়া হবার দরকার কি।'

'রণেন, আমার প্রেম অতীন্দ্রিয় নয়, রতীন্দ্রিয়। তুমি কেন আমাকে চাইবে না? আমি কি এতই বাজে, এতই কুচ্ছিত?'

'কে তা বলছে?' ঢোক গিলল রণেন : 'কিন্তু আমার ভালবাসা ঐশ্বরিক।'

'ঈশ্বর-ফিশ্বর মানি না।'

'ঈশ্বর না মানলেও ঐশ্বরিক প্রেম মানা যায়।'

'বাজে কথা। আমি জানি তুমি ওসব মানো না। তুমি সাফল্য চাও, সংসার চাও, সন্তান চাও। আমি—আমিই সব দিতে পারব তোমাকে।'

'কিন্তু আপাতত শান্তি চাই।'

'তুমি যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও আমি মরে যাব।'

'মরেই যদি যাবে, এ দেহায়তন ভোগ করবে কি করে? মন্মথের মন মন্থন করবে কি করে? যাও পরীক্ষার বেশি দেরি নেই।'

মরলও না ফিরলও না মৃদুলা। চিঠি ছাড়তে লাগল। উত্তর দিল রণেন। কিন্তু সে উত্তর আর কিছুই না, পুঞ্জীকৃত ঔদাসীন্য। পিণ্ডীকৃত হিতকথা।

হামাগুড়ি দিয়ে পালানো যাবেনা, দু পায়ে ছুটতে হবে। রণেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এল কলকাতা। ঠিক করল শেষ পরীক্ষা এম-এটা দিয়ে ফেলি।

হাতে রেস্ত কিছু ছিল, সস্তায় না গিয়ে হোটেলে এসে উঠল, একটা একক ঘরে।

কি আশ্চর্য, এখানেও পিছু নিয়েছে মৃদুলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, ধরতে পারে না কিছুতেই। রণেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, পিছলে-পিছলে সরে পড়ে।

টেলিফোন বেজে উঠল হোটেলের। রণেনবাবুকে চাই।

'কে?'

'আমি মৃদুলা। চিনতে পার?'

'পৃথুলা হলে চিনতাম। আরেকটু যদি বিস্তৃত হও।'

'আমি তোমার ছাত্রী গো—'

'ও! চিনেছি। কি ব্যাপার?'

'আমি কিছু বলতে চাই তোমাকে।'

'বল।'

'ফোনে সে সব কথা হবার নয়। একবার যেতে পারি হোটেলে?'

'ফোনে যে কথা বলা যায় না তেমন কোনো কথা নেই তোমার সঙ্গে।' রিসিভার রেখে দিল রণেন।

'আছে।' সেটা মৃদুলা নিজে বললে নিজেকে শুনিয়ে।

সটান সেদিন হোটেলে গিয়ে হাজির। পূর্ণ বাক্যের শেষে শান্ত একটা দাঁড়ি হয়ে নয়, ভাঙা বাক্যের মাঝখানে উদ্ধত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে।

চারপাশ মোলায়েম দেখাবার জন্যে রণেন প্রশ্ন করল : 'কি, কোন বই-টই চাই? খাতা পত্র?'

'না, ওসব কিছু চাই না। আমি ছাত্রী নই,' মুখে একটি প্রশস্ত হাসি মেলে ধরল মৃদুলা : 'আমি দাত্রী।'

মুখচোখ গম্ভীর করল রণেন। বললে, 'শোন, কে কী ভাববে সেটা শোভন হবে না। যা সমীচীন নয়, ছন্দোময় নয়, তা সুন্দরও নয়। রাত হবার আগেই গা-ঢাকা দাও।'

তবু সেদিন শুনেছিল, গা ঢাকা দিয়েছিল মৃদুলা।

আজ আর শুনবে না।

কেন, কেন এত উপেক্ষা, ঔদাসীন্য, এত প্রত্যাহার? শুধু ছন্দই সুন্দর? উচ্ছৃঙ্খলতা সুন্দর নয়? মেঘই মনোহর? ঝড় মনোহর নয়?

কেন, কেন রণেন জাগবে না? উঠে দাঁড়াবে না? এক স্তূপ বসনের মত বুকের মধ্যে কেন নেবে না আঁকড়ে? ও যেন একটা খেলা পেয়েছে। কিছুতেই বক্র হবে না, বিকৃত হবে না, নিষ্কলঙ্কিত থাকবে, এই এক কৌতুককর খেলা। হঠপূর্বক হটানো। ডাক্তার অস্ত্র করছে করুক, চেঁচাব না, এই এক বাহাদুরি। নিজের নির্দয়তায় নিজের কাঠিন্যে এ এক রকমের মুগ্ধতা। মুগ্ধকে মত্ত করতে হবে, মুক্ত করতে হবে।

সমস্ত ত্রুটি মৃদুলার নিজের। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি নয়, আঙ্গিকের ত্রুটি।

পায়ের নিচের মাটিতে দেবে না সে আর ঘাস গজাতে। আঁকড়ে ধরবে সময়ের ঝুঁটি। লজ্জা যদি শক্তি, নির্লজ্জতাও শক্তি। আবরণ যদি শক্তি, উন্মোচনও শক্তি।

কী রহস্য, কেন তপ্ত হবে না, ভ্রান্ত হবে না, স্খলিত হবে না?

শুধু জানিয়ে সুখ নেই, জাগিয়ে সুখ।

ঘর খোলা। ভিতরে রণেন আছে?

আছে।

আর কিছু প্রশ্ন করবার নেই। স্বতঃসিদ্ধের মত ঢুকে পড়ল মৃদুলা।

দরজায় খিল চাপাল। যেন আততায়ী তাড়া করছে ছুরি হাতে তেমনি ভয়ার্ত চেহারা।

'একি, এত রাত্রে? এই ভাবে?' ছাইয়ের মত মুখে বললে রণেন।

'এই ভাবে না হলে কিছু হবে না। আর ইনিয়ে-বিনিয়ে নয়, আমি এবার ছিনিয়ে নিতে এসেছি। গায়ের জোরে জিততে এসেছি এবার। গায়ের জোরে—যৌবনের জোয়ারে—'

'কিন্তু না, এ হয় না।' চারদিকে শূন্যচোখে তাকাতে লাগল রণেন।

'আমি বলছি, হয়।'

'হয়? কিন্তু আমি, আমি কী করব, আমি কী করতে পারি?' মহাজনের কাছে খাতকের মত দুর্বল অসহায় রণেন।

'তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। বন্যতম, ভদ্রতম, যা তোমার খুশি। আমাকে ধর মার কাট পিষে ফেল, পুলিসে ধরিয়ে দাও—নয়তো ঘুম পাড়াও, বুকে করে রাখ। একটা কিছু কর আমাকে নিয়ে।'

এক ঢেউ সমুদ্র যেন গন্ডূষে নিঃশেষ হতে এসেছে।

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল রণেন। কাশতে লাগল। এ কী কাশি! কাশি হল কবে? এ কি, যেন থামতে চায় না—

টেবিলের তলা থেকে একটা বাটি তুলে নিয়ে নিজের মুখের কাছে ধরল রণেন। টাটকা রক্ত উঠল খানিকটা।

'একি, রক্ত?' এক পা পিছিয়ে গেল মৃদুলা। 'কী হয়েছে, তোমার?'

সমুদ্র কি পুকুর হয়ে গেল মুহূর্তে?

'আমার টি-বি হয়েছে।' নেতিয়ে পড়ল রণেন।

'আহা-হা, কি ভয়ানক, শুয়ে পড় শুয়ে পড়।' আকুল হয়ে উঠলো মৃদুলা : 'তোমাকে তো তাহলে খুব ডিস্টার্ব করলাম। ছি-ছি।'

পুকুরটুকুনও কি বুজে গেল আস্তে আস্তে?

'তুমি বিশ্রাম কর, সকালে ডাক্তার ডেকো—কে দেখছে? আমি বলি কি, কলেজ-টলেজ ছেড়ে দিয়ে বাইরে কোথাও চেঞ্জে যদি যাও দিন কতক—'

আস্তে-আস্তে বার হয়ে গেল মৃদুলা।

হস্টেলে ফিরে এসে নিজের বিছানায় নিঃস্বত্বের মত পড়ল হুড়মুড় করে।

অতসী হকচকিয়ে উঠল। প্রশ্ন করল : 'কি রে, চলে এলি?'

চলে এসেছে তো বটেই, এটা আবার প্রশ্ন কি! প্রশ্নটা এবার চোখা করল অতসী : 'কি রে, পেয়ে এলি?'

উত্তর দেয় না।

'কি রে, সর্বস্বান্ত হয়ে এলি?'

'মোটেই না। পড়তে পড়তে সামলে এলাম।' হাঁপধরা লোক যেন হাওয়ায় চলে এসেছে এমনি স্ফূর্তি এখন মৃদুলার : 'হারাতে-হারাতে জিতে

এলাম সর্বস্ব। লোকটার টি-বি। অত কাব্য করে বলবার কী হয়েছে? যক্ষ্মা।'

'তাই। তাই ওই ঢঙ, ওই বীরত্বের ছদ্মবেশ। দাঁত নেই বলে মাংস ছাড়া। তাই ঐশ্বরিক প্রেম, বেদান্তের বুকনি। কাঁধে মোহমুদগর নিয়ে ব্রহ্মচারী সাজা। কিছুতেই আমি টলি না নড়ি না, আমি অনতিক্রম্য—এই অহঙ্কারের ঝিলিক দেওয়া।'

'বেঁচে গিয়েছি। খতম হই নি, ফতুর হই নি। আস্তসমস্ত আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁকে না মানলেও তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

কদিন পরে অতসী বললে, 'জানিস আমার বিয়ে।'

'মাইরি?' খুশিভরা চোখে জিজ্ঞেস করল মৃদুলা : 'বাগানো না লাগানো?'

'আমরা কি বাগাতে পারি? আমাদের ভাগ্যই লাগিয়ে দেয়।'

'কাকে করছিস?'

'আবার ব্যাকরণ ভুল করলি। করছি না রে, হচ্ছে।'

'কার সঙ্গে?'

'তোর রণেনের সঙ্গে।'

'সে কি? সর্বনাশ! ওর তো টি-বি—'

'না। ওটা ওর নড়া দাঁতের রক্ত।'

'নড়া দাঁত?'

'হ্যাঁ, প্রেম পরখ করবার কষ্টি।' বললে অতসী, 'একটা সত্যকে যাচাই করবার রক্তাক্ত মিথ্যে।'

৪। আরোগ্য

কেউ-কেউ দিব্যি লাফিয়ে ডিঙিয়ে পালিয়ে যেতে পারল। কেউ কেউ পারল না।

সরল কি করে পারবে? একে সে রুগী, তায় তার হাতে আবার জিনিসপত্র। জিনিসপত্র না থাকত কিংবা জিনিসপত্র পারত ছুঁড়ে ফেলে দিতে, তবে একবার না হয় চেষ্টা করত ছুটতে, ছিটকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু হাত থেকে জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া যা, নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণটা ফেলে দেওয়াও তাই।

তা ছাড়া একটা কনস্টেবল বিশেষ করে ওকেই তাড়া করেছে। কতক্ষণ ছুটবে! জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সারা গা।

'হাতে কী ওসব?' ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করল।

বাড়িয়ে ধরল সরল। জিনিসপত্রই বটে। জিনিসের মধ্যে একটা দাগ আঁটা ওষুধের খালি শিশি আর পত্র বলতে একটা হাসপাতালের আউট-ডোরের টিকিট একখানা।

'কিন্তু ট্রেনের টিকিট কই?' রুখে উঠল ম্যাজিস্ট্রেট।

'কোত্থেকে কিনব?' ছেঁড়া শার্টটা তুলে বুকের জিরজিরে কখানা পাঁজরা দেখাল সরল।

ওদিকে না তাকিয়ে মুখের দিকে তাকাল ম্যাজিস্ট্রেট। বললে, 'এই তো সামান্য বয়স। কত আর হবে? বড় জোর চৌদ্দ-পনেরো। এরই মধ্যে চুরি করতে শুরু করেছিস?'

'চুরি!' সরল যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'চুরি নয় তো কি! চুরি-জোচ্চুরি একসঙ্গে।' বললে ম্যাজিস্ট্রেট, 'ট্রেনের টিকিট না কেটে কোম্পানিকে ঠকিয়ে তোমার দেশবিদেশ বেড়াবার জন্যেই রেলগাড়ি করা হয়েছে—তাই না? বলে কিনা কোত্থেকে কিনব। কেনবার পয়সা না থাকে হেঁটে আয়। বলি, আসছিস কোত্থেকে?'

'চন্দনপুর থেকে।'

'জায়গার নামের তো দেখি বাহার আছে। কিন্তু চন্দনপুরের লোক চন্দন না হয়ে হয়েছে দেখি কন্টিকারি।' হাসল ম্যাজিস্ট্রেট। উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললে, 'চন্দনপুর ক মাইল হবে এখান থেকে?'

'ছ-সাত মাইল।'

'ছ-সাত মাইল হাঁটতে পারিস না?' ম্যাজিস্ট্রেট সরলের দিকে আবার তিরস্কারের তীর ছুঁড়ল।

'কী করে হাঁটব? হাঁটতে গেলে, পরিশ্রম করতে গেলেই কাশি ওঠে আর কাশি উঠলেই—' একটা কাশি আসছিল, অনেক কষ্টে তাকে যেন দমন করল সরল।

'তা হলে পরিশ্রম না করলেই হয়। বাড়ি থেকে না বেরুলেই হয়।' ম্যাজিস্ট্রেট একটু বা বিদ্রূপের সুর আনল। 'দয়া করে না চড়লেই হয় পরের গাড়িতে।'

'তা না হলে হাসপাতালে যাব কি করে? কি করে তবে রোগের চিকিৎসা হবে? দেখছেন না আউটডোরের এই টিকিট? সাতদিন অন্তর যেতে হয়। তা না হলে চলবে কেন? রোগ ভালো করতে হবে তো? কতদিন থেকে লেখাপড়া বন্ধ।' হতাশায় মুখ ম্লান করল সরল। 'কিন্তু কতদিন ধরেই তো যাওয়া-আসা করছি, কিছুতেই উপকার হচ্ছে না।'

'অসুখ হলে তো উপকার হবে। এ-তো সুখ!' কাষ্ঠ মুখে মুচকে হাসল ম্যাজিস্ট্রেট। 'দিব্যি বিনা টিকেটে রেলগাড়িতে হাওয়া খাওয়া।'

একটা বিচ্ছিরি কাশি উঠল সরলের। হন্তদন্ত ক্লান্ত হয়ে একদলা গয়ার ফেলল মাটিতে। যখনই অমনি ফেলে, সুতীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে,

ঠিক দেখবে সেই সুস্পষ্টকে, অবধারিতকে। হ্যাঁ, এখনো তাই দেখল। গয়ারের মধ্যে ঠিক রক্তের চিহ্ন।

ভীষণ বিরক্ত হল ম্যাজিস্ট্রেট। খসখস করে কাগজে তক্ষুনি অর্ডার লিখে দিল। 'দুই টাকা জরিমানা নয়তো এক সপ্তাহ বিনা-শ্রম জেল।'

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কোর্ট বসেছে। বিনা টিকিটে যারা রেলভ্রমণ করছে তাদের ধরে বিচার করার কোর্ট। হয় বাড়তি সমেত রেলভাড়া দিয়ে দাও, নয়তো শাস্তি ভোগ কর।

সরল কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে, 'জেলে গেলে আমি মরে যাব।'

'বেশ, যেও না জেলে। জরিমানা দিয়ে দাও।'

'কোথায় টাকা! টাকাই যদি থাকবে, তাহলে এই দশা হবে কেন?'

ম্যাজিস্ট্রেট পরের নম্বর আসামীকে নিয়ে পড়ল। 'তুমি কোত্থেকে?'

যতক্ষণ কোর্ট চলল, আতঙ্কে মুখ কালো করে চুপচাপ বসে রইল সরল। কে তার জরিমানার টাকা দিয়ে দেবে? কেউ নেই তার আপনার লোক। এমনও কেউ নেই যে বাড়িতে গিয়ে খবর দিতে পারে তার বাবা-মাকে।

কোর্ট গুটিয়ে উঠে পড়বার আগে ম্যাজিস্ট্রেট বললে, 'দ্যাখ, আমি তোকে ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু আমাকে কথা দে, আর কোনো দিন বিনা টিকিটে চড়বিনা ট্রেন। কি, রাজী?' আগের অর্ডার প্রায় নাকচ করে ম্যাজিস্ট্রেট।

'তা কি করে কথা দিই! আমাকে যে সাতদিন পর পর চিকিৎসার জন্যে আসতে হবে হাসপাতাল! রেলভাড়া কি যোগাড় হবে সব দিন?' সরলতার প্রতিমূর্তি হয়ে বললে সরল।

'তবে গোল্লায় যা।'

কনেস্টবল সরলকে জেলে জিম্মা করে দিয়ে গেল।

সারা রাত কেশেছে, কেঁদেছে, জ্বরের ঘোরে ছটফট করেছে সরল— সকাল বেলায় ডাক্তারের কাছে খবর গেল।

ওষুধের শূন্য শিশিটা ছেড়ে আসতে হয়েছে, কিন্তু হাসপাতালের সেই টিকিটটা সরল ছাড়েনি। তাই সে বাড়িয়ে ধরল ডাক্তারের দিকে।

এক নজরেই সব বুঝতে পেরেছে ডাক্তার। জিজ্ঞেস করলে, 'কদ্দিনের মেয়াদ?'

'সাতদিন।'

'মোটে সাতদিন।' মুখ বিমর্ষ করল ডাক্তার। 'সাত দিনে কী হবে?'

তবু সাতদিন, তার একদিনই বা ফেলা যায় কেন। ডাক্তার সরলকে জেলের হাসপাতালে ঢুকিয়ে দিল। দামী দামী ওষুধ, ইনজেকশন আর পথ্যের বন্দোবস্ত করল। হ্যাঁ, যত পারিস খাবি। এ অসুখে জ্বরের মধ্যেও খেতে হয়। আর দিল শোবার জন্যে আলাদা বিছানা। 'হ্যাঁ, সমস্তখন শুয়ে থাকবি, বিশ্রাম করবি, একদম হাঁটাচলা করবিনে।'

সাতদিন—যেন সাত রঙে আঁকা স্বপ্নের এক রামধনু! মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

'যাই ডাক্তারবাবু।' ছাড়া পেয়ে হাসি মুখে বললে সরল।

ডাক্তারের মুখ বিশেষ উজ্জ্বল হল না। বললে, 'কেমন আছিস?'

'দেখুন আর জ্বর প্রায় নেই।' হাত বাড়িয়ে দিল সরল। 'কাশিটাও কম পড়েছে। যা ইনজেকশান দিচ্ছিলেন, জ্বর-কাশি ভয় পেয়ে গেছে—'

'কিন্তু সাত দিনে কী হবে?' হতাশ মুখে বললে ডাক্তার।

'যখন একবার কমের দিকে গেছে তখন আস্তে আস্তে সেরে উঠব এবার।' যেন ডাক্তারকেই প্রবোধ দিচ্ছে এমনিভাবে সরল বললে, 'এতদিন তো ভুলেও কমের দিকে যায়নি কখনো।'

ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'কিন্তু এ কি সাত দিনের লড়াই?'

আবার বিনা টিকিটে রেলভ্রমণের দায়ে ধরা পড়েছে সরল।

'কোত্থেকে আসছিস?' জিগগেস করল ম্যাজিস্ট্রেট।

'সত্যি বলছি চন্দনপুর থেকে।' বললে সরল।

'দু টাকা জরিমানা নয়তো সাতদিনের অশ্রম জেল।' সঙ্গে সঙ্গেই অর্ডার দিল ম্যাজিস্ট্রেট।

'এ আমার দ্বিতীয় অপরাধ স্যার।' হাত জোড় করল সরল। 'সুতরাং আমার শাস্তি বেশি হওয়া উচিত। প্রথমবারে আমার মোটে সাত দিনের জেল হয়েছিল। এবার অন্তত একমাসের হলে ঠিক হয়।'

হাসল ম্যাজিস্ট্রেট। বললে, 'শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ আসামীর কথা মত হবে না। কোর্ট ঠিক করবে। কম বেশি কোর্ট বুঝবে।'

জেলে ডাক্তারকে প্রণাম করল সরল। বলল, 'আরো সাতদিনের জন্য এলাম।'

'মোটে সাতদিন। ডাক্তার উদাসীনের মত বললে, 'সাতদিনে কি হবে?'

তবু যতটুকু হয়! যতটা ইনজেকশান দেওয়া যায়, খাওয়ানো যায় দুধ ঘি, মাছ মাংস, আপেল বেদানা। যতক্ষণ রাখা যায় শুইয়ে।

'কেমন আছিস?' ছাড়া পেয়ে যখন চলে যাচ্ছে ডাকিয়ে জিগগেস করলেন ডাক্তার।

'জ্বর আর নেই। হয় না। শুধু কাশিটা—'

'এ কি সাত দিনের ব্যাপার?' অন্যদিকে মুখ ফেরাল ডাক্তার।

বিনা টিকিটে তৃতীয়বার যখন ধরা পড়ল তখন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে সরল বললে, তেহট্ট থেকে আসছি। এখান থেকে তেহট্ট প্রায় তের মাইল, চন্দনপুর থেকে আরো ছ-মাইল। তবে এবার শাস্তি বেশি না দিয়ে যাও কোথা।

শাস্তি বেশি হল বৈ কি। চার টাকা জরিমানা নয়তো দুই সপ্তাহের অশ্রম জেল।

'এবার কদ্দিন?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'এবার চোদ্দ দিন।' সরল বীরের মত বললে।

'এবার বাড়ল কী করে মেয়াদ।'

'বেড়ানোর দৌড়টা বাড়িয়ে দিলাম। ছ-সাত মাইলে সাতদিন করে হচ্ছিল এবার তেরো মাইল করে দিলাম।' খুব একটা কৃতিত্ব করেছে এমনি ভাব দেখিয়ে, প্রায় বুক ফুলিয়ে বললে সরল। 'আগে আগে চন্দনপুর থেকে আসছিলাম আজ আসছি তেহট্ট থেকে।' বলে হাসতে লাগল মুখ লুকিয়ে।

কিন্তু সে হাসির লেশটুকুও রইল না যখন দেখতে দেখতে কেটে গেল চৌদ্দদিন।

ডাক্তার বললে, 'খুচরো-খাচরা করে চিকিৎসা করলে কি চলে! চাই লম্বা একটানা চিকিৎসা। আর সেই সঙ্গে ঢালা বিশ্রাম। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘোরাঘুরি করবি, ওষুধ পথ্য আর চলবে না, যেটুকু এ কদিনে উন্নতি করেছিলি সব নস্যাৎ হয়ে যাবে। আবার যে রোগ সেই রোগ।'

'তবে এর উপায় কী?' দুই চোখে অন্ধকার পুরে জিজ্ঞেস করল সরল।'

'উপায় বড়লোক কাউকে ধরে কোনো হাসপাতালে ঢুকে পড়া।'

'তেমন লোক কোথায় পাব বলুন। আজকাল তো ভগবানও গরিবকে ছেড়েছে। আর সরকারী হাসপাতালের নমুনা তো দেখছেন, এই অসুখেও ফিভার মিকচারের বেশি ব্যবস্থা নেই।'

ডাক্তার হাসল। বললে, 'নইলে আরেক উপায় জেলে চলে আসা। এখানে দেখতে তো পেলে কেমন ব্যবস্থা।'

'তাই তো দেখলাম। নিরপরাধ রুগীর চেয়ে অপরাধী রুগীর খাতির বেশি। যে পাপ করেছে সে বাঁচবে, যে পাপ করেনি সেই মরবে তিলে তিলে।' কান্নাছলছল মুখে বেরিয়ে গেল সরল।

কিন্তু তার মুখ গর্বে ভরে গেল যখন সে দেখল ট্রেনের কামরার প্যাসেঞ্জারের জামার পকেট থেকে মনি ব্যাগটা দিব্যি সে সরাতে পেরেছে। ভেবেছিল পারবে না কিছুতেই, হাতের আঙুল আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। কিন্তু না পারলে চলবে কেন? তাকে রোগমুক্ত হতে হবে। আর সেই রোগমুক্তির সম্ভাবনা একমাত্র জেলে গেলে।

আনাড়ি তাই সহজেই ধরা পড়ল সরল।

'তুই নিয়েছিস ব্যাগ?'

সরল কোন কথা বলল না, ব্যাগটা বার করে দিল।

কেউ কেউ মারতে লাগল সরলকে। সরল বললে, 'ব্যাগ তো বার করে দিয়েছি, তবে আর মারছেন কেন? পুলিসে ধরিয়ে দেন, কেস করুন।'

তাতে কি আর মার থামে।

কেউ কেউ মারের বিপক্ষে দাঁড়াল। 'ছেলেটা তো বোকা, প্রায় সেধে ধরা দিল। নইলে ও তো হাত থেকে নিচে ফেলে দিতে পারত ব্যাগটা। এমন কি, জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে পারত বাইরে।'

মার-খাওয়া করুণ মুখে তাকাল সরল। আমি ত ধরা পড়তেই চাই। ধরা না পড়লে আমি জেলে যাই কী করে।

পরের স্টেশনে পুলিসের হাতে পৌঁছে গেল সরল। আর এবার তার বিচার হল খোলা প্ল্যাটফর্মে নয় পাকা ধর্মঘরে, আদালতে। শাস্তি হলো তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করে, জেলে, ডাক্তারকে সরল প্রণাম করলে। বললে, 'এবারে লম্বা মেয়াদ—তিন মাস।'

'খুব ভালো। খুব ভালো।' সরলের পিঠ ঠুকে দিল ডাক্তার।

'কিন্তু এবার সশ্রম।'

'রুগীর আবার অশ্রম-সশ্রম কী। রুগী রুগী। নে শুয়ে পড়। বিছানা তো রিজার্ভ করাই আছে। লক্ষ্মী ছেলে।'

তিন মাসের চিকিৎসায় অনেক উন্নতি হলো সরলের। ফুসফুসের ফটো তোলা হয়েছে, তাই তাকে বোঝাতে এলো ডাক্তার। এই দ্যাখ, কতটা ঘা শুকিয়ে গিয়েছে, আর শুধু এই একটুখানি আছে।'

'আরো একটুখানি আছে! কই আমি তো কিছু বুঝি না।'

'কী বুঝিস না?

'আমার কোনো অসুখ। জ্বর নেই, কাশি নেই, কেমন সুন্দর ফিরেছে শরীরটা। ওজনে বেড়েছি, হাতে পায়ে এখন কত জোর—'

'ভিতরের ক্ষতিটা সব সময়ে বোঝা যায় না বাইরে থেকে।' ছেলেটার উপর কী রকম মায়া পড়ে গেছে ডাক্তারের. বললে, 'যদি আর কটা মাস সময় পেতাম।'

ছাড়া পেয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন সরলকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, 'কি রে আর ক' মাসের জন্য আসতে পারবি?'

ম্লান হেসে সরল বললে, 'দেখি!'

বাবা-মা ওর চেহারা দেখে ভারি খুশি। কিন্তু মুখভার করে সরল বললে, 'ডাক্তার বলে দিয়েছে দোষ কাটেনি সম্পূর্ণ। আর একবার যেতে হবে।'

বাবা মা প্রবোধ মানল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললে, 'ডাক্তার বাবু যখন বলছেন তখন উপায় কি, শুনতেই হবে। যেতেই হবে তাঁর কাছে।'

কিন্তু ধরা পড়লেই প্রথমে এক চোট মার খেতে হয়। আর যদি মার-ধোর এড়াতে চাও, তাহলে আর ডাক্তারের কাছে পৌঁছানো হয় না।

স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে, প্যাসেঞ্জারেরা নামছে। তখন একজনের পকেট থেকে পার্সটা তুলে নিল সরল।

মুহূর্তে ভদ্রলোক পার্সসুদ্ধু সরলের হাত খপ করে ধরে ফেলল।

সবাই মন্তব্য করল, ছোঁড়াটা বোকা, হাত পাকেনি এখনো। নইলে অমনি করে ধরা পড়ে! হাত যখন ধরল তখন কে আর পার্সটা মুঠোর মধ্যে

রেখে দেয়? মুঠোটা আলগা করলেই তো পড়ে যায় মাটিতে। আমি নিয়েছি তার প্রমাণ কি, নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছে মাটিতে—এমনি কিছু বলা যায় তো স্বপক্ষে! একটা কোলাহল তো তোলা যায়!

ছেলেটা গেঁয়ো, অজবুক।

প্ল্যাটফর্মে পুলিস ছিল বলে মারটা এবার' বিস্তারিত' হতে পারল না। কিন্তু বিচারে শাস্তিটা গুরুতর হলো, দাগী প্রমাণিত হল বলে এবার জেল ছ'মাস।

রেলে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সরল।

'ভাগ্যিস দাগী ছিল।' ডাক্তার তাকে সম্বর্ধনা করলে। বললে, 'ওসব দাগ দাগ নয়। তুই তো আর ইচ্ছে করে ওসব করছিল না, রোগ সারাবার উপায় হিসাবে ওসব করছিস। যখন রোগ চলে যাবে তখন ওসব দাগও চলে যাবে।'

ছ'মাস পরে দিব্যি পরিচ্ছন্ন সার্টিফিকেট দিল ডাক্তার—সেরে গিয়েছিস। এই দ্যাখ ছবি। বাকি ঘাটুকু শুকিয়ে গিয়েছে। এইবারেই তোর সম্পূর্ণ মুক্তি।' শেষ চলে যাবার সময় ডাক্তার আবার তাকে সংবর্ধনা করল।

কিন্তু ট্রেনে উঠে ভিড়ের মধ্যে সরলের হাত নিসপিস করে উঠল। সে অজবুক, সে আহাম্মক! তার হাত পাকেনি, বোকা না হলে অমনি করে কি কেউ ধরা দেয়।

কই; ধরুক দেখি না এখন। দিব্যি আলগোছে একজনের পকেট সে হালকা করেছে। স্টেশনে ট্রেনটা ভিড়বার আগেই নামতে পেরেছে লাফ দিয়ে।.

অনেক সয়েছে সে অপবাদ, সে অপবাদের থেকেও মুক্তি চাই।

ব্যাগের মধ্যে অনেক টাকা আর কিছু কাগজ পত্র। নোটে রেজকিতে মোট কত টাকা গুনতে বড় লোভ হল সরলের। আলোর একটা নিরিবিলি পোস্ট পেয়ে তার নিচে দাঁড়াল।

নোটগুলো হাতে নিয়ে গুনতে যাবে অমনি একটা কাশি উঠল। মুখ কালো হয়ে গেল আতঙ্কে।

কতদিন কাশির তন্তুমাত্রও ছিল না। বাষ্প মাত্রও না—তবে আবার এ হলো কেন? আশ্চর্য্য, কাশতে কাশতে শ্লেষ্মা উঠে এলো! থুক করে ফেলল মাটির উপর!

যেমন আগে আগে দেখেছে তেমনি বুঝি আবার দেখবে সেই সুস্পষ্টকে, অবধারিতকে। সুতীক্ষ্ন চোখে তাকাল সরল। কিন্তু না, রক্তের ছিটে-ফোঁটাও নেই।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সরল। সত্যই তার অসুখ সেরে গিয়েছে, সত্যই আর তার ব্যাধি নেই।

নেই? সেরে গিয়েছে।

চুরিকরা মনি ব্যাগটার দিকে তাকাল সরল। এ আর এক নতুন ব্যাধি কি তাকে ধরল না? এক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে পড়ল নাকি আর এক ব্যাধির কবলে?

এই নতুন ব্যাধি থেকে কে তাকে ত্রাণ করবে?

আবার কি একটা কাশি উঠছে?

না। কাশি নয়, কিছু নয়। তার সব রোগ নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

ব্যাগের কাগজপত্রের মধ্যে মালিকের ঠিকানা পেল। পরদিন সমস্ত টাকাটা মালিকের নামে মনি-অর্ডার করে দিল।

কুপনে লিখল :

ধন্যবাদ। আমার আর চুরি করার দরকার নেই।

৫। ঘোড়া

গরু কুঁড়ে। চাষাও কুঁড়ে। তবু ফলন হল অজস্র।

কেন হল কে বলবে। দৈবব্যাঘাত ছিল না, তবু এই মেহনতে গত সন আট আনা ফসলও হয়নি। আকাশ ও মাটির একেক সময় কি-একটা অজানা বনিবনা হয়। ধান আসে অফুরন্ত।

গত যুদ্ধে পাটের বাজার পড়েছিল। এবার ধানের।

ওবারকার বাজারের নাম ছিল বড় বাজার, এবারকার পাগলা বাজার।

ওবার টাকা নিয়েছিল লোকে পুঁটলিতে বেঁধে, গেঁজেয় বা থলেতে-খুতিতে। এবার ধামায় করে। কেউ-কেউ বা বলে, এক ডোঙা টাকা। নৌকার মাল-খোপে টাকা বোঝাই।

কাগজের টাকা। মাটির তলায় পুঁততে পারে না। উড়িয়ে দিতে হয় হাওয়ায়।

জবান খাঁ বললে, 'এবার করি কি?'

এক বিবি ছিল আলেকজান। আরো দুটো বিয়ে করল, খোসজান আর তুষ্টু বিবি। মামলা বসাল কয়েক নম্বর।

'তার পর?'

আরো জমি কনতে চাইল। জমি তো মাটি নয়, বুকের মাংস, তাই সহজে কেউ ছাড়তে চায় না। তবু এরই মধ্যে পাওয়া যায় হাভাতে চাষা, খোরাকির ধান যার ঘরে নেই, খাজনা যে টানতে পারে না, পেটের অভাবের জন্যে যে ভিটে-জমি কবালা করে।

তার পর?

কোশ নৌকো হয়েছে একখানা। ডাবা হুঁকোর বদলে গড়গড়া। টিনের ঘর। মাটির হাঁড়িকুঁড়ির বদলে এলুমিনিয়মের বাসন। ডেকচি-ডাবোর।

তবু মন ওঠে না।

টাকা আছে, তবুও শান্তি নেই। নাম ছাড়া টাকা হচ্ছে, গরু আছে তো হাল বয় না। আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল।

খাদেম বলে, 'আছে টাকা না হয় নাম, তাকে দুনিয়ায় কেন পাঠালাম।'

'গাঁয়ের ইস্কুলে কিছু টাকা দাও।'

তার বাড়ি থেকে ইস্কুল পাঁচপো পথ। সেখানে চাঁদা দেবে না হাতি! ইস্কুল তার বাড়ির খোলায় এসে বসত, দিত কিছু। যদি 'মেম্বট' হতে পারে, খসাতে পারে না-হয় দু'-পাঁচশো। শুধু-শুধু খয়রাতি করতে পারে না।

'টিউবওয়েলটা খারাপ হয়ে গেছে, ওটা সারিয়ে দাও।'

আমার বাড়ির কাছে টিউবওয়েল হত, সারিয়ে দিতুম। লোকে বলত, কোথাকার টিপকল? না, জবান খাঁর বাড়ির বগলে। এখন ওটা 'পিসিডিনের' বাড়ির নগিজে। সে দিক টাকা।

'পাইকহাটির সাঁকোটা ভেঙে গেছে। টাকা দিন, একটা পাকা পুল তুলি।'

'অপারগ, স্যার। আইন করে পুলের নাম 'জবান খাঁর পুল' করে দিতে পারেন? যেমন সব উজবুক চাষা, বলতে বলবে সেই পাইকহাটির পুল। নাম লিখে দিয়ে লাভ কি? পড়তে পারে কেউ?'

তবে করবে কি সে টাকা দিয়ে?

গরু কেন'। অকেজো গরুর বদলে পশ্চিমে ষাঁড়। বসে-খাওয়া গরু আর ঝোলাপেটা ষাঁড়ে দেশ ছেয়ে গেছে। এবার মজবুত গরু তৈরি কর। খালি ধানদুব্বোয় পুজো না করে ভুট্টা-জোয়ার, চুনিভুষি, যই-মটরে পুজো কর। গিনি আর নেপিয়ার ঘাসের চাষ লাগাও। পার তো, তিসি আর মাসকলাই।

খাদেম মুচকি-মুচকি হাসে। বলে, গরু নয় হে, গরু নয়। ঘোড়া।

জবান খাঁর বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

সন্দেহ কি, যারা মানী লোক, তাদেরই ঘরের মুখোরে ঘোড়া বাঁধা। খোরসেদ হাওলাদার ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তার ঘোড়া আছে। যুবরাজ খাঁ পাশ গ্রামের চৌকিদার, তার আছে ঘোড়া। গগনআলি ইস্কুল-কমিটির মেম্বর, তিনখানা গাঁ থুয়ে তার বাড়ি, তার ঘোড়া আছে। অবস্থা ফিরলেই লোকে ঘোড়া রাখে।

জবান খাঁ এখন জোরমন্ত লোক। ঘোড়া না হলে আর মানায় না তাকে। ইষ্টকুটুম্বের কাছে মান থাকে না। প্রজাপুঞ্জ তেমনি ঘাড় ছোট করেই কথা বলে।

তা ছাড়া, খোরসেদের সঙ্গে তার এওজ জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়া। যুবরাজ খাঁর সঙ্গে জামাত নিয়ে তর্ক। গগন আলির সঙ্গে ভোট নিয়ে লাগালাগি।

না, ঘোড়া চাই।

এত দিন দুর্বল ছিল বলেই গরু-মোষের দিকে তাকিয়েছে, এবার ঘোড়ার দিকে নজর পড়ল জবানখাঁর। গরিব বলেই ভোটে জেতেনি, মামলায় জেতেনি। পারেনি ইউনিয়ন বোর্ডে ঢুকতে, পারেনি স্কুল-কমিটিতে, সালিশী বোর্ডে। জনে-জনে টাকা দেবার মত তার মুরোদ ছিল না। এবার এক মুঠে ফেলে দিতে পারে কয়েক শো।

নতুন আরেকটা কমিটি হয়েছে। ফুডকমিটি।

জবান খাঁ এখন ফুডকমিটির মেম্বর।

আর, মেম্বর যখন সে হয়েছে তখন তার ঘোড়া না হওয়া মানে চাপরাশির চাপ না হওয়া।

কিন্তু এ ঘোড়া চড়বার জন্যে নয়, চরে বেড়াবার জন্যে। বাড়ি ফিরিয়ে এনে আড়গড়ায় বেঁধে রাখবার জন্যে। এ ঘোড়া হচ্ছে সম্ভ্রমের সাইনবোর্ড। লোকে বলবে, দরজায় ঘোড়া বাঁধা।

মাঝে-মধ্যে জমিদারের কাছারির মাঠে থোল বসে। তখন ঘোড়দৌড় হয়। খোরসেদ হাওলাদার, যুবরাজ খাঁ আর গগন আলির ঘোড়ার সঙ্গে জবান খাঁর ঘোড়া দৌড়ুবে একদিন।

জবান খাঁ আর চিটে-গুড়-মাখা দা-কাটা তামাক খায় না। সে এখন চালানী তামাক খায়। ফরসিতে টান মারে আর সেই শুভদিনের স্বপ্ন দেখে।

জবান খাঁ হরিছত্রের মেলায় যাবে। সেখানে হাতি ওঠে, ঘোড়া ওঠে, উট ওঠে।

খাদেম সিকদার টন্নি মানুষ। যেখানে দুটো পয়সা মুনাফা আসে সেখানেই নাক ঢোকায়। কার সঙ্গে কার ঝগড়া বাধতে পারে শুধু তারই সুযোগ-সন্ধান দেখে বেড়ায়। এর হাতে দেয় সিঁদকাঠি, ওর হাতে দেয় ল্যাজা। ঝগড়াকে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে নিয়ে যায় মামলাতে। তার পরে চার-দিক থেকে পয়সা লোটে।

খাদেম বলে, 'খোট্টা ঘোড়াতে সুবিধে হবে না, হাল-চাল বুঝতে পারবে না আমাদের। ঢাকার ঘোড়া নিয়ে ব্যাপারীরা এসে পড়বে শিগগির।'

এ সময় আসে বেপারীরা। নানান রকম বেপারী। আসে টিন। মাটির হাঁড়ি-কলসী। কাঁচের চুড়ি, খেলনা-পুতুল। আসে সার্কাস।

ঢাকার ঘোড়া মানে? গাড়ির ঘোড়া? পংখীরাজ?

'আরে না না, রেসের ঘোড়া। প্রিন্স অব আগ্রা।'

আটশো টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনল জবান খাঁ।

দেশময় সাড়া পড়ে গেল। ফুডকমিটির মেম্বর সাহেব ঘোড়া কিনেছে! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। ঢাকার রেসে বাজি মেরেছে কয়েক বার। ছেলেবুড়ো নাছোড়ের মত ঘোড়ার পিছু নেয়। ঘোড়া চললে চলে, থামলে দাঁড়ায়। মেয়েরা মফস্বলে উঁকিঝুঁকি মারে।

জবান খাঁর বুক সাত হাত হয়ে উঠে।

কি তেজী জোয়ান ঘোড়া! কেমন ঢেউ-খেলানো কেশর! ঘাড়ের কেমন জবরদস্ত ঝাঁকুনি!

জবান খাঁর ঘোড়া বলে যেন মনেই হয় না।

'এর একটা নাম রাখতে হয়—'

'না, না, নাম কিসের?' খাদেম বিজ্ঞের মত বলে, 'ওর নাম হলে তো ওরই নাম হবে। আপনাকে তখন চিনবে কে? যখন ও রেস জিতবে, তখন লোকে শুধোবে, কার ঘোড়া? সবাই বলবে, ফুডকমিটির মেম্বট সাহেবের ঘোড়া।'

ঠিক, ঠিক। ঘোড়ার নাম নয়, নিজের নাম। মাজিস্টর সাহেবের লঞ্চ। এস্ডিও সাহেবের আর্দালি। ফুডকমিটির মেম্বট সাহেবের ঘোড়া।

কে ওই যায় মাঠ দিয়ে? গলায় লাল রুমাল বাঁধা, কপালে সিতাপাটি, কে যায় ওই রুপোর ঘণ্টা বাজিয়ে? বা, চেন না ওকে? ও যে ফুডকমিটির মেম্বট সাহেবের ঘোড়া। মেম্বট সাহেবকে চেন না? আরে, আমাদের জবান খাঁ। হাচন আলির বেটা।

আজ শুধু খাঁ। কালকেই খাঁ সাহেব।

ঘোড়া দেখা শেষ হলে সবাই পরে জবান খাঁকে দেখে যায়। গগন আলিদের মত সে ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া কেনেনি। সে কিনেছে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া।

বাছাই-করা সোয়ার আনতে হয়েছে শহর থেকে। নইলে ওকে সামলাবে কে? গগন আলিদের ছাড়া, আবান্ধা ঘোড়া, মাঠে-মাঠে গরু-ছাগলের মত চরে বেড়ায়। ঘাস খায়। জবান খাঁর ঘোড়ার সব সময় সোয়ার থাকে। মুখে দড়ি দিয়ে সেই তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তার মান কত!

কখনো-কখনো ঘোড়া কারুর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। উৎসব লেগে যায়।

মেয়েরা কুলোয় করে চাল খেতে দেয়। বালতিতে করে এখো গুড়ের সরবৎ। যার বাড়ি ঢোকে, সেই কৃতার্থ মনে করে। পীরফকির হলেও এমন হয় না। তদন্তের দারোগার চেয়েও সম্মানী অতিথি।

যদি কেউ একটু ছুঁতে পারে আলগোছে! যদি গায়ে লাগে একটু লেজের হাওয়া।

কার ঘোড়া? ফুডকমিটির মেম্বট সাহেবের ঘোড়া। কার দোহাই? না, মহারাণীর দোহাই।

কিন্তু থোল আর বসে না কোথাও।

জমিদাররা সব নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আর সেই দাব নেই, বাবও উঠে গেছে—পরবী আর দস্তুর, বাটা আর মেহমানি। পুন্নের সময়ও আর সেই দরবার-কারবার বসে না। মেলা-মজলিস এখন সব মিইয়ে গেছে।

তবু ঘোড়া আছে জবান খাঁর।

ছন্নছাড়ার মত মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। ঘাস খায়। ধানক্ষেতে ঢুকে পড়ে।

সোয়ার যে ছিল, মনশুর, সে এখন চাষ-আবাদ দেখাশোনা করে, ভুঁই ভাঙে, বীজপাতার চাতর দেয়। কখনো-কখনো বা পেয়াদা-মির্ধার কাজ করে। তদ্বির-তদারকের মধ্যে মাঝে-মাঝে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঢিমে কদমে হাওয়া খেতে বেরোয়। জিনের বদলে পিঠের উপর একটা দুমড়ানো বালিশ আর লাগামের বদলে দড়ি।

কেউ-কেউ বলে, দৌড় করাও।

মনশুর বলে, এখন কি? যখন থোল বসবে, তখন! বেফয়দা ছুটিয়ে লাভ নেই।

সোয়ার ঘোড়ায় চড়ে, তাই উজ্জ্বল চোখে দেখে জবান খাঁ। বুকের রক্ত মুখের উপর চলকে ওঠে।

তারপর যেদিন ও ছুটবে, ফার্স্ট হবে, সেদিন ওর খুরের বাজনা বাজবে যেন বুকের পাঁজরায়!

কিন্তু কবে ও ছুটবে? কবে হবে ওর নিমন্ত্রণ?

নোনা হাওয়ায় বাত ধরেছে বোধ হয়। খালি চাল খায়, ধান খায়, ঘাস খায়। প্রায় গরুর মত ব্যবহার করে। গেঁতো হয়ে পড়ছে দিন-কে-দিন। গাধা বোটের লস্করের মত। যখন তখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমোয়।

শরীরে যেন সে তেজ নেই, জেল্লা নেই! কেবল খায়। খেতে পেলেই খায়, যা পায় তাই! ক্ষেত-টেত সব তছরুপ করে দিচ্ছে। খেসারি বুনেছিল আউস ধানের সঙ্গে, ফসল পাকবার আগেই সব খেয়ে নিয়েছে। আশ্বিন মাসে খেয়ে নিয়েছে জোয়ার। অঘ্রানে মাসকালাই। মাঘে অড়হর। শুধু কি তাই? করলা, কাঁকরোল, ঝিঙে, সিম, নটে, পুঁই পর্যন্ত সাবাড় করে দিয়েছে। যেন এসেছে দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে।

হিসেব জানে না জনাব খাঁ। খাতা-পত্র রাখে না। তবু, মাঝে-মাঝে হাতড়ে সংখ্যা গোনে। আঁৎকে ওঠে। সে কি এবার ফতুর হয়ে যাবে নাকি?

তবু, মানের জিনিসের উপর সে মান করতে পারে না।

শুধু কি তাই? চাঁট ছুঁড়ে আলোকজানের কোঁক ভেঙে দিয়েছে। খোসজানের দাবনা। তুষ্টু বিবির কোলের বাচ্ছাটাকে চেপটে একেবারে চাটাই করে দিয়েছে।

তবু জবান খাঁ সোরসরাবৎ করেনা। এমন একটা ভাব করে থাকে, যেন বড়লোক হলেই এমনি খেসারৎ দিতে হয়। শুধু সোয়ারকে আড়ালে ডেকে এনে ধমকে দেয়। শাসিয়ে বলে, দরমাহা থেকে জরিমানা যাবে।

সোয়ার ঘোড়াকে নিরালা মাঠে নিয়ে গিয়ে চাবুকের অভাবে চেলাকাঠ দিয়ে পেটায়।

খাবু ঘোড়া তবু ছোটে না। পাছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যা একটু প্রতিবাদের মন্তব্য করে।

যুবরাজ খাঁ তার ঘোড়া বেচে ফেলেছে বড়-শহরের গাড়োয়ানের কাছে।

এখুনি এত অধঃপাতে যায়নি জবান খাঁ। যুবরাজের ঘোড়া প্রায় পাট-খড়ি বনে যাচ্ছিল, ঘোড়া না গাধা চেনা যাচ্ছিল না। জবান খাঁর ঘোড়া দিব্যি নাদাপেটা, অনেক সম্ভ্রান্ত। এখনো বেচে-কিনে সব খেয়ে ফেলার মত তার অবস্থা হয়নি। তা ছাড়া খোরসেদের ঘোড়া আছে, গগন আলির ঘোড়া আছে।

খোসজান আর তুষ্টুবিবিকে সে তালাক দিল, কিন্তু ঘোড়া ছাড়তে পারল না। খোসজান আর তুষ্টুবিবির সঙ্গে গেল তাদের হাঁটানে ছেলে-মেয়ে, কিন্তু থেকে গেল সোয়ার।

এমন সময় ঢোলনছব হল গ্রামে, শহরে একজিবিশন হবে। আর সেই একজিবিশনে হবে ঘোড়দৌড়।

পোদ্দার-সাহা বা ভুঁইয়া-মোল্লাদের থোল নয়, শহরের একজিবিশন। কে কত লম্বা আখ করেছে, কত বড় কুমড়ো বা লাউ, মুলো বা ওল, তার প্রদর্শনী। রেশমী চুল আর পাতলা চাম, বড় পালান আর আঙ্গুলে বাঁট দেখে গরু কেনার নির্দেশ। গরুর দুটো বাঁটের দুধ টেনে নিয়ে আর-দুটো বাঁটের দুধ যে বাছুরের জন্যে রেখে দিতে হবে তার টিপ্পনি। করিম কেমন পড়ে ডিপটি হচ্ছে আর মজিদ কেমন না পড়ে জমি চষছে তার লটকানো ছবি। মুরগির যাতে 'রানিক্ষেত' না হয় তার ইস্তিহার।

আর দুর্ভিক্ষের পর সারি-সারি বেসুমার খাবারের দোকান। তেলে-ভাজা থেকে সুরু করে মাংস-পোলাও। সোডা-লেমনেড। তা না হলে লোকে আসবে কেন? ফুর্তির জিনিস না রাখলে জনশিক্ষা হবে কেমন করে?

তড়ে-নৌকায় লোক আসতে লাগল দলে-দলে। দেখবে কোন সাহেবের ঘোড়া জেতে। পান্তা-পোড়ার বেশি খায় না কোনদিন, এবার খাবে কিছু ঝাল-ঝাল মিষ্টি-মিষ্টি সুগন্ধি রান্না। তারপর রাত্রে জারি শুনবে, গাজি ও কালুর গান, কিংবা এজিদবধের পালা।

এতদিনে দিন এল জবান খাঁর। দিন এল আরো অনেক ঘোড়াওলার।

এক লপ্তে ফাঁকা মাঠ পাওয়া গেছে প্রকাণ্ড। শুধু মানুষের মাথা। শুধু ডাক-চীৎকার। শুধু উত্তাল ভিড়ের মধ্যে একে-ওকে ডেকে বেড়ানো।

আবাদে গরু উদোম হয়, এখানে মানুষ।

গলায় রুমাল-বাঁধা ঘোড়ারা দাঁড়িয়েছে দড়ি-সই হয়ে। পিঠের উপর কোল-বালিশ চেপে সোয়ার ব'সে। হাতে দড়ির লাগাম। বাঁশি দিলেই ছুটবে—ছুটবে তুফানের মত।

ঘোড়া ছোটে, সঙ্গে-সঙ্গে লোকও ছোটে।

সোয়ারদের একেকজন ঠ্যাঙাড়ে থাকে, ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে ঘোড়ার পাছায় ঠ্যাঙার বাড়ি মারে। তাতেই ঘোড়াকে প্রেরণা দেয়া হয়, তার ছোটায় চাড় আসে। বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ পাছার উপর ঠ্যাঙার বাড়ি। ঢিমিয়ে-পড়া ঘোড়া আবার টগবগিয়ে ওঠে।

জবান খাঁও অনেকটা মাঠ ছুটে এসেছিল, কিন্তু ভিড়ের চাপে হারিয়ে ফেলল নিজেকে।

শুনল, এ অঞ্চলের কেউ নয়। কোন এক রহিমদ্দি পালোয়ানের সাজোয়ান ঘোড়া ফার্স্ট হয়েছে। বাড়ি সুপখালি। অনেক দূর।

আর জবান খাঁর? জিগগেস করল একটা উটকো লোককে।

বললে, সোয়ারকে মাঝ-মাঠে ফেলে দিয়ে ঢুকেছে পাশের কলাইয়ের ক্ষেতে। ঠ্যাঙাড়ের বাড়ি ঘোড়ায় পাছায় না পড়ে পড়েছে প্রায় মনশুরের পিঠে, তাইতেই এই কেলেংকারি। কিন্তু জবান খাঁর জামাতের লোকেরা তা মানতে চায় না। বলে, বড় বেশি চাল খায় ও। তাই অমন ভেতো হয়ে পড়েছে। ওকে চানা খাওয়াও। বজরা-জোয়ার খাওয়াও।

ঘোড়াকে এনে আবার দোরগোড়ায় বাঁধা হল। গলায় সেই শুকনো রুমাল, মেডেল ঝুলছে না তার সঙ্গে, তবু কিছু মনে করেনি জবান খাঁ। দেখা যাবে পরের বার। একবারে একজনের বেশি তো ফার্স্ট হবে না। খোর-সেদ-গগন আলি তো পায়নি।

ঘোড়াকে আর মাঠে ছেড়ে দেওয়া নয়। পোষ্টাই খাওয়াতে হবে। ছন্নছাড়ার মত আর ঘাস-পাতা নয়।

ফুডকমিটির হাতে কয়েক শো বস্তা বজরা এসেছে। লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে যাবার পর গুদামে বসে পচছিল অনেক দিন। সেগুলি এবার সাফ করে দেয়া দরকার। পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে নয়, টেন্ডার নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে। অর্ডার হয়েছে, পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করতে পার, কিন্তু, খবরদার, মানুষের খাদ্যরূপে নয়।

কত মানুষ পশুরও অধম হয়ে মরে গেছে তার লেখাজোখা নেই।

জবান খাঁ কিনলে কয়েক বস্তা। মজুত করলে।

বালতি বোঝাই করে খেতে দিল ঘোড়াকে। কতদিন মাঠের টাটকা শাক-সবজি খেতে পায়নি, ঘোড়া অশ্বগ্রাসে খেতে লাগল।

কিন্তু খাবার পর, নাকের মধ্য দিয়ে কতগুলি শব্দ করে ও কতক্ষণ ঘন-ঘন লেজ নেড়ে, মশা তাড়িয়ে, কি হল তার কে বলবে। পাগলের মত হয়ে গেল। প্রায় হনোর মত। দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটতে লাগল বেমক্কা। মনশুর তাকে ধরতে গেল, কাঁধের উপর কামড়ে দিলে। জবান খাঁকে দেখতে পেয়ে মারলে দু'পায়ে চাঁট ছুঁড়ে। গাছের সঙ্গে ঠোক্কর লেগে মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। কারু সাহস হল না এগিয়ে যায়। খানা-খোদল পেরিয়ে ছুটছে, ফিরছে, আবার কান্নিক খাচ্ছে। মাটিতে শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল বেহুঁসের মত।

সবাই বললে, শূল হয়েছে। অশ্বশূল।

তড়পে-তড়পেই মরবে এবার।

টান্নি বললে গলা নামিয়ে, 'নিশ্চয়ই কেউ বিষ খাইয়েছে। নিশ্চয়ই এ

নশুরের কাণ্ড। মনশুর খোরসেদের চাচাত বোনাই, গগন আলির ফুফাত
াই। যাই আমি শহর থেকে পশু-ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। তার
াপোর্ট পেলেই ড্যামেজের মামলা ঠুকে দিতে হবে এক নম্বর—'

পঞ্চাশ টাকা কবুল করে পশু-ডাক্তারকে নিয়ে আসা হল। কিন্তু তত-
ণ ঘোড়া শেষ পগার পেরিয়ে গেছে।

সবাই বললে, 'নদীতে ভাসিয়ে দাও শালাকে।'

জবান খাঁ বললে, 'না, মাটি দেব। ওকে আমি অসম্মানী হতে দেব না।'

খোঁড়াতে-খোঁড়াতে গেল সে কবরখানায়। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাড়ি ফিরে
া। অন্ধকারে শুনল একটা গরু ডাকছে বাড়ির মধ্যে।

৬। ছাত্রী

ালো-না-জ্বালা বাইরের ঘরে বসে একা-একা মদ খাচ্ছে শিবতোষ। পর্দার
ইরে কার ছায়া দুলে উঠতেই জিগগেস করলে : 'কে?'

'আমি।'

'ভেতরে আসুন।'

বিমান ঘরে ঢুকল।

'ও! আপনি?' কন্ঠস্বরের তাপ জুড়িয়ে গেল নিমেষে। দরজার
কে তাকিয়ে বললে, 'যান, উপরে যান। মানসী আছে তো?'

'থাকবার তো কথা।'

'কিন্তু গিয়ে হয়তো দেখবেন, বাড়ি নেই, সিনেমায় গিয়েছে।'

'তা হলে, মন্দ কী, ফিরে যাব। মাগনা একদিন ছুটি মিলে যাবে।'

'হ্যাঁ, তা যাবে। কোনো উপায় নেই।' সিগারেটে টান দিল শিবতোষ।
ী পড়াচ্ছেন?'

'জুলিয়স সিজর।'

'ভালো। পড়ান। ভালো করে পড়ান। একমাত্র মেয়ে—মেয়ে কী,
কমাত্র সন্তান—খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—এই আমার একমাত্র স্বপ্ন।' গ্লাশে
মুক দিল শিবতোষ।

'হ্যাঁ, চেষ্টা করছি, যাতে ভালোভাবে পাশ করতে পারে।' বিমান দরজার
কে এগুবার ভঙ্গি করল। 'তা মানসী বেশ পড়ে।'

পর্দা প্রায় ছুঁয়েছে, শিবতোষ পিছু ডাকল। বললে, 'পড়েই বা কী
র? শুধু পড়লে, পাশ করলে, বিয়ে হলে বা চাকরিবাকরি করে টাকা
াজগার করলেই কি উজ্জ্বল হয়? আচ্ছা, শুনুন—'

বিমান ফিরল।

'বসুন না একটু।'

টেবিলের কাছ ঘেঁসে আরো একটু এগুলো বিমান। বসল না।

'আপনি এসব খান?'

'না।'

'কোনোদিন খেয়েছেন?'

'না। দরকার হয়নি।'

কথাটা কেমন একটু অন্তরঙ্গ হয়ে বাজল। চোখ তুলল শিবতোষ। 'দরকার হয়নি?'

'না। জীবন এমনিতেই এক আশ্চর্য নেশা। ভরপুর আনন্দ।'

'ইয়ং ম্যান, বিয়ে-থা করেননি, স্বপ্নের ঘোর লেগে আছে চোখে, তাই বলছেন ঐ অপরূপ কথা। কিন্তু—মুখের রেখা কুটিল করে শিবতোষ। 'কিন্তু যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে, যখন ভরাডুবির পর নদীর পারে একলা পড়ে থাকবেন, তখন কী হবে?'

'তখনকার কথা তখন।'

'দেখুন, কতখানি একলা।' মদের গ্লাশের দিকে তাকাল শিবতোষ 'মদে পর্যন্ত যার বন্ধু নেই, বুঝুন সে কতখানি নিঃসঙ্গ।'

'সত্যি, তাই।' মমতাভরা চোখে তাকাল বিমান।

'সুখ সঙ্গ খোঁজে। দুঃখই একাকী।' করুণ করে তাকাল শিবতোষ 'আমিও একাকী।'

চলে যাচ্ছিল, শিবতোষ আবার ডাকল।

'আপনার অনেক ছাত্রী আছে?'

এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন! বিমান একটু-বা গম্ভীর হল। বললে, 'কলেজে যখন পড়াই তখন অনেক আছে, এ নিশ্চয়ই বলা যায়। কিন্তু প্রাইভেটে শুধু এই একজন—মানসী।'

'প্রাইভেটে মানে?' দিব্যি কটাক্ষ করল শিবতোষ।

'প্রাইভেটে মানে প্রাইভেট টিউশানিতে।'

'মোটে একটা?' শিবতোষের চোখে এখনো কালিমার ছোঁয়াচ।

'মফস্বলী কলেজ। প্রাইভেট টিউশানির তত রেওয়াজ নেই। আর, আপনার মত কে দেবে ন্যায্য মাইনে? কার বা অত আছে?'

'অনেক আছে, তাই না?' মদের বোতলটার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললে শিবতোষ। হঠাৎ চমকে উঠে বিমানকে আবার লক্ষ্য করল। 'শুনুন একটু কাছে আসুন।'

বিমান কাছে এল।

গলার স্বর ঝাপসা করল শিবতোষ। 'আপনার হাতে কোনো গরি ছাত্রী আছে?'

'গরিব ছাত্রী মানে?'

গরিব ছাত্রী মানে, ভালো খেতে-পরতে পায় না, পড়ার খরচ চালাতে কষ্ট পাচ্ছে, হয়তো বই কিনতে পাচ্ছে না, বাস-এ যাওয়া-আসার স্থান নেই বলে হয়তো দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটে, খুব দীনহীন অবস্থা—এমন কেউ?'

'কত আছে।'

'তাদের কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন?'

'পাঠিয়ে দেব? কেন?' একেবারে একটা মাস্টারের মতই বললে বিমান।

'আমার অনেক—অনেক আছে। তাকে কিছু দেব।' গ্লাশে দীর্ঘ চুমুক দিল শিবতোষ। 'যদি চায়। যদি চাইতে জানে, অনেক, অনেকই তাকে দিয়ে দেব।'

'চ্যারিটি করতে চান সে তো খুব ভালো কথা।' বিমান সরল সাজবার চেষ্টা করল। 'কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লিখলে তিনি দুঃস্থ ছাত্রীর লিস্ট পাঠিয়ে দেবেন। প্রায়রিটি বিচার করে আপনি—'

'এত কম বোঝেন বলেই তো আপনাদের মাস্টার হতে হয়েছে।' একটু যেন বিরক্ত হল শিবতোষ। 'আমি তাকে এত—এত দেব, আর সে আমাকে কিছুই দেবে না?'

'সে আবার কী দেবে'? গ্রাম্য-আনাড়ির মত মুখ করল বিমান।

'বা, টু সে দি লীস্ট য়্যাবাউট ইট, একটু সঙ্গ তো দেবে, একটু মিষ্টি কথা। জানেন,' আর্ত উত্তেজিত স্বরে বললে শিবতোষ, 'আজ প্রায় পাঁচ বছর কোনো মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলিনি।'

প্রথমে চোখ নত করল বিমান। পরে উপরে তাকাল। উপরে মানে, দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দিকে।

'বাসবী, মানে মিসেস নিয়োগীর, মানে, মানসীর মার কথা ভাবছেন? তার সঙ্গে পাঁচ বছর আমার সম্পর্ক নেই।'

'জানি। শুনেছি।'

'কী শুনেছেন? আমাদের মধ্যে একটাও কথা নেই। উনি ওখান দিয়ে যান তো আমি ওইখান দিয়ে যাই। আলাদা ঘর, আলাদা ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট, সমস্ত আলাদা। সামান্য চোখের দেখা-হওয়াটাও যথাসাধ্য মুছে ফেলেছি দুজনে। অথচ এক বাড়িতেই, এক ছাদের নিচেই আছি, এক ।'

'শুনেছি সব।'

'শুনেছেন? কার কাছে শুনেছেন?'

একটু বা থতমত খেল বিমান। বললে, মানে, দেখেছিও তো কিছু কিছু।'

'কী দেখছেন? সপ্তাহে তিন দিন তো মোটে পড়াতে আসেন, তাও সন্ধের দিকে, ঘন্টাখানেকের জন্যে।' শিবতোষ গ্লাশে আবার চুমুক দিল।

'পড়াতে এসেই তো বন্দী হয়ে যান ঘরের মধ্যে, অন্তত বইয়ের মধ্যে। তখ
কতটুকু আপনার দেখা সম্ভব? বড়জোর এইটুকু যে, এই বাড়ির কত্
আর কর্ত্রী ঐটুকু সময়ে আপনার সামনে কথাবার্তা বলছে না। সে
স্বাভাবিক কারণেও হতে পারে। তা থেকে কীই বা সিদ্ধান্ত হয়? ত
মানে, কিছুই আপনি দেখেননি, পারেন না দেখতে। সব আপনি শুনেছেন

'হ্যাঁ, স্যার, শুনেছি।' নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলল বিমান।

'আর তা শুনেছেন আপনার ছাত্রী, আমাদের মেয়ে, মানসীর কাছ থেকে

'তাই।'

'কতদূর শুনেছেন শুনি?'

'শুনেছি মানসীর বিয়ে পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করছেন। ওর বি
হয়ে গেলেই আপনারা কোর্টে যাবেন বিবাহবিচ্ছেদের মামলা নিয়ে।'

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, শুধু পড়া নিয়ে নয়, পড়ার বাইরের বিষয় নিয়ে
আপনাদের ছাত্রী-শিক্ষকের বেশ কথা হয়?' কথাটা এমনি শুনতে এক
[illegible] মত, কিন্তু শিবতোষের তরল কণ্ঠে পরিহাসের মত শোনাল

'তা, অস্বীকার করি কী করে, হয় একটু-আধটু।' মাথা চুলকালে
বিমান। 'আর এ তো প্রাসঙ্গিক কথা।'

'সবই প্রাসঙ্গিক। আসঙ্গের কথা যদি ওঠে তাও প্রাসঙ্গিক।' শব্দ ক
হেসে উঠল শিবতোষ।

বিমান মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

শিবতোষ মদ ঢালল গ্লাশে। বললে, 'মানসী যখন প্রথম আপনা
নিয়ে এল আমার কাছে, বললে, এঁকেই কোচ রাখলুম, তখনই দেখে মা
হয়েছিল, কালক্রমে অনেক প্রাসঙ্গিক কথাই উঠবে। ইয়ং ম্যান, বি
করেননি, তারপর এমন ইন্দ্রের মত চেহারা—'

'ইন্দ্রের মত!' হা-হা-হা করে হেসে উঠল বিমান। বুঝতে বাকি রই
না শিবতোষ মাতাল হতে শুরু করেছে।

'সুতরাং সন্দেহ নেই, কলেজের বহু অপ্সরাই দেবরাজে আকৃষ্ট হয়েছে
শুনুন, আমি উর্বশী তিলোত্তমা রম্ভা মেনকা চাই না। একটি দুঃস্থ-দুগ
হলেই আমার চলে। প্রমাথিনী বা ঘৃতাচী বা অলম্বুষা।' নামগুলি
নিজেই হেসে উঠল শিবতোষ। 'বুঝলেন সুবিধে পেলে এক-আধটি দে
পাঠিয়ে।'

মাতালকে স্তোক দিতে বাধা কী। বিমান বললে, 'দেখব।'

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ টেবিলের-উপর-রাখা মানসীর শিথিল ডান হাত
ধরে ফেলল বিমান।

মানসী চঞ্চল হল না। এমন একটা ভাব করে রইল এ যেন পড়ানে
উত্তেজনায় সরল ও সমীচীন মুদ্রা। শুধু চোখ নামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে
'মা দেখছেন।'

দ্রুতে হাত তুলে নিল বিমান।

তাকাল বারান্দার দিকে। বারান্দা তো এখন ফাঁকা। তাকাল জানলা দিয়ে উঠোনের দিকে। সেখানেও তো কেউ নেই। আর থাকলেই বা কী। সেখান থেকে এই দোতলার ঘরের ভিতরটা দেখা যায় না। তবে বাসবীর কি এমন চোখ যা দেয়াল পর্যন্ত ভেদ করে?

'কই, তোমার মা তো নেই এদিকে।'

'চুপ।'

কতক্ষণ পরেই বারান্দায় দেখা গেল বাসবীকে। আপন মনে পায়চারি করছে।

খালি পা, জুতোর কোনো শব্দও ওঠেনি। পরনে এমন কোনো সদ্য পাটভাঙা শাড়ি নেই যে হাওয়াতে খসখসিয়ে উঠবে। এখানে-ওখানে কোথাও একটা ছায়ারও ছায়া পড়েনি।

তবু গন্ধ শুঁকে মানসী ঠিক বলে দিতে পারল, মা দেখছেন।

বনে, হাওয়াতে, হরিণ বুঝি এমনি দূর থেকেই বাঘের আভাস পায়।

বাসবী ফের ঘুরে যেতেই সতর্ক ভঙ্গিটা শিথিল করল বিমান। টেবিলের নিচে খালি পা মানসীর খালি পায়ের উপর এনে রাখল।

এতটুকু চমকাল না মানসী। শুধু বললে, 'ভয়ানক মামুলি হচ্ছে।'

'আদ্যোপান্ত সমস্ত কিছুই মামুলি। জন্ম প্রেম মৃত্যু সব কিছুই সেই সেকেলে, একঘেয়ে, সকলের মুখস্ত। কোথাও বৈচিত্র্য নেই। বিস্ময় নেই।'

'তবু যে শিল্পী, যে কবি সে তারই মধ্যে আঙ্গিকে নতুনত্ব আনে। সেইটিই স্বাদে তার আনে, ধার আনে, বিস্ময় ঘটায়।'

'মাঝখানে এই টেবিলটা রেখে আমি কী আর নতুনত্ব দেখাতে পারি?' ব্যস্ত হয়ে বিমান বললে।

'যখন পারেন না, চুপচাপ পড়িয়ে যান।'

'মাঝে মাঝে চুপচাপই তো পড়াতে চাই।'। হাসল বিমান। 'মানে, পড়াতে পড়াতে চুপ করে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কখনো বা তোমার হাত ধরি, পা ধরি, কখনো বা একগুচ্ছ চুল। তখন আর অন্যের কবিতার মানে নয়, তখন নিজের কবিতার মানে তোমাকে নিঃশব্দে বোঝাতে চাই। ঠিকই বলেছ, সেই আমার চুপচাপ পড়ানো।'

'এখন শিগগির চেঁচিয়ে পড়ান।' মানসীই এবার পা দিয়ে ধাক্কা মারল।

একটা ইংরাজী কবিতার আবৃত্তিতে লেগে গেল বিমান।

আবার ঘুরে গেল বাসবী।

'জানেন, মা ঠিক বুঝতে পারবেন এই কবিতাটা পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, আপনার প্রক্ষেপ।' ভয়মাখানো চোখে মানসী বললে।

'আর টেবিলের নিচে তোমার ঐ নিক্ষেপটা?' খুশি মাখানো চোখে বললে বিমান।

'ওটাও মার চোখ এড়াবে না। জানেন, সব মা দেখতে পান, কিছুই তাঁর কাছ থেকে লুকানো যায় না।'

'টেবিলের নিচেটা যখন দেখতে পান তখন বুকের হাড়মাস চামড়ার নিচেটাও দেখতে পান নিশ্চয়।'

'ঠিক পান। কী রকম চোখ হয়ে গেছে দেখেছেন? কত রাত একফোঁটা ঘুমুতে পারেন না, কেবল ঘুরে বেড়ান।' মানসীর মুখ পাংশু হয়ে গেল। 'আমার একেক সময় মনে হয় মা বুঝি পাগল হয়ে যাবেন।'

বাসবীকে আবার দেখা গেল। আবার ব্যাখ্যায় উচ্চঘোষ হল বিমান।

বাসবী আবার ঘুরে যেতেই বিমান বললে, 'উনি হবেন, আর আমরা হয়ে গিয়েছি।'

'হয়ে গিয়েছেন তো বাবাকে গিয়ে বলুন।'

'আর তুমি মাকে বলবে!'

'য়্যাবসার্ড! মরে গেলেও বলতে পারব না।'

'পারবে না?'

'না। মুখ দিয়ে আসবেই না কথাটা।' মানসী ঘড়ির দিকে তাকাল। 'একটা প্রাইভেট টিউটর ও তার ছাত্রীর মধ্যে প্রেম হয়েছে, তারা বিয়ে করতে চায়, এ একেবারে মান্ধাতার আমলের কাহিনী। একেবারে পুরোনো, ঝর্ঝরে লজঝর উপন্যাস। বললেই কেমন খেলো শোনায়, পাত্র-পাত্রীদের সুস্থ-সবল মনে হয় না, মনে হয় জলবার্লি খাওয়া জেবারো রুগী—'

'বা, পুরোনো কাহিনীই তো পুনরাবৃত্ত হবে।' যেন বাঙলায় নোট দিচ্ছে, হাতের বইয়ের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল বিমান। 'যা চিরকাল হয়ে আসছে তাই আবার হবে এতে অন্যায় বা অসঙ্গত কিছু নেই। পুরোনো বলে লজ্জিত হবার কী আছে? এই পৃথিবীটাই তো পুরোনো। রোগে পড়াটা দোষের নয়। আর রুগ্ন যখন হয়েছি তখন নিরাপদ জলবার্লিই তো ভালো। প্রেমে-পড়ার পক্ষে বিয়ে করাটাই প্রশস্ত।'

'হয়তো তাই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতীক্ষা না করে উপায় নেই।' কথাটা শেষ না করেই থেমে পড়ল মানসী।

বাসবীকে আবার দেখা গিয়েছে।

'উপায় নেই কেন?' বাসবী আবার সরে যেতেই জিজ্ঞেস করল বিমান।

'বলেছি তো, ছাত্রী হয়ে মাস্টারকে বিয়ে করতে পারব না।'

'কেন, বাধাটা কী? নিষেধ কোন আইনে? মক্কেলনী তার উকিলকে বিয়ে করতে পারবে না, রুগিনী তার ডাক্তারকে, কিংবা নার্স তার রুগিকে কিংবা ড্রাইভার স্বয়ং মোটরওয়ালিকে, এমন কথা কোথাও লেখে না।'

'না লিখুক।' বিমান হাত বাড়িয়েছিল ধরতে, ত্রস্ত হয়ে হাত গুটিয়ে নিল মানসী।

'যোগের বেলায় বাধা নেই, ভোগের বেলার বাধা! হতেই পারে না। এর

মধ্যে কোনো নীতি নেই।' তপ্ত হয়ে উঠল বিমান। 'মন-দেয়ানেয়া করবে, দেহ-দেয়ানেয়া করবে না, ভালোবাসাবাসি করবে, বিয়ে করবে না, এটাই য়্যাবসার্ড।'

'আমি বিয়ে করব না বলেছি? আমি বলেছি প্রতীক্ষা করতে।' করুণ চোখে তাকাল মানসী।

'তোমার দেহে যৌবন আসেনি, তার জন্যে প্রতীক্ষা? না কি আমার রক্ত যথেষ্ট লাল নয়, তার জন্যে?' আগুনের শিখার মত হয়ে উঠল বিমান।

কথাগুলি বুঝি শুনতে পেয়েছে বাসবী। তার পদক্ষেপ মন্থর হয়েছে। অনেক দেরি করছে এদিকে আসতে।

'মোটেই তার জন্যে নয়।' বাসবী এসে ঘুরে যেতেই স্বাচ্ছন্দ্য পেল মানসী। 'আপনি এ চাকরিটা ছেড়ে অন্য একটা চাকরি নিন।'

'কে দেবে? কাকে দেবে? কেন দেবে? যে ডুগডুগি বাজায় তাকে কে দেবে ঢাকঢোল?'

'তাহলে আমাকে পাশ করে চাকরি করতে দিন।'

'তুমি চাকরি করবে?'

'অন্তত একটা মাস্টারি কোন না পাব! তখন বলতে বেশ লাগবে, এক শিক্ষিকার সঙ্গে এক শিক্ষকের বিয়ে হল। বেশ নিটোল শোনাবে। হাঁড়ির মুখে ঠিক সরা এসে বসবে।' হাসল মানসী। 'কিন্তু প্রোফেসরের সঙ্গে ছাত্রীর বিয়ে, নৈব চ, নৈব চ।'

'মোটেই উপাধির সঙ্গে উপাধির বিয়ে নয়।' ভঙ্গিকে দৃঢ় করল বিমান। 'এ পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন। সূর্যের সঙ্গে চন্দ্রমার। প্রয়াসের সঙ্গে প্রসাদের।'

'জানি না। কিন্তু লোকে আমার ভালোবাসার কোনো স্বাধীন মূল্যই দেবে না।' মানসীর চোখের কোণ কি একটু ভিজে উঠল? 'লোকে বলবে, আমি এক দুর্বল অর্বাচীন ছাত্রী, মাস্টারের প্রবলতর ব্যক্তিত্বের কাছে সহজেই বশীভূত হয়েছি। আসল যেটা শ্রদ্ধা তাকেই আমি ভুল করেছি ভালোবাসা বলে।'

'সেদিক থেকে তো আমার ভয় বেশি।' গম্ভীর শোনাল বিমানকে।

'ভয়?'

'হ্যাঁ, সমালোচনার ভয়।' মৃদুরেখায় হাসল বিমান। 'লোকে বলবে, পেস্কারের ছেলে সহজেই জজসাহেবের মেয়ের প্রতাপে অভিভূত হয়েছে। আমার প্রেমকে, গরীয়ান প্রেমকে, কেউ মান দিতে চাইবে না। ভাববে, তোমার বাবাই আমাকে পাকড়েছেন আর আমি তোমার মধ্যে টাকা দেখেছি বা বৈষয়িক সুবিধে। শোনো, লোকের কথায় কিছু যায় আসে না। লোকের কথায় চলছে না জগৎসংসার।' আবার পায়ের উপর পা রাখল বিমান। 'প্রেমের কোনো বিশেষণ নেই। কোনো বয়স নেই, জরা নেই, বার্ধক্য নেই, কালাকাল নেই। ভালোবাসি—এর বাইরে আর সমস্ত পরিচয় অবান্তর।'

'তবু প্রতীক্ষা না করে উপায় নেই,' মানসী আলগোছে পা সরিয়ে নিল। 'মাকে দেখছেন তো?'

বাসবী আর এখন বারান্দায় নেই। তবু বিমান বললে, 'দেখছি।'

'কী দেখছেন?'

'যেন বন্দিনী বাঘিনী স্তব্ধ আক্রোশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু বনের স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতার বাইরে আরো কী জিনিস যেন তার নেই। জীবন যেন তাঁকে কী স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে, ছাড়া পেলেই কেড়ে নেবেন নখে দাঁতে এমনি একটা জ্বালা ঠিকরে পড়ছে চোখের থেকে।'

মানসীর চোখ এবার স্পষ্ট ছলছল করে উঠল। বললে, 'বাবার তো তবু মদ আছে, আর কিছু নেই। কী দুঃসহ এই নিঃসঙ্গতা। কী দুঃসহ!' দু-হাতে দু'পাশের রগ টিপে ধরল সজোরে।

'মার তো তুমি আছ।'

'সম্প্রতি মা আমাকেও সহ্য করতে পারছেন না।' অকারণে বইয়ের কতকগুলি পৃষ্ঠা উলটোলো মানসী। এক জায়গায় অকারণে হঠাৎ স্থির হয়ে বললে, 'তবু আমি আছি, আমার দিকে অবিচ্ছেদ একটি লক্ষ্য রেখেছেন, এই নিয়ে খানিক বা ব্যাপৃত আছেন দিনে-রাতে। কিন্তু আমি যদি এখুনি চলে যাই—'

'এখুনি-এখুনি আর কে যেতে বলছে? অন্তত পরীক্ষাটা তো দিয়ে নেবে।'

'কিন্তু যখনই যাব তখনই তুমুল হবে বাবা-মায়ে। সে সঙ্ঘর্ষের ছবিটা কল্পনা করতেও ভয় করে।' যেন হঠাৎ হিম হয়ে গেল মানসী। 'হাতাহাতি মারামারিও রেয়াত যাবে না। কে জানে ঝগড়ার মাথায় বাবা হয়তো মাকে তাড়িয়ে দেবেন, কিংবা মা-ই হয়তো নিজের থেকে চলে যাবেন বাড়ি ছেড়ে।'

'ডিভোর্সের মামলা হবে না?'

'শুধু মামলা হলে তো ভালো। ভদ্রভাবে নিষ্পন্ন হতে পারে মামলাটা। কিন্তু আদালতের ব্যাপারের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতে কী ব্যাপার চলবে তাই ভেবেই আমি শিউরে উঠছি।' মানসী এবার তার ডান হাত টেবিলের উপর অনেকখানি প্রসারিত করে দিল। 'আর তারই জন্যে এ বাড়িতে আমার অবস্থিতিটা যতদূর পারছি দীর্ঘ করছি, বিলম্বিত করছি।'

মানসীর সেই নিরালম্ব হাত অনায়াসেই নিজের হাতের আশ্রয়ে টেনে নিল বিমান। বললে, 'আর কে জানে, তোমার এ বাড়িতে থাকতে-থাকতেই হয়তো বাবা-মাতে পুনর্মিলন ঘটে যাবে।'

'ওঁরা আবার মিলবেন?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানসী। 'অনেক বছর ধরেই চলছিল ধিকিধিকি, এখন বছর পাঁচেক একেবারে দাউদাউ। অস্পর্শ-অশব্দও যে কী ভয়ানক আগুন হতে পারে, আমি কাছে আছি সব সময়, আমি বুঝি।'

'যারা ভায়োলেন্ট পাগল তারা হঠাৎ কোনো ভায়োলেন্ট শক পেলে চট করে আবার ভালো হয়ে যায় শুনেছি।'

তেমনিই বুঝি প্রচণ্ড শক পেল যখন দেখল ঠিক দরজার ওপারে উদ্যত চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে বাসবী।

তখন আবার দুয়েকটা পড়ার কথা-টথা বলে আবহাওয়াকে লঘু করে দিল বিমান।

দেখল, বারান্দায় বাসবী নেই। সরে গিয়েছে।

'আজ তবে এখন উঠি। পালাই।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিমান।

কোথায় পালাবে? সিঁড়ির মুখে ধরে ফেলল বাসবী। নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তকিয়ে বললে, 'একঘণ্টার পাঁচ মিনিট এখনো বাকি।'

যন্ত্রচালিতের মত নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল বিমান।

কার ঘড়ি ঠিক-বেঠিক এ নিয়ে বিমান আর তর্ক করল না। নম্র মুখে দোষ কবুল করে নিল। বললে, 'পাঁচ মিনিটের তো হেরফের।'

'না, তাই বা হবে কেন? আপনার পুরো একঘণ্টা পড়াবার কথা।' বাসবী মুখ-চোখ রুক্ষ করে তুলল। 'সামান্য কথাটা তো রাখবেন।'

এ কথার উত্তরে যে কথাটা বলা যায় তাই বললে বিমান। বললে, 'কত দিন যে একঘণ্টার বেশি থাকি, বেশি পড়াই।'

'কেউ বলে না আপনাকে থাকতে। আপনার একঘণ্টা পড়াবার কথা, কাঁটায়-কাঁটায় একঘণ্টা পড়িয়ে চলে যাবেন। বেশি থাকবার কী দরকার!' শাসনের সুরে প্রায় তিরস্কার করে উঠল বাসবী। 'বরাদ্দ সময়ের মধ্যে পড়া আর কতটুকু, থাকার দিকে লক্ষ্য, থাকাটাই বেশি। থাকতেই বেশি সুখ।'

চুপ করে রইল বিমান।

'যদি এমনি গাফিলতি হয়, মাস্টার বদলাব বলে রাখছি।' প্রায় তর্জন করে উঠল বাসবী।

বিমান সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল নিঃশব্দে।

বিকেল হতেই অঝোর বর্ষণ। আজ নিশ্চয়ই বিমান আসবে না।

বারান্দার দিকে পিছন করে খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে আছে মানসী। দু-হাতে একটা করে বালা, শিক ধরে আছে। পিঠে ঝুলছে রুক্ষ বেণী। পরনের শাড়িটা ধসা, আধ-ময়লা। ভঙ্গিটাতে ক্লান্তি বুলোনো।

ভেজা জুতো নিচেই ফেলে উপরে চলে এসেছে বিমান। পা টিপে টিপে উঠে এসেছে। বারান্দা পেরিয়ে ঘরে। মানসী এত তন্ময় কিছুই টের পায়নি।

পিছন থেকে এসে মানসীর দুই চোখ টিপে ধরল বিমান।

তুমি কে, তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই, এমন কোনো ঘোষণার মধ্যে গেল না মানসী। চোখের উপর থেকে আগন্তুকের হাত চাইল না ছিনিয়ে নিতে। বরং সেই হাতের বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে ঐ বৃষ্টির মতই অজস্র ধারায় ঢেলে দিল। আর, বিন্দু-বিন্দু এত বৃষ্টি ঝরলেও এক বিন্দু এখনো কম আছে সেই ভাবনায় সেই শেষ বিন্দুটি মানসীর সিক্ত অধরে স্থাপন করল বিমান।

সেই মুহূর্তে জগৎ-সংসারে কে কোথায় আছে, জেগে না ঘুমিয়ে, দুজনের কেউই দেখতে চাইল না। থাকলে আছে না থাকলে নেই। এই বিন্দুর বাইরে সমস্ত অস্তিত্ব নিরর্থক।

'চরণ! চরণ!' চাকরের উদ্দেশে হুমকে উঠল বাসবী।

কতক্ষণ পরে চরণ এসে বিমানকে বললে, 'আপনাকে মেমসাহেব ডেকেছেন।'

ভয়ে-ভয়ে হাসল বিমান।

মানসী বললে, 'যা বলেন সব মেনে নিয়ো। অপ্রকৃতিস্থ আছেন হয়তো, তর্ক কোরো না।'

পাশের ঘরই বাসবীর। তেমনি দক্ষিণ দিকের জানলা খোলা। জলের ছাঁট আসছে মৃদু-মৃদু। বাসবী তার নিচু খাটে, খোলা চুলে বসে আছে।

দরজার পর্দা সরিয়ে বিমান ঘরে ঢুকল।

'দরজা বন্ধ করে দিন।' কঠোর স্বরে বললে বাসবী, 'তারপরে বসুন ঐ চেয়ারে। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

বন্ধ করল। বসল। স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করে রইল।

'আপনার স্পর্ধাকে বলিহারি!' বাসবী টিটকিরি দিয়ে উঠল। 'আপনি ভাবছেন আপনি মানসীকে বিয়ে করবেন?'

কথা না বলে থাকতে পারল না বিমান। স্নিগ্ধমুখে বললে, 'ভাবতে দোষ কী! হাত বাড়িয়ে না পাক, চাঁদের স্বপ্ন দেখতে বামনের পরিশ্রম নেই।'

'কিন্তু আপনি বামনের চেয়েও ছোট।' বাসবীর কন্ঠস্বর থেকে ঘৃণা ঝরে পড়ল।

'ছোট?'

'হ্যাঁ, আপনি মফস্বলী কলেজের সামান্য লেকচারার। আর মানসী ডিস্ট্রিক্ট জজের মেয়ে। জজসাহেব আরো কত কী উন্নতি করবেন ঠিক নেই। মানসীর গরমাই আরও বাড়বে। তেজ সইতে পারবেন না। আপনার জীবন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে।'

চুপ করে রইল বিমান। অভিভূতের মতো রইল।

'বড়র পীরিতি যে বালির বাঁধ তা আপনি জানেন না? চাঁদ ভেবে নেবেন হাত পেতে, দেখবেন আগুনের গোলা। যার যেমন পুঁজি সেই ভেবেই তার দোকান ফাঁদতে হয়। আপনার মাইনে কত? বাড়িঘর বলতেই বা আপনার কী আছে?'

'কিছু নেই। শূন্য। বলতে গেলে, আমি তো কাঙাল।'

'তাই রাজরাণী নয়, আপনার কাঙালিনী দরকার।'

'কাঙালিনী পাই কই?' বলবে-না বলবে-না করেও বলে ফেলল বিমান।

'দেখুন তো আমিই সেই কাঙালিনী কিনা।' তরলবিহ্বল চোখে তাকাল বাসবী। 'এ বাড়িঘর সমস্ত জজসাহেবের। যখন ডিভোর্স মামলার

ডিক্রি পাবেন তখন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন আমাকে, কিংবা তার আগেই। মানসী তার বাবার পক্ষে থাকবে। সেখানে থাকলেই তার সুবিধে, তার উন্নতি। আমিই অনাথিনী কাঙালিনী হয়ে যাব। তখন আমি কাকে ধরব? কে আমার আছে আপনি ছাড়া?'

মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল বিমান। মানসী যে বললে, অপ্রকৃতিস্থ, তার মানে কী? না, মাতাল নয় তো? তবে কি মস্তিষ্কে বিকৃতি? তাও তো মনে হচ্ছে না। কোনো দিন তো শোনেনি এমন অভিযোগ।

'আপনি সাংসারিক অর্থে কাঙালিনী বলছেন?'

'না আরো—আরো অর্থ আছে। আমি ভালোবাসায় কাঙালিনী।'

'সে কী? এ আপনি কী বলছেন?'

'কেন, আমি কি ভালোবাসতে পারি না? কত আর আমার বয়স হয়েছে? এখনো পড়িনি চল্লিশে। দেখুন আমার চোখ। এখনো চশমা নিইনি।'

বাসবীর চোখের দিকে তাকিয়ে বিমান দেখল তাতে জল এসেছে।

'আর আমার রূপ কি এরই মধ্যে একমুঠো ছাই হয়ে গিয়েছে? আর আপনিই তো সেদিন বলেছিলেন ভালোবাসায় কোন বয়েস নেই, জরা নেই, বার্ধক্য নেই, কালাকাল নেই। রূপযৌবনের প্রশ্ন নেই। বলুন, আছে?'

'কিন্তু,' ছটফট করে উঠল বিমান, 'কিন্তু, কই, আমি তো কিছু জানিনি—'

'জানতে দিইনি আপনাকে। প্রস্তুত হতে দিইনি। ছাত্রীত্বের পরিবেশ না পেলে আপনার হৃদয় খুলবে না আমার কাছে। তাই মানসী আর নয়, এবার আমি আপনার ছাত্রী হবো।'

'ছাত্রী হবেন?' চোখেমুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিমান।

'মাস্টার বদলাব বলেছিলাম না? তার দরকার নেই। এবার ছাত্রী বদলাব। আমাকে আপনি পড়াবেন।'

'পড়বেন আমার কাছে?'

'শুধু পড়ব না, পড়তে বসলে যা হয়, সেই প্রেম করব।' জলে চোখ টলটল করে উঠল বাসবীর, 'মানে আপনি করবেন। হ্যাঁ, আপনি। কী বলেন, পারবেন না?'

'সেই আবহাওয়া পেলে কোথা থেকে কী হয়ে উঠবে বলতে পারি না।'

'নিশ্চয়ই হাতে হাত রাখবেন, পায়ে পা।'

এ কি স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম, বিমান কিছু স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারল না। পাংশুমুখে বললে, 'কিন্তু যদি আপনি উচ্চপুচ্ছ সম্ভ্রান্ত হয়ে থাকেন তা হলে একেবারেই সাহস পাব না। যেমন এখন পাচ্ছি না। পালাতে পারলে বাঁচি এমন মনে হচ্ছে।'

'বা, এখনো তো ছাত্রী হইনি। ছাত্রীর বেশ ধরিনি।' নিজের বেশবাসের দিকে তাকাল বাসবী।

'ছাত্রীর বেশ!'

'হ্যাঁ, কুমারীর বেশ। কুমারীর বেশ না ধরলে আপনার প্রেম আর প্রশ্রয় পাবে কী করে?'

'কুমারীর বেশ ধরবেন?' কৌতূহলে বিমানের চোখ নেচে-নেচে উঠল।

'ডিভোর্সের পর যা হব, তা দুদিন আগে হতে আর দোষ কী!' বললে বাসবী, 'অর পরিশ্রমটাই বা কোনখানে? আঁচলে চাবি না ঝুলিয়ে শুধু হবল্ দিয়ে শাড়িটা পরা, মাথার কাপড়টা ফেলে দেয়া আর চুলগুলো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে না রেখে পিঠের উপর একটা সাপ করে ছেড়ে দেওয়া—'

'আপনাকে কুমারী ভাবতে পারলে হয়তো বা হৃদয়ে কাব্য জাগবে।' উদ্বেল হয়ে বললে এবার বিমান।

'প্রেম জাগবে বলুন। আপনাকে তখন আর সম্ভ্রমের সামনে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে থাকতে হবে না। অন্তরঙ্গের মত মুক্তবাহু হয়ে দাঁড়াতে পারবেন।'

'তখনই হৃদয়ে সুর উঠবে।'

'পরিপূর্ণের সুর।' বললে বাসবী। 'কোনদিন জীবনে পাইনি এই আস্বাদ। কুমারী-জীবনের প্রথম রোমাঞ্চ। তাই এবার আপনি আমাকে দেবেন।'

'দেব।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিমান। 'আপনি কুমারী সেজে ক্লান্তকায়া ছাত্রীর ভঙ্গিতে দাঁড়াবেন জানলায়, বারান্দার দিকে পিঠ করে, তাকিয়ে থাকবেন নতুন অন্ধকারের দিকে—হাতের কাছে সুইচটা থাকলেও আলো জ্বালবেন না—'

'আর আপনি?' বাসবীও উঠে দাঁড়াল।

'বলুন—'

'আপনি পিছন থেকে এসে আমার চোখ টিপে ধরবেন। যেমন ধরলেন আজ।' শব্দ করে হেসে উঠল বাসবী। 'ধরলেন আর ধরা পড়লেন।'

'তারপর?'

'তারপর আর বলে দিতে হবে না।' মুখটা ঈষৎ উঁচু করল বাসবী। 'তারপর সমস্ত আমার মুখস্থ। তারপর? আরো শুনবেন?'

দরজার খিলে হাত রেখেছে বিমান, এক মুহূর্ত স্তব্ধ হল।

'তারপর দুটি সুখী প্রাণীর উপর প্রতিহিংসা। এক মানসী আর তার বাবা। এক ঢিলে দুই পাখি! এক চুমুকে দুই সমুদ্র।' দরজার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালো বাসবী। 'তারপর পড়াচ্ছেন কবে থেকে?'

'শুভস্য শীঘ্রং। কাল থেকেই।'

'হ্যাঁ, কাল মানসীর ডে নয়, হ্যাঁ, কাল থেকেই।'

আলো-না-জ্বালা বাইরের ঘরে বসে একা একা তেমনি মদ খাচ্ছে শিবতোষ।

মোটরটা বেরিয়ে গেল।

'কে গেল?' গর্জে উঠল শিবতোষ।

উত্তর দিলে বিমান। ঘরে ঢুকে বললে, 'মানসী আর তার মা, মিসেস নিয়োগী।'

'মা-মেয়ে একসঙ্গে? আশ্চর্য তো! গেল কোথায়?'
'আমাদের কলেজে একটা ফাংশান আছে, সেইখানে।'
'তা আপনি গেলেন না?'
'যাব। এখ্‌নি যাব। মানসীর সামিল হব।'
'ও!' কী যেন হিসেব করল শিবতোষ। 'আজকে আপনার ডে নয়?'
'না।' কানের কাছে ম্‌খ আনল বিমান। 'আজকে আপনার ডে।'
'আমার ডে? বলো কী?' হাতের গ্লাশটা শব্দ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল শিবতোষ।
'সেই আপনি ছাত্রী চেয়েছিলেন না?' ষড়যন্ত্রীর ইশারা করল বিমান। 'একটিকে নিয়ে এসেছি।'
'কোথায়? কোথায় রেখেছ?' গ্লাশ বোতল ফেলে হ্‌তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল শিবতোষ।
'মিসেস নিয়োগীর ঘরে। দেখবেন, বারান্দার দিকে পেছন করে জানলার শিক ধরে আবছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছ্‌ ভাবছে হয়তো, হয়তো-বা ভবিষ্যৎ ভাবছে। আপনি পা টিপে-টিপে সন্তর্পণে উঠে যান। যেন শব্দ-ট্‌কুও না শ্‌নতে পায়।'
'তাই যাচ্ছি।' খালি-পায়ে এগ্‌লো শিবতোষ।
'শব্দ শ্‌নলে চমকে উঠতে পারে, অকারণে ভয় পেয়ে যেতে পারে। আগে ভয় পেয়ে গেলেই সব পণ্ড।'
'না, ট্‌ঁ শব্দটিও হবে না। নিশ্বাস ফেলব না পর্যন্ত।'
'চুপিচুপি গিয়ে পেছন থেকে তার চোখ টিপে ধরবেন।'
'চোখ টিপে ধরতে হবে?'
'হ্যাঁ, সেইট্‌কুই দেয়া আছে নিশানা। তার পরের টেকনিক—'
'আমাকে টেকনিক শেখাতে হবে না।'
'তার পরের টেকনিক আপনার নিজের। আচ্ছা, আমি চলি, মানসীকে দেখিগে।'
চলে গেল বিমান।
যা সে বলেছে, হ্‌বহ্‌, বারান্দার থেকে দেখা গেল নবীনাকে। র্‌দ্ধ-নিশ্বাসে পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে বাসবীর চোখ টিপে ধরল শিবতোষ।
কিছ্‌ক্ষণ পরে, কীরকম মনে হল, বাসবী স্‌ইচ টেনে আলো জ্বালাল। ক্ষিপ্রহাতে শিবতোষ আবার অন্ধকার করে দিল।
বাসবী বাধা দিল না।

৭। যতন বিবি

হানিফ বাথানে মোষ চরাতো। মাথায় শিং নেই আর খাড়া পায়ে হাঁটে, নইলে তাকে কিছুই পালের থেকে আলাদা করে দেখতো না। কালো কদাকার, কিন্তু শরীর একেবারে পেটা লোহা। চ্যাপটা চোয়াল, বেঁটে ঘাড়, আর মোটা কব্জি। সে যখন কোনো বোকামি করে তখনো লোকে তাকে গরু না ব'লে বলে, মোষ।

মেঘনার মোহনার মুখে হাতিয়া নামে দ্বীপ, স্থির ভূমির থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণে। মোষের রঙের মেঘ নামে আকাশে, উড়ন্ত উড়ুনির মত 'শর' ছুটে আসে দিকলেশহীন শাদা শূন্যতার থেকে, মুহূর্তে ঢেউ হয়ে ওঠে উত্তাল, ঝড় মাতে আথালি-পাথালি। ফাট ধরে ভেঙে পড়ে বড়ো-বড়ো মাটির চাঙর, সঙ্গে অশ্বত্থ কি ঝাউ, কখনো বা কারু ছাড়াবাড়ি। ধানবোঝাই নৌকা উলটে যায় মাঝ-নদীতে, লোকজন গরু-বাছুর কে কোথায় ছিটকে পড়ে, বেশির ভাগই আর পার খুঁজে পায় না। হানিফ জলের পোকা, বিশাল বাহুতে ঢেউ পিষে-পিষে উঠে আসে শুকনো চরে—নাম যার চর-জব্বর।

'কি রে, হোল?' নমাজ শেষ করে হাফ-প্যান্টে বেল্ট আঁটতে-আঁটতে সাহেব জিগগেস করে।

'আণ্ডা নেই, হুজুর। কুদ্দুস আনতে গেছে বাজারে।' হানিফ বাবুর্চি-খানা থেকে জবাব দেয়।

নাকের ভিতর দিয়ে সাহেব কি-একটা কঠিন শব্দ করে। সেটা চাপরাশি কুদ্দুসের বিরুদ্ধে না চাকর হানিফের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বোঝা যায় না।

সেবার ইনেসপেক্টর সাহেবকে বাঁচিয়েছিলো নৌকাডুবি থেকে, চর-বৈরাগ্যের কাছ-বরাবর। হানিফ যাচ্ছিলো দই বেচতে, সাহেব যাচ্ছিলো কিসের তদন্ত-তদারকে। বলা-কওয়া নেই, এক ডেলা তুলোর মতো মেঘ ফুটলো আকাশে আর সঙ্গে-সঙ্গে জল ফুটো হয়ে গর্ত হয়ে গেল আচমকা। ধুনখারার বাড়ি খেয়ে সে-তুলো পেঁজা না হতেই, গর্তটা চক্কর খেতে লাগলো, আর নৌকা তলিয়ে গেল খাড়া একটি লাঠির আকারে। হাতের কাছে যাকে পেল তাকেই সাপটে ধরে হানিফ রওনা হলো পারের সন্ধানে আর সম্বিৎ ফিরে পেতেই দেখলো যাকে সে টেনে তুলেছে ডাঙার উপর, সে ইনস্পেক্টর সাহেব।

যদিও সাহেব বলেছিলো সে নিজেই একজন বড়ো সাঁতারু, নিজেরই চেষ্টায় বাঁচতে পারতো সে অনায়াসে, তবু হানিফের মহানুভবতাকে সে অপুরস্কৃত রাখবে না। সামান্য একটা পদক বা খেতাব দিয়ে নয়, দস্তুরমতো মোটা মাশুলে। কি-একটা দলিল কি রদ-বদল করে কখানি জমি সে মোকররি করে দিল। শুধু তাই নয়, যদি পিওন করতে চায়, হানিফ শুনতে পেল যেন দূরের

ডাক রুপোর টাকার শব্দ। দেখলো বা চাপরাশের জৌলুশ। ছোট ভাই গফুরের হাতে মোষের দল ছেড়ে দিয়ে সে সাহেবের লাল-ফিতে-বাঁধা ফাইল তুলে নিল বগলে।

কিন্তু জল ছেড়ে কোথায় সে এসে পড়লো এই ডুবজলের দেশে। ভেবেছিলো চারদিকে বুঝি শুধু সবুজের ঢেউ, কিন্তু আশ্চর্য, এ যে আগাগোড়া হাজাশুকোর হাবুজখানা। জাগতে-ঘুমোতে সর্বক্ষণ এই ভাতের জন্যে কাতরানি। জবাই-করা পাখা-ছুলে-ফেলা মুরগির মতো চেহারা। একমুঠ ভাত পেলে কাৎ হয়ে যেন শুতে পারে কবরের নিচে।

'কি রে, এলো আণ্ডা?' সাহেব তাড়া দেয় উপর থেকে।

'এসেছে, হুজুর।'

'পরোটা বানিয়েছিস।'

'জি।'

'দে আমার বাস্কেটে।'

সাহেব মফস্বলে যাবে, জলে হলে নৌকায়, মাটিতে হলে সাইকেলে। মফস্বলে না হলে আপিসে, আপিস থেকে এসে ক্লাবে বা কোথাও কারু বৈঠকখানায়। সমস্ত দিন-রাত্রি হানিফ একা। শুনেছিলো সাহেব বিয়ে করেছে নাকি পশ্চিমের কোন উর্দু-কওয়া বিবিকে, বড় ঘর আর ছোট মাই-নেতে বনিবনা হয়নি। সাহেবের কি, ছুটি হলেই পালায় কলকাতা, ক্লান্ত হলেই মুক্তি পায় তার বইয়ের আকাশে, কিন্তু একটানা এই শাদা দিন আর কালো রাত্রি হানিফ কি করে কাটাবে? কি করে কাটাবে সে এই হাভাতেদের ভাতের কান্না শুনে?

চাকরিটা পেয়েছিলো সে ভাগ্যিস। নইলে সেও বুঝি আজ সরা হাতে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াতো, তারো দেশে বোধহয় এই সমান দুর্দশা। এই সমান পেট-পিঠ। পঙ্গপাল্ আসেনি, মাটিও আফলা নয়, তবু, চড়ুই পাখির জন্যেও এক কণা চাল নেই। তাদের মোষ দিয়েছে বেচে, দলিলের কারসাজিতেও জমিজিরাত রক্ষে পায়নি। হয়তো এমনি করেই লোক কাবার হয়ে যাচ্ছে। মুখ ভার করে থাকবার কোনো মানে হয় না তাই। পেট-ভাতায় কাজ করবার জন্যে কত লোক বসে আছে কাতার দিয়ে। তাই পিওনি না পাওয়ার জন্যে হানিফ নালিশ করে না যেন।

তবু, কেন-না-জানি তার ভীষণ একা লাগে। খিদে মেটে বটে, কিন্তু স্বাদ পায় না। ঘুরছে, অথচ মাধ্যাকর্ষণ নেই, এমন এক পৃথিবী। দলছাড়া।

'তুই যে দিনে-দিনে কাহিল হয়ে যাচ্ছিস।' সাহেব একেক দিন তার খবর নেয়।

'হজম হচ্ছে না, হুজুর।'

'তোর যে দেখছি ভীষণ বাবুয়ানা। লোকে খেতে পায় না আর তুই পাচ্ছিস না হজম করতে।'

'এখানকার জল হুজুর, বোদা, পানসে।'

'আর তোর হাতিয়ার জল তো লোনা।'

হানিফের চোখ চকচক করে ওঠে। বলে, 'সমুদ্রের সোয়াদ।'

সে স্বাদ যেন স্তিমিত হয়ে আসছে তার শরীরে। সাহেব বলে, 'পরিশ্রমের কাজ করবিনে, তাই ডোবায় এসে ডুবেছিস। নে, আজ থেকে মাটি কোপা, ক্ষেত কর। মুলো-বেগুন রো, কপি লাগা।'

সামনে অনেকখানি জমি পড়ে। সাহেব যন্ত্রপাতির জোগাড় দেখে, লাঙল আর মই, হেলা-কোদাল আর দাও-কোদাল। রেক আর খুরপি। হানিফ মুগুর দিয়ে ঢেলা ভাঙে, ঝারি করে জল ছিটোয় ভাবে, মাটির ফসলে তার কী হবে?

কে-একটা ভিখিরি মেয়ে এসেছে ভাত চাইতে, হাতে একটা মানের পাতা। তার চোখের দিকে চেয়ে থমকে যায় হানিফ। শুধু যে কাতর তা নয়, কেমন যেন গভীর। দেখামাত্রই দৃষ্টিটা যেন ফুরিয়ে যায় না, খানিকটা উদ্বৃত্ত থাকে। সমস্ত দেহের নৈরাশ্য পেরিয়েও তার চোখে যেন একটু স্বস্তির আভাস।

প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ, পচা-গলা একটা ন্যাতা কোনোক্রমে কোমর ও বুকের কাছে জড়ো করে রেখেছে—বয়েস বোঝা যায় না, শুধু চোখের কালোর থেকে যৌবনের অল্প যা অনুমান আসে, নইলে বুকে নেই এতটুকু স্তন-লেশ, গা-হাত-পা শুধু হাড়ের লুপ্তোদ্ধার। ধুলো-ঘসা একমাথা রুখু চুল, প্রথমটা দেখলে পাগল বলে মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য, এখনো সহিষ্ণুতা হারায়নি তার লজ্জার সজ্জাবোধ।

বেশ স্থির, স্পষ্টভাবে বলে : 'কিছু ভাত দেবে খেতে? ভাত!'

যেন প্রতিবাদের অবকাশও রাখে না। খিড়কির কাছে বসে পড়ে, ঝাঁজরা পাঁজরে ধুঁকতে থাকে। বলে : 'নেই কিছু? অন্তত ফ্যান খানিকটা? ফ্যানের সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া ক'টা শাদা ভাত?'

জোলা-কৈবর্তের মেয়ে হয়তো, খাবে কিনা তাদের রান্না কে জানে, অবান্তর সন্দেহে হানিফের মন দুলতে থাকে। জিগগেস করে : 'তোমার নাম কী?'

মৃদু গলায় মেয়েটা বলে : 'যতন বিবি।'

ফাঁপরের পর যেন হঠাৎ বাতাস নেয় ফুসফুস ভরে, হানিফ তার গোটা ভাতের থালাটাই উজোড় করে দেয় মেয়েটার মান-পাতায়। রতন নয়, যতন বিবি, যেন অনেক যত্ন অনেক সেবার সে প্রত্যাশী।

সামান্য একটা চাকর—ঠাট কত তার খাওয়ার, ভাতের মধ্যে গর্ত করে-করে ডাল-তরকারি নয়, আলাদা বাটি সাজিয়ে, আর দু দুটো কিনা আস্ত পারশে-মাছ! ভাতের পক্ষপাতের কথা একবার ভাবে হয়তো যতন। কিন্তু সামান্য যে চাকর তারো এই পক্ষপাতটা বা কম কিসে? এই ত্যাগ? আরেক রকম জলে ভিজে ওঠে তার চোখ দুটো।

ভাত নিয়ে চলে যাচ্ছিলো যতন, হানিফ চমকে ওঠে চেঁচিয়ে : 'ও কি, চলে যাচ্ছ যে? খাবে না?'

'এখানে বসে খেতে হবে?' কথায় কোমল একটা টান আনে যতন।
'নিশ্চয়।'
'তোমার সামনে?'
'একশো বার। নইলে ও-ভাত তোমাকে আমি বিক্রি করতে দেব নাকি?'
'বিক্রি যদি করি তবে তো ফের খাবার জন্যেই করবো। আর বিক্রি যে করবো, কিনবে কে?' তবু যতন দাতার মান রাখবার জন্যে চাপটি খেয়ে বসে ঘাসের উপর, গাছের ছায়া দেখে। ছোট গরস পাকিয়ে মুখে তোলে ছোট হাঁ করে, চিবোয় আস্তে-আস্তে, দাঁত দেখা যায় কি না যায়। জিভে ভারি হয়ে ওঠে পাতলা ঠোঁট দুটো, ছোট-ছোট ফেনা লেগে থাকে কশের কাছটাতে, জিভটা বড়শিতে-বেঁধা মাছের মতো ঘুরপাক খায়। চোখে একটি লোভের আবেশ লেগে থাকে।

ঠায় বসে-বসে দেখে হানিফ। পেন্সিলের মত সরু, শুকনো ডালে বসে কাক একটা কা-কা করে। হাতির পায়ের মতো মোটা চাকার লরি ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। পানা-পুকুরে এঁটো বাসনের পাঁজা নিয়ে এসে ও-পাড়ার কে বউ হঠাৎ ঘোমটা টেনে দেবার জন্যে হাত পায় না। ও-সব কি আজ আর হানিফের লক্ষ্যের মধ্যে? তাকের মধ্যে কাক দেখলেই সে ঢিল ছুঁড়ে মারে, লরি একটা যেতে দেখলে কতক্ষণ পর্যন্ত চোখে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে, বেপরদা কোনো মেয়ে-বউ কাছে এসে পড়লে সে নিজের থেকেই সরে যায় ব্যস্ত হয়ে। কিন্তু আজ ও-সব কিছুই দেখবার নয়। আজ দেখছে ও শুধু খাওয়া, কি করে যে খায়, চেটে-চেটে, চিবিয়ে-চিবিয়ে! শুধু দেখে না, শোনেও। তার নেবার সময় শোনে জিভের শব্দ, চিবোবার সময় দাঁতের, গেলবার সময় গলার। শোনে যেন হঠাৎ-সাড়া-পাওয়া তার রক্তের কুলুকুলু।

খাওয়া শেষ না হতেই উঠে পড়ে যতন বিবি। বলে : 'এ কটা থাক।'
'কেন? ওবেলার জন্যে?'
'এ বেলা জোটে না তো ও বেলা!'
'তবে? কালকের জন্যে? কেন, কালকে আবার এসো।'
'না, এ কটা বাড়ি নিয়ে যাই।'
'কেন, সেখানে কে আছে? বাপ-মা?'
'না, স্বামী।'

হানিফ পাতি-পাতি করে দেখে কতক্ষণ যতনকে। কে জানে কোথায় রয়েছে এর সমর্থন! পুরুষের পুজোয় লাগবে বলে এ-দেহে কোনোদিন আশকারা ছিল বিশ্বাস হয় না।

'ছেলেপিলে হয়েছে?'
আছে না, হয়েছে—প্রশ্নটা নিজেরই কানে কেমন খাপছাড়া শোনায়। যতন চোখ নামিয়ে বলে, 'না।'
স্বামীই যখন আছে তখন সে কোনো কাজ করে না? কাজ নেই তো,

নিজেই কেন বেরোয় না ভিক্ষে করতে? স্ত্রীর ভিক্ষে-করা ভাতে নিজের খিদে মেটাবে এই বা কেমন ধারা স্বামীপনা?

যতন যা বলে তা ওর স্বামীরই প্রতি হানিফের সহানুভূতি উদ্রেক করবার জন্যে। হাসনাবাদে আদককদের চালের কলে সে কুলিগিরি করতো, আড়াই-মণী একটা বস্তা তার পায়ের উপর পড়ে—কি করে যে ঘাড়ের উপর না পড়ে পায়ের উপর পড়লো তা কে বলবে—হয়তো, এক মুহূর্তে না মরে পচে-পচে মরবে এই নসিবের খেয়াল। এখন পায়ের হাড় টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ছে, চারদিকে ভনভন করছে গুয়ে মাছি, দুর্গন্ধে তার সামনে এগোয় এমন সাধ্যি কার? কিন্তু, বলো, তার খিদে পায় তো তবুও। কী হয় যদি সে একটু ভাগ দেয় তাকে?

মড়াখেকো একটা ঘেয়ো কুত্তা ল্যা-ল্যা করে হঠাৎ ছুটে আসে ভাতের দিকে। ক্ষুধায় সেও আজ দুঃসাহসী। যতন খেঁকিয়ে ওঠে, পাতাটা গুটিয়ে নেয় কোলের কাছে। হানিফ একটা ঢিল তুলে নেয় আলটপকা আর সজোরে ছুঁড়ে মারে কুকুরের নাক তাক ক'রে। সিধে লাগে এসে তার লোম-ওঠা ঘায়ের উপর, এখনো পাগল হয়নি বলেই সামনের মানুষকে না কামড়ে চলে যায় ককাতে-ককাতে। অথচ এই কুকুরটাই এতদিন হানিফের পাতের কুকুর ছিল। শুধু এঁটো-কাঁটা নয়, পরিষ্কার ক'টি আলাদা ভাত দুধ দিয়ে মাখা থাকতো ওর জন্যে। কিন্তু কে জানে ওর ঘাড়ের কাছে অমন জঘন্য ঘা!

তার পরের দিনও যতন ঠিক হাজির, ঠিক ভরদুপুরে, চাকর-বাকরের খাবার সময়। আজ হানিফ চারটি চাল ইচ্ছে করেই বেশি নিয়েছে, এদিক-ওদিক দু-হাতা দুধ হাত-সাফাই করে রেখে দিয়েছে মাটির খুরিতে। একটা মোটা ছেঁড়া বিছানার চাদর চুরি করেছে সাহেবের বোঁচকা থেকে। ভেবে রেখেছে কাল হাটের থেকে ক'গাছি কাচের চুড়ি কিনে আনবে। যতনের গায়ের উপর চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে হানিফ বলে, 'পরো'।

চাদরটা চিবুকের নিচে জড়ো করে ধরে যতন উছলে-উছলে একটু হাসে। বলে, 'কাল বাড়ি থেকে পরে আসবো।'

ঘেয়ো কুত্তাটা ঘুর-ঘুর করছে আশে-পাশে। হানিফ বলে, 'না, এখুনি পরতে হবে তোমাকে।' বলে সে আড়ালে একটু গা-ঢাকা দেয়। লজ্জার মাঝে লাবণ্যের উল্লেখ আনে।

অনেকখানি কাপড় নিয়ে আগোছালো হয়ে উঠতেই হানিফ স্পষ্ট টের পায় যতনের যৌবন, বুকের উপর আঁচল টেনে দেবার শৃঙ্খলায়, যে-লজ্জা এতক্ষণ ছিল না সে-লজ্জা হঠাৎ গায়ের উপর টেনে-আনায়। অনেকখানি আবরণ পেয়ে বেড়ে যায় তার রহস্য। অনেকখানি যেন অন্ধকার হয়ে থাকে। চট করে কেবল তখন হাড়ের কথাই মনে হয় না।

ঘেয়ো কুকুরটাকে ঘেঁসতেই দেয় না আজ কাছে! কুকুরটারও কেমন যেন সাহস হয় না। যতনকে তারো হয়তো সম্ভ্রান্ত মনে হয়।

দুধ দেখে একটু-বা আশান হয় যতনের। বলে, তার স্বামীর পায়ের ঘা এখন প্রায় গলা পর্যন্ত উঠেছে, চটকে দলা পাকিয়ে দিলেও কিছু গিলতে পারছে না। দুধটা যদি পায়, হয়তো টেনে নিতে পারে দু এক চুমুক।

রঙিন কাচের চুড়ি ঠিক করে রেখেছে, তার পরের দিন, অথচ দেখা নেই যতনের। আর কোথাও আস্তানা গাড়লো নাকি? বিছানার চাদরের বদলে শাড়ি জুটলো নাকি কোথাও?

না, ভোলেনি যতন, অন্তত ভোলেনি তার ক্ষুধাকে। দেরি একটু হতেই হবে আজ। গত রাত্রে তার স্বামী, গরিবুল্লা, মারা গেল, লোক জোটে না মাটি দেবার, কত হাঙ্গামা করে যন্ত্রণা চুকলো এতক্ষণে।

'কাঁদোনি ওর জন্যে?'

'কাঁদবো কেন? বেঁচে গেছে। বেঁচে গেছে ঘায়ের জ্বালা, খিদের জ্বালার থেকে।'

রোজ যেমন, তেমনি করেই খায় যতন, যেন বা অধিকতর তৃপ্তিতে।

ভাতে আর তার ভাগ নেই হয়তো তারি নিশ্চিন্ততায়। আজকের খাওয়া যেন তার আরোগ্যের খাওয়া।

কাচের চুড়ি ক'গাছ এগিয়ে দেয় হানিফ। বলে, 'পরবে নাকি?'

যতন আহ্লাদ করে নেয় হাত বাড়িয়ে, বলে, 'যদি কোনো দিন ফের মানুষ পাই মনের মতন, পরবো সেদিন।'

তার পর থেকে রোজই যতন আসে, সময়ের এতটুকু নড়চড় হয় না। ক্রমে-ক্রমে তার ভিক্ষেটা যেন দাবির চেহারা নেয়। আগে বাইরে ঘাসের উপর বসতো, এখন খিড়কির চৌকাট পেরিয়ে উঠোনে এসে বসে। এটা-ওটা চায় আজকাল। বলে, তেল দাও, চুলে জট পাকিয়ে গেছে। দেয় এনে হানিফ, সাহেবের গন্ধ-তেল চুরি করে। বলে, একখানা শাড়ি দাও না, চান করে উঠে পরবো। আপাতত হানিফ তার একটা গামছা দেয়, প'রে স্নান করবার জন্যে। বলে, এক টুকরো সাবান যদি দিতে পারো, চামড়ায় একটু চেকনাই আনি। হানিফ কাপড়কাচা সাবানের থেকে কেটে দেয় এক থাবা।

তার পরে যখন স্নান সেরে খেতে বসে, হানিফের ভয় হয় কেউ না দেখে ফেলে যতনকে। এক নজরে তাকে যেন আস্তাকুঁড়-কুড়োনো ভিক্ষুক বলে মনে হয় না।

বদনা করে জল পর্যন্ত সে চেয়ে নেয়। জল খেয়ে বলে ঘুমো চোখে, 'এখানে থাকতে পেলে মন্দ হতো না।'

কেমন যেন বেখাপ্পা শোনায় কথাটা। হানিফ কাঠখোট্টার মতো বলে, 'না, এখানে কাজ কোথায়!'

সেদিন যতন এসে নতুন রকম নালিশ করে হানিফের কাছে। বেশ পষ্টাপষ্টি ব্যক্ত করে যতন। বলে, এদিকে আসবার সময় কে-একটা লোক হঠাৎ তাকে ডেকেছিলো হাতছানি দিয়ে, এবং কাছে যেতেই পকেটে খুচরো

কটা পয়সা বাজিয়ে এমন একটা ইঙ্গিত করেছিলো যেটা অত্যন্ত ঘেন্নার। জামাটা ফতুয়া আর বাজছে যা পকেটে, নিতান্তই টিঙ টিঙ! যতন ঠাট্টা করে ওঠে। কেমন চোখ ঘুরে যায় হানিফের। হঠাৎ দ্রুত, তীক্ষ্ন আরেক-রকম চোখে দেখে সে যতনকে। সত্যিই তো, ভোল বদলে গেছে তার চেহারার। গাল দুটো প্রায় ভরা-ভরা, বুকের মধ্যিখানটায় থর ফেলে দুপাশ থেকে প্রায় গোল হয়ে উঠেছে, চলা-বসায় এসেছে অনেক ভার আর গরিমা। পাতা-ঝরা গাছে কখন ফের হঠাৎ ফুল গজায়, কে জেগে তাকিয়ে থাকতে পারে সারাক্ষণ! এক সময় বিস্ময় এসে ধাক্কা দেয় আকস্মিক। তেমনি যেন হানিফ একটা ধাক্কা খায়। নতুন চোখে তাকাতেই যতন হাসে তেরছা করে। হানিফ দেখে তার হাসিতে এখন চাকুর চাকচিক্য।

এ একা হানিফের কীর্তি। পাঁচজনের মাঝে অপচয় না করে সে এক-জনকে তোয়াজ করেছে। শুধু তাকে খাদ্য দেয়নি, দিয়েছে স্বাস্থ্য, ফিরিয়ে এনেছে তার যৌবন, যা ছিল এত দিন অপাঠ্য, চিহ্নহীন। তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সে এখন স্বাধীন দুই পায়ের উপর।

'লোকটা কে?' জিগগেস করে হানিফ।

'দেখিয়ে দেব'খন।' হেসে উত্তর দেয় যতন।

হারান সানা, বেঞ্চ-কোর্টের কেরানি, যতন দেখিয়ে দেয় এক দিন। ঘেয়ো কুকুরটা অনেক আগেই মরে গেছে, কিন্তু হারান মরেনি। ঝোপের ভিতর থেকে, অন্ধকারে, শক্ত একটা ঢিল হারানের কপালে এসে লাগে, যেন মাথার মধ্যে ঢুকে ঘুঙরি পোকার মতো পাক খেতে থাকে। যেন এবার সে হাঁসপাতালে আটক থাকে কিছুকাল, যতনকে হাতছানি মেরে না আর পকেট বাজায়!

এবার যতন চাকরি নিক কোথাও, ঢেঁকিকলে বা মটকা-মাচানে। কলে হলেই বা মন্দ কী। এখন তার গায়ে মাংস হয়েছে, হাড়ে এসেছে শক্তি, ডৌল এসেছে পায়ের গোছে, পাছায় আর কোমরে। আর তার হাত গুটিয়ে থাকবার মানে হয় না। ভাতের থালা পাতা আছে বলেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়বে সে কী কথা? না, এত লোভ তার ভালো নয়। শেষকালে মুস্কিল হয়ে যেতে পারে।

তবু যতন শুনবে না। পর দিন ফের আসবে ভাত খেতে। রান্নার প্রশংসা করে যাবে।

সাহেবের চোখ এড়াতে পারলেও কুদ্দুসকে লুকোনো যায়নি।

'মুনিবের আর কত লোকসান করাবি, হানিফ?' কুদ্দুস নালিশ করে!

'সত্যি। খাইয়ে-খাইয়ে নাই বেড়ে গেছে মেয়েটার।' হানিফ যে বিরক্ত হয়ে উঠেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'দিব্যি ভরা-ভরতি হয়ে উঠেছে, তবু কাজ নেবে না কোথাও।'

'তার শেষ দান যে দেয়া হয়নি এখনো।'

হানিফের চেয়ে কুন্দুস ঢের বেশি শহুরে, ঘোরালো। কথাটা হানিফ বুঝতে পারে না তলিয়ে। বলে, 'কী আবার চায় সে?'

'তোকে চায়। তাই চলে যেতে পারছে না।'

সত্যিই বোকা মোষ। অন্ধকার হঠাৎ পাতলা হয়ে আসে, বাতাস হালকা, আকাশ পরিষ্কার। এটুকু কৃতজ্ঞতা, এটুকু প্রতিদান না থাকলে চলবে কেন? আর কে না জানে, যতন তার নিজের হাতের তৈরি, মাটির পরেকার প্রতিমা! তার নিজের প্রাপ্য!

'এক দিন এসো না সন্ধেসন্ধি।' শহুরে, ষড়যন্ত্রীর গলায় হানিফ বলে।

যতনের বুক যেন থরথর করে ওঠে। গলা নিচু করে বলে, 'কবে?'

'তোমার যেদিন ইচ্ছে।'

'কোথায়?'

কী বলবে কিছু ভেবে না পেয়ে হানিফ বলে, 'নদীর পারে—নৌকোতে।' পরে হঠাৎ দম নেয় : 'শোনো, সেদিন নতুন ঐ শাড়িটা পরে এসো।'

'আসবো।' এ যেন তার কর্তব্য, প্রায় ভাগ্য বলা যেতে পারে, যতন বলে প্রায় এমনি ভাবেই।

বাঁকা ছুরির মতো চাঁদ-বেঁধা আকাশে, জানানো-শোনানো নেই, যতন এসে হাজির। পরনে হানিফের কিনে-দেয়া খড়কে-ডুরে শাড়ি, গায়ে ছিটের কাঁচুলি, হাতে সেই কাচের চুড়িগুলি ঝকমক করছে। চলছে যেন নিজেকে বইতে পারছে না।

'চলেছ কোথায়?' হানিফ বোকার মতো হাঁ করে থাকে।

'বা রে, জানে না যেন।' যতন রঙ্গ করে হাসে। ঝাপসা গলায় বলে, 'নদীতে, নৌকোয়।'

বাড়ির পিছনেই মরা নদী, পথটুকু হানিফ শ্রান্তের মতোই পার হয়।

'আমি এমন নেমকহারাম নই। যে আমাকে এতদিন খাওয়ালো-পরালো, যার দৌলতে বেঁচে গেলাম এই মহামারী থেকে, যার পয়সায় আমার এই শাড়ি-জামা চুড়ি-বালা তাকে আমি ফেরাতে পারবো না কিছুতেই।' যতনের গলা কৃতজ্ঞতায় নম্র, আচ্ছন্ন।

ঘাটের থেকে দূরে বাঁধা হয়েছে নৌকো। পারে দাঁড়িয়ে কুন্দুস, আর নৌকোর মধ্যে গুড়ি মেরে ব'সে স্বয়ং সাহেব।

পা ভিজিয়ে যতন নৌকোয় ওঠে। হাঁটু দুমড়ে বসে গিয়ে ভিতরে। কুন্দুস হানিফকে লক্ষ্য করে হাসিতে ভেঙে পড়ে হঠাৎ।

যেন কে যতনকে নিয়ে যাচ্ছে তার আশ্রয় থেকে, তার রক্ষণাবেক্ষণ থেকে, তার হাতে-গড়া মূর্তির ছাঁদ কে বদলে দিচ্ছে রাতারাতি—দিশেহারার মতো হানিফ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য করে, বাহুতে আর তার সেই বেগ নেই, জলেও নেই আর সেই ঢেউ, সেই [illegible]।

৮ । মেথর-ধাঙড়

'পরাণের হুঁকা রে,'

কে রাখিল তোর নাম ভাবনা রে—'

গলা ছেড়ে গান গাইছে গাড়োয়ান, গো-গাড়ির গাড়োয়ান। গাইছে আচ্ছন্নের মত। খড়ের গাদা নিয়ে যাচ্ছে বোঝাই করে। বাবুই ঘাসের বাঁধের সঙ্গে হুঁকোটা লটকানো। রথের ধ্বজার মত। হুঁকোটা চোখের সামনে নেই, কিন্তু মন জুড়ে রয়েছে। কতক্ষণে পথ ফুরাবে না-জানি। গাছের ছায়ায় বসবে বন্ধুকে নিয়ে। অদিনের বন্ধু।

গাঁ ছেড়ে শহরের হুদ্দার মধ্যে গাড়ি এসেছে।

'কে যায়? এই রোকো।' মওড়া নিল ধনপতি। হাঁকার দিয়ে উঠল।

ভাল গাড়ির টানে পিছের গাড়ি যায়। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল লাইন দিয়ে। কি ব্যাপার?

কী ব্যাপার? মুনিসিপালটির ইলেকার মধ্যে এসে পড়েছ। গাড়ি পাশ করাতে হবে না?

ধনপতি মুনিসিপালটির ট্যাক্সো-দারোগা। গরুর গাড়ির ট্যাক্সো আদায় করে। কোথায় গরুর গাড়ির আঁট, কোথায় গাড়ি মোড় ঘোরে—রঁদ দিয়ে বেড়ায়। দেখতে পেলেই চিলের মত ছোঁ দিয়ে পড়ে।

মুনিসিপালটির রাস্তার মধ্যে এসে পড়লেই গাড়ির টিকিট কাটতে হবে। প্রতি গাড়ি বারো আনা। মাটির রাস্তা ছেড়ে সুরকির রাস্তায় এসেছ, খাজনা দিতে হবে না? গরুর গাড়ির চাকায় বাঁধা রাস্তা ধ্বসে ভেঙে যাচ্ছে না? মেরামতি-মেহনতি কে দেয়?

টিকিট নেব না কি। পাঁচ আইনে চালান হবে। আইনের আমল পরের কথা, আগে লাঠির আমলে এস। পাঁচন কেড়ে নিয়ে ধনপতি মারলে এক ঘা।

ধনপতির সে এক খাণ্ডার মূর্তি। টিকিট কেটে বেঁধে দিলে শলির মধ্যে। পাশ করিয়ে দিলে।

সব সময়েই কি ধনপতির এমন রণমুখো চেহারা? কে বলে?

মেথররা বলে ধনপত সাহেব আমাদের মাটিয়া ঠাকুর। আমাদের মরা-হাড়ায় বিমারে-বোখারে তিয়াসে-উপোসে ও আমাদের বাপ-মা।

খোসামোদ করে বলে না। মনের থেকে বলে।

কেন বলে?

'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।' পাগড়ি মাথায় ধনপতি চলে আসে মেথর-পটিতে। চলে আসে খবরাগিরি করতে।

তার হাত-ভরা নানান রকম কাগজ-পত্র, মুড়ি-চেক, হিসেব-কিতেব। জামার বুক-পকেটে নোটের থাক। পাগড়ির ভাঁজে পেন্সিল গোঁজা।

কার-কার টাকার দরকার?

পেরুয়ার দু'দিন ধরে ঠেঙ্গা জ্বর, কাজে বেরুতে পাচ্ছে না। এই নে এক টাকা। সোনেলাল মদ পিয়ে হাতের পয়সা সব ফুঁকে দিয়েছে, উনুন জ্বলে না। বাজার বেসাত হবে না কিছু। এই নে আট আনা। মিলিটারি হাস-পাতালে কাল হয়েছে ফেকুরামের। মাটি দিতে হবে। ঢাকনের কাপড়-লাগবে। এই নে দু'টাকা।

খাতার পাতায় ঘষে-ঘষে ভোঁতা পেন্সিল ধার করে হিসেব লেখে ধনপত।

আর-আর কেউ দাঁড়ায় পাশ ঘেঁষে। হাত বাড়াবার জন্যে উসখুস করে।

'হোবে, হোবে, দু-চার দিন হামাকে জিরেন লিতে দে। বেশি ঠেকা-ঠোকা হয় যাবি আমার সেরেস্তায়। শিলিপ দেব।'

মেথররা ঘিরে দাঁড়ায় ধনপতিকে। খুশিতে সোরগোল করে। ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত—ধনপত ছাড়া আমাদের কেউ নাই তিরিসংসারে। চেয়ারম্যান ফত্তোলবাবু, দু'আঙুলে কেবল টাক চুলকায়। ডাগদর যে একজন আছে সে তো লাট সাহেবের ভায়রা, বলে, ইস, আমি যাব মেথর-পটিতে রুগী দেখতে? সাতগুষ্টি মরে যাবে তো ফিরেও দেখবে না। আর আছে টোপ-মাথায় ওভারসার বাবু, সে তো ঠেঁটি পরে ঘুরে বেড়ায় সাইকেলে। আমাদের থাকার মধ্যে আছে এই ধনপত। ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত।

'তুমি মাথায় পাগড়ি পিন্দেছ কেন? কেমন পেয়াদা-পেয়াদা মনে হয়।'

'আরে, এ পাগড়ি হল একঠো বাহার। মাথার উপর বাবা বরত্‌মান। বাবা বম ভোলা।'

হেসে ওঠে সবাই।

এমনি খোসগল্প করে ধনপতি। বলে, 'আমার বাতটা সমাঝাইলে না? বাপ ছেলিয়ার দুখ-দরদ সামলিহে চলে তো? তেমনি এ পাগড়ি দু'-একটা লাঠির বাড়ি জরুর সামলাহে লিবে। তার পর ফাটলে-চোটলে বান্ডিজ হোবে, সাপ ছোবলালে দড়ি পাকাবে, নদী পারে কোপনি হোবে, গর্মিকালে পঙখা হোবে—'

বলতে বলতে হাসতে হাসতে চলে গেল ধনপতি।

আর অমনি পেরুয়া আর সোনেলাল আর ফেকুরামের ছেলে বাঙাড়ী চলল মাতালশালায়। হাতে করকরে কাঁচা পয়সা। এক গলা না খেয়ে নিলেই নয়।

জীবন-ভোর এই মদের তিয়াস। মাসে তিরিশ দিন। ভাত হবে না না-হোক, কিন্তু চাই পচাই আর রসুই। ভেতো মদ।

দিগেন সার মদের দোকান। ঠিক মেথর পটির লাগ-পাশে। পোড়া-পোড়া করে চাল সেদ্ধ করে চ্যাটাইয়ে মেলে দেয় রোদ্দুরে। বাখর গুঁড়ো মেশায়। আবার ভাপে সেদ্ধ করে মদ করে।

এদের সুখের সায়র দৈবে শুকিয়ে গেছে, তৃষ্ণায় প্রাণ আইঢাই। গলায় আধ সের ঢেলে দাও, সরকার।

সকালবেলা ভিজে ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায় স্ত্রী-পুরুষে। যার-যার ইলাকা ঠিক আছে। যার-যার যজমান। মেয়েরাও বেরোয় বলে সকাল বেলা রান্না হয় না। পুরুষেরা প্রথমে যায় বাজারে—রাস্তায় গোঁজা সাফ করে; মেয়েরা যায় বরান্দ ধোলাইয়ের কাজে। ঘুরে-ঘুরে ধোলাইয়ের কাজ সেরে মেয়েরা বাড়ি ফিরে যায় রান্নার জোগাড়ে। রাস্তা থেকে পুরুষদের ময়লার কাজে যাবার কথা। কেউ যায়, কেউ যায় না। খুঁজে বেড়ায় কোথাও বাংলা কাজ আছে কি না। মুনিসিপালিটির যে-যে ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন-ট্যাক্স নেই সে-সে পাড়ায় কারু-কারু ডাক আসে। তাও কালে-ভদ্রে। বেশির ভাগ লোকই মাঠে সারে।

ফালতু কাজ যে-দিন পায় মন্দ রোজগার হয় না। সারা দিন খেটে-পিটে হেলন্ত বেলায় মাতালশালায় গিয়ে ঢোকে। কাতারবন্দী হয়ে বসে। ডোমেরা—মানে যারা মুন্দোফরাস—তারা মেথরের চেয়ে নিচু। বসে তারা একটু ফারাক হয়ে। হাড়িরা সব চেয়ে উঁচু, মেথরের তারা মহাজন, মেথরকে তারা শুয়োর বেচে—তারা বসে আগ বাড়িয়ে।

যে যেখানেই বোসো, ভাঁড়ে-গেলাসে খেতে পাবে না। অশুচি এঁটো ভাঁড় ফেলবে কোথায়? আর, বাড়ি থেকে যে আনবে তার ফুরসৎ কই? আর, ঘড়াঘটি গেলাস-ফেরো আছে না কি কারুর? শুধু কেলে-হাঁড়ি আর মাটির কলসি। তা ছাড়া, যাবে তো পেটে, অত ঠাট-বাটে দরকার কি।

দরকার নেই। গলা উঁচু করে হাঁ করে বসে থাকো। এক ঢোঁকেই বেশি নিতে চাও কখনো, বোসো হাঁটু গেড়ে।

পাঁচ আনা করে সের। বাটখারাতে ওজন করে দেয় দিগেন সা। ছোঁয়া বাঁচিয়ে ওপর থেকে ঢেলে দেয় সরকার। ঢক-ঢক। ঢক-ঢক-ঢক।

'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।'

মদ খেয়ে এই নরকের যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ খোঁজে।

টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। ফিরেই বলে, গরম ভাত দে। বৌরা আশা করে থাকে হয়তো তাদের জন্য নিয়ে আসবে কিছু ভাঁড়ে করে। সোয়ামীরা বলে, আমদানি কিচ্ছু নেই। আর দুটো দিন সবুর কর—

থাবা-থাবা ভাত খেয়ে এঁটো মুখ-হাত ভাল করে ধুয়ে-না-ধুয়েই শুয়ে পড়ে তালায়ের ওপর।

স্ত্রীরা আশা করে থাকে সোয়ামীরা মাছ তরকারি চালডাল নিয়ে আসবে। কিন্তু যা নগদান রোজগার করে সব যায় মদের অন্দরে। এক পয়সাও ফেরে না। তখন ধনপতের খোঁজ পড়ে। বলে, শিলিপ দাও।

ধনপত শিলিপ কাটে। শিলিপ যায় যাদু ঘোষের মুদিখানায়। যাদু ঘোষ প্রতি টাকায় এক আনা করে মাসিক সুদ আদায় করে। নামে-নামে হিসেব রাখে। ধনপতের আট আনা বখরা।

ঘরগুষ্টি জ্বরে পড়েছে, ছেলে একটা মরেছে কি হয়েছে—নগদ টাকা চাও, ধনপত পত্রপাঠ দাদন দেবে। কিন্তু টাকায় ঐ এক আনা সুদ। এক টাকা ধার তো পনেরো আনা পাবে—হাতে কেটে নিয়ে তবে দাদন। সুদের চিন্তা কে করে? এখন সমূহ বিপদ থেকে তো বাঁচায়।

ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত। আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

একসামিলী চালানে মেথরদের মোট মাইনে ধনপতই ট্রেজারি থেকে বের করে আনে। ট্রেজারির বাইরে রাস্তার উপর গাদি মেরে বসে থাকে মেথর-মেথরানি। কাটাকুটি হয়ে কার কত মিলবে কারুরই কোনো হদিশ-নুটিশ নেই। নাম ধরে-ধরে নিখুঁত হিসেব করে রেখেছে ধনপত। সুদ-আসল মুশমা দিয়ে নিট করে রেখেছে। তুই লালচাঁদ তেরো আনা। তুই বিলাসী সাত সিকে, মুঙ্গিয়া দু'টাকা, তুই ঝুলনি সাড়ে আট আনা—

ঝুলনি মুখ ম্লান করে বলে, 'মোটে সাড়ে আট আনা!'

ধনপত ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'হিসেবে আমার কালির আঁচড়েও ভুল নেই। গেল মাসে তোর বেটা-বিটি মরে গেলে না জ্বর হয়ে? ওষুধ খাওয়ালি না? মাটি দিলি না?'

'অত কচাল কিসের?' বলে উঠল বিরিজলাল : 'নেবেও ধনপত দেবেও ধনপত। ধনপত ছাড়া আমাদের গতিমুক্তি কই?'

ঝুলনি যত্ন করে আঁচলের গিঁটে পয়সা বাঁধে।

তনখা কত তোদের?

জিগগেস করে স্বদেশী বাবু। আমাদের মণিলাল। জমিদারের ছেলে। বেকার বসে না থেকে দেশের কাজে লেগেছে। দেশের কাজ মানেই দুঃস্থ-দুঃখীর কাজ। আর সব চেয়ে অধন-অধম, সব চেয়ে অধঃপেতে আর কে আছে এই মেথর-ধাঙড় ছাড়া?

তনখা বলতে বারো-চোদ্দ, ভাতা বলতে পাঁচ টাকা। এতে কী হয়? এতে তো জল গরমও হয় না।

ক'ঘর আছিস তোরা?

আগে প্রায় পঞ্চাশ ঘর ছিনু। আকালের বছর বহুৎ উজাড় হয়ে গেল। মাটি দেয়া গেল না, বাঁশে বেঁধে একে-একে নদীতে ফেলে দিয়ে এনু! এখন আছি মোটে কুড়ি-বাইশ জন—জরু-খসম নিয়ে। হাড়-জিরজিরে গা, শরীর একেবারে নাই হয়ে গেছে। জোয়ান-ভর্তি বয়সের যে ক'টা মেয়ে ছিল ব্যামোয়-ব্যামোয় জেরবার হবার আগেই পাঠিয়ে দিনু শহরে-বাজারে। কলকাতায়। তবু খেয়ে-পরে থাক বেঁচে-বর্তে। এইখানে পড়ে আছি আমরা বুড়ো-হাবড়া আর ক'টা গুঁড়োগাড়া। ছেলে যে ক'টা বড় হচ্ছে বিয়ে-সাদি হতে পাচ্ছে না। বউ আনতে হয় দুমকা নয়তো ভাগলপুর থেকে, কিন্তু বউ কিনে আনি তেমন পয়সা কই? তারা আসবে কেন এই ভাগাড়ে? বলে, খেতে খুদ নেই বসতে পিঁড়ে।

তোমাদের সর্দার কে? সর্দার বিরিজলাল। তন্তুসার চেহারা, রোগে-রোগে ধুঁকছে, ঢকঢকে হয়ে গেছে। সমস্ত গায়ে খোস-চুলকানি। এক দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, সব সময়েই খসখস ঘসঘস করছে।

শুধু একা আমার নয় হুজুর। ঘরগুষ্টি সকলের এই খুজলিপাঁচড়া।

দেখুন এই ঘর-দোরের অবস্থা। মাটির মেঝে, মাটির দেয়াল, খ্যাঁড়ের চাল। জায়গায়-জায়গায় খড় খসে পড়ছে। বাদলা হলে নালে জল পড়ে। ঐ দেখুন সব ফাঁক-ফর্সা হয়ে আছে, এখনো মেরামত হল না। এ কি মানুষের ঘর-দুয়ার? না আঁটকুড়-পাঁটকুড়?

তার পর, একেকটা ঘরে একেকটা পরিবার। এক ঘরেই শোয়া-বসা খাওয়া-পরা জনম-মরণ। আড়াল-আবডাল নেই। এক কোণে ছেলে হচ্ছে, আরেক কোণে মরছে। বাপ-মা মেয়ে-জামাই ছেলে-বউ সব এক কামরা। ঘেরা-বেড়া নেই, সব এক সামিল।

শুধু কি তাই? এই দেখুন দেয়ালে-মেঝেতে ছারপোকা থিক-থিক করছে। কেঁথা-কানি, তালাই-চাটাই এমন কি রুটি-চাপাটির মধ্যে ছারপোকা। আর মশা? সন্ধ্যে হবে, মনে হবে ঝম্প বাজছে। বাঁচি কি করে? ভুলি কি করে? ঘুমে অসাড় হয়ে যাই কি করে?

মানুষের অধঃপাতে যাওয়া কাকে বলে মানুষ হয়ে দেখছে তাই মণিলাল। এর প্রতিকার কি? মেথরের দল শূন্য চোখে চেয়ে রইল।

'চেয়ারম্যানকে বলেছ?'

বলে-বলে হদ্দ। কিছু করেন না। শুধু ঠেঙা মেরে কথা বলেন। বলেন, হাকিম নিম-হাকিমদের সঙ্গে খাতির-পীরিত করবার জন্যে চেয়ারম্যান হয়েছি, চেয়ারম্যান হয়েছি কি মেথর-মুদ্দোফরাসের ঝামেলা পোহাতে?

'ভাইস-চেয়ারম্যান?'

সে আছে তদন্ত-তদবিরে। কে নকসা-মত দেয়াল তুলছে না। কার পাইখানা রাস্তার উপর উঠে আসছে তার তালাসে-নালিশে। এক কথায় ঘুষের ফিকিরে। আমরা কিছু বলতে গেলে বলে, খোদ থাকতে আমার কাছে কেন?

'ডাক্তার?'

গায়ে হাত ঠেকাবে না, ছোঁয়া লেগে জাত যাবে। এমন কি বুকে জাড় লাগলেও কম্পাস লাগিয়ে দেখবে না আমাদের বুক-পিঠ।

'আর ওভারসিয়ার বাবু?'

ও তো লাটসাহেবের ছোট নাতি। মাথায় ধুঁচনি এঁটে সাইকেল মারবে রাস্তায় রাস্তায়। আর ফন্দি খুঁজবে জরিমানা করতে পারে কি না।

'তবে তোমাদের দেখে-শোনে কে?'

'দেখে তো ধনপত, শোনে তো ধনপত। আর আমাদের কেউ নেই।'

'কিন্তু ও তো টাকায় এক আনা করে সুদ নেয়।' ঝাঁজিয়ে উঠল মণিলাল।

তা নেবে বৈ কি। নইলে ঘরের টাকা সে দাদন দেবে কেন? কম সুদে আর কে দিচ্ছে তাদেরকে? মরা-হাজায় ব্যামো-পীড়ায় মদে-ভাঙে আর কার কাছে গিয়ে তারা হাত পাতবে? সুদের হার চড়া রেখেছে বলেই তো রাশ রেখেছে একটা, নইলে কবে দফা নিকেশ হয়ে যেত। হাঁড়িতে আর চাল চাপত না, ঘসি-কাঠি জোগাড় হত না উনুনের। ওষুধ আসত না।

'যা পেতাম তা মদ খেয়েই টেঁসে দিতাম।'

'মদ রোজ চাই?'

'বারো মাস, তিরিশ দিন। নোংরা ঘেঁটে এসে—যেখানে আমরা ঘাঁটি নি—সে জায়গা যে আউর ভি নোংরা। যদি মদ না খাই সে নোংরা আমরা ভুলি কি করে? ঘর আঁধার করে দিয়ে ঘুমাই কি করে অজ্ঞানের মত?'

'আগে তোমাদের এখানে কাবলিওয়ালা আসত?'

'ও, অনেক। ও শালারা সব পালিয়ে গেছে।'

'যায়নি পালিয়ে। ধনপত সেই কাবলিওয়ালার সাকরেদ। কাবলি-ওয়ালার পাকানো লাঠি এখন তার হাতে বেঁটে পেনসিল হয়েছে।'

ছি ছি ছি, এ কি কথা। এ বাত ঠিক নয়। ধনপত তাদের দেবতা। ফাগুন মাসে তারা যে সূর্যি-পুজো করে সেই সূয্যিঠাকুর।

মণিলাল এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো। বললে, 'মাইনের টাকা পাও কত হাতে?'

কেউ বারো আনা, কেউ দেড় টাকা, কেউ বড় জোর ন' সিকে।

সতেরো টাকার মধ্যে? বাকি টাকা যায় কোথায়? ধনপতের পাগড়ির ভাঁজে। পাগড়ি ফুঁড়ে পেটের মধ্যে।

তা ছাড়া উপায় কি। সারা মাস হাওলাত করে খেয়েছি তার উশুল নেবে না ধনপত? হাওলাত না করে উপায় কি আমাদের? বাংলা কাজ যা পাই মদ খেয়ে বাজারের জন্যে কিছুই বাঁচাতে পারি না। বালক বেলা থেকে মদ খাচ্ছি; পালে-পরবে, শ্রাদ্ধে-ভোজে তেজী হয়ে ওঠে মদের খাঁই। আমাদের মদ ছাড়তে বলাও যা, মহাজনকে সুদ ছাড়তে বলাও তাই। আর এ মহাজন সুদ নিলে কি হবে, তদবির তদারকও এ-ই করে। শিলিপ কাটিয়ে মুদি-দোকান থেকে চাল-ডাল তেল-নুন বাড়ি পাঠায়। উটকো ডাক্তার ডাকায়। ঘর-দোর সায় করে।

যদি বলতে হয় চেয়ারম্যানকে গিয়ে বলুন। চেয়ারের পায়া ভেঙে দিন। ভাইস-চেয়ারম্যানের ঘুষ নেয়া বের করে দিন। ডাক্তারের হাত থেকে কেড়ে নিন কম্পাস। টুপিমাথায় ওভারসিয়ারকে নামিয়ে দিন সাইকেল থেকে। গরিবের বন্ধু ছোট-চাকুরে এই ধনপতি—তার পিছে লাগা কেন? গরিবের তত্ত্বতালাস করে যে, গরিবের সঙ্গে ওঠাবসা করে যে, তার যত অপরাধ। আর তোমরা যারা বড়লোক—চেয়ারম্যান আর কমিশনার—তোমাদের কোনো জবাবদিহি নেই।

'কিন্তু'। মণিলাল খুশিমুখে বলল, 'বড়লোকেরা যদি না শোনে, তা হলে?'
তা হলে আর কি। এমন করে খসে-খসে পচে মরব।
'তোমরা শুয়োর খাও না?'
'পাই কোথায়? দর-দাম ঠান্ডা নেই আজকাল।'
'খেতে বলছি না। কিন্তু শুয়োর কী ভাবে থাকে দেখেছ তো?'
'দেখব কি। সেই ভাবেই আছি আমরা।'
'কিন্তু এ ভাবে থাকবার দিন দূর করে দিতে হবে জোর করে। তোমরা স্ট্রাইক করবে।'
'টাইট' করবে। এমন কথা শুনেছে তারা হাওয়াতে। 'টাইট' করলে দুর্দিনের জগদ্দল পাথর সরিয়ে দিতে পারবে তারা।
বেশি কিছু চাই না। ঘর বাড়াতে হবে, চাল ছাওয়াতে হবে, মাইনে বাড়াতে হবে পাঁচ টাকা।
'যাতে, আমদানি ভাল হলে, আমরাও একটু পিতে পারি দারু-উরু।' বললে মেথরানিরা।
জটিল মামলা সওয়াল করবার সময় দু'আঙুলে টাক চুলকোন ননী বাবু। বলেন, করি কী বল? মিউনিসিপ্যালিটির আয় কই? ময়লার গাড়ি ভেঙে পড়ে আছে কিনতে পারি না। বারে-বারে জলের ট্যাঙ্ক যাচ্ছে ফুটো হয়ে, মেরামতির মাশুল নেই। কলকব্জার দাম বেড়ে গেছে দু'শো গুণ।
শুধু মানুষের কলকব্জাই জং ধরে অচল হয়ে যাক। বাকি ওয়ার্ড-গুলোতে ল্যাট্রিন ট্যাঙ্ক বসান না কেন?
ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড কাটাতে হবে যে তার পয়সা কই?
এমনি জেনারেল রেট বাড়িয়ে দিতে বাধা কি? প্রফেসন্যাল ট্যাক্সও তো বসেনি এখনো।
ওরে বাবা, আবার ট্যাক্সো! তা হলে আগামী মেয়াদে আর রিটার্ন হতে পারব না। জানো তো, দু'বছর উকিল এক বছর মোক্তার—এই প্যাক্ট হয়ে আছে এখানে। আমার আরো এক মেয়াদ বাকি। তোমার কানে-কানে বলি, সে কি আমি খোয়াতে পারি?
আর কিছু না পারেন, ধনপতিকে ডিসমিস করুন। শুষে-শুষে শেষ করলে সে ধাঙড়দের। টাকায় এক আনা করে মাসে-মাসে সুদ নেবে এমন আইন আবার চালু হল করে? এক হাত ঘাড়ে এক হাত পায়ে—এমন বদমাস আর দেখা যায় না।
তাই না কি? কই, মেথররা তো নালিশ করেনি কোনো দিন! ননী বাবু বোকা সাজলেন : 'আমরা বরং জানি ধনপতি ওদের ঝক্কি নিয়ে আছে, আপদে-বিপদে বুক দিয়ে পড়ছে। তাই না রে বিরিজলাল?'
ভেজা বেরালের মত চেহারা করে আছে বিরিজলাল, মোক্তারের পিছে মুহুরির মত। কী কথা বলা ঠিক হবে কে জানে।

চোখ চেয়ে তোলান দিতে লাগল মণিলাল। বিরিজলাল বললে, 'ওই তো আমাদের সব দুঃখ-ধান্দার মূল, বাবু। আমাদের মাইনের টাকা ঘরে আনতে দেয় না। কর্জ খাইয়ে নাজেহাল করে রাখে।'

প্লাস-মাইনাস চশমার কোন অংশে চোখ রেখে বিরিজলালের মুখের দিকে তাকাবেন পলকের জন্যে ননীবাবু ঠিক করতে পারলেন না।

গর্বে মণিলালের বুক ফুলে উঠল। বোবার মুখে বোল ফোটাতে পেরেছে। এখন খোঁড়াকে দিয়ে পাহাড় ডিঙোতে হবে।

ভাইস-চেয়ারম্যান কোথায়?

সে গেছে এনকোয়ারি করতে। তার বারো মাস এনকোয়ারি। কে মুনিসিপালটির মাটি কাটল, নর্দমা মারল রাস্তা ঠেলল তার সরজমিন তদন্ত। তার মানে, হাতে-হাতে কিছু দাও, ফর্সা রিপোর্ট যাবে। আর কমিশনর বাবুরা কোথায়? তারা সব কন্ট্রাক্টরের বাড়িতে। বেনামদারের মুনফা নিতে। আর, আপনি বুঝি ডাক্তার?

নামটা শুনতে অমনি জমকালো। খুদ খেয়ে দুধের ঢেঁকুর তুলছি। মাইনে মোটে কুড়ি টাকা। পোষায় না, মশায়। ওরা-আমরা সব এক দলে। যেমন কন্যা রূপবতী তেমনি পাত্র মাধা তাঁতি। স্ট্রাইক করিয়ে দিন, মশায়।

তা আর বলে দিতে হবে না আপনাকে।

ঐ, ঐ যাচ্ছে লাট সাহেবের ছোট নাতি। টোপ মাথায় ওভারসিয়র বাবু।

ওকে ধরে কী হবে? কাশতে গেলে কোপনি ছেঁড়ে ওর কী মুরোদ।

ধনপতি কোথায়?

ধনপতকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধনপত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখ একবার মজাটা। আগে দেনদার পালিয়ে বেড়াত, এখন মহাজন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

দরকার নেই জবাবদিহিতে, তর্কাতর্কিতে। কথা ছেড়ে কাজ করো। নিজের পায়ে দাঁড়াও।

হ্যাঁ, 'টাইট' করল মেথররা। দাবি তাদের যৎসামান্য। ঘর না বাড়াও, সারিয়ে দাও। দাও মাগনা ডাক্তারি। আর বাড়তি মাইনে পাঁচ টাকা।

'টাইট' তো করল, কিন্তু 'টাইটে'র ক' দিন খাবে কি তারা? ধনপতের কাছে তো আর যাওয়া চলবে না।

খবরদার, কখনো না। মণিলাল হুংকার দিয়ে উঠল : 'আমি তোদেরকে টাকা দেব। আমার টাকা মানে পাঁচ জনের টাকা—তোদেরই মতন পাঁচ জনের থেকে চেয়ে আনা টাকা। আজ ওরা দিচ্ছে কাল তোরা দিবি। এ টাকা তোদের শুধতে হবে না। ক'টা দিন শুধু থাক একটু কষ্ট করে।'

'কিন্তু এক ঢোঁক মদ না খেলে চলবে না বাবু।'

'তা খাবি বই কি। তা না খেলে চলবে কেন? কিন্তু মনে থাকে যেন, ঐ এক ঢোঁক। এক-পেট করবার জন্যে যেন যাসনে ধনপতের কাছে।'

কখনো না। অকাল-মহামারী হলেও না।

কে এক হাজরা শুয়োরের পাল নিয়ে চলেছে মেথরপটির সমুখ দিয়ে। খাসী শুয়োরও আছে দু'তিনটে। বেশ মোটা-সোটা। তেলালো শুয়োর।

বিরিজলাল বেরিয়ে এল ঘরের থেকে। বেরিয়ে এল আরো অনেকে। কত বচ্ছর শুয়োর খায়নি তারা। দেখেনি এমন চোখের সামনে।

কোথায় যাচ্ছ শুয়োর নিয়ে?

বিলে চরাতে নিয়ে যাচ্ছি।

ঐ দিকে বিল কোথায়?

ঘুর-পথে চলে এসেছি ভুল করে।

বেচবে না কি এক-আধটা?

কিনতে হলে খাসীই কিনতে হয়। দাম বলে কি না পঁচিশ টাকা। অত গরমাইয়ে দরকার নেই, ঠিক-ঠাক বলো। ঘষে-মেজে আঠারো টাকায় রফা হল। কিন্তু টাকা? টাকা কে দেবে?

'টাইটে'র টাকা এক-আধটা করে এখনো আছে সবার কাছে। তাই দিয়ে চালিয়ে দাও। তিন দিন 'টাইট' হয়ে গেছে, ঢের হয়েছে। শুয়োরের কাছে আবার 'টাইট' কি। পেট পুরে মদ খাব না বুঝি, কিন্তু মাংস খাব না এমন কড়ার নেই। দিয়ে দে যার কাছে যা আছে। পথ-ভোলা শুয়োর এমন মিলবে না হামেসা।

চাঁদার টাকা চাঁদা করে দিয়ে দিল সবাই।

হা-রা-রা-রা-রা। পুরুষ মর্দ সবাই বেরিয়ে এল লাঠি আর হলকা নিয়ে। তাড়াতে-তাড়াতে মারতে-মারতে বাছাই শুয়োরটাকে ফেলে দিলে ডোবার জলে। জলে চুবিয়ে মারলে। এদিকে শুয়োরের আর্তনাদ ওদিকে মেথরদের গাঙাড়ি।

মরা শুয়োরটাকে এবার আগুনে ঝলসাতে হবে। আগুন করবে কি দিয়ে? আর কিছু না পাও চালের থেকে খড় টেনে নাও। চাল এমনিতেও ফাঁক অমনিতেও ফাঁক। যে যেমন পারল টেনে আনল খড়ের গোছা। আগে এক নালে জল পড়াত। এখন না হয় ঝোরে-ঝোরে পড়বে। ও প্রায় একই কথা।

লাল টকটকে করে পোড়ানো হয়েছে চামড়াশুদ্ধ। এবার বনাও, কাটো। বঁটি আনো, চাকু আনো। ভাগ-বাঁট করো। ঝামা দিয়ে ঘষে-ঘষে রোঁয়া তুলে ফেল।

মাংস হল, মদ হবে না?

ওরে বাবা, মদ না হলে তো সব মাটি। দিগেন সা মদের দাম কমিয়ে দিয়েছে এক আনা। দে, কার কাছে কি আছে বার কর এই বেলা। না থাকে তো ঘটি-বাটি বাঁধা দে। কালকের কথা কালকে, আজকে তো ফুরতি করে লি।

ঘরে-ঘরে পেঁয়াজ-রশুন ঝাঁই-মরিচের গন্ধ বেরুচ্ছে। ধিয়া তাধিয়া নাচছে মেথররা। মদ খেয়ে নেশায় ভোঁ হয়ে আছে কেউ। কাজিয়া-ঝগড়া করছে কেউ-কেউ। কেউ গাল-কুবাক্য করছে। বড় ফুর্তির দিন আজ।

আজ কারুর শ্রাদ্ধ-পিণ্ড হলে হত না? কত দিন কত লোক মরেছে, শ্রাদ্ধ খায়নি তারা, শ্রাদ্ধে খায়নি এমনি মদ-মাংস। আজ কেউ মরতে পারে না তাদের জন্যে? তবে অনায়াসে ভাবতে পারে তারা শ্রাদ্ধের ভোজে আনন্দ করছে।

কিন্তু কে মরবে? ঠসা বুড়ো ঐ সোমরা মেথর আছে। ওকে ধরে মারো। বেঁচে থেকে ওর কোনো ফয়দা নেই। বাঁশ দিয়ে কাঁড়ি মারতে-মারতে ওর ঘুম ছাড়িয়ে দাও। তার পর ওর কলজেটা ছিঁড়ে নিয়ে খেয়ে ফেল মদের মুখে।

দেখলে মদে তর হয়ে সোমরা মাদল বাজাচ্ছে আর গান গাইছে : ভুজঙ্গিনী রঙ্গিনী গো চিনিতে না পারি।

ঠিক। শ্রাদ্ধ করে কি হবে? তার চেয়ে বিয়ে হোক। বিয়ে হবে তো বর-কনে কই? দুত্তোর বর-কনে। 'রাঙ্গা বর মিলে কেমন রাঙ্গা কনের অঙ্গেতে। কনের বাবা ঢুলে পড়ের বরের মায়ের সঙ্গেতে।'

দূর ঝাঁটাখেকো। দূর খালভরা।

পরদিন মণিলাল তো অবাক। ঝাঁটা-বালতি হাতে নিয়ে মেথররা সব কাজে বেরিয়েছে। চালে খড় নেই, হাঁড়িতে চাল নেই, ট্যাঁকে নেই আধলা পয়সা। আবার সর্ব গায়ে সেই খসখস ঘসঘষ।

সমস্ত কিছুর মূলে ঐ ধনপতের কুচক্র। বুঝতে পেরেছিস?

হ্যাঁ, বাবু।

কী বুঝতে পেরেছিস? ওই শুয়োর নিয়ে বিশে হাড়িকে পাঠিয়েছিল তোদের পটিতে। ওই দিগেন সাকে দিয়ে মদের দাম শস্তা করে দিয়েছিল। তোরা বোকা, উজবুক, আহম্মক।

হ্যাঁ, বাবু।

লাঠি ধরে শুয়োর ঠ্যাঙাতে পারিস। পারিস সোমরা বুড়োর শ্রাদ্ধ করতে। কিন্তু যার মাথার পরে লাঠি ধরা দরকার—

হ্যাঁ, বাবু। বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।

রেজিস্ট্রি আফিসে গরুর গাড়ির প্রকাণ্ড আঁট হয়। সেই আঁট থেকে ফিরছিল ধনপতি। হঠাৎ তার মাথার উপরে লাঠি পড়ল একটা। সন্ধে হয়ে এলেও আর চার পাশে ঘোরালো ঝোপঝাড় হলেও লোক দুটোকে চিনতে পেরেছে ধনপতি। পেরুয়া আরে সোনেলাল।

ধনপতি হাসল। পাগড়িটা মাথার উপরে ঠিক মত বসিয়ে বলে উঠল : 'আরে, মাথার উপরে বাবা বরতমান। বাবা বম ভোলা। মাথা হোল তার ছেলিয়া। ছেলিয়াকে বাপ সামলাহে চলবে না তো কি। এক দিন মান্‌সো খেলেই কি আর গায়ে তাগদ হবে? সঙ্গে মদ খাচ্ছিস না? হাতের টিপ যে ফসকে যাবে নেশার ঘোরে। বাবার সঙ্গে চালাকি?'

কিন্তু চেয়ারম্যান অমন ঠান্ডা ভাব দেখাতে রাজি নয়। ঝাঁটা-বুরুশ ছেড়ে লাঠি তুলেছে বেটারা, এবার বুঝুক লাঠির কেরামতি।

ধনপতি রাজি হয় না। না হোক। চেয়ারম্যান পুলিসে খবর দিলেন।

এই তো ঠিক কথা। মণিলাল বললে মনে-মনে। যত বেশি মার খাবে তত বেশি শক্ত হবে। আর কী চাই। কথা বলতে শিখেছে, পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে শিখেছে, হাতে ধরতে শিখেছে আক্রমণের লাঠি! যে ঠুঁটো সে নাগাল পেল, যে খোঁড়া সে পেল পদক্ষেপ।

মেথররা আবার 'টাইট' করলে। মদ-মাংসে এবার আর তারা ভুলছে না। তাদের পিছনে পুলিস লেগেছে যখন তখন তারাও মাটি কামড়ে মৃত্যুর সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার চাঁদা আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

ধনপতি বললে, 'এখন আমরা হেরে যাই আসুন। ওদের এক টাকা করে মাইনে বাড়িয়ে দি।'

চেয়ারম্যান ঢোঁক গিললেন: 'তুমি মাইনে বাড়িয়ে দেবার কে?'

'আমি কেউ নয়। আপনারা কমিশনর বাবুরা মিলে মিটিং করে ইস্তাহার দয়ে দিন এক টাকা করে মাইনে বাড়ল। তার পর আমি দেখে লোব। মুনিসিপালটিরও খরচ হবে না, আমারও লোকসান কমবে। মুনিসিপালটিরও কাগজ-কলম আমারও হিসাব-কিতাব।' ধনপতি চোখ ছোট করল।

'যা বলেছ। আর পারি না ঝামেলা সইতে। কিন্তু মারপিটের কেস কি হবে?'

'ও আমরা তুলে লোব। চোট-জখম লাগল না, বাবা বাঁচিয়ে দিলে, তার আবার মোকদ্দমা কি।'

যা চিরদিন বলে এসেছে মেথররা—ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত। আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

ধনপত শুধু মাইনে বাড়িয়ে দিলে না, মামলা পর্যন্ত তুলে নিলে।

মণিলাল ওদের কাছে ব্যাখ্যা করতে এল, কোথায় ওদের জোর, কিসে ওদের জিত। আর ঘাসের রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে যে সাপ থাকে, চট করে চিনতে দেয় না, তার মত খল আর নিষ্ঠুর ঐ ধনপতি।

নেহি মাশায়। ও আমাদের মাটিয়া ঠাকুর। আমাদের বম ভোলা।

এবার মেয়েরা এল ধনপতির দরবারে।

বললে, 'মাইনে বাড়ল এক টাকা, কিন্তু আমাদের কি সুবিধে হল?'

'কেন তোদেরও তো মাইনে বেড়েছে।'

'তা বেড়েছে বৈ কি। কিন্তু বুঝতে পারছি কই?'

'কী চাস তবে?'

'ওরা বলত, আমদানি বাড়লে মদ দেবে খেতে। এখন সোয়ামি-স্ত্রীতে এক টাকা করে দু'টাকা আমদানি বাড়ল, আমরা এখনো একপো-আধসের মদ খেতে পাবো না?'

'বা, পাবি বই কি। তোদের কথা ভেবেই তো মাইনে বাড়িয়ে দিলাম।'

করে তো ধনপত, ধরে তো ধনপত। ধনপত তাদের ফাগুন মাসের সুয্যিঠাকুর।

'লে, এক টাকায় পনেরো আনা পয়সা লে। খা গে পেট ভরে। খেয়ে

ঢসঢোসে হ গে। এবার তোদের জন্যে আমাকে লতুন খাতা তৈরি করতে হবে। তোদের লতুন আমদানি, আমার লতুন খাতা। এই দ্যাখ।'

মেথরানিরা হেসে উঠল। এ ওর গায়ে ঢলে-ঢলে পড়ল। ছেঁড়া-খোঁড়া ছাবা শাড়ি পরনে। অমানুষে পেয়েছে এমন চেহারা। মদের কথায় যেন তারা হারানো যৌবনের কথায় ফিরে আসে। ঝুলনি আর মুঙ্গিয়া, সুখন্ন আর বিলাসন। জ্বর-জ্বালা শোক-তাপ ভুলে যায়।

চুচ্চুরে মাতাল হয় মেয়েরা। রান্না করে না। ডাল-ভাত পুড়িয়ে ফেলে। ছেলে ঠ্যাঙ্গায়। একে অন্যের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করে।

তারপর পুরুষরা যখন মাতাল হয়ে ফিরে আসে, বেধে যায় মহাপ্রলয়। এ খুলে নেয় বাঁশের খুঁটি, ও খুলে নেয় বেড়ার বাঁখারি।

কি রে, এত হুড়-ঝগড়া কিসের? মণিলাল নয় ধনপতিই ফিরে আসে মেথরপটিতে। 'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।' বলে, 'কি রে, রান্নাবান্না হয়নি? ঘরে দেখি চাল-তেল-নুন তরি-তরকারি কিছুই নেই। এই লে, শিলিপ লিয়ে যা মুদিখানায়। লিয়ে আয় বাজার করে। আর, তুই গেরস্ত বৌ, ভাতার-পুতকে রান্না করে না দিলে চলবে কেনে? যা, আখা ধরা।'

মদের পর আবার ভাত-ডালের ব্যবস্থা করে দেয় ধনপতি।

ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত। আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

গো-গাড়ির গারোয়ানের শুধু এক হুঁকো। গলা ছেড়ে গান গাইছে :

'পরাণের হুঁকা রে
কে রাখিল তোর নাম ডাব্বা রে—'

হঠাৎ মওড়া নিল ধনপতি। হাঁকার দিয়ে উঠলঃ 'কে যায়? রোকো।'

গাড়োয়ানরা জেনে নিয়েছে, চিনে ফেলেছে। ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করলে। টিকিটের ট্যাক্সো নয়—টিকিটের ট্যাক্সো তো অদানে অব্রাহ্মণে যাবে। তার চেয়ে কম-সম করে কিছু গুঁজে দাও ধনপতির হাতে, গাড়ি এখুনি পাশ হয়ে যাবে। তোরাও বাঁচবি আমিও বাঁচব। কারু সাধ্যি নেই আর তোদের পথ আটকায়।

সে দিনের সেই খাণ্ডার-মূর্তি ধনপতি, আজকে একেবারে গোপালের মত ঠাণ্ডা।

কিন্তু পথ আটকালো মণিলাল। বললে, কেন তোরা ধনপতকে ঘুষ দিবি?

নইলে পুরোপুরি ট্যাক্সো দিয়ে টিকিট কাটতে হলে আমাদেরই লোকসান।

হোক লোকসান, তবু ঘুষ দিতে পারবিনে। জোর করে চলে আসবি রাস্তা দিয়ে।

তার চেয়ে এ ঢের শান্তি। নিশ্চিন্ত থাকতে পারলে হুঁকোর টানে বেশি সোয়াদ পাব। ধনপতকে আমরা ঘুষ দিচ্ছি কে বলে? আমাদের হয়ে ভালোমানুষি করে তারই বখশিশ দিচ্ছি।

কে তোদের ধনপত?

সেই মন্ত্র এত দিনে ওদেরও শেখা হয়ে গেছে। বললে, 'কাড়ে তো ধনপত, ছাড়ে তো ধনপত, আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।'

ভাল গাড়ির টানে পিছের গাড়ি এগিয়ে যায়।

৯। গার্ড সাহেব

'বাবু, কিতাব!'

ঠিক বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ে। শুনেও শোনে না নিবারণ। ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরে একবার।

কিন্তু ও-ডাক কি ভুল শোনবার?

কল-পিওন আবার হাঁক পাড়ে : 'গার্ডবাবু, কিতাব হ্যায়।'

বই হয়েছে! তার মানে সর্বনাশ হয়েছে।

দু'খানা ছোট-ছোট কুঠুরিতে অধস্তন কোয়ার্টার। উনুনে আগুন দিচ্ছে লতিকা। ডাক শুনে সেও আঁতকে ওঠে।

'বাবু, কিতাব!'

সমস্ত সংসার-শান্তির উপরে উদ্ধত বজ্র।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে লতিকা। সত্যি-সত্যিই কল-পিওন! নিজের চুল ছিঁড়বে, না কল-পিওনের কিতাবটা—বুঝে উঠতে পারে না।

'এ কি, আজ না তোমার রেস্ট বেশি হবে বলেছিলে?'

'হ্যাঁ, রোস্টার আজ ভালো ছিল। ভেবেছিলাম—'গলার স্বর ফোটে না নিবারণের।

কিন্তু চোখ ফোটাও। পিওন কল-বুকটা চোখের সামনে মেলে ধরে। হ্যাঁ, সই করো। দেখে নাও ঠিকঠাক। কোন ট্রেন, ইয়ার্ডে কোন লাইনে আছে, কোথায় যেতে হবে এ-যাত্রা। সব বিতং করে লেখা আছে বইয়ে। দেখে নাও। মনে মনে টুকে রাখো।

'তবে কি হবে!' লতিকা ককিয়ে ওঠে।

'আর কি হবে!' তক্তপোশ ছেড়ে উঠে পড়ে নিবারণ।

দশ বছর আগে এমন দিনে তাদের বিয়ে হয়েছিল। প্রথম পাঁচ বছর তারা ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে—নিবারণ মেসে, লতিকা বাপের বাড়ি, নয়তো বা শ্বশুরবাড়ির কোনো আত্মীয়ের আশ্রয়ে। ছ'বছরের মাথায় তারা প্রথম কোয়ার্টার পায়—ইনসাইড কোয়ার্টার। সেও দু'কুঠুরিরই আস্তানা —একটার মধ্যে আরেকটা ঘর। এবার, দশ বছরের বার, পাশাপাশি ঘরের কে-টাইপের কোয়ার্টার পেয়েছে। সামান্য একটু ভদ্রতা এসেছে বসবাসে।

ইলেকট্রিক আলো হলে আরো একটু সুন্দর হত। রেল্ট-সেকশনের বড়ো-বাবুকে ধরেছিল নিবারণ—তিনি একটা আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন। তার মানে, ঘুষ চাই একশো টাকা।

বড় ছোট ঘরে, ছোট জীবনের মধ্যে আছে নিবারণ। স্ত্রীর সঙ্গে খুব একটা সংকীর্ণ সম্বন্ধের মধ্যে। একটু অন্যরকম অর্থ দিতে চেয়েছিল আজ। আনতে চেয়েছিল একটু অন্যরকম লাবণ্য। ঠিক করেছিল, আজ, দশ বছর বাদে এই প্রথম, সে তার বিয়ের তারিখে একটু উৎসব করবে। উৎসব আর কি, ক'জন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে একটু চা খাওয়ানো, চার সঙ্গে কিছু নাহয় খাবার তৈরি করে দেবে লতিকা। বাইরে বসবার ঘরের মতো করতে পারা যাবে একটা ঘরকে, তাই যা সুবিধে। বন্ধুরা কিন্তু জানতেও পাবে না কেন কি হচ্ছে—শুধু জানবে তারা দুজনে, একটু বা নতুনতরো অর্থে। কিছু ফুল যোগাড় করবে হয়তো। বিশেষ একটি অনুভবের লালিত্যে ফরসা ও আস্ত একখানা শাড়ি পরবে লতিকা, বিকেলের দিকেই না-হয় দাড়ি কামাবে নিবারণ। মুহূর্তের জন্যে হোক, তবু সব আবার কেমন নতুন মনে হবে, মনে হবে আরম্ভের মতো, অজানার মতো—

রাত-ভোর ডিউটি করে সকাল চারটেয় আজ ফিরেছে নিবারণ। বাড়ি ফেরবার আগে রোস্টার দেখে এসেছে, অবস্থা বেশ ভালো—অনেক নম্বর গার্ড 'ইন' করেছে আজ। এমনিতে ডিউটির পর বারো ঘন্টা মামুলি রেস্ট, তবে রোস্টারে বেশি গার্ড 'ইন' থাকলে আশা থাকে যে, পালা আরো দূরে গিয়ে পড়বে। কিন্তু বিপদ এই, মামুলি রেস্টের পর সব সময়ে বাড়িতে তৈরি থাকো কখন 'কিতাব' এসে হাজির হয়। আজ নিবারণ আন্দাজ করে-ছিল, বারো ঘন্টার কায়েমী বিশ্রামের পর আরো কয়েক ঘন্টা ফাউ মিলবে বোধ হয়। সেই ভরসায়ই করতে গিয়েছিল সে এই হাঙ্গামা। কিছু ফুল-পাতা কিনেছিল, কিনেছিল কিছু গন্ধওয়ালা চা, ছোট্ট এক শিশি দামি এসেন্স।

'বন্ধুদেরও তো বলেছ—'মনে করিয়ে দেয় লতিকা।

'তেমন করে কিছু বলিনি। বলেছিলাম রোস্টার ভালো আছে, দু'চার ঘন্টা মিলে যেতে পারে একস্ট্রা। এক হাত তাস হবে'খন এসো। আর এলেই —এটা সর্বত্র উহ্য—একটু চা-টা—'

তেমন করে কিছু বলিনি। একটু যেন বাজল লতিকাকে। বলতে লজ্জা হয়েছিল নিশ্চয়ই! নিমন্ত্রিত বন্ধুরা এসে ফিরে যাবে তার চেয়ে সে-লজ্জা অনেক বেশি।

'বা, লজ্জা কী। চাকরি যখন করছি তখন চাকরি তো করতেই হবে—'

'এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষে করাও ভালো।'

এই কথাটা আরো একদিন বলেছিল লতিকা। তখন ছিল তারা ইনসাইড কোয়ার্টারে, এক ঘরের মধ্যে আরেক ঘরে। শীতের রাত পাশাপাশি শুয়ে আছে দুজনে। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে তার উপর। বেশ একটা ঘুম-না-আসা

অথচ ঘুমেরই মতন মনোহর রাত। হঠাৎ রাত-দুপুরে দরজায় কে ঘা দিলে। 'বাবু! বাবু! কিতাব!' চোর-ডাকাত নয়, কল-পিওন। মাথায় ছেঁড়া ছাতা, হাতে হাত-বাতি। গাড়ি বুকিং হয়েছে তারই খবর দিতে এসেছে। এখন যদি রাত বারোটা হয়, গাড়ি নিয়ে নিবারণকে বেরুতে হবে দুটোয়। দু'ঘন্টা আগে নোটিস আসে কিতাবের। কী গাড়ি জিগগেস করছ? রাগ কোরো না— মালগাড়ি। একে গার্ড, তায় মালগাড়ির গার্ড।

তবু, তবু সেই তপ্ত শয্যা ছেড়ে উঠে পড়তে হয়েছিল নিবারণকে। দু' ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে। লতিকাকে উঠে খাবার-দাবার করে ভরে দিতে হবে টিফিন-কেরিয়ার। ইউনিফর্ম পরে গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে, এক হাতে টিফিন-কেরিয়ার আরেক হাতে হ্যান্ড-সিগন্যাল ল্যাম্প নিয়ে কাদা-জলের মধ্যে ছপ-ছপ করতে-করতে যেতে হবে ইস্টিশান—

বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে সেদিন বলেছিল লতিকা, 'এর চেয়ে ভিক্ষে করা ভালো ছিল—'

কিন্তু আজ যেন রাগ নয়, আজ দুঃখ। সেই ছোট ঘরে ছোট হয়ে থাকবার হুকুম। একটা নতুন কিছু দেখবার, নতুন কিছু বোঝবার থেকে বঞ্চনা।

কাছে এসে গলা নামাল লতিকা : 'সিক রিপোর্ট করে দিলে হয় না?'

নিবারণ হাসল। সে হাসির অর্থটা ভয়ের মতন স্পষ্ট।

সেবার মিথ্যেমিথ্যি সিক-রিপোর্ট করেছিল নিবারণ। ফলে বড় ছেলে অন্তুর ডবল-নিউমোনিয়া হয়েছিল। আরেকবার হয়েছিল নিজের রক্ত-আমাশা। এমনিতে কত মিথ্যের মধ্যেই তো আছে তারা, ছোট-বড়ো কত জুয়াচুরির মধ্যে— সেগুলি যেন গায়ে লাগে না, সেগুলির যেন বোধ-স্পর্শ নেই—কিন্তু অসুখের ভয়টা যেন বুক-চেপে-ধরা, দম-বন্ধ করার মতন। লতিকা কথা ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। বললে, 'আর কোনো উপায় নেই?'

আরেক উপায় কেতাবে সই না-করা। অর্থাৎ বাড়িতে না-থাকা। মামুলি রেস্টের পর পরোয়ানার প্রত্যাশায় তুমি বাড়িতে তটস্থ হয়ে থাকবে না, এ হতেই পারে না। নিজের কর্মদণ্ড নিজেকেই সই করতে হবে। তা যদি না করো, তবে তোমার জরিমানা হবে, নামিয়ে দেবে নিচু মাইনেতে, পাস-ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেবে। চাকরি করতে বসে এ-সব গুনাগারে সাধ্য থাকতে কে রাজি হয় বলো?

তবু ওরি মধ্যে জিগগেস করে লতিকা, 'এবার কোথায় ট্রেন হল?'

'গয়া।'

যেন কত উপেক্ষার সুর। মোকামায় না গিয়ে এবার যে নিবারণ গয়া যাচ্ছে আর লতিকা যে কোথাও যাচ্ছে না, থাকছে বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে— দুই-ই যেন একই কথা।

একজন যে যাচ্ছে আরেকজন যে বসে থাকছে, দুই-ই যেন সমান নিরর্থক।

কিন্তু এখন আর বসে থাকা চলবে না লতিকার। খাবার-দাবার তৈরি

করে দিতে হবে নিবারণকে। যে উনুন সে আজ জ্বালতে যাচ্ছিল, মাখতে যাচ্ছিল যে আটা, তাতে আজো সে কোনো নতুন অর্থ দিতে পারল না।

শুরু হয় সেই মামুলি কর্মচক্র।

সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ে নিবারণ। যেন বাজারে যাচ্ছে বা বেড়াতে যাচ্ছে, তার যাওয়ার চেহারাটা যেন এমনি। লতিকা একটু দাঁড়িয়ে পর্যন্ত দেখে না। ছেলেমেয়েগুলো কে কোথায় ছিটকে রয়েছে তার কোনো খোঁজ-খবরে দরকার নেই। যাবার আগে লতিকাকে কোনো বিষয়ে কিছু বলতে বা সতর্ক করে দিতে হবে না। কবে ফিরবে, কাল না দু'তিন দিন পর, সে প্রশ্নও অবান্তর। দিন-দিন কেরানি যেমন অফিস করতে যায় এও তেমনি। এদিকে হোক মোকামা বা গয়া, ওদিকে খিদিরপুর বা চিৎপুর—সব একই চর্বিতচর্বণ। একই থোড়-বড়ি-খাড়া। এতটুকু রহস্য নেই কোথাও। নেই এতটুকু কোথাও নতুনতরো অনুভূতি!

'এ. এস. এম.'-এর অফিসে গার্ডের হাজিরা-বইয়ে সই করে নিবারণ। ঠিক ক'টার সময় গাড়ি সাজানো হবে জেনে নেয়। বক্স-গোডাউনে গিয়ে বোতলে খাবার জল ভরে। জল আর টিফিন-কেরিয়ার বাক্সে ভরে চলে যায় অয়েল-গোডাউনে। ওখান থেকে টেইল-ল্যাম্প নিতে হবে সই করে। ট্রেনের পিছনে যে লাল বাতি জ্বলে সেইটেই টেইল-ল্যাম্প। আরো, নিতে হবে কেরো-সিন তেল। সেই তেলে হাত-বাতি জ্বালাবে, জ্বালাবে টেইল-ল্যাম্প আর সাইড-ল্যাম্প। আজ চারটের সময় বই হয়েছে যখন, ষোলো আউন্স তেল পাওয়া যাবে। একটু যেন আশ্বস্ত হল নিবারণ। তেল কিছুটা সরানো যাবে আজকে।

তেলও ভরা হল লাইন-বক্সে। কি না আছে এই বাক্সটায়! টাইম-টেবল, একটা লাল আরেকটা সবুজ নিশান, টেইল-ল্যাম্প আর সাইড-ল্যাম্পের তিনটে বার্নার, দুটো লাল সাইড—আর ডিটোনেটর। তা ছাড়া গার্ডস্ মেমো-বই—তাতে লেখা থাকবে ট্রেনের নম্বর, যাবে কোথা, ক'টার সময় য়্যারেঞ্জ, ক'টা ওয়াগন—তাদের টেয়ার-ওয়েট কত, কতই বা লোড-ওয়েট—স্টেশনের কোড, কোন স্টেশন কোন সময়ে পার হল তার ফিরিস্তি। তারই এক পাশে টিফিন-কেরিয়ার, জলের বোতল, গ্লাস—সঙ্গে ছোট্ট ভাঁড়ার ঘর—চাল ডাল আটা নুন তেল মশলা আলু পেঁয়াজ চা আর চিনি। হ্যাঁ, মাথার তেল, সাবান, দাড়ি কামাবার সরঞ্জামও আছে—

বাক্স-কুলির টিণ্ডেল এসে ল্যাম্প-টিণ্ডেলের থেকে জেনে নেয় ইয়ার্ডে কোন লাইনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। লাইন-নম্বর বলে দেয় সে বাক্স-কুলিকে। বাক্স-কুলি সেই নম্বরের ট্রেনের ব্রেক-ভ্যানএ তুলে দিয়ে আসে বাক্স।

বাক্স পাঠিয়ে দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইয়ার্ড-মাস্টারের ক্যাবিনে যেতে হয় নিবারণকে। সেখানে নাম্বার-টেকাররা ট্রেনের ফর্দ বা 'গাইডেন্স' বানিয়ে রেখেছে। মানে, কতগুলো ওয়াগন আছে, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, টেয়ার-ওয়েট লোড-ওয়েট কত—তার হিসেব। ফর্দ মিলিয়ে একধার

থেকে গাড়ি চেক করতে শুরু করো এবার। দেখো সিল আর রিভেট ঠিক আছে কিনা,—এধার দেখেছ তো ওধারও পরখ করো। বয়ে গেছে অত মিলিয়ে দেখবার। একটা মালগাড়ির ফুল-লোড হল ষাট ওয়াগন—এটার মধ্যে আছে বুঝি পঞ্চান্নটা। কোথায় কোনো ফ্ল্যাপ-ডোর আলগা থাকে তো থাক না—তার কি? যারা মাল বুক করে তারা দেখতে পারে না? কিন্তু গাড়িতে-গাড়িতে কাপলিং ঠিক আছে কিনা, অর্থাৎ শেকল দিয়ে যে গাঁট-ছড়া বাঁধা আছে তা আঁট আছে কিনা—তা তো দেখবে! বয়ে গেছে। তার জন্যে মাইনে দেয়া হয় না নিবারণকে।

ওয়াচম্যানের খাতায় তাড়াতাড়ি সই করে দেয় নিবারণ। 'হ্যাঁ, পঞ্চান্ন ওয়াগন, সিল-রিভেট করেক্ট। ঠিক আছে। ও. কে.।'

তারপর ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করে। ঘড়ি মিলিয়ে নেয়। কোম্পানির থেকে ঘড়ি দিয়েছে দুজনকে। সে যেমনতরোই ঘড়ি হোক, মিল থাকলেই হল। গাইয়ে-বাছুরে মিল থাকলে বনে গিয়েও দুধ দেবে।

ড্রাইভার জে. টি. আর.-ফর্ম আর ফুয়েল-ফর্ম বের করে দেয় নিবারণকে। জে. টি, আর. মানে জয়েন্ট ট্রেন রিপোর্ট—ক'টার সময় কোন স্টেশন পার হচ্ছে ট্রেন তার হিসেব দুজনকে রাখতে হবে আলাদা। শেষ স্টেশনে পেশ করতে হবে। মিল না থাকলেই মুশকিল। তা একযাত্রায় কি পৃথক ফল হয় কখনো? কি বলো হে ইয়াসিন?

এঞ্জিনের টেন্ডারে ক টন কয়লা নিয়েছ? নয় টন। দেখো এই ফুয়েলফর্ম।

'সিগন্যাল ডাউন হলেই স্টার্ট কোরো।' ইয়াসিনকে বলে দিয়ে নিবারণ তার ব্রেকভ্যানে গিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, এই ইয়ার্ডে সিগন্যাল আছে। যে ইয়ার্ডে নেই সেখানে ট্রেন অ্যারেঞ্জ করলেই ঝামেলা। ড্রাইভারকে গিয়ে স্টার্টিং অর্ডার নিয়ে আসতে হবে। ততক্ষণ হয়ে বসে থাকো ততক্ষণ। স্টার্টার সিগন্যাল আর অ্যাডভান্স-স্টার্টার সিগন্যালের মধ্যে অল-রাইট সিগন্যালও দেখাও—রাত হলে সাদা আলো দেখিয়ে, দিন হলে হাত নেড়ে। তুমিও দেখাও, ড্রাইভারও দেখাক। একটু ভুলচুক হলেই কেলেঙ্কারি। ভাগ্যিস এই ইয়ার্ডটা তেমনি কানা নয়—লাল-সবুজ চোখ আছে জ্বলজ্বলে। তাই ড্রাইভারের উপর ভার দিয়ে ব্রেকভ্যানে গিয়ে বসেছে চুপচাপ। যখন ছাড়তে হয় ছাড়বে।

একেবারে চুপচাপ। পঞ্চান্নখানা মালবোঝাই ওয়াগানের পিছনে একা-একা চুপ করে বসে থাকা। সেই কত দূরে এঞ্জিন, সেইখানেই যা প্রাণ-স্পর্শ। তবু তো এঞ্জিনে ড্রাইভারের পাশে ফায়ারম্যান থাকে, জ্যাক থাকে—গল্প করা যায়। কিন্তু গার্ডের কেউ নেই, কিছু নেই। মাইলের পর মাইল চলেছে গাড়ি, সে একেবারে একা। চলেছে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, অন্ধকার চিরেচিরে, তাকে ঘিরে সমস্ত বিশ্বসংসার যেন অনন্ত শূন্যে ভরে রয়েছে। তার যেন কোনো আত্মীয় নেই, প্রতিবেশী নেই—কেউ এসে তাকে খুন করে

গেলেও কেউ বাধা দেওয়া দূরে থাক, অস্ফুট আপত্তিও করবে না। ইয়াসিনও বুঝতে পারবে না সে খুন হল! যদি কারা গাড়ি থামিয়ে ওয়াগন লুট করে, মুখ বাড়িয়ে একবার দেখবেও না নিবারণ। ঘুম না এলেও ঘুমুবার ভান করবে। ডাকাতদের সঙ্গে সে লড়তে যাবে নাকি খালি-হাতে? এই এক-টানা একঘেয়েমির চেয়ে রাস্তার মাঝে দু-একটা রাহাজানি মন্দ নয়। অন্তত খানিক লোকজনের হৈ-চৈ কানে আসে।

দশ দিক আঁধার করে রাত নেমেছে। এটা থ্রু গুডস-ট্রেন, ওয়াটারিং স্টেশন ছাড়া থামবে না। কিন্তু মেইল ও এক্সপ্রেস, এমনকি প্যাসেঞ্জারকে পর্যন্ত আগে যাবার অধিকার ছেড়ে দিয়ে লুপে গিয়ে শান্ট করছে। কখনো বা স্টেশন ক্লিয়ার পায় না, পিছনের স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখে।

যদি স্টেশনে এসে দাঁড়ায় তবে দু'চারটে আলো বা গোটাকয় নিশ্বাসের না-হয় আভাস মেলে। তখন আসান লাগে কিছুটা। তাইতে যারা প্যাসেঞ্জারে কাজ করে তাদের তত হয়রানি নেই। কতক্ষণ পরে-পরেই তারা মানুষের হাঁক-ডাক শোনে, নিজের সমসুখদুঃখের সঙ্গী কেউ আছে তার পরিচয় পায়। কিন্তু এখানে এ যাত্রায় কতক্ষণ স্টেশন পড়বে? আর স্টেশন পড়লেই বা কি! প্যাসেঞ্জার কই? কই সেই সুন্দর জনকোলাহল?

নিবারণ একেবারে একা। নিরবকাশ ভাবে নিঃসঙ্গ। পঞ্চান্নটা গাড়ির পরে কোথায় ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান আর জ্যাক, হাত বাড়িয়ে নাগাল পায় না কিছুতেই। মনে হয়, গাড়ি যেন কেউ চালাচ্ছে না, গাড়ি আপনিই চলেছে। যেন কোথাও থামবে না কোনোদিন। শুধু কতগুলো রাশীভূত বস্তু আর সে একাকী এক প্রাণ, এ ছাড়া আর কেউ নেই এই গতির উন্মুক্তিতে।

ঠিক এমনি করেই ভাবছে না নিবারণ। ভাবছে, আজকের জার্নিতে থ্রিল কই? ইয়াসিন কি এ-যাত্রায় কোনো মার্চেন্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেনি?

প্যাসেঞ্জারে কাজ করলে অনেক সুবিধে। লোডিং-মানির বখরা পাওয়া যায়। ব্রেকে যে-সব মাল যায় তাতে পয়সা দেয় মার্চেন্টরা, পার্শেল-ক্লার্করাই তা উশুল করে, ভাগের পয়সা লোডিং-এর সময় দিয়ে দেয় গার্ডকে। ধরা পড়বার ভয় নেই। আর যদি টি. টি.-ই হতে পারতে, তবে ঝাঁপসেই' ফেঁপে উঠতে নিটোল হয়ে। 'ঝাঁপস' শোনোনি বুঝি? ও একটা মুখচলতি টার্ম—ঝাঁ করে আপস করতে হয় বলেই সন্ধি করে ঝাঁপস। হ্যাঁ বাবা, সন্ধি করো। তোমার অন্ধি-সন্ধি আমি জানি, আমারটা তুমি জান। তবে কেন মিছিমিছি খচখচ করছ?

সুখে কাজ করে বটে গুডস-ক্লার্করা—স্থায়ী ডে-ডিউটি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত নেই, আর উপরিও স্বচ্ছন্দ।

আর তোমাদের?

আমাদের কথা আর বোলো না। বলতেই বলে, এক পা রেলে এক পা

জেলে। মার তো গণ্ডার লাট তো ভাণ্ডার। আর, চোকা কাঁড় রোখা মাল। হাতে-হাতে দে রে ভাই দাঁতে-দাঁতে খাই।

কিন্তু আজ হল কি? কোনো বন্দোবস্তই কি করেনি আজ ইয়াসিন? আজ কি ডোলভরা আশা আর কুলোভরা ছাই?

কোনো স্টেশনের বাইংরে কি আজ আর গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়বে না? আসবে না কি কোনো মার্চেন্টের সাঙ্গোপাঙ্গেরা? অফ-সাইডে সিল-রিভেট না থাকে তো ভালোই, আর থাকলেই বা খুলে ফেলতে কতক্ষণ? এই জঙ্গলে অন্ধকারে কে তার খোঁজ রাখছে? সেই সব সাঙ্গোপাঙ্গেরা ঢেরা-দেওয়া গাড়ি থেকে মাল খালাস করে নেবে না—চিনি বা আস্ত গম বা কেরোসিন? সঙ্গে-সঙ্গে ড্রাইভার আর গার্ডের হাতে আসবে না নোটের পাঁজা?

ট্রেন যে হঠাৎ থামিয়ে দিলে তার জবাবদিহি কি? ড্রাইভার মুখে-চোখে নিরীহ-নির্দোষের ভাব এনে বলবে, 'কি করব, এঞ্জিনে স্টিম পড়ে গিয়েছিল, স্টিম বানাতে হচ্ছিল.' কিংবা, 'কয়লা ঝামা হয়ে গিয়েছিল, আগ বানাতে হচ্ছিল—'

পরের স্টেশনে হয়তো চেক করতে আসবে ওয়াচম্যান। হয়তো খোলা দেখবে গাড়ি। দেখুকগে, বয়ে গেল। ওয়াচম্যানের বইয়ে গার্ড রিমার্ক দিয়ে দেবে, গাড়ি খুলে দিয়েছে কে মাঝ-পথে, জি. আর. পি.-কে না হয় তার করে দেবে, মেসেজ পাঠাবে ওয়াচম্যান ইন্সপেক্টরের কাছে। তারপরে তোমরা ইন-কোয়ারি করো। আর যার মাল খোয়া গেছে সে উলটে ক্লেম দিয়ে বা কোর্ট করে তার ক্ষতি-খেসারত আদয় করে নিক।

ওয়াচম্যানও কম যায় না। গার্ডের থেকে অল-করেক্ট সই নিয়ে পরে গাড়ি খুলে মাল বের করে নেয়। গাড়ি তখন হয়তো অন্য স্টেশনে চলে গিয়েছে, ওয়াচম্যানের আর ঝক্কি নেই। ফাঁসবে তো গার্ড ফাঁসবে। তখন সেই ভাঙা গাড়ি সিল করিয়ে চেকিং-এর জন্যে কেটে রেখে মেসেজ পাঠিয়ে দাও। শুরু হোক ইনকোয়ারি। গার্ড বলবে, 'আমি জানি কি, মাঝপথে কে কেটেছে—' আর ওয়াচম্যান বলবে, 'আমি জানি কি, এই দেখো গার্ডের অল-করেক্ট দস্তখত।' আর ড্রাইভার এমন একখানা মুখ করবে, যেন তিলক না কাটলেও সে পরম বৈষ্ণব। সে যে কখন কার সঙ্গে সড় করবে কেউ জানে না। সর্বাঙ্গে ঘা, ওষুধ লাগাবে কোথা? সুতরাং, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, খেসারত দিয়ে মরো রেলকোম্পানি।

এরকম একটাও বড়ো দাঁও পড়েনি নিবারণের হাতে। একবার একটা হাতে আসতে-আসতে ফসকে গেল। পরের মাল চুরি করে নেয় মার্চেন্টের চর-অনুচর, এতে হাঙ্গামা বেশি। সবচেয়ে সুবিধে নিজের মাল চুরি করা। গাড়ি চিনতে দেরি হয় না, আর মাল বার করবার কায়দাটাও রপ্ত-মুখস্থ থাকে। চক্ষের নিমিষে ঘটে যেতে পারে ঘটনা।

হলও তাই। ব্রিজ রিপেয়ার হচ্ছে, গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। কিছু

বলতে পার না ড্রাইভারকে। হুকুম টাঙানো আছে : স্টপ ডেড ফর টু মিনিটস। যেই গাড়ি দাঁড়াল, অমনি বরজলাল মাড়োয়ারির লোক এসে তাদের গাড়ি খুললে। বাইরে চেহারা থেকেই বুঝে নিল কোন গাড়ি। কি ভাবে সিল-রিভেট ভেঙে খুলে ফেলতে হবে দরজা, জানা আছে তার কলকৌশল। গম যাচ্ছিল বস্তা করে। চক্ষের পলকে প্রায় কুড়ি বস্তা ধুপধুপ করে ছুঁড়ে ফেললে মাটিতে। স্টার্ট দিল গাড়ি, একটা লোক বুঝি নামতে পারেনি। আহা, ভারি তো তখন গাড়ির স্পিড! হুকুম টাঙানো : পাস দি ব্রিজ অ্যাট ফাইভ মাইলস পার আওয়ার। নেমে পড়ল লোকটা। ট্রাক তৈরি ছিল রাস্তায়। বোঝাই হয়ে গেল বস্তা। বেরিয়ে গেল এক ফুঁয়ে। যেখানকার গম সেখানে গিয়ে উঠল।

নিবারণ নিরিবিলিতে দেখা করেছিল ড্রাইভারের সঙ্গে। সে তো আকাশ থেকে পড়ল। ব্রিজের মুখে গাড়ি দাঁড় করাতে হবে এ তো সরকারের হুকুম। সে কাঁটায়-কাঁটায় হুকুম তামিল করেছে—সে কিছুই জানে না। এক আঙুলে দিব্যি তুড়ি বাজিয়ে গেল সে।

বরজলালের গদিতেও খোঁজ করেছিল নিবারণ। তারা স্পষ্ট মুখ মুছলে। কে-না-কে ডাকাতি করে মাল বার করে নিয়েছে তারা তার জানে কি! তারা উলটে ক্লেম দিয়েছে অফিসে। ক্লেম না মানে, মোটা টাকার মামলা ঠুকবে আদালতে। একেই বলে, খাবে আবার ছাঁদও বাঁধবে।

এ তো সামান্য চুরি। কখনো কখনো আবার তেন্নাথের মেলা হয়। ড্রাইভার, গার্ড আর ক্যাবিন-ম্যান—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—ত্রিনাথের যোগাযোগ। সে-সব পুকুর-চুরি না বলে বলতে পারো গুদোম-চুরি। ক্যাবিনম্যান আউটার সিগন্যাল খারাপ করিয়ে রাখে। সিগন্যাল যদি কাজ না করে, তবে গাড়ি চলে কি করে? ড্রাইভারকে তাই আউটার সিগন্যালের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। জি. টি. আর.-এ ভালো করে কৈফিয়ত লেখে গার্ড। ডিসট্যান্ট সিগন্যাল আউট অফ একশন। সিগন্যাল সারিয়ে ফের চালু করতে কম-সে-কম দশ-পনেরো মিনিট কোন না লাগে। আর সেই দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই চিচিং ফাঁক—যাকে বলে গুদোম সাবাড়।

এসব বড় চুরি। রাজসূয় ব্যাপার। এসব ব্যাপারে অংশ নিতে পারাও ভাগ্যের কথা। নিবারণের অদৃষ্টে ঘটনাচক্র এমনভাবে কখনোই ঘুরবে না যাতে সে তেন্নাথের মেলায় বসে এক ছিলিম গাঁজা টানতে পারে। সে ভীরু, সে খুঁতখুঁতে। এমনি ড্রাইভার যা জোগাড় করে দিয়েছে। পথের মধ্যে যা দু'একটা ছককাটা ফন্দি-আঁটা রাহাজানি হয়েছে তারই লাভের বখরা। নিবারণ সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, হঠাৎ খ্যাঁচ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে গাড়ি। গাড়ি বন্ধ না হলে মাল-খালাসি চলবে কি করে? আর, গাড়ি বন্ধ হলেই গার্ডের তাঁবেদারিতে চলে এল। কেননা গার্ডের হাতে জি. টি. আর. টাইমিংএর ফিরিস্তি। অতএব গার্ডের হাতেও কিছু গুঁজে দাও।

কিন্তু সব সময়েই ছক কেটে আসে না। এসে পড়ে গ্রাম্য ডাকাতের দল। লাইনের উপরে পাথর বা গাছ ফেলে রাখে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে লুটতরাজ করে। দু'প্রান্তের দুই লোক, কোনো সংযোগের সুবিধে নেই—তাই চুপচাপ বসে থাকো যে যার এলেকায়। আর সংযোগ থাকলেই বা কি, লুটেরাদের বাধা দেবার তোমাদের রসদ কোথায়? আর, যেখানে রস নেই সেখানে রসদ থাকলেই বা কি? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও, ডাকাতরা চলে গেলে হাত-বাতি দেখিয়ো, স্টার্টের সিটি দেবে ড্রাইভার।

ডাকাত যদি না থাকে, খুচরো চোর আছে অগণ্য। দিল্লি থেকে হাওড়া পর্যন্ত চলেছে এই চোরের অক্ষৌহিণী। এরা গাড়ি থামায় না বটে, কিন্তু যেইখানেই গাড়ি থামে, স্টেশনেই হোক বা স্টেশনের বাইরেই হোক, ঠিক এসে হাজির হয় কাতারে-কাতারে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সরু লোহার শলা, আর গলায় একটা করে বেশ খানিকটা কাপড়ের টুকরো বাঁধা। প্রত্যেক গ্রামের কামারশালায় তৈরি হচ্ছে এই লোহার শলা, কারুর বা চাই লিক-লিকে তলোয়ার। মালগাড়ি দাঁড়ালেই প্রত্যেক ওয়াগনের ফ্ল্যাপ-ডোরের ফাঁকের ভিতর দিয়ে এরা শলা ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খোঁচা মারে। নেহাত যদি পাট বা তামাক হয়, তা হলে অবিশ্যি কোনো সুসার নেই, কিন্তু শুকনো আর দানা-ওয়ালা বা গুঁড়ো-গুঁড়ো জিনিস হলেই খোঁচা খেয়ে ঝরঝর করে বেরুতে শুরু করবে। আর যেই বেরুনো, সর্ষে কি মুশুরি ডাল, আটা কি সুজি, চিনি কি চাল—বা নিতান্ত বিঁড়ির শুকো—গলার কাপড় তুলে ধরে ভরে নাও এক থলে। এমনি জনে-জনে, যার যেমন ভাগ্য। আর যেই গাড়ি চলল অমনি সবাই এক দাপটে পগার-পার।

কি হল আজ! বরাকর—আস্তে আস্তে ধানবাদ পেরুলো—এখনো কোনো থ্রিল নেই? ড্রাইভার কি আজ একেবারে বেকার হয়ে থাকবে?

কি মনে করে বাইরে একবার তাকাল নিবারণ। একি, জমাট মেঘ করেছে যে।

বৃষ্টি শুরু হলে কী অবস্থা যে হবে এ ব্রেক-ভ্যানের, ভাবতেও মন খারাপ হয়ে যায়। ফাটা দিয়ে পড়বে জল আর ফুটো দিয়ে ঢুকবে হাওয়া। কিন্তু কে জানে বৃষ্টি শুরু হলেই বোধ হয় পার্টিরা এসে দেখা দেবে। অন্ধকার যত বেশি ঘোরালো হয় ততই যেন চুরির সুবিধে—

সুবিধে হলেই বা কি, না-হলেই বা কি, নিবারণ কী জানে! নিজের থেকে তার কোনো তোড়জোড় নেই, যন্ত্রতন্ত্র নেই। ড্রাইভার যদি কোথাও কোনো ব্যবস্থা করে রাখে, আর তা যদি তার এলাকায় এসে পড়ে, তবেই সে আশা করতে পারে কিছু। নইলে তার কাঁচকলা!

ঘুষ না পেলেও ঘুষের স্বপ্ন দেখতে মন্দ লাগে না।

মাঝে মাঝে মাল-গাড়িতে ক্যাটল-ওয়াগন থাকে। তার মানে গরু মোষ যাঁড় বোঝাই হয়ে। কিছু দুধ দুয়ে দে দেখি? সঙ্গে যে গয়লা থাকে সে দুয়ে দেয় গাড়িতে বসে। সঙ্গে দু'চারজন বেশি লোক নিতে যদি চাস,

সিগারেট খাবার জন্য দু'চারটে টাকা দে, নিয়ে যা পাহারাদার। আর যদি কখনো তারা গাঁইগুঁই করে, বলে, 'তোদের গাড়ি হট-অ্যাক্সল হয়েছে, মানে চাকা গরম হয়েছে—কেটে রাখতে হবে গাড়ি। কেটে না রাখলে আগুন লেগে যাবে, বেলাইন হয়ে যাবে গাড়ি, সর্বনাশ হয়ে যাবে। নে, নেমে পড়।' তখন হাতজোড়। তখন দু-পাঁচ টাকা বেশি আসে।

সারাক্ষণ নিবারণ কি শুধু ঘুষের কথাই ভাববে!

তা ছাড়া আর কী আছে ভাববার? কোনো একটা বই পড়ো না!

বই পড়বে! যা তোমার গাড়ির দুলুনি আর ঝাঁকুনি, সাধ্য কি তুমি বইয়ের লাইনের উপর সোজা করে চোখ রাখো!

বেশ তো, বসে-বসে ঢোলো না! লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়, তুমি তো তবু বসবার জায়গা পেয়েছ।

হ্যাঁ, ঘুমুই, আর সেই ফাঁকে ড্রাইভার একাই ষোল আনা মেরে নিক। আমাকে না বলে ড্রাইভারকে ঘুমুতে বলো।

সেবার মধুপুর থেকে গাড়ি ছাড়ছে—হন্তদন্ত হয়ে এক যুবক আর যুবতী এসে হাজির। দয়া করে তাদের যদি তুলে নেয় নিবারণ। কী ব্যাপার? তারা মধুপুরে আউটিং করতে এসেছিল দেওঘর থেকে, ফিরে যাবার দুপুরের ট্রেনটা মিস করেছে, এখন যদি এ মালগাড়িতে যেতে না পায় তা হলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। দেখুন, আপনি না দয়া করলে—আপনি যদি না মুখের দিকে তাকান—

মুখের দিকে তাকাবার অত গরজ নেই নিবারণের। সে মনি-ব্যাগের দিকে তাকাল। বললে, 'দশ টাকা।'

'তাই দেব।' উঠে পড়ল যুবক-যুবতী।

কিন্তু উঠে পড়ে দেখে দুজনের কাছে মিলিয়েও দশ টাকা হয় না। যদি বা হয়, জসিডি থেকে দেওঘরের ভাড়ায় কম পড়ে।

নিবারণ বললে, 'আমি তা জানি না। দশ টাকার এক আধলাও কম নয়। আর তা আগে চাই, এক্ষুনি-এক্ষুনি। শেষে জসিডিতে এলে যে কলা দেখিয়ে সটকান দেবে, তা হবে না।'

'দিয়ে দাও পুরোপুরি।' মেয়েটি বললে দর্পিণীর মতো : 'জসিডিতে নেমে দেখা যাবে ধার পাই কি না।'

পুরোপুরিই আদায় করল নিবারণ। দর্পই বলো আর প্রেমই বলো, ওসবে আর চোখ পড়ে না, এখন চোখ শুধু বাঁধা মাইনের উপরে কিছু উপরি আয়ের দিকে। একে আর ঘুষ বোলো না; বোলো বকশিশ, বোলো অনুগ্রহ।

কিন্তু আজকের দিনে একটু প্রেমের কথা ভাবলেই বা। স্ত্রীর হাতের অসমাপ্ত মালা না নিয়ে চলে এসেছ তুমি। এখন স্নিগ্ধ মনে তার কথা একটু ভাবা উচিত।

স্নিগ্ধ মন-টন বড়ো কথা। ওসব বড়ো কথা, বড়ো ভাব আসবে না ঘুণাক্ষরে। বরং ভাবা যাক, গাড়ি কখন থামবে কোন মাঠের মাঝখানে, আসবে কোন এক মার্চেন্টের লোকজন, মাল-খালাসির মিলবে কিছু নগদ মুনাফা। তা হলেই প্রেম পরিতৃপ্ত হবে। পেট পরিতৃপ্ত হলেই প্রেম পরিতৃপ্ত।

গয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিবারণ যদি বলে,—আর কিছু নয়, শুধু এই কেরোসিন তেলটুকু এনেছি, তখন কী বলবে লতিকা? বলবে,—কেরোসিন তেলটুকু গায়ে ঢেলে দেশলাই ধরিয়ে দাও। দিয়ে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে এসো।

সংসারে সর্বত্র এই উপরি-পাওনার জন্যেই ছটফটানি। মজুর থেকে হুজুর, কেরানি থেকে কর্ণধার—

গাড়ি থেমে গেল।

বসে-বসেই লাট্টু পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল নিবারণ। হঠাৎ চমকে জেগে উঠল। ও মা, বৃষ্টি পড়ছে যে ঝুপঝুপ করে, গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুতের ঝলক দিচ্ছে থেকে-থেকে। এ কোনখানে দাঁড়াল গাড়ি? কোন জায়গা? দু'পাশে একটু দূরে দূরে কালো-কালো কদাকার পাহাড়ের পাহারা। আর যখন বিদ্যুৎ নেই তখন কী নিরেট অন্ধকার! গাড়ি আর জায়গা পেল না দাঁড়াতে? এখানে মার্চেন্ট কোথায়?

ধৈর্য ধরো। ঘাবড়াও কেন? গাড়ি যখন থেমেছে তখন মজা একটা আছেই।

মজা বুঝতে দেরি হল না নিবারণের। গাড়ি পার্টিং হয়ে গেছে। ভ্যাকম-গজ-মিটারের কাঁটা 'জিরো'তে গিয়ে ঠেকেছে। কাপলিং ছিঁড়ে গেছে ওয়াগনের। হয়তো ভেঙে গেছে ড্র-বার। এখন উপায়?

জায়গাটার দিকে ঠাহর করে একবার তাকাল নিবারণ। বিশালকায় পাহাড় আর বুনো ঝোপ-ঝাড় দেখেই সে আন্দাজ করেছিল—তবু বিদ্যুতের আলোয় মাইল পোস্ট দেখে সে নিঃসন্দেহ হল, পরেশনাথের কাছাকাছি। ঠিকঠাক বলতে গেলে পরেশনাথ পেরিয়ে এসে পরের স্টেশন চৌধুরীবাঁধের মাইল দুয়েক দূরে এসে ঠেকেছে।

ধারে-পারে কোথাও জন-প্রাণী নেই। নেই ছিটে-ফোঁটা আলোর কণিকা। আকাশের একটি তারাও জেগে নেই, তাকিয়ে নেই। বিশাল ভয়াল অন্ধকার। অজানার রাজ্য।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে সাহস আনতে চাইল নিবারণ। দেশলাই জ্বলল অনেক ঘষা-ঘষি করে। ঘড়িতে দেখল রাত প্রায় দুটো। কিন্তু সিগারেট ধরানো গেল না। সিগারেট ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে গিয়েছে।

যদিও শত ছিদ্র দিয়ে জল পড়ছে ব্রেকভ্যানে, গাড়ির চেহারা দেখতে তবু নেমে দাঁড়াল না নিবারণ। তার ভয় করতে লাগল। ভীষণ ভয় করতে লাগল। মনে হল কে যেন তাকে হঠাৎ একটা বিরাট অনুভূতির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যা বিরাট তাই ভয়ঙ্কর।

খানিক পরে ঢিকোতে-ঢিকোতে ড্রাইভার এসে হাজির।

দু'খণ্ড হয়ে গিয়েছে গাড়ি। ছিঁড়ে গিয়েছে গাঁটছড়া।

'প্রথম খণ্ডের লাস্ট ওয়াগনের নম্বরটা দেখে এসেছ?' ড্রাইভারকে জিগগেস করল নিবারণ।

'হ্যাঁ', ড্রাইভার নম্বর দিলে।

'তবে আর কি, ঐ লাস্ট নম্বর দিয়ে মেমো লিখে দিই আগের স্টেশনের এ. এস. এম.-কে। মেট আর জ্যাককে নিয়ে তুমি প্রথম খণ্ডটা নিয়ে বেরিয়ে যাও এঞ্জিন সমেত। এ. এস. এম. কণ্ট্রোলকে খবর দেবে। তারপর, ইতিমধ্যে যদি বেঁচে থাকি, আসবে রিলিফ-এঞ্জিন। মুণ্ডু চলে গিয়েছে আগে, পরে টেনে নিয়ে যাবে ধড়টাকে।'

আগের আধখানা ট্রেন নিয়ে ড্রাইভার বেরিয়ে গেল। জীবনের সঙ্গে যে একটু ক্ষীণ সংস্পর্শ ছিল তাও গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে।

আধখানা ট্রেনের শেষ চাকার শব্দ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কোথাও আর সম্পর্কের এতটুকুও বন্ধন রইল না। সে একেবারে একা, নিঃশেষরূপে নিঃসঙ্গ। তাকে ঘিরে প্রাচীন অরণ্য, মহামহিম পর্বত আর অগম্যরূপ অন্ধকার। এই বিশ্বসংসারে সে শুধু সঙ্গীহীন নয়, সে একেবারে দ্বিতীয়-রহিত। পৃথিবীতে পরিত্যক্ত প্রথম প্রাণ।

কিন্তু ভয়ে কুঁকড়ি-সুকড়ি হয়ে ব্রেক-ভ্যানে বসে থাকলে চলবে না। তাকে তার শেষ আশ্রয়টুকু ছেড়ে নেমে পড়তে হবে এই অপরিচিত অন্ধকারে। এই দুর্বোধ উপস্থিতির মুখোমুখি।

কিসের টানে নেমে পড়ল নিবারণ। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে একবার বুঝে নিতে চাইল চেহারাটা—চোখ বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে শুধু বিশালস্তূপ পাহাড় আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আর সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্জ্ঞেয় অন্ধকার। তার সংকীর্ণ সংসার থেকে ছিন্ন করে কে নিয়ে এল তাকে এই বিশাল অনুভূতির মাঝখানে! তার ছোট ঘর ছোট উঠোন থেকে অন্তহীন এই অঙ্গনের মুক্তিতে। তার প্রাণধারণের ছোট ছোট চেতনার বিন্দু থেকে মহিমময় মৃত্যুর মুখোমুখি।

খল-খল খল-খল শব্দে কে যেন হঠাৎ উচ্চরোলে হেসে উঠল। ভয়ে চমকে উঠে চোখ মেলল নিবারণ। না, ভূত-প্রেত নয়, কাছেই কোথায় একটা পাহাড়ী ঝর্ণা বৃষ্টির জল পেয়ে উল্লাস করে উঠেছে। কে জানে, তাকে দেখে যেন খল-খল হাস্যে বিদ্রূপ করে উঠেছে। যে মহা-স্তব্ধতা পুঞ্জিত হয়ে আছে পাহাড়ে-অরণ্যে, তা যেন অমনি এক উপহাসেরই উচ্চ সুর। সে যে এক ক্ষীণপ্রাণ হীনমতি প্রগল্‌ভ মানুষ, তারই প্রতি উপহাস। তার যে একটা ছোট সংসার আছে, ভীরু আশা আর হীন হতাশা দিয়ে তৈরি—তারই প্রতি উদ্ধত ব্যঙ্গ। তার ক্ষুদ্র লোভ ক্ষুদ্র সঞ্চয় ক্ষুদ্র ভবিষ্যৎ-চেতনার উপরে কঠিন ভর্ৎসনা।

মাইল পোস্ট লক্ষ্য করে স্লিপারের উপর দিয়ে পিছন দিকে এগিয়ে যেতে লাগল নিবারণ। কোয়ার্টার মাইল দূরে রেল-লাইনের উপর ডিটোনেটর প্লেস করতে হবে। গায়ে বর্ষাতি, হাতে হাত-বাতি নিয়ে চলেছে সে পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে। যেন প্রথম আবিষ্কারের পৃথিবীতে প্রথম মানুষ তার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছিপ-ছিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, পা মেপে মেপে এগিয়ে চলেছে নিবারণ। কোয়ার্টার মাইলের মাথায় ডিটোনেটর ফিক্স করে দিল। আরো যেতে হবে কোয়ার্টার মাইল। সেখানে গিয়ে দশ গজ দূরে-দূরে আরো তিনটে প্লেস করতে হবে। একেই বলে ফগ সিগন্যাল। আকস্মিক যদি কোনো ট্রেন এসে পড়ে আপ-লাইনে, তবে আধ মাইল দূরেই পর-পর তিনটে পটকা ফাটবে। তখনই কষে দেবে ব্রেক। আর যখন আরো খানিক এগিয়ে এসে একটা পটকা ফাটবে তখনই করে দেবে ডেড স্টপ। দাঁড়িয়ে যাবে পিছুকার ট্রেন, বেঁচে যাবে দুটো গাড়িই।

কিন্তু পা চলে না আর নিবারণের। মনে হয় আরো কোয়ার্টার মাইল এগিয়ে যাবার আগেই যেন দুর্দান্ত বেগে ছুটে আসবে পিছনের ট্রেন। মুহূর্তে সর্বনাশ ঘটে যাবে। বিদীর্ণ হয়ে পড়বে অসহায় মানুষের করুণ আর্তধ্বনি—তাইতো জীবনধ্বনি।

সেই আর্তধ্বনি যেন স্তব্ধীভূত হয়ে আছে এই অন্ধকারে। পাষাণ হয়ে আছে এই পাহাড়ের রুক্ষতায়।

না। দূরের ডিটোনেটরও লাগিয়ে আসতে পেরেছে। বেঁচে যাবে গাড়ি—যদি না ড্রাইভার মাতাল হয়, যদি না সে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু নিবারণ বাঁচবে না। কতক্ষণ পরেই জঙ্গল থেকে বাঘ বেরুবে কিংবা শুনেছি ভালুক আছে এ অঞ্চলে। বাঘ-ভালুক না হোক, সাপ উঠবে গা বেয়ে। যা হবে তা হবে, এখন ফিরে যেতে হবে গাড়ির কাছাকাছি। হাত-বাতি লাল করে তাই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ব্রেক-ভ্যানের পিছনে। দু'পাশে দুই সাইড-ল্যাম্পের লাল বাতি, টেইল-ল্যাম্পের লাল বাতি, তার উপরে আবার এই হ্যান্ড-সিগন্যালের লাল বাতি। যদি, ডিটোনেটর অগ্রাহ্য করলেও নজরে পড়ে এই সর্বনাশের নিশানা।

কে জানে পড়বে কি না। কিন্তু তার আগেই নিবারণ মরে যাবে। শুধু আতঙ্কে মরে যাবে। বাঘ-ভালুক চোর-ডাকাত ভূত-প্রেতের ভয় নয়। আরেক-রকম ভয়। সংজ্ঞাহীন সীমাহীন শরীরহীন ভয়। একটা বিরাট চেতনা, বিশাল উপস্থিতির ভয়। এই দুশ্ছেদ্য অন্ধকারে সে যে একেবারে একা, তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, তার স্থির কোনো আশ্রয় নেই, দৃঢ় কোনো পরিচয় নেই—তার ভয়। এই মুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘুষ, ক্ষুদ্র প্রমোশন, ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির কথা যে মনে আসছে না—শুধু মৃত্যুর কথা মনে আসছে—তার ভয়।

মনে হচ্ছে সেই ভয় যেন মূর্তি গ্রহণ করছে। সমস্ত পাহাড়-অরণ্য স্তব্ধতা-অন্ধকার মিলে এক বিরাট পুরুষের আকার নিচ্ছে তার চোখের

সামনে। যেন প্রচণ্ড তাণ্ডব মূর্তি অথচ আদিমধ্যান্তশূন্য অশরীরী—

ঐই বোধ হয় মৃত্যুর আবির্ভাব।

কিন্তু পেছনের সেই উদ্দাম উর্ধ্বগতি ট্রেন কই?

না, তার বদলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। পূর্ণিমার চাঁদ লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে পশ্চিমে। পূবে লাল হয়ে জাগছে সুগোল সূর্য। নিবারণের মনে হচ্ছে যেন সেই বিরাট পুরুষ দুই হাতে সোনার খঞ্জনি বাজাচ্ছেন। জন্ম-মৃত্যুর খঞ্জনি।

গাইছেন নবজীবনের কীর্তন।

সমস্ত মৃত্যুর পর এই নবজীবনের সঙ্কেত, সমস্ত ক্ষুদ্র অস্তিত্বের পর এই বিরাট এক সত্তার অনুভব—এইটিই আজকের উপরি-পাওনা।

আজকের নয়। অনন্তকালের।

১০। বিড়ি

তামুকের উপর ট্যাকসো বসেছে।

তবু এক ছিলিম না খেয়ে নিলে নয়। দা-কাটা তামাকের সঙ্গে রাব-গুড় মিশিয়ে গোল্লা বানিয়েছে দলিলদ্দি।

'এক কলকে তামুক সেজে দাও আলির দাদি। বড় তাড়াতাড়ি, এক ফুঁয়ে ধরিয়ে দেওয়া চাই।'

কিন্তু শান্তির দিন কি আর আছে? ভাত খেয়ে উঠে আছে কি আর তামুক খাওয়ার সুসময়?

এক নৌকোতে চলেছে অনেক জন। কেরায়া নৌকো। দখিন থেকে দিলদরিয়া হাওয়া দিয়েছে। বাদাম তুলে দিলে তরতরিয়ে চলে যাবে দেখতে দেখতে। বেতিখালের মধ্যে দিয়ে।

সব চেয়ে বেশি তাড়া হোসেন মোল্লার। সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে সে তিন-ধারার দরখাস্ত লেখে। প্রত্যেক মুসবিদায় দু-আনা চার-আনা মজুরি পায়। আর সব সমন-ধরানো সাক্ষী। ফৌজদারির আর আদালতের। বট-তলায় বাস, ভাড়াটে সাক্ষী আছে একজন। খাজনার মামলায় একতরফা জবানবন্দি করে। কানে খড়কে-গোঁজা আছে একজন মুহুরি।

মেখেজুখে খাবার একটু সময় নেই। সময় নেই হুঁকোয় দুটো সুখ টান দেয়। বাদাম খুলে এখুনি বেরুতে না পারলে ঠিক সময়ে পৌঁছুনো যাবেনা শহরে।

'নেন, বিড়ি নেন।' বাঁশের চুঙার মধ্যে থেকে বিড়ি বার করে দিল আলির দাদি।

হ্যাঁ, বিড়িই তো আছে। হুঁকোর চেয়ে অনেক কড়া, অনেক টিক-খর। এক টানেই চাঙগা করে তুলবে। তুর্কি তাজির মত। এখন শহরে যাচ্ছে, বিড়ি-ই তো থাকবে তাঁর পকেটে। তার তামুকের সার। সারালো তামুক।

না, পকেটে নয়। বিড়ি কটা দলিলদ্দি রাখল তার ট্যাঁকে গুঁজে। অন্তরঙ্গের মত, গায়ের চামড়ার সঙ্গে। গায়ের জামাটা পর-পর মনে হয়। মনে হয় বাইরে, দূরে-দূরে।

দিয়াকাটি কই? বাক্সে মোটে আছে দু তিনটে। ও থাক। আলির দাদির লাগবে সন্ধেরাত্রে। যখন আখা ধরাবে। চেরাগ দেবে পীরের মাজারে। দলিলদ্দির লাগবে না। কারু থেকে চেয়ে-চিন্তে নেবেখন।

আগে বলত বারিকের মা। এখন বলে আলির দাদি। বারিক মারা যাবার পর। বারিকের কবিলা যখন নিকা বসে তখন আলিকে দলিলদ্দি নিয়ে যেতে দেয়নি। হোক মা তার স্বাভাবিক অভিভাবক, আসলে সে-ই তার ভুঁই-সম্পত্তির অলি-অছি। আর ছেলে-মেয়ে নেই, নাতিটুকুই তার শিব রাত্তিরের সলতে। তার পীরের দরগার পিরদিপ।

'আমি যাব শহরে।' আলি লাফিয়ে উঠল।

হ্যাঁ, তেমনি কথা আছে বটে। এবার যখন যাবে দলিলদ্দি, আলিকে সঙ্গে নেবে। শহর দেখে আসবে সে। লাল সুরকির রাস্তা, টিনের ঘর, পাকা দালান, হর-কিসমের দোকানপসার। দেখবে ইস্কুল আদালত। দারোগা দেখেছে সে, এবার নিজের চোখে দেখে আসবে এজলাসের হাকিম।

তাই না রে আলি?

পাঁচ-ছ বছরের ছেলে। পরনে ছোট ডোরাকাটা লুঙ্গি। গায়ে কুর্তা। চোখ ডাগর করে হাসে। বলে, 'শহরে গিয়ে রসগোল্লা খাব, ফজলি আম খাব, আর—'

আবার তাড়া দিয়ে উঠল হোসেন মোল্লা।

নাতিকে নিয়ে নায়ে উঠল দলিলদ্দি।

'এ কি, নাতিকে নিয়ে চলেছ কোথায়?'

'শহরে।'

'সেখানে ওর কী?'

'দেখে আসুক একটু সোরসার। আইন-আদালত চিনে আসুক নিজের চোখে। জমিজিরাতে ওরই তো ওয়ারিশি। বুঝে নিক আপন গণ্ডা। জবরান যে দখল করে তাকে কি করে উচ্ছেদ করতে হয় শিখে নিক তার ঘাঁতঘোঁত।'

'এখুনি শিখবে কী, নয়া মিয়া? এখনো বুঝজ্ঞানই হয়নি।'

'না হোক। কিন্তু রক্তে ওর তেজ লাগুক। নিজের জমি জমা রক্ষা করার তেজ।'

মুহুরিবাবু দিয়াশালাই দিলেন। একটা বিড়ি ধরাল দলিলদ্দি। দু

টানেই গাঁট করে বাঁধা বন্দুকের গুলির মত শরীরটা টন-টন করে উঠল। আমা ইট ঝামা হয়ে উঠল। বিড়িটা চালান দিলে পাশের সোয়ারীকে। পাঁচ আঙুল জড় করে মুখে পুরে বিড়িতে টান দিলে সে ছোঁয়া বাঁচিয়ে। হাত-ফিরতি দিলে আরেকজনকে। আঙুলে ঠোঁট লাগিয়ে সেও টান দিলে চুকচুক করে। ঘুরতে ঘুরতে শেষ টানের জন্যে এল আবার দলিলদ্দির হাতে। লম্বা টান দিতে গেল দলিলদ্দি। বিড়িটা নিবে গেল। শুখা নেই আর, শুধু পাতা। ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীতে।

দূরের পথ নয়। আধ ভাটা সই লাগে। আদালতের প্রথম হাজিরার ডাক পড়বার আগেই এসে পড়েছে তারা।

আর সবাই হোটেলে খাবে। খাক। তারা সাক্ষী, তাদের গুমর কত। তাদের খাওয়া-খরচ চাই, বারবরদারি চাই। না, আমরা ঠিক আছি, আমাদের জন্যে ভাবনা নেই। আমরা দাদা-নাতিতে খেয়ে এসেছি এক পাতে। দরকার হলে নায়ে না এসে হাঁটা পথে চলে আসতে পারত তারা। তারা সাক্ষী নয়, তারা পক্ষ। তারা বাদী।

স্বত্ব সাব্যস্তের মামলা। উচ্ছেদপূর্বক খাসদখল।

ব্যাপার কী? ব্যাপার খুব সোজা। সাধারণ।

কানি তিনেক বাপের আমলী জমি ছিল দলিলদ্দির। তার মধ্যে প্রজার মুখে এক কানি। বাকি জমি ছিল খাসে, নিজ লাঙলে। জমি-জায়গার সঙ্গে সঙ্গে বাপ কিছু কর্জ-দেনাও রেখে গিয়েছিল। সাদা খত আর কটকবালা। দেনার দায়ে, পেটের দায়ে বিক্রি হয়ে গেল খাস জমি। এখনো প্রজাপত্তনি আছে শুধু এই এক কানি। ধানকড়ারী জমা। খাজনা শুধু দশ মণ ধান। অভাবে, বাজার-দর। বাজার যতই সুবিধের হোক তা দিয়ে সংসারপুষ্টি চলে না। পারে না চলতে।

দলিলদ্দির ইচ্ছে করে কোনো ছুতোয় জমিতে নেমে আসে! সে খাজনা চায় না, সে জমি চায়। মুনাফা চায়না, চায় মাটি। আসল-ফসল। খাস জমি সব খোয়া গেছে, এখন আছে শুধু এই প্রজাই জমিটুকু। তার জমি, অথচ তার নয়। সাধ্য নেই দখল করে, আঁকড়ে ধরে বুকের মধ্যে। যেন মা পড়ে আছে শূন্য ভিটেয়, সন্তান রয়েছে দেশান্তরী হয়ে।

দলিলদ্দির মধ্যস্বত্ব। হাওলা। সবাই তাকে হাওলাদার সাহেব বলে। বলে জমিদার। অথচ এদিকে সে বর্গা চষে, বাজার-বেপার করে, মন্দা পড়লে সোজসুজি জন খাটে। জমিদারি চায় না সে, সে জমি চায়।

কিন্তু এক্রাম আলিকে সে কি বলে উচ্ছেদ করবে? এক্রাম আলির রায়তি স্বত্ব। সন-সন সালিয়ানা সে খাজনা দিচ্ছে। জোর করে লিখিয়ে নিচ্ছে দাখিলা। এতটুকু ফাঁক দিচ্ছেনা যে একটা নালিশ ঠোকে দলিলদ্দি। আর নালিশ ঠুকলেই বা কি, ডিক্রি হবার আগেই টাকা জমা করে দেবে আদালতে। ডিক্রি মকুব্বল করে দেবে।

চিরকাল থাকতে হবে বুঝি এমনি পরের জমিতে চাকরি করে। খাটনা খেটে। এ'টোকাঁটা খেয়ে।

গা তেতে-পুড়ে যায় দলিলদ্দির। এমনি সাফ-সুতরো বিক্রি করে দিত, বাস, ভাবতে পারত, চির জন্মের মত চলে গিয়েছে স্বজন-বান্ধব। যে মরে যায় তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় কি করে? যদি বাঁধা থাকিত, জায়সুদি বা খাইখলাসি, ভাবতে পারত, মেয়াদের মধ্যেই ছাড়িয়ে নিতে পারবে কোনোরকমে। তবু আশা থাকত, না মরা পর্যন্ত রুগীর যেমন আয়ু থাকে। কিন্তু এ কী বেদলিলী কান্ড! তার বিয়ার বউ যেন ঘর-গৃহস্থি ফেলে রেখে পরের বাড়িতে গেছে আমোদ-আহ্লাদ করতে। গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে দলিলদ্দির। বুকের মাংস খাবলে নিয়েছে কে—সে-ঘায়ে খাজনার মলম লাগাচ্ছে ফোঁটা-ফোঁটা।

যুদ্ধ এল। ওলোট পালোট হয়ে গেল সব। এক্রামালি কিস্তি খেলাপ করলে। এক কিস্তি নয়, পুরো এক সন। কিন্তু সটান তখুনি আর্জি করতে পারল কই দলিলদ্দি? কি করে পারবে? তার হাওলা-স্বত্ব সে অভাবের দায়ে বিক্রি করে দিয়েছে আহম্মদকে।

আহম্মদ বড় হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। মাটি থেকে উঠে আসতে চাচ্ছে উপরে, লাঙল থেকে লাটদারিতে। সে এখন মান চায় মুনাফা চায়, চায় উপরের স্বত্ব। সে হতে চায় উপর তলার বাসিন্দে।

নালিশ ঠুকল আহম্মদ। আশ্চর্য, এক্রামালি জবাব পর্যন্ত দিলে না। এত তরফা ডিক্রি হয়ে গেল এক ডাকে।

ব্যাপার কী? খবর নিয়ে জানল, এক্রামালি ভেগে পড়েছে। কোথায় গেল? আর বোলো না। গ্রামে যুদ্ধের আড়কাঠি এসেছিল, টাকা পয়সা ও রাঙা মেয়ে মানুষের লোভ দেখিয়ে সেপাই-সাহেবের চোপদার করে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে জমি সে সরাসরি ইস্তফা দেয়নি। জমির উপর বসিয়ে গেছে কোলরায়ত। তার সতাই ভাইয়ের শালা। নিজের ধর্ম-জামাই। নয়ন খাঁ।

জমি-বিক্রির টাকা এক দমকে খরচ করে ফেলেনি দলিলদ্দি। পুষে রেখেছে তুষের আগুনের মত। আহম্মদের ডিক্রিজারিতে সে এসে নিলাম কিনলে, বকেয়া বাকি বেশি ছিল না, পারলে নিলাম কিনতে। আহম্মদের জমি খাস করার ইচ্ছে নেই, সে চায় প্রজা, সে চায় খাজনা। তার হাওলার নিচে রায়ত। এক্রামালিই হোক, বা দলিলদ্দি। দলিলদ্দি চায় জমি জায়গা, ভিত-বনেদ। ফৌতফেরার হয়ে থাকতে চায়না। চায় জমির কাছে ফিরে যেতে। তার নিজের মায়ের কোলে।

নিলাম কিনে আদালতের পেয়াদা নিয়ে বাঁশগাড়ি করে দখল নিলে দলিলদ্দি। কিন্তু খাস দখল পায় কই? কোত্থেকে নয়ন খাঁ এসে হাল তাড়িয়ে দিলে। বললে, ভাসা চর নয় যে লাফিয়ে পড়বে। আমি আছি এখনো।

তুমি কে?

আমি দায়ধারী। এই দেখ পত্তনপাট্টা।

মনে মনে হাসল দলিলদ্দি। সেলামি নিয়ে এক্রামালি তার ধর্ম-জামাইকে ঠকিয়েছে এক চোট। পাকা পোক্ত কোনো স্বত্বই হয়নি নয়ন খাঁর। তাসের ঘরে বাসা নিয়েছে। দায় রহিতের একটা নুটিশ দিলেই উড়ে যাবে এক ফুঁয়ে।

তার কিনা এত চোট! জোয়াল থেকে খুলে দেয় গরুর কাঁধ। কই কাকুতি মিনতি করে বলবে, প্রজা স্বীকার কর নয়া মিয়া, উলটে কিনা হাম্বি হয় জমির উপর। বলে, দায়ধারী!

দায় এবার বিদায় নেবে এক দৌড়ে। প্রজা স্বীকার করবে না হাতি। এত কষ্টে এত দিন বসে থেকে জমির একবার দেখা পেয়েছে, আর তাকে সে লাড়বেনা ঠান্ডা মাটিটার উপর উদলা বুকে পড়ে থাকবে।

গাজুরিতে দরকার নেই। দলিলদ্দি গেল উকিল সাক্ষাতে। উকিল বললে, দায় রহিতের এক নুটিশ জারিতেই নয়ন খাঁ কাটা পড়বে।

হল নুটিশ জারি। কিন্তু নয়ন খাঁ তবু হটে না।

তাই এবার স্বত্ব সাব্যস্তের মামলা। স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্বক খাস দখল।

আদালত গিসগিস করছে। অনেকে এসেছে শুধু জবানবন্দি শুনতে আর হাঁ-না মাথা বাঁকাতে। কোন সাক্ষী কী কেলেংকারি করে, কার কী কেচ্ছা বেরোয় তার মজা পেতে। রেলিঙের বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর্দালি-চাপরাশি তাড়িয়ে দিলে তাদের হাতে পয়সা গুঁজে আবার এসে ভিড় বাড়ায়।

নয়ন খাঁ পাট্টা শুধু নিজের নামে নেয়নি, তার বোনের নামেও নিয়েছে। হয়তো এই বোনের ঠেঙেই সেলামি পেয়েছিল সে। উকিল বললে, সেই বোনের নামে নুটিশ কই? দলিলদ্দি হাসিল। বললে, নুটিশ জারির আগেই সে বোন মারা গেছে। সোয়ামী মারা যাবার পর চলে আসে ভায়ের সংসারে। নিকা বসবারও সময় পায়নি।

যাক, বাঁচা গেল। নয়ন খাঁরও তেমনি তদবির, বোনের কথা কিছুই বলেনি বর্ণনায়। তবু সেই বোনের কথা উঠল দলিলদ্দির জেরাতে।

'বোন মারা গেছে কবে?'

'নুটিশ জারির পূর্বে।' ঘাড় সোজা রেখে বললে দলিলদ্দি।

'তা হোক। বোনের মরা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আছে কে?'

'কে আবার থাকবে! পুরুষ তো আগেই মরে গিয়েছিল। থাকবার মধ্যে আছে শুধু এই ভাই নয়ন খাঁ।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ছেলেপিলে ছিল?'

'তা ছিল বৈ কি—'

দলিলদ্দির উকিল এখানে আঁ-হাঁ-হাঁ করে উঠল, টেবিল থাপড়াল, উঠে দাঁড়িয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রশ্নে অনেক প্রতিবাদ করল। তবু মূর্খ দলিলদ্দি কোনো ইঙ্গিতই বুঝতে পারল না। 'ছিল' পর্যন্ত বলেছিল, এখন বললেই পারে যে সে-ছেলেও মরে গেছে। এখনো পড়তে-পড়তে বেঁচে যেতে পারে। বোকাটা হাসছে মিষ্টি-মিষ্টি। সত্য কথা বলার আরাম পাচ্ছে।

'সে ছেলে কই?' জিগগেস করলে বিপক্ষের উকিল।

'বেঁচে আছে। বাড়িতে আছে। নাম চান্দু। আমার নাতি আলি আজিমের বয়সী।'

তবে আর কী! কচু পোড়া খাও গিয়ে। চান্দুর স্বত্ব তা হলে ধ্বংস হয়নি। আর তবে পাবে কি করে খাসদখল?

কাঠগড়া থেকে নেমে এল দলিলদ্দি। বারান্দায় নিয়ে উকিল তাকে চাবুক মারার মত করে ধমকালে। এমন অঘামারাও আছে দুনিয়ায়? বর্ণনায় কিছু বলেনি, তুই কেন বলতে যাস গায়ে পড়ে? ছেলে একটা ছিল বলেছিলি তাকে মেরে ফেললেই তো পারতিস এক কথায়। তাকে একেবারে জলজীয়ন্ত রেখে দিলি তোর নাতির সামিল করে!

দলিলদ্দির হাত-পা ছেড়ে গেল দেখতে-দেখতে। আদালতের বারান্দায় দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়ল আচম্বিতে। চান্দুকে বাঁচিয়ে রাখার দরুন তার এই ঘোরচক্কর হবে কে জানত! সত্য বলতে গেলে এত শাস্তি! কেন, তার বলতে যাবার ঠেকা পড়েছিল কী! নিজের না' সে নিজে ডোবাল ঘাটে এনে। আর, মুখের কথায় মেরে ফেললেই তো আর মরে যেত না চান্দু। নিকা বসবার আগে আলির মা আলিকে কত মেরেছে আর বলেছে মরে যেতে। কিন্তু আলি কি তার জন্যে বেঁচে নেই?

কিন্তু এখন হবে কী বাবু?

আর হবে কী! নয়ন খাঁর কাছে থেকে খাজনা পাবে কোলরায়তির। জমিতে খাস দখল পাবে না। মুঠ ধরে জমিতে লাশ টানতে পারবে না লাঙলের।

হাউ-হাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করল দলিলদ্দির। এমনি করে আনাড়ি আহম্মকের মত সমস্ত সে মেছমার করে দিলে! কী হত যদি চান্দুকে সে মেরে ফেলত এক কথায়! কী হত যদি চান্দুকে সে মেরে ফেলত এক কোপে!

আলি আরো ছোট্টটি হয়ে বসল দাদার গা ঘেঁসে। দাদার কিছু একটা দুঃখ-বিপদ হয়েছে এ সে বুঝতে পারছে আবছা-আবছা। কিন্তু কিছুই তার করবার নেই। সে শুধু দাদার গায়ে হাত রেখে আপনার জন হয়ে বসে থাকতে পারে চুপ করে।

ট্যাঁকে শুধু তিনটে বিড়ি আছে। একটা বের করে দলিলদ্দি দিলে তা আলির হাতে। বললে, 'যা, পানের দোকান থেকে ধরিয়ে নিয়ে আয়।'

দাদার এই দুর্দিনে কোনো একটা কাজে লাগছে, আলি খুশি হয়ে উঠল। পানের দোকানে ঝুলছে ছোবার পোড়া দড়ি। তারই মুখে মুখ ঠেকিয়ে আলি বিড়ি ধরাল। কচি-কচি পাতলা ঠোঁটে চুক চুক করে টানলে কয়েক বার। ছোট্ট হাতের মুঠটি গোল করে বিড়িটাকে বাঁচিয়ে রাখলে। পাছে নিবে যায় মাঝ পথে ছোট্ট করে আরেকটা টান দিলে চোরের মত। মাঝে-মাঝে ঠিক মত টান না দিলে বিড়ি কখন নিবে যায় আপনা থেকে।

ঠিক ধরিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে বিড়িটা। দলিলদ্দি হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে দু' আঙুলে। টানতে লাগল হু-হু শব্দে।

আর কি, এবার বিড়ি পাকাবে দলিলদ্দি। কোলের উপর কুলো নিয়ে বসবে। কুলোর উপর থাকবে শুকা আর পাতা, ছুরি আর কাঁচি। চা-খড়ি আর সুতো। আর টিনের একটা ফরমা-পাতা। প্রথম প্রথম এই ফরমার উপর বিড়ির পাতা রেখে কাটবে সে মাপসই করে, হাত ওস্তাদ হয়ে উঠলে লাগবে না আর ফরমা-পাতা। রকমারি সুতো বেঁধে-বেধে কদরের হেরফের বোঝাবে। সেঁকা বিড়ি, আসেকা বিড়ি, মুখপোড়া বিড়ি। কড়া, মিঠে আর ছ্যাঁকছেঁকে।

গাল-গলা ভেঙে চুপসে যাবে দলিলদ্দির। বেরিয়ে পড়বে পাঁজরা। কুঁজো হয়ে আসবে ক্রমে-ক্রমে। বিড়ির পাতার মত তার সারা গায়ে শির বেরুবে। কিন্তু হাত হয়ে উঠবে খরখরে। দিনে প্রায় হাজার-দুহাজার বিড়ি পাকাবে দলিলদ্দি। আর লাঙল চালাবেনা। কাঁচি দিয়ে পাতা কাটবে। ছুরি বা কাঠের কলমের ডগা দিয়ে মুড়বে বিড়ির মুখ।

না, অসম্ভব। খুব লম্বা করে শেষ টান দিলে দলিলদ্দি। ধোঁয়াটা বুকের মধ্যে ধরে রাখল অনেকক্ষণ।

তামুকের ঝাঁজে মরা রক্ত চনমন করে উঠল। খাড়া হয়ে উঠে বললে, 'চল ফিরে যাই।'

'কোথায়? বাড়ি?' আলির মুখ চুপসে গিয়েছে।

'না। বাড়িতে নয়।'

'তবে?'

অন্তরঙ্গের কাছে যেন গোপন কথা বলছে এমনি ভাবে গলা নামাল দলিলদ্দি : 'জমিতে। মামলার অত প্যাঁচঘোঁচ বুঝিনা আমরা। আমরা দাদা-নাতিতে মিলে আমাদের নিজ জমির দখল নেব জোর করে।'

বড় মনমরা হয়ে ছিল আলি। শহরে এসে কত কিছু সে খাবে ভেবেছিল, কত কিছু সে দেখবে। কিছুই তার ঘটে ওঠেনি অদৃষ্টে। সমস্ত দিন সে দাদার গা ঘেঁসে বসে রয়েছে। দুঃখের দিনের দিলাশার মত।

শুধু-শুধু বাড়ি ফিরতে হলে খুবই হতাশ লাগত আলির। জমিতে যাবে শুনে তার ফুর্তি হল। লাগল নতুন রকম। চোখ ডাগর করে বললে, 'তাই চল দাদু।'

কাউকে কিছু বললে না দলিলদ্দি। নাতির হাত ধরে চলে এল নদীর ঘাটে। একটা ডিঙি নৌকা ভাড়া করলে। বললে, 'বাড়তি একটা বৈঠা থাকে তো আমার হাতে দাও!'

যেন দৈত্যদানা ভর করেছে দলিলদ্দির কাঁধে। তীরের মত ছুটিয়ে আনলে নৌকা একেবারে জমির কিনারে।

আছরের অক্ত চলে গিয়েছে। আজ আর নামাজ পড়া হল না। আলির

কানে কানে বললে, 'চলে আয়। এই মাটি-মাঠ ধান-পান সব আমাদের।'

'আমদের ? সব ?'

'সমস্ত।'

আকেটা বিড়ি ধরাবে নাকি দলিলদ্দি ? না, এখন নয়।

আউশ ফলেছে জমিতে। পুরো পাকেনি এখনো। না পাকুক, ভাই কাটবে এবার দলিলদ্দি। নৌকার মাঝির সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে। সে দিয়েছে কাঁচি এনে। যা সরাতে পারবে তার দশ আনা তার। জমির নিচে বাঁধা আছে নৌকো।

না, চুরি বোলো না। বলো, জবরান দখল নিচ্ছে সে তার নিজের জমি। যদি নয়ন খাঁ গিয়ে আদালত করুক।

কাঁচি দিয়ে ধান কাটতে সুরু করল দলিলদ্দি। আর আলি নুয়ে-নুয়ে কাদাজলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে-ডুবিয়ে টানতে লাগল গোড়া ধরে।

তিন কানি ভুঁইয়ের মাথায় নয়নখাঁর বাড়ি। কলাগাছের হাউলি দিয়ে ঘেরা।

কে রে ধান কাটে ?

যার জমি সে। রাজার আদালতে হারতে পারি কিন্তু খোদার আদালতে হারবনা।

নয়ন খাঁরা পড়ল গিয়ে ল্যাজা-লাঠি নিয়ে। পালিয়ে গেল না দলিলদ্দি। উন্মাদের মত লড়াই করতে লাগল।

তারপর কী যে ঘটল, অনেকক্ষণ কিছু মনে নেই দলিলদ্দির। দেখল নৌকোয় করে কোথায় চলেছে।

ছই নেই নৌকোয়। ঐ যে লম্বা একটা বাঁশ দেখছ ওটা পাল খাটাবার কাঠ নয়, ওটা ল্যাজা। খাড়া হয়ে বিঁধে আছে দলিলদ্দির বুকে। লেগে ছিটকে পড়ে যায়নি, ঢুকে বসে গেছে। লোহার অংশ বেরিয়ে নেই কিছু বইিরে।

চলেছি কোথায় ?

আবার শহরে। হাঁসপাতালে।

আলি কোথায় ?

পিছনের নৌকোয়। তার লাগেনি বিশেষ। কপালের কাছটা শুধু ফেটে গিয়েছে।

হ্যাঁ, তাকে বাঁচা। তাকে ওষুধ দে।

দলিলদ্দি আবার নিঝুম হয়ে পড়ল। এখনো বেঁধা জায়গা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে ক্রমাগত।

না, এখুনি ঝিমিয়ে পড়লে চলবেনা। আলির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলে যাওয়া দরকার। দাদুকে ফিরে না পাক, কিন্তু জমি তাকে ফিরে পেতে হবে, এই মন্ত্র দিয়ে যেতে হবে তার কানে-কানে। তার রক্তে সেই ঝাঁজ দিয়ে যেতে হবে। এখুনি তার নিবে গেলে চলবে না।

'ম্যাচবাতি আছে নাকি ?'

দলিলদ্দি ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করল। সঙ্গের লোকদুটোকে বললে, 'আমাকে একটু উঁচু করে তুলে ধর। আমি বিড়ি ধরাই।'

বুকে ল্যাজা গোঁজা, অন্যের গায়ে পিঠের ভর রেখে বিড়ি ফুঁকছে দলিলদ্দি।

হাঁসপাতালে যখন পৌঁছুলো তখনো দলিলদ্দির প্রাণ আছে।

আলি কোথায়?

ঐ শুনতে পাচ্ছনা তার কান্না?

হ্যাঁ, আলির কান্নাই বটে। তার জখম হয়েছে কোথায়?

কপালে। ফেটে হাঁ হয়ে রয়েছে। ডাক্তার বলছে সেলাই করবে। তাই ভয় পেয়ে কাঁদছে ছোট ছেলে।

হ্যাঁ। কাঁদছে। দাদু-দাদু বলে কাঁদছে।

বা, কাঁদছিস কেন? লড়াই করতে হবে তোকে। কত প্রতিশোধ নিতে হবে। রক্তে রেখে দিতে হবে কত জন্মের রাগ। তোর ভয় পেলে চলবে কেন?

ল্যাজা বার করে নিয়েছে বুকের। লম্বা ঘরের মধ্যে এক পাশে এক বিছানায় শুয়ে ধুকপুক করছে দলিলদ্দি। অবস্থা সঙ্গিন। এই আছে কি এই নেই।

বারান্দায় উঁচু একটা টেবিলের উপর আলি শোয়া। ডাক্তার অস্ত্র নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে। তার কপালটা সেলাই করতে হবে। প্রাণপণে চিল-চেঁচাচ্ছে ছেলেটা।

সঙ্গের লোক দুটোকে চিনেছে দলিলদ্দি। একটা ভিক্ষুক, একটা দাগী। একজনকে ইসারা করে কাছে ডাকলে। ট্যাঁক থেকে শেষ বিড়িটা বের করে দিল।

বললে, 'আলিকে দিয়ে আয়। বল দাদু দিয়েছে। যেন কাঁদে না। যেন ঠিকমত চিকিচ্ছে করে ভালো হয়। বাড়ি ফিরে যায়।'

'কাঁদিসনে আলি। এই দ্যাখ, তোর দাদু দিয়েছে।'

আলি চোখ ডাগর করে দেখল। একটা গোটা, আস্ত বিড়ি। এক চুমুক ধোঁয়া নয়, একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড। এক খোঁট কালি নয়, একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস। এক শিষ ধান নয় একটা প্রকাণ্ড ধানক্ষেত।

তার দাদু দিয়েছে।

আলি চুপ করল। তেজালো লোভে চকচক করে উঠল তার চোখ দুটো।

১১। অপূর্ণ

কাঁচা মাটির রাস্তার উপর দিয়ে সাড়ে সাত মাইল কঙ্কাল-বার-করা গরুর গাড়িতে আসতে-আসতে অসীমা ভাবছিলো, কী দৃশ্যই না জানি দেখতে হবে। কিন্তু না, বাড়িটা পাকা, দোতলা; নিচে আপিস, উপরে কোয়ার্টার। যে-লোকটা আগে এখানে ছিলো সব ছত্রখান, একাকার করে রেখে গেছে, ভাঙা

হাঁড়ি, মুড়ো ঝাঁটা, ছেঁড়া মাদুর, ঘুঁটের গুঁড়ো—কী নয়! উনুনটা পর্যন্ত আস্ত রাখে নি, শিকগুলি নিয়ে গেছে। কুয়োতলা পর্যন্ত সার-ফেলা ইঁটের চিহ্নই শুধু আছে, ইঁট নেই। এই বে-আব্রু কুয়োর পাড়ে সে স্নান করবে কি করে।

'বাড়িওয়ালাকে শিগগির একটা বাথরুম করে দিতে বোলো।' অসীমা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে জিগগেস করলে : 'এর জল কেমন?'

কাছেই একটা আপিসের লোক ছিলো, বললো, 'ঘরধোয়া বাসন-মাজার কাজ চলতে পারে।'

'খাবার জল?'

'কাছেই টিউব-ওয়েল আছে। এটার জন্যে গাঁয়ের পেসিডেন্ কম লড়াই করেন নি।'

অসীমা উপরে চলে এলো। তখনো সন্ধে হবার সময় হয়নি, কিন্তু গাছ-গাছড়ার অন্তরালে অপরাহ্নটিকে কেমন যেন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে। দু'খানা ঘর ও রাস্তার দিকে অনতিপ্রশস্ত একটি বারান্দাতেই সমস্তটা সুসমাপ্ত। অসীমা দেয়ালের দিকে চেয়ে হতাশ হয়ে গেলো; কী সর্বনাশ, কোনো ঘরেই একটাও তাক নেই। তবে কোথায় সে তার বাঁধানো মাসিক-পত্রিকাগুলি সাজিয়ে রাখবে, তার হোমিয়োপ্যাথির বাক্স, তার প্রসাধনের এটা-ওটা! অন্তত এক-খানা ক্যালেণ্ডারো রাখতো না ঝুলিয়ে? না, যাবার সময় দেয়ালের পেরেক-গুলোও তুলে নিয়ে গেছে?

গ্রাম্য গণনীয়দের সঙ্গে বাক্যালাপ সেরে সুরেশ্বর উপরে এসে বললে. 'প্রথমেই হচ্ছে একপেয়ালা চা!'

'না', অসীমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : 'প্রথমেই হচ্ছে একটা চাকর। জল আনা, বাজারে যাওয়া, ঘর ঝাঁট দেয়া, বিছানা খোলা, এক গাদা কাজ বাকি।'

'সব হচ্ছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ঠাকুর গেছে জল আনতে, আপিসের একটা লোককে বাজারে পাঠিয়েছি, বিছানাটা খুলে নিজেই দিচ্ছি ঝাঁটা বার করে, তুমি শুধু দয়া করে শোবার এলেকাটা পরিষ্কার করে নাও।' ডেক-চেয়ার খুলে সুরেশ্বর গা এলিয়ে দিলো : 'আজ, মনে করো, ধর্মশালায় আছি। কাল সকালে চাপরাশি জয়েন করবে, আর ভাবতে হবে না। ও ছুটি নিয়ে গেলো বলেই এত অসুবিধে।'

'আজ রাতে তবে আর রাঁধতে হবে না নাকি?'

'কী দরকার। স্বচ্ছন্দ খাবার আছে টিফিন-কেরিয়ারে, তারপর চা আছে আর তুমি আছ।' স্ত্রীর দিকে চেয়ে সুরেশ্বর বাধানো দাঁতে হাসলো : 'এই একটু বিশৃঙ্খলা একরাত্রির জন্যেও কি তুমি সইতে পারবে না?'

কতক্ষণ পরে বাড়িওলা এসে হাজির, বিনয়ে পরনের বস্ত্রখানি থেকে সমস্ত দেহটিই যেন অতিমাত্রায় খর্ব, সঙ্কুচিত। কি-কি অসুবিধে তাই এক-বার জানতে এসেছে। সুরেশ্বর আঙুল দিয়ে স্ত্রীকে দেখিয়ে দিলো।

'সব প্রথমেই একটা বাথরুম চাই মশাই, ছাদ-দেয়া ঘেরা জায়গা, সঙ্গে

একটা চৌবাচ্চা, পাড়টা বেশ খানিকটা চওড়া রাখবেন। আর, কোনো ঘরেও একটা তাক রাখেন নি কেন, তাক করে দিতে হবে, মায় দরজা—মানে আলমারির মতো। নিচের বারান্দার সঙ্গে রান্নাঘরটা জয়েন করে দেবেন, অন্তত টিনের ছাদ দিয়ে। আর শুনুন, কাল ভোরেই আমার একটা গয়লা চাই, মেথর চাই, আরেকটা চাকর। সঙ্গে আমি শুধু ঠাকুর নিয়ে এসেছি। বেশ একটা জোয়ান মজবুত চাকর আনতে হবে, অনেক ভারি কাজ সংসারে। কত মাইনে এখানকার চাকরের?' অসীমা একটাল জিনিস-পত্রের মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠলো।

বাড়িওলা সবিনয়ে বললে, 'সব কি একসঙ্গে পারবো?'

'না পারবেন তো ভাড়া পাবেন না বলে রাখছি।' অসীমা শরীরে একটা দৃপ্ত ভঙ্গি আনলে : 'এ মশাই গবর্ণমেন্ট ভাড়াটে চালাকি চলবে না। আপনাকে সাত দিনের আলটিমেটাম দিচ্ছি, সমস্ত করে দিতে হবে, সমস্ত, যা-যা বললাম। তাও তো এখনো সব দেখিনি।'

কতক্ষণ পরে বাজার এসে হাজির।

লণ্ঠন জ্বালাবার জন্যে কেরোসিন তেল আসেনি, তাই অসীমার হাতে টর্চ।

'স্পিরিট এনেছ?' লোকটার চোখ ঝলসে দিয়ে অসীমা জিগগেস করলে।

'সে মা, সরকারি ডিসপেনসারি থেকে আনতে হবে।'

'হোক, আনলে না কেন?'

'বাবু একটা টাকা দিয়েছিলেন, এ-সব কেনাকাটা ক'রে মোটে এই তিন পয়সা ফিরেছে।'

'তাই বলে পয়সার জন্যে তুমি ফিরে এলে?' অসীমা মুখ-চোখের একটা অসম্ভব ভঙ্গি করলে : 'সরকারি ডাক্তারখানা হাকিমের নাম শুনলে এক বোতল স্পিরিট তোমাকে বাকি দিতো না?'

'দিতো না, মা।' লোকটা ভয়ে ভয়ে বললে।

'তোমাদের এই ভূত পাড়াগাঁয়ে কোনো মুন্সেফ আসে, না, ডিপুটি আসে? এই সাব-রেজিস্ট্রারই তো এখানকার একমাত্র হাকিম একচ্ছত্র। মুন্সেফে মুন্সেফ, ডিপটিতে ডিপটি। এজলাসে বসে বিচারও করতে হয়, সাইকেলে করে কমিশনেও বেরুতে হয়। মাইনেতে মাইনে, টি-এতে টি-এ। যাও,' অসীমা গর্জন করে উঠলো : 'দাঁড়িয়ে আছ কি হাঁ করে? দেখি কেমন তোমার সরকারি ডিসপেনসারি এক বোতল স্পিরিট দেয় না ক্রেডিটে। যাও শিগগির। স্পিরিট এলে পরে আমি স্টোভ ধরিয়ে চা করবো।'

রাতটা অসীমার প্রায় অনিদ্রায় কাটলো, প্রায় একটা উত্তেজনার মধ্যে। কাল থেকে তার নতুন সংসার পাতা, নতুন সব জ্যামিতিক পরিস্থিতিতে—কোথায় টেবিল, কোথায় খাট, কোথায় আলনা, কোথায় বা ট্রাঙ্ক-সুটকেস রাখবার বেঞ্চিটা। কিন্তু দেখ দেকি চাপরাসিটার আক্কেল। সামান্য ক'দিন ইস্টারের ছুটিতে তার বাড়ি যাবার কী হয়েছিলো, যখন জানে যে তারা

এ আর একটা এমন কী বেশি কথা এমনি একখানা ভাব করে দেবেন্দ্র সুরেশ্বরের দুই পা কোলের উপরে টেনে নিয়ে বসে পড়লো। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর অসহায় মুখে বললে, 'গোড়ালি ধরে ফস করে টেনে যে-জুতো খোলা যায় সে-জুতো পরো না কেন?'

সুরেশ্বর হাসতে লাগলো।

কিন্তু হাসি দেখে দেবেন্দ্রর আর সহ্য হ'লো না। একটানে হুক শুদ্ধ ফিতেটা সে ছিঁড়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গেই : 'যা!'

'য়্যা! ছিঁড়ে ফেললি?' জুতোর ডগা দিয়ে সুরেশ্বর হাঁটুতে ঠোক্কর মারলো।

'আহা! এতে একেবারে মারবার কী হয়েছে! ভারি তিন পয়সার তো একটা ফিতে, দাও, আমি খুলে দিচ্ছি।' কোত্থেকে অসীমা এলো ছুটে।

'করো কি, করো কি, 'তুমি খুলবে জুতোর ফিতে!'

'কেন, কোনো দোষ আছে?'

'না, কোনোদিন খোলো নি কিনা—' সুরেশ্বর ভয়ে-ভয়ে বললে।

'অনেক কিছুই তো করি নি এত দিন', স্বামীর পা-টা অসীমা জোর করে টেনে নিলে : বাসন মাজি নি, মশলা পিষি নি, ঘর ঝাঁট দিই নি, মশারিটা টাঙাই নি পর্যন্ত। সব চাকরে করে দিয়েছে।'

একবার দেবেন্দ্র ও একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সুরেশ্বর বললে, 'তবে এই নিষ্কর্মা বাচ্চা চাকর রেখে কী লাভ হ'লো?'

'ক্ষতিই বা হ'লো কী শুনি?' ফিতের হট্‌কাটা টানতে গিয়ে অসীমা আঁট করে একটা গিঁটই লাগিয়ে ফেললো, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললে, আগে যেখানে ছিলে, চাকরের মাইনে ছিলো সাত টাকা। এখানেও তার চেয়ে তোমার এক আধলাও বেশি লাগবে না। দেবুকে দেব পাঁচ টাকা আর বাকি দু'টাকা জলের জন্যে। চুকে গেলো।'

'আর বাকি সমস্ত কাজ তুমি নিজে করবে?' সুরেশ্বর নিজের প্রশ্নটাকেই যেন অবিশ্বাস করছে।

'কেন, খুব একটা দোষের কাজ করবো নাকি? নিজের সংসারে নিজে খাটবো এর চেয়ে বড়ো সুখ আর মেয়েদের কী হ'তে পারে? অন্তত এক্‌সারসাইজ তো হ'বে! সেদিন খবরের কাগজে পড়লাম, বসে থেকে-থেকে মেয়েদের আজকাল ডায়াবেটিস হচ্ছে।' বলতে-বলতেই জুতোর ফিতেটা সে সমূলে ছিঁড়ে ফেললো।

উল্লাসে দেবেন্দ্র উঠলো লাফিয়ে : 'কই, মারো দেখি তো এবার মাকে।'

'চুপ কর, দেবু!' অসীমা ধমকে উঠলো।

কিন্তু সুরেশ্বর দেখলো তাতে শাসনের চেয়ে স্নেহের বেশি প্রকাশ।

শুধু পা দুটো সামনের দিকে আরো ছড়িয়ে সে মুহ্যমানের মতো একবার বললে, 'মধুসূদন!'

যাই বলো, সুরেশ্বরের একটা ভাবনা ঘুচলো। আর তাকে মুহুর্মুহু

ব্যস্ত থাকতে হবে না অসীমাকে ব্যাপৃত রাখতে। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল অসীমার কাজের আর অন্ত নেই। তার একটানা সেই অলস প্রসারিত ভঙ্গিটা এখন নানা ছন্দে এঁকে-বেঁকে ভেঙে-চুরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। এত কাজ করবার তার শক্তি ও উৎসাহ এলো কোত্থেকে সুরেশ্বর ভেবে-চিন্তে কিছু কিনারা করতে পারলো না। তার সংসার যেন হঠাৎ খুব বড়ো হয়ে উঠলো এখান থেকে ওখানে এটা থেকে সেটায় কে যেন তাকে শত-সহস্র হাতে খাটিয়ে বেড়াচ্ছে। চাকরটার এক আঙুলও নাড়তে হচ্ছে না। পান সাজা থেকে জুতো বুরুশ-করা, ঝুল-ঝাড়া থেকে ঘর-মোছা, কাপড়-কাচা থেকে বাসন-মাজা, ভারি আর হালকা, উপরে আর নিচে, সমস্ত কাজই এখন অসীমার নিজের কাজ। এই কাজেই তার ছুটি, তার বিশ্রাম।

'চাকরটা তবে আছে কি করতে?' সুরেশ্বর বিরক্ত হ'য়ে বললে।

'কেন, তোমারি বাজেট তো আর ছাড়িয়ে যায় নি। সাত টাকা ছিলো, সাত টাকাই আছে।'

'বেশ তো, ওটাকে না ছাড়াও, আরেকটা রাখো।'

'কী একবারে লাট-সাহেব হয়েছ যে দু'দুটো চাকর রাখতে হবে।' অসীমা ঝামটা দিয়ে বললে, 'তোমার কোন কাজটা হচ্ছে না শুনি?'

'কিন্তু মাইনে-করা চাকর থাকতে তুমিই বা এত খাটবে কেন?' সুরেশ্বর গলা নামিয়ে আনলো।

'শুয়ে-বসে থেকে লাভের মধ্যে তো শুধু ভুঁড়ি হচ্ছিলো' কথার স্থূলতায় অসীমা নিজেই হেসে ফেলল : 'এখন খেটে-পিটে চেহারার ঢিলেমিটা কেমন কমে যাচ্ছে দিন-দিন। কেন, পছন্দ হচ্ছে না?' অসীমা শরীরে একটা তির্যক্ ভঙ্গি আনলো।

'ছাই! আজকাল ভালো ক'রে চুলটা পর্যন্ত বাঁধো না। কোথায় বা তোমার সুর্মা, কোথায় বা তোমার আলতা! শুতে যে আস যেন ঘুমুতে আস।'

'আমার এত সময় কোথায়!' অসীমা কার্যান্তরে চলে গেলো।

নিচু মোড়ার উপর লণ্ঠন রেখে, রাত্রে, মেঝেয় বসে অসীমা কল চালিয়ে কী সেলাই করছিলো, সন্ধের পর তাস খেলে বাড়ি ফিরে এসে জামা ছাড়তে ছাড়তে সুরেশ্বর ডাকলো : 'দেবু।'

নামটা হ্রস্ব না ক'রে আর উপায় ছিলো না।

'কেন?' অসীমা সেলাইয়ের লাইন ভাঙতে-ভাঙতে উদাসীনের মতো বললে।

'এক গ্লাস জল দেবে।'

'বোসো, আমি দিচ্ছি।'

'কেন, ও তবে আছে কী করতে?' সুরেশ্বর মুখিয়ে উঠলো।

'তোমার জল খাওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা। জলের মধ্যে জল যে দেবে তার নাম লেখা থাকবে না। কেউ না কেউ দিলেই হল।' অসীমা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলো।

জল সুরেশ্বর খেলো কি না-খেলো, প্লাসটা টিপাইয়ের উপর নামিয়ে রেখে বললে, 'শালাকে একবার ডেকে দাও।'

অসীমা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো কঠিন কিছু বলবার জন্যে। গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'নিজের ছেলেকেও তুমি একদিন শালা বলতে পারবে দেখছি।'

'বেশ, তোমার ছেলেকেই ডেকে দাও দয়া করে।'

'হ্যাঁ, ছেলে, একশোবার ছেলে। পনেরো বচ্ছর আজ বিয়ে হয়েছে, যদি হ'তো এমনি বড়োটিই সে হ'তো। হ'লে তখুনি-তখুনিই হয়,' অসীমার গলা কেমন ছলছলিয়ে এলো : 'আর যখন একবার হয় না, হয়ই না।'

'তারা ব্রহ্মময়ী!' সুরেশ্বর পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লো।

অসীমা কাছে এসে বললে, 'কেন, দেবুকে কী দরকার?'

'গা-হাত-পা-টা একটু টিপে দিতো।'

'তা বললেই হয়। আমিই দিচ্ছি টিপে।'

'সেটা টেপা হবে না, বুলুনো হবে। সুরেশ্বর হাসলো।

'আর দেবু একটা কী গঙ্গার ঘাটের নাপতে এসেছে। পাপড়ির মতো তো তার হাত-পায়ের ছিরি, একখানা বাসন মাজতে দিলে হাত টাটিয়ে ফোস্কা পড়ে। আমারটা যদি বুলুনো হয় তবে ওরটা তো সুড়সুড়ি হবে।'

স্বামীর পদ-সেবার মধ্যে সতীত্বের যতো কবিত্বই থাক, পায়ের উপর অসীমার হাতের স্পর্শ এসে লাগতেই সুরেশ্বর অস্থির হ'য়ে উঠলো। 'কেন, ও নবাবপুত্তুর তোমার কী করছে?'

অসীমা সঙ্ক্ষেপে বললে, 'পড়ছে।'

'পড়ছে?' এর চেয়ে মাথায় বাড়ি মারলে সুরেশ্বর বেশি আরাম পেতো।

'হ্যাঁ, দুপুরবেলা পড়া দিয়েছি, এখন ওর তা তৈরি করবার সময়।'

প্রাণ খুলে যে হাসবে অসীমার মুখের চেহারায় সুরেশ্বর তার এতটুকু প্রশ্রয় পেলো না। তাই রুক্ষ গলায় বললে, 'লেখা-পড়া শিখে রেজেস্ট্রি আপিসের দলিল লিখবে নাকি?'

এ যেন শুধু তার শিক্ষকতাকে অপমান করা। অসীমাও পাল্টা জবাব দিলো: 'কেন, শুধু নাম-দস্তখৎ-করা রেজেস্ট্রি আপিসের হাকিম হ'তে পারবে না?'

যাক, দুপুরবেলাটাও অসীমার পরিপূর্ণ। টিফিন করা বা টিফিনের সময় বাড়ি আসার রেওয়াজ ছিলো না সুরেশ্বরের। কিন্তু এখন মাঝে-মাঝে সে দু'দশ মিনিটের ফাঁক খুঁজে উঠে আসে উপরে। দেখে, মেঝের উপর পাটি পেতে ব'সে অসীমা শেলেট-পেন্সিল নিয়ে দেবুকে আঁক শেখাচ্ছে অসীমার চুলগুলি খোলা, আঁচলটা বহুদূর পর্যন্ত স্খলিত, সমস্ত চেহারায় কেমন মাতৃত্বের তন্ময়তা, আর দেবুর দুই চোখে কৌতূহলের যেন সীমা নেই শেলেটের উপর পেন্সিলের ক'টা চিহ্ন যেন তার কাছে আকাশের গায়ে তারার রহস্যের মতো। যেমন নিঃশব্দে আসে তেমনি নিঃশব্দে সুরেশ্বর চ'লে

যায়। কোনদিন এসে দেখে অসীমা তাকে মুখে-মুখে ভূগোল শেখাচ্ছে—কী আমাদের দেশ, কতো বড়ো, কতো তার জেলা, কত তার নদী, আর কত অপরূপ সে কোলকাতা, রাজধানী! শুধু একটা তালিকা দিচ্ছে না, যেন সব আত্মীয়-স্বজনের কথা বলছে, জল পাথর মাটি সবেতেই যেন কী অসীম মমতা মাখানো। আর দেবুর বিস্ময়ের অন্ত নেই, না বা অহেতুক-জিজ্ঞাসার।

'আমার জিনের প্যাণ্টালুন দুটো কী করলে?' আপিসে বেরুবার আগে বাক্স ঘাঁটতে-ঘাঁটতে সুরেশ্বর জিগগেস করলে।

'কেন, ও দুটো তুমি পরতে নাকি? ওদের তো পায়ের তলা দিয়ে সুতোর শুঁড় বেরিয়েছিলো।'

'কাঁচি দিয়ে কেটে নিলেই পরা যেতো—অন্তত দু' ছুট করে।'

'কাঁচিই চালিয়েছি বটে, তবে হাঁটুর কাছাকাছি।' অসীমা হাসলো।

'কেটে ফেলেছ নাকি? কেন?'

'দেবুকে হাফ-প্যান্ট করে দিয়েছি।'

'এই না সেদিন কাপড় কিনে দিলে?'

'দেখলাম হাফ-প্যান্ট পরলেই বেশি স্মার্ট দেখায়।'

শুধু স্মার্ট নয়, বাবু হয়ে উঠেছে।

দেবু একদিন এসে বললে, 'নিচে ও ঘরে আমি শুতে পারবো না, মা।'

অসীমার বুকটা ধক করে উঠলো: 'কেন?'

'কাল রাতে ঘুমের মধ্যে ঠাকুর আমার গা থেকে কম্বলটা টেনে নিয়েছে, মা। সারা রাত আমি শীতে হি-হি ক'রে কেঁপেছি।'

'কেন, ওর কাঁথা নেই?' অসীমা জ্বলে উঠলো।

'বলে, ত্যানার কাঁথাতে শীত মানে না, তাই খালি-খালি আমারটা ধ'রে টানাটানি করবে।' অভিমানে কি অপমানে দেবু ঠোঁট ফোলালো: 'তারপর এক তক্তপোসে ওর সঙ্গে শোয়া আমার পোষাবে না, মা। খালি লাথি মারে, মশারি থেকে বাইরে ঠেলে ঠেলে দেয়—মশার কামড়ে আমি ঘুমুতে পারি না।'

'এত দূর!' অসীমা রাগে একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।

'বলে কিনা, তুই তো চাকর, নিচে নেমে শো না, লক্ষ্মীছাড়া, আমার এই-টুকু তক্তপোসে তুই ভাগ বসাতে এসেছিস কেন?'

সত্যিই তো, এ-কথাটা তো অসীমার মনে হয়নি এতদিন। আজ দেখলো, কত বড়ো একটাই না সে অসামঞ্জস্য করে বসেছে। ঐখানে শুয়েই কি ওকে মানায়, একপাশে যেখানে কয়লা আর ঘুঁটে টাল করা, মাকড়সার জাল আর পোড়া বিড়ি—সেই একটা নোংরা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায়? রাজ্যের চাকর-বাকর যেখানে এসে আড্ডা দেয়, বিড়ি ফোঁকে, জুয়ো খেলে, মুখ-খারাপ করে। সেই আবহাওয়াটা কি ওর চরিত্রের অনুকূল হবে, কোথাকার কে একটা খোট্টাই বামুনের সাহচর্য?

হাতের যেখানে-যেখানে লালচে-মতন দেখাচ্ছে সেখানে-সেখানে হাত বুলিয়ে

অসীমা বললে, 'দেখেছ! আচ্ছা, আজ থেকে তোমার আর ও ঘরে শুতে হবে না। ওপরে শোবে, আমাদের পাশের ঘরে।'

পাশের ঘরটা সুরেশ্বরের বসবার, এক কোণে একটা টেবিল পাতা। বিস্তর খালি পড়ে আছে মাঝখানটায়, দিব্যি আরেকখানা তক্তপোস পড়বে। জিনিসের মধ্যে তো টিনের একটা ওর সুটকেস, ফুলতোলা একখানা আয়না, আর এটা-ওটা বইবার জন্যে বেতের একটা বাক্স বা জাদুঘর। দড়িতে আর ওর জামা-কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে হবে না, ব্র্যাকেট আছে, আসন-পিঁড়ি হ'য়ে পড়া করতে হবে না, টেবিল চেয়ার আছে। নতুন একসেট বিছানা, একটা মশারি লাগবে। তা লাগুক। সংসারে টাকা বড়ো, না সম্মান বড়ো? দেবু তাই তার পোঁটলা-পুটলি নিয়ে উপরে উঠে এলো।

তাকে যেন কে হঠাৎ ছালার মধ্যে পুরে মুখটা সেলাই করে দিচ্ছে সুরেশ্বর মুখের তেমনি একটা ভয়াবহ চেহারা করলে। বললে, 'একেবারে ওপরে টেনে নিয়ে এলে দেখছি।'

'না, একা-একা নিচের ঘরে শুয়ে ভয়ে ও মরে যাক!'

'কেন ঠাকুর কী করলো?'

'ও সব সময়ে থাকে নাকি বাড়িতে? রাত-বিরেতে কোথায় আড্ডা দিতে যায় কিছু ঠিক আছে?' অসীমা দৃষ্টিটাকে কুটিল ক'রে তুললো : 'আর বলিহারি তোমার কাণ্ডজ্ঞানকে। খইনি টেপে আর ফিচ-ফিচ করে থুথু ফেলে, অমনি একটা খোট্টাই মার্কণ্ডেয়র সঙ্গে ও ঘুরে বেড়াক! এই বুদ্ধি না হ'লে কি আর সাব্‌রেজিস্ট্রার হয়েছ?'

'কিন্তু আমি ভাবছি, গদি না হ'লে কি শুধু তক্তপোসে শ্রীমান ঘুমুতে পারবে?' সুরেশ্বর কথাটাকে নির্লজ্জের মতো বাঁকা করলো : 'আমি বলি কি, আমাকে ও-ঘরে চালান দিয়ে তোমরা দু'জনে খাটে এসে শোও।'

ইঙ্গিতটা অসীমা গায়ে মাখলো না। বললে, 'ঈশ্বর না করুক, যদি ওর কোন অসুখ-বিসুখ হয়, তবে সেই বন্দোবস্তই করতে হবে।'

সুরেশ্বর চুপ করে গেলো। কেননা অসীমা যে কোনো একটা কিছু নিয়ে ব্যাপৃত, তন্ময়, পরিপূর্ণ থাকতে পারছে, সংসারে সেইটেই তার প্রকাণ্ড লাভ। কেননা, এত দেবার পরেও অসীমা যখন মুখোমুখি তাকে জিগগেস করে : 'আমাকে তুমি কী দিয়েছ?' তখন সত্যিই সুরেশ্বর কোনো জবাব দিতে পারে না। আজ ঈশ্বর তার হাতে খেলনা এনে দিয়েছেন, তাকে নেড়ে-চেড়েই যদি তার তৃপ্তি হয় তো হোক।

দেবু এবার তাই উপরেও নির্বাধ জায়গা পেয়েছে। সেই আজকাল ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলায়, মাস ফুরুলে পাতা ছেঁড়ে, ঘড়িতে চাবি দেয়, য়্যলার্মের কাঁটা ঠিক করে রাখে, ডিস্‌ক্ ঘোরায় গ্রামাফোনের তার রুচি দিয়ে অসীমার রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সকালবেলায় দু'এক ঘণ্টার জন্যে সুরেশ্বর তার বসবার টেবিলে জায়গা পায়, বাকি সময়টা তার উপরে

দেবুর দুর্দান্ত কর্তৃত্ব। সেই বিশৃঙ্খলাটাকে সন্ধের আগে অসীমা কেমন সমাদরে গুছিয়ে রাখে, যেন সে একটা উদ্বেল ভাবাবেগাক্রান্ত কোমল একটি কবিতাকে সংযত, সুসম্বদ্ধ করে আনছে।

কিন্তু সেদিনের কাণ্ড দেখে সুরেশ্বরের পক্ষেও মাত্রা বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে উঠলো। তখন ঘোরতর বর্ষা, আর মফস্বলের বর্ষা, যে-বর্ষার কোনো-কালে কখনো শেষ হবে বলে মনে হয় না। তেমনি এক সন্ধ্যাশেষে বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে প্রথমে পা দিতেই সুরেশ্বর ভয়ে আর রাগে কত-ক্ষণের জন্যে মূঢ় হ'য়ে রইলো।

দরজা-জানলাগুলো খোলা, বৃষ্টির ছাঁট আসছে। টেবিলে তার টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু উচ্চ শিখার দৌরাত্ম্যে চিমনি ও তার ঘেরাটোপটা দুইই ফেটে চৌচির। শিখাটা লকলকে জিভ মেলে চারপাশে আহুতি খুঁজছে। কাগজ-পত্র কি কোথায় ছত্রখান হ'য়ে ছিটিয়ে পড়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু আর ক' মিনিট পরেই একটা অগ্নিকাণ্ডের সমারোহ হ'তো, যদি না এ সময় সে এসে পড়তো আকস্মিক। অথচ এরি মধ্যেই দিব্যি ঠাণ্ডা পেয়ে দেবুচন্দ্র টেবিলের উপর হাত রেখে তাতে মাথা গুঁজে আরামে ঘুম যাচ্ছেন।

সমস্ত শরীরে তেমনিই বুঝি আগুন জ্বলে উঠলো সুরেশ্বরের। ডান হাতে দেবুর কান আমূল আকর্ষণ করে সে বললে, 'আলো কতখানি চড়া হলে, ব্যাটাচ্ছেলে, তোমার পড়া হয়?'

চোখ চেয়েই দেবুর চক্ষু স্থির।

কিন্তু তার চেয়েও স্তম্ভিত হয়েছে সে এই তার অসম্ভব অপমানে। সুরেশ্বর কী বলছে যেন সে ঠিক কান দিতে পাচ্ছে না।

বাঁ হাতে ল্যাম্পের পলতেটা ডুবিয়ে দিয়ে কানটা তীব্রতর মুচড়িয়ে দিয়ে সুরেশ্বর বললে, 'তুমি কি এখন লঙ্কাকাণ্ডে এসে পৌঁচেছ হতচ্ছাড়া?'

আলো নিবতে এতক্ষণে দেবুর যেন হুঁস হ'লো। তেজ দেখিয়ে বললে, 'কান ছাড়ো বলছি।'

'কান ছাড়বো, কিন্তু হারামজাদা চাকর, তোর শরীরে আর জায়গা নেই?' বলে সুরেশ্বর ধাঁ করে তার গালে এক দীর্ঘ চড় বসালো।

দেবু খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালো। চোখ পাকিয়ে বললে, 'মারো যে ভালো হবে না বলছি।'

'কী ভালো হবে না রে পাজি? মুখ একেবারে ভেঙে দেবো।' সুরেশ্বর হাতের টর্চটা উঁচিয়ে এলো।

'মারো দেখি তো তোমার কেমন বুকের পাটা।'

সত্যি-সত্যিই সুরেশ্বর মারলো, চড়ের পরে চড়। বললে, 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি ছেড়ে।'

অসীমা কোথায় বাইরে গিয়েছিলো, পাগলের মতো ছুটে এলো লন্ঠন নিয়ে।

'কী হয়েছে?',

'ব্যাটাচ্ছেলে ল্যাম্প জেবলে ডোম-চিমনি সমস্ত ভেঙে দিয়েছে, আরেকটু হ'লে আগুন লেগে যেতো বাড়িতে। আগুন জবালিয়ে তিনি ঘুম যাচ্ছেন।'

'মিথ্যে বলো না বলছি, মুখ খসে যাবে।' দেবু রুখে উঠলো।

'দ্যাখ্ না কার মুখ খসে।' বলে সুরেশ্বর আবার তার মুখে একটা চড় মারলো।

স্বামীর এমন বিজাতীয় রাগ অসীমা দেখে নি আর, কী আশ্চর্য, এই ছেলেটা সামান্য আর্তনাদও করছে না।

'আমি ভেঙেছি নাকি? হাওয়ায় ভেঙেছে।'

'এই না হ'লে বিদ্বান চাকর! আমি মারছি নাকি, আমার হাত মারছে। কিন্তু হারামজাদা, এই আলো তোমাকে জবালতে বলেছিলো কে?' সুরেশ্বর মুখ খিঁচিয়ে উঠলো : 'এখানে পাওয়া যায় না এই চিমনি, আমি কত কষ্টে পোস্টমাস্টারবাবুকে দিয়ে সদর থেকে আনিয়েছি। দে আমার এই চিমনি আর ডোমের দাম।'

'আমার মাইনে থেকে কেটে নাও গে।'

'মাইনে!' সুরেশ্বর ফের মারবার জন্যে উদ্যত হয়েছিলো, কিন্তু অসীমার সামনে সাহস পেলো না।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তেমনি চুক্তি করেই রাখা হয়েছিলো। যা কাটবে কাটো, বাকি টাকা যা আমার এতদিনে পাওনা হয়েছে চুকিয়ে দাও।'

'যা, আদালত করে নে গে যা। দেবো না। বেইমান, নেমকহারাম কোথাকার!'

'আর মাস-মাস মাইনে দেবে বলে চাকর রেখে যে মাইনে না দেয়, তাকে লোকে কী বলে? বলে ভদ্রলোক, বলে হাকিম, না?'

দেবু অসীমার দিকে ফিরেও চাইলো না, বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

কোন দিকে গেল কে বলবে!

অনেক রাতে ঘুমের মধ্যেই সুরেশ্বর অনুভব করে দেখলো পাশে অসীমা শুয়ে নেই। কোথায় গেল সে হঠাৎ, কখন? এই তো তখন খেয়ে-দেয়ে আলো নিবিয়ে পাশে এসে শুলো দিব্যি মশারি ফেলে ধারগুলি টান করে গুঁজে দিয়ে। কিন্তু কোথায় সে সত্যি গেলো? সুরেশ্বর পা টিপে-টিপে, যেন কি-একটা আশাতীত দেখবার আশায়, পাশের ঘরে উঁকি মারলো। না, দেবুর বিছানাটা খালি, কেউ সেখানে নেই, সমস্ত ঘরে সেই রাশীভূত বিশৃঙ্খলা। টর্চটা হাতে নিয়ে বারান্দা ও ছাদটা সে ঘুরে এলো, কোথায় অসীমা যেতে পারে। নামলো নিচে, নিঃশব্দে। দেখলো রান্নাঘরে নিম্নশিখায় আলো জবলছে। টিনের বেড়ার গোলাকার একটা গর্তে সে চোখ রাখলো। দেখলো পিঁড়িতে বসে দেবু গোগ্রাসে ভাত গিলছে, আর অসীমা, চওড়া কস্তা-পাড় শাড়ি পরনে, পাশ ঘেঁসে বসে একদৃষ্টে তার খাওয়া দেখছে।

সুরেশ্বর শুনলো অসীমা বলছে : 'কাল সকালে উঠেই পা জড়িয়ে ধরে ওঁর ক্ষমা চাইবি। লজ্জা কিসের? বলবি, আর অমন করবো না।'

দেবু জল খাচ্ছিলো, আধ পথ থেকে ঢোঁক গিলে বললে, 'ও আমি পারবো না, মা।'

'সে কী কথা, তিনি গুরুজন, তাঁর মুখে-মুখে কি কথা কইতে আছে?'

'কে গুরুজন? তুমি যদি সামনে অমনি না দাঁড়াতে, মা, আমি ঠিক ওর মাথা সই করে পেপার-ওয়েটটা ছুঁড়ে মারতাম।'

অসীমা শিউরে উঠলো : 'দূর ডাকাত-ছেলে। সে কথা মনেও করতে নেই। আচ্ছা, আমি তোর গুরুজন তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়, একশোবার। তুমি আমার মা।'

'তেমনি তিনি তোর বাবা।'

'ঐ বুড়ো?'

'কেন, আমিও তো বুড়ি হয়েছি।'

'তুমি বুড়ি! কে বলে?' দেবু তার হাতের গ্লাসটা শক্ত করে চেপে ধরলো : 'বাবা, না হাতি! ও তো তোমার বাবার বয়সী, গোঁফে কলপ দেয়, বাজারের দাঁত পরে, বৃষ্টি হলেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে হাঁচে।'

অগোচরে অসীমার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো কিনা বোঝা গেলো না। শুধু বললে, 'আমি যেমন তোর গুরুজন হই, তেমনি তিনি আবার আমার গুরুজন হন। একটা কথা তুই আমার রাখতে পারবি না, দেবু?'

'তুমি বললে নিশ্চয়ই পারবো।' চিবোতে-চিবোতে দেবু হাসিমুখে বললে, 'কিন্তু তোমার গুরুজনকে বলে দিয়ো মা, আমার গুরুজনকে যেন তিনি না কখনো বুড়ি বলেন।' তবে তার তোবড়ানো গাল আরো তুবড়ে যাবে। ছেড়ে কথা কইব না।'

পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন ছিলো না, যেমন অপ্রতিবাদে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে গেলো তেমনি অপ্রতিবাদেই দেবু সংসারে তার সাবেক জায়গা খুঁজে পেলো। বোধকরি বা আগের চেয়েও বেশি। কেননা কখনো-কখনো অসীমার হাত জোড়া থাকলে চাবি দিয়ে বাক্স খুলে দেবুই আজকাল পয়সা বার করে দিচ্ছে।

পুজোর সময়টায় এ-অঞ্চলের যুবক জমিদার তার নবপরিণীতা গৃহিণীকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে এসেছেন। জমিদারের না-হয় সেলাম আর সেলামি আছে, দুই অর্থে শিকার আছে, প্রজা-ঠ্যাঙানো আর নায়েব-শাসানো আছে, কিন্তু গৃহিণী তাঁর ঐশ্বর্যটা কিসে ও কোথায় উদ্ঘাটিত করেন? একমাত্র সাব-রেজিস্ট্রারের বাড়িতেই তিনি আসতে পারেন, যার কারখানায় তাঁদের পাট্টা আর কবুলতি হচ্ছে, একরার আর এওয়াজনামা, কবালা আর জায়সুদি।

তাই তিনি একদিন এলেন, দুপুরবেলা, গয়নায় গম-গম করতে-করতে।

তাঁকে কোথায় বসাবে ভেবে পেলো না। প্রথমেই নিয়ে এলো তাঁকে

বসবার ঘরে। বললে, 'আপনি এসেছেন শুনেছি। কিছুদিন আছেন নাকি এখানে?'

জমিদার-গৃহিণী নাসিকাগ্রকে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করলেন : 'পাগল! এ তে আর চাকরি করে উদরান্ন সংস্থান করতে হচ্ছে না। সপ্তাহখানেক পরেই পালাবো। যেখানে ইলেকট্রিক নেই, ভদ্রলোক সেখানে টিকতে পারে? রাতে উঠে এককাপ চা খেতে ইচ্ছে করলেই গরম জল করতে ভোর হয়ে যাবে। ত আপনার বাড়িখানা মন্দ নয়। ঐ বুঝি আপনার বড়ো ছেলে?'

ঘরের কোণে টেবিল-চেয়ারে বসে দেবু পড়ছিলো। হাঁ কিম্বা না কিছু না বলে অসীমা বললে, 'প্রণাম করো, দেবু।'

দেবু উঠে এসে প্রণাম করলো। জমিদার-গৃহিণী গদগদ হ'য়ে বললেন, 'বাঃ ভারি সুন্দর ছেলেটি তো! কী নাম তোমার?'

'দেবব্রত।' দেবু বললে।

'আর হয় নি কিছু?' জমিদার-গৃহিণী অসীমার দিকে তাকালো।

'না।' অসীমা স্বচ্ছন্দে বললে। জিগগেস করলে : 'আপনার?'

'এখনো সময় হয়নি।' জমিদার-গৃহিণী হাসলেন।

'বিয়ে হয়েছে কদ্দিন?'

'এই পাঁচ বছর।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অসীমা বললে, 'এখনো তবে সময় যায়নি।'

'সময় যায় নি নয়, সময় হয় নি।' জমিদার-গৃহিণী কি-রকম যেন একটু গূঢ় ইসারা করলেন : 'আপনি বুঝি মিসেস্ স্যাঙ্গারের নাম শোনেন নি কখনো? ফোঁপরা হ'লে নারকোলে কি বেশি শাঁস থাকে? দাঁড়ান না, ক'টা দিন একটু হিল্লি-দিল্লি করে নি।' জমিদার-গৃহিণী দেবুর টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন : 'তুমি কি পড়, দেবব্রত?'

দেবু প্রায় গর্বিত বিজয়ীর মতো বললে, 'এই ফার্স্ট-বুক সবে শেষ করেছি

জমিদার-গৃহিণী হয়তো কিছুটা থমকে গেলেন, কিন্তু অসীমা ব্যা বেশ বিশদ করে দিলো : 'ছেলেবেলা থেকেই ওর অসুখ, একরকম বিছানাতে শোয়া। এই বছর আড়াই ধরে ও খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পেরেছে। পড়াশুনো তাই মোটেই এগুতে পারে নি।'

'কিন্তু কী হবে গুচ্ছের পড়াশুনো করে'? কী সুন্দর ওর চোখ। দুষ্টুমিতে টলটল করছে। বড়ো হলে প্রকাণ্ড একটা লেডি-কিলার হ'বে দেখছি। বুঝলেন পড়ুয়া ছেলের চাইতে দেশে আজকাল বেশি বয়াটে ছেলের দরকার।' জমিদার-গৃহিণী এগিয়ে গেলেন : 'আর ঐ বুঝি আপনাদের বেড-রুম?'

কক্ষান্তরে চলে এসে বললেন, 'বাঃ, একটা গ্রামাফোন আছে দেখছি। এনায়েৎ খাঁর সেতার আছে? মাণিকমালার নাচ?' জমিদার-গৃহিণী বাক্স খুলে রেকর্ডের লেবেল দেখতে লাগলেন।

সেই ফাঁকে হাত-বাক্স খুলে অসীমা পয়সা বার করতে বসলো।

জমিদার-গৃহিণী চালাক মেয়ে, তা টের পেলেন। বললেন, 'আপনাকে সাবধান করে দি, গ্রামের এই পচা খাবার কিনে আনবেন না। টাইফয়েড আর স্মল-পক্সে গিজগিজ করছে।'

ততোধিক চালাক মেয়ে অসীমা। হাসিমুখে বললে, 'কিন্তু যদি বলি, আপনাকে এক পেয়ালা চা করে দেবো ততটুকু চিনিও আজ ঘরে নেই, তা হলে আপনি কী বলবেন?'

বলে পয়সা নিয়ে পাশের ঘরে সে দেবুর কাছে এসে উপস্থিত হ'লো। গলা খাটো করে বললে, 'একদৌড়ে বসন্তর দোকান থেকে টাটকা দেখে কিছু খাবার নিয়ে আয় চট করে।'

দেবু গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'আমি এখন পড়ছি।'

অসীমা বললে, 'কতক্ষণ আর লাগবে। জমিদারের বৌ এসেছে, একটু মিষ্টি মুখ করে না দিলে কি ভালো দেখায়?'

ততোধিক গম্ভীর হ'য়ে দেবু বললে, 'চাকরকে গিয়ে বলো।'

অসীমা একটা ঢোঁক গিললো। বললে, 'দুপুরবেলা সে থাকে নাকি বাড়িতে? কোথায় আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেছে।'

'না থাকে তো চাকরটাকে ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত।' দেবু বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়লো : 'পড়ার সময় আমাকে এখন বিরক্ত করো না।'

অসীমা এগিয়ে এসে দেবুর চুলে-পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'বাড়িতে চাকর না থাকলে বুঝি ঘরের ছেলে বাজার করে আনে না? যারা গরিব, যাদের চাকর রাখবার মুরোদ নেই, তাদের ছেলেরাই তো বাজার করে।'

দেবু অসীমার মুখের দিকে মুগ্ধের মতো চাইলো, এক মুহূর্ত। হাত পেতে বললে, 'দাও।'

এবং মুঠোর মধ্যে পয়সা পেয়েই সে বসন্তর দোকানের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলো। জুতো দূরের কথা, গেঞ্জিটা পর্যন্ত সে গায়ে দিলো না।

তারপর এলো গ্রীষ্মের ছুটি।

চাপরাসি ডাক দিয়ে গেছে, হঠাৎ সুরেশ্বর উৎসাহিত হয়ে বললে, 'সত্যর চিঠি এসেছে, ছুটিতে আসছে এখানে বেড়াতে।'

অসীমা কি কাজ করছিলো, অন্যমনস্কের মতো বললে, 'কেন, এ-বছর মামাবাড়ি গেলো না?'

কথার সুরটা সুরেশ্বরের পছন্দ হ'লো না। বললে, 'বছর তিনেক বাদে বাপকে হয়তো হঠাৎ মনে পড়েছে।'

'বাপের ভাগ্য ভালো। কিন্তু গ্রামে এ-সময়টায় বসন্ত দেখা দিয়েছে, এখন কি তার আসা উচিত হবে?'

'আর উচিত!' সুরেশ্বর স্ত্রীর দিকে করুণ করে তাকালো : 'কালই সে আসছে বিকেলে।'

'কালই?'

'হ্যাঁ, কলেজ তো ছুটি হয়েছে হপ্তাখানেক আগে। ডিক্সন লেনে ওর মাসি এসেছে চিকিৎসা করাতে, সেখানে দিন কয়েক থেকে কাল রওনা হয়েছে।'

অসীমা অকস্মাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। আর সে-স্তব্ধতা সমস্ত সংসারে একটা যেন কি বিষণ্ণ ছায়া ফেললে।

বিকেলবেলা সাজগোজ করে স্টেশনে যাবার প্রাক্কালে সুরেশ্বর বললে, 'ছোঁড়াটাকে আমার সঙ্গে দাও।'

অসীমা কঠিন কন্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : 'কেন, ইস্টিশানে কুলি নেই?'

'বা, আমি সেই জন্যে বলছি নাকি? এতটা রাস্তা গরুর গাড়িতে একা-একা যাবো, তাই ভাবছিলাম গল্প করবার জন্যে সঙ্গে একটা লোক থাকলে মন্দ হ'তো না।'

'কেন, গরুর গাড়ি করে যাবে কেন? তোমার সাইকেল নেই?'

'তা, ও না গেলে সাইকেলেই যেতে হবে বৈ কি।' সুরেশ্বর আমতা-আমতা করে বললে। অসীমার কুটিল চোখের সামনে বেশিক্ষণ সে দাঁড়াতে পারলে না।

সন্ধে হ'তে-না-হ'তেই বাড়ির দোর-গোড়ায় এসে একটা গাড়ি দাঁড়ালো। কে এলো দেখবার জন্যে দেবু একটা লন্ঠন নিয়ে এগিয়ে গেলো। দেখলো সুরেশ্বরের সঙ্গে আরেকটি কে ভদ্রলোক গাড়ির থেকে নামছে। চমৎকার তার সাজগোজ, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, আলো পড়ে পায়ের কালো চামড়ার জুতোটা কেমন চকচক করছে, চুলে এমন ছাঁট দেওয়া যে এখানকার পরামাণিকরা বি-এ পাশ করে এলেও তেমন কাটতে পারবে না।

দেবু একদৌড়ে অসীমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কে এসেছে মা।'

অসীমা তার কৌতুকোজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে তাকালো। বললে, 'তোমার দাদা!'

'দাদা?' দেবু যেন অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো : 'সে কি কথা? তুমি না বলতে আমিই তোমার বড়ো ছেলে! আমার তবে দাদা এলো কোত্থেকে? কেমনতরো দাদা?'

নিস্পৃহ, উদাসীনের মতো অসীমা বললে, 'তোমার আরেক মা ছিলেন, তিনি নেই, মারা গেছেন, তোমার দাদা সত্যব্রত তাঁরই ছেলে।'

দেবু যেন খানিকটা আরাম পেলো। বললে, 'তবে তোমার ছেলে নয়।'

ততক্ষণ অসীমা দেবুকে নিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে সত্যব্রত তখন জিনিস-পত্র নামাবার জন্যে চারপাশে সাহায্য খুঁজছে। সুরেশ্বরকে বললে, 'বাড়িতে চাকর নেই?'

সুরেশ্বর দেবুকে চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রুখে উঠলো : 'কি অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস? মালগুলো নামা! মাইনে নেবার বেলায় তো দেখি খুব ওস্তাদ, এখন কাজ করবার বেলায়ই আর হাত ওঠে না, না? ওপরে নিয়ে যা সব বাক্স-পত্তর।'

এমন একটি সুবেশ, সুদর্শন ছেলে বাড়ির চাকর হ'তে পারে কথাটা সত্যব্রত চট করে বিশ্বাস করতে পারলো না।

দেবু হয়তো এগিয়ে যাচ্ছিলো, কেননা তার বিশ্বাস হয়েছে বাড়ির কাজে ঘরের ছেলেদেরো কখনো-কখনো হাত লাগাতে হয়, তাতে অপমান নেই, কিন্তু অসীমা তার হাত চেপে ধরে বাধা দিয়ে ঠাকুরকে বললে, 'জিনিসগুলি নামাও ঝটপট, গাড়োয়ানটাও বা দাঁড়িয়ে আছে কী করতে?'

সত্যব্রত এসে অসীমাকে প্রণাম করলো।

অসীমা দেবুকে বললে, 'দাদাকে প্রণাম করো, দেবু।'

খানিকটা কুণ্ঠিত, খানিকটা কৌতূহলী হ'য়ে দেবু প্রণাম করলো সত্যব্রতকে। তার প্রণাম ও প্রণামের ধরন দেখে সত্যব্রতও কম কুণ্ঠিত, কম কৌতূহলী হ'লো না।

ততোক্ষণে সত্যব্রত হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে সুরেশ্বরের শোবার ঘরে খাটের উপর বসে বাপের সঙ্গে গল্প করছে, কোলকাতার কথা, তার কলেজের কথা, বি-এ শেষ করে' কোন লাইনে যাবে তারি জল্পনা। রাজধানী ছেড়ে তারপর এই গ্রামে চলো এই সংসারে, একেবারে এই শোবার ঘরটিতে। বড়ো-বড়ো সমস্যা থেকে একেবারে খুঁটিনাটি বিষয়, দুধের দাম, ডিমের হালি, ঠাকুর-চাকরের মাইনে।

কিন্তু সম্প্রতি সিগরেট খাবার জন্যে তার আল-জিভ পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। তাই সমস্ত শরীরে শিথিল একটা ভঙ্গি এনে সে বললে, 'কী বিচ্ছিরি ট্রেন আর কী ন্যুইসেন্স গরুর গাড়ি, একেবারে ক্লান্ত, দুর্বল করে ফেলেছে! গা হাত পা একটু টান করতে পারলে মন্দ হত না।

'হ্যাঁ, পাশের ঘরে বিছানায় গিয়ে একটু শো না', সুরেশ্বর বললে, 'রান্নার হয়তো দেরি আছে।' বলে সে নিজেই তার বিছানায় প্রসারিত হলো।

নীচে অসীমা তখন রান্নার তদারকে ব্যস্ত, হঠাৎ একটা কান্না আর কোলাহল তার কানে আগুন ঢেলে দিলো। কান্নাটা দেবুর আর কোলাহলটা সত্যব্রতের।

আঁচলে ভিজে হাত মুছতে-মুছতে অসীমা ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে এলো উপরে। এমন একটা দৃশ্য দেখবে বলেই সে যেন অন্তরে-অন্তরে শিহরিত হচ্ছিলো এতক্ষণ।

দেখলো, দেবু তক্তপোসের উপর পাতা বিছানাটা কামড়ে পড়ে আছে, আর সত্যব্রত তাকে টেনে তোলবার জন্যে আসুরিক আস্ফালন করছে। যেমন একবার ঠেলে ফেলে দিচ্ছে বাইরে, অমনি আবার দেবু বিছানায় গিয়ে মাটি নিচ্ছে। চড় চাপড় ঘুসি-লাথি কিছুরই কমতি নেই, সরাসরি জোরে না পারলেও ক্রোধে দেবু এক ইঞ্চি পিছনে নয়, কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলছে সে বিছানার চাদর, তুলো বার করে ফেলছে বালিসের।

একেবারে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। অসীমা দেখলো, দূরে দাঁড়িয়ে এ যুদ্ধের প্রেরণা দিচ্ছে সুরেশ্বর।

অসীমাকে দেখেই যন্ত্রণাটা বাক্যে রূপান্তরিত হলো।

সত্যব্রত বললে, 'দেখলে মা, আমার বিছানাটার কী দুর্দশা করলে!'

'তোমার বিছানা!' দেবু দুঃখে, রাগে, অসহায় অপমানে তীব্র কণ্ঠে বললে, 'আজ তিন বচ্ছরেরো উপর সমানে আমি শুচ্ছি, আর একদিনে সেটা তোমার বিছানা হ'য়ে গেলো?'

'আলবৎ আমার বিছানা।' সত্যব্রত হুঙ্কার দিয়ে উঠলো : 'এই বাড়ি ঘর জিনিস-পত্র সমস্ত আমার। তুই কে?'

'তুমি কে?' দেবু পাল্‌টা নিক্ষেপ করলে।

'আমি এ বাড়ির ছেলে। আমার এই বাবা-মা, আমার এই ঘর বাড়ি, সমস্ত আমার।'

'তুমি তো আরেক মায়ের ছেলে, যে মরে কবে ভূত হয়ে গেছে। এই মা তো আমার। আমার একলার।' দেবু অসীমার দিকে করুণ করে' তাকালো : 'তাই না, মা?'

এতোটা অসীমার সহ্য হ'লো না, সত্যব্রতের সামনে, সুরেশ্বরের সামনে, সুরেশ্বর ও সত্যব্রতের সামনে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দেবুর কানটা সে সজোরে মুচড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ওঠ্ ওঠ্ এই বিছানা থেকে। চাকর, তুই আমার ছেলে হ'তে যাবি কোন লজ্জায় রে, মুখপোড়া? এই তো আমার ছেলে।' সত্যব্রতের দিকে সে আঙুল দেখালো, 'সত্যিকারের ছেলে। তোকে আমি পেটে ধরেছি, হতভাগা? যা, নিচে শুগে যা ঠাকুরের ঘরে। যতোই নাই দেওয়া যায় ততোই কুকুর মাথায় এসে ওঠে, না? যা এখান থেকে।' বলে অসীমা তাকে ধাক্কা দিয়ে দরজার দিকে ঠেলে দিলো।

পরে নতুন চাদর বার করে বালিস বদ্‌লে স্বহস্তে পরিপাটি করে বিছানা করলো। সত্যব্রতকে স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'শোও, বিশ্রাম করো। রান্নার আর বেশি দেরি নেই।'

নিচে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে দেখলো দেবু নেই। কুয়োতলা দূরে পুকুরের ঘাটলা, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। অনেক রাত পর্যন্ত তার ভাতের থালা নিয়ে অসীমা বসে রইলো, ভাবলো খিদে পেলেই সে সেদিনের মতো ফিরে আসবে। কিন্তু এলো না। ভাবলো, এ ক' বছরের মাইনের—দু' শো টাকারো উপর—একটি আধলাও সে নেয়নি; ভাবলো, নিশ্চয়ই কাল সকালে সে আসবে, অন্তত টাকা ক'টা চেয়ে নিতে, মাইনে সম্বন্ধে চেতনা যার ভয়ঙ্কর জাগ্রত। কিন্তু পরদিনের সকাল গত রাত্রির সন্ধ্যার মতোই অন্ধকার।

১২। তসবির

কাঁচের চুড়ি আরো ক'গাছা আনতে হবে। এবার আরো শক্ত দেখে, মোটা দেখে।

'ক্যান, কি অইলে?' তেতো মুখে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল কাঙ্গালী খাঁ।

'বড় ফুকা চুড়ি বাজান।' অপরাধীর মত মুখ করল শরিফন: 'বাড়ি মারতেই পট-পট কইরা ভাইঙ্গ্যা গেলে। ডাইব্যা বয় না হাতের মদ্যে।'

পাশেই বসেছিল মোক্তারসাহেবের বউ। তাকে শরিফন ধর্ম-মা বলে। ঘোমটার ফাঁক থেকে সে বললে, 'চুড়ির দোষ কী। তুই তো আস্তে আস্তে মারতে আছ। হাত তুইল্যা ইটের উপর মারতে আছ। ইট তুইল্যা হাতের উপর মারলে চুড়ি-ভাঙা ঠিক গিয়া ডাবত হাতের মদ্যে।'

'তয় আপনেই মারেন।' শরিফন কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে।

'থাউক, মোর ধারে আয়।' কাঙ্গালী খাঁ শরিফনের ডান হাতটা টেনে নিলে নিজের হাতের মুঠোয়। ভাঙা ধারালো চুড়ির টুকরো হাতের উপর বসিয়ে শক্ত, ভারি ইঁট তুলে মারলে এক জুৎসই ঘা। কাঁচের চুড়ি বসে গেল হাতের মধ্যে। মাংস খেয়ে। দরদর করে নাজুক মেয়ের রক্ত ঝরতে লাগল।

একটা বেশ দাগজখমের মত দেখাচ্ছে। বেশ সরল চেহারার। ডান হাতের কব্জির উপরে। যেন লাঠির বাড়ি ঠেকাতে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে চুড়ি।

ফুটে-ফুটে কেঁদে উঠল শরিফন। এ-কান্নাটাও বেশ সত্যি সত্যি দেখতে।

'যাই ডাক্তার লইয়া আই।' কাঁধে গামছা ফেলে বেরিয়ে গেল কাঙ্গালী খাঁ।

দেশগাঁয়ে ডাক্তার কই? ডাক্তার বলতে শীলমশায়। শাস্তরি মতে কবিরাজি করে। খালি গায়ের উপরে গোছ-করা চাদর ঝোলানো।

'কাটলে ক্যামনে?'

আর বোলো না। জামাইটা কাঠগোঁয়ার, কেবল মারধোর করে, জ্বালাপোড়া দেয়। মারতে-মারতে ফেলে দিয়ে গেল বাড়ির দরজায়। সারা পথ হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে এসেছে। বাড়িতে কাঁচাঘাটেরও পুকুর নেই, নদী থেকে জল আনা নিয়ে অবর্গ হয়েছে। তাইতে তেড়ে উঠে মেরেছে লাঠির ঘা। হাত দিয়ে তা ঠেকাতে গিয়ে বাড়ি পড়েছে হাতের চুড়ির উপর। ভাঙা চুড়ির টুকরো বসে গিয়েছে মাংসের মধ্যে।

কিন্তু শাস্তরি মতে ঘায়ের ওষুধ আছে কই শীলমশায়ের? রস-কষ টোটকা-টাটকি দিয়ে দাও। ওষুধ তো বিশেষ দরকার নেই, দরকার তাকে সাক্ষী দিতে হবে। ধর্মবাপ মোক্তারসাহেব আর তার মুহুরি। সবার উপরে এই চাপান সাক্ষী—শাস্তরি কবিরাজ। সব চেয়ে যে উচিত সাক্ষী। এর পর আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই জবেদালির।

'কিসের সাক্ষী?'

বিয়ে ছাড়ানের মোকদ্দমা করবে শরিফন। চোটজখমের ওজুহাতে। হামেসাই মারপিট করে। কিন্তু এ পর্যন্ত দেখাদৃষ্টে দাগ পড়েনি গায়ে। চড়চাবাড়ির উপর দিয়ে গেছে। আজই প্রথম খুন ঝরল। দাগ পড়ল চামের উপর।

তোমার আর কি। সাক্ষীর তহরি পাবে। খাইখরচ আর বারবরদারি।

কিন্তু উপায় কী?

নতুন জরিপ এসেছে দেশে। খতিয়ানের কারসাজিতে কাঙ্গালী খাঁর জায়-জিরাত আরেক প্রজার জমাভুক্ত হয়ে গিয়েছে। হয়তো বা আমিন-কারকুনের কারিগরি। জরিপ-হাকিমের কাছে তিন-ধারার ফির-যাচাই করেছিল কাঙ্গালী খাঁ। সুবিধে হয়নি। যার নামে খতিয়ান হয়েছে স্বত্বসাব্যস্ত করে জবর দখল করে নিয়েছে আদালত করে। তর্ক ছিল বিচার ছিল, কে শোনে। যার খতিয়ান তারই ক্ষেত-খেতি। যার নামে খতিয়ান হল না সেই ছন্নমতি।

হাওলাদার বাড়ির এক কোণে অনুমতিসূত্রে হোগলা-তালপাতার ঘর বেঁধে কোনোমতে আছে কাঙ্গালী খাঁ। যাকে বলে ওকরাইত। ইচ্ছাধীন প্রজা। মুখের কথাটি বললেই সরে পড়তে হবে। ঘনবর্ষার দিনেই হোক বা খরা-শুখার দিনেই হোক। টালবাহানা চলবে না। জমি-জায়গা নেই, ঘরদরজা নেই—এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে হবে এতিম-আতুরের মত।

না, কাঙ্গালী খাঁকে জমি পত্তন নিতে হবে। বাঁধতে হবে বাড়ি-ঘর। তার তাই টাকার দরকার।

বেটা-পুত্তুর নেই। ভাই-বন্ধু নেই, দোস্ত-দায়াদ নেই। সরকারী লোন পায় না। নেই কেউ সর্দার-মুরুব্বি। থাকবার মধ্যে আছে এক মেয়ে। ডাকের সুন্দরী। গায়ের রঙটি রাঙা। মুখটি যেন ছবিখানি।

রাঙাই শুধু দেখতে নয়, গড়ন-পিটনও বেশ টানটোন। কালো চোখে যেন জিলকি খেলে। এক পিঠ চুল, যেন শাওনের রাতের ভুর-করা মেঘ। মুখের হাসিটি দেখ, যেন জোনাক রাতে ফিনিক ফুটেছে। কবুতরের পায়ের মত লাল তার পায়ের পাতা। টিপলে যেন ফেটে পড়বে রক্ত। সবাই বলে, যেন হলদে পাখির ছা। বিয়ের বাজারে দর-দাম তার অনেক উঁচুতে।

তার প্রথম বিয়ে হয় আকন-বংশের শাহাদাতের সঙ্গে। সে তখন বারো-তেরো, তখনো বালেগ হয়নি। শাহাদাতেরও ছোকরা বয়স। গোঁফের রেখা পড়েছে কি পড়েনি। বেশ ফিটফাট ছিমছাম চেহারা।

সেই প্রথম বিয়েটাই সত্যিকারের বিয়ে-বিয়ে মনে হয়েছিল শরিফনের। পাঁচ বিবি সাজিয়েছিল তাকে পাঁচখানা পিঁড়ি পেতে। পার্শি শাড়ি পেয়েছিল, পেয়েছিল তিন টেক্কার চুড়ি, বিস্কুট-হার। মখমলের জুতো। পাল্কি চড়ে এসেছিল শাহাদাত, সঙ্গে বন্দুকধারী রক্ষী দুজন। বাড়ি পৌঁছুতেই চারটে ফাঁকা আওয়াজ হয়েছিল, কেঁপে উঠেছিল বুকের মধ্যে। জানলা খুলে দিয়ে মিতিনী বলেছিল, 'চেয়ে দ্যাখ।' সরমে ঢুল লাগলেও চোখ চেয়ে দেখেছিল

শরিফন। পরনে চোস্ত্ পাজামা, গায়ে চোগা-চাপকান, মাথায় আমামা—দেখাচ্ছে রাজপুত্তুরের মত।

শোয়া-বসা হয়নি সে-সময়। কথা ছিল, বালেগ হলে ছেলের বাড়ি মেয়ে তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু বালেগ যেই হল, বাপের কথায় শরিফন বিয়ে তুড়লে। মোয়াজ্জেল মহরানা সাব্যস্ত হয়েছিল সাত শো টাকা। তার মধ্যে কাঙ্গালী খাঁ পেয়েছে মোটে সাড়ে তিন শো। শাহাদাতরা বলেছিল, ঠেকা বুঝে আস্তে-আস্তে দেব না-হয় কিস্তি করে। কাঙ্গালী বললে, 'আমার জনমভোরই ঠেকা। টাকা আগে না দিলে মেয়ে দেব না।'

শাহাদাতরা তালাসী বের করলে। পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ এল। শরিফনের বুকের ভিতরটা কেঁপে-কেঁপে উঠল, এতদিনে বুঝি সোয়ামির সোয়াদ পাবে। কিন্তু বাজান আবার তাকে ফেরৎ নিয়ে এল কোর্ট থেকে। মোক্তারসাহেব বুঝিয়ে দিলেন হাকিমকে, তালাসী তদন্ত করে মেয়ে বের করে নিয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে যে ওঠা-বসা হয়নি সেই প্রমাণটাই ভেস্তা করে দেয়। এদিকে বিয়ে খারিজ করে দিয়েছে মেয়ে, আদালতে রুজু করেছে মোকদ্দমা। এখন এমন শারীরিক প্রমাণ নষ্ট করানো যায় না।

মামলায় ডিক্রি পেল শরিফন। বিয়ে ভেঙে গেল শাহাদাতের সঙ্গে। বিয়ের রাতের বন্দুকের সেই ফাঁকা আওয়াজটাই বিঁধে রইল বুকের মধ্যে।

ডিক্রি পেল বটে, কিন্তু কাঙ্গালী খাঁ মামলার তদবিরে নাকাল হয়ে গেল। দুই-তিন কোর্ট দোড়াদৌড়ি করে জিব পড়ল বেরিয়ে। খরচে-তখরচে সব টাকা ছারখার হয়ে গেল।

শুধু কি তাই? আকন গুষ্টি তেজীয়ান গুষ্টি, তাদের মানসম্মানের হানি ঘটিয়েছে কাঙ্গালী খাঁ। তারা তাকে রেয়াৎ করবে না। মেয়ে-ডাক্তারি করতে গিয়েছিল তারা শরিফনকে, ঠকে গিয়েছে। তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। তারাও এর শোধ তুলবে।

নানান কছমের মামলা বসাল কাঙ্গালীর বিরুদ্ধে। কাঙ্গালীকে তারা ভিটে-ছাড়া করলে।

নাচার-নাজেহাল হয়েও কাঙ্গালী খাঁর ভয় নেই। তার শরিফন আছে। তার সকল বিত্ত-বেসাতের চেয়ে বেশি।

মধ্যম অবস্থার চাষা এই জবেদালি। সেও দেনমোহর দিয়েছে পাঁচশো টাকা। আর সেই টাকা কাঙ্গালী খাঁর হাতে ফুরিয়ে আসতেই কাঙ্গালী খাঁর মনে হতে লাগল, জবেদালি শরিফনের যুগ্যি নয়।

জবেদালি থেকে মাঝে-মধ্যে টাকা এনেছে কাঙ্গালী খাঁ। কাঙ্গালী খাঁ ভেবেছে সুদ নিচ্ছে মেয়ের বাবদ, জবেদালি ভেবেছে দস্তকর্জ। এই নিয়ে ঝগড়া-বচসা হয়েছে দু জনের মধ্যে। খোস আপোস হয়নি। লুকিয়ে লুকিয়ে শরিফন বাপকে ধান-চাল পাঠিয়েছে, বাড়ির ফল-পাকড় পাঠিয়েছে, কিন্তু

টাকার অভাবী যে, এ-সবে তার পেট ভরে না। কিন্তু নগদ টাকা কোথায় পাবে শরিফন? জবেদালির কাছে বলতে গিয়েছিল একদিন গলা মোটা করে, ঠেঙ্গালাঠি খেয়েছে।

এবার মেয়েকে নাইয়র নিতে এসেছিল কাঙ্গালী খাঁ। জবেদালি ছেড়ে দেবেনা কিছুতেই। সে কওয়াকওয়ি শুনেছে বিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে শরিফনকে নিকে দেবে আরেক জায়গায়। সে তাই বলেছে, আমার হাবেলির মধ্যে ঢুকবে তো ল্যাজা খেয়ে মরবে।

এত বড় কথা! গায়ের উপর দিয়ে আঁচল আঁট করে শরিফন নিজেই বেরিয়ে এল। ঘুম-জাগন্ত মেয়েটা ছিল বুকের উপর, এক টানে তাকে ছিনিয়ে নিল জবেদালি।

'মাইয়া লইয়া যাও কই?'

'মোর মাইয়া। মোর প্যাডে অইছে।'

'হেইলেই তর মাইয়া অইলে? কোন রেওয়াজে?'

কেড়ে রাখল জোর করে। রাখুক। রেখে দিক। শাড়ি-জেওর, জায়-জিনিস, সোয়ামি-সন্তান সব আবার হবে, কিন্তু বাপ বলতে ঐ একজন। বাপকে সে ছাড়তে পারবে না। কাঙ্গালী খাঁর সঙ্গে চলে এল শরিফন।

শরিফন যদি পুরুষপোলা হত, বাপের দুঃখ-কষ্ট আসান করতে পারত। সে ছাড়া আর কেউ নেই যার থেকে সে টাকার জোটপাট করতে পারে। অবান্ধব সংসারে শরিফনই তার একমাত্র বল-ভরসা, তার জোর-জোশ। সে ছাড়া উপায়-উপার্জনের পথ কোথায় বাপের। সে ছাড়া আর কে বাপকে জমি এনে দেবে, গড়ে দেবে ঘর-দুয়ার। বাপ তো তার শত্রু নয়। সে তো আর পরঘরী হয়ে থাকবেনা!

তবু ভাঙা চুড়ি যেন হাতের মাসের মধ্যে বসতে চায় না বিঁধে-বিঁধে। ভাবে, জবেদালির কী দোষ! মেয়েটার কথা মনে পড়ে। তার জুলজুলে চাউনি! গোল-গোল মুঠি!

মিছা মায়া! আগে সে মেয়ে, পরে সে মা। আগে বাপকে পেয়েছে, পরে পেয়েছে সন্তান। তাই আগে সে বাপের দিকে চাইবে। মা হওয়া তার ফুরিয়ে যায়নি অদৃষ্টে। শরীরের জমি তার এখনো মিঠেন আছে। নইলে এমন লোক এসে যাচনদার হয়!

যে-সে নয়, মানী গৃহস্থ। গাঁয়ের মধ্যে ভদ্র বলে সবাই। নামের শেষে মিয়া বলে। ধান-পান আছে বিস্তর। হাট মেলে গাঙের কোলে। সেই হাটের মালিকিয়ৎ তার। সরিক-দায়িক নেই। হাটের টোল-মাশুল ষোল আনা আদায় করে। এক কথায়, সবাই বলে, পাঁচ-হাজারী অবস্থা।

কাঙ্গালীকে ছ শো টাকা দেবে আমজাদ।

আর এক সংসার আছে আমজাদের। তা থাকুক, শরিফন হবে তার নয়া বিবি, সুয়া রানী। কত মান বাড়বে তার। মিয়াদের ঘরে গিয়ে সে পর্দার

বিবি হবে। কথা আছে, ঘর-সংসার করবে আগের পরিবার, সে করবে আমোদ-আহ্লাদ। হয়ে থাকবে তোয়াজ-তোসামোদের জিনিস!

টাকা দিয়ে কাঙ্গালী খাঁ কায়েমী খাজনার বন্দোবস্ত নেবে। নিকে করবে। নিকে না করলে চলে কি করে বুড়ো বয়সে? শরিফন তো আর সারাজীবন বাপের তত্ত্বতালাপী করতে পারবে না। তাকে একসময় তো সোয়ামীর ঘর করতেই হবে। কাঙ্গালী খাঁর একজন বিবি দরকার। যে ছিল, শরিফনের সতাই-মা, গোসা করে তালাক নিয়ে চলে গিয়েছে বাপের বাড়ি। পেটের অভাবে থাকতে পারবে না সে এমন চামদড়ি হয়ে। বাপের জন্যে একটি ছয়ছোট নরম-তরম মেয়ে দরকার। কটু শুনলেও যে শক্ত কইবে না। কিন্তু, বুড়ো হয়েছে, টাকা না ফেললে মেয়ে মিলবে কোথায়? আর, শরিফন ছাড়া টাকা আনবে কে?

মোক্তারসাহেব এল। কথার কর্তা সে-ই, সে-ই রায়বারি করছে। বিয়ার পণে তার চার আনা অংশ।

আঞ্জাম-সরঞ্জাম দেখে সে তিক্ত হয়ে উঠল। বললে, 'এ কিছুই অয় নাই। ছ্যাঁকা দিতে লাকপে। শাস্তরি কবিরাজে চলবে না, পাশ-করা ডাক্তার আনন দরকার।'

'মাইয়া রাজি অইবে না। চিল্লাইয়া উঠবে।' বললে মোক্তারের বউ।

বাপের জন্যে এটুকু কষ্ট সহ্য না করলে সে মেয়ে কী! বললে মোক্তারসাহেব। কথাটা কাঙ্গালী খাঁর মনে লাগল। ধর্মের কথা বলেছে মোক্তারসাহেব। ঠিক হল, শরিফন যখন ঘুমুবে। তখন লোহা গরম করে এনে খোলা পিঠে ছেঁকা দেবে কাঙ্গালী। বেশি ভয় নেই, ছোট একটা ফোস্কা হলেই চলে যাবে।

লোহার একটা শিক গরম করে আনল ধর্ম-মা। পিঠ উদলা করে বাঁ কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে শরিফন।

চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কের মধ্যে। 'এ কি, গরম লোয়ার ছ্যাক দিলা? তুমি?'

'আমি কই? তোর সোয়ামী। সাক্ষীর কাঠগড়ায় উইঠ্যা কিন্তু বুল কইছ না।' কাঙ্গালী খাঁ নির্বিকার মুখে বললে।

দেখতে-দেখতে ফোস্কা পড়ে গেল, একটা তিন-দানা-ওয়ালা চীনেবাদামের মত। যন্ত্রণাটা একটু কম পড়তে শরিফন হাসল। বললে, 'পোড়নের কী দরকার আছিল? হাতের ঘায়ে অইত না?'

'না। ঐটা দেইখ্যা হয়ত কইত, নিজে-নিজে ক্যরছে। পিঠের ঘা তো আর নিজে-নিজে করন যায় না।'

ডাক্তার এল বন্দর থেকে। না-পাশ-করা কম্পাউণ্ডারের বদলে পড়ে পাশ-করা ডাক্তার। বললে, 'অইলে ক্যামনে?'

'সোয়ামি দাগনী দিয়া ছ্যাকা দিছে। বাড়ির তিয়া খেদাইয়া দিছে। একটা বালো দেইখ্যা সার্টিফিকট লেইখ্যা দেন।'

মামলার তারিখ পড়ল। জবেদালি বললে, স্রেফ সাজানো মোকদ্দমা।

ফেরবী, যোগসাজসিক। বাপটা কুচুটে, মেয়ে তার হাতের খেলনা। মেয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আর কোথাও বিয়ে দেবার মতলব। শরিফনের সঙ্গে নিরিবিলি আমাকে দেখা করতে দাও, তার কোলে মেয়ে দিয়ে তার সঙ্গে একবার কথা কই, দেখি কেমন সে বিয়ে ভাঙে।

শরিফন ঘাড় বেঁকিয়ে রইল। বাজান তাকে বললে ঘাড় বেঁকিয়ে থাকতে।

কিছুতেই কিছু হল না। মামলা পেল শরিফন। বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

সব যেন কেমন তাড়াতাড়ি ঘটে গেল, তাই না? বিয়ে-বিচ্ছেদ চেয়েছিল, ঠিক বিয়ে-বিচ্ছেদই হয়ে গেল। অন্য কিছুই হল না। একবার ডিসমিস হয়-হয় হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত হল না। এরকম মামলা বুঝি ডিসমিস হয়না কোনো কালে।

জবেদালি কী অপরাধ করেছিল! কেন তার মুখ কালো করে দিয়ে এল! কেন মেয়েটাকে আরেকবার কোলে নিল না! নিজের কী সে সুবিধে করল বিয়ে ভেঙে দিয়ে? নিজের কথা কে ভাবছে? শুধু তার বাপের একটা সংসার-সমাজ হোক। কিছু জমি পাক কায়েমী জমায়! বাড়ি বাঁধুক একখানা।

'কি। মাইয়া দ্যাখপেন না?' মোক্তারসাহেব জিগগেস করলে আমজাদকে।

'না, মাইয়া দেখুম কি? তার রূপ-গুণ কি আর অপরকাশ?'

আমজাদ তিন শো টাকা আগাম দিলে। বললে, বউ তুলে যখন নিয়ে যাবে দিয়ে দেবে বাকিটা। না, কিস্তি করবে না।

কেমন বিয়ে-বিয়ে মনে হচ্ছে না শরিফনের। নিজেকে সুন্দরী লাগছে না। জোয়ানকি বয়সেও যেন যৌবনের জ্বাল নেই। কেমন রুঠা-শুঠা। যেন বেপার-বেসাতের জিনিস।

তবু বেশ ভাতে-কাপড়েই ছিল শরিফন। ভাল অবস্থার লোক, গাঁয়ে সবাই মানে-গোনে, ছিল একরকম সুখে-শান্তিতে। কিন্তু কাঙ্গালী খাঁ এসে একদিন টাকা চাইলে।

আমজাদ বললে, 'এহন না। এহন হাত খালি। খন্দের পর আইয়েন।'

মাঘের শেষে গেল আবার কাঙ্গালী।

আমজাদ বললে, 'কিসের টাহা? মাইয়া যখন বশ মাইন্যা আছে তখন হের মদ্যে আর কোন দেন-পাওন নাই। মিট অইয়া গেছে ষোল আনা।'

নাইয়র এসেছিল শরিফন। মোক্তারসাহেব বলল, মেয়ে আটকাও।

কাঙ্গালী খাঁ মেয়ে আটকাল।

বাপের সঙ্গে সায় দিলে শরিফন। বললে, 'যামুনা আমি অমন সোয়ামির বাড়তে। ওয়াদা কইর‍্যা কথামত যে টাহা দ্যায়না সে তো হারামি।'

মোক্তারসাহেব বলল, আবার তালাকের আর্জি কর। এবার এনে দেব আরো জমকালো পাত্র। আদালতের পেস্কার।

এবার মারধোরের ধার দিয়ে না গেলেও চলবে। এবার অন্যরকম সুবিধে আছে। শুধু শরীরের অত্যাচারেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না, মনের ক্লেশ-কষ্টেও

হয়। দুই বউকে সমান চোখে দেখে না আমজাদ, বিয়ার বউকে নিকার বউয়ের চেয়ে বেশি নেকনজর করে, এ কি কম কষ্ট, এই দাবিতেই মামলা ডিক্রি হয়ে যাবে।

'না, না, ছ্যাকন-পোড়ন দিতেই বা দোষ কি?' বললে কাঙ্গালী খাঁ।

'না, বারে-বারে এক পদ বালো না।' মোক্তারসাহেব মাথা নাড়ল।

কিন্তু বিয়ার বিবি হঠাৎ মারা গেল না বলে কয়ে। তাতে কী? খোরাক-পোষাক দিচ্ছেনা, অশ্রদ্ধা করে ফেলে রেখেছে বাপের বাড়িতে এই বনিয়াদেই বিয়ে রদ হয়ে যাবে।

আমজাদ বাড়ির ধারে-ধারে ঘুরঘুর করে। বলে, 'ল, বাড়তে ল। আমার ঘর-দুয়ার আন্ধার অইয়া আছে।'

শরিফন বলে, 'কিছুতে না। আমার বাজানের টাকা বুজ দিয়া দাও। খালি কি হেই? এই এতডা দিন যে পইড়া আছি আমি, আমার খাওন-খোরাকের টাকা ফিরাইয়া দাও বাজানরে। টাকার অভাবে বাজানের আমার কিছু অইলে না। জমি অইলে না, বাড়ি অইলে না, জননা অইলে না। আমি বেলায়েক মাইয়া, কিছুই করতে পারলাম না বাজানের লিগা।'

টাকা-পয়সায় গলে না আমজাদ। বলে, 'ও তো বাপ নয়, ও জহ্লাদ।'

'তুমি আবা না বাড়ির তিরসীমায়।' শরিফন ঝামটা দিয়ে ওঠে।

খোরাকপোষাকের অভাবের বনিয়াদেই তালাকের আর্জি করতে হবে। কিন্তু দু-দুটো বছর অপেক্ষা করবার মত সময় নেই কাঙ্গালী খাঁর।

হয়ত সময় নেই শরিফনেরও।

ধর্ম-মা বললে, পেটে সন্তান এসেছে শরিফনের।

কাঙ্গালী খাঁ আর মোক্তারসাহেব চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কার কান্ড?

আর কার! আমজাদই তো কত দিন এসেছে রাত্তির করে। চোরের মত। বেড়া ডিঙিয়ে। কচা-কচুর জঙ্গল টপকে।

সুপারি গাছের চেরা চেঁচে-ছুলে তাতে বালি ঘসে কাস্তে-কাঁচি ধারালো করে চাষীরা। বালি চকচক করে বলে নাম তার বালিকচা। তাই একটা পড়ে ছিল উঠোনের কোণে। তাই নিয়ে আগাপাস্তলা পিটতে লাগল কাঙ্গালী খাঁ।

সেদিন গরম লোহার ছেঁকা দেবার সময় যেমন হেসেছিল শরিফন তেমনিই হাসল প্রথমে। যেন তেমন বিশেষ লাগেনি। একটা দুটো দাগেই তো ডাক্তারের সাক্ষী পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে অন্ন-নালিশের কারণ। কিন্তু কাঙ্গালী খাঁ থামতে চায় না। শেষকালে ডুকরে কেঁদে উঠল শরফিন। বললে, 'এই তো খুব অইছে, আর ক্যান?'

'আর ক্যান?' গর্জে উঠল কাঙ্গালী খাঁ : 'আমি এত কষ্টে গুটি পাকাইলাম আর উনি এক ঢাইলে সব কাচা কইরা দিলেন।'

'তোমার পা ধরছি বাজান। আমি আর সইতে পারি না।'

মোক্তারসাহেব এসে থামাল। মরুব্বির মত বললে, 'এ তো খুব বালোই

অইলে, কাঙ্গালী। এহন মারপিটের আর্জি দিয়াই বিয়ার তালাক লওন যাইবে। রাহো, ডাক্তার লইয়া আই।'

সমস্ত রাত উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে শরিফন। ধর্ম-মা এসে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকল আমজাদ। পাথালিকোলা করে নিয়ে গেল শরিফনকে। বললে, 'ঘাটে নাও বান্ধা আছে আমার।'

শরিফন বললে, 'আমার শরীরে আর কিছু নাই। আমারে তালাক দিয়া থুইয়া যাও।'

কোন কথা শুনলে না আমজাদ শরিফনকে বুকে বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এল।

কিন্তু, যেমন করে হোক, শরিফনকে পালাতে হবে এখান থেকে। নতুন নিকে বসে বাপের জন্যে টাকার জোগাড় করতে হবে। ব্যবস্থা করে দিতে হবে জায়-জমির, বাড়ি-ঘরের, নতুন বিবির। এমনি করে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে এখানে বেদামী হয়ে যেতে পারবেনা।

তার বাপ কী বলবে। তার ধর্ম-বাপ কী বলবে।

পিঠ উদলা করে দেখাল শরিফন। দেখাল হাত-পা। ফোলাফোলা লম্বা লালচে দাগ হয়ে আছে। শরিফন বললে, 'আমার শরীরে আর কিছু নাই। আমাকে লইয়া তুমি কী করপা?'

'কিন্তু তোমার মুখখানা তো আছে।'

শরিফন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। পরে মাথা হেঁট করে বললে 'প্যাডে যারে ধরছি হে তোমার না।'

মুহূর্তে গিঁট পাকিয়ে উঠল আমজাদ : 'তয় কার? কথা কওনা যে?'

'হে দিয়া তোমার কাম কী?' শরিফন উঠে দাঁড়াল। বললে, 'মোরে ফিরাইয়্যা দিয়া আও মোর বাপের বাড়তে।'

বাতায় গোঁজা বাঁশের লাঠি ছিল আমজাদের। চাষারা বলে, টনির লাঠি। তাই তুলে নিলে আমজাদ। শক্ত হাতে। শরিফনের গায়ে মার দেবার আর জায়গা নেই। আমজাদ ঘা বসাল শরিফনের মুখের উপর। নাক-চোখ-কপাল লক্ষ্য করে।

দর দর করে রক্ত ঝরতে লাগল।

মুখটি যেন ছবিখানি। মনে পড়ল শরিফনের। চোখের জল মুছতে গিয়ে কেবল রক্ত মুছতে লাগল।

তিন তালাক বাইন দিয়ে তাকে ঘরের বার করে দিলে আমজাদ।

কাঙ্গালী খাঁ মেয়েকে লুফে নিলে। তালাক নিয়ে এসেছে জেনে পিঠে তার হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

এল আহম্মদ পেস্কার। বললে, মেয়ে দেখবে। মুখ-দেখানি দেবে পঁচিশ টাকা।

রায়বার মোক্তারসাহেব। সে বললে, 'মেয়ের রূপগুণ কি আর অপরকাশ? দশদেশে তার নাম ডাক।'

তবু মেয়ে দেখবে আহম্মদ পেস্কার! সে অনেক আধুনিক।
মুখ দেখাল শরিফন।
আহম্মদ পেস্কার আঁৎকে উঠল। একটা চোখ কানা, নাকটা বেঁকে গেছে, যখন হাসল একটা দাত ফাঁক।
'মুখটি যেন ছবিখানি।' মনে পড়ল শরিফনের।
পঁচিশটাকা ফেলে রেখে চলে গেল আহম্মদ পেস্কার। টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে চার আনা অংশ মোক্তারসাহেবকে বুঝিয়ে দিলে কাঙালী খাঁ। বললে, 'মন্দ কি। খালি মুখ দেখাইয়া পঁচিশ টাকা রোজগার।'

১৩। হাড়ি-হাজরা

মাটির কলসির ভেলা বাঁধছে হাড়ি-বউ। লালু হাজরার পরিবার। কুড়োমতি। সাটুয়ের দ'য়ে পাঁইফল তুলতে যাবে।
লালু যাবে শুয়োর চরাতে। আঁদুলের বিলে।
কুড়োমতি ফিরবে দুপুরে আর লালু ফিরবে ঝিকিমিকি বেলায়।
ভিজে ভাত আছে হাঁড়িতে। আর ঝালসানা। তাই খে লে গে।
'ভিজে ভাত খাব না। আজ সন্দি হোলচে।' লালু হাজরা বলে কথার সুরে মিনতির টান দিয়ে : 'দুটো গরম ভাত এঁদে আখিস বাড়ি ফিরে। বুললি?'
'হুঁ, বুইচি—' কুড়োমতি গা করে না।
'আর শোন্, একটু ত্যাল এনে আখিস। বুকে-পিটে মালিশ করে লোব।'
পানিফল তুলে এনে হাটে গেল কুড়োমতি। বেচা-কেনা সারা করে গেল যজমান বাড়িতে। নিজের মহালে, পুবের চাকলায়। পোয়াতিদের খোঁজ-খবর নিতে। কার কোন অসুখ-বেসুখ করল, কার পেটে তেল-জলে মালিশ করতে হবে। কার লাগবে তুকতাক, টোটকা-টাটকি। কার ছেলে কাক-চিল বসতে দিচ্ছে না বাড়ির তি-সীমায়। দেয়োমা করে কুড়োমতি। খালাস করায়।
চেয়ে চিন্তে গেরস্ত বাড়ি থেকে গরম ভাত নিয়ে এসেছে কুড়োমতি। কে আবার রাঁধে এখন গতর খাটিয়ে। নিজে দুটো রেঁধে নিতে পারে না? বারো মুলুক ঢুঁড়ে খায়, ঠাকুর-বাড়ির পথ চেনে না।
দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে সেই ভাতই এখন লাপুরলুপুর করে খাচ্ছে কুড়োমতি। লালু হাজরা হাজির।
কুড়োমতির থাবা খুব চওড়া। গেরাস বেশ দরাজ। খিদে খুব চনচনে।
'হা টে শালি, আমার ভাত কই?'
কুড়োমতির হাঁড়ি দেখাল। এই তো।
'ও তো ভিজে ভাত। বিয়েন বেলা বুলে গেলাম ভিজে ভাত খাব না, সন্দি

হোলচে। তু গরম ভাত এনে খেছিস, ও কটা আমার লেগে আখলিনে কেন? তু ভিজে ভাত খেলেই তো পাত্তিস।'

'যদ্দিন ছরৎ তদ্দিন।' কুড়োমতি টাকরার উপর জিভের বাড়ি মেরে টাক-টাক শব্দ করলে। বললে, 'আমার গরম না খেলে চলবে কেনে? আমাকে খেয়ে-মেখে বাঁচতে হবে তো? ওজকার করতে হবে তো?' বলে ছড়া কাটল :

'ভিজে পান্তা ভোক্ষন
ঐ পুরুষের লোক্ষন।
আমি মাগী গরম খায়
পাছে কবে মরে যায়।'

লালু রা কাড়লে না। এক নজরে তাকিয়ে রইল কুড়োর দিকে। রাগে চোখ রাঙা না হয়ে জলে ঝাপসা হয়ে এল।

কিন্তু কী করবে? কুড়ো তার তৃতীয় পক্ষের সাঙা করা পরিবার।

কিটকিটে কালো নয়, কুচকুচে কালো। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়, গায়ে ঠাণ্ডা বাওরের ছোঁয়া লাগে। অমানিশির অন্ধকারের মত অটুট। যেন কষ্টি পাথরের শান-বাঁধানো চাতাল। আর সেই শানের মতই তার নিষ্ঠুরতা।

বড় রোগাটে-পাঁকাটে দেখতে লালচাঁদকে। ডিগডিগে। বউয়ের লাটদারিতে বেঁচে আছে কোনো রকম। নইলে শুয়োর চরিয়ে কত আর সে কামাতে পারে? শুয়োর যদি সে ভাগে পেত, পেত যদি বাচ্চার ভাগ, তা হলেও বা কথা ছিল। সে পরের শুয়োর চরিয়ে রাখালি-বাগালির মাইনে পায়। আসল যা রোজগার সব কুড়োর কেরামতিতে। তাই নিন্দু হয়ে আছে সে বউয়ের। ঢাকের বেঁয়ো হয়ে—সানাইয়ের পোঁ।

তাই বলে দুটি গরম ভাত রেঁধে দেবে না? নরম বলে ধরম দেখাবে?

'যাগগে—টুকচে ত্যাল তো দে। বিলের জলে খালুস লেগেছে, গায়ে-পায়ে মাখি।'

কুড়ো ভাত-মাখা আঙুল চাটছে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে। বলে, 'পয়সা নাই।' পরে ঘটি কাৎ করে জল খেয়ে বললে, 'যা আক্কারা ত্যাল—আজ আর ত্যাল আনব না।'

'হা টে শালি বিটি, তবে কি আর মাচ-তরকারি আঁদবিনে? ত্যাল না দিয়ে মাচ-তরকারি আঁদবি কি দিয়ে টে?'

কুড়ো ঝাঁকরে উঠল : 'হা খালভরা! বাঁশচাপা! আজ তিন দিন হল সইষ্যা বাটা দিয়ে তরকারি হোচে। তু কানা দেখতে পেছিস না? পিণ্ডি যে খেছিস, কই, কোনো কতা বলিসনি যে?'

'শুধু সইষ্যা বাটা দিয়ে মাচ-তরকারি আঁদনা হয়? ত্যাল লাগে না?' লালু অপরাধীর মত মুখ করে।

'হা নামুনে! জকা! সষ্যার মদ্যেই তো ত্যাল—আবার ত্যাল লাগবে কিসে? নে, ডালার মদ্যে সইষ্যা আছে, তাই বেটে নিয়ে তোর খালুসে লাগা গা।'

লাল্ম হাজরা তাই মেনে নিল ঘাড় পেতে। বেখাপ্পা-বদরাগীর মত কোনই কান্ড করলে না। যেন সেই শক্তিই তার নেই।

ভদ্দর-শদ্দরের থেকে শ্বর্ম করে পাড়ার পঞ্চজনে সবাই তাকে জানে উদোমাদা ব'লে। বলে, লালা, আবাঙ। মাগবোশো।

লাল্ম বলে, 'মা লয় যে খেদ্রে দেবো, বাপ লয় যে তাড়্পে দেবো—রর্ধ-রঙ্গে কি ব্মলছি বল্মন?' কুড়োমতি ছাড়া আর তার কে আছে?

কিন্তু কল্লা মাগী মধ্যে-মাঝে পেচন্ড পেহার দিয়ে বসে। তখন ভালো-মান্মষি করতে আসে কেউ-কেউ। কুড়োমতিকে বলে, 'মন না বসে ছেড়ে দিলেই তো পারিস এই অনাম্মকোকে? আঁশ খেয়ে ওববার লষ্ট করিস কেনে? এখনো তোর দলমলে দেহ—কত ভালো-ভালো—'

কুড়োমতি লজ্জার লহর তুলে হাসে। বলে, 'ওল-কচ্ম-মান সবই সমান। আমার কাছে অঙ-অঙ্গের গপ্প ব্মলতে এসো না।' বলে ছড়া কাটে :

'যদি কেষ্ট পিতি থাকে মন
তবে কোথা লাগে তার আইন-কানন।'

মদন চাপরাশির মেয়ের ব্যথা উঠেছে। 'পেরথ্থম' পোয়াতি। এসেছে শ্বশ্মরবাড়ি। কাটোয়ায় তার সোয়ামী ফৌজদারিতে ম্মহ্মরিগিরি করে। এক ইস্টিশান পরেই কাটোয়া। কুড়োমতির ডাক পড়ল।

'এখানে কেন মরতে এলাম মা?' মদন চাপরাশির মেয়ে প্মর্ণশশী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে : 'কাটোয়া ছেড়ে কেনে এলাম এই জঙ্গল-আগাছার দেশে? এখানে আমাকে কে বাঁচাবে?'

কিছ্ম ভয় নেই মা, আমি আছি। স্মপ্রেসব করিয়ে দেব।

জমিদারের যেমন জমিদারি, গেরস্তর যেমন জোত-জমা। গ্মর্ম-প্মর্মতের যেমন শিষ্য-যজমান, আমাদের তেমনি পো-পোয়াতি। সমান কদর। হাত আমাদের রপ্ত-দোরস্ত, কিছ্ম ভয়-ডর নেই।

এবার খানিকটা হাঁটো দেখি আঙনায়।

'রক্ষে করো দাই-মা, আমি মরে যাব।' প্মর্ণশশী কুড়োমতির হাত দ্মটো আকুলি-বিকুলি করে জড়িয়ে ধরে।

'যাঁহা ম্মস্কিল তাঁহাই আসান। দেবতা-গোঁসাইকে একবার মানত কর দিনি, এখ্মনি ছেলের ম্মখ দেখবে।'

'একটু জল দাও—' 'বড় ব্যথা খাচ্ছে মেয়েটা।

জল ঢেলে দিয়ে জায়গাটা মাটিতে নামিয়ে রেখেই কুড়োমতি হঠাৎ হাঁক দিয়ে উঠল : 'ওগো ভালো-মন্দ কুজ্ঞানী নোক যদি কেউ থাকো তো সরে যাও। মাথার চুলের গিট খ্মলে দাও শিগ্গির।'

পাড়ার অনেক ঝিউড়ি-বউড়িই এসে জড় হয়েছে মজা দেখতে।

'হেই মা, এখানে আবার কুজ্ঞানী ভালো-মন্দ কে আছে গো। ইয়ে আবার কী কতা?'

'এই লাও ভাই, মাথার চুল খুললাম। সবাই খোলো।'
লাটপাট করে বাঁধা ঢলকো খোঁপা সবাই ঝুপঝাপ খুলে ফেলতে লাগল।
'ওগো একখানা ক্যাদা কি অন্য হেত্যার দাও দিনি শিগগির। ঘরের কোন ধারের চাল লাগাল পাব বলো তো?'
হেতের নিয়ে এল মদনের বউ টুনুবালা।
হেতের দিয়ে ঘরের চালের তিনটি বাঁধন ফট-ফট করে কেটে ফেলল কুড়োমতি। কিন্তু কই। এখনো তো কিছু আসান হল না।
এ যেন বাপু কেমন-কেমন লাগছে। পাঁচ জনকে ডেকে দেখাও। মজলিশ কর। দশে মিলে করি কাজ, ভোন্ডুল হলে নাই লাজ।
সকলে সল্লা-সুলুক করতে বসল। পরস্পর চোখ-টেপাটেপি আর ঘন-ঘন ঘাড়-মাথা নাড়া। কী বিঘটন না হয়ে বসে!
'তু কেমন বুঝছিস হাড়িবৌ?' টুনুবালা অস্থির হয়ে উঠল।
'তাই তো বাপু, দিন নাই দুপুর নাই, সোমবার নাই মঙ্গলবার নাই, কবে কোন আমাবস্যা পুন্নিমেতে কোতু থুতু ফেলেছে বা কখুনু গা উদোম করে বসেছে। কি করতে কি হোলচে ঠেকনা নাই।'
'ওমা, কি হবে গো? কুদিষ্টি পড়েছে গো।' টুনুবালা হাঁকিয়ে-চেঁচিয়ে উঠল : 'ওঝা ডাকো ওঝা ডাকো।'
পুর্ণশশী আর কাউকে চেনে না—জানে না। সে শুধু কুড়োমতির কাছে মিনতি করে। বলে, 'পেটেরটাকে মেরে ফেল। আমাকে বাঁচাও।'
'শিগগির করে স' পাঁচ আনা পয়সা আর ছোটপানা কুলের ডাল আনো—ধান থাকে তো পাঁচ পোয়া ধান—' কুড়োমতি ধুমুল দিয়ে উঠল : 'রাখো ঐ বাঁহাতি আমার পেছেতে।'
শেষকালে বেপদ কিছু হয়ে বসে, একেবারে না খালি হাতে ফিরতে হয়।
টুনুবালা ধান আর পয়সা নিয়ে এল। কুলের ডাল ভেঙে আনবে কে?
'হোলছে, আর দেরি নাই। জয় মা কালীর দোয়া, জয় মা হরির দোয়া—আমার মুখ এখো মা।'
ছেলে হয়েছে পুর্ণশশীর। ব্যাটা ছেলে। সন্নবন্ন ছেলে। হয়েই ট্যাঁটাতে শুরু করেছে। বুঝলে না, খাওয়ার জন্যে কাঁদি।
সুতো কই, চোঁচ কই? বাঁধন-কাটন হবে। মধু দাও, গোলমরিচের গুঁড়ো দাও। ছেলের মুখে দেব।
'কাল্-দমনের দলে যাবা। ত্যাল মাখবা আবাথাবা, আর খাল দেখে পাত পাড়বা—'ছেলের ধোয়া-পাখলা করতে-করতে কুড়োমতি আদর করে ছড়া কাটে।
শেষে ছেলেকে পুর্ণশশীর কোলে দেয়। বলে, 'ছেলে তোমার না আমার?'
পুর্ণশশী খুশিতে গদ-গদ হয়ে বলে, 'ছেলে আমার।'
'হ্যাঁ, তোমার।' কুড়োমতি হাঁক দেয় : 'ওগো ছেলে-পোয়াতি সব এক পাশ। আমি বাইরে যাব—'

বাতাস লাগলে বিঘ্ন হতে পারে। তাই আবার ফেরবার সময় আগুন ছুঁয়ে ঘরে ঢোকে।

দুটি সরষেতে মন্তর পড়ে পূর্ণশশীর কাপড়ে বেঁধে দেয়। একটু মাছ-ধরা জাল-ছেঁড়া ঘরের 'ছামু'তে ঝুলিয়ে রাখে। ছোট মই এনে পেতে রাখে চৌকাঠের নিচে। যাতে ভূত-পেরেত আঁতুড়ঘরে দৃষ্টি না করে।

পাকা কলা খাওয়ায়। শুঠ পেঁপুল গোলমরিচ বাটা ঘি দিয়ে ছোঁক দেয়। আরগোজার পাতা জোগাড় করে আনে। তার রস করে। যাতে দুধ বাড়ে, কালজিরে বাটা চাল-ভিজে খাওয়ায়। তিন দিনের দিন ভাত দেয়। কত যত্ন-আত্মি করে। সব তুমি হাড়ি-মা, দাই-মা। তুমিই আমার ভাবীসাবী, জাতজ্ঞাত। তোমাকে ছাড়া চলবে না আমার দু-দণ্ড।

রাত্রে মা-ছেলের পাশে তালাইয়ের উপর ঘুমিয়ে থাকে কুড়োমতি।

বিদেয়-আদায় ভালো হবে লিচ্চয়। ঘরে থাকবার রীতকরণ নয় তাদের। কিন্তু পূর্ণশশী ছাড়ে না। বলে, 'আঁতুড়-ষষ্ঠীর পর যাবে। আর যদি এর মধ্যে ডাক আসে কোনো, ছুটি দেব।'

ছ'দিনের দিন রাতে আঁতুড়ষষ্ঠীর পুজো হয়। দেয়ালে গোবরের গোটা লাগায়, তার গায়ে কড়ি বসায় নটা। নটা পাতাশুদ্ধু কঞ্চির মাথা গুঁজে দেয় তাতে। তার উপর হলদে ন্যাকড়ার আচ্ছাদন দিয়ে সিঁদুরের টোপা দেয়। নৈবিদ্য দেয় মুড়ি-মুড়কি চিড়েভাজা কড়াইভাজা। সে পুজোর পুরোত আমাদের কুড়োমতি।

ছেলেকে মাটিতে শুইয়ে রাখে। তালপাতা অ আ ক খ লিখে রাখে ষষ্ঠীর সামনে, রাখে দোয়াত-কলম। ষষ্ঠী ও ছেলের দিকে বৈমুখ হয়ে বসে থাকে পূর্ণশশী আর কুড়োমতি। ছেলে কেঁদে উঠলে তখন কোলে নেয়।

বিধেতার লিপি লেখা হয়ে যায় ছেলের কপালে।

'এবারে আমি যাই। ঘরের পুরুষ উগ্‌টে, শরীলে আরো বেজুত ধরে যাবে।'

আর দুটো দিন। গাছ-ষষ্ঠীর পুজো হবে বিজোড় দিনে, বটগাছ শেওড়া গাছ বা পাকুড় গাছের গোড়া।

গাছ-ষষ্ঠীরও পুজো হয়ে গেল। পাটকাম সব কুড়োমতিই করলে।

বললে, 'এবার ঘরকে যেছি আমি ঠিক। আবার তোমার শুদ্ধ হবার দিন আসব। সি দিন আমার পাওনা-গণ্ডাটা—' ছেলেকেও একটু আদর করলে। বললে, 'ই ছেলের যখুন বিয়ে হবে তখুন আবার আমার ডাক পড়বে। ই আমার খালাসী ছেলে।'

কুড়োমতি চলে যায়। এবার ঘরে আসে অগ্নি-মা।

একুশ দিনের দিন পাকাপাকি শুদ্ধ হয় পূর্ণশশী। গোয়ালে বসে মাথায় দুধ আর গঙ্গাজল ঢালে। তারপর ডুব দেয় বাড়ির গোড়াতে।

ঘুসঘুসে জ্বরে ধরেছে পূর্ণশশীকে। লিকলিকে হয়ে গিয়েছে চেহারা। তা হোক, আজকের দিনে একটা ডুব না দিয়ে উঠলে তার উপায় নেই। সেরে

যাবে অসুখ। এমন ছেলে যার কোলে, তার আবার আধিব্যাধি কি! তার সুখের ঘরে রূপের বাসা।'

কুড়োমতি এসে দাঁড়ায়। তার পাওনা-থোওনাটা বাকি আছে এখনো। ছেলের বাপ ঘুরে যেয়েছে? কী দিয়ে দেখলে সোনামুখ?

গেরস্ত বাড়ি, ধান-খড়ের কারবার, উঠোনে কুটি-কুটি খড় পড়ে আছে। পূর্ণশশীর কাছ পর্যন্ত নেতাড় লেগে আছে। পূর্ণশশীর মনে হল হাড়ি-বৌয়ের ছোঁয়া খড়ের সঙ্গে সঙ্গে নেতাড় হয়ে গেল। আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠল সে : 'এই যা, সব মাটি করল মাগী! কি লো ছুঁয়ে দিলি?'

কুড়োমতি থ বনে গেল। সে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় কাঠা দুয়েক দূরে, ছুঁলো কখন?

'তোকে আগেই বারুন করলাম, আগিয়ে আসিসনে। আসিসনে, ছোঁয়া লাগবে, নেতাড় ছেড়ে দে। তা কানের মাথা খেয়েছিস নাকি মাগী? এখন যে তোর ছোঁয়া এসে গায়ে লাগল।'

কুড়োমতির মুখে রাকাড় নেই।

'আমি গোয়ালঘরে গিয়ে চান করে এসে শুদ্ধ হলাম। পোড়ামুখি মাগী, তু আসবার আর সময় পেলিনে? এলি তো এলি, সরাসর ছুঁয়ে দিলি? আমি কি এখনো সেই আঁতুড়ঘরের পোয়াতি আছি?'

কি, কি, হল কি? টুনুবালা ছুটে এল।

'আ মর মাগী, তোর জ্ঞান নাই? তু হাড়ির মেয়ে। অচল-অজল, তোর আস্পদ্দা তো ভেষণ। বাড়িময় কুটি-কুটি খড় পড়ে আছে, তুই কি কানা, দেখতে পাস না? খড়ের নেতাড়ে তুই ছেলে-পোয়াতি ছুঁলি কোন হিসেবে? বামুন না হলেও তোর চেয়ে তো বড় জাত বটি। তোর এই খিটকেলের কি কম্মটা ছিল? কেন আবার তুই কাঁচা পোয়াতিকে চান করাবি শুনি?

কুড়োমতি আঁট হয়ে দাঁড়াল। বললে, 'হা গো, আমি তো উঁদিকে ছুঁইনি-লাড়িনি—কেন মিছিমিছি লপলপ করছ?'

'হারামজাদি, নেতাড় দেখতে পাস না?' মুখিয়ে উঠল টুনুবালা : 'নেতাড় ছাড়লিনে কেন?'

'বাড়িতে গোটা উঠোনেই তো খ্যাড়ের কুটি পড়ে আছে। এতে যদি দোষ হয় তাহলে তো ঘাসের সঙ্গেও নেতাড় লেগে আছে। ঘাসে-ঘাসে নেতাড় লেগেও তো ছোঁয়া যেতে পারে ত্রিভুবন।'

'ল্যায় করবি তো মুখ ভেঙে দেব।'

'তা ছাড়া আমিও সেই মানুষ, ছেলে-পোয়াতিও সেই মানুষ। আঁতুড়ঘরে এক বিছানায় গলা ধরে শুয়েছিলুম। ভাত-জল হাতে করে আগিয়ে দিয়েছি, তা খেয়েছ, কত নোংরা ঘুচিয়েছি, কত লাড়া-ছোঁয়া করেছি—মা-বুন বলে গিদের করেছ! আর এখন দাই-উদ্ধার হয়ে গেলে পরে পয়জার মারছ। নায়ে হতে নামলে পরে নাউরে বেটা শালা, তাই না?'

'চুপ কর মাগী। যা করলি তা করলি, তা-পর আবার গজল্লা কিসের? ছোটলোকের আবার অত খ্যাঁক-খ্যাঁক কেন? কুঁজোর সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে—না? আঁতুড়ঘরে না হয় খেয়েছে-ছুঁয়েছে—বেকচ্চায় পড়ে হাতি, চামচিকেতে মারে লাথি--তাই বলে কি শুদ্ধ হয়েও তোকে ছুঁতে হবে?'

'যখন যেমন তখন তেমন।' ফোড়ন কাটে পূর্ণশশী। 'ঘরের ভিতর যদি কেউ কোনো ল্যায়-অল্যায় করে তাতে দোষ হয়? তা বলে লোক দেখিয়ে তোকে ছুঁতে হবে?'

'যাও, যাও। আর লাথি উঁচিও না। সব জানা আছে। ঢাকে ঢোলে বিয়ে কাসতে মানা। কত গেরস্তর মেয়েকে কত ভাবে আমরা বাঁচিয়ে দি—দরকার হলে নিজের বাড়িতে লিয়ে গিয়ে এখে দি, নিজের হেঁনসেলে নিজের হাতে ভাত আদনা করে খেতে দি—তখুন তো সব চলে। ঠ্যালায় পড়ে ল্যালার জল খেতে আপত্য নাই, না?'

'মুচলমানী হারামজাদী, ঝাঁটা মেরে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে দেব—' টুনুবালা শতমুখী নিয়ে বেরিয়ে এল। 'বেরো তু আমার চৌহিদ্দি থেকে।'

অনেকক্ষণ কাঁদল কুড়োমতি। কেন কাঁদল কে জানে। এত তেজ-তাপ যার, এত যার জোরজার, সে এত সহজেই হার মানলে। কেঁদে মাটি ভেজাতে বসল। মনে তার বড় ব্যথা লেগেছে।

তাই বলে চোখের জলে ভাসবে না কখনো পিথিমি। আগুন লাগাতে হবে। চোখের জল ফেলে তাই সে নিবতে দেবে না আখার আগুন।

বাড়ি ফিরে কুড়োমতি ভাত রাঁধতে বসল। হাজরা শুয়োর চরিয়ে এখনো বাড়ি ফেরেনি। সামনের খাল থেকে কুড়োমতি ধরতে গেল কটা গেঁড়িগুগলি।

লালু যখন বাড়ি ফিরল আখার উপর ভাত ফুটছে টগবগ করে। শিলে পোড়া গুগলি বাটছে কুড়োমতি। খাওয়ার আজকে খুব তেজ হবে তা হলে। লালুর জিভ সড়সড় করে উঠল।

'ইয়ের পিতিফল চাই। তুই যদি আমার স্বামী হোস তবে ইয়ের তুর পিতিকার করতে হবে।'

লালু থমকে দাঁড়াল।

'তু সাতাসে, না, দশ মাসেই হয়েছিস? মানুষ বটিস? ভাত খাস? না শুদু পাটের শাগের বীচ খাস?'

'কি হয়েছে তুর?'

'আজ গেরস্ত বাড়িতে বড় রপমান হোলচে, ই রপমান সইতে লারব। আর ইত্তিলোকের বাড়ি যাবনা কখুনু দেয়োমো করতে। খ্যাড়ের নেতাড়ে পা দিয়েছিলাম বলে ছোঁয়া লেগে অশুদ্ধ হোলছে ঘরগুষ্টি। আঁতুড়ঘরে আমার লাড়া-ছোঁয়া জলটল সবই চলেছে—এখন দায়-উদ্ধার হয়ে ছিঁগ্রে ছাঁটলেই দোষ—'

লালু হাজরা মাথা চুলকোতে লাগল।

'আমাকে ঝ্যাঁটা দেখালে। তু যদি আমার স্বামী হোস, তুর কাছে আমি

মিনতি করছি—হিয়ের তু বিহিত কর। যাকে ভাতারে করে হেলা তাকে রাখালে মারে ঢেলা। বিয়োলোই হই, শাঙালোই হই, আমিই তোর তি, তু ছাড়া আমার আছে কে?'

লালু হতভোম্বের মত তাকিয়ে রইল। কুড়োমতি তার কাছেই মিনতি করছে, ভিক্ষে চাইছে। তার স্বামীর কাছে আশ্রয় চাইছে। হিয়ের তাপ জানাচ্ছে তার কাছে। বলছে, পিতিবিধেন করো। সে এত বলবান, এত শক্তিধর!

'এবার থেকে তোকে আমি গরম ভাত এঁদে দেব। এখন গুগলিসানা দিয়ে উবোজ্বলন্ত ভাত খেয়ে নে—শরীরে তুই একবার বল বাঁধ। লাঠি হাতে নে। গলায় রজ দে। বলে আমরা নাকিনি কেউ লয়, আমরা ছোট জাত, আমাদের সব ইতুরে কান্ড। কী জানে উয়ারা? আমরা কি মান্যের লোক কম ছিলাম রে একদিন?' কুড়োমতি কোমরে আঁচল জড়াল। 'আমরা হাজরার গুষ্টি। হাজার হাজার লাঠিয়ের সর্দারি করেই না আমরা হাজরা! এক লাঠি ধরে হাজার লোককে থ বানিয়ে দিয়েছি আমরা। লাঠির জোরে লুটপাট করে দেশটা একদিন হাত করেছিলাম আমরা—মনে নাই?'

লালুর বুকের ভিতরটা খলবলিয়ে উঠতে লাগল। যেন মনে পড়ল সব।

'রনগাঁর কুঠিতে ডাকাতি করে বেরুবার সময় আমার কত্তাবাবার বাবার পায়ে চাঁদগজাল ঢোকে, সেই গজাল পায়েই বামাল কাঁধে করে ঘন্টায় চার কোশ পথ অক্লেশে চলে আসে। তার গাঙাড়ি শুনলে পাহাড়ে ফাট ধরত, গর্ভিনীর গর্ভপাত হত—আমরা সেই হাজরার ঝাড়। হৈ-হয় ক্ষত্রিয় আমরা। আমরা কি কম? ফতা হাড়ির জাতজ্ঞাত আমরা—যে ফতে সিঙ্গির পরগনা ইটা সেই ফতে সিং। কেল্লা ফতে, কাম ফতে থেকে ফতে সিং। তু শুনিসনে কিছু? মুন্ডুমালার বাঁধ দিলছিলাম আমরা! সব যেয়েছে আমাদের, আজ্যি-আজ্য কিছু নাই, তমু হাজরা নাম ঠিক আছে। সেই হাজরার বেটা তু। তোকে কে উখতে পারে ভিমন্ডলে?'

লালু ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল থর-থর করে।

'তোর গায়ে কি সান নাই? তুই কি অক্ষাম-অজ্ঞান?'

হঠাৎ বার কতক মুখে 'আবা' দিয়ে বিকট আওয়াজ ছাড়ল লালচাঁদ। বাঘের মত গুমগুমে হাঁকার। সমস্ত শরীরে তার গিঁট পাকিয়ে উঠল। শুয়োরের কুচির মত মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। বাই ঠুকে লাফ দিয়ে হাতের খেঁটে ঘোরাতে লাগল বনবন করে।

গামলাতে গরম ভাত বাড়তে লাগল কুড়োমতি।

বৈরাগ্যদের বাড়ি থেকে পোয়াতি-খালাসের ডাক এসেছে।

'না, না, যাবনা আমরা আর ভন্দর-শন্দরের বাড়িতে।' লালু গর্জন করে উঠল: 'আমরা লড়াইয়ে যাব। শোন নাই সাহেবডাঙায় যোদ্ধ লেগেছে। আমরা আর উ ছোট কাজ করে ছোট নোক থাকব না। আমরা যোদ্ধ করব।'

ঘটির জলে হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে কুড়োমতি বললে, 'না, যাই,

বেপদ উদ্ধার করে দিয়ে আসি। ই বেপদে আমি না গেলে যাবে কে? ই বেপদের কথা শুনলে থির থাকা যায় না যে। তা বাপু পাওনা-গণ্ডা আগাম লিয়ে লোব কিন্তুক। উই যে কথায় বলে :

অভন্দর বর্ষাকাল
হরিণ চাটে বাঘার গাল
ওরে হরিণ তোরে কই
সময় কেরমে সকলি সই।

আমাদের হোলছে সে দশা। বাঁ হাত কাটতেও যে দুখ ডান হাত কাটতেও সেই দুখ।' পরে লালচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তু খেয়ে লে। আমি এক ঘুরনা দিয়ে আলছি এখুনি।'

ভাম হয়ে বসে রইল লালচাঁদ।

গরম ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে। ঝালা হয়ে যাচ্ছে। এখনো খেয়ে নিলে পারে লালচাঁদ। এখনো তার রক্ত গরম আছে। এখনো তার গাণ্ডাড়ির কাঁপুনি তড়পাচ্ছে আকাশে। আর বেশি দেরি করলে তার দেহও জুড়িয়ে যাবে ক্রমে ক্রমে, বল-বিক্রম নরম হয়ে পড়বে। যুদ্ধে যাবার স্বপ্ন যাবে মিলিয়ে। মুণ্ডুমালা দিয়ে বাঁধ দেবার স্বপ্ন।

নিসেধোর মত বাড়া ভাতের দিকে তাকিয়ে রইল লালচাঁদ।

না, কুড়োমতি ফিরে আসুক।

১৪। আর্টিস্ট

দুপুর বেলা দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শীতের রোদ পোহাচ্ছিলুম, শুনলুম আমার নামে কোত্থেকে এক টেলি এসেছে।

চিঠির মোড়ক না খোলা পর্যন্ত শিহরিত আঙুলের মুখে অর্ধোচ্চারিত প্রত্যাশার ভাষা, টেলির বেলায় সব সময়েই একটা মূঢ়, নিরবয়ব আতঙ্ক।

স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি। টেলি এসেছে সুদূর লামডিং থেকে। স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি। চুনী—আমাদের চুনী আসামের জঙ্গলে মাত্র দশ ঘণ্টার ম্যালেরিয়ায় অকস্মাৎ মারা গেছে।

হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলুম। শীতের আকাশে কোথাও যেন আর এক ফোঁটা রোদ নেই। যেন একটা আর্দ্র আহিম অন্ধকার আমার সমস্ত অস্তিত্বকে সহসা পিষে ধরেছে। অলস, ম্রিয়মাণ রোদে গা ভিজিয়ে খানিক আগে মনে-মনে কবিতার উড়ু-উড়ু মৃদু কয়েকটা লাইনে কল্পনার তা দিচ্ছিলুম, তারা স্তব্ধতার শূন্যে গেল হারিয়ে। চুনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার একটি কবিতারও অকাল-মৃত্যু ঘটল।

কী যে করা যায় কিছু ঠিক করতে পারলুম না। চলে গেলুম রমেশের আপিসে। টাইপ-রাইটারের উপর একসঙ্গে তার দুই হাত চেপে ধরে বললুম, —ভীষণ দুঃসংবাদ।

—কী? রমেশের আঙুলগুলো আমার হাতের মধ্যে ভয়ে কুঁকড়ে এল।

পকেট থেকে বের করে দেখালুম টেলি। আমাদের চুনী আর নেই।

—বলিস কী? রমেশ চেয়ারের পিঠে পিঠটা ছেড়ে দিলো : আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। এমন দুর্দান্ত ছিল ওর প্রাণশক্তি। হাতের মুঠোটা বাঘের থাবার মতো প্রচন্ড। দুই চোখে ঝড়ের কালো দীপ্তি। গলায় যেন বাজ ডাকছে। তার মৃত্যুটা যেন সূর্যের আকস্মিক নির্বাপণের মতোই অসম্ভব।

—বরং আত্মহত্যা করলেও বিশ্বাস করতুম। শেষকালে ম্যালেরিয়ায় মরে যাওয়া? রমেশ ভয়ে হেসে উঠলো : কে করেছে টেলি? কে এই অমরেন্দ্র?

—লামডিং-এর কোনো বন্ধু বা আত্মীয় হবে হয়তো। যেখানে গিয়ে উঠেছিল। টেলিটা উলটে-পালটে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললুম : পরে চিঠি আসবে লিখেছে।

—কিন্তু লামডিং ও গেল কবে? এই সেদিন তো ওকে ম্যানাস্‌ক্রিপট বগলে করে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে যেতে দেখলুম।

—এই সেদিন, সেদিনও আমার কাছে এসেছিলো ওর একটা গল্পের ইংরিজি অনুবাদ করে দিতে পারি কি না। টাকার ভীষণ দরকার, অথচ মাথায় নাকি কিছু নতুন গল্প নেই। অনুবাদটা পেলে বোম্বাই না কোথাকার কী কাগজ থেকে কিছু পেতে পারে সম্প্রতি। অথচ তার আগেই—

রমেশ দুই হাতে তার টাইপ-রাইটারের চাবি টিপতে লাগল। বললে,— টাকা, টাকার জন্যে শেষকালটা কেমন মরিয়া হয়ে গেছল। না হ'য়ে বা উপায় কী! কত বললুম কোথাও একটা অপিসে-টাপিসে ঢুকে পড়—সাহিত্য করে কিছু হবে না। কে শোনে কার কথা! কী গোঁ, কী সতীত্ব, মরবে অথচ ধর্মভ্রষ্ট হবে না। যাক, রমেশ আবার চেয়ারে হেলান দিল : ভাগ্যিস বিয়ে করে রেখে যায় নি।

—কিন্তু সমস্যাটা তাতে বিশেষ প্রাঞ্জল হয়েছে বলে মনে হয় না। বললুম, বিধবা মা, তিনটি ছোট বোন, বড়োটির প্রায় বিয়ের বয়েস, এক দাদা আছেন—ট্রাম-অ্যাক্‌সিডেন্টে আজ বছর দুই ধরে প্যারালিটিক, বিছানায় শোয়া—তারো আছে ক'টি ছেলে-পুলে, সমস্ত সংসার ছিল চুনীর মাথার উপর। সমস্ত সংসারে শুধু ওই ছিল রোজগেরে—লিখে-টিখে যা পেত এদিক-ওদিক। এখন কী যে উপায় হবে কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

রমেশ বললে,—বাড়িতে জানে?

—কী করে জানবে? বোধহয় নয়। বোধহয় আমাকেই গিয়ে বলতে হবে।

আপাদমস্তক শিউরে উঠলুম : তুইও আমার সঙ্গে যাবি, রমেশ। চল, ওঠ।

—কিন্তু আগে খোঁজ নেয়া দরকার। অমরেন্দ্র না কার আগে সবিস্তারে চিঠি আসুক। কোনো শত্রুর কারসাজি নয় তো? রমেশ চেয়ার থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল : আমি যে কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছি না, চুনী আর নেই—আমাদের সেই চুনী।

বিশ্বাস করা এমনিই শক্ত। টেলির আঁকাবাঁকা নীলচে ক'টি অক্ষর ছাড়া আর কোথাও এর বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। স্পষ্ট দিবালোকে পৃথিবী তার অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বললুম,—মানুষের মৃত্যুটা সবসময়েই ভীষণ সত্যবাদী। তার আকস্মিকতাতেই সে বেশি স্পষ্ট, বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এখন কী করা যায়? ওর মা'র কাছে গিয়ে কী করে এই খবর দেব?

—দাঁড়া, ভেবে দেখি। আমিও তোর সঙ্গে যাব। রমেশ আমার হাত ধরল : চল টিফিন্-রুমে। দু' কাপ আগে চা খেয়ে নিই। গলাটা শুকিয়ে আসছে।

রমেশকে নিয়ে সন্ধ্যাসন্ধিতে চুনীদের বাড়ি গেলুম। নোংরা, অন্ধ একটা গলির শেষ-প্রান্তে, তা-ও ভিতরের দিকে, দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট, নিচু একটা গর্ত। শীতের সন্ধ্যায় স্যাঁতস্যাঁত ধরছে। এ-বাড়ির বাতাস কোনোদিন যেন রোদের মুখ দেখে নি। অন্ধকারটা যেন কালো মস্ত একটা মরা পাখীর মতো তার ভারি পাখায় ঘর জুড়ে পড়ে আছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়াতেই চোখ একটু সজুত হয়ে এল।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ এল : কে?

—আমি, আমি প্রসাদ। আর সঙ্গে এই আমার একটি বন্ধু।

কাঁথার তলা থেকে চুনীর মা উঠে এলেন। বয়েসে যত নয়, দারিদ্র্যে গেছেন জীর্ণ হয়ে। বললেন,—এসো, এসো, তোমাদের কাছেই খবর পাঠাবো ভাবছিলুম। চুনী কোথায় গেছে বলতে পারো?

শুকনো একটা ঢোক গিলে বললুম,—কেন, চুনী বাড়ি নেই?

—কলকাতায়ই নেই। তিন দিন হল, গেল-বেস্পতিবার সন্ধেবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো, আর তার কোনো পাত্তাই নেই। তোমাদের সঙ্গে ওর দেখা হয় নি?

—না তো। অনেক দিন দেখা নেই বলে আমরাই বরং ওর খোঁজ নিতে এসেছিলুম। কোথায় গেছে কিছুই বলে যায় নি?

—সে ছেলে আবার বলবে! মা অবহনীয় দুর্বলতায় মেঝের উপর বসে পড়লেন : যা মুখে এল তাই না আমাকে বলে পাগলটার মতো বেরিয়ে গেল। তারপর একটিবারের জন্যেও এ-মুখো হবার নাম নেই। সামান্য একটা চিঠি পর্যন্তও নয়। মা হঠাৎ কান্নার অসহায়তায় ফুঁপিয়ে উঠলেন : আমি তো তোমাদের দেখে ভাবছিলুম তোমরা আমার চুনীর কিছু খবর নিয়ে এসেছ।

গলাকে যথাসম্ভব তরল রাখবার চেষ্টা করলুম। বললুম,—আমার সঙ্গে

কম-সে-কম প্রায় দুই হপ্তা দেখা নেই। নতুন এক কাগজ বেরুচ্ছে তাই ওর একটা লেখা চাইতে এসেছিলুম। তা—ও হঠাৎ আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে গেল কেন?

—আর বোলো না। মার কান্না এবার শব্দে প্রতিহত হতে লাগল : বাড়ি-ওলা সেদিন বাড়ি এসে আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেল, ওকে বলে-ছিলাম তার একটা প্রতিবিধান করতে। ও ক্ষেপে উঠে বললে, বাড়িওলাকে ও এখুনি গিয়ে খুন করে আসবে। আমি টিটকিরি করে বলেছিলুম, ওর ন্যায্য টাকা দিতে পারিস না, আবার মুখ করিস কার ওপর? করবেই তো তাকে অপমান যে ঠাট করে মাসের পর মাস পরের বাড়িতে থাকবে অথচ ভাড়ার টাকা গুনতে পারবে না। তার আবার কিসের মা, কিসের কী? এই না বলা, আর ছেলের সমস্ত রক্ত গেল মাথায় উঠে। দু'হাতে জিনিস-পত্র ভেঙে চুরে ছত্রখান করে দিয়ে যা মুখে এল তাই বলতে-বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

গলায় হাসির আমেজ এনে বললুম,—কী বললে?

—সে মুখে বলতে পারব না। মুখে ওর কোনোদিন কিছু বাধে নাকি?

—না, বলুন, আমাদের বলতে কী বাধা?

মা দুই হাঁটুতে মুখ ঢাকলেন : বললে, পারব না, পারব না আমি এই গুষ্টি গেলাতে। আমি কে, আমার কী, আমি কেন তোমাদের সবাইকে খাওয়াতে যাব? অমি একা, আমাকে সবাই মিলে তোমরা বাঁচতে না দাও, আমার মরণ তোমরা কী করে বন্ধ করতে পারবে? আমি মরবো, মা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলেন : যা মুখে এল তাই বলতে-বলতে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। ভাতের থালাটা পর্যন্ত ছুঁলো না।

ঘরের মৃত, ঠাণ্ডা অন্ধকার মুখের উপর প্রেতায়িত নিশ্বাস ফেললে। অন্ধকারে যেন অস্তিত্বের কোনো সীমা খুঁজে পেলুম না।

পিছন থেকে রমেশ বলে উঠল : একেবারে ছেলেমানুষ।

—এমনি ছেলেমানষি আরো কতবার করেছে, রাগারাগি করে কতোদিন গেছে ঘর থেকে বেরিয়ে, আবার একটি দিন পুরো যেতে-না-যেতেই কোত্থেকে নিয়ে এসেছে টাকা যোগাড় করে—এমন করে একসঙ্গে এতোদিন আমাদের ফেলে রাখে নি। কী যে মুশকিলে পড়েছি, প্রসাদ, কী বলব? হাঁড়িতে একটা কুটো পর্যন্ত নেই—ছেলেপুলেগুলো কাল থেকে ঠায় উপোস করে আছে। তোমরা একটু খোঁজ করে রাগ ভাঙিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারো? ও নিজেই বা এতোদিন কী করে থাকতে পারছে চুপ করে? ও জানে না আমাদের অবস্থা? ও জানে না ও ছাড়া আমাদের কী গতি হবে?

রমেশ জিগগেস করলে : লামডিং-এ অমরেন্দ্র বলে আপনাদের কেউ আছে জানেন?

—অমরেন্দ্র? মা চমকে উঠলেন : কেন? অমরেন্দ্র তো আমার দূর সম্পর্কের বোনপো হয়। লামডিং-এ তার মস্ত কাঠের কারবার। কেন, তার কী হলো?

—না, কিছু হয়নি। একটা উড়ো খবর শুনেছিলুম চুনী নাকি লামডিংএ গেছে সেই অমরেন্দ্রের কাছে।

—পাগল! তার হবে আবার সেই সুমতি! অমরেন্দ্র তার কারবারে ওকে নেবার জন্যে কতো ঝোলাঝুলি, পেরেছে ওকে বাগ মানাতে? ব্যবসা বা চাকরি ওর দু' চক্ষের বিষ। ওর তপস্যা হচ্ছে সাহিত্য, খেতে না পাক, গুষ্টিসুদ্ধু মরুক সবাই মিলে, তবু ও ছাড়বে না ওর নেশা। ওটা ওর কাছে ঠিক ধর্মের মতো। বলে, যার যা কাজ মা, যার যা ব্রত। বলে, তুমি বলতে পারো আগুনকে তুমি পোড়াতে পারবে না, দিতে পারবে না আলো, হতে পারবে না লাল? তেমনি মা আমি। আমার যা করবার তাই আমি করব, তাই আমি করব আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে। ও যাবে লামডিং, অমরেন্দ্রের কারবারে! উদ্বেগে অস্থির হয়ে মা আবার উঠে দাঁড়ালেন : তা হ'লে তো অমরেন্দ্রই আমাকে আহ্লাদে একেবারে টেলি করে খবর দিতো। লামডিংএ যাবে বলে তোমাদের কাছে ও কিছু বলেছিল নাকি?

—না, বলে নি ঠিক, তবে হ্যাঁ, শুনেছিলুম যেন কোথায়, এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। রমেশ হাঁপিয়ে উঠল।

মা আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন : যে করে পারো ওর একটা খবর এনে দাও আমাকে। আমি এমনি করে যে আর পাচ্ছি না। এতদিন ধরে রাগ করে থাকবার ছেলে তো ও নয়। ও যে মা'র দুঃখ ভীষণ বুঝতো, সবায়ের দুঃখ।

বললুম,—না, নিশ্চিন্ত থাকুন, খবর এনে দেবো ঠিক। কোথায় আবার যাবে?

রমেশ তার মানিব্যাগ থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বার করল। আমি তো অবাক। রমেশ বললে,—সামান্য ক'টা টাকা, আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। কটা দিন চালান যতদিন না চুনীর খবর পাওয়া যায়।

মা অত্যন্ত কুন্ঠিত হয়ে গেলেন : না, না, তা কি হয়? চুনী জানলে মনে করবে কী? আবার ক্ষেপে যাবে, আবার যাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে। ওকে তোমরা চেনো না।

—না, এটা ওকে ওর গল্পের জন্যে অগ্রিম দিয়ে যাচ্ছি মাত্র, ওর গল্প আমরা চাই-ই। রমেশ নোট দুটো কোনো রকমে মা'র হাতে গুঁজে দিল।

খবরটা কিছুতেই ভাঙতে পারলুম না। দু' দিন ধরে সমস্ত পরিবার ঠায় উপোস করে আছে।

কিন্তু রমেশের ব্যবহার সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য করেছে। বরং কঞ্জুস বলেই তার একটু অখ্যাতি ছিল, বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে আঙুলের ফাঁকে একটি পয়সাও তার গলতো না। সে কিনা অনায়াসে কুড়ি-কুড়িটে টাকা বার করে দিলে। চুনীর ভাগ্য বলতে হবে! কিন্তু হায়, বন্ধুর এই মহানুভবতা দেখবার জন্যে আজ সে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে বা বেঁচে থাকতে অবিশ্যি তার উপর আমরা এমন মুক্তহস্ত হতে পারতুম না।

অমরেন্দ্রের চিঠির জন্য অপেক্ষা করছিলুম। বন্ধুদের মধ্যে একবার ঠিক

হয়েছিল লামডিংএ কাউকে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু সেই দিনই দুপুরে অমরেন্দ্রের চিঠি এসে হাজির। সমস্ত ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছে।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাবার আগে প্রায় সাড়ে ন'টার সময় তার জ্বর আসে—দেখতে দেখতে একশো পাঁচ, ছয়, সাত—উঠে এল মাথায়। যাকে বলে ম্যালিগ্‌ন্যান্ট্‌ ম্যালেরিয়া। চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। ডাক্তার, ইন্‌জেক্‌শান, আইস্‌ব্যাগ—স্টেশন থেকে দু'মণ বরফ পর্যন্ত আনানো হয়েছিল। লোকজন সেবা-শুশ্রূষা—যতদূর হ'তে পারে। তবু কিছুতেই কিছু হলো না। জ্বর নেমে গেল প্রায় চারটের কাছাকাছি, সঙ্গে-সঙ্গে সব গেল নিবে, জল হ'য়ে। দশ ঘন্টার মধ্যেই সব শেষ।

তারপর চিঠিতে খবরের কাগজের ভাষায় অমরেন্দ্র দীর্ঘ এক বিলাপ জুড়ে দিয়েছে। তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই, বাঙলা দেশের আকাশ থেকে একটি উদীয়মান, উজ্জ্বলন্ত নক্ষত্র হঠাৎ খসে পড়ল। তার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্যে তার সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের অবহিত হওয়া উচিত। বাঙলা-সাহিত্যের যা ক্ষতি হল—সে আরেক শোকাবহ, দীর্ঘ বক্তৃতা। অমরেন্দ্রের কারবার এখন ভারি মন্দা, চারদিক দেখতে-শুনতে হচ্ছে, তাই এই দুঃসময়ে মাসিমার সঙ্গে এসে সে দেখা করতে পারছে না। তবে চুনীর জন্যে কোনো মেমোরিয়্যাল ফান্ড তৈরি হলে সে একুনে একশো টাকা দিতে রাজি আছে।

মনে-মনে হাসলুম। চুনী আজ নেহাৎ মরে গেছে বলেই, তোমার ব্যবসার মন্দায়মান অবস্থা সত্ত্বেও, তুমি এক কথায় একশো টাকা দিতে রাজি হয়ে গেলে। কিন্তু যতদিন ও বেঁচে ছিল, ততদিন ভুলেও হয়তো একখানা পোস্টকার্ড খরচ করে ওর খবর নাওনি। বাঙলা-দেশের আকাশ থেকে একটা তারা-ই খসেছে বটে। সে-খবরটাই শুধু পেলে, কিন্তু কখন সেটা উঠেছিল বলতে পারো?

চুনীলালের জীবনের সমস্ত ছবিটি আমার মনে পড়ল। সে সেই জাতের সাহিত্যিক ছিল না যারা পয়সার জন্যে জনসাধারণের মুখ চেয়ে সাহিত্যকে জার্নালিজমের পর্যায়ে নিয়ে আসে। তাতে তার নিজের তৃপ্তি কী হত ছাই কে জানে, পয়সা হত না। এ-পর্যন্ত কেঁদে-ককিয়ে বই লিখেছে সে মোটে পাঁচখানা—তাও প্রকাশকের ফরমায়েসে নয়, নিজের তাগিদে, বই ছাপাতে তার তাই বেগ পেতে হত ভীষণ, জনসাধারণের কথা না বলে সে নিজের কথা বলবে—এই আস্পর্ধার জন্যে তাকে দাম বলে যা নিতে হত সেটাতে তার কাগজ ও কালির দাম উঠে আসত কিনা সন্দেহ। অথচ সে আমার মতো শীতের রোদে ইজিচেয়ারে আধখানা শুয়ে কবিতায় গলে যেতে বসেনি, নেমে এসেছিল সে গদ্যের রূঢ় বন্ধুরতায়। তবু কেন যে সে বেশি লিখছে না, লেখাটাকে [illegible] মতো অর্থোপার্জনের বিদ্যা করে তুলছে না, সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য ছিল। জিগগেস করলে বলত : কী লিখব, কাদের জন্যে লিখব? মূর্খ পাবলিকের বুদ্ধির সমতলতায় সে নেমে আসতে পারে নি, তাই তার উপর ভাড়াটে ছুটো সমালোচকরা প্রসন্ন ছিল না। আর

চুনীলাল লিখেই খালাস, একবার চেয়েও দেখত না বইয়ের সম্পর্কে আর তার কোনো কর্তব্য থাকতে পারে কিনা। বইয়ের কাটতির জন্যে বিজ্ঞাপন লেখার কসরৎও যে সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ, সে বিষয়ে তার অজ্ঞান ছিল অভ্রভেদী। ঘরে-বাইরে এখানে-ওখানে নিজের বইয়ের ঢাক পেটাবার সূক্ষ্ম কৌশলটা এতদিনেও সে আয়ত্ত করতে পারেনি। বন্ধু-বান্ধব ধরে কী করে সভা-সমিতি ডাকানো যায়, কী করে আদায় করা যায় প্রোফেসরদের সার্টি-ফিকেট, কারু কোনো অসংলগ্ন মৌখিক উক্তিকে কেমন ছলনা করে ছাপার অক্ষরে টেনে আনা যায়—সাহিত্য ব্যবসায়ের এ সব প্রাথমিক আবালবৃদ্ধজ্ঞেয় নীতি সম্বন্ধে সে ছিল একে বারে নিশ্ছিদ্র। তবুও তাকে কিনা আসতে হয়েছিল এই সাহিত্যে—এই সাহিত্যিক উপজীবিকায়। নিয়তির সামনে তার পুরুষকার টিকতে পারল না।

চুনীর মৃত্যুর খবরটা পরদিন দৈনিক কাগজে সমারোহে ছাপা হয়ে গেল। আজ আর কেউ চুনীকে প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত নয়—একজন তরুণ বাঙালি সাহিত্যিক অকালে তিরোধান করল খবরের কাগজের দপ্তরে সেটা একটা মস্ত খবর। তার দাম আছে। তার জীবনের না থাক, মৃত্যুর তো বটেই। কোনো-কোনো কাগজ তার উপরে প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত লিখেছে। বাঙলা-ভাষার ক্ষতি কষতে গিয়ে শোকের উৎসাহে বাঙলা ভাষাকে আর তারা কেউ আস্ত রাখে নি।

দৈনিক কাগজ নিবে গিয়ে ক্রমে মাসিক-কাগজের দিন এল। নানা জায়গা থেকে আমার কাছে চিঠি আসতে লাগল চুনীলালের কোনো অপ্রকাশিত লেখা বা ফোটো এনে দিতে পারি কি না। ওদের বাড়ির সেই অন্ধকার গর্ত হাতড়াতে-হাতড়াতে কয়েকটা লেখা বার হল : খুচরো তিনটে গল্প, আর ছেঁড়া-খোঁড়া একটা নাটিকা। মা বাক্স থেকে তার কিশোর-বয়সের সুকুমার একখানি ছবি খুলে দিলেন। চুনীলালের শেষ সম্পত্তিগুলি নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

সম্পাদক দামিনীভূষণ চুনীর জীবদ্দশায় তার উপর প্রায় খড়্গহস্ত ছিলেন। কিন্তু আজ মৃত্যু তার স্মৃতির উপর অপরিম্লান একটি মহিমা এনে দিয়েছে। মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখাচ্ছে তাকে আজ যথার্থ অনুপাতে। আজ তাকে মূল্য দিতে কারু কোনো লোকসান নেই, কেননা সে মূল্য সে আর নিজ হাতে নিতে আসছে না। তাকে প্রশংসা করতে আজ আর কিসের লজ্জা, কিসের ভয়, যখন সে নিঃশেষে মরে গেছে। মৃত্যুর মতো নিশ্চিন্ত আর আছে কি!

পৃষ্ঠায় যে-গল্পটি সব চেয়ে বড়ো দামিনীভূষণ সেটি গ্রহণ করলেন। একবার পড়ে পর্যন্ত দেখলেন না। তার দরকার ছিল না। চুনীলালের লেখাটা তাঁর কাগজে আজ একটা মস্ত বিজ্ঞাপন—সেটা তিনি ব্যবসার চোখে সহজেই ধরতে পেরেছেন। আজ তার লেখা ছাপায় চুনীলালের দরকার নেই— দরকার দামিনীভূষণের। বলা বাহুল্য, প্রায় অর্থনৈতিক নিয়মেই দামটা একটু বেশি

চাইলুম। দামিনীভূষণ এক কথাতেই রাজি, আমার মতের জন্যে অপেক্ষা না করে সটান একটা পঞ্চাশ টাকার চেক কেটে দিলেন। বললেন : ও'র বিপন্ন, দরিদ্র পরিবারের কথা ভেবেই সংখ্যাটা একটু ভদ্র করলুম।

দামিনীভূষণের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চারপাশের কৃপাজীবীর দলও মমতায় দ্রবীভূত হয়ে গেল। একজন গদগদ হ'য়ে বললে—কিন্তু এ-টাকায় বড়ো জোর একমাস চলতে পারে। তারপর? দামিনীবাবুর মতো স্বজনবৎসল লোক তো আর বেশি নেই বাঙলা-দেশে।

বললুম—না, আমরা একটা চুনীলাল-মেমোরিয়াল ফাণ্ড খুলব ভাবছি।

—খুলুন, দামিনীভূষণ সহসা সামনের টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারলেন : একশো বার খোলা উচিত। এই নিন, আমিই দিচ্ছি প্রথম চাঁদা। বলে বুকপকেট থেকে মনি-ব্যাগ খুলে আমার দিকে দশটাকার একটা নোট বাড়িয়ে ধরলেন।

কৃপাজীবীদের কেউ-কেউ করুণ, মৃত্যুম্লান চোখে দামিনীভূষণের দিকে চেয়ে রইল। কেউ-কেউ উল্লাসে ঢলে পড়ে বললো : কী উদার, কী মহান।

চুনীলালের মৃত্যুতে দামিনীভূষণ উদারতার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েছেন বটে। ভাগ্যিস সে মরেছিল, নইলে তাঁকে এমন মহৎ বলে হয়তো আমরা দেখতে পেতুম না।

দামিনীভূষণ আর্দ্র গলায় বললেন,—আমি শেষ পর্যন্ত বিচার করে দেখলুম, চুনীবাবুর লেখা এমন কিছু নিন্দনীয় ছিল না। শুধু কাগজের পলিসির জন্যেই তাঁকে রাইট-য়্যাণ্ড-লেফট গাল দিতে হয়েছে। মানুষ না মরলে তাকে আমরা বুঝতে শিখি না কখনো। কী বলো হে রাজেন?

—আমিও তোমাকে এতদিন এই কথাই বলব-বলব করছিলুম। বাবরি চুলে উদাস একটি ছোকরা গুনগুনিয়ে বলে উঠল।

চুনী নিতান্ত আর বেঁচে নেই বলেই আজ তার এত সৌভাগ্য।

বাকি লেখা দুটোও উঁচু দামে অতি সহজেই বেচে এলুম। এই মহড়ায় থিয়েটার খুব ভালো জমবে মনে করে তার সেই নাটিকাটিও পেশাদার এক থিয়েটার-পার্টি কিনে নিল।

আশ্চর্য, স্বপ্নেও কেউ যা ভাবতে পারিনি। আজ আর তার সমালোচনার কথা উঠতেও পারে না, বেরুতে লাগল কেবল উচ্ছ্বসিত, উলঙ্গ প্রশংসা। দামিনীভূষণের রাজেন সংস্কৃতবহুল গম্ভীর বাঙলায় "সাহিত্যে চুনীলালের বিদ্রোহ" সম্বন্ধে জাঁকালো, প্রকাণ্ড এক প্রবন্ধ বার করলে। (পৃষ্ঠা গুনে সে দাম পাবে অবিশ্যি) তার দেখাদেখি, এটাই নতুনতম ফ্যাশান ভেবে, আর-আর কাগজও সুর মেলাল। চুনীর বইগুলি কাটতে লাগল প্রায় হু-হু শব্দে, ছ'মাসে বইটার প্রায় এডিশন হয়! যে-বইটার সে কপি-রাইট বেচে দিয়েছিল, তার বিক্রয়াধিক্য দেখে প্রকাশক আপনা থেকেই দয়াপরবশ হয়ে কিছু মোটা টাকা চুনীর মায়ের নামে ধরে দিলেন। নাটিকাটাও সেই সঙ্গে জমজমাট হয়ে উঠল।

আজ চুনীলাল নেই। কিন্তু তার বাড়ির অবস্থা এ ক'মাসে বেশ শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকলে শত চেষ্টা, শত সংগ্রাম করেও এ-বাড়ির এক-খানা ইঁট সে খসাতে পারত না। কিন্তু তার তিরোধানের কল্যাণে সবাই উঠে এসেছে এখন ভালো পাড়ায়, ফাঁকা, রোদালো বাড়িতে। চুনীলালের মৃত্যু সমস্ত পরিবারের পক্ষে প্রসন্ন একটি আশীর্বাদ।

আমি তার টাকা-পয়সার তদারক করছি—মেমোরিয়াল ফান্ডটাও আমারই হাতে। বর্ষার নদীর মতো ক্রমশ তা কেবল ফেঁপেই চলেছে—প্রতি সপ্তাহে খবরের কাগজে জমার তালিকাটা দেশের সামনে পেশ করছি। আজ চুনীলালের অনুরাগী ভক্তের আর লেখাজোখা নেই, দূর মফস্বল থেকে অপরিচিততম পাঠক পর্যন্ত তার সাধ্যাতীত দিচ্ছে পাঠিয়ে। যতদিন চুনী-লাল বেঁচে ছিল কেউ তাকে চিনত না, আজ তার মৃত্যু সমস্ত দেশের কাছে একটা অনপচেয় ঐশ্বর্য। জীবনে সে ছিল নির্বাক, নির্বাপিত, কিন্তু মৃত্যুতে সে আজ মুখর, অন্ধকারে সে আজ দীপ্যমান। মৃত্যুই আজ তার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন, শ্রেষ্ঠ রচনা।

তাঁর জন্যে আর আমরা কেউ শোক করছি না।

ফান্ডের টাকাটা দিয়ে চুনীলালের নামে একটা লাইব্রেরি স্থাপনার জল্পনা চলছিল। এই বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে দেশবাসীর একটা মত আহ্বান করেছিলুম, সবাই প্রায় রাজি দেখা গেল। কেউ-কেউ শুধু বললে,—সঙ্গে চুনীলালের একটি প্রস্তরমূর্তিও স্থাপিত করা হোক।

কমিটি থেকে তাই পাশ করিয়ে নিয়ে নিচে একা ঘরে হিসেবের খসড়ার উপর অন্যমনস্কের মতো চোখ বোলাচ্ছিলুম, হঠাৎ দরজার কড়াটা যেন হাওয়ায় নড়ে উঠল।

রাত তখন এগারোটার কাছাকাছি। পাড়াটা নিঝুম। আলো নিবিয়ে এবার শুতে যাব, দরজার উপর আবার কার ভারি হাতের শব্দ হল।

বললুম—খোলা আছে। ধাক্কা দিন।

দরজাটা সজোরে দু' ফাঁক হয়ে খুলে গেল।

চমকে আর্তকন্ঠে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলুম। মুহূর্তে সমস্ত শরীর শুকিয়ে এল। চারদিক থেকে দেয়ালগুলি যেন হেঁটে-হেঁটে সরে এসে আমাকে চেপে ধরেছে। পায়ের নিচে মেঝেটা আর খুঁজে পাচ্ছি না।

লোকটা শব্দ করে চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বলল। হাসিমুখে, পরিচিত স্বাভাবিকতায় বললে,—ভয় পাচ্ছিস কেন? চিনতে পাচ্ছিস না আমাকে?

চাপা গলায় আবার একটা চীৎকার করতে যাচ্ছিলুম, চুনীলাল তেমনি তার প্রবল উচ্ছ্বসিত পৌরুষে অজস্র হেসে উঠল। বললুম: তুই—তুই কোত্থেকে?

—স্বর্গ থেকে বললে বিশেষ নিশ্চিন্ত হবি না নিশ্চয়ই। চুনীলাল

কোটের বোতামগুলি খুলতে-খুলতে বললে, আপাতত লামডিং থেকেই আসছি। কত পেলি? জমলো কত আমার ফাণ্ডে?

তার মুখের উপর রুখে উঠলুম : লামডিং থেকে আসছিস মানে?

—হ্যাঁ, ফাণ্ডের টাকাটা নিয়ে যেতে এসেছি। বেশ একটা ডিসেন্ট সংখ্যা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বলে চুনীলাল আবার শূন্যতা কাঁপিয়ে হেসে উঠল : বেশ পাবলিসিটি করেছিস, প্রসাদ। আমিও তাই আশা করছিলুম। ব্যবসায় বেশ মাথা খুলেছে দেখছি।

চেয়ারের পিঠে ভেঙে পড়ে আবার তার সেই পরিতৃপ্ত আলস্য।

তার হাতটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরলুম। হাড়ময় নীরক্ত হাত নয়, দস্তুরমতো মাংসল, সুস্থ, নধর। বললুম : এ কী ভীষণ কথা? তুই না মরে গেছিস?

—মরেই গেছি তো নিঃশেষে মরে গেছি। চুনীলাল পরিষ্কার, প্রখর দাঁতে আবার হেসে উঠল : আমি তো আর সাহিত্যিক নই, আমি এখন অমরেন্দ্রের কাঠের কারবারে।

১৫। থার্ডক্লাস

'যেমন কেরানিদের কথা বস্ নিয়ে, উকিলদের কথা হাকিম নিয়ে, তেমনি—'

তিলোত্তমার মুখের কথা কেড়ে নিল জয়তী। প্রশ্ন করল : 'তুই উকিলদের কথা জানলি কী করে?'

'ওর বাবা যে উকিল।' তিলোত্তমার সঙ্গে এক মফস্বল শহর থেকে এসেছে, নমিতা বললে।

ব্যাখ্যাটা মোটেই মনঃপূত হল না তিলোত্তমার। সে ঝাঁজিয়ে উঠল : 'কেন, বাবা, উকিল না হলে উকিলদের কথা জানা যেত না? সব কিছুই আমাদের বাবাদের থ্রু দিয়ে জানতে হবে?'

হেসে উঠল মেয়েগুলি। এক ঝাঁকা মুরগি পাখা ঝাপটিয়ে উঠল।

'আমাদের জ্ঞান সব বই পড়ে।' সালিশি করতে এল শর্বরী। জয়তীর দিকে ভ্রূকুটি করে বললে, 'কথাটা ওকে শেষ করতে দে। হ্যাঁ, তেমনি, তেমনি কী—' তিলোত্তমাকে তপ্ত করতে চাইল শর্বরী।

তিলোত্তমা আগের কথার জের টানল : 'তেমনি আমাদের স্নান-করা মেয়েদের কথা—'

আবার মুখের উপর থাবা মারল জয়তী : 'স্নান-করা মেয়ে মানে?'

'আহা, এটুকু বুঝিস না?' শর্বরী হাসতে-হাসতে বললে, 'স্নান করা মানে স্নাতক, মানে গ্র্যাজুয়েট।'

'আমরা গ্র্যাজুয়েট কোথায়!' বললে নমিতা, 'আমরা তো পোস্টগ্র্যাজুয়েট। আমরা স্নাতকোত্তর।'

তার মানে আমরা শুধু স্নান-করা নই, আমরা স্নান করে-সারা।' জয়তী ফোড়ন দিল।

আবার হাসিতে কিলকিল করে উঠল মেয়েগুলো। ধমকে উঠল শর্বরী: 'আহা, কথাটা ওকে শেষ করতে দে না। হ্যাঁ, আমাদের কথা—'

তিলোত্তমা গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমাদের কথা প্রোফেসর নিয়ে।'

'প্রোফেসর নিয়ে মানে কে কেমন পড়ায় তা নিয়ে?' জয়তী ঘাড় বাঁকা করল।

'ওটা গৌরচন্দ্রিকা। তার পরেই ধুলোট।'

'মানে?'

'মানে, কিছুক্ষণ পরেই চরিত্র নিয়ে আলোচনা।'

এমন সময় আরেকটা মেয়ে ঢুকল। কৌতূহলী চোখে জিগগেস করলে, 'কী ডিসকাস্ করছিস রে তোরা? কোন পেপার?'

'কোন চরিত্র?' তক্তপোশের এক কোণে বসল সুমিত্রা : 'শাইলক না হ্যামলেট?'

আরেক পশলা হাসি ঝরাল মেয়েরা।

'কোন চরিত্র নয়, কার চরিত্র!' নমিতা ব্যাখ্যা জুড়ল।

'কার চরিত্র?' কৌতূহলে তীক্ষ্ন হল সুমিত্রা : 'আমাদের?'

'আমাদের কেন হবে?' জয়তী চিড়বিড় করে উঠল : 'আমরা তো অমৃতের প্রতিমা।'

'তবে কার?'

'পুরুষদের। প্রোফেসরদের।' বললে শর্বরী।

'মানে আমরা ছাত্রীরা প্রোফেসরদের চরিত্র নিয়ে কথা বলি।' প্রসঙ্গটা প্রাঞ্জল করল তিলোত্তমা।

'আর চরিত্র মানেই বুঝতে পারছিস দুশ্চরিত্র।' জয়তী বললে।

'আমরা কি কারো ভালো দেখি? আমরা কালো দেখি।' বলেই গান ধরল শর্বরী : 'নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে ভালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে কালো—'

আবার হাসির ঘোলা জল উথলে উঠল। প্রসঙ্গটা ঘুরে যায় বুঝি। ব্যস্ত হয়ে সুমিতা জিগগেস করলে, 'তেমনি কেউ আছে নাকি আমাদের জানাশোনা?'

'বা, আমদের সেকেণ্ড পেপার যাঁর হাতে তিনিই তো একজন আছেন।' বললে তিলোত্তমা।

'তিনি কী করেন?'

'তিনি শুনেছি ছাত্রীদের কাছে প্রেমপত্র লেখেন।'

জয়তী ঝলসে উঠল : 'আর ছাত্রীরা কী করে?'

'তারা তো পরস্পরের কথা জানে না, তারাও লেখে, সাধ্যমত উত্তর দেয়।'

'তবে আর প্রোফেসরের দোষ কী?' জয়তীই বললে।

'না, দোষ কী! তবে মেয়েগুলো যেখানে ধিকিধিকি, প্রোফেসর সেখানে দাউ-দাউ।'

'তা মেয়েগুলো তো পান্তামুখী, তারা জ্বলতেই পারে বলতে পারে না।' বললে শর্বরী, 'তারই জন্যে আগুনের শিখাটা তুলতে পারে না আকাশে, মাটিতে শুয়ে শুয়েই কেবল ধোঁয়ায়, কেবল ধোঁয়ায়—'

'আর ফোর্থ পেপার?' মনে-মনে নোট নিচ্ছে সুমিত্রা, আগ্রহে এগিয়ে এল।

সে কথার উত্তর দিল না তিলোত্তমা। বললে, 'তারপর পত্র-পাওয়া মেয়েগুলোর মধ্যে হঠাৎ কানাকানি শুরু হল—আর কানাকানি থেকেই জানাজানি—মেয়েগুলো পত্র মেলাতে বসল। বসে একেবারে থ হয়ে গেল। একটা আরেকটার হুবহু কার্বন-কপি। যা দুর্গা তাই উমা, তাই পার্বতী, তাই ভগবতী, তাই গৌরী, তাই মহামায়া। মানে এক চিঠিই দফায়-দফায় পাঠিয়েছে অনেককে—'

'যেমন এক বক্তৃতা প্রতি সেসনে প্রতি সেকশনে রিপিট করে, তেমনি এক চিঠিই প্রতি প্রেমিকাকে পাঠায় নকল করে, শরতে-বসন্তে—'

'তা হলে তো ভদ্রলোককে চরিত্রহীন না বলে রসিকোত্তম বলতে হয়।' সার্টিফিকেট দিল জয়তী।

'আর মেয়েগলো—মেয়েদের কথা বোলোনা।' তিলোত্তমা ঘিনঘিন করে উঠল : 'তার পরেও তারা প্রোফেসরের পিছু ছাড়ল না। পোড়া-পাখা পতঙ্গের মত নিরালায়, পরস্পরকে লুকিয়ে ফরফর করতে লাগল।'

'কী করবে!' কন্ঠস্বর কোমল করল সুমিত্রা : 'ফার্স্টক্লাশ পেতে হবে তো।'

'ফার্স্টক্লাশ না অশ্বডিম্ব!' বললে তিলোত্তমা, 'পাশই করতে পারে না তার আবার ক্লাশ। মোটে মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা!'

'তারপর, ফোর্থ পেপার?' উস্কে দিতে চাইল সুমিত্রা।

'ফোর্থ পেপার কিছু জানি না, তবে ফিফথ পেপার শুনেছি, বাগে পেলেই ছাত্রীকে বিয়ে করে।' তিলোত্তমা খিকখিক করে উঠল।

'উদ্ধার করে বল।' নমিতা বললে।

'বিয়ে করার মধ্যে দুশ্চরিত্রতার কী আছে?' এ বাঁকা প্রশ্ন জয়তীর।

'তা নেই, তবে এক স্ত্রী থাকতে আরেকজনের করমর্দনটা অসৌজন্য।'

'যে ছাত্রীটির কর মর্দিত হল সে সম্মত হল কেন?' মুখিয়ে এল জয়তী : 'সে কেন দেখল না এই ব্যাপারে আরেকটি মেয়ের প্রতি, পূর্বতনার প্রতি ঘোর অন্যায় হচ্ছে?'

'তুমিও যেমন।' শর্বরী কষ্টের মত মুখ করে বললে, 'মেয়েদের আবার বিচারশক্তি আছে নাকি? তাদের শুধু নিজের রুটি সেঁকে নেওয়া।'

হস্টেলের মেয়েগুলো মফস্বল থেকে এসেছে অথচ কত খবর রাখে। একে

বারে হাঁড়ির খবর, নাড়ীর খবর। আর সুমিত্রা শহরে থাকে অথচ সে কিনা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে! কে না জানে, প্রদীপের নিচেই অন্ধকার।

কিন্তু না, আর কি নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত হবে? পরীক্ষা তো কাছিয়ে এল।

'তারপর সিকসথ পেপার?' সুমিত্রা ত্রস্তব্যস্ত জিগগেস করল।

'কেন, তোর অত খোঁজে কী দরকার?' তিলোত্তমা রাগ করে উঠল।

'ও বোধহয় ফার্স্টক্লাশ চায়।' নমিতা চিবুকে খাঁজ ফেলে বললে।

'আহা ফার্স্টক্লাশ যেন গাছের ফল!' টিটকিরি দিল সুমিত্রা : 'ও যেন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়।'

'তুই তো ভালো মেয়ে, তোর ভাবনা কী?' বললে আবার তিলোত্তমা।

'আজকাল ভালোমানুষেরই ভাত নেই।' সুমিত্রা মুখখানা করুণ করল।

'তুই তো চৌদ্দ ঘণ্টা পড়িস', হুঙ্কার দিল শর্বরী : 'আরো না নয় ঘণ্টা চারেক বাড়িয়ে দে।'

'আহা, খাটলেই বুঝি ফল মেলে?' দুঃখী মুখে হাসল সুমিত্রা : 'আজ-কাল শুধু কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে না।'

'তা হলে নষ্ট করলে মেলে।' জয়তী আবার আগুন ধরাল।

আবার ছড়িয়ে পড়ল হাসির ফুলঝুরি।

সিকসথ পেপার, ডক্টর ভট্টাচার্যকে চিঠি লিখল সুমিত্রা। প্রেমপত্র বলতে পারো না, প্রশংসাপত্র। কোথায় কোন বিদেশী পত্রিকায় কী এক প্রবন্ধ লিখেছে ভট্টাচার্য, তা খুঁজে বের করে তার উপরে এক স্তুতির সৌধ খাড়া করল। যারা যারা বিরুদ্ধ কথা বলেছিল তাদের ফেলল মাটিতে।

যে প্রশংসা করে সেই যথার্থ লেখে। সেই বোদ্ধা সেই বুদ্ধিমান।

অবাক মানলেন ভট্টাচার্য। এমন গুণী মেয়েও আছে নাকি কলকাতায়?

ভট্টাচার্যও প্রশংসা পাঠালেন সুমিত্রাকে।

সমস্ত প্রেমের সূচনায়ই প্রশংসা।

তারপর হঠাৎ সুমিত্রাই প্রস্তাব করল, একদিন আপনার বাড়িতে যাব দেখা করতে?

এস। আকুল আগ্রহে প্রতিধ্বনিত হল ভট্টাচার্য।

একদিন সন্ধ্যায় সুমিত্রা হাজির হল ভট্টাচার্যের বাড়িতে। 'আমিই সুমিত্রা।'

মাঝারি আকারের ঘর, চারদিকে বইয়ের র‍্যাক, তার মধ্যে তন্ময় হয়ে বসে কী পড়ছেন ভট্টাচার্য, শব্দ শুনে চমকে উঠলেন।

'ও। তুমি?' এক নজর তাকালেন ভট্টাচার্য।

বেশ দেখতে তো মেয়েটা, চোখেমুখে বুদ্ধির শান দেওয়া। কালচে রঙের টান-টান চেহারা, ক্ষণিক যৌবনে উদ্ধত, বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ঝলক আছে। ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে কে লুকিয়ে থাকে বোঝা যায় না। আর ক্লাশে কি কোনো বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায়? ক্লাশের দৃষ্টি বিষয়ে।

'বোসো।'

বাড়ি যখন, তখন অত বিধিবদ্ধ সঙ্কোচের দরকার কী, শৈথিল্যে-আলস্যেই বসল সুমিত্রা। ঔদাসীন্যে উদার হয়ে বসল।

'তুমি আমার ছাত্রী?' যেন নিজেকে প্রায় ধিক্কার দিলেন ভট্টাচার্য : 'কোনো-দিন দেখেছি বলে তো খেয়াল হচ্ছে না।'

'কোনোদিন ভিড় ঠেলে যাইনি কাছে।' চোখে ও চিবুকে লজ্জার রেখা টানল সুমিত্রা।

'কিন্তু এইবার পরীক্ষার ভিড় ঠেলে যেতে হবে এগিয়ে।'

'হ্যাঁ, তার জন্যেই তো আপনার কাছে আসা।'

'আমার কাছে।' একটু যেন বা পিছু হটলেন ডক্টর।

'সিকসথ পেপারটা ভীষণ গোলমেলে।' দিব্যি নিরর্গলের মত বললে সুমিত্রা। 'মনে রাখতে পারা দূরের কথা, বুঝে উঠতেই পারি না। মাঝে মাঝে আপনি যদি একটু পড়ান, দেখিয়ে দেন—'

চিন্তিতমুখে হাসলেন ভট্টাচার্য। বললেন, 'বি-এতে কেমন হয়েছিল?'

'একটা হাই সেকেণ্ড পেয়েছিলাম। কিন্তু এবার আমার অভিলাষ আরো উচ্চ।' নির্ভীক চোখে হাসল সুমিত্রা : 'উচ্চতর।'

'সে তো খুব ভালো কথা।' ভট্টাচার্য উচ্ছ্বসিত হলেন : 'সব সময়ে সূর্যকে তাক করবে, তা হলেই পৌঁছুবে পর্বতের চূড়ায়। পর্বতের চূড়া তাক করলে পৌঁছুবে গাছের মাথায়। কিন্তু গাছের মাথা তাক করলে কোথাও পৌঁছুনো নেই, পড়ে থাকবে মাটিতে।'

'আমি সূর্যকেই তাক করেছি।'

যেন ভট্টাচার্যই চোখ সরিয়ে নিলেন : 'কী রকম পড়ছ?'

'পড়ছি তো প্রাণপণ। কিন্তু, দেখছেনই তো, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে. প্রোফেসর রাখতে পারছি না মাইনে দিয়ে। অত দামী-দামী বই কেনবারও পয়সা নেই। এক যা লাইব্রেরি ভরসা। সেখানে যে দিন কাটাব সে সুবিধেও দেবে না সংসার—'

'সংসার মানে?'

'মানে মা-বাবার সংসার। অনেকগুলি ভাইবোন। আমি সবার বড়। সবাই আমার দিকে চেয়ে আছে।'

'তোমার দিকে!'

'আমার মুখের দিকে।' উন্মুখ ফুলের মত মুখখানি তুলে ধরল সুমিত্রা। বললে, 'এ বছরেই বাবা রিটায়ার করবেন। তাই আমার না দাঁড়ালেই নয়। সামান্য মাইনের একটা ইস্কুল মাস্টারি করব এ আমার পোষাবে না। সংসার বাঁচবে না। আমি বড় হব। কোনো ফার্মে-টার্মে চাকরি না পাই অন্তত কলেজের প্রোফেসর হব। গোড়াতেই আমার একটা শাঁসালো মাইনে দরকার। তাই ফার্স্টক্লাশ আমাকে পেতেই হবে।'

কী সতেজ সরলতায় কথা বলছে মেয়েটা। ভট্টাচার্য আমতা-আমতা করতে

লাগলেন। বললেন, 'তা ভালো করে, বেশি করে পড়ো—আর, আর কী বলব, ভগবানকে ডাকো।'

সুন্দর দাঁত দেখিয়ে হাসল সুমিত্রা। বললে, 'কোনোটাই হচ্ছে না।'

'হচ্ছে না?'

'না, বলেছিই তো, ভালো করে পড়ার, বেশি করে পড়ার সুবিধে নেই, আর, ও কী নাম করলেন, কিছু বুঝি-সুঝি না। একেক সময় ভাবি, ভগবান কি মানুষের ভুল, না, মানুষই ভগবানের ভুল!'

'হোক ভুল, তবু এ ভুল মানুষের প্রয়োজন। যেমন ধরো কবিতা। যেমন ধরো গান।'

'না, ভুল নয়, আপনি—আপনারা—আপনিই আমার ভগবান।' সামনে টেবিলের উপর হাত রাখল সুমিত্রা।

যেন বা একটু ভয় পেলেন ডক্টর। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি তো টিউশানি করি না।'

'কি আশ্চর্য, আপনাকে টিউটর রাখব এ আমার সংগতি কোথায়?' নিঃস্বের মত মুখ করল সুমিত্রা : 'যদি মাঝে-সাঝে আসি আপনার কাছে, দু-একটা পড়া-টড়া জেনে নিই, দু-একটা প্রবলেম—'

একেবারে না বলতে কেমন মায়া হল ডক্টরের। বললেন, 'তা এস। কিন্তু জানো তো প্রায়ই আমার অন্য কাজ থাকে, আমি ব্যস্ত থাকি—'

'তখন আপনাকে নিশ্চয়ই ডিস্টার্ব করব না। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে যাব এখানে। চারিদিকে বই, মনে হবে যেন মন্দিরে বসে আছি। ভগবান না পাই, মন্দির তো পাব। খানিকক্ষণ বসে পড়তে পারব তো চুপচাপ।'

উঠে দাঁড়াল সুমিত্রা। নিষ্কলঙ্ক ঋজুতায় ঝলমল করতে লাগল।

'তোমার কি কোনো ডাক-নাম আছে?'

'আছে।'

'কী?'

'কণা।'

'কিসের কণা? অমৃতের কণা, না, আগুনের কণা?' হাসলেন প্রফেসর।

'আগুনের কণা।' হাসল সুমিত্রা : 'আগুন না হলে অমৃত তৈরি হয় কী করে?'

'কী সুন্দর তোমার এই য়্যামবিশন!' সপ্রশংস চোখে তাকালেন ডক্টর : 'যার স্পর্ধা আছে, সাহস আছে, ভাগ্য তার উপর প্রসন্ন হবেই।'

'আপনি—আপনারা—আপনি যদি প্রসন্ন হন, তা হলেই ভাগ্য বলে মানব। আচ্ছা, আসি।' নত হয়ে পায়ের ধুলো নিল সুমিত্রা।

আর চলে গেলে হঠাৎ ভট্টাচার্যের মনে হল কাকে বলে শূন্য হয়ে যাওয়া।

দুচার দিন দেখেছে ছেলেটাকে, একটু-আধটু আলাপও হয়েছে, কিন্তু আজ একেবারে সশরীরে পথ আটকাল। বললে, 'বাবা বাড়ি নেই।'

তবুও লাইব্রেরি ঘরের দিকে এগুলো সুমিত্রা।

'কী, বসবেন? কিন্তু ও-ঘরটা বন্ধ। এদিকে আমার ঘরে এসে বসুন।' ছেলেটা পথ দেখাল : 'আমার ঘরে বসলে আপনাকে শোক করতে হবে না। আসুন। আমার নাম অশোক।'

মন্দ কী! দেখে যাই না খানিক বসে। উচ্চাশা পূরণের সুরাহা কিছু হয় কিনা।

'মৃত বইয়ের চেয়ে একটা জ্যান্ত লোককে আপনি বেশি দামী মনে করেন না?'

'কিন্তু কখনো-কখনো জ্যান্ত লোক মৃত বইয়ের চেয়েও মৃত।' হাসল সুমিত্রা।

'তা ঠিক। কিন্তু সে সব লোক হয় কবি, নয় দার্শনিক, নয় প্রোফেসর। কিন্তু আমরা যারা এঞ্জিনিয়র, যারা বেশি লেখাপড়া করিনি—'

'আপনি এঞ্জিনিয়র! প্রশংসমান বিস্ময়ে চোখ নাচাল সুমিত্রা।

'লেখাপড়া বেশি করিনি। ঐ আই-এসসি পর্যন্ত! তারপর সব হাতেনাতে কাজ—'

'বা, এঞ্জিনিয়ারি পাশ করেছেন তো?'

'তা করেছি। কিন্তু লেখাপড়া ঐ আই-এসসি পর্যন্ত। বাকিটা শুধু আঁক কষা, ছবি আঁকা আর হাতুড়ি মারা। ও কিছু নয়। ওকি, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।'

সুমিত্রা বসল। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়েছেন তো।'

'হ্যাঁ, জ্যান্ত মানুষ। সমস্ত কলকব্জা চলছে এমনি একটা কারখানায় বাস করছি, সর্বক্ষণ জীবনটাকে এমনি অনুভব করছি।' মুখোমুখি সোফায় অশোক বসল। 'কী, আমাকে একটা মৃত বইয়ের চাইতেও পাণ্ডুর মনে করবেন?'

'না, না, কখনো না।' মদির চোখ তুলল সুমিত্রা : 'কী করছেন এখন?'

'একটা জার্মান ফ্যাক্টরিতে কাজ করছি। মাইনেপত্র ভালোই। তা ছাড়া ওরাই হয়তো শিগগির পাঠাবে ফরেনে।' বুকটা একটু প্রশস্ত করল অশোক।

'তবে আর কি চাই! কী হবে লেখাপড়ায়?' সুমিত্রা মুগ্ধের মত বললে।

'তবে আপনি অত কষ্ট করছেন কেন? বি-এ পাশ করেছেন, যথেষ্ট। এখন যা করবার করে ফেলুন। মিছিমিছি কেন নিজেকে ক্লান্ত করছেন, রুক্ষ করছেন?'

'বা, বড় হবনা?'

'মার্জনা করবেন, মেয়েরা তো বড় হবে শুধু আয়তনে।'

'আজ্ঞে না। মেয়েরা বড় হবে দৈর্ঘ্যে, দীপ্তিতে, গরিমায়।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই এঞ্জিনিয়ারি—'

'এঞ্জিনিয়ারি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই হাতে নাতে কাজ।' অশোক দু হাত নেড়ে বোঝাতে লাগল : 'সেই রান্নাবান্না, বাসনমাজা, কুটনোকোটা, মশলাপেষা—'

'আপনার যিনি স্ত্রী হবেন', ঝাঁকরে উঠল সুমিত্রা : 'তাঁকে এই সব কষ্ট সহ্য করতে হবে নাকি?'

'হয়তো নয়, হয়তো অন্য যন্ত্র এসে তাঁকে উপশম দেবে, কিন্তু এমন এক যন্ত্রণা আছে যার থেকে কোনো যন্ত্র তাঁকে উদ্ধার করতে পারবে না, তিনিও চানও না উদ্ধার। সেই যন্ত্রণার যন্ত্রী, এঞ্জিনিয়র বলুন বা আর্কিটেক্ট বলুন—তিনিই। সুতরাং সেই যন্ত্রণাই যখন শেষ কাম্য—না, কিংবা বলব, আদি কাম্য—তখন মিছিমিছি আর এসব বাজে যন্ত্রণা কেন?' অশোক উঠে গিয়ে আরেকটা সোফায় বসল।

অনড় হয়ে ভাবতে লাগল সুমিত্রা।

'এম-এ পাশ করে আপনার কী হবে?' আবার চঞ্চল হল অশোক : 'আপনর গায়ে লেগে থাকবে?'

বিস্তৃত রেখায় হাসল সুমিত্রা! রহস্যঘন চোখে বললে, 'কিন্তু ফার্স্টক্লাশটা লেগে থাকবে। দিন চলে যাবে কিন্তু কথা থেকে যাবে। সেটা কি কম কথা?'

'আপনি ফার্স্টক্লাশ পাবেন?'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী!' আবার হাসল সুমিত্রা : 'কোনো নদীই অপার নয়।'

'বেশ ফার্স্টক্লাশ পেয়েই বা কী হবে আপনার? সেই কান্না, সেই যন্ত্রণা তো থাকবেই—'

'সেটা আর্তনাদ না জয়নাদ তা কী করে বলি!'

'বলতে চান, ফার্স্টক্লাশ পাবার পর আপনি আর সংসারিই করবেন না?'

'বা, তা কেন করব না? তা কে বলেছে?'

'তবে চলুন, আমার একটা স্কুটার আছে, সেটায় করে দুজনে বেড়িয়ে আসি।' লাফিয়ে উঠল অশোক।

তীক্ষ্ন এক মুহূর্তে সুতীব্র ভাবে ভাবল সুমিত্রা। কোন ঘরে বেশি আশা!

'স্কুটার! ওরে বাবা,' সুমিত্রা পাংশুমুখে বললে, 'কোনোদিন চড়িনি। পড়ে যাব।'

'মোটেই না। ধরবার জায়গা আছে। যদি বেশি ভয় হয় আমাকে ধরবেন।' হাত বাড়িয়ে দিল অশোক।

তার মানে, এমনিই পড়ে যাবে না, ও ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে পথে—পথের ধারে।

'তার চেয়ে যদি একটা ট্যাক্সি নেন—'

'ট্যাক্সি? ও তো বালকেরা চড়ে, অথর্বেরা চড়ে। চলুন না হু-হু করে বেরিয়ে যাই—নির্জনে, গঙ্গার পার ধরে, নয়তো কোনো হোটেলে—'

তাতে কি ফার্স্টক্লাশ হবে? যে আকাশের তারাকে ঘুড়ি করে উড়িয়েছে সে কি সুতোর টানে নেমে আসবে মাটিতে? না কি ভোকাট্টা? দুই চোখে মিনতি পুরল সুমিত্রা। বললে, 'শরীর খারাপ। বুঝতেই পাচ্ছেন—'

'তা হলে আজ থাক।'

তারপর একদিন বিকেলে বেরুবার মুখে ভট্টাচার্যকে ধরল সুমিত্রা।

'আমি এখন বাইরে বেরুচ্ছি।' সবিনয়ে বললেন ভট্টাচার্য।

'কিন্তু এক মিনিট। একটা জরুরি বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই। পড়াশোনার ব্যাপার নয়, জীবনমরণ সমস্যা।'

'কেন কী হয়েছে?'

'একটা যুবক আমার পিছু নিয়েছে।' সুমিতার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ।

'কেন, কী চায়?'

'এখন কী চায় জানি না, পরে বিয়ে করতে চায়।'

'চাকরিবাকরি করে কিছু?'

'তা করে। তিনশো টাকার মতন হবে হয়তো।'

'ছোঃ। ওতে কী হবে?'

'আমাকে ঐ টাকাটাই বা কে দেয়!'

'তার মানে তুমি ঐ ওটাকে বিয়ে করবে নাকি?'

'করতে পেলে মন্দ কী!' সুমিত্রা বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলল : 'এসব ঝামেলা থেকে ছাড়ান পাই তা হলে। শেষপর্যন্ত তো সেই কাঁথাশিল্প, রন্ধনশিল্প—'

'সে কী?' যেন এক প্রবল ধাক্কা খেলেন ভট্টাচার্য : 'তুমি বড় হবে না? এম-এ হবে না? ফার্স্টক্লাশ নেবে না?'

চকোলেট মুখে আদুরে গলায় সুমিত্রা বললে, 'সে কি আমি পাব?'

'কেন পাবে না? আমি তবে আছি কী করতে?' ভঙ্গিমায় দৃঢ়তা ফোটালেন ভট্টাচার্য : 'ততদিন, পরীক্ষার রেজাল্ট না বেরুনো পর্যন্ত, ওসব হাঙ্গামা স্থগিত রাখো।'

'কিন্তু সে ভদ্রলোক স্থির থাকতে চায় না।'

'অনেক ভদ্রলোকই স্থির থাকতে চাইবে না,' ভট্টাচার্য বদান্য দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করলেন সুমিত্রাকে, 'কিন্তু তুমি শিল্পী, তুমি স্থির থাকবে। তুমি ধরা দেবে না।'

'আমি ধরা না দিলে কী হবে, সে বারে বারে ধরতে চাইবে।'

'তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি ক্যানিউটের মত ঢেউকে শাসন করবে, বলবে, এই পর্যন্ত, আর নয়।'

'কিন্তু এত যেখানে ব্যাকুলতা সেখানে প্রশ্রয় তো একটু দিতে হয়।'

'তা একটু দিতে হয়,' যেন অনেক বিবেচনা করে বললেন ভট্টাচার্য : 'একেবারে নিষ্ঠুরই বা কী করে হতে পারো। তবে ঐ যে বললাম, দাস্ ফার য়্যান্ড নো ফারদার। মানে, বড়জোর অর্ধাঙ্গিনী হতে পারো, তার বেশি নয়।'

খিল খিল করে হেসে উঠল সুমিত্রা। বললে, 'অর্ধাঙ্গিনী হলে তো হয়েই গেল।'

'অর্ধাঙ্গিনী মানে, আই মিন, উধর্বাঙ্গিনী।' ভট্টাচার্যও হাসলেন।

'কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন স্যার—' রূপের বৃষ্টি ঝরিয়ে উঠে পড়ল সুমিত্রা।

'হ্যাঁ, চলো, ঘরের ভিতরটা বড্ড গুমোট।'

পায়ে হেঁটে ফাঁকায় একটু বেড়াবেন ভেবেছিলেন, সুমিত্রা হঠাৎ একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে অভ্যর্থনা করল।

সুমিত্রার পাশটিতে উঠে বসতে আপত্তি করলেন না ভটচায।

বসেই বললেন, 'এটা কী রকম ট্যাক্সি? বেবি ট্যাক্সিই তো জানতাম—'

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বললে, 'এটা লিটল বেবি।'

আবার হস্টেলের মেয়ের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে সুমিত্রা।

'গায়ে গা লাগিয়ে ট্যাক্সিতে কার সঙ্গে যাচ্ছিলি রে সেদিন?' সুচিমুখে প্রশ্ন করল তিলোত্তমা।

'সে কী! আমি কোথায়!' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল সুমিত্রা।

'আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না।' তিলোত্তমা বললে, 'আমার সঙ্গে জয়তীও ছিল।'

'আমি ভাই স্পষ্ট কিছু দেখিনি।' বললে জয়তী, তাকাল তিলোত্তমার দিকে : 'তা গায়ে গা লাগলে কী হয়?'

'ক্ষয়ে যায়? ধ্বসে যায়?' ঝাঁকরে উঠল শর্বরী।

'বাস-এ ট্রামে লাগাস না?' বললে নমিতা, 'তারপরেও তো আস্ত-সুস্থই থাকিস।'

'হ্যাঁ, দাস্ ফার্ য়্যান্ড নো ফারদার।' মৃদু মৃদু হাসল সুমিত্রা : 'চোখের কাজল গালে না লাগলেই হল।'

'মানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দোষ নেই, সুগম হলেই সর্বনাশ।' বললে জয়তী।

হাসির উত্তাল ঢেউ তুলল মেয়েগুলো।

'বলনা ঐ লোকটা কে।' কৌতুহলের চেয়েও কাকুতি বেশি নমিতার।

'সেই এঞ্জিনিয়র ছেলেটা, যে বলেছিলি তোর পিছু নিয়েছে?' তিলোত্তমা সুমিত্রার হাঁটু ধরে ঝাঁকুনি দিল।

'না, সে নয়, তার বাবা।' নির্দ্বিধায় বললে সুমিত্রা।

'তার মানে, প্রোফেসর—'

একটা বুঝি বোমা পড়ল ঘরের মধ্যে।

'মানে, তুই এমনি করে নাইনথ পেপার করছিস?' শর্বরী চেঁচিয়ে উঠল।

'শুধু একটা ফার্স্টক্লাশের জন্যে?' চেঁচিয়ে উঠল নমিতা।

'পারলে কেন করবে না? জয়তী শান্তস্বরে বললে, 'ফার্স্টক্লাশটা কি কম?'

'ওটা বড় হবার দ্বার।' নিপুণ রেখায় হাসল সুমিত্রা। বললে, 'আর ওসব কিছুই গায়ে লেগে থাকবে না, ফার্স্টক্লাশটাই লেগে থাকবে।'

যথারীতি পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাশ পেল সুমিত্রা।

ডক্টর ভট্টাচার্যকে প্রণাম করতে এসেছিল, শুনল বাড়ি নেই।

অশোক আবার পথ আটকাল।

'এবার তো ফার্স্টক্লাশ পেলেন, এবার তবে সংসারিতে নেমে আসুন।'

ছেলেটার প্রতি যেন বাৎসল্য জাগল সুমিত্রার। বললে, 'লোকে ফার্স্টক্লাশ পায় কি নামবার জন্যে, না আরো ওঠবার জন্যে?'

'কিন্তু তুমি তখন বলেছিলে—'

'তখন তো কত কথাই বলেছিলাম, বলতে হয়েছিল।' কথা তো নয় আগুনের কণা ছিটোতে লাগল সুমিত্রা : 'কিন্তু তুমি কি আমার যোগ্য? তুমি তো মোটে আই-এসসি পাশ, অর্ধশিক্ষিত। একটা জ্ঞানীগুণী প্রোফেসর হতে, তবু না হয় একটা কথা ছিল। তুমি তো একটা মিস্ত্রি—থার্ডক্লাশ।'

জ্বলতে-জ্বলতে বেরিয়ে গেল সুমিত্রা।

১৬। ধান

'ও কে? ওর নাম কি?'

খাতা লিখছিল সরকার। বট দত্ত। চোখ তুলে বললে, 'লাহিরি সেখ।'

মরাটে চেহারা। ছেঁড়া ধুকড়ি পরনে। এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন প্রাণটা টিমটিম্ করছে।

'জমি আছে ক বিঘে?' দাবায় বসে হুঁকা খাচ্ছে মহাজন। যোগেশ সিঙ্গি। হাঁকার দিয়ে উঠল।

লাগানি-ভাঙানির দল আছে কাছে-ভিতেয়। বললে, 'এক ধুলও জমি নেই হুজুর। সব বিবিকে হেবা করে দিয়েছে।'

'তবে হবে না।' সরকার লাহিরিকে সরিয়ে দিল হাতের হাওয়ায়।

লাহিরি কুকুরের গলায় কঁকিয়ে উঠল। সে আর তার পরিবার কি আলাদা?

নির্দিষ্ট তারিখ নেই মরবার, কেউ মাথা-মরুব্বি নেই সংসারে, তাই আগুতেই জমি লিখে দিয়েছে। দেনমোহরের দায়ে। তাই বলে পরিবার কি তাকে পথে বসাবে? না, ধানের কর্জ শোধ দেবেনা ওয়াদামত? অভাবী বলে কি তারা এত অধার্মিক?

কচাল-কচকচি করিসনে। যা, পরিবারকে নিয়ে আয়। সে এসে মোকাবিলা করে দিক। দাদন হবে তার নামে। খাতকের ঘরে উঠবে তার নাম।

'তার বড় অসুখ।'

চলবে না ওসব টালবাহানা। আর, দলিল বেঁধে আনতে বলিস আঁচলে। দাগ-খতিয়ান মিলিয়ে নেব।

সত্যি বলছি, জ্বরে-জ্বরে সে জেরবার হয়ে গেছে। বলতে-চলতে পারে না। বাতাসে হেলছে এমনি রোগা।

রাখ ওসব ছল-অছিলা। যার ধানী জমি আছে সেই পাবে ধান।

বড় অভাব পড়ে গিয়েছে দেশ-গাঁয়ে। খাই-খোরাকের অভাব। ভাদ্র মাসেই ভাত নেই।

হাঁটিয়ে-বসিয়ে টানা-হেঁচড়া করে বহু কষ্টে নিয়ে এসেছে মোহরজানকে। এই দেখ দলিল। মুখস্ত দান নয় আমাদের। খুঁত-টুট নেই। মিথ্যে বলিনি। হাত বদল হয়নি, আর দায়সংযোগ করিনি কোথাও।

'তা হলে ধান কিন্তু তুমি নিচ্ছ, তোমার খসম নয়।'

'হ্যাঁ, আমি লিচ্ছি।' ছেঁড়া শাড়িতে আব্রু ঢাকা, বললে মোহরজান।

'শোধ না দিলে তুমি দায়ী হবে। তোমার জমি দায়ী হবে।'

'হব।'

'ক ধামা নেবে?'

'তিরিশ ধামা।'

ধান দাদন হচ্ছে। শতকরা পঞ্চাশ ধামা সুদ। মানে একশো নিলে লাগনা হবে দেড়শো। বেড়ে যাবে দেড়ে। নাম হল দেড়িবাড়ি। ধামার মাপ তিন সের।

খাতায় একটি মবলগবন্দি করে নাও। আঙুলের মাথায় কালির ধাবড়া। কাটান-ছিঁড়েন নেই।

না থাক। যতই কড়াক্কড়ি হোক, এখন তো বাঁচল। এখনই তো উড়ে-ঝরে নস্যাৎ হয়ে গেল না। স্বামী-স্ত্রীতে দোয়া করতে লাগল মহাজনকে। নিজেদের ক্ষুধার তাড়নায় বুঝতে চাইল না মহাজনের ক্ষুধা। যাতে পউষে ফলন ধরে অজস্র, মহাজনের দেনা শোধ করে দিতে পারে, তারই আরজ জানায়।

তারপর দেশে লাইসেনির আইন এল। ধান-দাদনেও লাইসেনি লাগে।

'বড় ধরাকাট। বড় খিটকেল। অত বাঁধাবাঁধিতে যেতে পারব না বাপু। যেমন কলি তেমনি চলি।

'ও কে? ওর নাম কি?'

'ওর নাম কান্তি পন্ধান। দেশে-গাঁয়ে মামলার তদবির করে বেড়ায়। অবস্থা পড়ে গেছে আজকাল।'

'জমি নেই?' লোভাক্তে চোখে জিগগেস করলে মহাজন।

ছামুতেই আছে সব লাগানি-ভাঙানির দল। বললে, 'হিজলের মাঠে জমি আছে তিন বিঘে। জলা জমি।'

হোক জলা, সেই তিন বিঘের জমিই তবে দিতে হবে। হ্যাঁ, সরাসর বিক্রি। মাঠে বাজার যা চলছে সেই দরেই কিনে নেবে। বলি, ধান চাই কতটা?

নিদেন আট বিশ। কুড়ি মই। পোষ্য-পাল্য অনেক।

জমির ঠিকানা কি? খতেন-পরচা দেখাও।

জমিটাকে জন্মের মত ছেড়ে দিতে হবে শুনে কান্তির বুকের মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়ল। খাটতে পারা অবধি সেই, জমিতেই সে চাষ করছে, তা ছেড়ে দেয়া মানে এক রাতের মধ্যেই পাহাড় ধোসে পড়া। হাত জোড় করে বললে,

'গোড়াগড়িতেই না কাঙাল হয়ে যাই হুজুর। একটা ফাঁক-ফিকির কোথাও রাখুন যাতে জমিটা বজায় থাকে।'

তবে, বেশ, শাদা স্ট্যাম্প-কাগজের কানিতে সই করে দাও। দুসিটে দেড় টাকা করে স্ট্যাম্প। ওয়াদামত সুদসমেত ধান যদি না ফেরৎ পাই ঐ কাগজ আমি কবালায় বদলে নেব।

'আর যদি ফেরৎ দিই?'

'তোমার দস্তখতী শাদা স্ট্যাম্প-কাগজ ছিঁড়ে ফেলব কুটি-কুটি করে।'

কান্তি হাঁপ ছাড়ল। একটুকু আশা! একটুকু আয়ু! জমিটা তার বজায় থাকবে, বরবাদে যবে না। মানী খানদানী লোক, ধান ফেরৎ পেলে জমি নিশ্চয় আর তনছট করবেনা। আলেখা দলিল নষ্ট করে ফেলবে।

কিন্তু ধান যদি ফেরৎ দিতে না পারে?

যখনকার কথা যখন। এখন তো ঘরগুষ্টি তার বাঁচল; অভাব-অভিযোগে ফৌত হয়ে গেল না। এখন তো কটা দিন হাওলাত-বরাতের থেকে রেহাই পাক। কান্তিও মহাজনকে আশীর্বাদ করলে।

তারপর দেশকে লক্ষ্মীছাড়ায় পেলে একদিন।

'কোথায় চললে হে বরকৎ?' বাগেশ্বর গনাই ডাক দিলে পাছু থেকে।

'পোদ্দারের গদিতে।'

'সেখানে কি?'

'আর সেখানে কি! সোনা-রুপো আছে কতক, বাঁধা থুবো।'

ট্যারা পোদ্দার ভারি ফিকিরবাজ। কালে-কস্মিনেও ছাড়ান দেবেনা। ময়াল সাপের মত গিলে ফেলবে। গোড়ায়-গোড়ায় হবে-হচ্ছে করবে, পরে একেবারে ন্যাকা সাজবে। বলবে, কিসের গয়না কিসের কি! খাতা কাগজের ধার ধারবেনা।

'যে ডাল ধরি সে ডালই ভেঙে পড়ে। কি করব মশায়?'

'জমি নেই? এক-আধ কেতা তাই বিচে দাও ক্যানে?'

বরকৎ যেন ঘা খেল বুকের মধ্যে! বললে, 'জমি পাশার শেষ দান। ঘটি-ঘড়া কাঁস-পেতল গেছে, এখন সোনা-রুপো। শেষ তাকাৎ জমি। আগে পেক-ফ্যাকড়া, শেষকালে শেকড়।' যত দিন পারে জমির গায়ে হাত দেবেনা। যত দিন পারে গায়ের আঁচল করে রেখে দেবে জড়িয়ে।

কিন্তু পারল কই? একধার থেকে জমি বেচা সুরু হয়ে গেল। গোডহর-গোচর-ভাগাড় পতিত-পুকুর পুকুর-পাহাড় কিছুই আর বাকি রইল না।

গাঁ-ঘরকে বাঁচালে যোগেশ সিং। ধান দিয়ে জমি কিনে কিনে। ঠকঠকে জমি দিয়ে কী হবে যদি সমূহ খেতে না পায় দু মুঠো? টাকার তারা কেউ যাচনদার নয়, সবাই ভাতের কাঙাল।

জমি তাই সস্তা হয়ে গেল মাটির মত। ধুলোর মত।

কিন্তু এবারো, সবাই বললে ঐ এক কথা। বললে, 'সিঙ্গি মশাই আমাদের ধম্ম রাখলেন। ছোট লোকের মরদ আমরা, আর কিছু না বুঝি, ধম্ম বুঝি।'

তবু দেশে আইন এল বিপরীত। জমি-ফেরস্তের আইন। ইংরেজের হুল কী? রাজ্যপাট লোপাট হবার দাখিল নাকি? নইলে বলে কিনা আকালের বছরে পেটের দায়ে আড়াইশো টাকার কম পণে যারা জমি বেচেছে তাদেরকে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে! লম্বা, বছরে কিস্তিতে উশুল পাবে মহাজন! চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে শুরু করে কোথায় আজ ঠেকেছে তারা, কোন আঘাটায়! কে জানত এমন হবে! আগে আভাস পেলে নগদ আদান-প্রদান যাই হোক, কবালায় পণ লিখত তিন শো টাকার কম নয়।

উপায় নেই। যোগেশ সিঙ্গির হাত থেকে টুকরো জমি বেরিয়ে গেল অনেকগুলি। পেটের দায়ে নয়, লটকানা দোকান করতে বা মাটকোঠা তুলতে ধার নিয়েছিল এ জাতীয় সাফাই গেয়ে সে আদালতে জবাব দিলেনা। কোনো কারকোপ না করেই জমি সে ফিরিয়ে দিলে। গাং পার হয়ে কুমীরকে ওরা কলা দেখাল বলে রাগ করল না। ভগবান যদি দিন দেয় আবার আসবে। শুধু-শুধু উকিলকে দিয়ে লাভ কি!

'মহাজনের মত ব্যাভার করে বলেই তো সে মহাজন।' সুখ্যাতি করে বলে পাঁচকড়ি সেখ। 'সিঙ্গি মশাই কেদের বাঁটে হরিণ মারেন না।'

আইনই বদলাচ্ছে। কিন্তু মানুষ বদলাচ্ছে কই?

তাই জমি ফেরৎ পেয়েও কতদূর যাবে চাষাভুষোরা? পুঁটির পরাণ কতক্ষণ? ডুলির কড়িতে কবে একদিন বিবি বিকিয়ে দেবে।

যোগেশ সিঙ্গি ধান এবার মজুত করবে। ধার না দিয়ে তেজী বাজারে বিক্রি করবে নগদ টাকায়। তাইতেই হাঙ্গামা কম। হাতে-হাতে কারবার। রয়ে-সয়ে ব্যবস্থা। আর দাদনি-মহাজনি নয়। ঢের শিক্ষা হয়েছে যোগেশ সিঙ্গির। বলে, শিখছ কোথা, ঠেকছ যেথা।

পাকা গাঁথনির উপর যোগেশ সিঙ্গির দু-দুটো পেল্লায় হামার। এক-এক হামারে প্রায় পাঁচ শো মণ গাদি করা। মাথার দিকে দরজা। মই না হলে নাগাল পাওয়া যায় না। দরজায় তালা মারা। যাতে ইঁদুরে না নষ্ট করতে পারে তারি জন্যে ধানের উপর ধারালো শরঘাস বিছানো।

সব থাকবে মজুত হয়ে, নিটুট হয়ে। দরের যখন তেজ হবে তখন ছাড়বে আস্তে আস্তে। তার আগে নয়।

চাষী-প্রজারা চেয়ে থাকে হামারের দিকে। চেয়ে থাকলে কী হবে, আর ধার কর্জ নয়, কবালা-কটকবালা নয়, স্রেফ সাফ বিক্রি। জমি-টমি নয়, সিধে ধান। ঘুরিস-ফিরিস কী এদিক-ওদিক? তোদেরই ধান তোরাই খাবি। আমি শুধু তোদের জিম্মাদার। তাই বাজার বুঝে নগদ টাকা নিয়ে আয়। কর্জ নিবি তো আরেক জনের ঠেঁয়ে নে গে। জমি বেচবি তো অন্য মহাজন ধর। আমি এবার নগদ টাকার বেপারী। অনেক গপচা দিয়েছি, আর নয়।

'অবিনাশ বায়েন বড্ড কান্নাকাটি করছিল। বিচব নাকি?' বট দত্ত জিগগেস করলে।

'দর কত এখন?'
'সাত টাকা।'
'ভাদ্র আশ্বিন পড়ুক। এখুনি তাড়াহুড়ো কেন? ওদের যত বেশি খিদে ধরবে ততই তো দরের তেজ বাড়বে। তাই না?'
ছালা টানে, মুনিষ খাটে, কিরষানি করে, গাড়ি বয় আর হামারের দিকে তাকায় লম্বা চোখে। ওই হামারের মধ্যে ধান, যেমন নারীর বসনের মধ্যে যৈবন।
সবাই ওরা ঠিক করেছিল ধর্মগোলা করবে। ক্ষেতপিছু ধান ধরে, ফলন বুঝে। বাকার করে বেঁধে রাখবে ধান। অভাবের দিনে শস্তায় কর্জ পাবে সবাই, পাবে লম্বা মেয়াদ। নিজেদের ব্যাপার, তাই এতে ফিকির-ফন্দির কথা নেই। কিন্তু কেউ কাউকে বিশ্বাস করল না।
এখন ধানের জন্যে তুফানে পড়েছে সবাই।
'এবার ছাড়ব নাকি কিছু?' বট দত্ত উসখুস করতে থাকে : 'তিন চারজন এসেছে এবার।'
'দর কত এখন?'
'সাত টাকা ছ আনা।'
'আরো দুটো দিন যাক।'
'এর পর হলে লোক বাড়তে থাকবে। তিন-চার থেকে দশ-বারো, দশ বারো থেকে—' বট দত্ত গলা নামায়।
'যতই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, গোলা লুট করবেনা। যে ডালে বসে আছে সেই ডাল কাটবেনা কখনো। ভুখা কি দুই হাতে খায়? বাজারে আরো টান ধরুক।'
কিন্তু এমনি সময় সরকারী রুবকারি এসে হাজির। যোগেশ সিঙ্গিকে সাতশো মণ ধান দিতে হবে। বলা নেই, কওয়া নেই, মাপ নেই ওজন নেই, সাত শো মণ বলে দিলেই হল? তাও নিজে গিয়ে গুদামে দিতে হবে পৌঁছিয়ে। অত ছালা-বস্তা না থাকে, নিয়ে এসো গে আগেভাগে। তারপর গরুর গাড়ি জোগাড় করো। জন ধরো। কয়েল ডাকো। সব তোমার নিজের খরচ। খরচ-খরচা সহ মণ পাবে মাত্র সাড়ে ছ টাকা।
যোগেশ সিঙ্গির মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। এখন উপায়?
উপায় তো দেখতে পাচ্ছিনে কিছু। বটদত্ত চোখ মিটির-মিটির করতে লাগল।
এসেসরবাবুকে গিয়ে ধরো। একেবারে রেহাই পাবনা জানি, কিছুটা মিনাহা করে দিক। সাতশোর জায়গায় দুশো। হিসেব করে পড়তা-মত কিছু না হয় এদিক-ওদিক—বুঝছই তো।
নাপিত ধুত্তু, শেয়ালের পুত্তু। বটদত্ত গেল এসেসরবাবুর কাছে।
এসেসরবাবু হুমকে উঠল। এ এলেকা বাড়তি এলেকা, এখানকার টার্গেট পনরো হাজার। একদানা কারু বাদ-রেয়াৎ হবে না। এ ধান যাবে ঘাটতি

অঞ্চলে। এক জায়গার ধান গুমে যাবে, আরেক জায়গার লোক হাভাত হাভাত করে ফিরবে এ অসম্ভব। আমার কাছে ছাড়ছুড় নেই।

ছোট চোখে বটদত্ত বললে, 'ধান যদি সবাই ধরে রাখে এ এলেকাও তবে তো ঘাটতি এলেকাই হয়ে গেল। এ ধানটা তাই এখানেই আমরা ধীরে সুস্থে বিলি করে দিই না। আপনি বরং—শুনুন, এদিকে একটু আসুন।'

'বেশি তেল দেখাবেন তো পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেব। নিজের স্টকে না থাকে শেষকালে বাজার থেকে কিনে এনে পুরিয়ে দিতে হবে। রেট পেনাল হয়ে যাবে।'

খবর শুনে যোগেশ সিঙ্গি মরিয়া হয়ে উঠল। ডাক-হাঁক দিলে সবাইকে।

সবাই এবার এসে তোমরা ঠেকাও। যে দু-তিনজন করে একে-একে আসছিলে ধান নিতে, তারা এসে এখন একত্র হও। বলো, দেশের ধান চলে যেতে দেবোনা। মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে দেবনা আমাদের।

হাঁসের খাঁচা নেড়ে দিয়েছে। হুমাহুমি লেগে গেল। গাঁয়ের লোক সবাই খেপে উঠল। কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবনা ধান।

'ধান যদি নিয়ে যায় তো আমরা খাব কি?' পাতলা বেতের মত চেহারা হয়ে গিয়েছে, বললে লাহিরি সেখ।

'এবার আর ছাড়ছোড় নেই। এবারে ঠিক মরব। গোর-কাফিনও জুটবেনা।' বললে বরকৎ আলি। হাড়-পাঁজরা বের-করা, পরনে শুধু একটা ন্যাকড়ার ঘের।

'গেল বার তবু জমিজিরাৎ কিছু হাতে ছিল, একেবারে উচ্ছন্ন হয়ে যাইনি। এবারে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে।' কাগাবগা চুল, লগবগ করে হাঁটে, বলে কান্তি পদ্দান।

'তারপর এবার আবাদের অবস্থা দেখেছ? শ্রাবণ মাস গেল জমিতে এখনো জল লাগল না। বীচনের প্যাব ছেড়ে গেল।' জ্বরে ধোঁকা শুকনো চেহারায় বললে পাঁচকড়ি সেখ।

'ভাদ্দরে ঝরলে দু-আনা চার-আনাও পাবনা। ধান চিটনে মরিঞে হয়ে যাবে। পাত উঠে যাবে গৈ-গ্রাম থেকে।' গুম-ধরা মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেললে অবিনাশ বায়েন।

'ফুটো নৌকার কালাপাতি চলবে না আর। সব্বংশে ডুবব এবার।' বললে ভুবন গাড়োয়ান।

'জমিজমা যে বেচব, টাকা দিয়ে কোন আমোদ হবে? ধান কিনতে হবে তো? ধান-চাল কোথায়? সব দেশান্তরী।' বললে বাগেশ্বর গনাই।

না, না, নিয়ে যেতে দেবনা। কী করতে পারে যদি একজোট হয়ে দাঁড়াই সবাই? কী হবে? পুলিশ আসবে? গুলি করবে? করুক। এমনিতেও মরব অমনিতেও মরব। একশো জন মরবে, বাঁচবে এক হাজার।

পড়শির মুখ না আরশির মুখ!' সবার মুখে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা। যোগেশ সিঙ্গির বুকটা ফুলে উঠল।

খোঁজ নিতে গেল পাশ-গাঁয়ের মজুতদাররা কী করছে। মদন সরকার আর একুবালি।

মদন সরকার হাড়ে টক বদমাস, ভেবেছিল পগার ডিঙিয়ে যেতে পারবে। তার বরাদ্দ হয়েছিল পাঁচশো। আন্দাজী ওজন, এসেসরের খামখেয়াল। মদন কতক চাল করে ফেলল, কতক খড়ের গাদা খুলে লুকোল বাকার বেঁধে। মেঝে কেটে লুকাবোর সময় ছিল না, উঠোন কেটে লুকোতে গেলে তো জল পড়ে গাছ গজাবে। ক্রোকী ধান ধরতে এসে হামার খুলে দেখা গেল বড় জোর পঞ্চাশ মণ। কী ব্যাপার? রুবকারি পাঠাবার সময় তো কাঁটা ধরে ওজন করে যাননি, বাইরে থেকে ঠাউকো মাপ ধরে গিয়েছিলেন। আমার আছেই মোটে ওই। যা আছে তাই নেবেন। মন-গড়া মাপ ধরলে আমরা করব কী?

সুরু হল খানা-তল্লাসী। খড়ের গাদার ভিতর থেকে ধান বেরুল। আর অন্ধকার ঘরের মধ্যে মটকিতে এসব কী? এ মশাই চাল। চাল নেবার তো হুকুম নেই। কে বললে নেই? ধানের মধ্যেই চাল। জোরের মধ্যেই অধিকার। এ চালকেই আবার ধানে নিয়ে যাব। অধিকারকে শক্তিতে।

লাভ হল কী? নিজেও ঠকল, গ্রামবাসীদেরও ঠকাল।

আর একুবালি?

সে দুঁদে মামলাবাজ, সে রুবকারি গ্রাহ্য করেনি। তার বরাদ্দ ছিল চারশো। শ তিনেক মণ সে চলতি দরে বেচে দিয়েছে গাঁয়ের মধ্যে। ক্রোক করতে এসে দেখে হামার প্রায় খালি। খানাতল্লাসী করেও সুফল হল না। ধরে নিয়ে গেলে আসামী পাওয়া যায় কিন্তু বরাতী ধান পাওয়া যায় না। তবু পুলিশ-হায়রানিতে পড়ার মজা কি তারই ঝাঁজটা সে একটু জেনে রাখুক।

তখন করলে কী একুবালি?

সব নাম দিলে যাদের-যাদের ঘরে সে ধান বেচেছে। সরকারী দলবল পড়ল গিয়ে সে সব চাষী গেরস্তর বাড়িতে। পাকা রুবকারি দেবার সময় কোথায়? কাঁচা টোকচা শিলিপ দিলে, বললে, এত মণ তোর, এত মণ আপনার। যা কিনেছিল সাত টাকা বার আনা দরে তাই তদের বেচতে হল ছ টাকা ছ আনায়। একুবালির বরাদ্দ মিটে গেল, পুরে গেল ঘাটতি। চারশো মণ ধরা হয়েছিল, চারশো মণেরই সে বুঝ দিলে।

'শোন, শুনে রাখ তোরা সবাই।' যোগেশ সিংগি ডাক দিলে গাঁয়ের জনতাকে। 'তোরা এক্ষুনি-এক্ষুনি ধান চাস? তা হলে ঐ একুবালির খদ্দেরদের মত দশা হবে। ধানও পাবিনা উলটে লোকসানি দিবি।'

'না, এ ধান আমরা নিতে দেবনা গাঁয়ের থেকে।' বললে লাহিরি সেখ।

'হামার আমরা পাহারা দেব।' বললে কান্তি পন্ধান।

'ঘিরে থাকব একের পর এক দেয়াল গেঁথে।' বললে বরকৎ আলি।

'দুর্গের দেয়াল।' ফোড়ন দিলে অবিনাশ বায়েন।

'দেখি কে আমাদের ধান নেয়!' বললে পাঁচকড়ি সেখ।

'পাশালি গাঁয়ের মত আমরা জবথব নই।' বললে ভুবন গাড়োয়ান।
পড়শির মুখ না আরশির মুখ! যোগেশ সিঙ্গি মনে-মনে উলসে উঠল। বটদত্তকে কাছে ডেকে বললে, 'একবার যদি ঠেকাতে পারি—'
বটদত্ত মিটির-মিটির চোখে বললে, 'একবার যদি—'
কড়ারী দিনে ধানের দর আরো খর হবে নিশ্চয়। একবার হটিয়ে দিতে পারলেই তক্ষুনি-তক্ষুনি বেচে দিয়ে ফর্সা হয়ে যাব।
হুকুমের সোহাগটা একবার দেখনা। ছালা বয়ে আনো গুদোম থেকে। নিজেই গরুর গাড়ির জোগাড় করো। নিজের খরচে মুনিষ ধরো। নিজে গিয়ে বয়ে নিয়ে বুঝে দিয়ে এসো।
কেউ আমরা মুনিষ দেবনা। কেউ আমরা কাঁটা ধরবনা। কেউ আমরা গাড়ি বইবনা। আমরা দাঁড়াব সারে-সারে, দল পাকিয়ে, বুক বেঁধে। এ আমাদের ধান। আপনারা আমাদের বাপ-মা, আমরা আপনাদের সন্তান। সব এক সংসার, এক ভাত। এ আমাদের সক্কলকার ধান। সক্কলে মিলে একে রুখব, রেখে দেব। হাঙ্গামা হয়তো হবে। আমাদের মজুত ধান আমাদেরই থাকবে।
যোগেশ সিঙ্গির মনের উল্লাস চোখে-মুখে ভেসে উঠল। গোঁফের কোণটা সে নিচের পাটির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলে।
এলো সেই কড়ারী দিন।
সকাল থেকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে গাঁয়ে। ঘুরে-ঘুরে বট দত্ত খবর নিয়ে এসেছে। লাঠি রেখেছে সবাই হাতের কাছে। কেদে-কাস্তে, কুড়ুল-কোদাল। বলে, আমাদের ধান, আমাদের মাঠ-গাঁ। কার সাধ্যি লুট করে নেয় আমরা থাকতে।
ঘি তা হলে যজ্ঞেই পড়েছে এবার!
এ গাঁয়ে লোক পাবেনা, বহিগ্রামী লোক নিয়ে এসেছে বুঝি এসেসর। রপ্তে-রপ্তে ধান নেবে। প্রথম ক্ষেপে দশখানা গাড়ি। সঙ্গে লাল-পাগড়ি-মাথায় দুটি মাত্র পেট-রোগা গেঁয়ো নিরীহ পুলিশ। হাতে দুটো মরচে-ধরা টিঙটিঙে বন্দুক। সঙ্গে কাঁটা, ছালা, ধামা, গাড়ি।
এই ওদের সাজপাট? এক ঝাপটায় উড়ে যাবে ধুলোর মত।
কিন্তু আমাদের এরা সব কই? এখনো বেরোচ্ছেনা কেন হুমহাম করে? যোগেশ সিঙ্গির কোটাল হাঁক দিয়ে উঠল।
'এই যে বাবু আমরাই।'
কাছে এগিয়ে এসে যোগেশ সিঙ্গির চক্ষু স্থির। সত্যিই তো, গাড়ি নিয়ে এরাই তো এসেছে। বহিগ্রামী তো কেউ নয়। সব মুখ তার চেনা, সব্বার নাড়িভুঁড়ি।
'তোরা?'
'হ্যাঁ আমরাই।'
এসেসর হুকুম দিল—হামার ভাঙো।

বন্দুকে কিরিচ নেই, উঁচিয়ে পর্যন্ত ধরলে না সে-বন্দুক। আর, কত সহজে, ঠোকাঠুকি ধাক্কাধাক্কি না করেই হামারের দরজা ভাঙল লাহিরি আর কান্তি। তাদের হাত-পাগুলো তেমনি লিকলিকে, চোখগুলো আগুনের ফুলকি।

'আমার হামার তোরা ভাঙবি?' চেঁচিয়ে উঠলো যোগেশ সিং।

'হ বাবু ভাঙব। ধম্মগোলা করতে পারিনি, কিন্তু অধম্মের গোলা ভাঙবার মত জোর পেয়েছি আজ। আয় সব এগিয়ে। হাত লাগা।'

ধামা করে তুলতে লাগল পাঁচকড়ি।

কাঁটা ধরে ওজন করতে লাগল অবিনাশ।

ছালা ভরে গাড়িতে তুলতে লাগল বরকৎ।

পাঁচন হাতে ভুবন গাড়োয়ান।

সবাই মুনিষ খাটতে এসেছে। কোথায় লড়িয়ে হয়ে আসবে, এসেছে মুটে-মজুর হয়ে। কোথায় নিজের জিনিস রেখে দেবে ধরে-বেঁধে, না, যেচে-সেধে বিলিয়ে দিতে বসেছে।

আর তাইতেই যেন তাদের ফুর্তি, তাদের জোর-জলুস।

'শেষকালে আমার গায়ে তোরা হাত দিবি? অন্যের হয়ে লুট করবি আমাকে?' যোগেশ সিঙ্গির খাড়া গোঁফ ঝুলে পড়ল হঠাৎ।

'উপায় নেই।' বললে লাহিরি সেখ। 'জল না দিলে কানের জল বেরোয় না।'

'বিপদে আপদে কত উপকার করেছি তোদের। আমি তোদের মুনিব, মহাজন—'

'আজ সে রবি ডুব দিয়েছে।' বললে কান্তি পদ্ধান। 'কখন নায়ের উপর গাড়ি, আর কখন গাড়ির উপর না।'

'কিন্তু এ ধান তো তোদের পেটে যাবে না।'

'কিন্তু একজনের পেট থেকে তো বের হচ্ছে।' হেসে উঠল বরকৎ আলি।

'গুদোমে মাল পৌঁছে দিয়ে তোদের লাভ কী?' প্রায় কেঁদে উঠল যোগেশ সিং।

'তা জানিনা। শুধু ভাঙবার মহড়া দিয়ে রাখছি।' বললে অবিনাশ বায়েন।

'রপ্ত করে রাখছি হাত-হেতের।' বললে পাঁচকড়ি সেখ।

'কখন একদিন আবার সময় হলে—' ভুবন গাড়োয়ানের সঙ্গে-সঙ্গে সকলে তাকাল সেই দুটো পেট-রোগা টিঙটিঙে সেপায়ের দিকে। মনে হল তালপাতার সেপাই। বন্দুক তো নয়, তালের বাগলো।

'হাত চালা, হাত চালা।' এসেসরের ধমকে চমকে উঠল মুনিষ মজুরের দল। 'অমন ঢিমে চালে চললে মজুরি পাবিনা এক আধলাও।'

মুনিষ মজুরের দল মুনিষ-মজুরের মতই হাত চালাল।

১৭। দাঙ্গা

শিশেখাল। এপারে আদমপুর ওপারে ধুলেশ্বর। দুই গ্রাম। মাঝখানে অনেক আগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পুল ছিল একটা। তার কাঠ আর লোহা দুই গ্রামের লোক চুরি করে নিয়েছে। এখন শুধু একটা দুই-বাঁশের সাঁকো। বাঁশের ধরুনি আছে উপর দিকে। হেলে-বেঁকে।

কাঁকালে কলসী, চলেছে মমিনা। ত্যাড়াব্যাঁকা সাঁকোর উপর দিয়ে। ধরুনি না ধরেই। হাতে খোঁটা দড়ি, চলেছে জিন্নাতালি, তেমনি নম্নড়ে সাঁকোর উপর দিরে। তেমনি ধরুনি না ধরেই।

এপারে পুকুর, ওপারে গোবাট। গরু আগেই হেঁটে পার হয়ে গেছে খাল, জলের থেকে নাকের তুলতুলে ডগাটা উঁচুতে তুলে ধরে। নদীর জল লোনা, পুকুরের ছাড়া খাওয়া যায় না। গরুকে খোঁটায় বেঁধে না রাখলে কার ক্ষেতের ফসল কখন তছরুপ করে।

মমিনা আর জিন্নাত। ধুলেশ্বর আর আদমপুর। দক্ষিণ আর উত্তর। দুজনে দেখা হোল মুখোমুখি।

মমিনা বলে 'পথ দাও।'

জিন্নাত বলে 'পিছু হাঁটো।'

মমিনা বলে, সে মেয়ে, তার দাবি সকলের আগে। জিন্নাত বলে, তার দাবি মমিনার আগে, কেননা সে আগে এসে সাঁকো ধরেছে। পথ এগিয়ে এসেছে আদ্দেকেরও বেশি। এখন সে আর ফিরে যাবে না। এমন কোনোই নুটিশ টাঙানো নেই যে মেয়ে দেখলেই সাঁকোর থেকে জলে ঝাঁপ দিতে হবে।

'হ্যাঁ, দিতে হবে। আগুনে পর্যন্ত দিতে হবে।' চোখ ঝিলকিয়ে বললে মমিনা। কলসীটা ঢলে পড়ছিল, কোমরের খাঁজের উপর তুলে চেপে ধরল আঁট করে। বাঁকা বাহুর বন্ধনীতে ফোটালে বা একটু নব-যৌবনের গরিমা।

'আগে আগুনে ঝাঁপ দিই, পরে না হয় পানিতে দেব।' জিন্নাতালি বললে।

'পথ ছাড়ো বলছি, রাগ-রঙ্গের জায়গা নয় এটা।' ঝলসে উঠল মমিনা : 'যদি না ছাড়ো তো ফিরে গিয়ে বাজানকে বলে দেব।'

'আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার বাজানকে বলতে পারি।'

'কি বলবে তুমি?'

'বলব মকবুল মুছল্লির মেয়ে মমিনা বলেছে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'ওমা কখন বললাম!'

'ঘরে নয়, বলেছে আমার মুখে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'দেবোই তো একশোবার। নুড়ো জেবলে দেব।'

'তাই বাজানদের বললে লাভ হবে না, দাঙ্গা বেধে যাবে দুই বাপে। আমার মুখে জ্বলুক নুড়ো, ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার মুখে একটু হাসি ফোটাও মমিনা।'

মমিনা চোখ নামাল। বললে, 'হাসির গল্প নেই তবু হাসি কি করে? শুধু শুধু কারু ফরমায়েসে হাসা যায়?'

'চাঁদ কি কারু ফরমায়েসে হাসে? আর যার অমন চাঁদমুখ—'

মমিনা হেসে ফেলল। ছলছলে জলে চিকচিক করে উঠল রুপুলি চাঁদের টুকরো। খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল জিন্নাত। বাকি জলটুকু পার হয়ে গেল সাঁতরে।

শিকস্তি-পয়স্তির দেশ। নতুন চর উঠেছে। যে নদী ভেঙেছে সেই নদীই দিয়েছে ভরাট করে।

জিন্নাতের বাপের নাম গফুরালি। সে বলে, আমার ভাঙা জমি আবার ভেসে উঠেছে। শিকল জরিপ করে জমি ভাঁউরে নিলেই বোঝা যাবে ঠিকঠাক।

মিথ্যা কথা। বলে মকবুল। মমিনার বাপ। বলে, নতুন চর, যখন আমার জমির লগ্ন, তখন আমার স্বত্ব।

প্রথমে ঝগড়া-বচসা। তর্ক-বিতর্ক। মন কষাকষি। শত্রুতালি। পক্ষাপক্ষি।

দুপক্ষের জমিদার দুপক্ষের পিছে এসে দাঁড়াল। ঠিক করলে প্রজাদের দিয়ে মামলা বসিয়ে পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বত্ব বর্তিয়ে নেবে। পিছনে থেকে উস্কে দেয় ঘন ঘন।

কিন্তু মামলা বসানো মুখের কথা নয়। তার অনেক তোড়জোড় লাগে, অনেক কাঠখড়। অনেক দলিল-দাখিলা। বাদী হওয়া সুবিধে না বিবাদী হওয়া, এই নিয়ে সল্লা-পরামর্শ চলে। খালি দিন গোনে। চরে ঘাস গজায়। গজায় বনঝাউ।

একদিকে আদমপুর, অন্যদিকে ধুলেশ্বর। তারা আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। দেওয়ানি আদালতের ফেরফার আর গলিঘুঁজির মধ্যে তারা যেতে চায় না। তারা ল্যাজা-লাঠির তদারক করে। আমি হামি হব, বলে গফুরালি। মকবুল বলে, আমি হামি হব। লাঠিতে তেল মাখায়, ল্যাজার মুখে শান পড়ে। সুরু হয় বুঝি হামলা-হামলি।

পলিমাটি শক্ত হয়ে উঠেছে। ফলেছে উঁড়ি ধান। সমর্থ হয়ে উঠেছে আবাদের জন্যে। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল দুদিকে। গাজী-গাজী। ঢাল-সড়কি, বর্শা-বল্লম, ল্যাজা-লাঠি, কোঁচা-টাঙ্গি, দা-কুড়ুল দুদিকেই ঝকমকিয়ে উঠল। চরের দখল নিয়ে বাধে বুঝি হাঙ্গামা।

আদমপুরের মোড়ল গফুরালি, ধুলেশ্বরের মোড়ল মকবুল। দু'জনেরই হাল-হালুটি বিস্তর, পাকা ভিতের উপর টিনের ঘর অনেকগুলি। তাঁবেদার লোক-লোস্করের অভাব নেই। মোড়লে-মোড়লে ঝগড়া, কিন্তু দেখতে-দেখতে ছেয়ে পড়ল তামাম গ্রামে। এ-ও এককাট্টা, ও-ও এককাট্টা।

অকু হলে হোক। কুছ পরোয়া নেই। মারপিট, খুনোখুনি, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ। হয়ে যাক হয়-নয়। এসপার কি ওসপার। আগে থেকে পুলিশে এত্তেলা দেবে না কেউ। পরে জেল-ফাটক হয় তো হবে। দ্বীপান্তরেও রাজি। বুকের মাংসের চেয়ে দামি যে জমি, সেই জমির চেয়েও মান বড়। স্বত্বের চেয়েও বড় হচ্ছে দখল।

উলু মাঠ ভেঙে চাষ সুরু করে দিল জিন্নাত। লাঙল দিলেই খড় ভেঙে-ভেঙে যায়। মাটি ফেটে-ফেটে পড়ে। এক চাষ দিয়েছে, দুয়ারে-তিয়ারে দরকার নাই, আদমপুরের লোকেরা ছুটে এল দলে-দলে। পাখা মেলা বাদুড়ের ঝাঁকের মত।

গফুরালি হুকুম দিল, কোট-এলাকা বজায় রাখতে হবে। দখল যখন নিয়েছি একবার, বেদখল হতে পারব না। ও হঠে গিয়ে আদালত করুক। থানায় গিয়ে এজাহার দিক। আমরা আমাদের গায়ের বস্ত্রের মত জমি কামড়ে পড়ে থাকব।

উঠন্ত রৌদ্রে ঝলসে উঠল অনেক পালিশ-করা শানানো লৌহ-মুখ, উড়ল অনেক ধুলোমাটি, ফিনিক দিয়ে ছুটল অনেক কাঁচা রক্তের তোড়। যার আর্তনাদ করার কথা সেও উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ উল্লাস করছে। অস্ত্র ফেলে দিয়ে যার মাটি নেওয়ার কথা সেও লাথি ছুঁড়ে মারে। হেরে গেল গফুরালির দল। ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। চম্পট দিল খাল-নালা সাঁতরে। কিন্তু জিন্নাতালি ফিরল না।

জিন্নাতালি আটক পড়েছে শত্রুর কব্জার মধ্যে। আর ছাড়াছাড়ি নেই। কয়েদ-খালাসী মোকদ্দমা করতে চাও তো করোগে, কিন্তু তার আগেই গুম হয়ে যাবে।

মুচলেকা দাও, এই চর মকবুল মুছুল্লির—দাও মুক্তিপত্র। একটানা দখল করতে দাও বারো বচ্ছর। রাজি হও তো ফিরিয়ে পাবে ছেলে। না হও তো কচুকাটা করে ভাসিয়ে দেব দরিয়ায়।

হাতে পায়ে কোমরে দড়ি বাঁধা, জিন্নাত শুয়ে আছে লকড়ি ঘরে। শুকনো হোগলার উপর।

রাত গহিন, ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। জ্যোৎস্নায় মোছা-মোছা অন্ধকার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিন্নাতের। তার জবরো কপালের উপর কার মিঠে হাতের ছোঁয়া।

'কে?'

'আমি গো আমি। মমিনা।'

স্বরের মিঠানিতে জ্বর জুড়িয়ে গেল গায়ের। যেন স্বপন দেখছে, স্বপন শুনছে জিন্নাত।

'জখম হয়েছে তোমার?'

'লাঠি লেগেছে ডান হাতে, বাঁ কাঁধের উপর। ব্যাথায় ছিঁড়ে পড়ছে

হাত। কিন্তু বেতাগী ল্যাজা ফসকে গেছে, বিঁধতে পারেনি বুকের মধ্যে।'
'এইখানে লেগেছে?' হাতের মিঠানি কপালের থেকে চলে আসে বাহুর উপর।
'এখন আর ব্যথা নেই। শুধু দড়ির বাঁধনটাই যা ফেলেছে বেকায়দায়।'
সত্যি, সমস্ত জ্বর-জ্বালা, ব্যথা-বেদনা যেন সব উবে গিয়েছে এক পরশে। ফুটন্ত গায়ের রক্ত ঝিমিয়ে পড়ল। চোখে লাগল যেন ঘুমের আমেজ। নতুন ফোটা কদমের গন্ধ পাচ্ছে মৃদু-মৃদু। দড়ির গিঁট খুলতে লাগল মমিনা।
'এ করছ কি মমিনা, বাঁধন খুলে দিচ্ছ গা থেকে?'
'হ্যাঁ', ছোট-ছোট আঙুলে বিন্দু-বিন্দু স্পর্শের শিশির ঢেলে-ঢেলে মমিনা বললে, 'এ বাঁধন যে আমাকেও বেঁধে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। প্রথম রাতে সর্দার-চাঁইয়েরা হল্লা-ফুর্তি করেছে। জবর দখল তো করেইছে, হটিয়ে দিয়েছে বিপক্ষদের। তার উপরে কয়েদ করেছে ও-দলের সাজোয়ানের ছেলে। কিন্তু আমি শুধু কেঁদেছি।'
'একি ছেড়ে দিচ্ছ আমাকে? জানতে পারলে তোমার কি সর্বনাশ হবে জানো?'
'জানতে পারবে না।'
'পারবে না মানে?'
'মানে জানতে পারলেও কিছুই করতে পারবে না আমার।'
'তা কি করে বলছ?'
'বলছি আমিও ছাড়া পাব তোমার সঙ্গে।'
'তুমি?'
'হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাব।'
'চলে যাবে? কোথায়?'
'বল্লভপুরের কাজীর কাছে। জানো তো, কাজী কুরমান মোল্লা আমার খালু। নদীর দু'বাঁক পরেই বল্লভপুর।'
'সেখানে কি?'
'সেখানে গিয়ে কাজীর দরবারে কাবিননামা রেজেস্ট্রি করব। তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে। তুমি দুলহা আর আমি দুলহিন।' কথার মাঝে লজ্জা আর আনন্দের মিশেল। সাহস আর ব্যাকুলতার।
গায়ের রক্ত শির শির করে উঠল জিন্নাতের। বললে, 'তোমার বাপ-চাচা রাজি হবে?'
'না হোক। আমি তো আর নাবালগা নই যে অলি লাগবে বিয়েতে। আমি বালিগ হয়েছি গেল পৌষ মাসে। পনেরো বছর পেরিয়ে গেছি আমি। তা আমি সাবিদ করতে পারব। আমাদের বিয়ে তুড়তে পারবে না কেউ। কিছুতেই না।'

'বিয়ে হবে আমাদের?' ঘোর-ঘোর চোখে এখনো স্বপন দেখছে জিন্নাত?'

'হ্যাঁ, তোমার খেদমতে থাকব চিরকাল। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে দু' পক্ষের। যে চর আমার বাজান বলেছে আমার, আর তোমার বাজান বলেছে তার, সে-চর তারা দুয়ে মিলে আমাদের দুজনকে জায়গির দিয়ে দেবে। নাইয়র যেতে-আসতে হবে আমাকে, বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো আবার শক্ত কাঠের পোল হয়ে উঠবে। দু' গ্রামে ফিরে আসবে মিল-মহব্বত। তাছাড়া আমি তো আর পথ দেখি না। নইলে চিরকাল দু'দল কেবল মারামারি করবে? আমার মনের মানুষের গায়ে ঝরবে রক্ত আর আমার চোখে ঝরবে দরিয়ার পানি!'

'কি করে যাবে মমিনা?' জিন্নাত উঠে বসল।

'ঘাটে ডোঙা আছে মাছ ধরার। তাতে করে পালাব।' কালো চোখে আলো জ্বলল মমিনার।

'আমার হাত যে ভাঙা। তুমি শুধু হালটা ধরে বসে থাকবে। পারবে না?'

'পারব।'

'তবে চলো। নদীর নাম আঁধারমানিক। আঁধার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ি।'

দুজনেই ত্রস্ত হালকা পায়ে চলে এল নদীর পারে। বাদাম গাছের নিচে নৌকা বাঁধা। হালকা মেছো ডিঙি।

'হাল-দাঁড় কই?' জিজ্ঞেস করল জিন্নাত।

'ও!' বুঝতে পেরেছে মমিনা। সব আশা-সোটা হয়েছে দাঙ্গার উরদিশে। বললে, 'তুমি একটু বোসো। উঠোনে মুলি-বাঁশ আছে, তাই দুটো নিয়ে আসি কুড়িয়ে। লগি ঠেলে-ঠেলে চলে যাব দুজনে। তুমি যদি না পার আমি একা বাইব। ভাটির নদী তরতরিয়ে বয়ে যাবে।' মমিনা ফিরে গেল।

এমনি করেই বুঝি সমাধান হবে, এত সব হাঙ্গামা-হুজ্জুতের, আক্রোশ-আক্রমণের! একটা মেয়েকে বিয়ে করে! ঘরের বিবি বানিয়ে। এত হুড়দঙ্গল, কলহ-কোন্দল, চোট-জখম, এত রক্তপাত--সব এমনি করে রফানিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এমনিভাবে ভুলে যেতে হবে হার-মার, ঘায়ে মলম লাগাতে হবে মোলাম করে। বাজানকে গিয়ে বলবে, মোল্লার কাছে কেতাব-কলমা পড়ে এসেছি আমরা, এবার ছোলেনামা দাখিল করে দাও আদালতে।

সে না মরদের বাচ্চা?

কিন্তু উপায় কি। এ যে একটা মেয়ে নয় খালি, এ যে মমিনা, নদীর নামে তারও নাম। সে যে আঁধারমানিক।

ছোট দেখে দুটো হালকা বাঁশ নিয়ে এল মমিনা। এসে দেখে জিন্নাত নেই, ডোঙাও নেই। দু'হাতে জল কেটে-কেটে বেরিয়ে গেছে সে অনেক দূরে। ঐ দেখা যায়।

ভাঙা চাঁদ ডুবে গেল পশ্চিমে। মমিনা তাড়াতাড়ি চলে এসে তার ছাড়া বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নদীর আভাস দেখা যায় ঝাপসা-ঝাপসা। অন্ধকারে আঁধারমানিকের দিকে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগল, জিন্নতের দু'হাতে হঠাৎ এত জোর এল কি করে?

১৮। চিতা

রাস্তার ধারে ঘাসের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কে-একটা ছেলে। নয়-দশ বছর বয়েস। শুয়ে আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে মনে করা যায় না।

মরে আছে।

লক্ষ্য করলেই মুস্কিল। দাঁড়াতে হয়, খোঁজ নিতে হয়, মড়া সরাবার ঝক্কি নিতে হয়। অন্তত একটু শোকার্ত ভঙ্গি করতে হয়। আর শোকার্ত ভঙ্গি করতে গেলেই তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায় না।

তাই সকাল থেকে পড়ে থাকলেও ভিড় হতে প্রায় দুপুরের কাছাকাছি। আর, যারা ভিড় করেছে বেশির ভাগই তারা এমনি পড়ে থাকবার মরে থাকবার মুখে।

জায়গাটা ভডু পাড়ার এলেকায়। আদালত-ডাক্তারখানা সব এক ডাকের পথ। ঠেকনা-দেয়া খোড়ো চালের ঘরের সামনে কটা উকিলের সেরেস্তা।

ছেলেটা একেবারে নির্জনে এসে মরেনি। আর সেটাই তার নির্লজ্জতা। কাছারির বেলা বাড়ছে দেখেও ভিড় ঠেলে উঁকি মারতে হয় একটু, মায়া করতে হয়, রুদ্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে তপ্ত একটা অভিশাপ চেপে রাখতে হয় বুকের মধ্যে। এ এক অকারণ অস্বস্তি। ভাত খেতে-খেতে হঠাৎ কাঁকর চিবোনো।

কেউ বলছে, কাহারদের ছেলে। কেউবা বলছে, মুচি, কেউ বা, কাপালি।

কিন্তু, সৎকারের ব্যবস্থা তো করতে হয়। কেউ বললে, মিউনিসি-প্যালিটিতে খবর পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তাদের কারু দেখা নেই।

এ তো আর মরা বেরাল নয় যে ডোম এসে এক দরজা থেকে তুলে নিয়ে আরেক দরজায় ফেলে রাখবে। একে একেবারে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে নদীর ধাপায়, শ্মশানে।

অভ্যাসবশে সন্তোষ বেরিয়ে এসেছে। পরনে স্ট্যান্ডার্ড ক্লথ, গায়ে খদ্দরের ছিন্নাবশেষ। যেন এটুকুই তার আভিজাত্য। শরীরে অনেক জেল-খাটার দাগ, ক্লান্তির ম্লানিমা। চোখে নিরাশ্রয়ের চাউনি। তবু, অভ্যাসবশে, কিছু একটা না করলে নয়। চিরকেলে সেই চেষ্টার চাঞ্চল্য।

'একটা তোমরা খাটুলি জোগাড় করতে পারলে না? কাঁধ দেবার লোক নেই তোমাদের মধ্যে? রোদ্দুরে পুড়ে মরবে ছেলেটা?'

কে কার দিকে তাকায়! বেশির ভাগই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ির থেকে বের করে দেওয়া। মরা পেটে টিং টিং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বা পেটে দড়ি দিয়ে পড়ে আছে এক পাশে। কেউ বা বসে যাচ্ছে একটু—তার মানেই, যেতে বসেছে!

মরা ছেলেটার দিকে কেউ একবার ফিরে তাকাচ্ছে না। রাস্তায় এমন অনেক তারা ছেলে দেখে এসেছে, রেখে এসেছে। ছেলেটার তো তবু ভাগ্য ভাল, মরবার পরে হলেও খাটে চড়বে!

কিন্তু এরাই তো সব নয়। মক্কেল-মুহুরি আছে, আমলা-ফয়লা আছে, কিছু চাঁদা জোগাড় হবে না? সন্তোষ আদালতের হাতার মধ্যে এগিয়ে গেল। সাক্ষী-সাবুদ, দালাল-ফড়ে, মোড়ল-মাতব্বর—সবার কাছে সে হাত পাতলো। একখানা দড়ির খাটুলি।

দু'-পয়সা চার-পয়সা করে মন্দ উঠলো না। যত ওঠে, সন্তোষ তত হাত বাড়ায়। ছেলেটাকে নতুন কাপড় পরিয়ে চন্দনকাঠ জ্বালিয়ে পোড়াবে নাকি? খাটুলি ছেড়ে যে প্রায় চৌদোলা জোগাড় হবে।

'কি, হল কত?' নারন জিগগেস করল।

পরনে পা-জামা, পায়ে কাবলি চটি। অনেক তাজা ও তেজী। এখানকার সাহেবের ছেলে। অগ্রপন্থী।

নাম ছিল নারায়ণ। সেটা নিতান্ত হিন্দু নাম বলে নারনে বদলে নিয়েছে। নারন মানে না-রণ; যুদ্ধ নয়, আপোষ।

'কি, পেলেন কত?' নারন হুমকি দিলে।

'প্রায় সাড়ে চারটাকা—' সন্তোষ বললে হাতের মুঠি খুলে।

'তবেই দেখুন, রাই কুড়িয়ে বেল—মেনি এ পিক্‌ল্‌ মেকস এ মিক্‌ল! কি হবে এত পয়সা দিয়ে?'

'খাটুলি, দড়ি, কাঠ, কলসী—অন্তত গামছা একখানা—'

'হ্যাঁ—শবের আবার শোভাযাত্রা! পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি। আপনাদের যত সব বাজে সেন্টিমেন্ট। দিন, পয়সাগুলো দিয়ে দিন আমাকে।'

সন্তোষ যদিও বয়েসে নারনের চেয়ে এক যুগ বড়, তবু নারনেরই এখন দাবি বেশি। তারই এখন পড়তা পড়েছে। পাল্লা এখন তারই দিকে ভারি। শিষ্য-শাগরেদ এখন সব তার দিকে।

প্রায় ছোঁ মেরে পয়সাগুলি নারন তুলে নিল।

'বললে, দুটো বাঁশ আর কিছু দড়ি হলেই যথেষ্ট। যে মরে গেছে তার জন্যে আবার মায়া কিসের?'

'একখানা বাঁশের দাম এক টাকা। আর দড়ি—'

'কিনবে না আরো কিছু। ওই সামন্তদের বাঁশঝাড় থেকে দু'খানা কেটে

নিয়ে আসব জোর করে। আর, খোঁটায় ঐ গরু বাঁধা দেখছেন? দড়ির জন্য ভাবতে হবে না আপনাকে।'

'অন্তত একখানা মাদুর—'

'আপনাদের যত সব পচা সেণ্টিমেণ্ট। মর্গে কেমন মড়া নিয়ে যায় দেখেন নি? তেমনি বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাব। মাদুর, না গালচে এনে দেবে মখমলের!'

'ও তো মুর্দাখানার মড়া নয়।' সন্তোষ আপত্তি করে।

'বেশ, মাদুর লাগে, মুহুরিদের কারু সেরেস্তা থেকে টেনে নিয়ে আসবেন একখানা।'

'কেন, এ পয়সা দিয়ে তুমি কি করবে?' সন্তোষ প্রায় রুখে উঠল।

'যারা এখনো মরেনি তাদের সৎকার করব।'

'তার মানে?'

'এই যারা ভিখিরি, হাঁপাচ্ছে বসে-বসে, তাদেরকে খাওয়াব। বেলের শুকনো খোলাটা নোখ দিয়ে কেমন আঁচড়াচ্ছে ঐ বুড়ো, দেখছেন? ঐ মেয়েটা কেমন পাতা চিবিয়ে খাচ্ছে?'

প্রথমটা সন্তোষ বলতে পারল না কিছুই। যেন ঠেকে গেল, হোঁচট খেল। মৃতের চেয়ে মুমূর্ষুকেই যেন বেশি অসহায় মনে হল।

কিন্তু, না, তা কি করে হয়?

'যারি জন্যে তুলুন, পাঁচ জনের পয়সা পাঁচ জনের কাজে ব্যয় হবে। এখানে এখন এক জনের চেয়ে পাঁচ জনের দাবি বেশি।' নারন চিবুকটা ভারি করল।

আশ্চর্য, পাঁচজন যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাদেরো তাই মত। যে আগেই মরেছে, তার চেয়ে যে এখুনিই মরবে তার ব্যবস্থাটাই আগে।

'ঝগড়া-বচসা করে লাভ নেই।' মুরুব্বি-মতন কে একজন রফানিষ্পত্তি করতে এগিয়ে এল। 'খাটও হোক খাওয়াও হোক।'

'খাট হবে, না হাওদা হবে!' পয়সা নিয়ে নারন চলে গেলে দোকানের দিকে।

কাঙালদের খাওয়াতে হয়, তার বন্দোবস্ত তো সন্তোষই করতে পারত। কর্তৃত্বের ভার তার হাত থেকে এমনি কেড়ে নেয়ার মানে কি! এ যে প্রায় উড়ে এসে জুড়ে বসা। উড়ুক্কু ফাজিল কোথাকার।

এক ধামা মুড়ি কিনে নিয়ে এসেছে নারন। সঙ্গে বোঁদের ছিটে। ক্ষুধার্তের দল হাউ-মাউ-খাউ করে উঠল।

নারন ভেবেছে কি। সন্তোষ ফের নতুন করে চাঁদা আদায় করবে। এবার বনেদি বাবুর মহলে। দেখি ছেলেটার জন্যে খাটুলি হয় কি না।

যাদের পরনে কানি-নেকড়া আছে, অতি কষ্টে তারি এক প্রান্ত খুলে মুড়ি নিচ্ছে দু'মুঠো। যাদের তাও নেই বা টেনে খুলতে গেলে ফেঁসে যাবে, তারা নিচ্ছে আঁজলা করে। কেউ বা কচু বা কলার পাতায়।

অনেক হুড়-দঙ্গল। কেউ বলে, বোঁদে পড়েনি এক কণা। কেউ বলে, থাবা মেরে কেড়ে নিয়েছে ও।

'এবার কিছু এ বেলের খোলে দাও, বাবা।' সরু ঠ্যাঙে টলতে-টলতে সেই বুড়ো আসে এগিয়ে। 'দেখছনা, ওরও পেট কেমন খোলে পড়ে আছে।'

নারন ধমক দিয়ে ওঠে।

'অনেক দূর যেতে হবে, বাবা। খেয়ে না নিলে গায়ে জোর হবে কেন?'

কিছু না ভেবেই পক্ষপাত করে ফেলে নারন। অনেক দূর যেতে হবে—কথাটা কেমন যেন সত্যি শোনায়। তাদের দলের কথা।

কোথায় বা খাটুলি কোথায় বা বাঁশ-দড়ি, ছেলেটা তেমনি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। উড়ে-উড়ে বসছে কতগুলি কুকুরে-মাছি। থেকে-থেকে ঝরে পড়ছে কটা শুকনো পাতা।

কে একটা লোক, বলা-কওয়া নেই, সরাসর ছেলেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গা-পা খালি, হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে কোমরে আঁট করে বাঁধা। মাথায় গামছার ফেটি।

'কে, কে তুই?' বেকার দর্শকের দল ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'আমি মুর্দফরাস। মুনিসিপালির ডোম।'

'দাঁড়া, খাটুলি আসছে।' বললে সন্তোষের লোকেরা।

'দাঁড়া, বাঁশ কেটে দিচ্ছি। মাদুর আর দড়িও জোগাড় হয়ে যাচ্ছে এখুনি।' বললে নারনের শাগরেদেরা।

ভূষণ ডোম উসখুস করতে লাগল। বাঁশ-দড়ি নিয়ে নন্দ ডোমেরও আসবার কথা পিছু পিছু, তারো দেখা নেই। কোন দিকে কেটে পড়ল কে বলবে।

সুন্দর ছেলেটা। একেবারে হাড়-গোড় বের করা নয়। আশ্চর্য, পেটটা এখন ফুলো, যেন কত খেয়েছে। মাথায় একরাশ চুল। ঠোঁটের কাছে দুদিকের দুটো টানে মুখখানা যেন মায়ায় ভরা।

কোথায় কাটা বাঁশ, কোথায় বা দড়ির খাটুলি। কোথায় বা নন্দ ডোমের কাঁধ! ভূষণ দু'হাত দিয়ে ছেলেটাকে হঠাৎ বুকে তুলে নিল। এমনি পাঁজা কোলে করেই নিয়ে যাবে শ্মশানে। হাত ব্যথা করলে কাঁধে তুলে নেবে। এক কাঁধ থেকে না-হয় আরেক কাঁধে।

তখন জল খাবার সাড়া পড়ে গেছে ভিখিরিদের মধ্যে। অনেক জল তারা খেয়েছে, কিন্তু খাওয়ার পরে খায়নি এমনি অনেকদিন। এমনি নোনতা-নোনতা মিষ্টি-মিষ্টি মুখে। জলের স্বাদ বেড়ে গেছে অনেক।

'দাঁড়া বাবা, আমিও খেয়ে নি।' বললে সেই বুড়ো। পুকুরের ঢাল ধরে তরতর করে নামতে গিয়ে পড়ে গেল আচমকা। তখুনিই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিছু না, কিছু না। গায়ে এখন জোর হয়েছে অনেক। এবার পেটে জল পড়লেই হাঁটতে পারব অনেক দূর।'

প্রায় এক পো রাস্তা হেঁটে এসেছে ভূষণ। খানিকটা পথ কেউ-কেউ

এসেছিল পিছু-পিছু। সন্তোষের দল হরিধ্বনি দিতে চেয়েছিল, নারনের দল উঠেছিল শাসিয়ে। বলেছিল ডোমের হাতের মড়া, ও সব সাম্প্রদায়িক ডাক চলবে না।

ভূষণ লক্ষ্য করে দেখেনি কতদূর গড়াল সেই ঝগড়াটা। কেননা আর এগোয়নি তারা তারপর।

এতক্ষণে পুলের কাছে নন্দর সঙ্গে দেখা। বাঁশ আর দড়ি নিয়ে এসেছে নন্দ। তাও বাঁশ বলতে ঘরপোড়ার একটা খুঁটি, আর দড়ি বলতে কাতা।

'দে, বেঁধে ফেলি এবার।' মুখের বিড়িটা ফেলে দিয়ে নন্দ বললে।

'এতক্ষণ ছিলি কোথায়?' ভূষণ খেঁকিয়ে উঠল।

'কাজ ছিল।'

'কাজ আবার কি!'

'গাঁজা কিনতে গিয়েছিলাম।' হাসল নন্দ।

ভূষণের রাগ জল হয়ে গেল নিমেষে। জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল।

'এরি মধ্যে তুই যে ঘাড়ে করে লাশ নিয়ে আসবি তা কে জানে। দে, বেঁধে ফেলি চটপট। আমার ট্যাঁক থেকে কলকে খুলে নিয়ে ততক্ষণ ধরা এক ছিলিম।'

ভূষণ ছেলেটাকে নামিয়ে রাখছিল মাটির উপর, পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল ব্যস্ত হয়ে, 'না না, বাঁধতে হবে না। ওকে এবার আমার কাছে দে। বাকি পথটুকু আমি নিয়ে যেতে পারব।'

অবাক হয়ে ফিরে তাকাল দু'জন। কে-একটা বুড়ো। তে-ব্যাঁকা।

ভূষণ যেন চিনতে পেরেছে তাকে। পুকুর-পাড় দিয়ে যাবার সময় তাকে যেন একবার ডাক দিয়েছিল। যেন বলছিল, দাঁড়িয়ে যেতে। তারপর কখন যে-গুটি-গুটি চলে এসেছে পিছু-পিছু খেয়াল করেনি।

'খুব নিয়ে যেতে পারব। গায়ে এখন আমার অনেক জোর হয়েছে। খেয়ে নিয়েছি এক পেট। দে, বাছাকে দে এবার আমার কোলে। রোদ্দুরে বাছার মুখ কেমন আমলে গিয়েছে। কতদিন খায়নি! আর ও খায়নি বলেই তো আমরা আজ সবাই খেতে পেলাম।'

ভূষণের কোল থেকে ছেলেটাকে বুড়ো দু'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিল। কিন্তু দু'পা হেঁটেই বসে পড়ল টলতে-টলতে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে। বললে, 'তোরা ততক্ষণ গাঁজা খা, আমি বাছাকে নিয়ে একটু বসি। জিরিয়ে নি।'

১৯। জারিজুরি

গেল আর ফিরে এল।

হাকিম তাকালেন ঘড়ির দিকে। মোটে বারো মিনিট নিয়েছে। মোটে বারো মিনিটেই বিচার-বিবেচনা শেষ।

কী সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে জিজ্ঞেস করতে হবে না। সিদ্ধান্ত জলের মত পরিষ্কার। আর কিছু নয়, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবার মতলোব।

কাঠগড়ায় আসামী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে। পারলে ও-ও ছুট দেয় বাড়ির দিকে।

'আপনারা একমত?' ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করলেন হাকিম।

ফোরম্যান বললে, 'না। আমরা ডিভাইডেড। তিন আর দুই। তিন—'

'থাক। মেজরিটি ভার্ডিক্ট বলতে হবে না।' হাকিম হাত তুলে বাধা দিলেন। বললেন, 'আপনারা আবার ফিরে যান দয়া করে। দেখুন সকলে একমত হতে পারেন কিনা। চেষ্টা করুন একমত হতে।'

জুরি পাঁচজন আবার ফিরে গেল।

ঘরে গিয়ে ঢুকতেই বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল চাপরাশি।

একটা টেবিল ঘিরে পাঁচখানা চেয়ারে বসল পাঁচজন।

'ফাস্ট ট্রেনটা আর ধরা গেল না।' কমল দাস বললে বিরক্ত মুখে, 'পাঁচদিন দোকান-ছাড়া।'

'আমার তো আবার ট্রেনের পরে নৌকো।' বললে দ্বিজপদ। 'নৌকো ভাড়া যে কত পাওয়া যাবে হদিস করতে পারছি না। আগে তো ফুড এলাউয়েন্স হাফ-ডে করেছিলাম, এখন, দেরি হবে যখন ফুল-ডে পাওয়া যাবে। এই যা লাভ। আইটেম ধরে বিল ঠিক করে নিতে কত টাইম লেগে যাবে তার ঠিক কী।' হাতে-ধরা বিলের হিসেবের দিকে সূক্ষ্ম চোখে আবার তাকাল দ্বিজপদ।

'ট্রেন আর নৌকো!' ফোরম্যান সুবোধ দত্ত হুমকে উঠল। 'একটা লোকের জীবন-মরণ নিয়ে কথা। সেদিক না ভেবে যত ট্রেন আর নৌকোভাড়ার কথা ভাবছেন!'

'জীবন মরণ নিয়ে কথা কোথায়? খুন তো হয়নি কেউ। ফাঁসি তো দিতে পারছেন না।' বললে চতুর্থ জন, সাতকড়ি সরদার।

'আহা জেল নয় খালাস, এই-ই তো জীবন-মরণ।' বললে সুবোধ। 'একটা লোকের স্বাধীনতা চলে যাওয়া তো তার মৃত্যুর সামিল।'

'তা লোকটা যখন ডাকাতি করেছে তখন জেলে যাবে।' সাতকড়ি বললে নিস্পৃহের মত। 'তাতে অত কী কথাবার্তা!'

'ডাকাতি করেছে?' সুবোধ ফোঁস করে উঠল। 'এক কথায় সাব্যস্ত করবেন? সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বলবেন তো!'

'আপনি মাস্টার মানুষ, আপনি বিশ্লেষণ করুন।' কমল টিপ্পনী ঝাড়ল। 'আমাদের অত সময় নেই। পাঁচদিন কাজকর্ম বন্ধ। ডাহা লোকসান।'

'কাজকর্ম বন্ধ হলে করা যাবে কী!' সুবোধ আচার্যের মত বললে, 'এখানে কত বড় মহৎ কাজ করছেন, পবিত্র কাজ—সত্যসন্ধান।'

'আমরা খাদ্যসন্ধান বুঝি মশাই।' কমল মুখিয়ে উঠল। 'বিলে যা মিলবে তা নিতান্ত নগণ্য। তাতে আবার আমলা-চাপরাশি ভাগ বসাবে। মহৎ কাজ তো কত!'

দ্বিজপদ বলে উঠল আপন মনে, 'চণ্ডীতলা থেকে হৃদয়গঞ্জ ক মাইল?'

'কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত করবেন তো? কমলের দিকে তাকাল ফোরম্যান।

'আমার মতে মশাই আসামী ডাকাত।' কমল বললে সরাসরি।

'ডাকাত?'

'হ্যাঁ, চেহারাটা দেখেছেন? চোখদুটো?' প্রায় আঁতকে উঠল কমল। 'ও-রকম চোখওয়ালা লোক ডাকাত না হয়ে যায় না।'

'লোকটার চেহারা খারাপ সেই কারণে তাকে দোষী বলতে হবে?' সুবোধ দত্ত, ফোরম্যান, ছটফট করে উঠল। 'এ একটা যুক্তি হল?'

'দোষী বা নির্দোষী একটা কিছু বলতে হবে তো?' সাতকড়ি এগিয়ে এল। 'আমরা আগেও বলেছি এখনো বলছি, দোষী।'

'তা যুক্তি দেখান।' সুবোধ টেবিলে চড় মারল।

'জুরিদের যুক্তি দেখাতে হয় না, তাদের কোনো দায়িত্ব নেই।' বললে সাতকড়ি, 'এই তো একমাত্র আরাম। যা মতলোব এল তাই বলে দেওয়া।'

'এখন আপনার মতলোবে কি আসছে?'

'বলেছি তো। দোষী।'

'কেন, মতলোবটা এ রকম হল কেন?' সুবোধ মাস্টারের মতই প্রশ্ন করলে।

'মশাই, আমি নোটিশ-পাওয়া জুরি নই।' বললে সাতকড়ি, 'কোর্টের বারান্দায় ঘুরছিলাম, জুরি শর্ট দেখে পেস্কার ছুটে এসে আমাকে ধরলে সামিল করে নিলে। কি জুলুম বলুন তো?'

'আপনি রাজি হলেন কেন?'

'রাজি হলুম কেন? সত্যি কথা বলতে, রাজি হলুম', সাতকড়ি গলা নামাল, 'লোকটার পক্ষে কিছু তদবির হবে এই আশায়। তা এই পাঁচ-পাঁচ দিন এখানে ঘোরাফেরা করছি, তাকাচ্ছি ইতি-উতি, তা মশাই, তদবিরের নাম গন্ধ নেই।'

'তাই বলে লোকটা দোষী হবে?' সুবোধ অসহিষ্ণুর ভাব করল।

'কী বলে হবে জানি না। আমার মতটা লিখে নিন—দোষী।'

'আমারও সেই মত।' নড়ে-চড়ে উঠল কমল দাস। 'পাঁচদিন দোকান বন্ধ।'

'আপনি কি বলেন?' জীবন লস্কর এতক্ষণ চুপচাপ ছিল তার দিকে তাকাল সুবোধ।

জীবন হাই তুলল। বললে, 'মশাই, আমি কিছু শুনি নি।'

'শোনেন নি তো কী করেছেন?'

'ঘুমিয়েছি। স্রেফ ঘুমিয়েছি।'

'তা একটা মত তো দেবেন। কেসটা তা হলে শুনুন। বলছি ছোট করে। দেখুন ভেবে চিন্তে—'

'রক্ষে করুন। বাকি ঘুমটুকু মাটি করে দেবেন না।' আবার হাই তুলল জীবন। 'জীবনে আর কোনো শান্তি নেই। শুধু এই ঘুমটুকু যা আছে।'

'তা হলে আপনাদের মত কী?' ঝাঁজিয়ে উঠল সুবোধ দত্ত।

'আপনি যা বলবেন তাতেই আমার ডিটো।'

'আমি যদি বলি নির্দোষ?'

'তা হলে আমিও তাই।'

'কী মুস্কিল, ইউনেনিমাস হতে হবে যে।'

'পরের ট্রেনটাও গেল।' কমল উত্তেজিত হয়ে বললে, 'ইউনেনিমাস হতে হবে তো লটারি করুন।'

'লটারি? সে আবার কী! ডিসকাস করে দেখুন না ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়ায়।' সুবোধ মিনতির সুর আনল।

'হ্যাঁ, দেখুন না।' বিলের হিসেবের থেকে মুখ তুলল দ্বিজপদ। 'পাঁচজন ডাকাতি করল, চালান হল একজন। শুধু এই আসামী, মাখনলাল। এর কখনো মানে হয়? আর বাকি চারজন কোথায়?'

'হ্যাঁ, এ একটা চিন্তার কথা।' সায় দিল সুবোধ।

'আপনি চিন্তা করুন।' ঝলসে উঠল কমল দাস। 'আর বাকি চারজন এখানে-ওখানে পালিয়েছে, ধরা পড়েনি। একজন পড়েছে, তাই তাকেই এনেছে বেঁধে। সহরে কোঠা-বাড়িতে থাকেন কিনা, আমাদের মত তো গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দে নন,' সুবোধের প্রতি কটাক্ষ করল কমল, 'চোর-ডাকাতের যন্ত্রণা আপনি কি বুঝবেন? একজন ধরা পড়েছে, তাই সই, সেই একজনকেই ঠুকতে হবে।'

'কিন্তু ওই যে ডাকাত তার কী প্রমাণ?' সুবোধ তাকাল কমলের দিকে। 'চোখ বড় করবেন না। একটা লোকের চোখ দুটো জ্বলজ্বলে বা ড্যাবডেবে তার জন্যেই সে ডাকাত বলে সাব্যস্ত হবে এ অমানুষের যুক্তি।'

'আপনি অমানুষ।' কমল প্রায় আস্তিন গুটোল। 'আমরা আপনার ছাত্র নই। বলছি দোষী, ব্যস, তাই যথেষ্ট। পাঁচ-পাঁচ দিন মশাই আমার দোকান বন্ধ। তার উপর দেখুন, ফার্স্ট ট্রেনটা ধরতে দিল না।'

'তা-ছাড়া একদিন একটু তদবিরের ব্যবস্থা করল না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাতকড়ি। 'এদিকে উকিল তো লাগিয়েছে দেখছি। খুব লম্বাই-চওড়াই হাঁকছে।

কিন্তু ওর মুহুরি নেই? মুহুরি নেই, তহুরি নেই, খালাসও নেই। নিশ্চয়ই দোষী, একশো বার দোষী—'

'আহাহা যুক্তির কথা বলুন না।' জীবন বলে উঠল।

'আপনি তো মশাই ঘুমিয়েছেন।'

'ঘুমই তো আসল যুক্তি।' হাসল জীবন।

'কিন্তু এখন তো আর আপনি ঘুমিয়ে নেই। এখন মাথাটা লাগান না। শুনুন—' সুবোধ উসখুস করে উঠল।

'তারপর আগে দেখুন না চন্ডীতলা থেকে হৃদয়গঞ্জের ভাড়াটা কত হতে পারে।' দ্বিজপদ তাকাল জীবনের দিকে।

জীবন বললে 'দাঁড়ান, আগে স্থলপথ সারি, পরে জলপথ।' হ্যাঁ, সুবোধকে লক্ষ্য করলে, 'বলুন ব্যাপারটা কী হল?'

'হ্যাঁ, আগে দেখুন ডাকাতিটি হয়েছে কিনা।' সুবোধ উৎসাহিত হল। 'ডাকাতিই যদি প্রমাণ না হয় তা হলে তো মূলেই গেল। আর যদি বোঝেন ডাকাতিটা সত্যি হয়েছে, তখন প্রশ্ন জাগবে, সেইটেই আসল প্রশ্ন, এই আসামী মাখনলাল সেই ডাকাতিতে অংশ নিয়েছে কিনা—'

'আপনি বলছেন ডাকাতিটাই হয়নি?' জীবন এবার বিস্ময়ে হাঁ করল।

'আহা, আমার একার বলায় কী এসে যায়, আপনারা সকলে বলুন।'

'না, না, ডাকাতি হয়েছে বৈকি।' বললে দ্বিজপদ, 'ডাকাতি না হলে আমরা এলাম কেন? ডাকাতি না হলে তো নৌকা ভাড়া কিছুই হয় না।'

'বেশ, হল ডাকাতি। কিন্তু এখন, আসামী যে ডাকাত তার প্রমাণ কী?' সুবোধ মাস্টারের ভাব করল। 'সে তো আর হাতেনাতে ধরা পড়েনি।'

'তাকে চিনেছে।' গর্জন করে উঠল কমল। 'তাকে বাড়ির গিন্নি চিনেছে।'

'হ্যাঁ, সেইটেই দেখুন।' হাতের পেন্সিলটা শূন্যে নাড়তে লাগল সুবোধ। 'কিসে চিনেছে? না, লণ্ঠনের আলোতে। এক সাক্ষী বলছে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুচ্ছিল; আরেকজন বলছে, লণ্ঠন নেবানো ছিল, ডাকাতরা এসে জ্বালিয়েছে। ডাকতরা লণ্ঠন জ্বালাবে কিনা সেইটে বিবেচনা করুন। অতএব চেনাটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা—'

'কেন, ডাকাতদের কারু কারু হাতে টর্চ ছিল—' তড়পে উঠল সাতকড়ি।

'সেই টর্চ কি ডাকাতরা পরস্পরের মুখের উপর ফেলবে যাতে ওদের চিনে নিতে সুবিধে হয়?' বিরক্ত হল সুবোধ। 'তা ছাড়া বাড়ির লোকেরা সাক্ষ্য দিয়েছে ডাকাতদের মুখে রঙ মাখা ছিল। রঙমাখা মুখ চেনা যায়?'

'কেন, গলার স্বর শুনে চিনেছে। আসামী তো প্রতিবেশী।' কমল সাতকড়ির সমর্থনে।

'হ্যাঁ, কিন্তু সেই চেনাতে কি ভুলের সম্ভাবনা নেই?'

'অনেক দিনের চেনা গলা না?' জীবন বললে, 'আসামীর সঙ্গে বাড়ির মেয়ে রানুবালার প্রণয় ছিল—'

'মশাই, আপনি তো ঘুমুচ্ছিলেন', দ্বিজপদ ফোড়ন কাটল। 'প্রণয়ের কথা শুনলেন কী করে?'

'হ্যাঁ, ওইটুকু শুধু কানে ঢুকেছিল—' জীবন চোখ বুজল।

'তারপর চোরাই কখানা বাসন পাওয়া গেছে আসামীর বাড়িতে।' সাতকড়ি বললে।

'কিন্তু সে সব বাসনে নাম লেখা নেই, চিহ্ন নেই।' সুবোধ কাটান দিতে চাইল। 'অতি সাধারণ জিনিস। যে কোনো গৃহস্থের বাড়িই পাওয়া যায়।'

'ডাকাতি যদি না হবে তবে ডাকাতির পরের দিন আসামীকে পুলিশ বাড়িতে পায়নি কেন?' কমল দাস মুখিয়ে এল।

'তার তো ন্যায্য কারণও থাকতে পারে।' সুবোধ সাফাই দিল। 'বেশ তো, ধরুন পুলিশের ভয়েই পালিয়েছে। শুধু বাড়িতে পাওয়া যায়নি তারই জন্যে সে ডাকাত হবে? আসামী যে বলছে, সে গিয়েছিল পাশ গাঁয়ে বোনের বাড়ি, ভাগ্নের মুখেভাতে—'

'তার কোনো প্রমাণ আছে?'

'কোনো প্রমাণের ভারই আসামীর উপর নেই। আপনারা দেখুন—'

'আমরা দেখেছি। আসামীই ডাকাত।' সাতকড়ি গ্যাঁট হয়ে বসল।

'পাঁচ-পাঁচ দিন দোকান বন্ধ।' কমল সায় দিল। 'আলবৎ ডাকাত।'

'আমার মশাই ভিন্ন মত।' বললে সুবোধ, 'যা সব সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তা নিঃসন্দেহে দোষ প্রমাণ করে না।'

'আমি আপনার দিকে।' জীবন বললে। 'আপনি?' দ্বিজপদকে লক্ষ্যকরল।

হিসেবের থেকে মুখ তুলল দ্বিজপদ। বললে, 'আমি বলি কি হুজুরকে গিয়ে বলুন, আপনিই স্যার বুঝে-সুঝে বিচার করে দিন। আমরা একটা নৌকা ভাড়ার বিল তৈরি করতে পারি না—'

'তা হলে একমত হওয়া যাচ্ছে না।' অসহায়ের মত মুখ করল সুবোধ।

'কি করে যাবে?' শাসানোর মত করে বললে সাতকড়ি।

'লটারি করুন।' কমল হুঙ্কার ছাড়ল।

সুবোধ দেখল, বাকি সকলেই লটারির দিকে। একা সে কোন দিক সামলাবে? যাক গে মরুক গে, ঝামেলা মিটুক। হোক লটারি। লটারি করে সিদ্ধান্ত।

ছোট একটা কাগজের টুকরোর এ-পিঠে লেখা হল, গিলটি, ও-পিঠে লেখা হল নট-গিলটি। ঘরের মধ্যে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হল।

'কি পড়ল?' উল্লসিত হয়ে উঠল সুবোধ। 'নট-গিলটি।'

'কই, কই, দেখুন ভালো করে।' আর সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'নট কথাটা আপনি বেশি পড়েছেন। আসলে দেখা যাচ্ছে গিলটি।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সুবোধ দেখল আশার আতিশয্যে নট কথাটা বেশি পড়ে ফেলেছে।

বসে পড়ল সুবোধ। মানুষে আবার কী বিচার করবে? দৈবই বিচারক।

'আপনারা এক মত?' হাকিম প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী আপনাদের সিদ্ধান্ত?'

'গিলটি।'

সমস্ত কক্ষ স্তব্ধ হয়ে রইল। তা আর কী করা! জুরির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে উপায় কী।

জুরির দল বেরিয়ে যাচ্ছে কোর্ট থেকে, সুবোধ আসামীকে লক্ষ্য করে নিচু গলায় বললে, 'কী করব বলো। তোমার অদৃষ্ট মন্দ। লটারিতে গিলটি উঠল।'

'স্যার', মাখনলাল চিৎকার করে উঠল, 'স্যার, ওরা লটারি করেছে। ওরা—'

হাকিম শুনেও শুনলেন না। শুনেই বা কী করবেন! রায় পাশ হয়ে গিয়েছে। চার বছর সশ্রম জেল হয়েছে মাখনলালের।

'স্যার', অসহায় কণ্ঠে আরেকবার চেঁচাল মাখনলাল।

কেউ গ্রাহ্য করল না। যে যার কাজে উঠে চলে গেল। শুধু আদালত কক্ষের অশরীরী প্রেতাত্মা শূন্যঘরে বলে উঠল, সবই লটারি। স্পিন অফ দি কয়েন।

২০। মুন্সি

তদন্তে দারোগা-দফাদার আসে। ঘুষ নিয়ে চলে যায়। খাজনা আদায় করতে আসে জমিদারের তশিলদার, খাজনার ওপর নিয়ে যায় নজরানা। আসে মহাজনের মুহুরি, আসলে মুসমা না দিয়ে সুদ নিয়ে যায় উশুল করে।

যে আসে সেই লুটে নেয়। শুষে নেয়। থাবা মেরে নেয়।

কিন্তু এবার যে এসেছে সে নিতে আসে নি, দিতে এসেছে। আর এমন জিনিস দিতে এসেছে যা যতই দেবে ততই বেড়ে যাবে।

দিতে এসেছে বিদ্যা। আর যে এসেছে তাকে সবাই বলে, মুন্সি! গাঁয়ের লোক বলে 'পণ্ডিত সাইব।'

বাঙলা দেশের দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্রের মধ্যে ছোট একটা চর—নাম চর-গর্জন। গর্ডন ছিল, উচ্চারণ-ভ্রংশে গর্জন হয়েছে।

শুধু অঢেল ধান-খেত। একটা পাঠশালা নেই। মক্তব-মাদ্রাছা নেই। বেশির ভাগই মুসলমান চাষা। অশিক্ষিত। গরিব। ঠগের হাতে লুটের জিনিস।

সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে নির্বোধ করে রেখেছে, গরিব করে রেখেছে। যাতে মহাজন পায় সুদ, জমিদার পায় খাজনা, মোকদ্দমার টাউটরা পায় মুনফা।

'ও সোনার বাপ, আরে কর কি?'
'হাতনায় বসিয়া তামু খাই। ক্যান, এ দিকে আও।'
'তোমার সোনা কই?'
'খ্যাতে গ্যাছে। ক্যান, হ্যারে ক্যান?'
'হালাদার বাড়িতে পুবপাড়িয়া একজন মুন্সি আইচে, পোলাপান পড়াইতে। খুব সাচ্চা মানু—পাঁচ ওক্ত আজান দিয়া নোমাজ পড়ে। পোলাপানও দশ বারুগ্গা জোটেছে। ন্যাহায়-পড়ায় বোলে খুব বালো। আমার ইজুরে পড়াইতে দিতাম। তয় কি না ও একলা যাইতে চায় না—'
'হ্যারে আমি কি করমু?'
'তোমার সোনারে যদি দিতা তয় আমার ইজুও যাইতে পারতে।'
সোনার বাপের চোখ হঠাৎ খুলে গেল। তার সোনা লেখাপড়া শিখবে! আর কিছু না, চাকরি-বাকরি না, হাকিম-বাদশা না, সে পড়তে পারবে হাতের লেখা, ছাপার অক্ষর—দস্তখৎ করতে পারবে চোখ বুজে।
দুই প্রতিবেশী বন্ধু বসে গেল দুঃখের কথা কইতে। একই হুঁকোতে মুখ ঠেকিয়ে-ঠেকিয়ে।
খতে টিপ দিয়ে কর্জ নিয়েছে তিরিশ টাকা, শেষে শুনল তিরিশের জায়গায় লেখা আছে একশো তিরিশ। গোমস্তা এসে চার সনের খাজনা নিয়ে রসিদ দিয়ে গেল, পরে ফের তারি মধ্যে থেকে দু'সনের জন্যে নালিশ ঠুকলে। উকিলকে গেল রসিদ দেখাতে। কোনটা যে রসিদ, কোনটা যে আর্জির নকল, কোনটা বা নুটিশ—তা পর্যন্ত চেনে না! রসিদ বেছে নিয়ে উকিল বলে দিলে, দু'সনের মোটে উশুল পড়েছে। জমির স্বত্ব-দখল পরচায় রেকর্ড হয়, আদালতে পড়াতে গিয়ে দেখে, কখন পাশ-জমির লোক চড়াও হয়ে লিখিয়ে নিয়েছে নিজের নামে। শুনে এমন তাদের অবস্থা, তারা জমিনেও নেই আসমানেও নেই।
কেবল ঠকেছে। কেবল পিছু হটেছে। কেবল ছেড়ে দিয়েছে দায়-দাবি।
কিন্তু সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলিকে তারা ঠকতে দেবে না। পাথুরে অন্ধকারের কুঠুরিতে ফোটাবে দু'একটা আলোর ফোকর।
'টাহা-পয়সা লাগবে নাকি?'
'টাহা-পয়সা মায়না-বুতা কিছুই লাগবে না। রোমজান মাসে শুদু সন্ধ্যাকালে এক বেলার খোরাকি দিলেই অইবে। আর হগল রাত্রিরে খাইবেও না। দাওয়াত খাইবে বাড়ি-বাড়ি। রোমজান মাসে একজন মুন্সি-মোল্লারে খাওয়াইলে কত গুণা মাপ হয় হ্যা জান না?'
'আর দুই-এক টাহা মায়না লইলেই বা খেতি কী? শুদু যদি দলিল-রসিদ পড়তে পারে, ঘুমের মদ্যে আঙুলের টিপ না চুরি যায়, তয় আমাগো পোয়ারা কেল্লা মারেলে—'
কামেল হাওলাদার ধানের বাজারে মজা মেরে বড়লোক হয়েছে। হয়েছে

সম্ভ্রান্ত। নিজের দলিজ-ঘরের বারান্দায় মক্তব বসিয়েছে। গাঁয়ের ছেলে-পিলে বাপ-চাচাদের সে একজন ভারিক্কি মুরুব্বি।

'বিদেশ তিয়া আইয়া যদি এ দেশী পোলাগুলারে একটু মানুষ করিয়া দ্যান, তয় দ্যাশ-সুদ্দা আহার নাম করবে।'

মুন্সি এক গাল দাড়ি দুলিয়ে বললে, 'এ্যা কয়েন কি হুজুর! আমি আপনাগো মদ্যে আইচি কিছু এলেম দিতে, হেলেমও কিছু দিতে চাই! আমাগো দেশী মানষে ল্যহাপড়া আর খোদার কালাম ছাড়া কিছু জানে না। হেইয়া জাহের করতেই আই বছর-বছর—'

তবু দশ-বারোটির বেশি ছেলে জুটলো না।

'বাজান, আমি যামু, আমি পড়মু।' ছেলেপিলেরা লাফালাফি শুরু করে।

বাপেরা চটে ওঠে কেউ-কেউ। 'হগোলডি পণ্ডিত অইলে চাষ করবে ক্যাডা? খ্যাতে পান্তাভাত ল্যাবে ক্যাডা?'

ছেলেরা তবু মানতে চায় না। কেউ কেউ নতুন শেলেট-পেন্সিল, নতুন বই কিনেছে দেখে কাঁদাকাটি করে।

'ছোড জাতের লাইগ্যা ছোড কাম। এ আল্লাই লেইকা থুইছে।'

'তয় হ্যারা ক্যান যায়?'

এমন কি এ গ্রামের সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলি।

'হ্যারার বাপ-মায়ের হাউস অইছে। পোলা দুইডা শ্যাষ অইবে জব্বর অইয়া। এই তোগো মুই কইয়া থুইলাম। ছোড-লোকের ল্যাহাপড়া হিকতে গ্যালেই ঠাইট মরণ।'

মুন্সি বাড়ি-বাড়ি ছেলে খুঁজে বেড়ায়। আরবি-পারসি পড়, দোয়া-দুরুদ পড়, কোরান-কেতাব পড়। সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ভাষা, বাঙলা ভাষা শেখ।

'বিদ্যা না অইলে দুন্নাই মিত্যা।'

হাওলদার সাহেবের বৈঠকখানার বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে স্কুল বসে। মাথায় কিস্তিটুপি, পরনে লুঙ্গি—ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলি, সাত-আট বছরের ছেলে। বসে মুখস্থ করে—অ, আ, ই, ঈ—। শ্লেটের ওপর দাগা বুলোয়। পেন্সিলের লাঙল চলে সাদা শ্লেটের খেতে। দুই বন্ধু পাকা ধানের স্বপ্ন দেখে।

মুন্সি বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসে ফরসি টানে। এবার কি রকম ফসল হয়েছে মাঠে তার হিসেব নেয়।

সন্ধ্যে হলেই বাড়ি-বাড়ি নিমন্ত্রণ আসে। মিলাদ-সরিফের নিমন্ত্রণ।

'আর দ্যাহো, বাড়ির মদ্যে বেশি কিছু জোগাড় করতে নিষেধ করিয়া দিও, কইও, মুন্সি-সাহেব মানা করিয়া দেচে। এ দেশে বালো ঘি পাওয়া যায়, ঘির বানানিয়া অল্প কিছু অইলেই অইবে। আর দ্যাহো, যদি মোরগ-টোরগ জবা দিয়া না থাহে, তয় যেন আর জবা দেয় না। আমি বোজদে

পারচি, খরচ উনি আইজগো অনেক করচে—হাড়েগোনে এত দুদ আনন, এত মিডা আনন ঠিক অয় নাই—'

'না মুন্সি-সাহেব, আমরা গরিব মানু, বেশি-টেশি কি আর জোগাড় করমু। তৌফিক-মতো অল্প কিছু জোগাড় করচি।'

'খোদার নামে দানধ্যান করলে যেমন বালো হয়, কিছু খাওয়াইতে পারলেও বালো অয়।'

পুণ্যের লোভ দেখিয়েছে মুন্সি, আরেক বাড়িতে ডাক পড়ে। আবার আরেক বাড়ি। আগের বাড়ি যা খাইয়েছে পরের বাড়ি তার চেয়ে বেশি খাওয়াবার সরঞ্জাম করে। চলে গ্রাম্য প্রতিযোগিতা।

বিদ্যা যেমন অনেক হজম করেছে মুন্সি তেমনি খাদ্যও সে অনেক হজম করতে পারে।

কিন্তু শুধু খেয়ে পেট ভরে না। নগদ টাকা চাই।

হাওলাদার সাহেব রাষ্ট্র করে দিল, কিছু মাইনে দিতে হয় মুন্সিসাহেবকে।

'বিনা ময়নায় অ-আ তামাইত অইছে। অহন আকার-ইকার হিকতে অইলে টাহা লাকপে দুইডা!'

এরি মধ্যে তাড়াতাড়ি যদি নাম-দস্তখৎটা শিখতে পারে, অনেকে রাজি হয় মাইনে দিতে।

অনেকে আবার হয় না। দুটো টাকা কি কম?

'মায়না আনছ রে করিমের পো?'

'মনে আছলে না।'

'হ্যা থাকপে ক্যান? মনে থাকপে বাইচের লাও আর মামলার তারিখ। তুই আনছ রে ফালাইন্যার পো?'

'আমাগো বড় ঠ্যাহা।'

'মায়নার বেইলে ঠ্যাহা। তিন হান বিয়া করতে তো ঠ্যাকপানা। তুই আনছ রে রাজাউল্লোর ব্যাডা?'

সোনাউল্লা নতুন রাজার মাথার টাকা বের করে দেয় দুটো। দেয় ইজ্জত আলিও। অদ্ভুত চকচকে। চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তবু অনায়াসে দিয়ে দেক দুই বন্ধু। এতটুকু মায়া করে না। তারা লেখা-পড়া শিখবে। তারা বড় হবে।

হামিদের বাপ এসে হাজির।

'মায়নার কতা তো আহে খুব কইচেন। পোলা আমার হ্যাকলে কেমুন?' বলে একটা দলিল ছেলের কাছে মেলে ধরল। 'এ-দলিলটা পড় দেহি?'

হামিদ বললে কাঁচুমাচু হয়ে, 'এ প্যাচ ল্যাহা পড়তে পারমু না।'

'তয় অইছে। বাড়-তে ল, আর ল্যাহন-পড়নে কাম নাই।' ছেলেকে নিয়ে সটান কেটে পড়ে হামিদের বাপ।

কিন্তু সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলি টিঁকে আছে ঠিক। আকার অবধি

শিখেছে, যদি আরো বেশি কিছু মাইনে দিয়ে ইকার-উকার একার-ওকারটা শিখে নিতে পারে, তাতেও তারা রাজি আছে।

রোমজানের মাস ফুরিয়ে আসে। মুন্সির ফিরে যাবার দিন আসে ঘনিয়ে।

আজ ঈদ। গ্রামে আনন্দ আর ধরে না। শত্রু-মিত্র নেই, ইতর-ভদ্র নেই, ধনী-দরিদ্র নেই, সবাই আজ ভাই-ভাই। কেউ ছাগল কেউ মুরগি জবাই করে, তৈরি করে ফিরনি-পায়েস, কোর্মা-পোলাউ। রোজার ফেতরা, রোজার মানত সবই আজ মুন্সি-সাহেবের। গ্রামের ধর্মের খাজনা-আদায়ের সেই তশিলদার।

সোনার ধান ফলেছে অজস্র, তাই ভারা-ভারা নিতে লাগল মুন্সিসাহেব। ছাত্রের মাইনে, ধর্মের মুনফা, মহত্ত্বের মাশুল। পরের বছর যে ফের আসবেন তার দাদন দিয়ে রাখতে হয় আগে থেকে। কত বছরই তো কেউ আসে নি। ইনি যদি তবু এক বছর পরে আসেন! যদি আবার একটু উস্কে দেন পলতেটা।

'যদি আল্লাতালা বাঁচায়, সামনের বছর আপনাগো খেদমতে দাখিল অমু। পোলাপানগুলারে রাইখ্যা যামু, ওগুলা আবার সোমন্ত বুলিয়া না যায়।'

ধান-বোঝাই নৌকো ছেড়ে দেয় মুন্সি-সাহেব। চলে যায় গঞ্জের হাটের দিকে। সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলি পারে দাঁড়িয়ে থাকে। ভয় নেই, বছর পরে আসবে আবার মুন্সি সাহেব। আবার সেই আমনের দিনে।

না, ভুলবে না সোনাউল্লা। ভুলবে না ইজ্জত আলি। সোনাউল্লা 'সনা' পর্যন্ত শিখেছে। আর ইজ্জত আলি শুধু 'ই'।

বছর ঘুরে আসে। আবার ধান ফলে। কিন্তু মুন্সিসাহেবের আর দেখা নেই। শোনা যায় সে এবার গেছে চর আণ্ডারে—মানে য়্যানড্রুসাহেবের চরে। সেখানে সে খুলে বসেছে ধান-বেতনের মক্তব।

ইজ্জত আলি মাঠে পাতা নিয়ে যায়। সোনাউল্লা গরু বাঁধে। আর মাঝে মাঝে নদীর দিকে তাকায় এই মুন্সি-সাহেবের নৌকা এল বলে।

সেই নৌকা প্রকাণ্ড জাহাজ হয়ে উঠবে একদিন। আর সেই জাহাজে চড়ে তারা দুই বন্ধু সুদূর সমুদ্রে পাড়ি দেবে—দিকদিগন্ত ছাড়িয়ে চলে যাবে দূর-দুরান্তের দেশে।

২১। বৈজ্ঞানিক

আগের থেকে দিন-ক্ষণ ঠিক না করে এলে দেখা হয় না।

নথির মধ্যে ক্লান্ত চোখ রাজেন্দ্রনাথ হাত নেড়ে বারণ করে দিলেন।

'এ এক সন্ন্যাসী, স্যার।' মুহুরি কানে-কানে বলার মত করে বললে।

'কেন, কোনো কেস আছে?'

'সন্ন্যাসীর কেস?' যারা উপস্থিত ছিল সন্দেহ প্রকাশ করল।

'আজকাল সন্ন্যাসীর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স আছে, স্থাবর-অস্থাবর আছে, রাগ-দ্বেষ, লোভ-মোহ আছে, আর সামান্য মামলা-মোকদ্দমা থাকবে না?'

আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই থাকবে। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলে সায় দিলেন একবাক্যে। আপনি ব্যারিস্টারদের প্রধান। বিদ্বান-বিদগ্ধের শিরোমণি। আপনি বেশি জানেন। হয়তো বা শেষ জানেন।

'কেস নেই তো, চায় কী?' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচোলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'বললে শুধু দেখা করতে চায়।'

'চাঁদা চায় বোধ হয়।' উপস্থিতদের মধ্যে কেউ বললে। 'অর্থ অনর্থের মূল জেনে হয়তো অর্থের প্রতি লালসা।'

'কিংবা হয়তো কোনো মামলার বিপক্ষ দলের লোক সন্ন্যাসীকে দিয়ে আপনাকে তুক করতে এসেছে।' যে-উকিল মামলা নিয়ে এসেছে সে বললে।

অবজ্ঞার হাসি হাসলেন রাজেন্দ্রনাথ। শিখণ্ডী পাঠিয়ে ভীষ্মকে তুক করা যায়, কিন্তু রাজেন্দ্রনাথকে বশীভূত করতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।

চিরকাল সংক্ষেপ করতে চেয়েছেন রাজেন্দ্রনাথ। একদানে বাজিমাতের মানুষ তিনি। পর্বতপ্রমাণ নথি, বস্তা-বস্তা সাক্ষ্য-প্রমাণ, গাড়ি-গাড়ি আইন আর নজিরের কেতাব—সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে একটি দ্রুত, তীক্ষ্ণ, বিদ্যুদ্দীপ্ত সূত্র তিনি বার করে নিয়েছেন, আর তাতেই সমস্ত রহস্যের নিরসন করে জিনে নিয়েছেন মামলা। যুক্তির পাষাণে শান দেওয়া একটি ব্যর্থ শরক্ষেপেই দুর্গজয়।

ইনিয়ে-বিনিয়ে আর যে যাই বলুক, আইনের কথাটা অত্যন্ত ছোট। পল্লববর্জিত।

'ডাকো সন্ন্যেসীকে।'

সন্ন্যাসী কাছে এসে দাঁড়াল।

চেহারা দেখে সবাই থমকে গেল। মোটেই মডার্ণ মঙ্কের চেহারা নয়। একেবারে সেকেলে। দাড়ি-গোঁফ ও জটাজুটের দণ্ডকারণ্য। হাতে গলায় একরাজ্যের মালা। সঙ্গে আবার চিমটে কমণ্ডলু। পায়ে খড়ম। গায়ে ছাইভস্ম।

মোটেই সংক্ষেপে করেনি। মনে মনে বিমুখ হলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'দিন-ক্ষণ আগে থেকে ঠিক না করে এসেছেন কেন?'

'দিন-ক্ষণ ঠিক না করে অনেকেই আসে।' হাসল সন্ন্যাসী।

'অনেকেই আসে?'

'হ্যাঁ, রোগ আসে, মৃত্যু আসে আর এই সাধুও আসে।'

কথায় যেন হেরে গেলেন রাজেন্দ্রনাথ। তাই স্বর নিজেরও অজান্তে রুক্ষ হয়ে এল : 'কী চাই?'

'আপনার বউমাকে চাই।'

বড় বেশি যেন সংক্ষেপে বলা হল, এমনটিই এখন মনে করলেন রাজেন্দ্র-নাথ। আরেকটু খুলে-মেলে বললে যেন ভালো হত।

'কাকে? তৃপ্তিকে? সে এ-বাড়িতে কোথায়?'

'তার মানে? আপনার ছেলে আর বউ আপনার সঙ্গে থাকে না?'

'না। আমার সঙ্গে থাকবে কেন? আমার ছেলে শঙ্কর, বিরাট এঞ্জিনিয়ার, বিলিতি ফার্মে প্রকাণ্ড মাইনেতে কাজ করে, সে বিবাহিত, সে থাকবে কেন আমার সঙ্গে। সে স্ত্রী নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে আছে। আর, তাই তো উচিত।'

'তার বয়েস তো অল্প—'

'হ্যাঁ, কত আর! পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ।'

'আর তার তো খুব অসুখ।'

রাজেন্দ্রনাথ আবার নথিতে চোখ রাখলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আজ তিন দিন। বাঁচবার কোনো আশা নেই।'

সন্ন্যাসী হাসল। মামলার হার-জিত বলে দেওয়া যায় হয়তো, কিন্তু—বাঁচা-মরা কে বলতে পারে? বললে, 'শঙ্করকে দেখবার জন্যেই তৃপ্তি-মা আমাকে স্মরণ করেছেন।'

অল্প কথায় হবার নয়। মোকদ্দমার আর্জিটা তো অন্তত সবিস্তার পড়তে হবে। তাই বিতং করে বলুন, মামলার বিষয় কী।

স্ট্রোক হয়ে শঙ্কর পড়ে আছে তিন দিন। হ্যাঁ, এটাও অনাবশ্যক দীর্ঘকাল। যতদূর সম্ভব, প্রচুর-প্রচণ্ড আসুরিক চিকিৎসা হচ্ছে। এবার তৃপ্তির ইচ্ছে, দৈবিক হোক। তৃপ্তির এখনো গুরুকরণ হয়নি, কিন্তু তার বন্ধু সুপ্তির এমন এক গুরু আছেন, যিনি সিদ্ধাইয়ে সিদ্ধহস্ত। অমানুষী আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনেক কঠিন রোগ তিনি সারিয়েছেন নিমেষে। সুপ্তির স্বামী নিশীথ জুনিয়ার ব্যারিস্টার, যদি গুরুকৃপায় সুফল কিছু ফলিয়ে দিতে পারে, তাহলে রাজেন্দ্রনাথের অনুগ্রহের রোদে সে বিলক্ষণ তপ্ত হতে পারে। তাই সে উদ্যোগী হয়ে যোগাযোগ করেছে। কত বড় ধনী ব্যারিস্টার রাজেন্দ্রনাথ, আর তাঁর ঐ একমাত্র ছেলে শঙ্কর—গুরুদেব যদি একটা ভেলকি লাগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আর দেখতে হবে না, বিজ্ঞাপনের জোরে লাখ লাখ শিষ্য হয়ে যাবে গুরুদেবের—

'এরা সব বিলেত-ফেরত, এদের সব উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী, এরা যে কী করে এসব আজগুবিতে বিশ্বাস করে ভেবে পাইনে।' ভিতরে-ভিতরে গুমরে উঠলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'সব রকম চেষ্টাই করে দেখছেন।' সাধু বললে সবিনয়ে।

'কিন্তু আপনারটা কোন চেষ্টা? কী করবেন আপনি?'

'শঙ্করের মাথায় হাত রেখে নির্জনে জপ করব।'

'আর তাইতেই শঙ্কর চোখ চাইবে, জ্ঞান ফিরে পাবে? যত সব অবৈজ্ঞানিক কথা। যান মশাই, আমি ওসব অপকার্যে বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু তৃপ্তি-মা করে।'

'ওরে, এঁকে কেউ ও-বাড়িতে নিয়ে যা।' হাঁক পাড়লেন রাজেন্দ্রনাথ : 'আর যারা বিনি পয়সায় ম্যাজিক দেখতে চায় তাদেরও খবর দে।'

'আপনি যাবেন না?' যাবার আগে জিজ্ঞেস করল সাধু।

'না-না, আমার জরুরি কাজ আছে। আমাদের মশাই লজিক, ম্যাজিক নয়।' ঘড়ির দিকে তাকালেন রাজেন্দ্রনাথ।

উপস্থিত সকলে, যারা পরামর্শে এসেছে, তারা মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল : 'আপনার ছেলের অমন অসুখ, কই জানি না তো!'

'জেনে কী ফয়সালাটা হবে?'

'তিন দিন ধরে অজ্ঞান, আর আপনি কোর্ট করছেন?'

'কোর্ট করব না কেন? আমি তো আর অজ্ঞান হইনি। সূর্য-চন্দ্র তাদের কাজ করে যাবে, আমিও আমার কাজ করে যাব।' রাজেন্দ্রনাথ আবার নথিতে নাক ডোবালেন।

'কে দেখছে?'

'কে না দেখছে?' রাজেন্দ্রনাথ চোখ তুলে নিলেন আবার : 'কলকাতায় ডাক্তার-কবরেজ আর বাকি নেই। শেষকালে, দেখছেন তো, এক সন্ন্যেসী ধরে এনেছে। স্বামীর জীবনের জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। কোনো কিছুই আর বাকি রাখছে না। বাদ দিচ্ছে না। যত পাথর পাচ্ছে উলটে-পালটে দেখছে। শেষ পর্যন্ত শুনুন, কী কেলেঙ্কার, মানত করছে গিয়ে মন্দিরে। ঝাড়-ফুঁক করাচ্ছে, মাদুলি পরাচ্ছে।'

'আহা বেচারি!' সকলেরই সমবেদনা তৃপ্তির জন্যে।

'তিনটে নার্স আছে, তবু দিনে-রাতে একফোঁটা ঘুম যাবে না মেয়ে। সর্বক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যদি কখনো চোখ চায়, যদি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনো কথা অস্ফুটে বেরিয়ে আসে। এতখানি ধৈর্য ও প্রতীক্ষা চোখে না দেখলে কল্পনা করা যেত না। মনে হয় ও শুধু তাকিয়ে থেকেই স্বামীর চোখ চাওয়াবে, জ্ঞান আনাবে। যদি কিছু অলৌকিক থেকে থাকে সংসারে, তবে স্ত্রীর ঐ সতী শক্তি। তাই শঙ্কর যদি বাঁচে, তবে ওষুধে-পত্রে নয়, জপে-তপে নয়, বউমার ঐ সতী শক্তিতে।'

'আপনি আজ কোর্টে যাবেন?' উপস্থিত সকলে উঠে পড়তে পারলে যেন স্বস্তি পায়।

'বা, কোর্টে যাব বৈকি। আমরা আমাদের কাজ করে যাব। আইন বসে থাকবে না, আমরাও বসে থাকব না। এ কী, উঠছেন নাকি আপনারা?'

'হ্যাঁ, আজ উঠি। আপনার মন ভালো নেই।'

'আরে রাখুন। আইনের চোখে মন বলে কিছুই নেই। শুধু শরীর। শরীরের ক্রিয়া। কী যেন বলেছে আপনাদের শাস্ত্র? শারীরং কেবলং কর্ম—' হেসে উঠলেন রাজেন্দ্রনাথ।

তবু নথিপত্র গুটিয়ে মক্কেলের দল পালিয়ে গেল। আরেক সময় আসব।

কোর্ট থেকে যথাবিধি বাড়ি ফিরে টেলিফোন করলেন রাজেন্দ্রনাথ। ওপার থেকে ধরল তৃপ্তি।

'খোকা কেমন আছে?'

'একই রকম।'

'সকাল বেলায় এক সন্ন্যেসী গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, উনিই সুন্দরানন্দ স্বামী, খুব পাওয়ারফুল সাধু খুব নামডাক।'

'করল কিছু?'

'শিয়রে বসে চোখ বুজে কতক্ষণ জপ করলেন দেখলাম।'

'ফল হল? চোখ চাইল খোকা?'

'দেখি না তো!' ব্যাথায় বুক ভেঙে যাচ্ছে তৃপ্তির : 'এখন পর্যন্ত তো চেতনার এতটুকুও রেখা দেখি না। তবে রাতের দিকে কী হয়, কিছু উন্নতি হয় কিনা ভগবান জানেন—'

'শোনো, হয়তো ডাক্তারিতেই ফল দিল রাতের দিকে, আর তারই সুবিধে নিয়ে বসল ঐ সন্ন্যেসী—'

'কে কী সুবিধে নিল, তা দিয়ে আমাদের কাজ কী। আমাদের রুগীর জ্ঞান হলেই আমরা খুশি। তবু মহাপুরুষ যে দয়াপরবশ হয়ে এসেছিলেন বাড়িতে, এটাই আমার কাছে খুব শুভলক্ষণ মনে হচ্ছে।'

'নিজের থেকে এসেছেন মনে করো না। নিশীথ ভটচাজ নিয়ে এসেছে অনেক খোসামোদ করে। হয়তো বা টাকা কবুলে। সে ভাবছে, তাতে যদি তার প্র্যাকটিসের সুবিধে হয়। আর সাধু ভাবছে, তাতে যদি তার প্র্যাক-টিসের।' রাজেন্দ্রনাথ একটু বা তিক্ততা আনলেন কন্ঠস্বরে : 'কারু সর্বনাশ কারু পৌষ মাস।'

'আর সকলের দুধে চিনি হোক, তাতে আমাদের আপত্তি কী', তৃপ্তি বললে, 'আমাদের শাকে বালি না হলেই হল। আপনি একবার আসছেন?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

রাজেন্দ্রনাথ ছেলের বাড়ি গিয়ে পৌঁছুলেন।

ভিড়—ভিড়—এত ভিড় কেন বাড়িতে? আর কেন এত গোলমাল?

ও-ঘরে কী? তান্ত্রিক স্বস্ত্যয়ন করছে আর এ ঘরে? চন্ডী পাঠ করছে পুজুরী।

'এ সব কেন?' ভীষণ বিরক্ত হলেন রাজেন্দ্রনাথ : 'এ সবে কী হবে?'

'যে যা বলছেন সব রকম করে দেখছি।' তৃপ্তি বললে, 'কোনো ত্রুটি কোনো খুঁত রাখতে চাচ্ছি না।'

'ডাক্তার—ডাক্তাররা কোথায়?'

'তারা সব উপরে, রুগীর কাছে।'

রাজেন্দ্রনাথ উপরে উঠলেন। তাঁকে দেখে উৎসুক আগন্তুকের ভিড় সরে পড়তে লাগল।

'আমাদের সবতাতেই ভিড়, সবতাতেই গোলমাল।' বললেন রাজেন্দ্রনাথ। 'কিছুতেই সংক্ষেপ হবার জো নেই। সর্বত্রই বাহুল্য, সর্বত্রই বিস্তার। রুগীকে শান্তিতে মরতে দিতে পর্যন্ত আমরা প্রস্তুত নই। রুগীর ঘরে-বারান্দায় এত লোকের যে আমদানি হয়েছে তাতে রোগের সুরাহাটা কী হচ্ছে শুনি?'

একজন কে বললে, 'আর নিচে যে ঐ পাঠ হচ্ছে শুনি?'

'ন্যুইসেন্স!' রাজেন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলেন : 'পড়বি তো এক-আধ পৃষ্ঠা পড়, তা না, গোটা বইটা পড়ছে। মানে, পসার বাড়াবার চেষ্টা। সশব্দে বই পড়লে হবে কী? যম মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনবে আর ভুলে যাবে রুগীকে? এ কি জজ-ঠকানো উকিলের রুলিং পড়া?' রুগীর খাটের কাছে চেয়ারে বসলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'তৃপ্তির ইচ্ছে।' কে আরেকজন বললে।

'হ্যাঁ, তৃপ্তির তৃপ্তি।' সায় দিলেন রাজেন্দ্রনাথ : 'ওর সর্বস্ব নিয়ে প্রশ্ন, তাই ওকে কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু ও একটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের বশবর্তী হবে, হাঁচি টিকটিকি মানবে এ অসহ্য।'

ছোট একটা খুরিতে করে একটা জবাফুল নিয়ে কে ঢুকল।

'এ ফুল দিয়ে কী হবে?' রূঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'এ বাবা চিত্তেশ্বরীর নির্মাল্য।' পিছন থেকে তৃপ্তি বললে, 'চিত্তেশ্বরী খুব জাগ্রত। এর প্রসাদী ফুলের তাই অনেক মূল্য।'

লোকটা সাহস পেয়ে রুগীর মাথায় ঠেকিয়ে বালিসের নিচে গুঁজে দিল।

ডাক্তার বসেছিল পাশে। তার দিকে ক্রূর দৃষ্টি ছুঁড়ে রাজেন্দ্রনাথ বললেন, 'এ সব আপনারা অ্যালাউ করছেন?'

'কেন করব না?' ডাক্তার হাসল : 'আমারাই কি জানি কী দিয়ে কী হয়!'

'তার মানে? বিজ্ঞানে আপনাদের বিশ্বাস নেই?'

'খানিক দূর পর্যন্ত আছে, তারপরে সব ঝাপসা, সব এলোমেলো।'

'তাই আপনারা, ডাক্তররা, আপনারাও খোল-কত্তাল ধরেছেন?' ঝাঁজিয়ে উঠলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'উপায় নেই। দিব্যি আউট অফ ডেঞ্জার ডিক্লেয়ার করে এলাম, শুনলাম তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টেঁসে গিয়েছে—তেমনি আবার—'

'তার মানে কী হল?'

'মানে হল, বিজ্ঞানই শেষ নয়, বিজ্ঞানের বাইরেও আরো কিছু আছে।' ডাক্তার সবিনয়ে বললে।

'যদি কিছু থাকে তো অজ্ঞান।' ছেলের দিকে তাকালেন রাজেন্দ্রনাথ।

কিন্তু রাত নটা হতেই রুগীর অবস্থা ভালো হল। শঙ্কর চোখ চাইল। চিনতে পারল লোকজন। বললে, 'জল খাব।'

আনন্দের ঢেউ পড়ে গেল সংসারে। বাড়িঘর আস্তে আস্তে জনশূন্য হয়ে এল, থেমে গেল মন্ত্রতন্ত্র পাঠকীর্তন।

'তুমি এবার একটু ঘুমোও।' বাড়ি ফিরে যাবার আগে তৃপ্তিকে সস্নেহে বললেন রাজেন্দ্রনাথ।

বিষন্নরেখায় তৃপ্তি একটু হাসল, কথা কইল না। রাজেন্দ্রনাথকে এগিয়ে দিল গাড়ি পর্যন্ত।

ভোরবেলা টেলিফোন বাজল।

'কর্তাবাবু, মানে ব্যারিস্টার সাহেব কোথায়?'

'প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোনো খবর আছে?'

'আছে। শঙ্করবাবু এইমাত্র মারা গেলেন।'

বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে শুনলেন রাজেন্দ্রনাথ। কাছাকাছি চেয়ারটাতে বসলেন। বসে পড়লেন না—ধীরে ধীরে বসলেন।

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন। আজ শনিবার। কোর্ট নেই। বাতাসে স্বস্তির স্পর্শ পেলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'কাল রাতে যখন ওবাড়ি থেকে চলে আসি, বউমার মুখের হাসিটা আমার ভালো লাগল না।' যেন কাউকে লক্ষ্য করে নিজের মনেই বলছেন, 'শঙ্কর জ্ঞান হবার পর সকলে কেমন হালকা মনে আনন্দ করছে, কিন্তু তৃপ্তির হাসিটি বিষাদে মাখা। ও কি বুঝতে পেরেছিল এই আনন্দ টিকবে না!'

কিন্তু এখন একবার তৃপ্তিকে গিয়ে দেখ।

শঙ্করের মৃতদেহের উপর লুটিয়ে পড়ে সমুদ্রের মত কাঁদছে। আর কত কী বলে-কয়ে আকুলি-ব্যাকুলি করছে তার লেখাজোখা নেই।

স্তব্ধ হয়ে এক পাশে বসে আছেন রাজেন্দ্রনাথ।

তৃপ্তির শোক যতই গভীর হোক, অভ্রভেদী হোক, এই প্রকাশটি রাজেন্দ্রনাথের কাছে বাড়াবাড়ি লাগছে—অবৈজ্ঞানিক। মৃতদেহটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখবার কী হয়েছে? কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে? শ্মশানযাত্রীরা টেনে কেড়ে নিয়ে যাবে জোর করে?

স্বামী তাকে কত কী আদর সোহাগ করেছিল, কত কী আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেসব গোপন কথা জগজ্জনে প্রচার করাটাও নিরর্থক। সব স্বামীই এ রকম করে থাকে, বলে থাকে। এর মধ্যে কী এমন অভিনবত্ব শঙ্করের!

শোক প্রকাশের রীতিতেও শালীনতার দরকার।

আহা, কাঁদতে দাও, ঢালতে দাও, নিঃশেষ হতে দাও। তোমার মত নির্মম, নিরশ্রু আর কজন!

ফুল—ফুল, ফুলই বা কত! আর কত বা ফটোগ্রাফারের ক্লিক-ক্লিক।

তৃপ্তি নিজের হাতে সাজিয়ে দিল স্বামীকে। বরবেশে সাজিয়ে দিল। সাজিয়ে দিয়ে উঠেই মাথা ঘুরে টলে পড়ে গেল মাটিতে। সবাই ভাবলে বরের সঙ্গে বধূবেশে সহমরণে যায় বুঝি।

না, সামলেছে তৃপ্তি। বলছে, 'আমি বেঁচে না থাকলে এ দহনজ্বালা বইবে কে?'

'কিন্তু আপনার এতটুকু অস্থিরতা নেই।' সোমবার দিন কোর্টে এলে সবাই ঘিরে ধরল রাজেন্দ্রনাথকে, 'আশ্চর্য পুরুষ আপনি।'

'বৈজ্ঞানিক পুরুষ।' নির্লিপ্ত মুখে বললেন রাজেন্দ্রনাথ, 'অস্থির হয়ে উন্মত্ত শোক করলে কিছু সুফল হবে? হয়েছে? আমার বৌমা যে এত শোক করছেন, বিশ্বপ্লাবী শোক, তাতে তাঁর স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন?'

কত বারণ করেছিল সবাই, তবু পুরোপুরি থান পরেছে তৃপ্তি। হাতে গলায় সোনার এক সুতো স্মৃতিও রাখেনি। চুল ছেঁটে দিয়েছে। মেঝেতে খড় বিছিয়ে শুচ্ছে। চারদিকে দেয়ালে শঙ্করের নানা বয়সের নানা ভঙ্গির ছবি, নানা জাতের জিনিসপত্র। যেখানে চোখ পড়বে সেখানেই শঙ্কর দেখবে। শঙ্কর ছাড়া দিক নেই দৃশ্য নেই।

রাজেন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে দেখেন তৃপ্তিকে, মনে মনে অভ্যর্থনা করেন, বলেন, একেই বলে সতীশক্তি।

ছেলেপিলে হয়নি, তৃপ্তিকেই শ্রাদ্ধ করতে হবে।

যত অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। চালকলার পিণ্ড করে নাও-নাও খাও-খাও বললেই মরা লোকের ভূত এসে তা খেয়ে নেবে? গাঁজার কলকে দিলে তাও?

শ্রাদ্ধের বিরোধী রাজেন্দ্রনাথ।

আর যদি কিছু করতেই হয় নমো নমো করে সেরে দাও। কিন্তু তাতে তৃপ্তির আপত্তি। অশৌচের পর্বটাও দশ দিনে সংক্ষেপ করতে সে রাজি নয়, পুরো ত্রিশ দিন সেটাকে নিয়ে চলো। আর ত্রিশ দিন কি, বাকি জীবনটাই তো এখন মরণাশৌচ।

'বাবা, ওঁর ভারি ইচ্ছে ছিল আমাকে দিয়ে একটা নার্সারি খোলান—' বললে তৃপ্তি।

'হ্যাঁ, আমি জানি। নইলে তুমি বাকি জীবন থাকবে কী নিয়ে? সতী-শক্তি এবার মাতৃশক্তি হবে।' রাজেন্দ্রনাথ কি অবৈজ্ঞানিক হচ্ছেন? পর-মুহূর্তেই বাস্তব স্বরে বললেন, 'তোমার নামে আমি বাড়ি কিনে নেব। কথাবার্তা আজ সকালেই হয়ে গেছে। দিন সাতেকের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করে দেবে আশা করি।'

'ওঁর নামে ইস্কুলটার নাম হবে।'

'ওর নামের কী দরকার? তোমার নামের মধ্যে দিয়েই ও বেঁচে থাকবে। তাই নার্সারির নাম হবে তৃপ্তি। এমনিতেই একটা তুষ্টিবাচক নাম।' রাজেন্দ্রনাথ উদার সুরে বললেন।

অনেক দিন পর তৃপ্তি একটু হাসল।

পরদিন বুধবার বললে, 'বাবা, ওঁর লাইফ ইনসিয়োরের টাকা—'

'খোঁজ নিয়ে দেখলাম মোটে চল্লিশ হাজার। আমি নিজের থেকে আরো ষাট হাজার দিয়ে এক লাখ পুরিয়ে তোমার নামে ব্যাঙ্কে রেখে দেব। ভালো হবে না?'

'হবে।' সামান্য ঘাড় হেলাল তৃপ্তি। আর এবারের হাসি ঠোঁট ছাপিয়ে গালে লুটিয়ে পড়ল।

'ইস্কুল নিয়ে, বাবা, আমাকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে।' এ বললে বৃহস্পতিবার।

'তা তো করতেই হবে।' রাজেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাই ভাবছি ছোট গাড়িটা তোমাকে ট্র্যান্সফার করে দেব।'

হাসি আজ তৃপ্তির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। বললে, 'আমি ড্রাইভিং শিখে নেব।'

'কী দরকার! ড্রাইভারের মাইনে আমি দেব।'

ভালোবাসায় ভোলালেন রাজেন্দ্রনাথ। বাড়ি দিলেন গাড়ি দিলেন নগদ টাকা দিলেন ষাট হাজার।

সমস্ত কায়-কারবার চূড়ান্ত করে নিতে তিন সপ্তাহ লাগল।

তারপর আটাশ দিনের দিন, শ্রাদ্ধের দু'দিন আগে রাজেন্দ্রনাথের কাছে ডাকে এক চিঠি এল।

বাবা,

আপনি মহানুভব। আমি দিনকয়েকের মধ্যে বিয়ে করছি। আপনি আমাকে মার্জনা করবেন। শ্রাদ্ধটা আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবেন দয়া করে। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিন। ইতি। তৃপ্তি।

চিঠিটা বার কতক পড়লেন রাজেন্দ্রনাথ। অন্যমনস্কের মত এটা-ওটা কটা আইনের বই ঘাঁটলেন। পরে টেবিলের উপর মাথা গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন ছেলের জন্যে।

২২ । মাটি

দরজার কাছে কে-একটা লোক ঘুরঘুর করছিল। হেডমাস্টারবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন : 'কী চাই ?'

লোকটা থতমত খেয়ে সরে যাচ্ছিলো, হেডমাস্টারবাবু তাকিয়ে দেখলেন, সামনেই তাঁর ইস্কুলের ছেলে আজিজর রহমান। বললেন, 'দেখ তো লোকটা কে।'

এ সময়টা হেডমাস্টারবাবুর ভয়ের সময়। তিনবছর আগে নরোত্তমপুরে থাকতে তাঁর বাড়ি পুড়ে যায়, ঝাঁকে-ঝাঁকে বেনামী চিঠি তাঁর হাতে আসে। এ জায়গাটা ঠিক পাড়াগাঁ না হলেও বলা যায় না কার কী অভিসন্ধি। দিনে-দুপুরে হলেও গা-টা ছমছম করে ওঠা আশ্চর্য নয়।

'আমার ফাদার, স্যার।' আজিজ কুণ্ঠিতমুখে বললে।

এতটা গুরুদয়ালবাবু ভাবতে পারতেন না। যেন থমকে গেলেন।

ছেলের পরিচয়ের সুতো ধরে সাহসে ভর করে আমানত ঘরে ঢুকলো। গুরুদয়ালবাবু যেন ফাঁপরে পড়লেন, আর কোনো কারণে নয়, ছেলের সঙ্গে বাপকে কিছুতে মেলাতে পাচ্ছেন না বলে। আজিজের পরনে ঢিলে পা-জামা, পায়ে স্যাণ্ডেল, গায়ে ডোরা-কাটা সার্টের উপর গরম কোট, বুকটা বিস্ফারিত খোলা, সার্টের কলারটা ইস্ত্রির কড়া শাসনে ফণা তুলে আছে। আর, আমানত প্রায় বুড়ো, পরনে খাটো পুরানো লুঙ্গি, গায়ে ছিটের কোরা কুর্তা, কাঁধের উপর জ্যালজেলে একখানা দোলাই।

কেন এসেছে, গুরুদয়ালবাবুর আন্দাজ করতে দেরি হলো না। তবু অভিভাবক যখন, বসতে দিতে হয়। 'বসুন।'

ফাঁকা চেয়ার ছিলো সামনে কিন্তু আমানত দরজার কাছে মেঝের উপরই বসে পড়লো। হাত জোড় করে বললে, 'ঐ আমার একমাত্র ছেলে। বাবু, আপনি না দয়া করলে—'

ছেলেকে দেখা গেল না। বাপকে পৌঁছে দিয়েই সে গা-ঢাকা দিয়েছে।

'চাষাভুষো মানুষ, অতশত বুঝি না বাবু। শুধু কৃপা করে ছেলেটাকে আমার—'

'কৃপা করে—' গুরুদয়ালবাবু হাসলেন : 'তা হলে ইস্কুলের বেঞ্চিচেয়ারগুলোকেও এলাউ করতে হয়।'

'ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই বাবু।'

এই যুক্তির সামনে গুরুদয়ালবাবু ভারি অসহায় বোধ করলেন। বাইরে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

আমানত তাঁর পিছু নিলো। আগের কথাটার পুনরুক্তি করলো। লিখিত পুনরুক্তিটা বিরক্তিকর, কিন্তু কথিত পুনরুক্তিটা কেমন কাতর শোনায়।

'কী করেন আপনি?'

'আমি? গৃহস্থি করি।'

'গৃহস্থি মানে? চাষবাস?'

'তা নইলে খাবো কি করে বাবু?'

'প্রজাবিলি আছে? না, খাসে রেখে আধি দিয়েছেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে আমানত বললে, 'জমিই মোটে এখন দশ বিঘেতে দাঁড়িয়েছে। তার আবার প্রজাবিলি না আধি!'

'জমি তবে নিজেই চাষ করেন নাকি?'

'আর কে করবে বলুন। দু' চারটে পাইট কখনো খাটে, মাঝে-মাঝে দু'চার বিঘে কখনো ফুরন দিই, নইলে সব আমিই নিজ হাতে কারকিত করি।'

চলতে-চলতে গুরুদয়ালবাবু থেমে পড়লেন। কম করে গ্রাম্য একজন গাঁতিদার বা মহাজন ভেবেছিলেন, কিন্তু একেবারে নিজের হাতে লাঙল ঠেলে—এটা যেন তাঁকে ঘা মারলো। আপাদমস্তক দেখলেন একবার

আমানতকে। দেখে তাঁর আর সন্দেহ রইলো না, এ একেবারে একজন খাঁটি মাটির মানুষ। গুরুদয়ালবাবুর গলা থেকে সম্ভ্রমের সুরটুকু উবে গেল। বললেন, 'তোমার তবে এই ঘোড়ারোগ হলো কেন?'

আমানত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

'বলি, ছেলেকে দিয়ে এই ঘোড়দৌড় খেলার সখ হলো কেন তোমার? হাল ছাড়িয়ে কলম ধরতে দেবার কী দরকার ছিলো?'

আভাসে মর্মার্থটা বুঝতে পেরেছে আমানত। ম্লান চোখে ঔজ্জ্বল্য আনবার চেষ্টা করে বললে, 'ও যে বড়ো হতে চায় বাবু।'

'যথেষ্ট বড়ো হয়েছে!' গুরুদয়ালবাবুর গলায় একটু শ্লেষ ফুটে উঠলো কিনা আমানত ধরতে পারলো না : 'চাষার ছেলে ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়েছে. এতেই গাঁয়ের পান্ডিতি মিলে যাবে দেখো। নিদেন রেজেস্ট্রি-আপিসের ডিড-রাইটার তো হতে পারবে।'

'না বাবু, অত ছোটতে ও রাজি নয়।' আবার চকচক করে উঠলো আমানতের চোখ : 'ও বলে ও হাকিম হবে, মেম্বর হবে, মন্ত্রী হবে—'

'কিন্তু অত যে হবে, পড়ে না কেন?'

'পড়বে বাবু, ঠিক পড়বে। আপনি খালি এ-যাত্রা ওকে পাশ করিয়ে দিন। আমি ওর জন্য আলগা মাস্টার রেখে দেব।'

'তোমার যে দেখছি অনেক পয়সা।' গুরুদয়াল বাঁ চোখের কোণটা একটু কুঞ্চিত করলেন : 'মহাজনি আছে বুঝি?'

'হায়রে বরাত!' আমানতের মাথাটা ঝুঁকে পড়লো মাটির দিকে, হতাশার ভঙ্গিতে।

'তবে, দশ বিঘে তো জমি, চালাও কি করে? জমা কত? খানেওলা ক'জন?'

'দশ বিঘে তো হালে বাবু, কিন্তু ছিলো আমার সত্তর বিঘে। তিন মৌজায় ছড়ানো। বেশির ভাগই তার কান্দর জমি, বিঘে প্রতি ধান হতো দশ-বারো মণ. খলেনে যখন ধান এনে তুলতাম—' আমানতের গলা ঝাপসা হয়ে এলো।

'সে সব গেল কোথায়?'

'সব এই ছেলের পিছনে। খাইখালাসী বন্ধক নিয়েছে মহাজন, খতে লিখেছে জায়সুদি। শেষকালে আসল টাকার জন্য ডিক্রিজারি করে নিলেম করে নিয়েছে। হ্যান্ডনোটে টিপ দিয়েছি দশ টাকা বলে, পরে শুনি আর্জি করেছে একশো টাকায়। দশের পিঠে একটা গোল্লা বসালেই নাকি একশো হয়। লেখাপড়া জানি না বলেই তো এই দশা। তাই মতলোব ছিলো ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে দলিলে-দস্তাবেজে আর কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। জমি-জিরাৎ সব সামলাতে পারবো।'

'দলিল পড়তে আর লাগে কী! ঢের হয়েছে তোমার ছেলের বিদ্যে।'

'আমিও তাই ওকে বলি বাবু, ঢের হয়েছে। কী হবে আর বিদ্যে নিয়ে?

তুই চলে আয় আজিজ, বলি ওকে, বাপে-পোয়ে মিলে জমিতে লেগে যাই দু'জন। গোলা ভরে সোনা জমাই। আবার আমার সত্তর বিঘে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি।' আমানতের দুই চোখ আবার চকচক করে উঠলো।

'ও কী বলে?'

'রাজি হয় না বাবু।'

'তা কী করে হবে? গায়ে যে তিন পল্লা উঠেছে। গেঞ্জির উপর সার্ট, সার্টের উপরে কোট। বড়ো যে প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়েছ। অত সব ছাড়ে কি করে?' গুরুদয়ালবাবু হাসলেন।

আমানত এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। বললে, 'তাই আর ওর পাশ করা ছাড়া গতি নেই। দয়া করে দিন না ওকে বেরিয়ে যেতে।'

'এখন আর আমার হাতে নেই। তলার দিকটা সেক্রেটারিবাবুর হাতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করো গে। কী উঠেছে এবার তোমার ক্ষেতে?' ছোট্ট ভ্রূকুটি করে গুরুদয়ালবাবু কেটে পড়লেন।

পালানে কিছু ঠাকুরি-কলাই করেছিলো আমানত। ঝুড়ি করে তাই নিয়ে দেখা করতে গেল সে সেক্রেটারিবাবুর বাড়ি।

ভুজঙ্গ হালদার শুধু ইস্কুলের সেক্রেটারি নয়, যৌথ ব্যাংকের ম্যানেজার, তদুপরি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। বিকল্পে সবাই তাঁকে অনাহারী বলে। সেই কারণে সর্বত্রই তাঁর গ্রাসটা কিছু উদ্যত।

ফেরিওয়ালা ভেবে আমানতকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ভুজঙ্গবাবু, কিন্তু তার বক্তব্য শুনে ও ঝুড়িটার ওজন আন্দাজ করে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'শেষ লিস্টি আমি কাল সকালেই টাঙিয়ে দেব। দেখি আর কে-কে আসে।'

শহর থেকে আমানতের বাড়ি প্রায় তিন ক্রোশ, দু'দুটো খাঁড়ি পেরিয়ে, মরালডাঙার গাঁয়ে। আজিজ থাকে ইস্কুলের হস্টেলে, সানকিতে করে পান্তা আর পেঁয়াজ খেয়ে নিত্যি সে পায়ে হেঁটে ইস্কুল করতে পারে না। আর তার সবে-ধন এই আজিজ। দু'দুটো জোয়ান ছেলে মরেছে জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে, রেখে গেছে কতগুলি মেয়ে, চাষার ঘরে যা অবান্তর। ছেলের জন্যে বুড়ো বয়সে সেও নিকে করেছিলো কিন্তু নেকজানের মা কেবল রোগে ভোগে।

সকাল থেকে আমানতের মন খারাপ। আজিজ সব শুষে নিচ্ছে এই বলে নেকজানের মা তাকে সমস্ত রাত গঞ্জনা দিয়েছে। কোথায় ছিল আর কোথায় তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে আজিজ। আমানত বলেছে : 'আর দুটো দিন সবুর করো নেকজানের মা, আজিজ আমাদের আবার সব ফিরিয়ে দেবে।' নেকজানের মা বলেছে : 'কচু! মান সেদ্ধ খেয়ে থাকতে হবে সবাইকে।'

নেকজানের মার আমলেও সে কম দেখেনি। আগে দলিজঘর ছিল, খলট ছিল যেন বেড়াবার মাঠ, দু'খানা ছিল গরুর গাড়ি, সাইকেল ছিল একটা, তিন-তিনটে ছিল হ্যারিকেন। তার গায়েও দু'চার গাছা বাজুখাড়ু উঠেছে। কিন্তু আজ সে সব কোথায়? ঘরের টিন উড়ে গিয়ে ছন এসেছে, অস্থাবর

করে গাড়ি-সাইকেল ধরে নিয়ে গেছে মহাজন, খলটের জমি লেগেছে এখন খেতির কাজে। গাছ-গাছালিতে বাড়ির সীমানা ছোট হয়ে আসছে দিন-দিন।

কিন্তু আশা ছাড়েনি আমানত। বাড়ির গায়ে হালটের উপর দাঁড়িয়ে আদিগন্ত তাকিয়ে এখনো সে আন্দাজ করতে পারে কতদূর পর্যন্ত তার জমির সাবেক চৌহদ্দিটা প্রসারিত ছিল। তার ঠাকুর্দা এজারদ্দি সেখ—মুদাফৎ এজারদ্দি সেখ আজো দেখা যাবে জমিদারের চিঠা-খতিয়ানে। ভয় নেই, সব আবার আজিজ ফিরিয়ে আনবে। বিয়ে করে ছেলে এনে দেবে তাকে এক পাল—নাতিতে-ঠাকুর্দাতে মিলে তারা চৌপহর আবাদ করবে। আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামবে ঝমঝম। মাঠে জল দাঁড়িয়ে যাবে একহাঁটু। মাঠ ছেয়ে তরতাজা ধান উঠবে গজিয়ে।

ভাটিবেলায় আজিজ এসে হাজির।

'নাম টাঙিয়ে দিয়েছে বাপজান। এক লক্ষ্মণ মণ্ডলের ছেলেটা পায়নি। লক্ষ্মণ বিনাটাকায় হ্যান্ডনোট কাটতে রাজি হয়নি, তাই।'

আমানতের খুসি হবারই কথা, কিন্তু কেন কে জানে চোখদুটো তার চকচক করে উঠলো না। ছেলেকে কেমন যেন তার বিদেশী, বেমানান মনে হচ্ছে। যেন বড়ো বেশি এলেম, বড়ো বেশি চটক তার চেহারায়। সব কিছু কেমন বেজুত লাগে তার সামনাসামনি।

'পাশ করলে, এক হাঁড়ি রসোগোল্লা নিয়ে আসতে পারলে না?' নেকজানের মা মুখ ঘুরালো।

আমানতের মনে পড়লো এমনি রসগোল্লা আনতো সে শহর থেকে যখন ভালো দর পেত সে ধানের। বলতো : 'খবর জবর ভালো নেকুর মা, সরু-এলাইর দাম চড়েছে। কিনে এনেছি এই রসোগোল্লা। আর এই এক গোছা পদ্মপাতা। সবাইকে দাও পাতায় করে।'

সে সব দিন কি আর আছে?

'চাচা এই তিলকুট দিয়েছে নানী। গুড়ের তিলকুট।'

'গুড়ের নয় বোকা।' আজিজ সংশোধন করে : 'ওটা চকোলেট। সাহেব-মেমের বাচ্চারা খায়।'

তিলকুটের স্বাদ বেড়ে যায়। তারপর তার মোড়কের কাগজ নিয়ে শিশু-গুলোর মধ্যে মারামারি সুরু হয়।

'এলাউ তো হলাম, কিন্তু ফি-ঠি জড়িয়ে লাগবে এখন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা।' আজিজ আমানতকে মনে করিয়ে দেয়।

'টাকা?' আমানত ভিতরে ঝাঁকুনি খায় : 'এত টাকা মিলবে কোথায়?'

'না মিললে চলবে কি করে? শেষকালে পারে এসে ভরাডুবি হবে নাকি?'

হলেও যেন ভালো ছিল। আমানতের বুকের ভিতরটা হাজাশুখা জমির মত খাঁ-খাঁ করতে থাকে।

'এবার ছাড়ান দে, আজিজ। ঐ দ্যাখ ঐ নদী পর্যন্ত আমার জমির সীমানা

ছিলো।' দক্ষিণে দূর জলের রেখা যেখানে আকাশের সাদায় গিয়ে মিশেছে সেই দিকে চেয়ে আমানতের চোখ চকচক করে ওঠে : 'সব হাতছাড়া হয়ে গেছে। আয়, দুজনে লেগে যাই লাঙল নিয়ে, সব আবার ছিনিয়ে নিয়ে আসি বুকে করে।'

আজিজ হেসে ওঠে : 'তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? নিশ্চয় সব আবার ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো। আমাকে মানুষ হতে দাও একবার। তুমি ভাবছ কী? থাকবে নাকি আর এই আউড়ের ঘর? সব পাকা ইমারত হয়ে যাবে দেখো। আর তখন সব মধ্যস্বত্ব কিনবো—প্রজা বসিয়ে দেব, রায়ত আর কোলরায়ত—গায়ে মাটি মেখে লাঙল আর বাইতে হবে না তোমাকে। তখন খাজনা নেব—নগদ আর ধানকড়ারি।'

'গায়ে মাটি মাখবো না তবে বাঁচবো কি করে?'

আজিজ আবার হেসে ওঠে : 'সাবান মেখেও দিব্যি বাঁচা যায় বাপজান, ভাবনা কী?'

না, দরিয়ার পারে এনে না' ডুবানো যায় না. কিন্তু কোথায় পাবে টাকা? মহাজনের মহাজনরা সব খয়রাতির মুখ দিয়েছে বন্ধ করে, একপয়সা কেউ কর্জ দেয় না। সাদা খত দূরের কথা, রেহানী খতেও টাকা ছাড়তে কেউ রাজি নয়। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। রেজাইখানা কাঁধে চাপিয়ে আমানত হাজীসাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হলো।

আর্জি শুনেই হাজীসাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো : 'আবার টাকা ধার করতে এসেছ কোন মুখে হে আমু মিয়া? দু'দুখানা বন্ধকী তমসুকে -দু' বিঘে আর তিন বিঘে—বোর্ডের কারসাজিতে বেমালুম ছাড়িয়ে নিয়ে গেলে—আবার টাকা কিসের হে? অভ্যেস এখনো শোধরালো না দেখছি।'

'ছেলের পরীক্ষার ফিস দিতে হবে, গোটা পঞ্চাশ টাকা চাই হাজীসাহেব। খাইখালাসী নিন কটকবালা নিন—যা আপনার পছন্দ। দু'বার করে তো আর বোর্ডে যেতে পারবো না।'

'অত সব ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই বাপু। সোজাসুজি সাফকবলা করতে তো দেখতে পারি।'

'কতখানি চাই কত টাকায়?' আমানত আড়ষ্টের মতো জিগগেস করলে।

'ঐ পাঁচ বিঘেই আমার চাই—যা তুমি তখন ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিয়েছ। ঐ পাঁচ বিঘে আওল জমি বিক্রি করো তো একশো টাকা দিতে পারি।' হাজীসাহেব বললে কাঠ-কাঠ।

'কিন্তু হালফিল একশো টাকার আমার দরকার নেই।' আমানত যেন ফেললো।

'টাকার আবার দরকার নেই কার? এ যে নতুন বাত শোনাচ্ছ মিয়া। করতে না চাও দর-পরদা রেখে দাও জমিয়ে।'

'কিন্তু কান্দর জমি—বিঘে প্রতি দাম মোটে কুড়ি টাকা?'

'ঢোল-সহরৎ করে দেখলেই পারো। না পোষায় অন্য জায়গায় দেখ। আমি এক কথার গাহেক। খাতিরনাদারৎ।'

'দু' বিঘে নিন না—দু' বিঘেতে পঞ্চাশ টাকা ফেলে দিন। ফরমানি করুন, হাজীসাহেব।' আমানত মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

'বলি, গরজটা কার হে, আমু মিয়া? এক লপ্তে জমি চাই পাঁচ বিঘে—সবই তোমার এক কদরের জমি নয়, কান্দরের সঙ্গে ডাঙ্গাও কিছু আছে—দাগ-খতেন আমার মুখস্ত। তোমার টাকার দরকার কম হতে পারে কিন্তু আমার জমির দরকার কম নয়। রাজি থাকো তো কবলার মুসবিদা করে ফেলি। পরে আধি নিতে চাও তো নিতে পারো—ফসল যখন করা হয়ে গেছে। বুঝলে, এর বেশি মহকুফ চলবে না।'

কী দমবাজ, কী দুঁদে—আমানত ভাবে, কিন্তু দাঁত ফোটাতে পারে না। উপায় কী—কোথায় নইলে টাকা! তার আজিজ নইলে মানুষ হয় কী করে! সাত দিন পরে ফিস দেবার শেষ তারিখ, আজিজ তাগিদ পাঠিয়েছে। ঘুরঘুট অন্ধকারে আমানত দিক-বিদিক দেখতে পায় না, কবালার গায়ে কোনাকুনি বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে ফেলে।

ধানের শীসে আগুনের শিস—সমস্ত মাঠ ভরে গেছে এখন সোনার আমেজে। পাঁচ বিঘে চকবন্দী করে দিয়ে গেছে হাজীসাহেবের জমানবীশ। গা-গতর ঢেলে চাষ করেও ফসলের অর্ধেক শুধু তার।

'এই পঞ্চাশ টাকা তোর কাছে রেখে দে, নেকজানের মা।'

'কী, আমার পৈঁছে হবে নাকি?' নেকজানের মা ঘুরে দাঁড়ায়।

'ঢামালি করিস নে। মেজাজ আমার আজ রুঠা হয়ে গেছে।'

'কেন, হয়েছে কী? টাকা পেলে কি করে?'

'লুটতরাজ করে। নাউড়ে হয়ে এবার ডাকাতি করতে বেরুবো।' আমানতের চোখ ছলছল করে ওঠে।

'বলো সত্যি করে, টাকা কে দিলো।'

'আর কে দেবে, নেকজানের মা? আমার এই জমি আমার এই জায়দাদ ছাড়া আর কে ছিলো আমার? আমি একটা আহম্মক, সব ভুট করে দিলাম।'

'কী, জমি বিক্রি করেছ বুঝি? কতখানি? এবার কি সব তবে ভুকসানি হয়ে মারা যাবো নাকি?' নেকজানের মা চোখে আঁচল চাপা দিল।

'ভয় নেই নেকজানের মা। আমাদের আজিজ আছে। রহমান আছেন। আবার সব ফিরে পাবো।'

ধান কেটে খলেনে ভাগ হয়ে গেল। গাড়ি বোঝাই হয়ে গেল হাজীসাহেবের। আউড়ের কুটোটি পর্যন্ত সে কুড়িয়ে নিলে। আমানতের দেহে যেন আর জোর নেই, জেল্লা নেই, শিটা হয়ে আসছে দিন-দিন।

মজুদ পঞ্চাশ টাকা রাখা গেল না সরিয়ে—উড়াল দিয়ে চলে গেল। আজিজ যাবে শহরে পরীক্ষা দিতে। রাহা-খরচ আছে, খোরাকি আছে, জামা-কাপড়

আছে—ফরদা সে খরচের ফর্দ। এদিকে ধুলধেকড়া সব ছেলেপিলেদের পরনে। তবু, যতটা পেরেছিলো রেখেছিলো আমানত হাতের মুঠ আঁট করে, শোনা গেল মাস্টারসাহেবের দু' মাসের পাওনা বাকি আছে কুড়ি টাকা।

'ফকির-ফোকরা হয়ে বেরিয়ে যাবে নাকি শেষকালে?' নেকজানের মা ঝামটা দিয়ে ওঠে।

'কী যে বলিস তার ঠিক নেই। আজিজ আমাদের মসনদে বসাবে। তুই থাকিস ইমারতে, নেকজানের মা, আমি আমার ভুঁইয়ে বুক দিয়ে পড়ে থাকবো।'

আরো পাঁচ বিঘে এখনো আছে। ঝাঁ ঝাঁ করে আকাশ, মেঘের ছিটেফোঁটা নেই আনাচে কানাচে। আমানত আকাশের দিকে তাকায় আর লাঙল ঠেলে। পানিপশালা এবার আর হলো না এ-তল্লাটে! আধপেটাও বুঝি আর জোটে না। এবার বোধহয় নগদা মজুরিতে পাইট খাটতে হয়।

না, রহমান আছেন। টেনেবুনে আজিজ পাশ করেছে। চাষার ছেলে আজ তাকে আর কে বলে। বদলে গেছে তার নামনিশানা।

'কী করবি আজিজ?' জিজ্ঞাসা করতেও যেন সম্ভ্রম হয়।

'পড়াবার তো আর মুরোদ নেই তোমার, এবার তাই চাকরি নেব।'

চাকরি আছে গোটাকতক। আদালতের আমলা। প্রাথমিক একটা পরীক্ষা হবে লোকদেখানো। জেলার সেরেস্তাদারকে যে ভারি হাতে খাওয়াতে পারবে তারটাই অবধারিত, আর সব খারিজ।

'একশো টাকায় রফা হয়েছে, বাপজান।'

'আবার টাকা!'

কিন্তু চমকে ওঠার কিছু নেই। নৌকো শুধু পাড়ে ভিড়ালেই চলবে না, নোঙর নামাতে হবে। টাকা দেবার জন্যে জমি রয়েছে এখনো নিটুট পাঁচ বিঘে।

দোয়াত-কলম স্ট্যাম্প-ইত্যাদি নিয়ে হাজীসাহেব এসে হাজির। পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে—বাকি পাঁচ বিঘেও লোপাট হয়ে গেল।

সদর থেকে আজিজ চাকরির খবর নিয়ে এলেও আমানতের কান্না থামলো না : 'একেবারে ফৌত-ফেরার হয়ে গেলাম, নেকজানের মা।'

বাপ-পিতামহের ভিটেটুকুই শুধু আছে। কিন্তু কী হবে তার এই বাস্তু দিয়ে যদি আর তাতে বস্তু না থাকে এক কণা!

আজিজ সবাইকে শহরে নিয়ে এলো, তার কর্মস্থলে। ত্রিশ টাকা মাইনেতে টায়েটুয়ে সে চালিয়ে নেবে সংসার। এদিক-ওদিক আছে কিছু উপরি—ঘাঁতঘোঁত সে এরি মধ্যে দোরস্ত করে নিয়েছে। এলেমদার ছেলে সে—কাউকে পরোয়া করে না।

কিন্তু ছিলিম খেয়েও আমানত আর আগের স্বাদ পায় না, শ্রান্তদেহে তামাকের সে-ধার। দু দিনেই তার গতুরে শরীর কেমন ধসকে গেছে, বাত জমে উঠেছে গাঁটে-গাঁটে। মেজছেলের বৌটা আলাদা হয়ে গেছে, বড়ো ছেলের বৌটাও যাব-যাব করছে। নেকজানের মা রয়েছে এখনো তাকে আঁকড়ে।

কিন্তু একেক সময় ইচ্ছে করে আমানতের, তাকে তিন-তালাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে আবার তার মাটির আকর্ষণে—কাঁচা-সোনা-গা নয়লী যৌবনী কাউকে সাদি করে ফের বুড়ো বয়সে, এক ফৌজ সৃষ্টি করে সে মাটির উপর, দিগন্ত পর্যন্ত সে সবুজের তরঙ্গ তুলে দেয়।

তার দিন আর কাটে না। অনড় হয়ে আসে তার হাত-পা। খাবার পর ঢেঁকুর ওঠে। তাই আজিজ তাকে বাজারে একটা খোপরি ভাড়া করে দিয়েছে। আমানত সেখানে বসে চোখে চশমা লাগিয়ে সেলাইয়ের কল চালায়। ফতুয়া বানায়, কুর্তা বানায়, সার্ট বানায়। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যবসা। আমানত আর চাষা নয়। খলিফা। আজিজ আর চাষার ছেলে নয়, খলিফার ছেলে। অনেক নরম লাগে শুনতে।

কিন্তু যেদিন আকাশ কালো করে টিনের চালের পরে বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌ করে, আমানতের পা-কল কেমন আপনা থেকেই থেমে যায়—বৃষ্টিটা মনে হয় যেন কান্নার শব্দ; আর সেই শব্দে ভেসে আসে তার মাটির ডাক। তার মাটি তাকে ডাকে—ডাকে—অনেক দূর পর্যন্ত ডাকে। বলে, আমানত, চলে আয়।

২৩। রং নাম্বার

'হ্যালো।' রিসিভার তুলে নিল জয়ন্ত।

'তুমি এখন ফ্রী আছ?' ওপার থেকে জিগগেস করল অরুণিমা।

'না। রং নাম্বার।'

রং নাম্বার মানে ঘরে লোক আছে।

'আচ্ছা। পরে আবার করব। না—এবার তুমি—'

দেওয়ালের কান আছে, কিন্তু এ টেলিফোনের কথা শোনবার আর দ্বিতীয় কান নেই।

কটার সময় করতে হবে বলে দেয় নি।

নটা। যাক আরও দশ মিনিট। হস্টেলে ফিরে আসবার সময় ছাত্রীদের বেলায় আটটা, সুপারিনটেন্ডেন্টের বেলায় আর এক ঘন্টা বেশি। পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে আরো দশ মিনিট ছেড়ে দেওয়া সমীচীন।

'হ্যালো।' ওপার থেকে আওয়াজ হল। 'কাকে চাই?'

অন্য কোনো মেয়ের গলা। ছাত্রীরা কেউ হয়তো।

'সুপারিনটেণ্ডেন্ট আছেন?' জিগগেস করল জয়ন্ত।

'না। এখনো ফেরেন নি।'

'আচ্ছা।'

'কিছু বলতে হবে?'

'না।'

ঘরে ফিরে এসে অরুণিমা শুনল কে তাকে ফোন করেছিল।

ছাত্রী টিপ্পনী কাটল, 'কে একজন ভদ্রলোক।'

'কে জানে।' তাচ্ছিল্যের ভাব করল অরুণিমা!

নিরালা হয়ে তাকাল টেলিফোনের দিকে। একবার তুলে নেবে নাকি কানে? ছটা অঙ্ক এদিক ওদিক সন্নিবেশ করার পরই চকিতে শোনা যাবে সেই মধুক্ষরণ কণ্ঠস্বর। শোনা যাবে সেই ডাক, অরুণ, অরুণ, আমার ভোরের অরুণ, লজ্জার অরুণ, কামনার অরুণ,—পুরুষের নাম ধরে ডাক শুনতে কী অদ্ভুত যে লাগে। প্রায় সূচ্যগ্র স্পর্শের মত। তুলবে নাকি রিসিভার? মুহূর্তে দেখবে নাকি আশ্চর্যকে? কত দূরে আমি কত দূরে সে। মাঝখানে কত মাঠ কত রাস্তা কত শব্দ কত অন্ধকার। কত বিধি কত বাধা। কিন্তু ছটা অঙ্কের সন্নিবেশ করলেই হৃদয়ের কানে হৃদয়ের মুখ রাখা। আমি তাকে ডাকব জয়, সে ডাকবে অরুণ, আরও একটু গাঢ় হলে রুনি।

কিন্তু এখন ডাকব কী! এখন তার ঘরে তার স্ত্রীর রাজ্য বসেছে। যদি সিনেমায় গিয়ে থাকে ফিরে এসেছে বাড়ি। ছোটদের খাবার টেবিলে ডাক পড়েছে। কিংবা হয়তো রেডিওতে শব্দঝরা নাটক শুনছে। ফোন করতে গেলেই রং নাম্বার হয়ে যাবে।

জয়ন্তেরই উচিত নিজের সময় খুঁজে নেওয়া। কখন অরুণিমা হস্টেলে থাকে বা না থাকে সে শিডিউল তো তাকে দেওয়াই আছে। একটু আধটু ব্যতিক্রম সব নিয়মেরই আছে। তা ছেড়ে দিলে জয়ন্তই তো বেশি নিশ্চিত— সেই তো পারে দড়ির দুই প্রান্ত এক করতে। কিন্তু গরজ তো তার নয় গরজ অরুণিমার।

জয়ন্তের জন্যে তো রয়েছে উপশম। কিন্তু অরুণিমার শয্যাভরা আস্তীর্ণ যন্ত্রণা। আর স্বীকার করতে দোষ কি, অরুণিমা এখনও অচ্ছিন্না কুমারী, অনাঘ্রাতা।

তবু যন্ত্রণায় আমি কাতর হব না, যন্ত্রণায় আমি উজ্জ্বল হব।

'আমার বড় দোষ—' বলছিল অরুণিমা।

'কী দোষ?' জিগগেস করছিল জয়ন্ত।

'আমি খুব অধীর।'

'অধীরতা তো গুণ।'

'গুণ?'

'অধীরতা তো অপ্রাপ্তিকে সুস্বাদু করে। অধীরতাই তো অকপট।'

'কিন্তু অধীরতার চেয়ে দৃঢ়তা কি ভাল নয়?' আকুল চোখে তাকিয়েছিল অরুণিমা।

জয়ন্ত হেসেছিল করুণ করে: 'দৃঢ়তা তো স্থবির।'

'না, দৃঢ়তাই যৌবন।' হেসেছিল অরুণিমা।

এখনও বেশবাসে ঢিলেঢালা হয় নি এরই মধ্যে আবার কতকগুলি মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আর তক্ষুনি বেজে উঠল টেলিফোন।

'হ্যালো।' অরুণিমা তুলে নিল রিসিভার।

'তুমি একা আছ?'

মুখচোখে বিরক্তির ঝাঁজ আনল অরুণিমা : 'না। রং নাম্বার।' রিসিভারটা রেখে দিল সশব্দে। যেন ভাগ্যের মুখের উপর ছুঁড়ে মারল।

'তোমরা আবার এখন কী করতে এসেছ?' প্রায় কান্নার মত সুরে রুখে উঠল অরুণিমা : 'আমার শরীর ভাল নেই, আমি তোমাদের পিটিশন ফিটিশন এখন শুনতে পারব না। সব কিছুরই একটা সময় আছে, শ্রী আছে—'

তাড়িয়ে দিল মেয়েদের। দরজা বন্ধ করে দিল।

অরুণিমা তাকাল টেলিফোনের দিকে, সম্বোধন করে বলল, 'জয়, আমি এখন একা, অভেদ্য একা, আমাকে কিছু বল, আবার আমাকে বোঝাও—'

কী আর বলবার আছে, কী আর বোঝাবার আছে। অনেক বলেও বলা হয় না, আর যে বোঝাবে সেই বোঝে না কিছু।

তবু টেলিফোনে কথা বলাটা কী সুন্দর! নতুন রকম শ্রোতা-বক্তা নতুন রকম সুর।' নতুন রকম। সন্নিহিত হয়েও ব্যবহিত। ব্যবহিত হয়েও সন্নিহিত।

অনেক কথা আছে যা মুখে বলা যায় না অথচ চিঠিতে লেখা যায়। অনেক কথা আছে যা মুখেও বলা যায় না চিঠিতেও লেখা যায় না অথচ বলা যায় টেলিফোনে। আরেক দেশের আরেক রকম ভাষা। মৌলিকও নয়, লৈখিকও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি অথচ দুটোকেই অতিক্রম করে। রঙ্গমঞ্চে এসেও একটা নৈপথ্য থাকা। সম্মুখীন বলতে বলতে আবার খানিক স্বগত বলা।

'কী দেখে আমাকে তুমি ভালবাসলে?'

'কী দেখে? তোমার পৌরুষ? তোমার প্রতিভা? তোমার ঐশ্বর্য? বল না কী বলব? তোমার হৃদয়? সেই তোমাকে যখন বললাম, জান, এত বড় হয়েছি এখনও সমুদ্র দেখি নি, তুমি তার উত্তরে বললে, আমার হৃদয় দেখ। আসল কথা কী জান? আসল কথা, আমাকে কোনো পুরুষই দেখেনি হৃদয়ের চোখে, তৃতীয় চোখে। তোমার মাঝেই প্রথম দেখলাম এই তৃতীয় চোখ। তাই তোমাকে দোরি-র মানুষ জেনেও দূরের মানুষ করে রাখতে পারলাম না।'

এ সব কথা কি চিঠিতে লেখা যায়? ফাঁকা কাব্যের মত লাগে। বলা যায় মুখে? নাটুকে নাটুকে শোনায়।

এ সব কথার জন্যেই টেলিফোন।

ইচ্ছে করে মাঝরাতে একটা ফোন আসুক। সাধ্যি কি এক ঝলকও ঘন্টা বাজে। মেয়েদের জিভ তো এমনিতেই নড়ে, ঘন্টা শুনে কানও নড়তে থাকবে। কত মেয়ের মধ্যরাতেও ঘুম আসে না। হিংসেয় ফেটে যাবে, আহা, এই নিশীথস্বর যদি আমার হত!

তবে সেদিন মধ্যরাতে যখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল ফোন এসেছিল অরুণিমার। এমন তুমুল বর্ষণ ঘণ্টার শব্দ পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল।

'জান, মধ্যরাতে ডায়াল করতে পর্যন্ত ভয়।' ওপার থেকে বলেছিল জয়ন্ত। 'যদি ও জেগে ওঠে। ও কে বুঝতে পেরেছ তো?'

'পেরেছি। উহ্য থাকলেও যে কর্তৃকারক।'

'সুন্দর বলেছ। কিন্তু আসলে কর্তৃকারিকা।'

'ঘুমুচ্ছেন?'

'বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন।'

'আলো জ্বেলেছ?'

'না। আলো জ্বাললেই ধরা পড়ে যাব। টর্চ টিপে নম্বর দেখে ডায়াল করলাম। এখন অমল অন্ধকার।'

'জয়।'

'অরুন! রুনি!'

এ পরিবেশ কি চিঠিতে হয়? না হয় সাক্ষাৎ-দর্শনে? এ পরিবেশের রচয়িতা টেলিফোন।

সাক্ষাৎ-দর্শন কি সোজা কথা? দুজনের কাজ আর ছুটিকে খাপ খাওয়ানোই কঠিন। আর সবচেয়ে অসুবিধা জয়ন্ত যেতে পারে না হস্টেলে, মেয়েদের হস্টেলে, আর অরুণিমা যেতে পারে না জয়ন্তের বাড়ি যেখানে তার স্ত্রী নীলাক্ষী রয়েছে একচ্ছত্রী।

জয়ন্তের যে ছুটি তার বেশির ভাগ নীলাক্ষীই গ্রাস করে নিয়েছে আর অরুণিমার যা ছুটি তা থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি।

তা টেলিফোনেও যখন রং নাম্বার, ছাত্রীদের কান-নাড়া, তখন চিঠি ছাড়া আর গতি কি! সভ্য সমাজে ভাগ্যিস সম্ভ্রান্ত একটা নিয়ম ছিল যে পরের চিঠি খুলে পড়া হয় না। তাই আর সেদিকে কোনো আলোড়ন ছিল না। শান্তির সরোবর বলতে চিঠিই। নাই বা থাকল তাতে টেলিফোনের শিহরণ।

এরই মধ্যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে ঠেকো ওখানে গোঁজা দিয়ে, এ-ঘরের ঘুঁটি ও-ঘরে বসিয়ে, গোল গর্তে চৌকো ঘুঁটি—মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছে তাদের।

সেদিন দেখা করেছে একটা পার্কের ফটকে। তারপর দুজনে ভিতরে ঢুকে—একটাও খালি বেঞ্চি নেই—বসেছে ঘাসের উপর। নিরিবিলি একটু ঘাস পাওয়াও দুষ্কর।

'জান তোমার কাছে আমি একটি উপহার চাই।' বললে অরুণিমা।

'বেশ তো, বল, কি চাও। তাহলে বসলে কেন? ওঠ।' তাড়া দিল জয়ন্ত: 'দোকানগুলো এখনও বন্ধ হয় নি। পকেটে আজ আমার যথেষ্ট টাকা আছে।'

'টাকা?' পাথরের চোখে তাকাল অরুণিমা।

'টাকাই তো সামামবোনাম। কাঞ্চনের আসল হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা।' হঠাৎ একেবারে মাটিতে নেমে এল জয়ন্ত : 'টাকা দিয়েই তো শাড়ি গয়না বই ঘড়ি—যা চাও।'

'আমি তোমার কাছে শাড়ি গয়না চাই?'

'চাইলে ক্ষতি কি! চাওয়াই তো উচিত।' হাসল জয়ন্ত : 'ভরণ বলতে আভরণ আর পোষণ বলতে পোশাক—'

'না, ওসব নয়।' গম্ভীর হল অরুণিমা : 'আমি তোমার কাছে একটা ছোট্ট জিনিষ চাই।'

'ছোট্ট?'

'হ্যাঁ, বলতে পারো সূচ্যগ্র। একটা স্থায়িত্বের চিহ্ন।'

'সে আবার কি?'

হাতব্যাগ থেকে ছোট একটা রুপোর কৌটো বার করল অরুণিমা। খুলল। খুলে দেখাল। আলোতে জয়ন্ত দেখল, সিঁদুর।

খোলা কৌটো এগিয়ে দিয়ে অরুণিমা বললে, 'তোমার আঙুল করে এর এক ফোঁটা আমার কপালে আর সিঁথেয় দিয়ে দাও।'

হো-হো করে হেসে উঠল জয়ন্ত। বললে, 'চাঁদ ওঠে নি তো আকাশে? এ বুঝি চাঁদ সাক্ষী করে বিয়ে করা।'

'তা জানি না।' কৌটো সরিয়ে নিল না অরুণিমা।

'তুমি ভাবছ এমনি একটা ফোঁটা তিলক কাটলেই তুমি আমার অ্যাডিশনাল বউ হয়ে গেলে।'

'তাছাড়া আবার কি। লোকের তো একাধিক বউ থাকে। আর স্ত্রী হয়ে আমি তো তোমার কাছ থেকে ভরণ-পোষণ চাইব না।' স্বর দৃঢ়তর হল অরুণিমার : 'আমি একাই দাঁড়াতে পারব নিজের পায়ে। শুধু কপালে একটা জয়টীকা পরে বেড়ানো। ঝুঁকি যে নিতে পারি তার সাইনবোর্ড এঁটে চলা। নির্ভয় হয়ে চলা। তারপর সত্যি যদি ঝুঁকি নেবার দিন আসে—'

থামা হাসিটা আবার খুঁচিয়ে তুলল অরুণিমা। জয়ন্ত বললে, 'লোকে জিজ্ঞেস করলে কী বলবে!'

'বলব বিয়ে করে এলাম। ছাত্রীরা কুমারী, আমিও কুমারী। ওরা যদি এ বেলা বেরিয়ে ও বেলা বিয়ে করে আসতে পারে, আমি ওদের কর্ত্রী, আমি পারব না?'

'স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?'

'স্বামীর নাম বলা বারণ, কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। যদি করে, যদি নেহাৎ বলতেই হয় বানিয়ে বলব। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে জানব কে আমার নিরন্তর।' খোঁচানো আগুন দাউ দাউ করে উঠল : 'এত তোমার হাসবার কী হয়েছে?' আহতের মত প্রশ্ন করল অরুণিমা।

'একাধিক বিয়ে আর নেই।' হতাশার সুর মিশিয়ে জয়ন্ত বললে, 'সে

স্বর্ণযুগের অবসান হয়েছে। নতুন আইন মানুষের নতুন আশার পায়ে কুড়ুল মেরেছে।'

'তার মানে?'

'তার মানে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আরেক মেয়েকে বিয়ে করা অবৈধ।'

এক মুহূর্ত দেরি করল না অরুণিমা, নিষ্ঠুর আগ্রহে বললে 'বেশ, যাতে বৈধ হয় তাই কর।'

স্তব্ধ হয়ে গেল জয়ন্ত।

অরুণিমা সরে এল একটু ঘন হয়ে। বললে, 'আমাকে তাহলে তুমি ভালবাস না?'

'ভীষণ, ভীষণ ভালবাসি। এ কথা বলতে দ্বিধা কোথায়? বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বলতে পারি তা গলা ছেড়ে।' অরুণিমার বাঁ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল জয়ন্ত : 'এমন লাবণ্যের প্রতিমা আর কে আছে! কোথায় এমন মর্মরের মসৃণতা? ফাট নেই, খিঁচ নেই, আঁশ নেই, ঢালা নির্মলতার স্রোত। জীবনে এত স্বাদ এত শ্রী এত উৎসাহ আর কে দিল!'

কী হল আজ অরুণিমার? চোখ ভরা জ্বলন্ত অশ্রু নিয়ে বললে, 'তুমি আমাকে চাও না প্রবলের মত, পুরুষের মত!'

'বলতেই পারি চাই, কিন্তু চাইতে পারার মত বল কই, আইন কই!' জয়ন্ত ঘাস ছিঁড়তে লাগল।

'তার মানেই তাই।'

'কিসের মানে!'

'ভালবাসার মানে। তার মানেই তুমি আমাকে ভালবাস না।'

'তাহলে বল বুকের নিশ্বাসকে ভালবাসি না। ভালবাসি না মুখের খাদ্য। চোখের সুনিদ্রা।' জয়ন্ত দুই চোখে তাকাল। বয়স একটু বেশি হয়েছে, তা হোক, কার বা না হবে বাঁচলে। বয়স একটা মায়া ছাড়া কিছু নয়। আভাস মাত্র। অবিদ্যার কল্পনা। আভাসে যাই হোক, সন্দেহ কি, অক্লিন্ন। কবিতার খাতার অলিখিত পৃষ্ঠার মত শুভ্র। জয়ন্ত আরো বললে, 'তোমাকে ভাল না বাসা মানে জীবনকে অস্বীকার করা, পরের ঘরে পোষ্য দেওয়া—'

'তাহলে,' নিজেই এবার জয়ন্তের হাত ধরল অরুণিমা : 'বিয়েটা বৈধ করে নাও।'

'তার আগে বিচার করে দেখ আমি কি বিয়ের পক্ষে উপযুক্ত? মজবুত? আমি নড়বড়ে হয়ে গেছি না? তুমি মরচে পড়া ভোঁতা তরোয়াল নেবে কেন? তুমি নেবে তাজা টাটকা শানের জৌলুস-লাগানো তরোয়াল!'

আগুন, আগুন। কোন্ কাঠের আগুন, অশ্বত্থের না পাকুড়ের, এ পতঙ্গের জিজ্ঞাসা নয়। প্রেম, প্রেম। প্যাশান ফ্যাশান মেনে চলে না। ভালোবাসার গাগেনা ভালো বাসা।

'কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়েটা বৈধ করতে হলে স্ত্রীকে, নীলাক্ষীকে ছাড়তে হয়।' বললে জয়ন্ত।

'খুব কঠিন বুঝি?' যেন চোখের কোণ থেকে বাণ ছুঁড়ে মারল অরুণিমা।

'ছাড়া কিছু কঠিন নয়। পুরনো হয়ে গিয়েছে, একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, নানাভাবে জীবনে নানা উৎপাত ঘটাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে সন্দেহের কাঁটা, কে চিঠি লিখল, কে ফোন করল, কোথায় কী কার কথা একটু লিখলাম ডায়ারিতে, কেন বাড়ি ফিরতে উৎরে গেল সন্ধ্যা। জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে কিন্তু—' সর্বস্বহীন নিঃস্বের মত তাকাল জয়ন্ত।

'কিন্তু—'

ছাড়তে হলে আইনে একটা ওজুহাত লাগবে। কোনো একটা বিশেষ দোষে দোষী হতে হবে। শুধু রাগী সন্দিগ্ধ শুধু দুর্মুখ এই কারণে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। অসহায় শোনাল জয়ন্তকে : 'তেমন কোনো দোষ তো খুঁজে পাচ্ছি না নীলাক্ষীতে—' তারপর আদালতের বারান্দায় এসে যেমন বখশিশ দেয় তেমনি বোধহয় স্তোক দিল জয়ন্ত : 'আচ্ছা, দেখি—'

সিঁদুরের কৌটো ফিরিয়ে নিল না অরুণিমা। ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কিন্তু তার নিগূঢ়ের দাবি ছুঁড়ে ফেলে দিল না মাটিতে।

চিঠি লিখল : 'তোমাকে আমার চাই। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। বাবা এবার আমার বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। কোন এক মফস্বলী হাকিম পাকড়ে এনেছেন আমার জন্যে। ছোট বোন মধুরিমাকে বলেছি তার গতি করতে। ছোট ভাই দেবলদের ম্যাগাজিনে সেই যে ছোট কবিতাটা দিয়েছ সেটা আমারও মনের কথা। স্পর্শমণির মনে কোন দ্বৈধ নেই এ লোহা কসাইয়ের খড়গের না পুরোহিতের পূজার। তেমনি প্রেমের মনেও কোনো বিচার নেই এ বৈধ না অবৈধ। আমি বাবাকে বলে দিয়েছি আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ঈস, যদি একটা জীবন্ত প্রমাণ থাকত, যদি অন্তত একটা শিশু থাকত আমার—'

'হ্যালো—' সাড়া দিল অরুণিমা।

'আমি!'

'রং নাম্বার না তো?'

'না। রং নাম্বার সিনেমায়।'

'শোনো, আমার চিঠি পেয়েছ?'

'পেয়েছি। পেয়েছি বলেই তো—কী সাংঘাতিক চিঠি।'

'মোটেই সাংঘাতিক নয়। তুমি তো দেখি বলে কত ভাবলে। শেষকালে আমিই ভেবে দেখলাম—'

'কী দেখলে?'

'দেখলাম বৈধ দরকার নেই। অবৈধেই আমি খুশি। অবৈধই আমার ঐশ্বর্য। তোমাকে না পাই, তোমার—'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

'মাথা খারাপ না হলে কি ভালবাসি? জেনে শুনে অথচ চোখ বেঁধে অসম্ভবে ঝাঁপ দিই? সামান্য হয়ে গণ্যমান্যকে স্তব করি? শোনো'—যেন কোন সাজানো শহরে আগুন লেগেছে এমনি একটা মিলিত কোলাহলের স্বর : 'শোনো, তোমাকে না পাই তোমার সারসত্তাকে চাই।' আমি তোরে ভালবাসি অস্থিমাংসসহ—সেই প্রেমের কথা পড় নি? তোরে, তোমারে নয়। আমারও সেই ক্ষুধা। অস্থির, অস্থি-র ভালবাসা। আমি ছিন্নমস্তা, নিজের মাথা কেটে নিজের রক্তে স্নান করি। শোনো, আমাকে অবৈধই দাও—'

'তার মানে!'

'তার মানে তাই। ডাস্টবিন থেকে ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে এসে আমি শুধু এক মফস্বলী হাকিম নিরস্ত করতে চাই না, আমি আমার নিজস্বকে চাই, নির্বাচিত নিজস্ব। সমস্ত কিছু পন্ড হয়ে যাক এক সঙ্গে। জগৎ সংসার চিরদিনের জন্যে নিরস্ত হোক।'

'তোমার চাকরি যাবে।'

'যাক। আমি অন্য জায়গায় গিয়ে চাকরি পাব। বিধবা সাজব। জবালা হব। তোমার কাছ থেকে এক পয়সা চাইব না। ওকে আমি মানুষ করব। কে জানে তোমার চেয়েও হয়তো বড় মানুষ হবে—'

'পরিচয় দেবে কী ওর!'

'পরিচয় আবার কী! আমার ছেলে।'

'তা নেবে না সমাজ। যখন বড় হবে স্কুলে পড়বে তখন বাপের নাম লাগবে—কী বলবে তখন?'

'তোমার নাম বলবে।'

ফোনের মধ্যেই হেসে উঠল জয়ন্ত : 'প্রমাণ কী? যে কোনো মেয়ে তার পেটের ছেলেকে যে কোনো পুরুষের বলে চালাতে চাইলেই চলে না—প্রমাণ কী?'

অরুণিমা নির্বিকার : 'প্রমাণ হবে না। সব বস্তুই আদালতের নয়। কত জিনিসই তো প্রমাণ হয় না। তাতে কী যায় আসে? প্রমাণ ছাড়াও সংসার ঠিক চলে যাচ্ছে—'

'আমি অস্বীকার করব।'

'কোরো। আমিও বলব তোমাকে তাই করতে। তবু প্রেম বল, কলঙ্ক বল, প্রেমের চন্দন বা কর্দমের তিলক বল, ও আমার।

'তোমার মুখে চুনকালি পড়বে।'

'তবু তোমার মুখে না পড়ুক। তোমাকে আমি আড়াল করে রাখব। কোনো দাবি সাব্যস্ত করতে দাঁড়াব না তোমার দুয়ারে। রাস্তায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব না। আমার নিজের জিনিস নিজে লুকিয়ে রাখব। তুমি আমাকে দিয়েছ। ভালবেসে কত জিনিসই তো দেয়, নেয়, পায় এই

সংসারে। তোমার কাছে না হোক, আমার কাছে প্রমাণ হোক। একটি শুধু প্রমাণ দাও আমাকে।'

'কিসের? আমার ভালবাসার?'

'না, আমার ভালবাসার। আমি যে তোমাকে ভালবাসলাম তার স্থির প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রমাণ। যদি কলঙ্কসাগরে নাই ভাসতে পারলাম তাহলে কিসের ছাই আমার ভালবাসা?'

রিসিভার রেখে দিল জয়ন্ত। 'আচ্ছা, দেখি—' ভয়ে ফুটল না বুঝি কণ্ঠস্বর।

ভয়ই শীতল সুন্দর। নীরব সুন্দর। সেই সুন্দরকে কতক্ষণ তুমি শীতল করে রাখবে, নীরব করে রাখবে! আবার কদিন পরে জয়ন্ত ধীরে-ধীরে রিসিভার তুলল।

একবার খোঁজ নিতে হয়। একটা বিঘটন কিছু করে না বসে। দড়িটা না ফাঁস হয়ে যায়।

'হ্যালো, রং নাম্বার?'

'না।'

'কী বৃষ্টি হচ্ছে বল তো।'

'ভীষণ। সমস্ত রাস্তা নদী হয়ে গেছে কিন্তু গাড়ি তো নৌকো হয় নি। ভাসা যায়, আসা যায় না।' বললে জয়ন্ত।

'কোনো উপায় কোনো মন্ত্রে কোনও জাদুবলে, ছোট্ট একটি মাছি হয়ে, দরজার জানলার কোন একটা অজানা ফাঁক দিয়ে—'

'মাছি হয়ে?' হাসল নাকি জয়ন্ত!

'এককণা বারুদের মুহূর্ত হয়ে—'

'কিন্তু তোমার দরজায় দারোয়ান বসা, অপরিচিত আগন্তুককে ঢুকতে দেবে কেন?'

'তা জানি না, শুধু এই জানি—'

'হাতে হাতকড়ি পড়বে। খবরের কাগজের শীর্ষাক্ষর উজ্জ্বল হবে। তার চেয়ে তুমি এস।'

'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে। খরার দিনে।'

'সত্যি বলছ?' মাটির তলার অদৃশ্য টেলিফোনের তার ঝংকৃত হল। 'সেই বাঘের বাচ্চা ছাগলের পালের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিল, ঘাস খাচ্ছিল, তারপর বনের জ্যান্ত জ্বলন্ত বাঘ এসে তাকে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে তার মুখের ছায়া দেখাল জলে, দিল মাংস খেতে, রক্তের স্বাদ পেতে—দেবে? এই ক্ষুদ্রতম বিন্দুতম স্বাদ—দেবে?

'দেব। চিনবে তো বাড়ি?'

'খুব চিনব। কতবার লুকিয়ে দেখে এসেছি। দোতলায় তোমার ঘরের

আভাস, বারান্দায় ফুলের টব সাজানো। সেদিন দেখলাম এক ভদ্রমহিলা টবে জল দিচ্ছেন—ওই বুঝি তোমার স্ত্রী—নীলাক্ষী—'

'হ্যাঁ, আরেক টব।'

'কিন্তু যাব কি! আমার দারোয়ান তো বাইরে তোমার দারোয়ান ভিতরে।'

'এমন এক লগ্নে ডাকব যখন দারোয়ান থাকবে না।'

'থাকবে না মানে? কোথায় যাবে?'

'কোনো এক আত্মীয়ের বাড়ি এক রাত্রির জন্যে স্থানান্তরিত করব। বিয়ে-থা তো এখনো উঠে যায় নি সমাজ থেকে।' হাসল বুঝি জয়ন্ত : 'তেমনি এক ঢাউস নিমন্ত্রণে চালান করে দেব একদিন।'

'তাই থাকব অপেক্ষা করে।'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা কর। শান্ত হও। ঠান্ডা থাক।'

কদিন পরে চিঠি এল অরুণিমার : 'তুমি আর ডাকলে না। আমি চলে যাচ্ছি।' কলকাতায় বাইরে কালিম্পঙে একটা কাজ পেয়েছি। কলকাতায় আর আমার কিসের আকর্ষণ। যাবার আগে আর একটি বার কি দেখা হয় না? আমার দাবি কত, কত কমিয়ে এনেছি। পাই না একটা হীরের টুকরো? অন্তত একটি চুম্বন। একটি সামান্য উপহার?'

'হ্যালো—' রিসিভার তুলল জয়ন্ত।

'হ্যাঁ, আমি।'

'রং নাম্বার?'

'না, একা আছি।'

'চলে যাচ্ছ?' জয়ন্তর কন্ঠস্বরে বিষাদের সুর।

'যেতে তো হবেই।'

'কোথায় যাবে! যেখানেই যাবে হাত যাবে আমার। আইনের শুনেছি দীর্ঘ হাত কিন্তু বেআইনের হাত, প্রেমের হাত, দীর্ঘতর। শোনো—'

'কান পেতেই আছি।'

'নিমন্ত্রণ করছি তোমাকে। কাল সন্ধ্যায় এস।'

'বল কি? যাব?'

'হ্যাঁ, লগ্ন প্রস্তুত করেছি।'

'তোমার জ্যান্ত ফুলের টব?'

'সে তার দিদির বাড়ি যাচ্ছে। তার বোনঝির বিয়ে।'

'তুমি যাবে না?'

'আমার তখন জরুরি কাজ থাকবে। আমি পরে যাব। চাই কি তোমাকে তোমার হস্টেলে ড্রপ করে যাব বিয়ে-বাড়ি।'

'কটায় লগ্ন?'

'কার? বোনঝির?'

'না। আমার।'

'তুমি এই সাতটা নাগাদ এস।'

'সন্ধ্যায়?'

'তাই তো ভালো। যথাসময়ে ফিরতে পারবে হস্টেলে।'

'ফিরতে পারব?'

'ফিরতে পারাই তো স্বস্তি। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো!'

চারতলা বাড়ির দোতলা ফ্ল্যাট। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল অরুণিমা।

থমথম করছে চারপাশ। থমথম করছে তার পা ফেলায়, তার হৃৎপিণ্ডের শব্দে। একটু ভয় এসে মিশলে সন্ধ্যাকেও গভীর রাত্রি বলে মনে হয়। আশ্চর্য গভীর।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল অরুণিমা। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এসেছে।

দরজায় টোকা দিতেই বেরিয়ে এল জয়ন্ত।

'এস।'

'কি, রং নাম্বার?' একটু হাসল বুঝি অরুণিমা।

'ইংরিজি রং নয়, বাঙলার রং। তুমিই এখন রং নাম্বার।'

শোবার ঘরে নিয়ে এল জয়ন্ত।

ব্যূহে প্রবেশ করাই কঠিন, বেরুনো কঠিন নয়।

'দরজাটা বন্ধ করে দেব না?' জিজ্ঞেস করল অরুণিমা।

'কেন, ভয়ের কী!'

অরুণিমা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল বাড়িঘর। এমন কি বারান্দার টবগুলি পর্যন্ত। কোনোটায় ফুল কোনোটায় শুধু গাছ।

ঘরে সরে এসে বললে, 'একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।'

'কত গাড়ি দাঁড়াচ্ছে চলে যাচ্ছে।' উদাসীনের মত বললে জয়ন্ত : 'তুমি বোস। তোমাকে দেখি।'

বসল অরুণিমা।

'সিঁড়িতে জুতোর শব্দ।'

'কত ফ্ল্যাট, হরদম লোক আসছে যাচ্ছে, উঠছে নামছে।' অভয়ের হাসি হাসল জয়ন্ত : 'তুমি খোলা দরজাকে ভয় পাচ্ছ বুঝি? দরজা বন্ধ থাকলেও তো হামলা হতে পারে। পরদাই তো ভদ্র বুদ্ধিমান।' ইঙ্গিতে গভীর হল জয়ন্ত। লগ্ন যখন পরিপক্ক হবে ঠিক সেই মুহূর্তেই—দরজার দিকে তাকাল।

সিঁড়ির জুতোর শব্দ বাইরে এসে থামল।

সর্ব শরীরে হাসতে হাসতে ঢুকল নীলাক্ষী। ঘরের মধ্যে আগন্তুক মহিলা দেখেও নিষ্প্রভ হল না। জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখ কী আশ্চর্য, শাড়ির বাক্সটাই ফেলে গেছি—'

'শাড়ির বাক্স?' দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্ত।

'যেটা মেয়েকে প্রেজেন্ট দেব। বেনারসী। ওই যে ফেলে গেছি খাটের

উপর।' হাসিমুখে নীলাক্ষী কুড়িয়ে নিল বাক্সটা। বললে, 'মাঝপথে গিয়ে খেয়াল হল। গাড়ি ফিরিয়ে আনলাম।'

চলে যাচ্ছিল আবার ফিরল নীলাক্ষী।

'আপনিই বুঝি অরুণিমা? রুনি? তা আপনি তো বেশ দেখতে। কী বা বয়েস?' পঁচিশ? তিরিশ? সেই মফস্বলী হাকিম মন্দ ছিল কি! মধুরিমাকে কেন? আগে অরুণিমা পরে মধুরিমা!'

'শোনো ওকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিয়ো না।' দরজার বাইরে গিয়েছিল আবার ফিরল নীলাক্ষী : 'কালিম্পং কবে যাচ্ছেন? আমি সব তৈরি করে রেখেছি মিটসেফে। খুলে দিতে পারবে তো? চাকরটা কোথায়, বাইরে? ডাক না ওকে। চলে যাবার আগে মিষ্টি মুখ করে যেতে হয়। আমি ভাই থাকতে পারছি না। খেয়ে যেয়ো কিন্তু—'

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীলাক্ষী।

পরক্ষণেই মন্থর পায়ে নামতে লাগল অরুণিমা।

পিছে পিছে নিচে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল জয়ন্ত। রাস্তায় পড়ে অরুণিমা তার দিকে ফিরে তাকালো। আর্দ্রস্বরে বললে, 'চলে যাচ্ছি। আর কিছু চাই না। শুধু মনে রেখো। মনে স্থান দিয়ো।'

২৪। কেরামত

আকাট মূর্খ, কিন্তু বউ পেয়েছে খুবছুরৎ। নাম মেহেরজান।

যখন সাদি হয়, তখন সাত-আট বছরের মেয়ে। সাদামাঠা, একহারা চেহারা! দেখতে-দেখতে সাত-আট বছরের মধ্যেই বদলে গেল ছিরি-ছাঁদ। এ নয় যে ডাঁসালো হল, জোয়ার এলে সব গাঙেরই জল ভরে—আসল কথা, সুন্দর হয়ে উঠল মেহেরজান। উলুমাঠ ছিল, হয়ে উঠল তেজালো ধানখেত।

ভাগ্যিস, ছোট থাকতে বিয়ে করেছিল কেরামত। নইলে, এই ভরন্ত বয়সে তাকে সে ঘরে আনতে পারত নাকি? তার কথা বলতেই মেহেরজান নিশ্চয়ই ভুরু কুঁচকে নাক সিঁটকে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে যেত পর্দার আড়ালে। তবুও, পিড়াপিড়ি করলে, মোটা মোহরানা চাইত। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, কেরামত দেনমোহর দেবে কোত্থেকে?

ক্ষুদ্দুর প্রজা—মোটে এক কুড়ো জমি। কোলরায়ত। ডিক্রির তিরিশ দিনের মধ্যে বছরের খাজনাটা না দিয়ে দিলে উচ্ছেদ হয়ে যাবার ভয় থাকে। তাই সব সময় এক পায়ে খাড়া থাকে কেরামত কিন্তু পেটই চালাতে পারে না, খাজনা দেবে কোত্থেকে। বড় তার ক্ষীণ অবস্থা।

ধান কড়ারে হালিয়ার কাজ করে। খন্দ উঠে গেলে নৌকো বায়। ফাড়ন-

চিরনের কাজ করে। কুলি খাটে। তবু হাটের থেকে মেহেরজানকে একটা ছাপার শাড়ি কিনে দিতে পারে না।

বড় সাজবার সখ মেহেরজানের। ইচ্ছে করে কোমরে গোট পরে, কপালে সিতাপাটি। রঙচঙে ছিটের কাঁচুলি আঁটে। চুলটা বিনুনি করে বাঁধে আর জরির একটা ঝাঁপটা ঝুলিয়ে দেয়।

কিন্তু তা না, রাঁধে বাড়ে, ভানাকুটা করে, কাঁকালে করে জল টানে। চুলে একটু ফুলেল তেল নেই, কানে দুটো দুলও চিকচিক করে না।

বলে, 'আমাদের এ হাল কি বদলাবে না কোন দিন?'

'খোদা বলতে পারেন।' জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে কেরামত।

এমদাদ হাওলাদারের চোখ পড়েছে মেহেরজানের উপর।

এমদাদের বিস্তর অবস্থা। তিন সংসার। আগের দু' পরিবার বেঁচে নেই। তৃতীয়টা যেটা আছে সেটা যেন শেওড়া গাছের পেত্নী। চুলগুলি শণের নুড়ি, গাল দুটি চড়িয়ে-ভাঙা। সম্পত্তির জন্যে বিয়ে করেছিল তাকে। যাকেই সে বিয়ে করে তার থেকেই জায়দাদের আয় খোঁজে।

কিন্তু মেহেরজানকে দেখলে আর সম্পত্তির কথা মনে হয় না। মনে হয় সাম্রাজ্যের কথা।

প্রায় হাজার বিঘে জমি আছে এমদাদের। টিনের ঘর আছে ছ'খানা। গরু-মোষের হাল আছে আটখানা। বাড়ির নিচে ঘাট আছে বাঁধানো। নৌকো আছে তিন নম্বর। মাছ ধরবার জন্যে দোনা, মাল বইবার জন্যে কোষ আর হাওয়া খাবার জন্যে বজরা। বেশ মানাত মেহেরজানকে। ঘরে তিনখানা নৌকো, আটখানা হাল আর ছ'খানা ঘর, তার ঘরের ঘরণী হয়ে।

তা ছাড়া তার তেজারতি আছে। বাজার আর তত তেজী না থাকলেও নগদ টাকা বের করে দিতে পারে সে কয়েক হাঁড়ি। রুপায়-সোনায় মুড়ে দিতে পারে মেহেরজানকে। অমন হাঘরে-হাবাতের মত দিন কাটাতে হত না। কোথায় দাসী-বাঁদী তাঁবেদারি করবে, তা না, কুলোয় করে চাল ঝাড়ে, শামুক ধরে হাঁস খাওয়ায়, খুচান জালে মাছ ধরে।

সাপের মাথায় না হয়ে মণি জ্বলছে যেন দেরখোর উপর।

তারা খাঁ এমদাদের এক্তারী লোক। কেরামতের মালেক। তাকে কোটনা করলে এমদাদ।

হাটের ফিরতি-পথে একা পেয়ে কথাটা ভাঙলে তারা খাঁ।

এমন অন্যায় কিছু বলছেন না হাওলাদার সাহেব। বলছেন, কেরামত তালাক দিক মেহেরজানকে। তার বদলে কেরামতকে তিনি পাঁচ বিঘে জমির রায়তিজোতের পাট্টা দেবেন। আর তার উৎখাতের ভয় থাকবে না। পাকা-পোক্ত ঘর চায় একখানা, চোরেলের হাট থেকে টিন কিনে দেবেন দশ ভাঁজ।

'এ কি জুলুমের কথা?' কেরামত হতভম্বের মত বললে, 'এ কি জবরদস্তি? আইন-ধর্ম কি সব উঠে গেছে?'

ফোকলা দাঁতে হাসল তারা খাঁ। আইন-ধর্ম আছে বলেই তো চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছেন না। শাস্ত্র অনুসারেই কাজ করতে চাচ্ছেন।

'না, আমি আমার বউ ছাড়ব কেন?' কেরামত শক্ত গলায় বললে।

'তুই তো দেখছি একটা আস্ত বেকুব। জমি পাচ্ছিস, দখলি স্বত্ব পাচ্ছিস, ঘর পাচ্ছিস টিনের—আর চাই কি তোর? তার পর নিকে সাদি কর না কেন যতটা খুসি। এটা শুধু ছেড়ে দে।'

'আমি কিন্তু থানা-পুলিশ করব।' কেরামত তেরিয়া হয়ে উঠল।

'ওঁর সঙ্গে পারবি তুই?'

'এর আবার পারাপারি কি? নিজে বেঁচে আছি, তিনতালাক দিইনি, আমার বউ উনি জোর-জবর কেড়ে নিয়ে যাবেন? গরিব বলে এ জুলুমও আমাকে সইতে হবে?

'শোন, রাগ করিসনে,' তারা খাঁ কেরামতের পিঠে হাত বুলুতে লাগল : 'মানী লোক, অমন কোনো কেলেংকারি করতে পারেন না সাহস করে। জেলের চেয়ে তাঁর বদনামের ভয় বেশি। তুই শুধু আলগোছে ওকে তালাক দে, আইনমাফিক ওকে তিনি নিকে করুন। নগদ টাকা চাস—'

'না। পারব না। ও আমার বুকের হাড়, কলজের রক্ত।'

'শোন—'

তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল কেরামত। মেহেরজানকে সব কথা খুলে বললে।

'নুড়ো জেবলে দিতে হয় মুখে।' রাগে মেহেরজান রি-রি করে উঠল, 'পঞ্চাশ বছর প্রায় বয়স হতে চলল, আধেক দাড়ি পেকে গেছে, মিন্সের আহ্লাদ দেখ না। আমার কাছে এলে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে আচ্ছা করে বসিয়ে দি ঘা কতক।'

'তোকে যদি মুখে কাপড় বেঁধে জোর করে টেনে নিয়ে যায়?' কেরামতের চোখে ভয়ের ঘোর লেগেছে।

'গেলেই হল? চৌকিদার দফাদার নেই? ফৌজদারি নেই? মহারাণীর দোহাই কি উঠে গেছে দেশ থেকে?'

'হাওলাদার সাহেবের ঘরে গেলে কত তুই সুখে থাকবি। কত ভাল খাবি, ভাল পরবি। চুড়-চিক পাবি, বিচে হার পাবি, বোরখা পরবি, মেহেদি পাতায় হাত পা রাঙাবি—'কেরামতের চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

শুকনো গলায় মেহেরজান একটা ঢোক গিলল বোধ হয়। বললে, 'সোয়ামীর জীবমানে কেউ আবার নিকে করতে পারে না কি? বেদাঁড়া হয়ে যায় না?'

কেরামত গঞ্জে গিয়েছিল যদি কুলির কেরায়া পায়।

আয়নালি তার বাড়ির গায়ের পড়শী। এসে শুনল, হাওলাদার সাহেব না কি তার বাড়ি এসেছিল দুপুরবেলা। লুকিয়ে লুকিয়ে আলাপ করে গেছে মেহেরজানের সঙ্গে। পান তামাক খেতে দিয়েছে মেহেরজান। পেয়েছে আয়না কাঁকই, বেলোয়ারি চুড়ি কয় গাছা।

বুক ও পিঠের পেশীগুলো রাগে ডেলা পাকিয়ে ওঠে। তক্ষুনি ছুটে যায় কেরামত। কিছু জিগগেস করবার আগেই মেহেরজান নিজের থেকে এনে দেখায়, ভাঙা চিরুনি, টুকরো টুকরো কাঁচের চুড়ি। বলে 'পোড়ামুখো মিনসের আস্পদ্দা দেখ। ঘরের বউকে কি না প্রলোভন দেখায়, উপহার দেয়। ও-ও এনেছে, আমিও অমনি শোধ দিয়েছি। শিল দিয়ে ভেঙেছি গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে।'

নিমেষে জল হয়ে যায় কেরামত। জিগগেস করে না, কখন এ সব সে ভাঙলে। জানতেও চায় না, পান তামাক খেতে দেয়ার গল্পটা সত্যি কি না।

শুধু মেহেরজানকে দেখে, আরেকবার দেখে। কি সুন্দর টানা চোখ, পাখি-ওড়া ভুরু, পাখির বুলির মত কথা।

গেরস্তালিতে কত মন! কুচি-কুচি করে গরুর জাব কাটছে। গোবর লেপছে। সাঁজালি দিচ্ছে। কেরামতের জন্যে তামাক সেজে কলকেতে ফুঁ দিচ্ছে।

আয়নালি শুধু খারাপ-মন্দ খবর দেয়। বলে, 'তোর পরিবারকে দিয়ে মামলা বসাবে হাওলাদার সাহেব।'

'কিসের মামলা?'

'বিয়ে-ছাড়ানের মামলা।'

'কেন, ওজুহাতটা কি?' কেরামত ঘাড় মোটা করে দাঁড়ায়।

'সে উকিল-মোক্তারই বলতে পারে।'

কেরামত তক্ষুনি ছুটে যায় মেহেরজানের কাছে। বলে, 'তুই না কি বিয়ে-তোড়ার মামলা করবি?'

স্বচ্ছ উপেক্ষার সুরে মেহেরজান বলে, 'কোন দুঃখে?'

'বাড়ি-ঘরের নাম-নিশানা নেই, হাওলাত-বরাত করে খাই, আমার ঘরে থাকতে কি আর তোর ভাল লাগবে?'

'ক্ষুদ্দুর লোক হলে বউ রাখতে পারবে না, এমন কথা শাস্তরে লেখা নেই।'

'মুখখু-সুখখু মানুষ আমি—'

'আর আমি একটা পন্ডিত। কেতাব-খেতাব কত আমার!'

ঠাট্টার হাওয়ায় মনের মেঘ কেটে যায় কেরামতের। ভাবে, বিয়ে তোড়বার কারণ কিছুই নেই দুনিয়ায়। মার-ধোর করেনি কোনো দিন; যেমন অবস্থা, খোরাকপোশাক চালিয়ে এসেছে প্রাণপণ। ব্যামোপীড়া নেই, মদ-ভাঙ খায়নি জীবনে। গরিব বলেই যদি বিয়ে তুড়ে দেয়া যেত, তা হলে আইন হয়ে গরিবানা উঠে যেত সংসার থেকে।

বিয়ে-ছাড়ানের মোকদ্দমা নয়, আয়নালি নতুন খবর জোগাড় করে আনে—একদিন মেহেরজানকে নিয়ে সটকাবে হাওলাদার সাহেব, স্বত্বসাব্যস্তের মোকদ্দমা করবে। মেহেরজান আর কেরামতের স্ত্রী নয়, কেরামত তাকে তিন-তালাক বাইন দিয়েছে।

'স্বপ্নে?' কেরামত তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

'স্বাক্ষী সাজাবে হাওলাদার সাহেব। মৌখিক সাক্ষী। সবাই বলবে, তারা

শুনেছে স্বকর্ণে স্বামী-স্ত্রীতে খুব কসে ঝগড়া-বচসা হবার পর কেরামত রাগ করে বলে উঠল, তালাক, তালাক, তালাক—বাইন! দশ, বিশ, পঞ্চাশ জন সাক্ষী মানবে, সমন করবে।

'ইস? আমার রেজেস্ট্রি-করা বিয়ে। কাবিননামা আছে।' চিবুক ভারি করে বললে কেরামত।

'তোর কি বুদ্ধি! ঠাট্টা করেও যদি বউয়ের কাছে তুই তিন বার তালাক বলিস, তোর বিয়ে অমনি ভেঙে যাবে।'

'বললে তো? জোর করে তো কেউ আর বলাতে পারবে না আমাকে দিয়ে।' কত বড় জোর, কতখানি শান্তি কেরামতের।

'বলতে পারবে না, শোনাতে পারবে।' কুটিল চোখে তাকায় আয়নালি: 'ফেরবি সাক্ষী তৈরি করবে। কত জোরমস্ত লোক সে। কত মুন্সি-মোল্লা, সর্দারসিপাই হাতে তার—'

তবু কেরামত ভয় পায় না। সরল বিশ্বাসে হাসে। বলে, 'কেউ বিশ্বাসই করবে না। এত যাকে ভালবাসি তাকে খামোকা-খামোকা মুখের কথায় তালাক দিয়ে দেব? দিনের বেলায় হাজার লোক যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে চোখ বুজে বলে যায়, অন্ধকার, তা হলেই সূর্য নিবে যায় না মিয়াসাহেব।'

'তোর মুখের কথাকে এত বিশ্বাস? কিন্তু ভালবাসাটাও মুখের ভালবাসা।'

তক্ষুনি আবার কেরামত ছুটে যায় মেহেরজানের কাছে। মেহেরজান তখন হেলি-পাতা আর হোগলাপাতা মিশিয়ে চেটাই তৈরি করছে। কেরামত তার পাশে বসে হাত ধরে ফেলে কাজে বাধা দেয়। বলে, 'এ সব শুনছি কি?'

মেহেরজান চোখ গোল করে বলে, 'কি সব?'

সব কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারে না কেরামত। বুকের ভেতর থেকে ঠেলে-ঠেলে ওঠে। বলে, 'তুই না কি ছেড়ে যাচ্ছিস আমাকে?'

'কেন, যোমরাজা টানছে না কি চুলে ধরে? না, তোমারই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবার মতলোব? ঘাটে-অঘাটে মনে ধরেছে বুঝি কাউকে?' হাতের উলটা পিঠ দিয়ে মেহেরজান চোখ মোছে।

কেরামত চিৎ হয়ে শোয়। অন্তত এখন শুয়েছে, ঘুমিয়ে আছে। বাঁ-হাতের চেটোটা উপরমুখো। আঙুলগুলো ফাঁকফাঁক, বুড়ো আঙুলের মাথাটা স্পষ্ট।

ভুষো তৈরি করেছে মেহেরজান। তারি খানিকটা আঙুলে করে কেরামতের সেই বুড়ো আঙুলের মাথায় সে মেখে দিল আলগোছে, যেন বা কত আদর করে।

এমন বেঘোরে ঘুমোয় কেরামত, বাড়িতে ডাকাত পড়লেও বোধ হয় সে-ঘুম ভাঙবে না। এক ঝাঁক মাছি যে মুখের উপর উড়ে-উড়ে বসছে, তাতে তার বিরক্তি নেই এতটুকু।

দলিল নিয়ে ঢুকলো আয়নালি। জায়গায়-জায়গায় টিপ নিলে, আঙুল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। কেরামতের বাঁ হাতের কালিমাখানো বুড়ো আঙুলের টিপ।

আয়নালি রেজেস্ট্রি-আফিসের মোক্তারের মুহুরি। সে জানে কটা টিপ লাগে। কোথায় লাগে।

ঘুমোচ্ছ তো ঘুমোও পড়ে-পড়ে।

দরজার বাইরে হাওলাদার সাহেব দাড়িতে হাত বুলোন আর মুচকি মুচকি হাসেন।

টিপটাপ নেওয়া হয়ে গেল মেহেরজান বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে। এক হাতে দলিল, আরেক হাতে মেহেরজানের হাত ধরে দুপুরের রোদে মাঠ পেরিয়ে চললেন হাওলাদার সাহেব।

গায়ে ঠেলা দিয়ে কেউ জাগায়নি আজ। কেরামতের যখন ঘুম ভাঙল, বেলা তখন একেবারে গড়িয়ে গেছে। চোখ কচলে চেয়ে দেখল, বাড়ি-ঘর কেমন এলোমেলো, ফাঁকা-ফাঁকা। আনাচ-কানাচ খোঁজাখুঁজি করে এল, কোথাও নেই মেহেরজান।

'আমি তখন গাঙে গরু নাওয়াচ্ছিলাম', বললে জোনাবালি, 'দেখলাম এক ছাতার নিচে যাচ্ছেন হাওলাদার সাহেব আর তোর মেহেরজান।'

'আমি আসছি তখন পোলের উপর দিয়ে,' বললে হাসমত, 'দেখি হাওলাদার সাহেবের সঙ্গে তোর পরিবার। বললাম এ কি, কেরামতের পরিবার আপনার সঙ্গে যে? চলেছে কোথায়? হাওলাদার সাহেব চোখ পাকিয়ে বললেন, ওসব চর্চায় তোর দরকার কি?'

হন্যে হয়ে উঠল কেরামত। এ-গাঁ থেকে ও-গাঁ, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি সরিয়ে রাখছে মেহেরজানকে। পাত্তা-নিশানা খুঁজে পাচ্ছে না। থানায় গিয়ে শেষে সে এত্তেলা দিলে। মোক্তার লাগিয়ে বার করালে তদন্তের পরোয়ানা।

হাওলাদার সাহেব দলিল বের করে দেখালেন। তালাকনামা। স্ট্যাম্প-কাগজে লেখা, শিল-মোহর করা। রেজেস্টারি হাকিমের সই লাল কালিতে। আর এই কেরামতের টিপ। হলফান বলুক দেখি ও, এ টিপ ওর নয়! টিপপরখের সাক্ষী আসুক কলকাতা থেকে, যত টাকা লাগে আমানত করবে সে চালান দিয়ে। আর, নিশিন্দি করেছে ওর বাড়ির গায়ের মানুষ, আয়নালি, রেজেস্ট্রি-অফিসের দলিল-লেখক। এতটুকু জালসাজি নেই কোথাও। আর, এই দেখুন না, কি লেখা আছে দলিলে : "এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্বক সরল মনে সুস্থ শরীরে স্থির বুদ্ধিতে স্বাধীন সম্মতিতে অন্যের বিনানুরোধে অত্র তালাকনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম।"

কেরামত মানুষ না পশু, গাছ না পাথর, কিছুই বুঝে উঠতে পারলনা নিজেকে। শুধু বললে একবার বেবভুলের মত : 'একটিবার মেহেরজানের সঙ্গে চোখোচোখি দেখা করিয়ে দিতে পারেন?'

কি সর্বনাশ! হাওলাদার সাহেবের সঙ্গে তার নিকে হয়েছে। মসজিদে যে ইমামতি করে সেই কাজীসাহেব তার বিয়ে পড়িয়েছে। এই দেখুন কাবিন-নামা। হাওলাদারের বিবি। এখন সে পর্দার হেপাজতে, ঘেরাটোপের মধ্যে।

মিঞাদের বাড়ির বউ এখন সে, বাইরের লোকের সামনে বের হয় এমন হাদিস নেই।

এত জালজোচ্চুরিতেও কিছু এসে যেত না কেরামতের, যদি নিরালায় মেহেরজানের সঙ্গে তার একটু দেখা হত। যদি আরেকবার তাকাতে পারত তার চোখের দিকে।

কিন্তু আর এল না মেহেরজান। সমস্ত প্রবঞ্চনার চেয়ে এই নিষ্ঠুরতা তার অসহ্য।

মোক্তারবাবু অনেক নিষেধ করলেন, তবু কেরামত ফৌজদারি করলে। আসামী খালাস পেয়ে গেল, তবু কেরামত ক্ষান্ত হয়না। যা অসত্য ও অধর্ম তা স্থায়ী হতে পারে না, এই তখনো তার অন্তরের বিশ্বাস। সে দেওয়ানি করলে। বউ-দখলের মোকদ্দমা। সে-মোকদ্দমায়ও তার হার হল। টিপ-পরীক্ষক সাক্ষী দিলে তালাকনামা খাঁটি দলিল।

আগে খোরাকের ধান বেচেছিল কেরামত, আস্তে আস্তে গরু, শেষে জমিটুকুও বেচে দিল। সব গেল উকিল-মোক্তারের পকেটে। আইনের রশুমে।

আদালতের বাইরে এসে দাঁড়াল কেরামত সদর রাস্তার উপর।

মোক্তারবাবু বললেন, 'লেখাপড়া শেখ, বুঝলি লেখাপড়া শেখ। লেখাপড়া না শিখলে সব যাবে, জমিজিরাত গেছে, জরু গেছে, সমস্ত দেশ যাবে রসাতলে।'

জামজিরাত গেছে। জরু গেছে। কিন্তু চার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে কেরামত ভাবল, দেশটা কি জিনিস।

২৫ । কাক

নতুন হাঁড়ি, নতুন উনুন, নতুন চাল। আঘন মাসের পয়লা। আজ নবান্ন।

ঠান্ডামনি বাপকে বললে 'এবার আর নবান্নে কাজ নেই বাবা।'

গুরুদাসের দু চোখ ঠেলে জল এল বেরিয়ে। মুছল না। গাল বেয়ে পড়তে দিল গড়িয়ে। শেষে বললে, 'এত দিনের নিয়ম! তোর মা কোন কালে এই সংসারে ছোট্ট বউটি হয়ে এসেছিল, প্রতি বছর করে গেছে নবান্ন। এইবার না করলে মনে সে খুব দুঃখু পাবে।'

ঠান্ডামনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

আর-আর বছরের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে তার।

কার্তিকের শেষেই গাঁয়ের মেয়ে-বউরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাটি তুলে নবান্নের হাঁড়ির জন্যে পৈঠা ও উনুন তৈরি করে। গেরস্ত-চাষারা মাঠে চলে যায় আঘনী ধান কেটে আনবার জন্যে। হয়তো পুরোপুরি পাকেনি, তবু তর সয়না। বাড়ির ভিটেয় উঁচু ডাঙ্গা জমিতে যে ধান দেয় তাই শুধু পাকে।

'ঠাণ্ডামনি, ওঠ্ ঢেঁকিঘর লেপাবিনে?' মা ডেকেছিল আর-বছর। আর-বছরের মায়ের মুখখানা তার মনে নেই। কেমন যেন আশ্চর্য লাগে, শুধু ডাকটা মনে আছে।

ধড়মড় করে উঠে বসেছিল ঠাণ্ডামনি। ঘাটে গিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে সরু কোমরে ছোট্ট আঁচল জড়িয়ে ন্যাতা-গোবর নিয়ে লেপতে বসেছিল সে ঢেঁকিঘরের পিঁড়ে। কাল ধান-ভানার দিন। ঘর-দোর সব শুচি করতে হবে।

কতক ধান শুকোতে হবে আতপের জন্যে। সেদ্ধ করার ভাল সময় কোনটা তা পাঁজি দেখে বলে গিয়েছিল গিরিশঠাকুর। গিরিশঠাকুর নমঃশূদ্রদের মধ্যে বামুন, উঁচু-জাত। মাথায় এক গোছা টিকি, পায়ে খড়ম। হাঁস যেমন শামুক-গুগলি খুঁজে বেড়ায়, গিরিশ খুঁজে বেড়ায় শিষ্য-যজমান। ঠুকরে-ঠুকরে কুরে-কুরে খাবে।

মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে ঠাণ্ডামনিও ধান সিজিয়েছিল, ধান শুকিয়েছিল আর-বছর। এসেছিল রাখালের মা, মধু ভুমিজের বউ, রাধিকা কৈবর্তের মেয়ে। যাকে ডাকো সেই আসে। বাগদি-বাইতি দলুই-ঘড়ুইর বউ-ঝিরা। সিজা ধান যখন নোটে ঢালা হল সবাই মিলে উলু দিয়ে উঠল। মা কেমন কলকলিয়ে উলু দিতে পারত! যেন এক ঝাঁক কলস্বরা পাখি চলে গেল উড়াল দিয়ে। ঝরে গেল এক পশলা শরতের বৃষ্টি।

নোটে হাত ঢুকিয়ে কেমন সুন্দর করে ধান এলে দিচ্ছিল মা। ঢেঁকির পাড় পড়ছে, মার হাত উঠে আসছে, আর ঢেঁকি উঠে পড়ছে, মা কোটা ধান ওলোট-পালোট করে দিচ্ছে। কেমন স্বচ্ছন্দে, মোলায়েম ভঙ্গিতে। 'যত সব ব্রজনারী, চাল কুটছেন সারি-সারি, এলে দিচ্ছেন বড়াই-বুড়ি, টেকে দিচ্ছেন রাই—' মেয়েরা ছড়া কাটছে। আঙুলের মাথায় করে চুন ঘসে-ঘসে পান সাজছে। সুপুরি কাটছে চিকির-চিকির করে।

চাল তৈরি হল। গোবর-লেপা নতুন ডোলে চাল রেখেছিল মা। বলেছিল চোখ বড় করে, 'খবরদার, ছুঁয়ে ফেলিসনি যেন।'

'যদি ছুঁয়ে ফেলি?' দুষ্টুমি করে বলেছিল ঠাণ্ডামনি।

'ছুঁয়ে ফেললে তক্ষুনি হাত ধুয়ে ফেলবি।'

'কেন, এ চাল কি অশুদ্ধ?'

'না রে না, তার জন্যে নয়। তুই একেবারে ছেলেমানুষ। এ হচ্ছে নতুন, সব চেয়ে পবিত্র। একে ছুঁয়ে আর কোনো জিনিস যদি ছুঁয়ে ফেলিস সেই হাতে, তা হলেই নতুনের মান গেল, দাম গেল। তাই নয়ার ছোঁয়া পুরোনোর গায়ে ঠেকানো চলবে না।'

নবান্নের দু'দিন আগে হাট ছিল আর বছর। বাবা হাটে গিয়েছিলেন সওদা করতে। ধামায় করে হর-রকমের তরকারি কিনে এনেছিলেন। সব নতুন। নতুন বরবটি, নতুন পালং, নতুন শিম, নতুন লাল-শাক, নতুন লাউ, নতুন বেগুন, নতুন কাঁচালঙ্কা, নতুন মুলো, নতুন মেটে আলু, নতুন কচু, নতুন

আদা, নতুন পান, নতুন তেজপাতা, নতুন ডাব, নতুন আখের গুড়। চারদিকে শুধু নতুনের নামজারি।

'ঠান্ডামনি, ওঠ্, ঘাটে যাবিনে স্নান করতে?' পাখি ডেকেছে কিন্তু বাসা ছাড়েনি এমন ভোর। সেই ভোরে উঠে পড়ল ঠান্ডামনি। বললে, 'লক্ষ্মীমনিকে ডাকি।'

মা বললে, 'না, ও ঘুমোক।'

নতুন শীতে স্নান করে ঘরে এল মায়ে-ঝিয়ে। প্রথমেই হাঁড়ি-নবান্ন। কুলোর উপর নতুন হাঁড়ি, চাল, পান-শুপুরি রাখা হল। সিঁদুর দিয়ে মা পুতুল আঁকল হাঁড়িতে। প্রদীপ জ্বালাল। উলু দিয়ে উঠল কলকলিয়ে। গোল ছোট্ট মুখের মধ্যে মার জিভের ডগাটুকু যে নড়ছিল ঘন-ঘন ঠান্ডামনির এখনো দিব্যি চোখে ভাসছে। বাঁ হাতে করে মা এক মুঠ চাল রাখল হাঁড়িতে। এমনি তিনবার। শেষে দুহাত ভরে চাল ঢেলে-ঢেলে হাঁড়ি ভরতি করল কানায়-কানায়। আমের পল্লব দিয়ে রাখল মাথার উপর।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোর দিন রাঁধতে হবে এ চাল। যদি দেখ পোকায় ধরেছে, বুঝতে হবে ঘনিয়ে এসেছে দুর্ভাগ্য।

মা আরো দুটো হাঁড়ি বের করল। একটাতে রাখল সেদ্ধ চাল। আরেকটাতে আতপ। দাদা একটা-একটা ডাব কেটে দিচ্ছে, আর মা তার জল কখনো ফেলছে সেদ্ধর হাঁড়িতে, কখনো আতপের। আর সমানে উলু দিচ্ছে। আরেকটা হাঁড়িতে ডাবের জলে ভিজিয়ে রেখেছে এখো গুড়।

মা তারপরে পার্বণের আয়োজন করতে বসেছিল। মার সঙ্গে-সঙ্গে সেও। গিরিশঠাকুর এসে গেছে, তার অনেক যজমান, গড়িমসি করবার সময় নেই। যজ্ঞেশ্বর, ভোজ্য, পিতৃপক্ষ, মাতৃপক্ষ, দেবপক্ষ—সমস্ত মা ঠিকমত সাজিয়েছে। বাবা বসেছেন পিঁড়িতে। অমনি গিরিশঠাকুর চেঁচিয়ে উঠল : 'কাকবলি কই? কাকবলি?'

মা তাড়াতাড়ি উঠে কলার ডোঙায় করে ডাবের জল, গুড়ের জল আর চাল সাজিয়ে দিল, দিল একটা পান, এক কোয়া কমলালেবু আর একটা কলা। একেই বলে কাকবলি, কাকের জন্যে ভোজ্য-উপহার। গিরিশ ঠাকুর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মন্ত্র পড়ে দিল : 'বায়সায় বলির্নমঃ। বায়সাঃ সর্বত্রং খাদন্তি।'

কাকবলি হাতে নিয়ে দাদা চলে গেল বাইরে। সঙ্গে শম্ভু আর গোপাল। তিন ভাইয়ের সে কী কোলাহল!

পার্বণ হয়ে গেলে শিলে করে সুরু হল চাল বাটা। নারকোল বাটা। চালের জল গুড়ের জল আর নারকোলের নেয়া মেশানো হল একসঙ্গে। চাল বাটবার জন্যে এসেছিল কংসবেনেদের বউ মালাকরদের পিসি। পিঁড়ি পেতে সার দিয়ে বসল সবাই ভাই-বোনেরা। দাদা, ঠান্ডামনি নিজে, শম্ভু, গোপাল আর লক্ষ্মীমনি। বাবা বসলেন পুবমুখো হয়ে। মার হাতে একখানা পাথরপূর্ণ নবান্ন, সবাইকে পরিবেশন করতে লাগল। একটু নুন ও একটু কর্পূর

মেশানো সেই নবান্নের কী অপূর্ব স্বাদ! একটি নাড়ু, একটু ফোঁপরা, একটু বা এখো পাটালির টুকরো। কেমন হাপুস-হুপুস শব্দ!

আর আর বাড়ি থেকে কত লোক এসেছিল 'নয়া' খেতে। তারাও পাঁচ-ভাই-বোন গিয়েছিল কত বাড়ি-বাড়ি। সকাল বেলা কেউই ভাত খায়নি। কেউই ভাত খায় না।

রাত্রে ভাত খাবার পালা। কত চাল দরকার বা কজনে খাবে সের-কুনকে মেপে সেদিন হিসেব করা চলবে না। আন্দাজে নিতে হবে মুঠ-মুঠ। কম হয় আবার রান্না করতে হবে, বেশি হয়, কুকুর বেড়াল খাবে তখন। মা এক হাতে মশলা পেষে, আরেক হাতে তরকারি কোটে। ঠান্ডামনি লক্ষ্মীমনি এটা-ওটা এগিয়ে দেয়। সেদিন কত কী রান্না করেছিল মা, সব চেয়ে বেশি মনে আছে নতুন তেঁতুল দিয়ে নতুন চালতে দিয়ে খেজুরের রসের অম্বল। আর চন্দ্রকাইট পিঠে। পোড়া পোড়া করে ভাজা, আঠা-আঠা খেতে, কী অপূর্ব স্বাদ সে চন্দ্রকেতুর।

খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে বাইরে সবাই আগুন জেবলে বসেছিল। সেঁকেছিল হাত-পা। মাও বসেছিল।

যা-যা রান্না করা হয়েছিল তার আদ্ধেক রেখে দিয়েছিল পরের দিনের জন্যে—শুধু ভাত ছাড়া। পরের দিন শুধু ভাত হয়েছিল। গরম ভাতের সঙ্গে সেই বাসি তরকারি খাওয়া—তাকেই বলে 'বাসনবান্ন'।

সেই নবান্নের দিন আবার ফিরে এসেছে। এক বছর বয়স বেড়েছে ঠান্ডামনির। এখন সে এগারো। এই এগারো বছরের মেয়ে পারবে কি সব তদবির করতে? উপায় কি—এখন সেই বাড়ির বড় গিন্নি। মা নেই।

গুরুদাস বললে, 'শুধু নমো-নমো করে নিয়মরক্ষা। গিরিশঠাকুর বলেছে, মন্ত্র পড়ে কাটিয়ে দেবে সব দোষ।'

'শম্ভু, শম্ভু, ওঠ, উঠবিনে? আজ নবান্ন, কাকবলি দিবিনে?'

শম্ভু ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল, দিদি। মা নয়।

গত বছর কাকবলি দিয়েছিল তারা। দাদা, সে, আর গোপাল। এমনি আরো কত বাড়ির ছেলে। পাছে নেমন্তন্ন না করলে কাক অভিমান করে চলে যায় তাই তারা ছড়া কেটেই কাক ডাকতে সুরু করেছিল :

কো কো কো—
মোদের বাড়ি হো
মোদের বাড়ি শুভ নবান্ন মোদের বাড়ি ছোঁ।
কাকবলি নিবি শুভনবান্ন খাবি,
আ আ আ—
কা কা কা।

কার ডাকে কাক আগে আসে এই নিয়ে টেক্কাটেক্কি। কে কত ভোরে উঠতে পারবে! কে কত চেঁচাতে পারবে গলা ফাটিয়ে। বঁড়শিতে লাল লঙ্কা গেঁথে

যারা কাক ধরতে ওস্তাদ ছিল তারাই আজ কত কাকুতি-মিনতি করে কাক আবাহন করছে। পাল্লা জমাচ্ছে চিল্লাচিল্লির। কান পাতা যাচ্ছে না।

কাক উড়ে আসে, ডোঙার থেকে কলাটা তুলে নিয়ে উড়ে পালায়। অমনি হাততালি আর হুল্লোড় সুরু হয়।

'দ্যাখ, দ্যাখ শম্ভু, কাকটা কোন দিকে উড়ে পালাল?' দাদা উঠেছিল চেঁচিয়ে।

সবাই তারা লক্ষ্য করেছে কাক দক্ষিণে উড়ে যায়নি, উড়ে গেছে পশ্চিম দিকে। দক্ষিণ দিকে গেলেই নাকি মৃত্যুভয়। সবাই বাড়িতে এসে বললে বাবা-মাকে, কাক পশ্চিম দিকে উড়েছে। শুনে সবার কত আনন্দ, কত শান্তি। গোপাল বললে সর্দারি করে, 'শুধু সাধুদের কাকটা, মা, উড়েছে দক্ষিণ দিকে।' মা চোখ-মুখ ঘোর করে বলেছিল, 'যেই দিকে সূয্যি ওঠে সেই দিকে, না?' গোপাল বলেছিল গম্ভীর হয়ে, 'তার উলটো দিকে।' সবাই হেসে উঠেছিল।

সবার আগে দাদা মারা গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে। ভাত-ভাত করে। তখন গাঁ-গেরামে পুরোপুরি দুর্ভিক্ষ লেগে গেছে। গাঁয়ের লোক দুর্ভিক্ষ বলতে পারেনা, বলে দুর্ভাগ্য। বলে, দুর্ভাগ্যের বছর। বলে, পঞ্চাশের আকাল।

চালের দর তখন চালে এসে ঠেকেছে। গুরুদাস ছোট চাষা, ছুটা খাজনায় জমি রাখে, খোরাকির ধান মজুত করতে পারেনি সম্বৎসরের। যা কিছু বা ছিল, অল্প-অল্প বেচেও দিয়েছিল আগে থেকে, পরনের কাপড়ে, তেলে-তামাকে। ভাবেনি পড়বে এমন দুঃসময়। গা-গতরে বিশ্বাস ছিল গুরুদাসের, ভেবেছিল খাটা-খাটনি করে কাজ-কারবার চালিয়ে নিতে পারবে। ভাত-লবণের দুঃখ হবে না তাদের। লগি ঠেলে ঠেলেই তুফানী নদী পাড়ি মারতে পারবে।

ছেলেবেলা থেকে পেলেছে যেই গরু সেই গরু বেচল, যে জমিতে ধানী সোনার স্বপ্ন দেখেছে বেচল সেই সোনার জমি, কাঁস-পেতল, সোনা-দানা। জলের দরে, ধুলোর দরে। তবু কিছু সুরাহা হল না। আঁধুল আকাশের মুখ তেমনি ঘোর করে রইল।

আগে গেল দাদা। দাদা সর্দারি করে নিজেকে বুড়োর দলে নিয়ে নিয়েছিল—মা-বাবার দলে। তাই যে কটি ভাত জুটত, ছোট ভাই বোনদের দিত, মা-বাবার সঙ্গে নিজে থাকত সে উপোস করে। একগ্রাস ভাত মুখে তুলেই বলত, পেট ভরেছে। শুধু জল খেত ঢকঢক করে।

যখন আর পারে না, মরবার দিন তিনেক আগে, মার কাছে সে বলেছিল, দুটি ভাত দাও, মা। মার হাতে তখনো এক হাঁড়ি চাল আছে, গত বছরের নবান্নের চাল, আষাঢ়ী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপুজোর কাজে লাগবে। মা ভেবেছিল আষাঢ় মাসে লক্ষ্মীপুজোটা নির্বিঘ্নে কেটে গেলে এ চালে হাত দেবে। কিন্তু তার আর সময় নেই। মা হাঁড়ি নামাল। কাপড়ে মুখ বাঁধা। মুখ খুলে দেখল চালে পোকা পড়েছে! মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। লক্ষ্মীর হাঁড়ির চালে পোকা পড়া মানেই হচ্ছে মন্দ দিনের ঢ্যাঁড়া পড়ে গেছে সংসারে।

শেষ চাল কটি এইভাবে নিঃশেষ হল। তবু দাদা বাঁচল না।

তারপরে গেল গোপাল।

গত বার নবান্নর দিন গোপাল এত বেশি চালের জল খেয়েছিল, রাত্রে আর ভাত খেতে পারেনি। মা তাকে বকেছিল সেই জন্যে। গোপাল বলেছিল, 'আমাকে বকিসনি মা। নবান্নের দিন একথালা ভাত কম খেয়েছি, সেই ভাত আমাকে এনে দে।'

আজকের এই নব-অন্নের দিনে পুরোনো-অন্ন মনে পড়ছে শম্ভুর।

দেখতে-দেখতে গ্রাম-দেশ সে কী হয় গেল! কত লোক চলে গেল গাঁ ছেড়ে! বাগদিরা, সামন্তরা, দলুই-দুয়ারিরা। রইল কংসবেনে আর মালাকর আর তারা। ও পাড়ার মোল্লা গুষ্টিরা। তারা গেল না। গুরুদাস বললে, 'কোথায় যাব পথে ভেসে, ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকব। এখানে থাকলে অন্তত ফৌত-ফেরার হয়ে যাবনা।'

তাদেরকে বাড়িতে রেখে গুরুদাস জন দিতে চলে যেত সদরে-মফস্বলে। যা জুটত তাই দিয়ে একমুঠ ভাত হত তাদের একবেলা। কোন দিন তাও হত না। ভাত হলেও জুটত না একটু মাছ দুধ, জুটত না একটু গুড় চিনি।

তারপরে লক্ষ্মীমনি চোখ বুজল। গুরুদাস বললে, 'লক্ষ্মী মেয়ে।'

শম্ভুর দিকে চেয়ে গুরুদাস নিশ্বাস ফেলত, 'যদি শিবু বেঁচে থাকত, আমার সঙ্গে ধান কাটতে পারত মাঠে গিয়ে।'

নিজেকে অপরাধী মনে হত শম্ভুর। তার বদলে দাদা কেন বেঁচে রইল না?

পরের খেতের ধান কাটে গুরুদাস। চুরি করে কোঁচড়ে করে ধান নিয়ে আসে। সেই কটি ধান মা পাতা জেলে সেদ্ধ করে। আশে-পাশের মাঠে গিয়ে শম্ভুও আউষের চারা থেকে শীষ ছিঁড়ে আনে। মাটি খুঁড়ে ইঁদুর যদি ধান লুকিয়ে রাখতে পারে সেও পারবে। পালাতেও পারবে সে ইঁদুরের মত। মা পাতা জেবলে সেই কটি ধানও সেদ্ধ করে। আপত্তি করে না। যেন শুধু খেতে পারার পুণ্যেই সব পাপ কেটে যাবে।

মা চলে গেল ভাদ্র মাসে।

তাদের বাড়িতে তারা তিন জন টিঁকে আছে শম্ভু, দিদি আর বাবা। রুইদাসের বাড়িতে তারা চারজন—মঙ্গল, তার কাকা, তার পিসি আর ঠাকুমা। ঠাকুমা যাবে দু চার দিনের মধ্যে।

তখনো মরছে। পড়ে থাকছে এখানে-ওখানে। মুসলমানের মাটি দেয়া হচ্ছে না, হিন্দুর হচ্ছে না সৎকার। নদীর চড়ার উপর এনে ফেলে রাখছে যদি জোয়ারের জলে ভেসে যায়।

একটা কুকুর-বেড়ালের দেখা নেই। ঘাস খেয়ে-খেয়ে বনবাসে গেছে। শুধু এখন শেয়ালের চিৎকার। আগে ওরা হাঁস-মুরগি টেনে নিত, এখন নিচ্ছে পরিত্যক্ত শিশু। মৃতপ্রায় জননীর বুক থেকে।

‘এখনো উঠলিনে শম্ভু? যা স্নান করে আয়। বারবেলা পড়ে যাবে।’ দিদির গলা যেন মরা গলা।

‘এমন দিনেও নবান্ন হবে দিদি?’

‘হবে। বাবার ইচ্ছে। মা নইলে স্বর্গে থেকে অসুখী হবেন।’

ভিটে জমিতে বাবা ধান ছিটেন করে দিয়েছিল। অঘানী ধান সোনালী হয়ে পেকে উঠেছে। ঠিক যেন মার হাসি। গোপালের হাসি। লক্ষ্মীমনির হাসি। আর ঐ যে বড় থোপাটা ঐ যেন দাদা।

শম্ভু স্নান করতে গেল।

গিরিশঠাকুর মরেনি। যজমানের হাজাশুকা নেই, নমো-নমো করে নিয়ম রক্ষা করতে এসেছে। তার দক্ষিণা আজ শুধু দুটো কাঁচাকলা বা কুলি-বেগুন। আধ মালসা নবান্ন।

কলার ডোঙায় কাকবলি তৈরি করেচে ঠাণ্ডামনি। গিরিশঠাকুর মন্ত্র পড়ে দিল : ‘বায়সায় বলির্নমঃ। বায়সাঃ সর্বত্রং খাদন্তি।’

গুরুদাস বলে দিল ভয়ে-ভয়ে, ‘দেখিস উড়ে যায় কোন দিকে।’

কাকবলি নিয়ে শম্ভু চলে গেল পুকুরপারে। রুইদাসের ছেলে অধীর এসেছে কাকবলি নিয়ে। পালেদের ছেলে তারক এসেছে। এসেছে মালীদের ছেলে যুধিষ্ঠির।

কিন্তু কাক কই?

কত ডাক, কত স্তব-স্তুতি, কত আবাহন-আরাধনা, তবু কারুর দেখা নেই। কো—কো—কো, কা কা—কা; সব কাকস্য পরিবেদনা। পাতিকাক দাঁড়কাক দ্রোণকাক কৃষ্ণকাক—কাকপক্ষীর দেখা নেই। শম্ভু-তারক-যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। শেষে এগিয়ে গেল পাকুড় গাছের নিচে যেখানে অনেক কাকের বাসস্থি। সে আস্তানাও ফাঁকা। আরো এগিয়ে চলে এল তারা ধানক্ষেতের আলের পাশে। দেখল অদূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে অনেক কাকের জটলা। অনেক কলোল্লাস। লুব্ধ, বিজ্ঞ, তৃপ্ত, ব্যর্থ, ধূর্ত, ভণ্ড, তণ্ডক-বণ্ডক অনেক রকম কাক।

যে রকমই কাক হোক ঐ মাঠ ছেড়ে নড়বেনা তারা আজ এক চুল। সামান্য কাঁটালি কলার চেয়ে গলিত নরমাংস তাদের কাছে বেশি লোভনীয়। বেশি উপাদেয়।

কাকদের নবান্ন আজ।

২৬। দিন

'আর তবে ভাবনা কী।' একগাল হাসল সখীলাল : 'এবার তো সেটলিং ডেট পড়ল।'

সে আবার কী! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মনোরথ।

'ঐ যাকে সংক্ষেপে বলে এস-ডি। মামলা-মোকদ্দমার বাজারে এস-ডি শুনিসনি?' সখীলাল্ল অবাক হবার ভাব করল।'

'কী করে শুনব?' অপরাধীর মত মুখ করল মনোরথ : 'আমি কি এ লাইনের লোক? আমি গাঁয়ের এক ভ্যাদভেদে চাষা। আমি কি ইংরিজি-টিংরিজি বুঝি?'

'আগে ইসু গেল, পরে ডিসকভারি, এখন সেটলিং ডেট।'

হাঁ হয়ে রইল মনোরথ।

'মানে, এবার মামলা পেরেমপটরি বোর্ডে উঠবে।' মুখ-চোখ যথাযোগ্য গম্ভীর করল সখীলাল।

'সে আবার কী!'

'তুই যে একেবারে আকাট মেরে গেলি! পেরেমপটরি বোর্ডের নাম শুনিসনি!' সখীলাল মনোরথের গায়ে ঠেলা মারল : 'তার মানে এবার তোর মামলার শুনানির তারিখ পড়বে। আর ভাবনা নেই, তোর মামলা শুনানির জন্য তৈরি হল।'

'হবে? আমার মামলার শুনানি হবে?' আনন্দের স্রোতে খলবল করে উঠল মনোরথ।

সেই কবে থেকে মনোরথের হয়রানি চলেছে। এক সমন জারি করতেই এক বছরের ধাক্কা।' কে একটা বিবাদী মারা গেল, তার ওয়ারিশ কায়েমমোকাম করো। ওয়ারিশদের মধ্যে দুটো আবার নাবালক, একটা নিরুদ্দেশ। নাবালক দুটোর জন্যে কোর্ট-গার্ডিয়ান বসাও, আদায় করো ফাইন্যাল রিপোর্ট। নিরুদ্দেশটার শেষ বাসস্থানের ঠিকানা জান না, সেখানে ঢোল-সহরৎ করে বিকল্প জারির ব্যবস্থা করো। ঝকমারির একশেষ।

আরো কত রকমের বায়নাক্কা।

এতদিনে পার দেখা গিয়েছে সমুদ্রের। একটি আশার বাতি টিপটিপ করে উঠেছে।

'এবার তবে যন্ত্রণার শেষ হবে।' আরামের নিশ্বাস ফেলল মনোরথ।

সখীলাল ফিকফিক করে হেসে উঠল।

'দিন ফেলবে কে?' উৎসাহ নিয়ে তাকাল মনোরথ : 'হাকিম নিজে?'

'ভাব দেখাবে হাকিম ফেলছে, কিন্তু আসল কর্মী পেশকার। তাকে দিতে হবে এক টাকা।'

'দেব। দেখো দিনটি যেন আগে পড়ে।'

'হ্যাঁ, যত শিগগির সম্ভব এ যন্ত্রণার শেষ হয়।'

'সেদিন আমাকে তো আসতে হবে না? আমার সেদিন কী দরকার!' বটতলায় একসঙ্গে দু পা হাঁটতে হাঁটতে বললে মনোরথ।

'আসতে হবে না মানে?' সখীলাল দাঁড়িয়ে পড়ল : 'না এলে শুনানির দিন জানবি কী করে?'

সত্যিই তো, না এলে চলবে কেন?

দক্ষিণ-বারাসত নেমে আট মাইল মেঠো রাস্তা পার হয়ে তার বাড়ি। তা হোক। পথকষ্ট যতই হোক, তাকে আদালতে আসতেই হবে। তার বিচার চাই। সকল কষ্টের উপশম চাই।

দিন-ফেলার দিনও এল মনোরথ।

কোর্টের হাতার মধ্যেই হিন্দুস্থানীর চায়ের দোকানের এক পাশে উকিল শিবপদর সেরেস্তা। সখীলালকে ডেকে জিগগেস করল শিবপদ : 'কী বলে?'

'আজকের জন্য ফি দিতে চায় না।'

'কেন? কী হল!'

'বলে আজ কিছু করবার নেই। বলবার-কইবার নেই!'

'বলে কী!' চোখ কপালে তুলল শিবপদ : 'ডাকো ডাকো শিগগির।'

মনোরথ সেরেস্তায় পৌঁছুতেই শিবপদ হাত পাতল : 'নাও, বউনি করো।'

'আজ মাপ করুন বাবু—' মিনতির ভঙ্গি করল মনোরথ।

'এর আবার মাপামাপি কী!' শিবপদ হাঁ হয়ে রইল : 'এ ন্যায্য পাওনা।'

'ইসুতে দিয়েছি, ডিসকভারিতে দিয়েছি, এস-ডি-ওতে আর দিতে বলবেন না।' মনোরথ শক্ত হতে চাইল।

'এস-ডি-ও কী রে! এস ডি।' সখীলাল হাসিতে ফেটে পড়ল।

'তা যাই হোক, আজ তো আর কিছু বলতে-কইতে হবে না। আজ শুধু দিনটি পড়ে যাবে। পেশকারের এক টাকা বরং দিই।' শার্ট তুলে ফতুয়ার পকেটে হাত রাখল মনোরথ।

'বলতে-কইতে হবে না মানে! কী বলছ তুমি?' শিবপদ তেড়ে উঠল : 'আজ তারিখ নিয়ে, তারিখ ফেলা নিয়ে, দস্তুরমত হিয়ারিং হবে। এস-ডি—এস-ডি মানে কী?'

সখীলালের দিকে নির্বোধের মত তাকাল মনোরথ।

'এস-ডি মানে সাজেস্টেড ডে। তার মানে দু পক্ষের উকিল নথি থেকে প্রমাণ করিয়ে দেখাবে যে এই দিনে শুনানি হওয়া দরকার।' নির্ভেজাল মুখে বললে, শিবপদ : 'ও পক্ষের উকিল হয়তো লম্বা করবার জন্যে বলল, ধরো সেই চৈত্র মাস, আর আমি সংক্ষেপ করবার জন্যে বললাম, ধরো এই পউষ।

এখন এ নিয়ে তর্কাতর্কি। এ কি যে-সে ব্যাপার? এর জন্যে সমস্ত রেকর্ডটি তন্ন তন্ন করে পড়া দরকার—কোথায় কোন সাক্ষীর ঠিকানা, কোত্থেকে কী দলিল তলব—হাজার গণ্ডা ঝামেলা—'

তর্ক করে কী বুঝবে বা বোঝাবে মনোরথ। সে শুধু মিনতি করতে পারে। তাই কান্নামাখা গলায় বললে, 'বাবু একটু দয়াদাক্ষিণ্য করুন।'

'বেশ তো, পুরো ফি ষোল টাকা না দাও, আট টাকা দাও—'

'আর পেশকারের এক টাকা।' জুড়ল সখীলাল।

'আজ কম আছে বাবু।'

'কম আছে? কত কম আছে?' মনোরথের ফতুয়ার পকেটের দিকে তাকাল শিবপদ।

'চার টাকা আছে।'

'যাক গে, ওটাকে থাপ্পড় করে দাও।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেল মনোরথ।

সখীলাল বুঝিয়ে বললে, 'তার মানে পাঁচ টাকা করে দাও। একটা পেশকারের তা ভুলে যাও কেন?'

পাঁচ টাকাই দিল মনোরথ। চার টাকা শিবপদ নিলে, আর বাকি টাকাটা সখীলাল।

যেদিন খুশি যেমন খুশি দিন পড়ুক। দিন তো একটা পড়বেই। দিন না পড়ে যাবে কোথায়!

মনোরথকে সেরেস্তায় বসিয়ে কালো কোটের উপর গাউনের হিজিবিজিটা ভুর করতে করতে কোর্টের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল শিবপদ। আর তারই পিছু পিছু সখীলাল।

ফিরে এলে শশব্যস্তে জিগগেস করল মনোরথ : 'কী হল?'

'আবার এস-ডি পড়ল।' শিবপদ বললে।

'আবার এস-ডি মানে?' মনোরথ আঁধার দেখল চারদিক।

'তোমাকে বলছি বুঝিয়ে।' শিবপদ সেরেস্তার তক্তপোশে বসে হাঁপ ছাড়ল। বললে, 'তার আগে ঐ চাটগাঁর দোকান থেকে ভাঁড়ে করে একটা বেশ কড়া মিষ্টি চা দিয়ে যেতে বলো।'

চা এল ভাঁড়ে করে। রুমালে করে ধরে চুমুক দিল শিবপদ। বললে, 'হাকিমের ডায়রি ভীষণ ঠাসা, তোমার মামলার তারিখ ফেলবার জন্যে দিন পাচ্ছে না।'

'দিন পাচ্ছে না মানে! আমার মামলার তবে শুনানি হবে না?'

'হবে। না হয়ে যাবে কোথায়?' ভাঁড়ে আবার চুমুক দিল শিবপদ : 'তবে দেরি হবে।'

'আর কত দেরি!' মনোরথ এবার বুঝি শূন্যের দিকে তাকাল।

'তা কী করা যাবে বলো! আরো অনেক-অনেক মামলা যে ফাইলে।'

'তাতে আমার কী!' মনোরথ হঠাৎ রাগ করে উঠল : 'অনেক মামলা বলে আমার মামলার তাড়াতাড়ি শুনানি হবে না? আমি দগ্ধে দগ্ধে মরব!'

'অত কোর্ট কই? হাকিম কই?'

'কেন বেশি-বেশি কোর্ট হবে না, হাকিম বসবে না?' আরো তপ্ত হল মনোরথ : 'কোর্টের অভাবে হাকিমের অভাবে মামলার নিষ্পত্তি বন্ধ থাকবে? আমি দম আটকে মরব?'

'অত কোর্ট করার মত উপরালার পয়সা কই? তাদের কত দিকে খরচ।' ঠোঁট চাটল শিবপদ।'

'কেন, আমি উপরালাকে কম পয়সা দিয়েছি?'

'তুমি দিয়েছ? তুমি আবার কখন দিলে?' ভাঁড়ের থেকে মুখ তুলল শিবপদ।

'কেন, আমি কোর্ট-ফি দিই নি? আমার বিচারের মাশুল?'

'ও, হ্যাঁ, দিয়েছ বটে।'

'আর তা কি চারটিখানি?' খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়ল মনোরথ। বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'জমির দাম বেড়েছে বলে মামলার ভেলুয়েশান বেড়ে গেল, চলে এল সাবজজ কোর্টে। কত টাকার বাড়তি কোর্ট-ফি নিলে আদায় করে। আপনি তো সব জানেন—'

'হ্যাঁ, অনেক টাকা।' শিবপদ সমবেদনার সুর আনল।

'তবে? এত টাকা দেবার পরও আমি তাড়াতাড়ি বিচার পাব না? খালি এস-ডি পড়বে? বলবে কোর্টের অভাব?'

'তুমি ভেবেছ তোমার টাকা দিয়ে কোর্ট হবে?'

'তবে আর কী হবে!'

'তোমার টাকা দিয়ে বড় বড় কাজ হবে। হাসপাতাল হবে, ইস্কুল হবে, রাস্তাঘাট হবে, কত কী হবে।'

'আর আমার নিজের মামলারই বিচার হবে না। হাসপাতালে-ইস্কুলে আমার দায় কী। আমার থেকে কোর্ট-ফি নিয়েছে আমাকে কোর্ট দাও, মামলার তারিখ দাও, শুনানি দাও। ট্রেনের টিকিট বেচল ট্রেনে চড়াল, অথচ ট্রেন ছাড়ল না, এ কেমনতরো কথা?'

'ট্রেন ছাড়লেই যে পৌঁছুবে শেষ পর্যন্ত তার ঠিক কী।' শিবপদ ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

এস-ডি এস-ডি করে তিন দফায় আরো ছ' মাস চলে গেল। প্রতি দফায় এক থাপ্পড় করে ফি নিল শিবপদ।

কিন্তু পাঁচ টাকায় কী হবে? শুনানির দিন না পড়লে রোজগার মোটা হয় কী করে? আর শিবপদর যত আর্গুমেণ্ট তা শুনানির দিনটা একবার ধার্য হোক, পাঁচকে যত শিগগির পারি পঁচিশ করি।

সেই খবরই শেষ পর্যন্ত সেদিন নিয়ে এল শিবপদ।

যেন কলম্বাস আমেরিকা দেখতে পেয়েছে এমনি জয়ধ্বনি করে উঠল :

'আর ভাবনা নেই। শুনানির দিন পড়েছে। আঠারোই জুন। আর আমাদের কে হটায়!'

শিবপদ এমন ভাব করল যেন কত বড় সে এক কান্ড করে এসেছে। দিন পাওয়া মানে যেন কুল পাওয়া।

সখীলাল বললে, 'এ একেবারে পেরেমপর্টরি ডেট।' নট নড়ন চড়ন।'

চোখমুখ উজ্জ্বল করে মনোরথ জিগগেস করল : 'সেদিন শুনানির দিন, সাক্ষী আনব বাবু?'

'প্রথম দিনই সাক্ষী আনবে কী!' শিবপদ চাটগাঁয়ের চায়ের দোকানের দিকে তাকাল : 'প্রথম দিন তো ওপনিং করতেই যাবে।'

একবার পেট কাটাতে হাসপাতালে গিয়েছিল মনোরথ। ডাক্তারদের মুখে শুনেছিল ওপনিং করার কথা। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল মনোরথের। ভাবলে কোর্টে আবার পেট কাটবে নাকি?

সখীলাল বললে, 'ওপনিং করা মানে হাকিমকে মামলাটা বুঝিয়ে বলা।'

'সাবজজ কোর্ট তো!' শিবপদ আরো বিশদ হল : 'বোঝাতেই লেগে যাবে সারাদিন।'

এর আবার বোঝাবার কী আছে! বিবাদী বলাই মন্ডল অনুমতিসূত্রে মনোরথের জমি দখল করত, চেয়েচিন্তে ভিক্ষে করে একখানা খড়ো চালের ঘরও তুলেছে, এখন, এমন অকৃতজ্ঞ, বলছে তার প্রজাই স্বত্ব হয়েছে। কী করে হয়? একখানা খাজনার রসিদ দেখাক তো বুঝি। কিংবা কোনো আমলনামা। যে কোনো একটা চিরকুট। মুখের কথায় স্বত্ব হবে? ওর থাকা তো অনধিকার থাকা। দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষলে সে যে উপকারীকে দংশন করবে, এর আবার বোঝানো কী! এ তো এক কথায় বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

যে আদালত যত বেশি সম্ভ্রান্ত তার বুঝতে তত বেশি সময় লাগবার কথা এমনি ভাব করল শিবপদ। বললে, 'কোর্টের আবার নতুন সেসন পাওয়ার হয়েছে—'

'আর সেসনের মামলায় ওপনিং তো অবধারিত।' সখীলাল ফোড়ন দিল।

'না, হোক ওপনিং। সারা দিন ধরেই হোক। এরই মধ্যে সাক্ষী সব আনতে পারি কিনা ঠিক কী।'

'হ্যাঁ, সাক্ষী জোগাড় করাও আরেক বিরাট পর্ব।' সহানুভূতির সুর আনল শিবপদ।

আঠারোই জুন পঁচিশ টাকাই হেঁকেছিল, মনোরথ বললে, 'ষোল টাকা নিন বাবু। ওপনিংএর পরে না হয় আরো চার টাকা দেব।'

'কিন্তু সাক্ষীর একজামিনের দিন বা সওয়াল জবাবের দিন কিন্তু পুরো পঁচিশ টাকা চাই।' শিবপদ কোর্টের মর্যাদার উপর আবার জোর দিল : 'যে-সে কোর্ট নয়। সেসন পাওয়ার-ওয়ালা সাবজজের কোর্ট।'

'সে অবস্থাটা আসুক, দেব পুরো টাকা।'

'আর যতদিন তা না আসে, ষোল টাকার এক তন্তু কম নয়।' হাতটা ঠুঁটো করে বাড়িয়ে ধরল শিবপদ।

কী বুঝল কে জানে, আশায় বুক বেঁধে, মনোরথ ষোল টাকা দিল উকিলকে।

সখীলাল বললে, 'আর আমার এক টাকা।'

কোর্ট থেকে ঘুরে এল শিবপদ। বললে, 'সব ঠিক করে এসেছি। টিফিনের পর হবে। তুমি তিনটের সময় কোর্টে গিয়ে বসবে। বুঝলে?'

সেই আড়াইটে থেকে কোর্টের শেষ বেঞ্চিতে মনোরথ বসে আছে গ্যাঁট হয়ে, কখন তার মামলার ডাক পড়ে তারই জন্যে কান খাড়া করে আছে। আদালতের চাপরাশির মুখে তার নামটা উচ্চারিত হবে এ যেন এক অদ্ভুত কৌতুক।

কই ডাক পড়ল না মামলার। তিনটে বেজে গেল।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল শিবপদ। পেশকারের কানের কাছে কী গুজগুজ করলে। পেশকার বললে, ছ বছর বুড়ো একটা পার্টহার্ড মামলা আছে। হাকিম সেটা আগে তুলে নিল। তাই তো নেবে। আপনার মামলা তো বাচ্চা।

'পেশকারকে কিছু দেওয়া হয়নি বুঝি?' সখীলালের উপর মুখিয়ে এল শিবপদ : 'বুঝতে পারছি সব তার কারসাজি। পরের তারিখে যেন এমন ভুল না হয়।' পরে মনোরথের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার সুর ভাঁজল : 'কী করবে বলো। যে বুড়ো তাকেই তো আগে খতম করবে।'

'কে বলে?' খেপে উঠল মনোরথ : কত বুড়ো টিঁকে থাকে আর কত বাচ্চা শিশু মরে যায় অকালে।'

'তা হাকিমের বিরুদ্ধে তো যেতে পারি না।' অনম্য নিয়তির ভাষায় বললে শিবপদ।

আগস্ট মাসে দিন পড়ল।

সেদিনও কোর্টের সময় হল না। বৃদ্ধতর মামলা পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

'কোর্টের সময় না হলে কী করা যাবে বলো?'

'কেন সময় হবে না? ডাক্তারের ফি দিয়েছি কেন ডাক্তার পাব না?' মরীয়ার মত বললে মনোরথ, 'সব লেনদেনেই দাম দিলে তক্ষুনি-তক্ষুনি জিনিস পাওয়া যায়, মামলার বিচারের বেলায় দেরি কেন? দাম নেয় কেন? দাম নেয় তো জিনিস কই?'

পুজোর ছুটি পেরিয়ে নভেম্বরে দিন পড়ল। আবার বড়দিন পেরিয়ে পরের বছর ফেব্রুয়ারি।

আশ্বাসের সুর বার করল শিবপদ : 'তোর মামলা ক্রমশই বুড়ো হচ্ছে।'

ফেব্রুয়ারিতেও মুলতুবি। সেই মামুলি মন্ত্র। 'ফর ওয়ান্ট অফ কোর্টস টাইম।'

'বাবু, অন্য কোর্টে মামলাটা বদলি করে নিলে হয় না?'

'সে তো ফ্রাইং প্যান টু ফায়ারে পড়বি।' চোখমুখ ঘোরালো করল শিবপদ।

'বাঘের থাবার থেকে লাফিয়ে কুমিরের চোয়ালে।' সখীলাল প্রাঞ্জল করল অবস্থাটা।

এবার দিন পড়ল গুডফ্রাইডে কাটিয়ে।

আবার পুজো ধরো-ধরো।

'কী করা যাবে বলো।' বললে শিবপদ, 'পুরোনো একেকটা নথির চেহারা যা হয়েছে তা আর ফাইলে বেঁধে হাতে করে বওয়া যায় না। কাঁধে করেও নয়। একেকটা নথি প্রায় চার-পাঁচ বছরের ছেলের মত উঁচু। তোমারটা তো শুধু হামাগুড়ি দেওয়ার মতন হয়েছে।'

'তা বাড়ুক, বড় হোক।' হতাশ-হতাশ মুখ করল মনোরথ : 'কিন্তু এদিকে কিছুই যখন হচ্ছে না, তখন দিনের পর দিন প্রত্যহ যদি ষোলটা টাকা না নিতেন বাবু। এক আধ দিন যদি মাপ করেন।' কেউই বুঝবে না জানে। তবু বললে, 'বড় কষ্ট।'

'যত কষ্ট এই উকিলের বেলায়।' ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললে শিবপদ, 'নানা বায়নাক্কায় কোর্ট যখন এটা-ওটা আদায় করে তখন তো কিছু বলো না। বেশ, দিও না, তোমার যেমন খুশি।'

শিবপদ যে রাগ করেছে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। চাটগাঁয়ের দোকানের দিকে নিজেই গেল ভাঁড়ের সন্ধানে।

মর্মে-তীর-বেঁধা ভুক্তভোগী কে আরেকজন বললে, 'অমন কর্মটি করো না। শুনানির দিন শুকনো রেখো না উকিলকে।'

'শুনানি না হলেও?'

'না, হলেও। টাকা দেওয়া না থাকলে হাজিরা সই করে ফাইল করবে না কোর্টে। পেশকার হাকিমের হাতে তুলে দেবে মামলা। বলবে কেউ আসেনি, কোনো তদবির হয়নি। হাজিরা-পিটিশন পড়েনি কিছু। টুক করে মামলা খারিজ করে দেবে।'

'কী সর্বনাশ!' দিশপাশ অন্ধকার দেখল মনোরথ।

'তখন আবার রেস্টোর করতে তিনগুণ খরচ। সুতরাং—'

সুতরাং ষোল কলার এক চিলতেও কমানো ঠিক হবে না।

তারপর আরো ছ'মাস ঘুরে গিয়ে মামলা ধরবার দিন পেল হাকিম।

এবার আবার নতুন খেলা।

'লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যেতে হবে কোর্টে।' বললে সখীলাল, 'চাপরাশিকে দিতে হবে আট আনা।'

'এই নাও। শেষকালে যেন এই আট আনার জন্যেই না আটকায়।' একটা আধুলি বের করল মনোরথ : 'বই তো দেখাবে কিন্তু ওপনিং কই?'

ওপনিং হল না। বিবাদী পক্ষ সময়ের দরখাস্ত করেছে। বিবাদীপক্ষের যে প্রধান সাক্ষী, সতীশ মালাকার, সে অসুস্থ। দরখাস্তের অনুকূলে এফিডেফিট করেছে বিবাদী। পাল্টা এফিডেভিট দিতে পারবে মনোরথ যে সতীশ

ভালো আছে, তার এফিডেভিট মিথ্যে? তা কী করে দেবে? সে কি সতীশকে চেনে, না কি আদালতে আসবার আগে দেখেছে তাকে বাড়িতে?

হঠাৎ ঝুপ করে সখীলাল মনোরথের পক্ষে এক হাজিরা লিখে ফেলল। মনোরথের কোনো সাক্ষীই আসেনি, সে নিজে ছাড়া, তবু তার পাঁচ জনের নামওয়ালা এক মস্ত হাজিরা দাখিল হল কোর্টে।

শিবপদ বললে, 'আমার সাক্ষী অকারণে ফিরে যাবে। মুলতুবি খরচ চাই।'

'নিশ্চয়ই।' হাকিম বললে, 'এস্টিমেট দিন।'

বিবাদীর লোক চেঁচিয়ে উঠল : 'বাদী ছাড়া ওদের পক্ষে কেউ আসেনি।'

'কে বললে আসেনি?' শিবপদ বললে, 'এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করছে।'

কাকের মাংস কাকে খায় না তাই বিবাদীর উকিল দাশরথি বিবাদীকে ধমকে উঠল : 'ও নিয়ে আবার বচসা কী। হুজুর যা বলেন তাই দিয়ে দেবে।'

পাল্লা আবার কখন ঘোরে দাশরথির দিকে তার ঠিক কী!

হাকিম হাজিরাটা দেখল খুঁটিয়ে। পাঁচজনের জন্যে পাঁচ-ছয় তিরিশ টাকা ধার্য করলে। উকিলের ফি বাবদ ধরলে দশ। মোট চল্লিশ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে মনোরথকে। আজ যে টাকা সঙ্গে নেই তা জানি। পরদিন দিতে হবে নির্ঘাত। সি-পি মানে কণ্ডিশন প্রিসিডেন্ট করে দিলাম। না দিলে মামলা লড়তে পারবে না। বিবাদী সাক্ষীসাবুদ দিতে পারবে না। মামলা একতরফা হয়ে যাবে।

পরের দিন চল্লিশ টাকা দিল বিবাদী। আর কার হাতে দেবে? শিবপদ ছাড়া লোক কই? শিবপদের হাতে দিলে।

পেশকার বললে, 'রসিদ দিয়ে দিন।'

রসিদ আর কে দেবে? রসিদ দেবে মনোরথ, আইনের চোখে যে ক্ষতিগ্রস্ত। যে পাওনাদার।

রসিদ খাড়া করল সখীলাল। মনোরথ অক্ষর শিখতে শুধু নামসইটাই শিখেছিল, এবার সেটা কাজে লাগল।

'বাবু এ টাকার মধ্যে আমার কিছু প্রাপ্য নয়?' মনোরথ তাকাল কাতর চোখে : 'রসিদ দিলাম আমি অথচ কিছুই আমার পকেটে এল না।'

'অমন কথা বলতে হয় না।' সখীলাল শাসনের সুরে বললে, 'মুলতুবি খরচ চিরকাল উকিলের প্রাপ্য। যেমন ওকালতনামার চাঁদা লাইব্রেরির প্রাপ্য। যা চিরকালের রেওয়াজ তার ব্যতিক্রম হবে কি করে? উকিলবাবু কত সস্তায় তোর মামলা করে দিচ্ছে তার খেয়াল আছে?'

তা তো ঠিকই। যা রেওয়াজ তার বিরুদ্ধে বলবে কে?

কিন্তু আজ কী হচ্ছে? আজ শুনানি হবে না?

'দাশরথিবাবু পার্সন্যাল গ্রাউন্ডে মুলতুবি চাইছে।' বললে সখীলাল।

'সে আবার কী!'

'দাশরথিবাবুর শরীর খারাপ, আসেননি কোর্টে—'

'আমাদের দিক থেকে আবার হাজিরা দেওয়া হবে না? আবার পাওয়া যাবে না খরচ?'

'না, ওটা উকিলবাবুর ব্যক্তিগত অসুবিধে যে। আমাদের দিক থেকে তাই কনসেণ্ট দেওয়া হয়েছে।' বুঝিয়ে দিল সখীলাল : 'কখন কার ঠেকা হয় কিছু বলা যায়? উকিল উকিলকে না রাখলে কে রাখবে?'

আবার দিন পড়ল শুনানির।

টিফিনের পরে মনোরথ দেখল দাশরথিবাবু গাছতলায় দাঁড়িয়ে।

ছুটতে ছুটতে মনোরথ একাই চলে এল কোর্টে। হাকিমকে লক্ষ্য করে বললে, 'হুজুর, ধর্মাবতার, দাশরথিবাবুর অসুখ নয়, তিনি এসেছেন কোর্টে, ঐ যে কথা কইছেন গাছতলায়।'

হাকিম হাসল। বললে, 'সকালবেলার দিকে অসুখ ছিল, শেয়ালদা কোর্টটা ঘুরে আসতেই বিকেলের দিকে ভালো হয়ে গেছে।'

চাপরাশিকে বললে, 'দাশরথিকে ধরে নিয়ে এস।'

দাশরথি তখন হাওয়া।

শিবপদ এল সাফাই গাইতে। বললে, দাশরথিকে ঠিকমত চেনে না মনোরথ।

কিন্তু হাকিম চিনল। দাশরথি আর শিবপদ দুজনকেই চিনল। মনে মনে ঠিক করল পরের দিন ধরতেই হবে মামলা। আর ভেরেন্ডা ভাজতে দেওয়া নয়। ফাঁকায় দিন রেখেছে এবার। লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে রেখেছে।

কোর্ট বসবার আগেই এসেছে শিবপদ। পেশকারের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আজ কীরকম বুঝছেন?'

'আজ মনে হচ্ছে হাকিম ধরবেনই মামলা।'

'কিছুতেই ঠেকানো যাবে না?'

'মনে তো হচ্ছে না। কোনো দরখাস্তেই কান পাতবেন না আজ।'

'তবে উপায়?' শালের ফুটোর মধ্য দিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট শিবপদ চালান করল পেশকারকে। বললে, 'একটা সেসন কেস নিয়ে আসা যায় না?'

'দেখি।' পেশকার উঠল। গেল ডিস্ট্রিক্ট জজের সেরেস্তায়। একটা রেপ কেস পেল। কেসটা অন্যত্র যাচ্ছিল, সাবজজের কোর্টে ট্রান্সফার করে নিয়ে এল।

সেসন কেস কি ফেরত দেওয়া যায়? তার দাবি সর্বাগ্রে।

তা ছাড়া এ একটু বেশ নতুন ধরনের মামলা। এ কি কেউ ছাড়ে?

'আজও আমার মামলা হবে না?' ককিয়ে উঠল মনোরথ।

শিবপদ বললে, 'দায়রা এসে গেলে কী আর করা যাবে? দায়রা হচ্ছে মেন লাইনের মেল ট্রেন, তাকে পথ ছেড়ে দেবে সবাই।'

দক্ষিণ-বারাসত নেমে আট মাইল মেঠো রাস্তা পার হতে হতে একবার থামল মনোরথ। নির্জনে একবার শূন্যের দিকে তাকাল। কান্নাভরা গলায় বললে, 'ভগবান, আর কতদিন?'

ভগবান হাসলেন। বললেন, 'আমার আদালত আরো আস্তে।'

২৭। কেরাসিন

নতুন বিয়ে করেছে রমজান। বউয়ের নাম হাস্যবিবি। সব সময়েই হাসে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও হাসে কি না বাতি জ্বালিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে রমজানের।

কুপি আছে। দিয়াশলাইও আছে। কিন্তু কেরাসিন কই?

পাশেই হাতেম শা'র দোকান। আগে কাঠ বেচত। কেরাসিন বেচত। এখন ভেলি গুড় বেচে। বেচে খোসাভুষি।

'কেরাচিন এল দোকানে?'

'কোথায় কেরাচিন!' হাতেম শা বিতৃষ্ণার ভঙ্গি করে।

জবাব শুনে রমজান যেন খুসি হতে চায় না। ইতি-উতি করে।

'চাষার ঘরে আবার কেরাচিনের দরকার কি? কোনোদিন বাতি জ্বেলেছিস রাত্তিরে?'

'সময়ে-অসময়ে জ্বালতে হয় তো তবু।'

'নে, নে, রাখ। পান্তা-পোড়া-খাওয়া চাষা, তার আবার কেরাচিন তেল! তার চেয়ে গিয়ে ঘিয়ের বাতি জ্বাল না।' হাতেম শা দাঁতখামটি দিয়ে ওঠে।

সত্যি, তাদের ঘরে রাত্রে আবার কবে বাতি জ্বলল! তার বাবা অত্যন্ত ছোট চাষা, হাল-গরু বেগার নিয়ে মুজরো কবুলতিতে জন খেটেছে এ বছর। হাতে-লাঙলে সে বাপের সাহায্য করেছে, তবু তাদের প্রায় দিনান্তর খাওয়া হয়নি। জমি অল্প, তায় ধানগাছে এত অতিরিক্ত তেজ হয়েছিল এ বছর যে, ধান ফোলেনি, ধানে দুধ হয়নি। এক কাটি ধান কর্জ এনে খন্দের সময় দেড় কাটি ফিরিয়ে দেবে এই কড়ারে পেট চালিয়েছে। তাদের কিনা কেরাসিনের কুপি! সত্যি, আজগুবি শোনায়।

তবু, এ বছরই কত মাৎবর চাষা রাজা হয়ে গেছে। কুপি থেকে চলে এসেছে হেরিকেনে, খোড়ো চাল থেকে টিনের চালে। গুড় ছেড়ে চিনি ধরেছে, বিড়ি ছেড়ে সিগারেট। ঘোড়া কিনেছে কেউ কেউ। কেউ বা কলের গান। আর, প্রায় সবাই একটা, দুটো তিনটে, চারটে পর্যন্ত বিয়ে করেছে। কুমিল্লা-ফরিদপুর থেকে রাজ্যের মেয়ে এসেছে চালান হয়ে।

রমজানের শুধু একা এই হাস্য। এত অভাব-উপোসের মধ্যেও যে হাসে। যার হাসিরই কোনো অভাব নেই।

রাত্রে একেক সময় মুখখানা তার দেখতে ইচ্ছে করে। ঘুমের মুখ, আনন্দের মুখ। দিনের মুখে রাতের মুখের চিহ্নটিও লেখা থাকে না।

দুই কমিউনিস্ট কর্মী গাঁয়ে এসেছে কেরাসিনের ফর্দ করবার জন্যে। হপ্তায় কার কত তেল লাগতে পারে, তার তায়দাদ। বলে, 'এবার আর কারু

ভাবতে হবে না। আমরা এসেছি। দেখবে গাঁয়ে আমরা দেয়ালি জ্বালব। কি, কত লাগবে তোমার?'

'এক কুপো।' রমজান কৃতার্থের মত বলে।

তার গায়ে খোঁচা মেরে হাতেম ধমক দিয়ে ওঠে: 'বল এক বোতল। বাইশ ইঞ্চি বোতল। তেল হাতি-মার্কা।'

তেলের এজেন্ট হীরেলাল সারখেল এসেছে ডিপোর বাবু চুনীলাল সিকদারের কাছে তালাস-তদবিরের জন্যে। দশ দিনের উপর সে কলকাতায় বসে, অথচ মাল বেরুচ্ছে না গুদোম থেকে।

'ক-টিন আপনার?'

'শাদা ছ শো, লাল চার শো।'

'পঞ্চাশ টিন ছেড়ে দিতে হবে মশাই।' চোখ ছোট করে চারদিকে তাকায় চুনীলাল।

না, একেবারে মুফৎ যাবে না। দামের যা পড়তা পড়ে, তার কিছু কম দিয়ে চুণীলাল পঞ্চাশ টিন কিনে নেবে হীরেলালের থেকে। আর সেগুলি, সোজা কথা, সটান চালান হবে কালোবাজারে। একেক ফোঁটা তেল একেক ফোঁটা রক্তের মত মনে হবে। কি, রাজি?

উপায় কি! রোমে এসে গ্রীক সাজলে চলবে না।

ওয়াগনে হাজার টিনই ঠিক এসেছে, কিন্তু তার পঞ্চাশ টিনই খালি। হীরালাল জেলার কর্তাকে মোকাবিলা রেখে মাল খালাস নিল, কিন্তু ডিপোয় নালিশ পাঠাল না। সাব্যস্ত হল লিকেজ, ঝড়তিপড়তি, টুটাফুটা। রেলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হল সবাই।

হিসেবে ছাঁট পড়ল পঞ্চাশ টিন। বাঁট হল সাড়ে ন শোর বনিয়াদে।

এজেন্টের নিচে ডিলার। দীননাথ নন্দী। ইয়াদালি ফরাজী।

'তোমার ছাড় কত?'

'লাল চল্লিশ, শাদা বিয়াল্লিশ।'

'তোমার?'

'লাল আটাশ, শাদা বায়ান্ন।'

মোট আটষট্টি আর চুরানব্বই। হীরেলাল মনে-মনে হিসেব ঠিক করে ফেলে। শতকরা কুড়ি নম্বর করে ছাড়তে হবে। একেবারে খালি না চলে, আধা-ভর্তি টিন নিয়ে যাও। গায়ে দাগ কাটা আছে। কি, রাজি?

উপায় কি! নইলে মাল আসে না হাতে।

টিন সব শিল করা, মুখ বন্ধ, কিন্তু সবগুলিই ঢকঢক করছে। কেউ পেট পর্যন্ত ভর্তি, কেউ বড় জোর গলা পর্যন্ত। মাথা-সই কেউ না।

কালোবাজার পিছল হয়ে ওঠে।

ডিলারের নিচে ইউনিয়ন-ডিলার। বামাপদ করন। আমাদের হাতেমালি।

'কত তোমার ইউনিয়নে?'

'লাল কুড়ি, শাদা দশ।'

'তোমার ?'

'ঐ রকম।'

দীননাথ ধমকে ওঠে। ইয়াদালি চোখ পাকায়।

'অত নিয়ে করবি কি শুনি? লাগবে নাকি অত? কত লোক সত্যি বাতি জ্বালায় তোদের দেশে?'

তা তো ঠিকই। বামাপদ আর হাতেমালি ফিকফিক করে হাসে।

'চাষার ঘরে বাতি জ্বলবে, না, ঝাড়লণ্ঠন জ্বলবে!'

তা, করতে হবে কি তাই বলো না।

'আদ্দেক বিক্রি করে যা আমাদের কাছে।'

নিশ্চয়ই। অত টিনের গাহেক কোথায় গ্রামে? দরকার থাকলেও দরকারের বোধ কই?

উপায়ও নেই তা ছাড়া। খাতিরখাতরার লোক তারা, কেউ পাটের বাবুর, কেউ বা বোর্ডের মেম্বরের, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে ছাড় করে নিয়েছে। দাম যদি একটু চড়া পায়, হাত-ফেরতা না করেই বিক্রি করে দেয়া মন্দ কি।

তিরিশ টিনের মধ্যে পনেরো টিনই বিক্রি হয়ে যায় গ্রামে না যেতেই। দীননাথ-ইয়াদালির আড়তে বসেই।

কেরাসিনের সোতা খাল বয়ে যায় কালোবাজারে।

তারপর যে কয় টিন গাঁয়ে আসে তারো কতক জড়ো হয় গিয়ে হয়ত পাটাতনের নিচে, গুড়ের হাঁড়ির আড়ালে।

'চাষার ঘরে আবার ক্রাচিনের দরকার হল কবে? কোনো দিন বাতি জেবলেছিস রাত্তিরে?' রমজানকে মুখঝামটা দিয়ে ওঠে হাতেমালি।

কমিউনিস্ট কর্মীরা সাবডিভিশনাল ফুড-কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছে। কোনো অসাম্য তারা বরদাস্ত করবে না। গাঁয়ের লোকদের তারা চিনি খাওয়াবে। রাত্রে তাদের ঘরে জ্বালাবে কেরোসিনের ফুটফুটে আলো।

শুধু শহরের লোকের জন্যে ভাবনা। যত উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-মাস্টার, দোকানদার, হোটেলওয়ালার প্রতি পক্ষপাত। যত মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি। আর গ্রাম রইল অন্ধকারে। অবহেলার অন্ধকারে। কর্মীরা পায়জামার দড়িতে জোরে গিঁট বাঁধল।

অনেক চেঁচামেচি করে অনেক টেবিল চাপড়ে গ্রামের বরাদ্দ তারা বাড়িয়ে নিল কমিটির থেকে। শহরে যদি একশো টিন লাগে, মফস্বলে কম করে লাগবে তবে হাজার। পাঁচ : এক—সমস্ত একত্র ধরলে গাঁয়ের লোকের অনুপাত এর চেয়েও বেশি। ঢোলশহরৎ করে গাঁয়ে রেশনিং চালু হল, বাড়ি প্রতি হপ্তার বরাদ্দ হল এক ছটাক থেকে আধ সের। গ্রামে এবার এল বুঝি দীপান্বিতা।

সাবডিভিশনাল ফুড-কমিটির নিচে গ্রাম্য রেশন-সমিতি। কমিউনিস্ট

কমীর কাণ্ডে তারা হাততালি দিলে। যত বেশি, ততই বেসাতের সুবিধে। আর কে না জানে, তাদের খাতিরের লোকেরাই ইউনিয়ন ডিলার। প্রেসিডেন্ট রহিম বক্স খোন্দকারেরেই লোক এই হাতেমালি।

কিন্তু কে কোথায় চায় কেরাসিন! জোর করে তুমি গছিয়ে দিতে পার, কিন্তু কেনাতে পার না। অভাবের বোধ আনতে পারলেও কেনবার ক্ষমতা আনতে পার না। রমজানের মত অমন বেআক্কেল কবিত্ব কার আছে এই বন-বাদায়! সন্ধ্যের সময়েই যেখানে ঘুম আর যেখানে এক ঘুমেই প্রত্যুষ সেখানে মাঝরাতে আলো জেবলে বউয়ের মুখ কে দেখতে চাইবে!

তাই কার্ডে ধরা থাকলেও বেশির ভাগ লোকই আসে না নিতে কেরাসিন। তাই অনায়াসেই হাতেমালি আদ্ধেক টিন দীননাথের ঘরেই বিক্রি করে আসে। বাড়তি সেই তেল কালোবাজার আলো করে। জবলে পাতালের অলিতে-গলিতে।

কিন্তু আসে তাঁতিরা। মুচিরা। নৌকোর মাঝিরা। রাত্রেও যাদের জীবিকার খেয়া, জীবিকার ফোঁড়, জীবিকার টানা-পোড়েন বন্ধ হয় না। তাদের কারুর কার্ড নেই, থাকলেও যা বরাদ্দের নমুনা, দু'রাত্রেই ফুরিয়ে যায়। তাই তারা মাঝে-মাঝে, অসহ্যের সময়, খিড়কির দরজায় এসে এক হাতে মুখের আধখানা ঢেকে জিগগেস করে, 'দাম কত বোতলের?'

'লাল পাঁচ সিকে, শাদা দু'টাকা।'

আস্তে-আস্তে তাঁত বন্ধ হয়ে যায়। মুচি ক্ষেতে গিয়ে জন খাটে। তাল-বেতের কারিকররা খোল-কত্তাল গায়। নৌকো নোঙর ফেলে চুপ করে বসে ঢেউ গোনে।

তবু বিক্রি হয় পাঁচ সিকে থেকে দু'টাকায়। মোড়ল-মাতব্বরের বাড়িতে। যখন খাওয়া-দাওয়া ঘটে, ঘটে বিয়ে-সাদি, পাল-পার্বন। যখন লুঠতরাজ হয়। ডাকাত আসে মশাল জবালিয়ে।

রাত্রে হাস্যবিবি মাঝে-মাঝে কেঁদে ওঠে। গুঙিয়ে ওঠে।

পেটে তার কি একটা দগদগে যন্ত্রণা। কখনো কাটা ছাগলের মত হাত-পা ছোঁড়ে, কখনো গুটিয়ে পাকিয়ে যায়। কখনো হাতে-পায়ে খিল ধরে থাকে।

'হাসু, কথা ক, কি খেয়েছিস আজ তুই? এমন করছিস কেন?'

মুগ আর মরিচের মৌশুমে পরের ক্ষেতে ফসল তুলে বাপে-পোয়ে যা পেয়েছে, তাই খেয়ে কাটিয়েছিল কয়েক মাস। তাও শেষ দিকে আকাঁড়া চালের জাউ খেয়ে। রোগে-রোগে কাহিল হয়ে গেছে দু'জনে। আর কেউ জন ধরে না তাদেরকে। স্টিমারঘাটে গিয়ে সর্দারের জিম্মায় কুলিগিরি করে। হালকা মালের তালাস দেখে। খাঞ্জা খাঁরাও আজকাল হালকা বোঝা কাঁধছাড়া করে না।

আকাঁড়া চালের জাউও বুঝি জোটে না আর। কাজীর হাঁড়িতে মুঠোখানেক চাল ছিল, তাই শিলে বেটে ফেনের মত একটু-একটু কদিন রান্না করেছে হাসু। তারপরে আজ ছ'-সাত অক্ত উপোস। টানা উপোস। চেহারা কি রকম বিগড়ে গিয়েছে তার!

খিদের তাড়নায় নিশ্চয়ই কিছু একটা খেয়েছে হাসু। আর কাউকে না দিয়ে। না জানিয়ে।

। [illegible] কাঁদিটা কাটা দাওয়ার উপর। সামনে বঁটি। কটা কাঁচা তেঁতুল।

বুঝতে আর দেরি হয় না। কাঁচা বিচেকলা কুটে কাঁচা তেঁতুলের সঙ্গে সেদ্ধ করে খেয়েছে হাসু। খেয়ে অবধি কি হয়েছে তার, কে বলবে।

রাত্রের হাসি কখনো দেখিনি, কিন্তু কান্নাটাকে দেখব। রমজান হাতেম শার দোকানে ভয়ে-ভয়ে এসে দাঁড়ায়।

'একটু কেরাচিন দেবে মাৎবর?'

হাতেম শা আঁৎকে ওঠে : 'কেরাচিন দিয়ে তুই করবি কি?'

'বউটার অসুখ, মাৎবর। বড় কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।'

'তা তেল দিয়ে মালিশ করবি নাকি?'

'না, আলো জ্বালব।'

কথাটা রমজানের কানেই বেখাপ্পা শোনায়। চাষার ঘরে সন্ধ্যের সময়েই যেখানে ঘুম, আর যেখানে এক ঘুমেই প্রত্যূষ সেখানে আবার আলো কিসের?

কিন্তু ব্যাথার তাড়নায় হাস্য মাঝেমাঝে উঠে দাঁড়ায় শোয়া ছেড়ে। এখানে-ওখানে ধাক্কা খায়, টলে পড়ে। ফের ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ে ছটফট করে। গায়ে হাত দিলে জ্বর মালুম হয়।

আলো না হলে ধরবে করবে কি করে? হাঁপিয়ে ওঠে রমজান।

হাতেম শা ভুরু কুঁচকে তাকায় খানিকক্ষণ। শেষে কি ভেবে বলে, 'নেই কেরাচিন। মালই আসে না—'

'তবে প্রহ্লাদ প্রামানিককে দিলে যে দেখলাম।' রমজান কাট-কাট গলায় বলে।

'তা, ওর বাড়িতে কলেরা—'

'আমার বাড়িতেও তো তাই। দাস্ত-বমি নেই, কেঠো কলেরা।' রমজান সিধে হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে।

'ও বোতল আড়াই টাকা করে দিয়েছে। তুই দিবি তাই? পয়সা থাকে তো কবরেজ ডাকা। বার্লি-সুজি কিনে দে।'

কিন্তু আজ বার্লি-সুজির বদলে ধুলো। কবরেজের বাড়িতে কবরের মাটি।

আজ রাতে হাস্যের আর্তনাদ কথা পেয়েছে। বলছে, 'তুমি কোথায়? আমার চোখ টেনে নিচ্ছে, ফাঁপর করছে আমার। ওগো আমাকে দেখ—তাকাও আমার দিকে।'

পাথরের মত শক্ত অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না।

হাস্য হাত বাড়ায়। আশ্চর্য, রমজান কোথাও নেই!

যে করে হোক, সে আলো আনতে গেছে। দেখবে সে রাত্রের মুখ। অন্ধকারের মুখ।

হঠাৎ বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে লাল মেঘের ঝড় উঠল আকাশে। ঘরের ঠিক পাশ

দিয়ে যেন টাটকা সূর্য উঠছে। রাতের অন্ধকার কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ে গেছে ধোঁয়া হয়ে।

কি ব্যাপার? হাতেম শার গুড়ের আড়তে আগুন লেগেছে। গুড়র হাঁড়ির মধ্যে লাল কেরোসিন।

রমজান চলে এসেছে হাস্যর পাশটিতে। এবার দেখবে সে হাস্যকে। যে হাস্য এখন ঘুমে, যার মুখ এখন অন্ধকার।

২৮। বিন্দু

এবার বাস্তবভূমিতে নেমে আসতে হয়। আইসক্রিম খেতে-খেতে দু-জনের মনে হল।

আশ্চর্য, এক সময় না এক সময় নেমে আসতেই হবে। দাঁড়াতেই হবে কঠিন মাটিতে। পাখি আর কত চক্কর মারবে? ডানা মুড়ে বসতেই হবে ডালে-আবডালে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ', চোখ নাচিয়ে শুক্তি বলল, 'আর আইসক্রিম খাওয়া নয়, এবার চাল-ডালের সন্ধান দেখ।'

'শেষ পর্যন্ত কথাটা উঠলই।' অনীক—অনীকেন্দ্র—বললে বিস্মিতের মত।

'উঠতেই হবে।' এক চামচ আইসক্রিম দাঁতের নিচে জিভের ডগা দিয়ে ধরে রাখতে চাইল শুক্তি ধরতে-ধরতেই মিলিয়ে গেল।

'আমি ভেবেছিলুম কথাটা আমি পাড়ব।' এক ঢোঁক জল খেল অনীক।

'পাড়তেই হবে। আমি-তুমি অবাস্তব।' হাসল শুক্তি।

'আশ্চর্য, কথাটা না উঠে আর যায় না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত কৃত্রিম ভঙ্গি করল অনীক।

'হঠাৎ কী রকম যেন স্থূল শোনায়!' বললে শুক্তি।

'হয়তো বা ছন্দপতনের মত।' অনীক প্রতিধ্বনি করল।

'অথচ, এমন অদ্ভুত, উপায় নেই এ ছাড়া।' শুক্তির মুখে একটু বা দুষ্টুমির হাসি ফুটল : 'এ ছাড়া আর ব্যবস্থাও নেই।'

'হাড়গোড় ব্যথাকরা তীব্র জ্বরে বসন্তের গুটি বেরিয়ে পড়াই ভালো ব্যবস্থা।' অনীক জোর দিল কথায় : 'আর তা যত শিগগির হয় ততই মঙ্গল। কি বলো?'

'যত শিগগির।' প্রতিধ্বনি করল শুক্তি : 'বাবা কোত্থেকে এক ইঞ্জিনিয়র পাকড়াও করেছেন। এরই মধ্যে একদিন নাকি দেখতে আসবে আমাকে।' আতঙ্কে ঝাপসা করল কণ্ঠস্বর।

'আর আমার মা-ও নাছোড়।' স্বরে অনুরূপ অস্পষ্টতা আনল অনীক :

'এবেলা ওবেলা পাত্রী দেখে বেড়াচ্ছেন। কবে যে ফিনিশিং টাচ দিতে আমাকে ডেকে বসেন তার ঠিক নেই।'

'ফিনিশিং টাচ মানে?' ডান চোখের দূর কোণটা সন্দিগ্ধ করল শুক্তি।

'ফিনিশিং টাচ মানে', শব্দ করে হেসে উঠল অনীক, 'শেষ স্পর্শ নয়—দেখার ব্যাপারে শেষ দৃশ্য। দৃশ্য হয়তো ঠিক নয়, শেষ দৃষ্টি।'

'তবু তুমি ছেলে—'

'কী বললে?' প্রায় হুমকে উঠল অনীক।'

'তবু, তুমি পুরুষ,' ইশারাটা মুহূর্তে বুঝে নিল শুক্তি: 'তোমার পক্ষে পাশ কাটানো সোজা। কিন্তু আমি মেয়ে, আমার অবস্থা করুণ। ভদ্রলোককে বাড়িতে ধরে নিয়ে এলে তার সামনে না দাঁড়িয়ে পারব এমন মনে হয় না।'

'আমি নারী—কই, পারলে না তো অমনি নাটকীয় উক্তি করতে!' অনীক একটু বা ব্যঙ্গ মেশাতে চাইল: 'যেই বিয়ের কথা উঠল, অমনি দেখলে তো, আমি পুরুষ হয়ে গেলাম। আর তুমি যে-মেয়ে সেই মেয়েই থেকে গেলে। বিয়ের আগেও যা পরেও তা। হলেও যা না-হলেও তা। সেই ইটার্ন্যাল নন-এনটিটি।'

'ঝগড়া পরে করব।' একটুও চটল না শুক্তি: 'দয়া করে এখন কাজের কথাটা বলো।'

'মানে আইসক্রিম ছেড়ে চাল-ডালের কথা। তার মানেই,' হাসল অনীক: 'দাঁতভাঙা বাস্তবের কথা। চাল-ডাল কাঁকর আর পাথরকুচি। কিন্তু সত্যি যদি একটু ঝগড়া করতে, আহা, কত মিষ্টিই না জানি লাগত। আরেকটা অর্ডার দিতে হত না।'

'এবার একটা চকোলেট নাও। প্লিজ।'

'নিশ্চয়। তা আর বলতে হবে না।

'আজ একটু বেশিক্ষণ থাকা দরকার, কাজের কথাটা সেরে নিতে হবে।'

কাজের কথা! সেই সব অমর্ত স্তব্ধতার ক্ষণগুলো বুঝি ফুরোল। সেই সব সুন্দর-সুন্দর দ্বিধা। আরো সুন্দর আড়ষ্টতা। একটা অলৌকিক অস্তিত্ব থেকে বুঝি নির্বাসন হবে দুজনের।

গোধূলি রঙের মন বুঝি এবার অস্ত গেল। অরণ্যের সীমান্তে একটা হিংস্র জন্তু যেন ওৎ পেতে আছে মনের মধ্যে এখন যেন সেই মধ্যরাত্রির উপস্থিতি।

'আজ কোনো কাজ নয়—এ বুঝি শুধু মানসসুন্দরীকেই বলা যায়।' চোখের দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করল অনীক: 'আর, গৃহলক্ষ্মী হলে বলতে হয়, আজ বড়ো শক্ত কাজ, সব ফেলে দিয়ে, ছন্দোবন্ধ গ্রন্থিগিট, এসো তুমি প্রিয়ে—'

'লক্ষ্মীটি, এখন আর কবিতা নয়।' শুক্তি বিরক্তির গায়ে মিনতি মাখাল।

'এটা শেষের কবিতা।'

'প্লিজ বি সিরিয়স।'

'এই মুহূর্তেই হচ্ছে। তবে যে কবিতাটা বললাম তোমার ইঞ্জিনিয়রদের সাধ্যি নেই তৈরি করতে পারে। শোনো—'

'দয়া করে গদ্য করে বলো।'

সব জানা। এবার থেকে আগাগোড়া গদ্য করে বলতে হবে। হিসাব-পরীক্ষকের ভাষা ব্যবহার করতে হবে। হয়তো বা রসকসহীন সিভিল কোর্টের কণ্ঠস্বর। এই কাছে-বসে-বলা অথচ সুদূর-থেকে-শোনা অপরূপ সুরটাকে কি আরো কিছুক্ষণ, আরো কিছু দিন, বাঁচিয়ে রাখা যায় না? এই অন্তরভরা মন্ত্রের মত ভাষাটাকে? আইসক্রিমের চামচটাকে কি এখুনি এখুনি ভাতের হাতা না করলেই নয়?

'বলবার আর কী আছে!' অনীক শুকনো গলায় বললে, 'এবার তবে আত্মীয়ভাবে বলতে হয়।'

লাইন পেয়ে উৎসাহিত হল শুক্তি: 'তার মানে আমি আমার বাবা-মাকে, তুমি তোমার বাবা-মাকে?'

'তাতেও সম্পূর্ণ খোলসা হবে না।' যেন উকিলের চেম্বারে আইন নিয়ে পরামর্শ চলছে এমনি নীরক্ত অনীকের কণ্ঠস্বর: 'কেননা তুমি তোমার দিকে একা বললে বোঝা যাবে না আমি কে, আমি আমার দিকে একা বললে বোঝা যাবে না তুমি কোনটি। আমাকেও তোমার বাড়ির কেউ চেনে না, তোমাকেও আমার বাড়ির কেউ চেনে না। সুতরাং আমার মতে উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের যুগল্ম আবির্ভাব ও যুক্ত ঘোষণা বাঞ্ছনীয়। অন্তত লুকোবার স্পর্শ থাকবে না তাতে।'

'আরো একটু সোজা করে বলো।' অসহিষ্ণু শোনাল শুক্তিকে।

'যুগল্ম-যুক্ত এসব কথা শোনোনি বুঝি? নতুন লাগছে?' হাসল অনীক: 'সোজা করেই বলছি। একদিন ছুটির দিন আমি তোমাদের বাড়ি যাব। তোমার পড়ার ঘরে অপেক্ষা করব।' তুমি তোমার বাবাকে বলবে, আমি অনীক গুপ্ত বলে এম-এ পাশ, বিলিতি সদাগরী অফিসে সদ্য-চাকরি পাওয়া এক ভদ্রলোককে বিয়ে করছি। কে অনীক? তোমার বাবা স্বভাবতই গর্জন করে উঠবেন। আর আমি তক্ষুনি বিনম্র ভঙ্গিতে কাছে গিয়ে দাঁড়াব, প্রণাম করব হেঁট হয়ে। কিছু আর অনুমানের জন্যে রাখব না।'

প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল শুক্তি: 'খুব ভালো হবে। তেমনিধারা ছুটির দিনে আমিও—'

'তেমনিধারা তুমিও এক ছুটির দিন আমাদের বাড়ি যাবে। আমার বসবার ঘরে অপেক্ষা করবে।' আমি আমার মাকে বলব শুক্তি দত্ত নামে একটি বি-এ পাশ তরুণীকে বিয়ে করছি। কে শুক্তি? মা স্বভাবতই তর্জন করে উঠবেন। আর তুমি তক্ষুনি সলজ্জ ভঙ্গিতে কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, প্রণাম করবে লুটিয়ে পড়ে। কিছু আর রাখবেনা অনুমানের জন্যে।'

'চমৎকার হবে।' চামচে-বাটিতে সানন্দ শব্দ করে উঠল শুক্তি। 'কিন্তু,'

একটু বা প্রশ্নটা জটিল করল: 'ছুটির দিন—তোমার বাবাকে বলবেনা কেন? শুধু মাকে বলবে কেন?'

প্রবোধের ভঙ্গিতে হাত তুলল অনীক। বললে. 'আমাদের বাড়িতে মা-ই প্রবল। বাবা কিছু নয়। তোমাদের বাড়িতে?'

'আমাদের বাড়িতেও তাই।'

'তাই?'

'তাহলেই বুঝতে পারো ননএনটিটি কারা?' তুরুপের তাশ তুলল শুক্তি: 'পুরুষেরাই ননএনটিটি।'

'জিতলে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। মানে বিয়ের আগে নয়, বিয়ের পরেই পুরুষেরা নিঃস্বত্ব। তবে একটা বিষয়ে উপশম আছে।' জোরে নিশ্বাস ফেললে অনীক: 'তোমার মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে গোড়াতেই আর মার খেতে হবে না।'

'ওমা, ছি, মার খাবে কেন?' ম্লান মুখ করল শুক্তি।

'গোড়াতেই তোমার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে রি-য়্যাকশন কী হত বলা যায় না। গুপ্ত-দত্ত দেখেই হয়তো মার-মার করে উঠতেন।' দু হাত তুলে অনীক একটা কুকুর-মারার উদাত্ত ভঙ্গি করল।'

খিল খিল করে হেসে উঠল শুক্তি: 'মোটেই তা নয়।'

'নয়?'

'না, ওসব বাবার গা-সওয়া।' বিহ্বল চোখে তাকাল শুক্তি: 'আমার দিদিও ইন্টারকাস্ট বিয়ে করেছে। বাবা-মা কিছুই আপত্তি করেন নি। বরং পুরোপুরি গয়না-টয়না জিনিসপত্র সমস্ত দিয়েছেন।'

'বলো কী?' উল্লাসে টেবল চাপড়াল অনীক: 'তোমার জামাইবাবু?'

'জামাইবাবুরা বামুন।'

'বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান। সে কথা বলছিনে। বলি করেন কী?'

'রেলের অফিসার। কলকাতায় বাড়ি আছে। ভাগ্যক্রমে এখন আবার এখানেই পোস্টেড।' রুমালে মুখ মুছল শুক্তি: 'দিদি কদিন আমাদের ওখানেই আছে। তুমি যেদিন যাবে আলাপ করে আসবে।'

'দিদির নাম নিশ্চয় মুক্তি।' জ্যোতিষীর মত আঙুল নাড়ল অনীক।

'আহা, এ যে-কেউ বলতে পারে। যেমন তোমার দাদার নাম নিশ্চয়ই অলীক হবে।'

'ঠকে গেলে। আমার দাদার নাম প্রাণকুমার।'

'যাই হোক, নামে কিছু আসে যায় না।' শুক্তি সামনের দিকে ঝুঁকল সামান্য: 'যেই মা দেখবেন, নবেন্দুবাবুর বেলায় যেসব দেখেছিলেন, তুমি একটা শাঁসওয়ালা চাকরি করছ আর চেহারাটা নেহাৎ অখাদ্য নয়, তখন তিনি একবাক্যে ছাড় দিয়ে দিবেন। এতটুকু হিচ হবে না। কিন্তু তোমাদের

বাড়িতে আমার কেমন রিসেপসান হবে তাই বরং ভাবছি।' চিন্তিত-চিন্তিত মুখ করল শুক্তি।

'আমাদের বাড়ি তোমাদেরটার চেয়ে পিছনে নেই।' গম্ভীর হল অনীক।

'তার মানে?'

'আমাদের বাড়ি তোমাদেরটার মতই উদার।'

'কেন, করেছে কী? ঝটপট বলে ফেল।' অধৈর্যের টান আনল শুক্তি: 'তুমি শুধু-শুধু বড্ড সময় নাও।'

'না, আর সময় কোথায়? এখন যত শিগগির শেষ হয়!' জলের গ্লাসে চুমুক দিল অনীক: 'বলতে চাচ্ছি আমার দাদাও জাতের বাইরে বিয়ে করেছে।'

'সত্যি?' আনন্দে শুক্তি সমস্ত মুখই আইসক্রিম করে তুললে।

'আমার যিনি বৌদি, তনিমা পাল, তিনিও গ্র্যাজুয়েট। তাই মা যখন দেখবেন তুমিও নিতান্ত আকাট নও আর দেখতে,' অনীক প্রতিশোধ নিতে চাইল: 'একেবারে প্রজাপতি না হলেও নেহাৎ শুঁয়োপোকা নও তখন মা নিশ্চয়ই বিমুখ হবেন না। সুতরাং মাভৈঃ।'

'এই একসেলেন্ট! নইলে—'

'মা শুধু এইটুকু জিজ্ঞেস করতে পারেন, এই মেয়েটার সঙ্গে আলাপ হল কোথায়?' অনীক বিলের বাবদ টাকা বের করল: 'প্রলাপ তো বলতে পারেন না তাই আলাপই বলবেন।'

'সে তো আমার মাও প্রশ্ন করবেন।' শুক্তির আর এতে সন্দেহ কী!

'দি ইটার্ন্যাল কিউরিওসিটি।'

'বা, সত্যি কথাই বলব।' শাড়ির স্খলিত আঁচলে ঝলমল করে উঠল শুক্তি: 'বলব গানের ইস্কুলে আমাদের আলাপ। ও ছিল ভোক্যালে আর আমি ইনস্ট্রুমেন্টে, গীটারে। তা এক ইস্কুলে আলাপ হতে বাধা কোথায়? তোমার দাদাও নিশ্চয়ই গান জানেন।'

'আর তোমার দিদি?'

'ক্লাসিক্যাল-এ গোল্ড মেডালিস্ট।' সেই মেডেলটা যেন তারই বুকে ঝুলছে অলক্ষ্যে এমনি ভঙ্গি করল শুক্তি।

'সব ভালোবাসার জন্মই বুঝি এই গানের ইস্কুলে।' অনীক দার্শনিকের ভাব করল: 'সে গান কখনো শ্রুত কখনো অশ্রুত কখনো তা শব্দে কখনো বা স্তব্ধে। আর সে সুরের স্বরলিপি সব সময়েই এখানে নয়, কখনো-কখনো বা সুরলোকে।'

'তবে এবার উঠি।' ত্বরায় তড়িৎলেখার মত উঠে পড়ল শুক্তি। আর দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলে সরাসরি বললে, 'কবে যাচ্ছ আমাদের বাড়ি? এই আসছে রবিবার, পরশু? আর তার দুদিন পরেই আরেকটা ছুটি আছে—আমি সেদিন তোমাদের ওখানে? কী বলো?'

'তাই ভালো। শুভস্য শীঘ্রং, আর—'

অনীকের কথাটা মুখ থেকে কেড়ে নিল শুক্তি: 'না, না, কালহরণের প্রয়োজন নেই। অশুভের স্পর্শ নেই কোথাও।' আগাগোড়া অনেস্ট, স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড। নইলে রেজেস্ট্রি অফিস থেকে বিয়ে করে বাড়িতে এসে সবাইকে চমকে দেয়া, আমরা বিয়ে করে এলাম—এটার মধ্যে কেমন একটা চোর-চোর ভাব আছে। আমাদের মধ্যে কোনো অসরল নেই।' সবাইকে বলে-কয়ে জানিয়ে-শুনিয়ে বিয়ে করছি। যদি ভালোই বাসলাম তবে আবার ভয় কী, ছলনা-চাতুরী কী!'

'একটা কিন্তু ভয় আছে!' অনীক ট্যাক্সির জন্যে ব্যাকুল চোখে তাকাতে তাকাতে বললে অন্যমনস্কের মত।

'কী ভয়?'

'এতদিন তোমাকে শুক্তি বলে ডাকতাম, এখন, মানে, পরে, তোমাকে না শুক্তো বলে ডেকে ফেলি। যে ঝিনুক মুক্তো ফলায় সে শেষে ডুমুর কাঁচ কলার ঝোল হবে এটা খুব সুস্বাদু নয়।'

'কিন্তু স্বাস্থ্যকর।' একটুকু গায়ে নিল না শুক্তি, বললে, 'তবে যদি চাও, লঙ্কাপেঁয়াজ গরমমশলার রগরগে ঝোলও হতে পারি। ঐ একটা ট্যাক্সি যাচ্ছে, ডাকো।'

হাত তুলে দীর্ঘস্বরে ডাকল অনীক।

এর পরে একটা ট্যাক্সি না নিলে হয় না। দ্রুত যান, দীর্ঘ পথ আর তীক্ষ্ন স্নায়ু এ তিনের এখন সমস্বর ঝঙ্কার। সময়ের ঝুঁটিকে ধরতে হবে মুঠো চেপে পায়ের নিচে আর ঘাস গজাতে দেওয়া হবে না। যে দেয় সে আন্তরিক নয়, সে ভালোবাসেনি ঠিক-ঠিক। তার বাক্য মিথ্যে, ব্যবহার মিথ্যে।

ট্যাক্সিতে আজ তারা নিশ্চয়ই ঘনতর হয়ে বসবে। সে অপূর্ব ব্যবধানটি আর থাকবে না। শোনা যাবে না আর সেই আধো দ্বিধায় অস্ফুট গুঞ্জন। আকাঙ্ক্ষা না অনাকাঙ্ক্ষা—সেই ধূসর দেশে মুগ্ধের মত ঘুরে বেড়োনো শেষ হবে। মুহূর্তের ঠোঁটের থেকে খসে পড়া ছোট-ছোট খড়কুটোগুলো আর কাজে লাগবে না। রাখবেনা কুড়িয়ে।

একটা উত্তাল ঢেউ এসে সব খড়কুটো ঝিনুক-শামুক ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যখন ঢেউ আসেনি তখনকার সেই অপরূপ ছোট মাঠটির জন্যে আর মায়া করবে না।

আগের ট্যাক্সিটা ডাক গ্রাহ্য না করেই চলে গেছে।

'ঐ, ঐ আরেকটা ট্যাক্সি।' নিজেই ডাকল শুক্তি। অনীকের দিকে ফিরে তাকাল: 'বেশ খানিকক্ষণ ঘুরব কিন্তু।'

তা অনীক জানে। সায় দিল স্বচ্ছন্দে।

কোথা থেকে একটা লোক ছুটে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ট্যাক্সিটাকে।

'তুমি যেমন শেলো, আঠারো মাসে বছর হলেই খুশি হও।' বিরক্তি সত্ত্বেও শুক্তি হাসল।' হাঁটতে লাগল।

অনীক কোনো কথা বলল না।

ট্যাক্সি!

হঠাৎ পেয়ে গেল একটা। না, আর দেরি নয়।

রবিবার সকালের দিকেই এসেছে অনীক। বাড়িটা চিনে নিতে বিশেষ বেশ পেতে হয় নি। আর কোনোদিন আসেনি আগে। দূরে দূরে-থেকেছে। আজ অনেক সাহস অনেক ঔজ্জ্বল্য। নির্বোধে ঢুকল বাড়িতে।

'এসো।' হাসিমুখে সদরের সামনে এসে ডাকল শুক্তি।

নিচেই শুক্তির ঘর। সেখানে নিয়ে এল অনীককে। বললে, 'বসো।'

'পাশের ঘরে কী একটা তুমুল গোলমাল হচ্ছে। কী ব্যাপার? বসবার আগে একটু বুঝি দ্বিধা করল অনীক।

কণ্টে হাসল শুক্তি। বললে, 'ভয় নেই। আমাদের নিয়ে নয়।'

তবু যেন আশ্বস্ত হওয়া যায় না এমন প্রবল সে কোলাহল। ম্লান স্বরে অনীক জিজ্ঞেস করল, 'তবে, কী ব্যাপার?'

'জামাইবাবু এসেছে।' সংক্ষেপে সারতে চাইল শুক্তি।

তারই এই সংবর্ধনা! এই উদাত্ত মানপত্র! হতবুদ্ধির মত তাকাল অনীক।

'দিদিকে নিয়ে যেতে চাইছে। আর দিদি যাবে না কিছুতেই।' বলেই শুক্তি মুখের ক্লেশ হাসি দিয়ে মুছে দিতে চাইল। বললে, 'তুমি বোসো। যেও না কিন্তু। আমি চা নিয়ে আসছি।'

যাবার সময় পর্দাটা আপ্রান্ত টেনে দিয়ে গেল। কিন্তু এমন ঝগড়া, দরজা বন্ধ করে গেলেও কোনো সুরাহা হবার নয়।

কিছু নিবারণ করতে পারে কি না, কিছু উপশম আনতে—সন্দেহ কি, তারই জন্যে শুক্তি গিয়েছে পাশের ঘরে। যদি অন্তত এ সময়টায় যখন নতুন এসেছে অভ্যাগত, তখন যদি কোলাহলটা একটু স্থগিত থাকে। অন্তত একটু খাটো হয়, খাদে নামে। তারপর না হয় কাক-চিল তাড়িও, এখন যদি একটু দম নাও।

ভিতরে ঢুকতে পায়নি শুক্তি, জিনিস ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে।

মুক্তি বলছে, 'যাব না, কিছুতেই যাব না। আগে তাড়াও ঐ ভদ্রমহিলাকে। অন্তঃপুরের গভীরে কোথাও পালিয়েছে হয়তো। বসে থাকতে বলেছে বসে থাকি। দেখি। শুনি।

মুক্তি বলছে, যাব না, কিছুতেই যাব না। আগে তাড়াও ঐ ভদ্রমহিলাকে।

'কে, কে ভদ্রমহিলা?' সর্বাঙ্গে জ্বলছে নবেন্দু।

'মা কথাটা মুখে আনতেও গলায় আটকে যাচ্ছে।' দেয়ালে বুঝি মাথা কুটছে : 'বলে কিনা, শাশুড়ি। শ্বাস উড়ে যায় চেহারা দেখলে। তারপর এক ননদ এসে জুটেছে। এক রামে রক্ষে নেই তায় আবার কাঠবিড়েলি।' কাঠবিড়েলি তো নয়,—বিচ্ছু। ইচ্ছে করে এক চড়ে উড়িয়ে দিই মুণ্ডুটা। আর চড়াতে শুরু করলে শুধু ঐ একচিলতে মেয়েটাকে নয়, সমস্ত গুষ্টিবর্গকে।

'গুষ্টিবর্গ!' আস্তিন গুটোলো নবেন্দু : 'একবার চেষ্টা করে দেখ না। আমিও দেখি না কার ঘাড়ে কটা মাথা! কোন পাটিতে কটা দাঁত।'

'শোনো। সাফ কথা বলি তোমাকে।' মুক্তি ঘুরে দাঁড়াল : 'যদি তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সীকে তাড়াতে না পারো আমাকে নিয়ে আলাদা বাসা করতে হবে। আমি এজমালি নরককুণ্ডে থাকতে পারবনা।'

'তোমার জন্যে আমি মা-বোন বাড়িঘর ছাড়ব এ অসম্ভব।' নবেন্দু বললে।

'আমার জন্যে ছাড়বে কেন? শান্তির জন্যে ছাড়বে। আমি যাতে পাগল না হই, গলায় দড়ি না দিই তার জন্যে ছাড়বে।'

'যত অশান্তির মূল তো তুমি, তোমাব স্বার্থ, তোমার ক্ষুদ্রতা। শুধু তোমার টাকা, টাকার দিকে লক্ষ্য, টাকার উপর লালসা। টাকার জন্যেই তোমার নোলা সকসক করছে সব সময়।'

'নইলে আর কিসের জন্যে করবে?' দিব্যি বললে মুক্তি।

'কিন্তু জেনে রাখো টাকা আমার। আমিই ও টাকা রোজগার করি।'

'তাই তো করবে। তুমিই তো আমার টাকা রোজগারের যন্ত্র। বিশ্ববিধানে এটাই ব্যবস্থা। সুতরাং ঐ টাকায় আমার আধিপত্য, অন্তত তোমার সংসারের ঐ ভদ্রমহিলার নয়।' দাউ-দাউ করে উঠল মুক্তি।

'আমার অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এস স্ট্যাম্পে সই করে এ টাকাটা মাস-মাস কে আনে, কাকে দেয়।' নবেন্দুও কম যায়না : 'সুতরাং সে টাকা যদি পকেটকাটা যায় আমারই যাবে। তেমনি সে টাকা যদি আমি উড়িয়ে-পুড়িয়ে নর্দমায় ঢেলে দিয়েও আসি তুমি কিছু করতে পারো না। তুমি যা দাসীবৃত্তি করো তার মাস-মাইনে বা খোরপোষ তোমার পেলেই হল!'

তারপরেই গালাগালি।' জিনিস ভাঙাভাঙি।

জমে থামের মত বসে রইল অনীক।

এরই মধ্যে চা করে খাবারে প্লেট সাজিয়ে এনেছে শুক্তি। অনীক সব শুনেছে, বুঝতে পেরেছে, তাই আর গৌরচন্দ্রিকা না ভেঁজে সটান বললে, 'নবেন্দুবাবু সত্যি কী আনরিজনেবল দেখ! শাশুড়ির সঙ্গে দিদির বনছেনা তবুও দিদিকে নিয়ে আলাদা হবে না। কলকাতা থেকে বদলি হয়ে গেলে তখন কী হত! তারপর জটিলার সঙ্গে কুটিলা যা একটি জুটেছে, দিদির প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

বলতে-বলতে শুক্তির চোয়ালটা কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনীক।

'তারপর সব টাকাই যদি মায়ের কাছে এনে দেয়, যদি স্ত্রীর কোনো কর্তৃত্ব না থাকে, স্বাধীনতা না থাকে, তা হলে, যাই বলো, জীবন দুর্বিষহ।' নিজেও পেয়ালা নিয়ে বসেছে, তাতে নিঃশব্দে চুমুক দিল শুক্তি।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে বর্ষীয়সী এক স্ত্রীলোক ঢুকে পড়ল ঝড়ের মত। শুক্তিকে উদ্দেশ করে বললে, 'দেখলে, দেখলে তো প্রেমের বিয়ে! দেখলে তো পরিণাম!

আর প্রেম-ট্রেম নয়, যাকে বেছে এনে দেব তারই সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে। আর ট্যাঁ-ফোঁ চলবে না বলে দিলাম—'

উত্তেজনায় ঢুকেছিল উত্তেজনায়ই বেরিয়ে গেল।' যথার্থ প্রেক্ষিতে বুঝতে পারে নি অনীককে।

চাপা গলায় শুক্তি বললে, 'মা।'

অনীক মনে মনে বললে, ভবিষ্যৎ ভদ্রমহিলা।

পাশের ঘরে গিয়ে মেয়ের স্বপক্ষে ভদ্রমহিলা সওয়াল করে উঠল : 'কী অমন অসভ্যের মতন চেঁচামেচি করছ? যা করতে হয় বাইরে গিয়ে করো গে—'

মায়ের প্রশ্রয়ে মুক্তিও উন্মুক্ত হল : 'যাও, বেরিয়ে যাও।'

'আচ্ছা, দেখে নেব।' মাথার চুলটা হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বেরিয়ে গেল নবেন্দু।

'কী দেখবে! কচু দেখবে।' নিজের মনেই বিজয়িনীর মত হেসে উঠল মুক্তি। মাকে লক্ষ্য করে বললে, 'জানোনা বুঝি উপর থেকে সার্কুলার এসেছে যে-অফিসার তার স্ত্রীকে অবহেলা করবে, অনাদর করবে, তার বিরুদ্ধে প্রসিডিং হবে, তার চাকরি যাবে। তাই যাবে কোথায় বাছাধন? আমার খাতিরে না হোক, চাকরির খাতিরেই তাকে আসতে হবে সুড়সুড় করে। স্তবের ভঙ্গিতে বসতে হবে হাঁটু গেড়ে। যাবে কাথায়? নইলে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে গিয়ে নালিশ করব না? বউয়ের চেয়ে চাকরি বড়, তখন চাকরি নিয়ে টানাটানি।'

মেয়ের আনন্দে মাও হাসল।

আর তার প্রতিচ্ছায়া শুক্তিও ফোটাল তার চোখেমুখে।

'আজ উঠি। পালাই।' হাত মুছে উঠে পড়ল অনীক।

সহানুভূতিতে তাকাল শুক্তি। বললে, 'হ্যাঁ, স্থগিত রাখাটাই সমীচীন।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল অনীক।

কিন্তু মঙ্গলবারেই শুক্তি নির্ভুল চলে আসবে এ অনীক কল্পনাও করে নি। কেননা সকাল থেকেই প্রাণকুমারে আর তনিমায় প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু হয়েছে।

শুক্তিকে অনীক নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

মৃদুস্বরে শুক্তি জিজ্ঞেস করল : 'কী নিয়ে ঝগড়া?'

'আর বোলো না। একেই তো মেয়েরা যুক্তি-টুক্তির ধার খুব কম ধারে, তবু বৌদি যেন বেশি ইররাশন্যাল।' অনীক দেয়ালের দিকে তাকাল : 'দাদা ভুল করে বৌদির একটা খামের চিঠি খুলে ফেলেছে, স্বীকার করছে ভুল, তবুও ছিন্নমস্তা শান্ত হচ্ছে না।'

'শুধু খুলেছে না পড়েছেও চিঠিটা?' কুটিল চোখে তাকাল শুক্তি। উথলে উঠলো : 'ঐ শোনো।'

পাশের ঘর থেকে প্রাণকুমার চেঁচিয়ে উঠেছে : 'একশোবার পড়ব। বিয়ের পরেও কতজনের সঙ্গে পীরিত চালিয়ে যাচ্ছে, তা আমাকে দেখতে হবে না? চোখ বুজে থাকব?'

আতঙ্কে মুখ কালো হয়ে উঠল শুক্তির। অস্ফুটে বললে, 'তোমাদের বাড়িতে মেয়েদের চিঠি খুলে পড়া হয় নাকি?'

'কিন্তু ঐ আবার শোনো।' এবার অনীক উথলে উঠল।

'চালাব না? একশোবার চালাব।' তনিমাও পালটা ঝঙ্কার দিয়েছে: 'যে একবার প্রেম করে সে বারেবারে প্রেম করে। নইলে তোমার মত একটা কৃকলাশেই সারা জীবন আকৃষ্ট হয়ে থাকব নাকি?'

'তা হলে আর গৃহস্থ বাড়িতে আছ কেন? নিজের পল্লীতেই থাকো না ঘর বেঁধে।'

'তোমাকে আগে তো শ্রীঘরে পাঠাই, তারপর দেখা যাবে।' নিজেই ব্যাখ্যা জুড়ল তনিমা: 'শুধু তো আমার টাকা আর গয়নাগাটিই চুরি করনি, ইদানিং আবার চিঠিপত্র চুরি করছ। আমার অনুমতি ছাড়া আমার চিঠি খোলাটাও চুরি।'

'মূর্খ আর কাকে বলে!'

'আর চিঠির ইতিতে সামান্য একটা পুরুষের নাম দেখলেই সন্দেহে যে দগ্ধ হয়, আত্মীয়-অনাত্মীয় বিশ্বাস করতে চায় না, তাকে শুধু মূর্খ নয় বলে গণ্ডমূর্খ। কৃকলাশ না হলে বলতাম হস্তিমূর্খ।'

তারপরেই আর রূপকের মাধ্যমে নয়, সোজা গালাগালি। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি।

'কী রকম স্বীকার করল শুনেছ?' অনীক মর্মাহত হবার মত মুখ করল: 'যে একবার প্রেম করে সে বারে বারেই করে!'

'বা, সেটা তো তোমার দাদার ঐ অন্যায় কথাটার উত্তরে?' ক্লিষ্টস্বরে বললে শুক্তি।

'জানো বৌদির মা পাগল ছিল। ওর রক্তে আছে ঐ ইনস্যানিটির ছোঁয়া।'

'তেমনি আবার সন্দেহ করা রোগটাও শুনেছি বংশানুক্রমিক।'

'কী, আর ভালোবাসার কথা বলবি?' প্রায় ঝাঁটা হাতে ঘরে ঢুকলেন এক মহিলা। অনীককে লক্ষ্য করলেন: 'জাত গণ্ডি ছেড়ে যাবি আর বাইরে? বলে স্ত্রীরত্নং যে কোনো কুলাদপি। আহা, এই তো স্ত্রীরত্নের চেহারা! স্বামীকে বলে চোর, বলে জেলে পাঠাব! বলে কাঁকলাশ!'

আর, বুঝতে পাচ্ছি তুমি কে, কিন্তু তোমার পুত্ররত্ন কী বলেছে সেটা দেখছো না? ভদ্রমহিলার দিকে ধারালো চোখে তাকাল শুক্তি।

'এই মেয়েটা কে রে?' ভদ্রমহিলা সন্দেহকুটিল দৃষ্টি ফেললেন।

শুক্তি কিলবিল করে উঠল।

অনীক সহজস্বরে বললে, 'কেউ নয়, আমাদের অফিসের এক চাকরির উমেদার।'

'মেয়েদের আবার চাকরি বাকরি কী। ঐ তো আমার বড়বৌ চাকরি করে! অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কত যে দাদা কত যে বন্ধু—'

'এবার উঠি।' পায়ে বুঝি ঝিঁঝি ধরেছে, দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল শুক্তি।

'হ্যাঁ, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাও।' বললে অনীকের মা, 'বয়স তো কমখানি

হয়নি। বাবা মা যাকে বাছাই করে আনে বাধ্য হয়ে শান্ত হয়ে তাকে বিয়ে করো। অফিসে বস এর পিছু-পিছু ছুটোছুটি কোরো না।'

দু পা এগিয়ে দিল অনীক। বললে, 'পরিস্থিতিটা শোচনীয়। আজকে আর কিছু বলাকওয়া চলে না।'

'তুমি যা বলেছিলে, স্থগিত রাখাই সমীচীন।'

আবার কবে দেখা হবে কিছুই ঠিক করা হয়নি। গানের ইস্কুল তো কবেই বন্ধ। চিঠি লেখার কথা ভাবতেও পারে না কেউ, যেহেতু কে আগে লেখে! এমনিতে কই আর পথে ঘাটে চোখে পড়ে। একটা দুর্ঘটনাও ঘটে না।

দেখা হয়ে আর কাজ নেই।

শুক্তির দিদিটা কী দুর্ধর্ষ রাগী! এই রাগ শুক্তিতে কোন না প্রচ্ছন্ন আছে! টাকার প্রতি কী কদর্য লালসা! শাশুড়ি ননদের সঙ্গে থাকবে না একত্র। যেহেতু তাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে তাকে করতে হবে ফিন্যান্স সেক্রেটারি। কাকে দেবে বা থোবে আর কত ঝোল বা নিজের দিকে মানে বাপের বাড়ির দিকে টানবে সেই ঠিক করবে। তুমি শুধু একটা টাকা রোজগারের যন্ত্র। ভাবছে আর শিউরে উঠছে অনীক।

অনীকের দাদাটার কী দারুণ সন্দেহ-বাতিক। যেহেতু তুমি প্রেমকরা বউ সেহেতু প্রেমের প্রকোপ থেকে তোমার নিস্তার নেই, কী সংকীর্ণ মনোভাব। এই সন্দেহ আর সংকীর্ণতা অনীকের মধ্যেও নেই তা কে বলবে!

আর কী একখানা শাশুড়ি! অনীকের বুক দুরদুর করে উঠল। মেয়ে জামাইয়ের বিরুদ্ধে সার্কুলার দেখাচ্ছে, তাতেই তার আনন্দলহর।

আর ঐ হবে শাশুড়ি? শুক্তির বুক হিম হয়ে গেল। বলে কিনা বস্-এর পিছু ছুটোছুটি কোরো না।

কী গালাগালিই দিল মুক্তি! শুক্তি তার বোন, সেও বা কী কম যাবে!

আর যে মেয়েকে কিনা ভালোবেসে বিয়ে করেছে তাকে প্রাণকুমার দিব্যি কিনা ঘর নিতে বললে। অনীক, তার ভাই, তারও তো ঐ ইস্কুলেই পাঠ নেওয়া।

দুর্যোগ, চারদিকে দুর্যোগ। ঝড় বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ উত্তাল সমুদ্র। ধার-পার দেখা যায় না।

হ্যাঁ, স্থগিত থাক। দুর্যোগটা কাটুক।

সেদিন কী মনে করে হঠাৎ দুপুরবেলা অনীক আইসক্রিমের রেস্তরাঁর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল একটা ছোট টেবিলে শুক্তি একলা বসে।

'আরে তুমি!' শুক্তি উথলে উঠল।

মুখোমুখি চেয়ারটা টেনেও অনীক বসল না। বললে, 'আজকে আইসক্রিম নয়, আজ চলো, কিছু তপ্ততর উত্তেজনা।'

'তার মানে?' সন্দিগ্ধস্বরে বললে বটে শুক্তি কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শুধোল, 'কী আজ?'

'আজ একেবারে সটান ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। ওটা আগে সেরে এসেই বাড়িতে ডিক্লেয়ার করব।'

'ওমা, এ কখন ঠিক করলে?'

'এই মুহূর্তে। পলকে, তোমাকে দেখামাত্র। কি, রাজি?'

'। এই মুহূর্তে রাজি।' হাসতে-হাসতে অনীকের পিছে-পিছে বেরিয়ে এল শুক্তি। বললে, 'চারদিকে কী দুর্যোগ, তার চেহারাটা দেখেছ?'

'দেখেছি। এই দুর্যোগের মধ্যেই স্নান করে নিতে হবে।' বললে অনীক, 'দুর্যোগ থামবে না কোনো দিন কিন্তু স্নান স্থগিত রাখা যাবে না।'

'আমিও তাই বলি।' দুজনে রাস্তায় নামলে শুক্তি বললে, 'সংসারে যন্ত্রণাই ধ্রুব। এই যন্ত্রণাকেই ধ্রুব জেনে ডুব দিতে হবে।'

'হোক সাময়িক, হোক ক্ষণস্থায়ী!' আনন্দদীপ্ত মুখে অনীক বললে, 'এই সময়টুকুই এই ক্ষণটুকুই বা কম কিসে। এই বা আমাদের কে দেয়!'

বিহ্বল চোখে তাকাল শুক্তি। তন্ময়ের মত বললে, 'আর বলতে গেলে এ জীবনটাও তো শুধু একটাই মাত্র মুহূর্ত।'

'একটা আশ্চর্য বিন্দু।' শুক্তির হাত ধরল অনীক।

২৯। সাক্ষী

'কী বলতে হবে ঠাকুর? বলো দিকি বুঝিয়ে, ভাল করে' ঝালিয়ে নি।' ট্রেনে ওঠবার আগে দুর্লভ আরেকবার ভটচাযকে জিগ্গেস করলে।

ভটচায ভারি বিরক্ত হ'ল। আজ প্রায় সাত-আট দিন তাকে সে সমানে বোঝাচ্ছে, কিন্তু এখনো কথাটা তার মাথায় ঢুকল না। কিন্তু বিরক্তির ভাব সম্পূর্ণ গোপন রেখে বললে, 'বলবি, একালি জমি, আজ বিশ-তিরিশ বছর ধরে দেখে আসছি ষষ্ঠী ভটচায বর্গায় দখল করছে।'

'চাষ করে কে জিগ্গেস করলে কী বলবো?'

কোনো দিকে না তাকিয়ে ভটচায বললে, 'সোনাউল্লো।'

'এই কথা? এ আমার খুব মনে থাকবে।' দুর্লভ নির্ভাবনায় ঘাড় হেলালো। বললে, 'দু-পয়সার পান কিনে দাও, ঠাকুর।'

ভটচায পান কিনে দিল। এক মুখ পান চিবোতে-চিবোতে দুর্লভ ট্রেনে উঠলো, এমন নির্লিপ্ত, যেন কত সে ট্রেনে উঠেছে।

রাত্রের ট্রেন, ব্রাঞ্চ-লাইন। সকালের দিকে এ-অঞ্চলে আগে একটা ট্রেন ছিল। বছর তিনেক উঠে গেছে। তাই আদালতের প্যাসেঞ্জার এ-ট্রেনেই শহরে যায়, কেউ হোটেলে, কেউ বাজারে, কেউ বা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাত্রিযাপন করে পরদিন সাড়ে-দশটায় গিয়ে হাজিরা ফাইল করে।

বেজায় ভিড় থাকে ট্রেনে, আজকের শেষ ও কালকের প্রথম ট্রেন। কথায় বলে, কোর্টের ট্রেন।

গাড়িতে উঠেই দুর্লভ বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'এ কী একটা জঘন্য গাড়িতে নিয়ে এলে, ঠাকুর? গদি নেই যে।'

ভটচায বললে, 'দাঁড়া, আমার কম্বলটা ভাঁজ করে পেতে দিচ্ছি।'

'তা তো দেবে, কিন্তু জায়গা কোথায়?'

'এই, তুই ওঠ তো পবন।' ভটচায একজনের কাঁধে একটা টোকা মারলে : 'আর, এই নটবর, ওরে সখীচরণ, ওগো বেয়াই মশাই, তোমরা একটু সরে বসো, দুর্লভকে বসতে দাও।'

পবন উঠে দাঁড়াতেই দুর্লভের কম্বলাস্তৃত জায়গা হ'ল।

কিন্তু তবু তার অস্বস্তি ঘুচল না। বললে, 'নাঃ, এ ভাবে বসলে জামাটা একেবারে দলামোচা হ'য়ে যাবে। দাও, ধোঁয়া বার করো, ঠাকুর।'

ভটচায পকেট থেকে সাদা সুতোর বিড়ি বা'র করলে।

'কী গুচ্ছের বিড়ি বা'র করছ? সাক্ষী দিতে যাচ্ছি, সিগারেট খাওয়াও।'

ভটচায অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। বললে, 'এখন একটা বিড়িই ধরা, নাগরদ ইস্টিশানে সিগারেট কিনে দেব।'

দুর্লভ মুখ ভার করে' বললে, 'দখলের বয়েস তবে তোমার তিন-চার বছর নেমে যাবে, ঠাকুর, বিশ-তিরিশ আমি বলতে পারব না। একটা সিগারেট খাওয়াতে পার না, বর্গা লাগিয়ে দখল কর না-বলে নিজেই হাল চালাও বল না কেন?'

'আছে নাকি হে সখীচরণ?' ভটচায ভিক্ষুকের চোখে তাকাল।

'আছে।' নটবর বললে। নটবর যদিও মাসতুত শালা এবং যদিও বয়স্ক ভগ্নীপতির সামনে ধূমপান তার নিষিদ্ধ, তবু এ-যাত্রায় চক্ষুলজ্জা করলে চলে না। কেননা, দুর্লভই একমাত্র অনাত্মীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাক্ষী, তাকে চটানো মানেই মামলাটি চটিয়ে দেয়া। আর সব সাক্ষীকে এতটুকু খোঁচা দিলেই রক্ত না হোক রক্তের সম্পর্ক বেরিয়ে পড়বে।

'চৌহদ্দিটা শিখিয়ে দিলে হ'ত না?' পবন প্রস্তাব করলে।

'পুবে ভেকটমারির খাল, পশ্চিমে মাদার মন্ডল, উত্তরে বিষ্টু গোলদার আর দক্ষিণে ছাবেদ আলি—' দলের মধ্যে থেকে বুড়ো পতিপ্রসন্ন, মানে গাঁ-সম্পর্কে ভটচাযের বেয়াই, বিড়বিড় করে' আউড়ে দিলে। এর দাদার নাম ছিল সতীপ্রসন্ন, মিলিয়ে নাম রাখতে গিয়ে এ হয়েছে পতিপ্রসন্ন।

'ভেটকিমারি না বোয়ালমারি ও-সব আমি বলতে পারব না, ভটচায।' দুর্লভ সিগারেটে লম্বা টান দিলে। বললে, 'পাশের জমি ঠাকুরদার দখল ছিল বলে দলিলে লেখা আছে বলছ, সেই জোরে সাক্ষী দিতে যাচ্ছি। নইলে কাৎলামারি কি চিংড়িমারি—ও-সবের আমি ধার ধারি না।'

'দরকার নেই।' ভটচায সায় দিলেন, 'একালি জমি, তাই বললেই যথেষ্ট।

আর বিশ-তিরিশ বছর ধরে ষষ্ঠী ভটচায দখল করছে বর্গায়। বর্গাদার কে মনে আছে তো?'

'সে যেই হোক, শহরে গিয়ে টাঁক দেখাতে হবে, ভটচায।' দুর্লভ চোখ বড় করে বললে।

'কিন্তু বল্‌ আগে, বর্গা করত কে?'

'দাঁড়াও, ভেবে নি।' সিগারেটে জ্বলন্ত টান দিয়ে দুর্লভ চোখ বুজলো।

'কি রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?' ভটচায তার হাঁটুতে ঠেলা দিলে।

'ও, হ্যাঁ—' দুর্লভ উঠলো হকচকিয়ে : 'ছোট একটা টেপা-বাতি চাই। জামার পকেটে যাতে লুকিয়ে নেওয়া চলে। হঠাৎ আলো ফেলে মুখ-চোখ তার ঝলসে দেব না?'

ভটচায তিরিক্ষি হ'য়ে উঠলো : 'দুত্তোর তোর টেপা-বাতি। বর্গাদারের নাম কী?'

'বেফাঁস নাম বলার চেয়ে স্রেফ বলে দেব স্মরণ নেই। তাই না পতি-ঠাকুর?' দুর্লভ পতিপ্রসন্নের দিকে ঝুঁকে এল : 'তুমি বলো নি জেরায় ঠেকে গেলেই বলতে হবে স্মরণ নেই? তবে আর ভাবনা কিসের! বর্গাদার কে মনে না থাকে স্পষ্ট বলে দেব, স্মরণ নেই, ধর্মাবতার। হাঁ-ও নয় না-ও নয়, মারে কে শুনি?'

'না।' ভটচায ধমকে উঠলো : 'শুনে রাখ্‌। সোনাউল্লো। সোনাউল্লো বর্গা করে।'

'সোনাউল্লোও যা, রুপাউল্লোও তাই। আসে নি তো কেউ।'

'সে জন্যে তোর ভাবতে হবে না। মুহুরিবাবু তাকে ধরে নিয়ে আসবে বলেছে। আসুক আর না-আসুক নামটা তুই তার ভুলিস নে।'

'আমি কি তেমনি ছেলে? কিন্তু, যাই বল, টেপা-বাতি চাই একটা। ঠিক গোল হ'য়ে আলো পড়বে। সমস্তখানা গোল মুখের উপর।'. সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দুর্লভ শিথিল গলায় বললে, 'একটু সরু হও পবনচন্দ্র, প্যা দুটো একটু টান করি।'

জায়গা ছেড়ে পবন উঠে দাঁড়ালো।

'পুঁটলিটা এগিয়ে নিয়ে আয়, নটবর, আমার মাথার নিচে শান্তিতে থাকবে।'

ভটচাযের ইসারায় নটবরও উঠে দাঁড়ালো, এবং তার জায়গাটা অধিকার করলো তার পুঁটলিটা। দুর্লভ স্বচ্ছন্দে তাকে শিরোধার্য করলে।

বাঘ তাড়াবার জন্যে লাইন পেতেছিলো বলে নিদারুণ শব্দ হয় এখান-কার ট্রেনের চাকায়। কিন্তু দেখা গেল বনের বাঘ তাড়া পেয়ে বাসা নিয়েছে এসে দুর্লভের স্ফারিত ও রোমশ নাসারন্ধ্রে।

দু-বেঞ্চির ফাঁকে মেঝের উপর হাঁটু গুটিয়ে নটবর আর পবন বসে,' আর দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভটচায।

হোটেল বেজায় ভিড়, খাওয়া যদি বা মেলে শোয়াই দুষ্কর।

ভটচায নটবরকে বললে, 'খেয়ে-দেয়ে তোরা ইস্টিশানে চলে যা ঘুমুতে দুর্লভকে নিয়ে আমি এখানে থাকবো।'

'জায়গা কোথায় এখানে?' নটবর আপত্তি করলে।

'হোটেলওয়ালা একখানা বেঞ্চি দেবে বলেছে—ছ-পয়সা ভাড়া। ভাবছি দুর্লভকে ওটাতে শুতে দিয়ে আমি নিচে মাটিতে শুয়ে থাকবো। গ্রীষ্মকাল, কষ্ট হবে না।'

পবন গরম হ'য়ে উঠলো, বললে, 'দুর্লভ তো নাপিত, ও শোবে বেঞ্চিতে, আর তুমি বামুন হ'য়ে শোবে মাটিতে? এ কি অনাচারের কথা!'

ভটচায চোখ টিপে বললে, 'যা আর বকাসনে। দুর্লভই আমাদের ভরসা। ওকে ঠান্ডা রাখতে হবে। এক রাতের তো মামলা—তাতে কি যায় আসে! মোকদ্দমা তো আগে পাই!'

ভিড়টা বেশির ভাগই দেওয়ানিঃ বোঁচকাতে নথি, কাছায় টাকা আর ললাটে দুর্ভাগ্য। আর কতকগুলি ফড়ে আর দালাল, এর থেকে ওকে কাড়ে, ওকে ভাগিয়ে একে বাগায়।

'যা যা, সেদিনের ছোকরা নবকেষ্ট, আইনের ও জানে কি!'

'আর যত জানে তোমার ঐ বুড়ো-হাবড়া বিপিন হালদার! দু-কথা ইংরিজি বলতে গিয়ে যে ইয়ে-ইয়ে করে কেঁদে ফেলে!'

'আরে দাদা, উকিল-ফুকিলে কিছুই নেই!' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে' উঠলোঃ 'সব এই অদেষ্ট। তুমি বললে এ, সে বললে ও, আর তার বাবা বললে, কিছু না।'

'কিছু না।' আরেকজন সায় দিলেঃ 'শুধু বাজি খেলা। যেমন আতসবাজি, তেমনি মামলাবাজি। উকিল-হাকিমে করবে কি?'

দুর্লভ এরি মধ্যে চেনা-অচেনা অনেকের সঙ্গেই জমিয়ে নিয়েছে।

'কত দিয়ে কিনলে এই চাদরখানা?'

'হ্যাঁ, সাক্ষী দিতে এসেছি, তার গাঁটের পয়সা খরচ করে চাদর কিনব!'

'তবে দিলে কে?' দুর্লভ হাতে করে জমিটা পরখ করতে লাগলো।

'পার্টি কিনে দিয়েছে।'

'সে আবার কে?'

'যার মামলা, সে। শহরে এসে ভদ্দর-সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেব, কাঁধে একখানা গামছা ফেলে তো আর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। তাই নায়েবমশাইকে বললাম, গায়ের একখানা কাপড় চাই, বহু মারামারি করে তের আনা দিয়ে এখানা উদ্ধার করেছি।'

দুর্লভ সটান ভটচাযের সামনে এসে হাত পাতলে।

'না, ছাড়াছাড়ি নেই, গায়ের চাদর দিতে হবে, ঠাকুর।'

'মামলাটা আগে জিতি, চাদর কেন, তোকে শালদোরোখা দেব দেখিস।'

'কাজ হাসিল করবার আগে সব শালাই তা বলে থাকে। কাজের পর

তখন অষ্টরম্ভা। চাদর না দাও, ছিটের অন্তত একটা হাফ-সার্ট দিতে হবে।'

'তার চেয়ে চুল ছাঁটবার জন্যে একখানা কাঁচি চেয়ে নে না।' পতিপ্রসন্নর সহ্য হ'ল না, মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'সাক্ষী দিতে হবে বলে শালা একেবারে ঘাড়ে চেপে বসেছে।'

'নাপিত বলে হেনস্তা কোরো না, পতিঠাকুর', দুর্লভ চোখ পাকালো: 'খুরে শান দিয়ে রাখব বলে রাখছি। কই, নিজেদের দিয়ে তো কুলোলো না, শেষকালে ডাক পড়লো সোনাউল্লো আর দুর্লভ প্রামাণিকের। এতই যখন হেনস্তা তখন পারবো না সাক্ষী দিতে।' দুর্লভ একটা ঘাই মারলো।

'কেন চটিস, দুর্লভ? আদালতে গিয়েই তোকে সার্ট কিনে দেব।' ভটচায তার পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত করলে। আর চোখ মটকে পতিপ্রসন্নকে বললে সরে' যেতে।

খেয়ে-দেয়ে সবাই শুয়েছে, দুর্লভ বেঞ্চির উপর আর ভটচায নিচে, মাটিতে মাদুর বিছিয়ে। গরম পড়েছে নিদারুণ, কিন্তু দলিল-পত্রের পুঁটলি নিয়ে বাইরে শুতে সাহস হয় না। মশারি নেই, তাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, কিন্তু রাত একটু ঘন হ'য়ে আসতেই দুর্লভের কাশি উঠেছে। খুকখুক থেকে খনখনে কাশি—মুখের আর পাতা পড়ে না। চোখের পাতা একত্র করে সাধ্যি কার!

হ্রস্ব অনুনাসিক শব্দে ভটচায কয়েকবার প্রতিবাদ করেছিলো, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। কাশি থামলেই সাক্ষী যায় চটে, আর সাক্ষী চটতেই কাশি আরো প্রবল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কতক্ষণ পরে দেখা গেল কাশি তরল হ'য়ে এসেছে, আর সেটা বেশ উত্তপ্ত তরলতা।

এতটা ভটচাযের সহ্য হ'ল না। ধড়মড়িয়ে সে উঠে বসলো, ধমকে উঠলো দিশেহারার মতো: 'তোর যে দেখছি বড্ড গরম কাশ, দুর্লভ।'

দুর্লভও উঠলো খাড়া হয়ে দু-হাতে পাঁজরা চেপে। গলায় সাঁই-সাঁই শব্দ করে' বললে, 'যার ঠান্ডা কাশ, তার কাছে যাও, আমি পারব না তোমার সাক্ষী দিতে। বলে, আমি মরছি হাঁপানিতে, আর উনি এখানে জমির চৌহদ্দি মেলাচ্ছেন!'

সকালবেলা দলবল নিয়ে ভটচায উকিলের বাড়ি এসে হাজির হ'ল। বোসেদের নতুন দালানে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে এসেছিলো, সেখান থেকে মুহুরি সোনাউল্লোকে ধরে এনেছে। বলে দিলে সবাইকে, 'চিনে রাখ, এই সোনাউল্লা।'

উকিল নরহরি বললে, 'বউনি করো। হাকিম বড় কড়া, ইংরিজিতে ছাড়া কথা বলে না, আট টাকার কমে পারব্যে না কাজ করতে।'

মুহুরি টিপ্পনি কাটলো: 'আর বিনা গাউনে যদি মামলা চালাতে চাও তবে কম দিলে চলে, কিন্তু জান না তো, গাউন পরে সওয়াল না করলে কোন হাকিমই আর চোখ তুলে চেয়ে দেখে না আজকাল।'

'না, না, গাউন পরে' বই কি।' ভটচায ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

'ফি তবে পুরো চাই।'

টেনে-বুনে দর-কষাকষি করে' চার টাকা বার আনায় রফা হ'ল—মায় মুহুরি আট আনা, আর সোনাউল্লোর দিনের মজুরি।

নরহরি মুহুরিকে বললে, 'হাজিরা লিখে ওদের সব টিপটাপ নিয়ে ঠিকমত ফাইল করে' দাও গে।' তারপর ভটচাযের দিকে তাকিয়ে: '-মামলায় তুমি নির্ঘাৎ ফল পাবে, পুরুতঠাকুর, হাইকোর্ট ছেড়ে প্রিভিকাউন্সিলও তোমার কিছু করতে পারবে না। খরচা-পত্র করে এত গুচ্ছের সাক্ষী এনেছ কেন? দুর্লভ পরামাণিক আর সোনাউল্লো সেখ—ব্যস্, কেল্লা ফতে! লাগোয়া জমি, বিশ-কুড়ি বছর দখল, চাষ আর রোয়া, মাড়াই আর কাটা, আর তোমাকে পায় কে! তার পরে যা করবার করবে আমার এই মুখ! ওদেরকে শুধু চৌহদ্দিটা বার কতক ঝালিয়ে নিতে বলো।'

ট্যাঁকে টাকা গুঁজে নরহরি বাড়ির ভিতরে উঠে যাচ্ছিলো, ভটচায শশব্যস্তে বলে উঠলো, 'মামলাটা আর একবার যদি বুঝে নেন—'

নরহরি বাধা দিয়ে বললে, 'বোঝবার কিছুই নেই এতে। বোঝাবো কাকে যে নিজে বুঝবো? হাকিমরা কি বোঝে মাথামুণ্ডু? সব লবডঙ্কা। কিছু ভেবো না তুমি ভটচায, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। চান করে কালীবাড়িতে দুটো টিপ করে হোটেল থেকে খেয়ে-দেয়ে কাছারিতে চলে যাও, এক ডাকে যেন হাজির পায় তোমাদের।'

এগারোটা বাজতেই ঘণ্টা পড়লো কোর্টে। খেয়ে উঠে আঁচাচ্ছিলো, ঘণ্টা শুনতেই নরহরির সমস্ত শরীর একটা রেলগাড়ি হ'য়ে উঠলো। কাপড়ে তাড়াতাড়ি হাত মুছে মালকোঁচা মেরে তার উপর দিয়ে জিনের প্যাণ্ট দিল চালিয়ে, গলাবন্ধ কালো কোটটাতে কোনরকমে গলিয়ে নিল হাত দুটো, জুতোর ফিতে বাঁধবার সময় হ'ল না, গোটা-ছয়েক পান মুখে পুরে দিয়ে সবুজ গাউনের পুঁটলিটা বগলে করে' উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলে।

হাকিম এজলাসে, চাপরাশি গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, অপর পক্ষ প্রস্তুত, কিন্তু না আছে ভটচায, না আছে সাক্ষীরা। পেস্কার বললে, মুহুরি হাজিরা ফাইল করে তাদের খুঁজতে গেছে, তাও প্রায় দশ মিনিট হ'য়ে গেল।

নরহরি আদালতকে সম্বোধন করে' বললে, 'আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিন, হুজুর, আমি একবার নিজে খুঁজে দেখি। এখানে নিশ্চয়ই কোথাও আছে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাকিম বললে, 'পাঁচ মিনিট।'

নরহরি ছুটলো বার-লাইব্রেরির দিকে। বেশি যেতে হল না, ঐ ভটচাযদের ভিড়। রাস্তার পাশে একটা কাটা-কাপড়ের দোকানের পাশে জটলা করছে।

'কী করছ তোমরা?' নরহরি ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'ওদিকে মামলা যে গেল খারিজ হ'য়ে।'

বিরক্ত হ'য়ে ভটচায বললে, কী করি, দুর্লভের জামা আর কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না।

'কী করে হবে? গায়ে আঁট হলেও নিতে হবে নাকি?' দুর্লভ ঘাড় মোটা করে' বললে, 'ছিটই পছন্দ হয় না, তায় সব ঝিনুকের বোতাম-ওলা। আমি চাই ডবল-ঘরের বুক। অনেক বেছে তবে এটা পাওয়া গেল।'

'নে, নে, চমৎকার হয়েছে। চলে আয় শিগ্‌গির।' নরহরি তাড়া দিলে।

'বা, সুতো-বাঁধা একগাছি হাড়ের বা কাচের বোতাম কিনে নিতে হবে না? হাঁ-করা জামা পরে আমি সাক্ষী দেব নাকি?' দুর্লভ ঘাড়টা আরও ছোট করে আনলে।

'আমার এখানে আছে।'

'আমার এখানে আছে।' পাশেই একটা মাটিতে বিছানো মনিহারি দোকান থেকে কে বলে উঠলো : 'এই যে এই জিনিস। নকল হীরের।'

'বাঃ', দুর্লভ লাফিয়ে উঠলো যখন দেখলো ওটা রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে : 'ঐটেই চাই। সুতো দিয়ে বেঁধে দাও লম্বা করে।'

'দাম কত?' ভটচায জিগ্‌গেস করলে।

'সাড়ে চার আনা।'

'দশ পয়সা পাবে, দিয়ে দাও।'

'নাও আর দরাদরি কোরো না।' পান-মুখে নরহরি একটা ঢোক গিললো : 'এদিকে দু' পয়সা বাঁচাতে গিয়ে ওদিকে তোমার ছ-শো টাকার মামলাটি কুপোকাৎ হয়ে যাক। এই না হলে কি পুরুতের বুদ্ধি, চুল কেটে টিকি রাখা!'

অগত্যা সাড়ে চার আনা পয়সাই ভটচায ফেলে দিল।

কিন্তু আরও বিপদ আছে। দু'পা এগোতেই আর এক জনের দোকানে দড়িতে টাঙানো রঙবেরঙের পাৎলা চাদর ঝুলছে—সব ইটালি থেকে আমদানি। সিল্ক-ফিনিস।

দুর্লভ বললে, 'আর এ একখানা। কথা রাখো, ঠাকুর।'

নরহরি চমকে উঠলো : 'এই গরমে তোর গায়ের কাপড় দিয়ে কী হবে রে হতভাগা?'

'এই গরমে তোমাদের গাউন হতে পারে আর আমাদের একখানা উড়ুনি হ'লেই চোখ টাটায়!' দুর্লভ ফোড়ন দিলে।

মুহুরি আদ্যনাথ ছুটতে-ছুটতে হাজির।

'বেটাদের আমি গরু-খোঁজা করছি। ওদিকে সাত মিনিট হ'য়ে গেছে, খারিজ করবার জন্যে হাকিম আছে কলম উঁচিয়ে বসে। নে, চলে এসো শিগ্‌গির।' বলে সে-দুর্লভের হাত ধরে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো।

'লণ্ঠন, টেপা-বাতি আর ছাতা—কিছুই হ'ল না।' দুর্লভ গাঁইগুঁই করতে লাগল।

'ওদিকে যে জরিমানা হয়ে যাবে, সে-খেয়াল আছে?' আদ্যনাথ গোঁফ

ফুলিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো : 'টিপ-সই করে হাজিরা দিয়েছিস, অথচ আদালতের ডাকে সাড়া দিচ্ছিস না। মারা যাবি, দুর্লভ।'

দুর্লভের চেতনা হ'ল। ভটচাযের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'চলো ঠাকুর, চলো—ও-সব পরে হবে খন। পুরুত মানুষ—তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। ভয় নেই, আমি কিছু ভুল করবো না—পুবে ভেকটমারির খাল, পশ্চিমে মাদার মণ্ডল, উত্তরে বিষ্টু গোলদার আর দক্ষিণে ছাবেদ আলি—কেমন, ঠিক ত?'

ভটচায আশাতিরিক্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলো : 'তুই সাক্ষীটা আগে দিয়ে আয়, মামলাটা আগে জিতি—সব দেব, যা তুই চাস, যা তোর দরকার।'

আবার সেই সুর করে ডাক উঠলো চাপরাশির : 'বাদী ষষ্ঠীচরণ ভটচায, বিবাদী উমেশ বালা।'

সাক্ষীসাবুদ নিয়ে নরহরি আদালতের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। 'হোটেল থেকে খেয়ে আসতেই ওদের দেরি হচ্ছিলো, ব্যাইকে করে মুহুরিকে পাঠিয়ে তবে ডেকে এনেছি।' এই কথাগুলি বলতে-বলতে নরহরি দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে গাউনটা আদালতের সমুখেই পরে নিলে। ছ-টা পানের ছ-আনি তখনও মুখের মধ্যে, তাড়াতাড়ি তার চর্বন-পর্বটা সমাধা করতে-করতে বললে, 'নাও, ওঠ, ওঠ ষষ্ঠী।'

হাকিম বললে, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, পানটা আগে খেয়ে নিন।'

নরহরি লজ্জিত হ'ল, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিতে তার যশ আছে। মুখের চর্বিতাবশেষটুকু জিভের এক ঠেলায় দক্ষিণ কোণের মাড়ির উপরে চালান দিয়ে ডান হাতের উলটো পিঠে বোজানো ঠোঁট দুটো বার-কতক রগড়ে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাব দেখিয়ে নরহরি ভটচাযকে কাঠগড়ায় তুলে দিল। বললে, 'নাম বলো।'

যথারীতি সুরু হ'য়ে গেল মামলা। অপর পক্ষে কৈলাসবাবু, সিনিয়র উকিল, অগাধ জলের মাছ, ভাব দেখান যেন চুনোপুঁটি। নরহরি একটা প্রশ্ন জিগ্‌গেস করছে আর অমনি তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'I object, Sir,'

এমনি যখন, 'চিফে'র পর জেরা চলছে, কে আরেকজন উকিল দাঁড়িয়ে পড়েছে কোণের দিকে। পার্শ্ববর্তীকে বললে, 'এই, তোর গাউনটা দে দিকি. একটা জরুরি পেশ সেরে নি। আমাকে একবার এক্ষুনি সার্টিফিকেট আপিসে যেতে হবে।' বলে তাড়াতাড়ি গাউনটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে বার-কতক পাঁয়তারা কসে বললে, 'স্যর! এক মিনিট।'

আদালত নির্মম গলায় বললে, 'আড়াইটেয়।'

ষষ্ঠীর পালা নির্বিঘ্নে শেষ হ'য়ে গেল, এমন কি দুর্লভের 'চিফ' পর্যন্ত। ভটচায পর্যন্ত অবাক, সব একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। জমির কোন ধারে 'পাতো' দেওয়া হয়েছিল তাতেও সে ভুল করলো না।

'দ্যাট্‌স্‌ অল।' নরহরি বললে।

চশমার ফাঁকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে-করতে কৈলাসবাবু উঠলেন। গলা খাঁখরে বললেন, 'দুর্লভবাবু, আপনি তো গাঁয়ের একজন মাতব্বর।'

প্রথমটা দুর্লভ স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিক তাকেই জিগ্‌গেস করা হচ্ছে কিনা সে ঠিক দিশে পেলো না।

কৈলাসবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি—এমন পুলিসসাহেবের মত জামা, গাঁয়ের একজন বিশিষ্ট মাতব্বর না হ'য়েই আপনি পারেন না।'

দুর্লভ গলে একেবারে জল হ'য়ে গেল। তার আপনার লোকেরা তাকে চিরকাল হেনস্তা করেছে, সে যে কত বড় একটা মানুষ এ-কথা কেউ কোনদিন তাকে বুঝতেই দেয় নি, আজ যেন মুহূর্তে তার চোখের সুমুখ থেকে কালো একটা পর্দা উঠে গেল, গাঁয়ের প্রেসিডেন্টের চেয়েও সে মানী লোক, শহরের সব চেয়ে সেরা উকিল কৈলাসবাবু তাকে 'আপনি' বলে ডেকেছে, এক কথায় চিনে নিয়েছে সে মাতব্বর, রাম-শ্যাম যদু-মধু নয়।

লজ্জিত বিনয়ে দুর্লভ বললে, 'তা গাঁয়ের লোকে বলে থাকে বটে।'

'বলতেই হবে।' কৈলাসবাবু ফের প্রশ্ন করলেন, 'মাতব্বরি করতে তো আপনাকে এখানে-সেখানে বেরুতে হয়, কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ, কোন সরিকের সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করে দেওয়া, কোন জমির আল-ভাঙার ঝগড়া মিটোনো—এমনি লেগেই আছে তো আপনার কাজ। গাঁয়ের মাতব্বর, বিঘটিত একটা কিছু হলেই তো আপনার ডাক পড়ে।'

'মাসের মধ্যে ঊনত্রিশ দিন।' দুর্লভ উৎফুল্ল হ'য়ে বলে উঠলো, 'এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত নেই।'

'মাতব্বর হবার দোষই এই। সাক্ষী পর্যন্ত দিতে হয়।'

'হয়ই তো। দলিল-পত্র কিছু একটা হলেই দুর্লভের ডাক পড়ে। গাঁয়ে আদালতের চাপরাশি গেলেই সব্বার আগে আমাকে ডাকে জারি দেখতে।'

'তা হ'লে চাষ-আবাদ আর করতে পারেন না! সময় কোথায়?'

'আমি করবো কেন? শীতল করে—ভাগে।'

'সে তো আপনার ঝিলখালির জমি, মালেক নন্দীবাবুরা। খতিয়ানে বর্গা-দখল শীতল মণ্ডল।'

'ঐ তো আমার জমি। শীতল চাষ করে।'

'তা তো ঠিকই। নিজের হাতে লাঙল-ঠেলা আপনাকে মানাবে কেন? আসছে বছরে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হবার কথা, কত চৌকিদার-দফাদার খাটবে আপনার নিচে—কি, ঠিক বলছি কিনা।'

সস্মিত লজ্জার ভান করে দুর্লভ বললে, 'তেমনিই তো শুনছি কানাঘুষো।'

'আর ঐ তো আপনার একমাত্র জমা?'

'একমাত্র। মায় সেস সাড়ে ন'টাকা খাজনা।'

'আর আপনার ভিটে-বাড়িও তো সেই জমার সামিল?'

'সামিল।'

'আচ্ছা, এখন বলুন তো, নালিশী জমি থেকে আপনার বাড়ি কত দূর?'
'নালিশী জমি?' দুর্লভের মনের কোণে এতক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললে, 'নালিশী জমির চৌহদ্দি আমি বলে দিতে পারি।'
'এত বড় মাতব্বর, তা পারবেন বই কি। কিন্তু ও আমি চাই না।' কৈলাসবাবু চশমার তলা দিয়ে চোখ বাড়িয়ে জিগ্‌গেস করলেন : 'আমার প্রশ্ন খুব সোজা, প্রশ্ন হচ্ছে নালিশী জমির থেকে আপনার ঝিলখালির বাড়ি কত দূর? মানে, ক'রশি?'
'রশি আমি বুঝি না।'
'আচ্ছা, ক'মাইল?'
'লেখাপড়া জানি না বাবু, মাইল কব কি করে।'
'আচ্ছা', কৈলাসবাবু প্রশ্নটাকে আরেকটু ঘুরিয়ে দিলেন : 'ঘণ্টা বোঝেন তো? দণ্ড?'
'তা বুঝি।'
'বেশ, তবে বলুন দিকি, আপনার বাড়ি থেকে নালিশী জমিতে যেতে কতক্ষণ লাগে? ক'ঘন্টা?'
'কতক্ষণ?' দুর্লভ মনে-মনে কি হিসেব করলো। বললে, 'আচ্ছা, যাব কিসে? তড়ে না নৌকোয়?'
'ধরুন, নৌকোয়।'
'আচ্ছা, গোনে না বেগোনে?'
'ধরুন বেগোনে।'
'উজানে না পিঠামে?'
'ধরুন পিঠামে।'
'দিবসে না রজনীতে!'
'ধরুন রজনীতে।'
দুর্লভ মরিয়া হ'য়ে বলে' উঠলো : 'ও আমি কেন, আমার ঠাকুর্দা এলেও বলতে পারবে না।'
'তা হ'লে আপনি বলতে পারেন না জমি সোনাউল্লো করতো কি তার চাচা করতো।'
'জমিতে পোঁছিয়েই দিতে পারলেন না, তায় বলব কি করে কে করে?' করজোড় করে দুর্লভ বললে, 'এই ধর্মঘরে আছি, একটি কথাও মিথ্যে বলবো না হজুর।'
কৈলাসবাবু বললেন, 'নামো।'
আদালত বললে, 'পরের সাক্ষী।'
নরহরি আদ্যনাথকে জিগ্‌গেস করলে, 'ষষ্ঠী কোথায়? দেখ, আর কাকে সে সাক্ষী দেবে?'
চারীদিকে চেয়ে ভটচাযকে কোথাও না পেয়ে আদ্যনাথ বাইরে বেরিয়ে গেল।

ভেণ্ডাররা যেখানে বসে তার বারান্দার কাছে ভটচাযের সঙ্গে তার দেখা, গায়ে তার একখানা রঙীন চাঁদর।

আদ্যনাথ ধম্‌কে উঠলো : 'গেছলে কোথায়?'

'চাদর কিনতে। নগদ পাঁচ সিকে দাম নিলে।' ভটচাযের চোখে তখন প্রায় জল দাঁড়িয়ে গেছে।

'ও দিয়ে হবে কি?' আদ্যনাথ মুখ খিঁচোলো।

'দুর্লভের চোখের সামনে গায়ে দিয়ে থাকবো। ও দেখবে, ওর চাদর কেনা হ'য়ে গেছে। চাদর দেখলেই ও ধাতে আসবে।'

'আর দুর্লভ! এখন আর কাকে সাক্ষী দেবে তার নাম কও।'

'কেন, দুর্লভ নেমে গেছে? হা অদৃষ্ট!' ভটচায উদ্‌ভ্রান্তের মতো আদালতে ছুটে এল।

এসে দেখলো তার আসতে দেরি দেখে নরহরি হাজিরায় লিখে দিয়েছে আর সাক্ষী দেবে না এবং অপর পক্ষের উমেশ গিয়ে দাঁড়িয়েছে কাঠগড়ায়।

অস্ফুট কণ্ঠে ভটচায নরহরির কাছে কেঁদে পড়লো, 'কি হবে বাবু?'

নরহরি বললে, 'ভয় কী, মামলা এখানে না পাও, আপিল আছে। সেখানে সাক্ষী খাটবে না, সব আইনের কুস্তি। নাও, আরও গোটা দুই টাকা বার কর, জেরায় সব ফাঁসিয়ে দেব এক্ষুনি, গোন-বেগোন বেরিয়ে যাবে বাছাধনের। আরো দুটো টাকা চাই, নইলে এমন উইক্ কেস আমি জেতাতে পারবো না!'

ভটচায তার পেট-কাপড়ের ভিতর থেকে শেষ দুটো টাকা বার করে দিল।

৩০ । জনমত

চড়ুই-পাখিদের দেশে একটা ময়ূর উড়ে এসেছে।

'ইং লেউ ইং—'

সেই পরিচিত স্বর। সেই পরিচিত ভারি পায়ের শব্দ। কিন্তু তেমন যেন আর সাড়া জাগায় না। আগে-আগে ভয় পেত সবাই, এখানে-ওখানে গা-ঢাকা দিত। এখন দিব্যি সবাই পথের উপর এসে দাঁড়ায়, পষ্টাপষ্টি তাকায় মুখের দিকে। আগে কেমন সম্ভ্রমের চোখে দেখত, এখন যেন কৌতূহলের, হয়ত বা কৃপার চোখে দেখছে। হল কি হঠাৎ? সে যেন সেই ডাকসাইটে ডাকাত নয়, ফকির মুসাফির।

মামুদ খাঁ হাসে মনে-মনে। হাতে লাঠি, জামার নিচে গায়ের চামড়ায় গরম হয়ে আছে ভোজালি।

'ইং লেউ ইং—'

কেউ যেন তাকিয়েও দেখে না। দেখলেও হাসে। অবজ্ঞার হাসি।

লোকজন অনেক বদলে গিয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু বন্দর-বাজার তেমনিই আছে নদীর ধার ঘেঁসে। সেই সব হোগলাপাতার চটি, বসেছে মুদি-মনোহারি বাজে-মালের দোকান। আছে সেই বড়-বড় বাহালীর দোকান, পেঁয়াজ-রশুন মরিচ-তেজপাতা টাল করা। সেই কাঠ-কাঠরার আড়ৎ। চলেছে সেই দর্জির কল, কিস্তিটুপি আর দোলমান সেলাই করছে। লোহার-কামারের দোকানে নেহাইয়ে ঘা পড়ছে হাতুড়ির। হাসিল-ঘরে রসিদ দিয়ে গরু আর মোষ বিক্রি হচ্ছে। নৌকো এসেছে কাঁচামালে বোঝাই হয়ে, গুড়ের হাঁড়ি, তামাক আর ধান-চালের বেসাত নিয়ে। খেয়ার পাটনী তোলা তুলে নিচ্ছে। গাছের ছায়ায় কামাতে বসেছে নাপিতের। সবই সেই আগের মত। সেই আগের মতই বিকেল।

তবু, যেন হাওয়া শুঁকে টের পাওয়া যায়, দিন কি রকম বদলে গিয়েছে।

হ্যাঁ, নতুন বাঁশের ছাউনি হয়েছে কতগুলি।

'কি এই সব?' একজনকে জিগগেস করলে মামুদ খাঁ।

লোকটা বললে, 'এফ-আর-ই।'

মামুদ খাঁ হাঁ হয়ে রইল।

'হাসপাতাল। দুর্ভিক্ষের হাসপাতাল।'

হ্যাঁ, বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষের কথা ভাসা-ভাসা শুনেছে মামুদ খাঁ। পাখার এক ঝাপটায় অনেক লোক উজাড় হয়ে গিয়েছে। অনেক লোক চলে এসেছে কঙ্কালের সীমানায়। তাদের কাছে আসেনি মামুদ খাঁ। এই বাজারেই যারা মুনাফা মেরে মোটা হচ্ছে, এসেছে তাদের কাছে।

'এই মেরা রুপেয়া লেউ।' মামুদ খাঁ পাকড়েছে ননীলালকে।

ননীলাল যেন একটুও ভয় পায় না। যেন খুব অবাক হয়েছে, এমনি ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকায়। বোধ হয় মুচকে-মুচকে একটু হাসেও।

'হাসতা কিঁউ? মেরা রুপেয়া লেউ।'

ননীলাল তবু ভড়কায় না এক-চুল। আগে-আগে পালাত আনাচ-কানাচ দেখে। দিনের বেলায় কোন দিন মুখোমুখি হবার সাহস পায়নি। আজ দিব্যি হাতের নাগালের মধ্যে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় বুক ফুলিয়ে। বলে, 'টাকা কিসের?'

টাকা কিসের! মামুদ খাঁর বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ভাবে স্পর্ধা কি লোকটার! মামুদ খাঁর হাতের লাঠি কি বেদখল হয়ে গেছে? জং ধরেছে কি তার ইস্পাতের ভোজালিতে?

পাঁচ বছর ফাটকে ছিল মামুদ খাঁ। তার লাঠির গাঁটে পাথরের মজবুতি ছিল, ভোজালির মুখে ছিল লকলকে আগুন। জেল থেকে বেরিয়ে মামুদ খাঁ কিছু বে-তাগদ হয়েছে, লাঠিতে যেন আর সেই লাফ নেই, ভোজালিতে নেই আর সেই রাগ-থেকেই-রক্তের ভোজবাজি। নইলে সেদিনের ননীলাল কি না বলে, টাকা কিসের!

'তুম শালা দিললাগি করছ হামার সাথ! হামি আদালত যাব।'

ননীলাল হেসে ওঠে গলা ছেড়ে। বলে, 'সেদিন আর নেই, খাঁ সাহেব।'

সত্যি, সেদিন আর নেই। নইলে মামুদ খাঁ আদালতের রাস্তা বাতলায়! কে না জানে, কত দিন তামাদি হয়ে গেছে তার টাকার দাবি-দাওয়া। তবু কি না আজ না-মরদের মত আদালতের নাম করে। নালিশবন্দ হয়ে জবানবন্দি করবে! ছেঁচড়া উকিল-মোক্তার টাপ্প-মুহুরির তাঁবেদার হবে! দিন বদলেছে বই কি!

তবে কি ননীলাল উপস্থিত দুর্ভিক্ষের দোহাই পাড়ছে? ননীলাল যেন না বেহুদা বদমায়েসি করে! তার 'ভাসানে' ব্যবসা ছিল, শহর থেকে বাজে মাল কিনে এনে নৌকো করে গাঁয়ের হাটে-হাটে বিক্রি করত, তার আলমাল বেড়েছে বই কমেনি একটুও। আগে মাটির একটা হাঁড়ি বেচে সেই হাঁড়ির মাপে চাল নিত, এখন এক হাঁড়ি চাল দিয়ে প্রায় এক হাঁড়িই টাকা নিয়ে যায়। তার এখন ফলাও কারবার।

দেদার টাকা না হলে ডাকাবুকো হয়ে দাঁড়ায় অমন মুখোমুখি?

কিন্তু মামুদ খাঁও একেবারে মরে যায়নি।

আরও দু'চারজন জুটছে এসে ক্রমে-ক্রমে। মোগলাই কাবা, ঘুরুলি-দেয়া পায়জামা, জরিদার মখমলের ওয়েস্টকোট অনেক দিন পর এ অঞ্চলে একটা সোর তুলে দিয়েছে। যেন বিদেশ থেকে বহুরূপী এসেছে সে। যেন কেউ তাকে চেনে না, দেখেনি কোনো দিন।

এই যে নবী-নওয়াজ। জমিদারের তশিলদার। একবার তবিল ভেঙেছিল বলে গ্রেপ্তারি বেরিয়েছিল তার নামে। মামুদ খাঁর থেকে চড়া সুদে দু'শো টাকা ধার নিয়ে দু'বছরে মোটে কুড়ি টাকা শোধ করেছিল সে।

'এই মেরা রুপেয়া লেউ।'

প্যাঁকাটে চেহারা, মাড়ি বের করে দস্তুরমত হাসে নবী-নওয়াজ। বলে, 'টাকা গেছে দেশান্তরী হয়ে।'

'তুম শালা তো আছ আমার কবজার ভিতর—' মামুদ খাঁ তেড়ে আসে।

'ও দিন-কাল আর নেই, খাঁ সাহেব। ও সব টেণ্ডাই-মেণ্ডাই আর চলবে না।'

আশ্চর্য, কেন কে জানে, মামুদ খাঁ গুটিয়ে যায় আচমকা। আগে কেমন টগে-টগে থেকেও নবী-নওয়াজকে ধরতে পারত না, এখন চোখের সামনে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পাচ্ছে না বাগাতে।

'আইন-ফরমান সব বদলে গিয়েছে। সুদখোরদের ওষুধ বেরিয়েছে এবার।'

আইন-ফরমানকে মামুদ খাঁ কবে তোয়াক্কা করেছে শুনি? আজও তাতে তার টনক নড়ত না, কিন্তু আজ সে চমকাচ্ছে ননীলালের সাহসে, নবী-নওয়াজের মাড়ি-বের-করা নিশ্চিন্ত হাসিতে। বাজার-বন্দর গোলা-আড়ত সব তেমনি আছে, কিন্তু, কি আশ্চর্য, সব থেকেও যেন কি নেই।

নেই আর তার পিছনের জোর, জনতার সম্মতি।

কে বলে জোর নেই? জবরদার হাতে মামুদ খাঁ নবী-নওয়াজের হাত চেপে ধরল। টানতে-টানতে নিয়ে চলল সামনের দর্জির দোকানে।

তবু নবী-নওয়াজ হাসে। যেন দর্জি-তাঁতি, মাঝি-মাল্লা, কামার-কুমোর, জেলে-মুচি, সব আজ তারা এক দল।

দর্জি কেতাব আলি। অনেক দিনের মহব্বতি তার সঙ্গে। এখানে বসে মামুদ খাঁর অনেক লেন-দেন হয়েছে, অনেক বুঝ-সমুঝ। হাতচিঠায় পড়েছে অনেক টিপটাপ। কেতাব আলিও তার কাছ থেকে খেয়েছে, কিন্তু বেইন-সাফি করে ঠকায়নি কোনো দিন। কত জনের জন্যে ফেলজামিন দাঁড়িয়েছে।

'পাল্লা বদল হয়ে গিয়েছে, খাঁ সাহেব। দেশে মহাজনী আইন বসেছে। এসেছে নতুন দিন, ফিরিয়ে দেবার দিন। অনেক দিন এ অঞ্চলে আসনি বুঝি? তোমার দোস্ত-দোসরদের সঙ্গে মুলাকাত হয়নি? তারা তো কবে এ তল্লাট থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে।'

উঁহু, কি করে জানবে? দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করে কয়েদ হয়েছিল তার। জেল থেকে বেরিয়ে সটান চলে এসেছে সে। এক ঘরওয়ালীর কাছে তার জামা-মেরজাই জুতো-পয়জার ছিল, তাই চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। সব ছিঁড়ে-ফেড়ে গেছে, কনকনে শীতের হাওয়া ঢুকছে এসে হাড়ের মধ্যে।

কিন্তু আইনটা কি?

হাতের লাঠি নির্জীব হয়ে থাকে, ভোজালিটা ভোঁতা মনে হয়, মামুদ খাঁ জিগগেস করে, আইনটা কি?

দর্জির দোকানে বসে আদালতের পিওন সমন-নোটিশ জারি করে, রিটার্ণ লেখে। পোস্টাপিসের পিওন চিঠি বিলি করে, বোর্ডের ট্যাক্স-দারোগা ট্যাক্সো কুড়োয়।

আদালতের পেয়াদারই বেশি মান, বেশি দাপট। সে জানে-শোনে বেশি, সে একেবারে ভিতরের লোক।

সে বলে, 'এখন বাবা লাইসেন লাগে। যেমন লাগে বন্দুকের, মদ-গাঁজার। লাইসেন না নিয়ে তেজারতি করলেই হাতে হাতকড়া।'

টাকা কর্জ দিতে কে এসেছে? যে টাকা নিয়েছ তোমরা, তা ফিরতি দেবে না? এ কোন দিশি নয়া কানুন? আসল টাকাও গাপ হয়ে যাবে?

হ্যাঁ, তামাদির গেরোর কথাটা জানা আছে মামুদ খাঁর। তার সে ভয় রাখে না। আদালতে যদি যেতেই হয় কোনো দিন, হাতচিঠাতে সে সুদের উশুল দিয়ে রাখতে জানে। কলম-ছোঁয়ানো সই করে রাখবার মত জাল-বাজের অভাব নেই। বটতলায় মিলবে অমন ঢের মুনসি-মুহুরি।

'নয়া কানুন না তো কি।' পাশের ঘরের মহেন্দ্র ডাক্তার তেড়ে এল : 'চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে চাষা-ভুষো বেপারি-কারবারি সবাইকে উচ্ছন্নে দিয়েছে, তাদের জন্যে নতুন আইন হবে না তো কি! সুদের সুদ, তস্য সুদ, যেন চক্কর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে-খেয়ে বেড়েই যাচ্ছে, খোলের চেয়ে আঁটি হয়েছে বড়, হাঁ-এর চেয়ে খাঁই। আসল? আসল কবে ভুষ্টিনাশ হয়ে গেছে তার ঠিক নেই।'

'নেহি, আসল অন্তত হামার চাই।'

'জানি না আমরা তোমার এই আসলের কারসাজি? দিয়েছ দশ টাকা লিখেছ চল্লিশ। এখন সব বস্তা-বোঁচকা গাঁট-গাঁটরি খুলে দেখাতে হবে। এসেছে হাটে হাঁড়ি ভাঙবার দিন।'

সত্যি, এ হল কি? গো-বদ্যি মহেন্দ্র সাপুই, ম্যালেরিয়ায় -ভোগা চিমসে চেহারা, সে পর্যন্ত আইনের চিপটেন ঝাড়ে। ত্যাড়া ঘাড়ে কথা কয়। চোখ পাকায়।

নিজেকে মামুদ খাঁর হঠাৎ অসহায় লাগে। বুঝতে পারে, তার পিছনে আর জনতার অনুমতি নেই। তার জবরদস্তির পিছনে নেই আর সেই ভয়ের বুজরুকি। যে ধার খায় সে যে অপরাধী নয়, সে যে শুধু অপারগ, রটে গেছে যেন তারই কানাঘুসো। অপারগের দল এবার তাই একজোট হয়েছে। পেরেছে একজোট হতে।

কিন্তু কিছু অন্তত টাকা না পেলে মামুদ খাঁ দেশে ফিরে যায় কি করে? তার কারবার যখন বরবাদ হয়ে গেল তখন দেশে গিয়ে সে চাষ-বাস করবে। হাল-বলদ কিনবে। হিং-এর চাষ করবে। কিন্তু বিনি সম্বলে সে যাবে কোথায়? খাবে কি? গরিবপরওয়ার কেউ নেই তোমাদের মধ্যে?

নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই মামুদ খাঁ লজ্জায় মরে যায়।

'এক আধলাও কেউ দেবে না! শুষে-শুষে ছিবড়ে করে ছেড়েছে, সোনার ডিম পাড়ত যে হাঁস, অতি লোভে তার পেটে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে—আছে কী আর আমাদের? যা তো থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আয় তো দারোগা-বাবুকে।' মহেন্দ্র তড়পাতে থাকে : 'আজকাল খাতকের বাড়িতে গিয়ে ধন্না দেয়া বা চারপাশে ঘুরনা দেওয়াও মারপিটের সামিল। যা তো কেউ, দেখবি এখনি শালার আসখাস তলব হবে থানা থেকে।'

থানা-পুলিশের নাম শুনে মামুদ খাঁ জ্বলে ওঠে। বলে, 'তুম শালা তো কম্বল লিয়েছিলে—তার দাম ভি আইন নাকচ করে দেবে? আচ্ছা দাম না দাও, হামার কম্বল ফিরিয়ে দাও!' মামুদ খাঁ সত্যি-সত্যি হাত পাতে।

'তুম শালা একখানা কম্বল দিয়েছ আর গায়ের ছাল তুলে নিয়েছ একশো জনের। সেই ছালে ডুগি-তবলা বানিয়েছ। আর আমরা হাড়গোড় বার করে দাঁত খিঁচিয়ে মরে আছি। বেইমানি করার আর তুমি জায়গা পাওনি? যাও, বেরোও।'

শের ছিল, কুত্তা হয়েছে আজ। তবু বেইমান কথাটা সহ্য করতে পারে না মামুদ খাঁ। তার এক কালের বেদানা-খাওয়া রক্ত লাল হয়ে ওঠে। লাঠি তুলে আচমকা মারতে যায় মহেন্দ্র সাপুইকে।

ঐ মারতে যাওয়া পর্যন্তই। হাতের মুঠ তার আঁট হয়ে বসতে পারে না লাঠির উপর, ওরা তা অনায়াসেই কেড়ে নেয়। কাউকে কিছু বলতে হয় না, সবাই দাঁড়ায় এককাট্টা হয়ে। একসঙ্গে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে

দেয় তাকে দোকান থেকে। তার জামা ছিঁড়ে দেয়। পাগড়ি খুলে ফেলে। বাবরি ধরে টানে। ঢিল ছুঁড়ে মারে। একটা ঢিল লেগে কপাল ফেটে যায়।

বুকের উমে গরম হয়ে আছে যে ভোজালি, মামুদ খাঁ তা আর মনেই করতে প্যারে না।

স্পষ্ট বোঝে, জনবলের সঙ্গে পারবে না সে লড়াই করে। সমুদ্রে ভেসে যাবে কুটোর মত। আর গায়ের জোর জিতলেও জিতবে না দাবির জোর। তার দাবি থেকে দাব গিয়েছে খসে। তার স্বত্বে বোধ হয় আর সত্য নেই।

মামুদ খাঁ পালিয়ে যায় জোর কদমে। যায় খেয়াঘাটের দিকে। কামারদের পিছনের গলি দিয়ে। পালিয়ে যাবার জন্যেই যেন সে এসে পড়েছে এই গলির আশ্রয়ে।

বাড়ির মুখোরে নিত্যগোপী জলচৌকির উপর বসে জল দিয়ে চেপে-চেপে আরেকটা কে মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছে।

নিত্যগোপী চিনতে পারল মামুদ খাঁকে। এ অঞ্চলেও সে তার হিং ফিরি করতে এসে কর্জ খাইয়ে যেত। শুধু নিত্যগোপীকেই জপাতে পারেনি। একখানা শাল দিয়েও নয়। নিত্যগোপী অনেক সম্ভ্রান্ত। সে কাবলিওলাকে ঢুকতে দেবে না তার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

খড়ম পায়ে নিত্যগোপী উঠে দাঁড়াল। বললে, 'এ কি হল খান সাহেব?'

'চোর ধরতে গিয়ে জখম হয়েছি।' রক্তে মামুদ খাঁর কপাল ও গাল ভেসে যাচ্ছে।

'সে কি কথা, এসো আমার বাড়িতে। বাবুকে ডাকাই। ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিক।'

কোনো দিন সাধ ছিল বুঝি মামুদ খাঁর, নিত্যগোপীর ঘরে যায়। আজ নিত্যগোপী তাকে ডাকল, কামনার মত নয়, শুশ্রূষার মত।

বললে মামুদ খাঁ, 'দরিয়ার পানি জবর নোনা, থোড়া পানি খাওয়াতে পারবে?' ছোট উঠোন পেরিয়ে নিত্যগোপী তাকে ঘরে নিয়ে এল। ঘটি করে জল দিল খেতে।

মামুদ খাঁর মুখে ঘটিটা আর কাৎ হল না। দেখল নিচু-মতন একটা তক্তপোষে কতগুলি কম্বলের থাক। লাল মোটা কম্বল। প্রায় এক শো কিংবা তারো বেশি।

'এ ক্যা?'

'বাবু এক গাঁট সরিয়েছেন হাসপাতাল থেকে। ঐ দুর্ভিক্ষের হাস-পাতাল থেকে। বাবু ওখানে এখন চাকরি করছে কি না—' সমপর্যায়ের ব্যবসায়ী ভেবে নিত্যগোপী বললে নিশ্চিন্ত হয়ে।

'কে তোমার বাবু?'

'মহেন্দ্র বাবু। খলিফার দোকানের পাশেই যার দাওয়াইখানা। দুর্ভিক্ষের দিনে খুব পয়সা করছে দু হাতে। নইলে আর আমার এখানে জায়গা পায়?'

জলভরা ঘটি নামিয়ে রাখল মামুদ খাঁ। বললে, 'পুলিশ ডাকে না কেউ? থানায় খবর দেয় না?'

'দারোগা জমাদার সবাইকে দেয়া হয়েছে একখানা করে।' নিত্যগোপী মামুদ খাঁর ফালা-খাওয়া ছেঁড়াখোঁড়া জোব্বা-জামার দিকে তাকাল। বললে, 'তুমি একখানা নেবে খান সাহেব? এই শীতে জামা-কাপড় তো তোমার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যে হতে-না-হতেই হাওয়া ছুটবে নদীর উপর দিয়ে—'

'না। চোরাই মাল আমি ছুঁই না।' মামুদ খাঁ নেমে পড়ল উঠোনে।

'এ কি, জল খেয়ে যাও।'

'না। পানি ভি খাব না।'

মামুদ খাঁ তার রক্তমাখা উপরের ঠোঁটটা চাটতে লাগল। যেন সে রক্তের স্বাদটা জেনে রাখছে। টক-টক, নোনতা-নোনতা, লোভের রক্তের স্বাদ। মহেন্দ্রদেরও কপাল যখন এক দিন ফাটবে তখন অনায়াসেই মনে করতে পারবে সে সেই রক্তের তার। জল দিয়ে তা সে আজ ফিকে করবে না।

লোকে দেখুক, দেখে রাখুক। রক্তমাখা মুখেই মামুদ খাঁ খেয়ার নৌকোয় গিয়ে উঠল।

৩১। খিল

অভাবনীয়েরো একটা সীমা থাকা উচিত। আপিসেই সুরজিৎ 'তার' পেলো, রাতে বরিশাল এক্সপ্রেসে অশোকা আসছে। আশ্চর্য, অশোকা কি জানে না কিছুই? ঘটনাটা তো ঘটে গেছে আজ এক বছরেরো উপর। তবু রাতে, বেশ একটু আগেই সুরজিৎ স্টেশনে গেল। গাড়ি ঠিক রাখলো। এবং যতক্ষণ না বাঁকের মুখে ইঞ্জিনের হেড-লাইট দেখা যায় ততক্ষণ প্লাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চিন্তিত ভঙ্গিতে পাইচারি করলো।

ইণ্টার-ক্লাশের মেয়ে-কামরা থেকে নামলো অশোকা। বয়েস প্রায় ত্রিশের কাছে, এবং নিঃসম্বল ও নিরভিভাবক। যখন সে একা আসছে, বুঝতে হবে সে কুমারী ও স্কুল-মিসট্রেস। আঠারো ইঞ্চির একটা পাতলা সুটকেশ ছাড়া সঙ্গে আর কোনো জিনিস নেই। শীতের রাতে বিছানাও নিয়ে আসেনি। মোটা সিল্কের একটা ব্লাউজ মোটে গায়ে—শীতের রাতে যার সংক্ষিপ্ততার চেয়ে হঠকারিতাটাই বেশি করে চোখে পড়ে।

দু'জন পরস্পরের দিকে চেয়ে সংক্ষেপে হাসলো। প্রায় দশ-এগারো বছর পরে দেখা। কিন্তু চিনতে কারুই দেরি হলো না। যেন কিছুদিন আগেই আর কোথাও তাদের এমনি অপ্রত্যাশিত দেখা হয়েছে।

'একেবারে তুমি যে আসবে তা ভাবিনি।' অশোকা সলজ্জমুখে সামান্য হাসলো : 'ভেবেছিলাম আর্দালি চাপরাশি কাউকে পাঠিয়ে দেবে হয়তো।'

'আর্দালি-চাপরাশি কেউ রাতে থাকে না,' সুরজিৎ অশোকার হাতের ব্যাগটার দিকে তাকালো। বললে, 'সঙ্গে আর কোন জিনিস নেই?'

'না।' কুণ্ঠিত হেসে অশোকা বললে, 'এক দিনের তো মোটে মামলা।'

সুরজিৎ ব্যাগটা অশোকার হাত থেকে তুলে নিলো। অশোকা আপত্তি করলো না। কিন্তু সেটা তখনি সে কুলির মাথায় চালান দেবে জানলে নিশ্চয় আপত্তি করতো, জোর করলেও ছেড়ে দিতো না।

গাড়িতে উঠলো দুজনে। অশোকা আগে পিছনের সিটে, সুরজিৎ মুখোমুখি। বাক্সটা গাড়োয়ানের জিম্মায়।

সংসারে জিনিস যার এত অল্প, সে যে কতদূর দুঃসাহসী এই কথাটাই সুরজিৎ ভাবলো। প্রয়োজন তার বেশি, না প্রয়োজন তার কম, এই কথাটাই বুঝে উঠতে পারলো না। বললে, 'আমার ওখানে যে চলেছ খুব অসুবিধে হবে।'

'কার? আমার না তোমার?'

'তোমার।' জানো তো সুরজিৎ একটু থেমে বললে, 'আমার স্ত্রী জয়ন্তী বছর দেড়েক হলো মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, কাগজে দেখেছিলুম খবরটা। গণ্যমান্যকে বিয়ে করলে স্ত্রীও গণ্যমান্য হয়।' অশোকা একটু হাসলো কিনা বোঝা গেল না।

সুরজিৎ বললে, 'বাড়িতে একেবারে একা আছি। মেয়েছেলে কেউ নেই—'

'কেন, আমিই তো আছি।' অশোকা স্বচ্ছন্দভাবে বললে।

'কিন্তু কে তোমার দেখাশুনা করে?'

'আমি নিজেই করতে পারবো। এতদিন ধরে তাই করে এসেছি।'

একটুখানি কাটল।

সুরজিৎ প্রশ্ন করলো : 'এখানে কেন এসেছ জানতে পারি?'

'আশ্চর্য, তুমিও একটা কৈফিয়ৎ না পেলে সন্তুষ্ট হবে না?' গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে অশোকার চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল দেখালো। 'সমস্ত রাস্তা গাড়িতে এক ভদ্রমহিলার কাছে লম্বা জবাবদিহি দিতে হয়েছে। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কার বাড়িতে যাচ্ছি, সে আমার কে হয়, সেখানে আর কে-কে আছে, ইস্টিশানে কে আসবে নিতে—এক গাদা প্রশ্ন। উঃ, প্রাণ প্রায় যায়।'

'সবগুলি উত্তরই বেশ সন্তোষজনক হয়েছিলো আশা করি।'

'অন্তত ভদ্রমহিলা তাই মনে করেছিলেন।' অশোকা সশব্দে হেসে উঠলো।

'ও-সব প্রশ্নের বেশির ভাগ উত্তরই আমার জানা, শুধু একটা ছাড়া। কেন এসেছ সেইটেই শুধু জানতে চাই।'

'এমনিতে আসতে পারি না?'

'কেউ পেরেছে বলে তো শুনিনি এ পর্যন্ত।'

'কেউ মানে?'

'কেউ মানে বয়স্ক কুমারী মেয়ে একাকী কোনো পুরুষের আশ্রয়ে—বলো না, কেন, কী দরকারে এখানে এসেছ?'

'বাবাঃ, কী কৌতূহল তোমার!' অশোকা আঁচলটা টানলো, চুলটা একটু অনুভব করলো, গলার হারটা একটু আঙুল দিয়ে নাড়লো। বললে, 'তোমাদের এখানকার মেয়ে-ইস্কুলের হেডমিসট্রেসের চাকরিটা পাবো বলে মনে করছি। কাল সকালে তারই ইন্টারভিয়ু।'

'সে ক্ষেত্রে,' সুরজিৎ একটু কাশলো : 'মেয়ে-ইস্কুলের হস্টেলে ওঠাটাই কি ঠিক ছিল না? কাল সকালে ইস্কুলের সেক্রেটারি যদি জিগ্গেস করেন, কোথায় ছিলে, তাহলে তোমার মুখের জবাব শুনে খুব বেশি তিনি খুসি হবেন বলে মনে হয় না।'

'প্রথমত তাঁর সে-কথা জিগগেস করাই উচিত হবে না, দ্বিতীয়ত,' অশোকা সহাস্য স্বাচ্ছন্দ্যে বললে, 'তোমার মতো এত ভীতু তিনি না-ও হতে পারেন।'

এর উত্তরে সুরজিতের কথাটা কেমন গম্ভীর, একটু বা বোকাটে শোনালো। সে বললে, 'এক-আধটু ভীতু হওয়াটা মন্দ নয়। বিশেষ করে তারা যারা চাকরি করতে বেরিয়েছে।'

'তোমার মতো চাকরির জন্যে আমার অত মায়া নেই। নেই বা হলো চাকরি।' অশোকা গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে গলাটা সামান্য উঁচু করে ধরলো।

কেমন যেন তাকে অত্যন্ত শ্রান্ত ও অসহায় দেখালো হঠাৎ। মনে হলো যেন তার হাত-পা গাল-গলা শীতে নিদারুণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। প্রথমে একটা সাদা গেঞ্জি, তার উপরে উলের গেঞ্জি, তার উপরে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি তার উপরে শাল—তবু সুরজিতের শীত মানছে না, ইচ্ছে করছে প্রকাণ্ড একটা লেপ জড়িয়ে বসে থাকে, অথচ এই গলিত শীতে ঐ তার চেহারা। এটা হতাশা না ঔদ্ধত্য তা কে বলবে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে সুরজিতের চক্ষু কেমন কোমল হয়ে এলো। বললে, 'তোমার শীত করছে না?'

'না।'

সুরজিৎ অল্প একটু হাসলো। বললে, 'শীতের কাছে ভীতু হওয়াটা অশাস্ত্রীয় হবে না। আমার গায়ের কাপড়টা নাও। বলে শালটা গা থেকে খুলে নিয়ে অশোকার কোলের উপর রাখলো।

অশোকা চমকে উঠলো। বললে, 'দেখো তোমার না ঠাণ্ডা লাগে। আগে আগে একটুতেই তোমার ঠাণ্ডা লাগতো। ব্রঙ্কাইটিসের দোষ ছিল। সে সব এখন সেরে গেছে, না?

'কিছুই সম্পূর্ণ সারে না।'

'তবে তুমিই গায়ে রাখো। একা আছ, অসুখ-বিসুখ হলে মুস্কিল হবে।'

'তার চেয়ে আরও মুস্কিল হবে যদি তোমার অসুখ করে।'

অশোকা আবার হেলান দিল। ক্লান্তরেখায় গলাটা আবার উঁচু করলে।

'কী, খুলে গায়ে দাও না।'

'না, এই বেশ আছি।' শালটা তেমনি রইলো অশোকার কোলের উপর পড়ে। গাড়ি থেকে নামবার সময় কি মনে করে শালটা সে তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিলো।

প্রকাণ্ড বাড়ি। একজনের পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ। নিচে দু'খানা ঘর, একটাতে বৈঠকখানা, পাশেরটা ভাঁড়ার। চেয়ার সোফা ও য়্যাসট্রের আধিক্য দেখে বোঝা যায় বৈঠকখানায় প্রচণ্ড আড্ডা বসে। আর পাশের ঘরে থাকে-থাকে থরে-থরে জিনিস দেখে মনে হয় কী নিপুণ নিখুঁত গৃহস্থালি! অথচ সব চাকর-ঠাকুরের হাতে। একটা ঠাকুর—দুটো চাকর কোথা থেকে কুটোটি কুড়িয়ে নেবে তারি জন্যে সর্বদা তটস্থ। ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতো অত বড়ো না হলেও প্রকাণ্ড উঠোন। তার এক পাশে আনাজের ক্ষেত, অন্য পাশে দিশি ক'টা ফুল-গাছ, কিন্তু কোথাও একটা শুকনো পাতাও পড়ে নেই। বাবু যদি বলে তবে ওরা অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে এমন একটা ভাব যেন ওদের মুখের উপর লেখা আছে। কোন জিনিসই যেন হাত বাড়িয়ে চাইতে হয় না, সব আগে থেকেই তৈরি। এতটা ভালো নয়, যেন কেমন চোখকে পীড়িত করে—অশোকার মনে হলো। কেননা যে একা আছে, তার ঘর-দোর খানিকটা আগোছালো থাকবে এটাই সকলের প্রত্যাশা করা উচিত।

নিচে স্নানের ঘরে একটু উঁকি মেরে অশোকা সুরজিতের সঙ্গে উপরে উঠে এলো। উঠেই উত্তরের বারান্দা। পাশাপাশি দু'খানি সমান মাপের ঘর, উত্তরে দক্ষিণে দরজা। দু'ঘরের মাঝখানেও একটা দরজা আছে—অবারিত খোলা, যেটায় কোনোদিন এ পর্যন্ত খিল পড়েনি। প্রথমেই ডাইনে যে ঘর সে ঘরটা কিসের যে নয় অশোকা ভেবে পেলো না। বিশালকায় এক টেবিল, দেখলেই সন্দেহ হয় এ-টেবিলের চার পাশে বসেই রাউণ্ড-টেবিল-কনফারেন্স হয়েছিলো কিনা। আফিসের বাক্স, বেতের বাস্কেট, ফ্ল্যাট-ফাইলে ফিতে-বাঁধা কাগজ পত্রের স্তূপ, আইনি-বেআইনি মোটামোটা বই—কী যে তাতে নেই তা কে বলবে? কিন্তু সমস্তই অদ্ভুত রকমের গুছোনো। খোলা দুটো সেল্‌ফে ঘেঁসাঘেঁসি করে বই সাজানো রয়েছে; কিন্তু আশ্চর্য, দু'খানা বইয়ের মাঝখানে কোথাও একটু ফাঁক নেই, কোথাও একখানা বই বেঁকে বা হেলে বসেনি। ওদিকের দেয়াল ঘেঁসে লম্বা একটা কাঠের বেঞ্চি, তাতে ট্রাঙ্ক আর সুটকেস সাজানো, একটার উপর একটা। ঘরে স্ত্রী না থাকলেও যে কেউ বাক্স প্যাঁটরাগুলি রঙচঙে কাপড়ের ঢাকনি দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখে, অশোকা তা কল্পনা করতে পারতো না। পাশেই দেরাজ—টানাগুলোতে হয়তো আপিসের পোশাক থাকে। তারই সন্নিকটে দেয়ালে ঝোলানো লম্বা একটা আয়না। আয়নাতে শরীরের অনেকখানি দেখা যায় বলে অশোকার কেমন লজ্জা করে উঠলো। দেরাজের উপরকার একটা ছবি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটা টেনে নিলো। না, মৃত-জীবিত কোনো মানুষেরই ছবি নয়, একটা সদ্য-উদ্ভিদ্যমান গোলাপের কুঁড়ি।

আয়নার দু'পাশে দুটো ছোট টেবিল, যদিও ডাইনেরটা অপেক্ষাকৃত বড়ো।

বাঁয়েরটাতে প্রসাধনের জিনিস, ডাইনেরটাতে ওষুধ। দুটোই যেন ভীষণ বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো। খানিকটা অন্যায় কৌতূহলের মতো দেখায় বলে অশোকা বেশিক্ষণ সেখানে চোখ রাখলো না। পাশেই আর দুটো ব্র্যাকেট, একটা কাপড়ও কোথাও একটু কুঁচকে বসেনি। আলনার শেষ তাকে সারবাঁধা জুতোর লাইন, ইলেট্রিকের আলোয় চকচক করছে। এ-সবের মধ্যে, ঘরের মাঝখানে বেমানান একটা স্প্রিং-এর খাট।

অশোকা জিগগেস করলো : 'এইখানেই শোও নাকি?'

'না। শোবার ঘর ঐ পাশে।'

পশ্চিমের ঘর থেকে পুবের ঘরে অশোকা এল, মাঝখানের দরজা দিয়ে। পশ্চিমের ঘরটা জিনিসপত্রে যেমনি জবরজঙ, পুবের ঘরটা তেমনিই ফাঁকা নিরিবিলি। মাঝখানে প্রকাণ্ড খাট পাতা, বিঘৎ দুয়ের পুরু গদির উপর নরম তোষকে নিভাঁজ বিছানা করা রয়েছে। পায়ের দিকে লেপ রয়েছে ভাঁজ করা। একজনের পক্ষে যেন অনেক অপচয়, অনেক উদ্‌বৃত্তি, তাকিয়ে থেকে অশোকার মনে হলো। কিন্তু যতই সে শ্রান্ত হোক না কেন, এখনি রাত সাড়ে নটার সময় লেপ গায়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়তে পারে না, এ কথাটা মনে হতেই সে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

পাশে একটা ইজি-চেয়ার, আলোর দিকে পিঠ করে। তার হাতের কাছেই ছোট টিপাইয়ের উপর টাইম-পিস ঘড়ি, ক'খানা ছ পেনি দামের হালকা বই আর কখানা রঙিন মলাটের চুটকি সাপ্তাহিক। একবার হাত দিয়ে নেড়ে-চড়ে দেখলো সেগুলি, যেমনি ছিল তেমনি আবার গুছিয়ে রাখলো সন্তর্পণে।

এ ঘরে ঢুকেই অশোকা ভেবেছিলো দেয়ালজোড়া এনলার্জ্‌ড একটা ফটোর সঙ্গে তার দৃষ্টির সংঘর্ষ হবে। কিন্তু আশ্চর্য, ঘরের চারদিকে কোথাও জয়ন্তীর একটুকরো একটা ছবি নেই। অশোকার বুকের মধ্যে থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। শব্দ শুনে নিজেই সে উঠলো চমকে কেননা সে-নিশ্বাস যেন ঠিক দুঃখের মতন বলে মনে হলো না।

অন্য দিকে চোখ রেখে সুরজিৎ বললে, 'হাত মুখ ধোবে না?'

'পুরোপুরি গা-ই ধোবো। নইলে বড্ড ঘিন-ঘিন করবে। গরম জল পাবো তো?'

'হ্যাঁ, করছে গরম জল।'

'দেখ, সাবান-তোয়ালে কিছু সঙ্গে আনিনি।' অশোকা হাসলো।

'তা-ও পাবে।'

'সবই প্যাবো।' অশোকা বললে, নির্ব্যক্তিকের মতো, পরে অনেকখানি হেসে : 'কিন্তু যদি শাড়ি-সেমিজ চাই।'

'তা দিতে পারবো না বটে, কিন্তু তার বদলে পা-জামা আর ঢিলে পাঞ্জাবি দিতে পারবো। পরো না, বেশ দেখতে হবে। অনেকেই তো পরে আজকাল।'

একটু কি বিবেচনা করলো অশোকা। পরে নিতান্ত বালিকার মতো

খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে, 'কি যে বলো! বলে তার স্যুটকেসে চাবি পরালো।

নিচে বাথরুমে এসে দেখলো, সমস্ত কিছু তৈরি, প্রয়োজনেরো অতিরিক্ত। প্রক্ষালন সমাপ্ত করে চাকর-ঠাকুরের সঙ্গে সে দুটো সাংসারিক কথা কইলো নিতান্ত মেয়েলী কৌতূহলে। কিন্তু ভুলেও তারা একবার জিগ্গেস করলো না, সে কে, কেন এসেছে, কেনই বা এতদিন আসেনি।'

উপরে গিয়ে দেখলো, টেবিলের সামনে কি-সব কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছে সুরজিৎ। যেন কতদিনকার পুনরাবৃত্ত অভ্যাস, সুরজিৎ চেয়েও দেখলো না! খসখসে শাড়ির বহু-বিস্তৃত বিশৃঙ্খলায় অশোকা যখন দ্রুত পায়ে উঠে সুরজিতের পাশ দিয়ে আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালো, তারো মনে হলো এমনি যেন আরো কতদিন হয়ে গেছে এর আগে। নতুনত্বের তীব্রতার মাঝে জিনিসটাকে কখনো-কখনো অত্যন্ত পরিচিত ও প্রাত্যাহিক মনে হয়। হঠাৎ ময়ূরসিংহাসনে গিয়ে বসলে মনে হয় এমনি যেন কতদিনই বসেছি।

কিন্তু খটকা বাধলো। অশোকা জিগগেস করলে : 'মোটা চিরুনি নেই?'

সুরজিৎকে তাকাতে হলো এবার, আর তাকিয়ে সে ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে গেল। আর কিছুতে নয়, শাড়িটার চওড়া ঢালা লাল পাড়ে। এই পাড়টা অত্যন্ত সেকেলে, আধুনিক কুমারী মেয়েদের পছন্দের বাইরে। এ-পাড়ের সঙ্গতির জন্যে কপালে ও সিঁথিতে যেন অনেকখানি সিঁদুরের প্রত্যাশা করতে হয়। এ লালটা সম্ভোগসৌভাগ্যের রঙ। যেন বড় বেশি উম্ঘাটিত।

'কি দেখছ অত করে। মোটা চিরুনি নেই?'

'চুল তো ভেজাওনি, সরু চিরুনিতেই আঁচড়ে নিলেই চলবে। তা ছাড়া' সুরজিৎ হেসে বললে, 'রুক্ষ চুলেই তো ভালো দেখায়।'

চুল আঁচড়াবার আর দরকার হলো না। নিজের থেকেই সুরজিতের শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে অশোকা বললে, 'বাবা, কী শীত এখানে!'

'তোমাকে এখন চা দেবে, না একেবারে খাবে?'

'একেবারে খাবো!' অশোকা অদ্ভুত করে হেসে উঠলো।

'কী খাবে? ভাত না লুচি?'

'তুমি?'

'তুমি যা খাবে তাই।'

'আমি ভাতই খাবো। ভাত না খেলে ঘুম হবে না। আমার সমস্ত শরীর এখন ঘুম চাইছে।'

'তবে দিতে বলি ঠাকুরকে?' সুরজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল।

'দাঁড়াও, ব্যস্ত কি?' অশোকা টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালো। বললে, 'কাজ—এখনো কাজ? আমি এসেছি তবু আজকের রাতেও তোমাকে কাজ করতে হবে?'

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে সুরজিৎ কাগজ-পত্রগুলি দূরে সরিয়ে রাখলো।

বললে, 'না, ঠিক কাজ নয়, একটু দেখছিলুম কাগজগুলো।' তারপর অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টায় একটু-বা ম্লানকণ্ঠে বললে, 'তারপর—'

'তারপর এই তো, ভাসতে-ভাসতে। উঃ, কী শীত এখানে! হাত দুটো আমার খেয়ে যাচ্ছে।' মুঠ-করা দুই হাতের উপর চিবুক রেখে দাঁড়িয়েছিলো অশোকা, হঠাৎ ডানহাতখানা দুর্বল ভঙ্গিতে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এই দেখ না, যেন বরফ দিয়ে তৈরি।'

এক মুহূর্ত সুরজিৎ দ্বিধা করলো হয়তো। তারপর সেই হাত ছুঁলো কি না ছুঁলো। ব্যস্ত হয়ে বললে, 'গ্লাভস পরবে? আমার কাছে গ্লাভস আছে।'

'আর মোজা?' অশোকা হাত সরিয়ে নিয়ে রাখলো শালের তলায়।

'মোজাও দিতে পারি। খুব নরম একটুও কুটকুট করবে না।'

'আর কান-ঢাকা টুপি? কম্ফর্টার?' হাসতে হাসতে অশোকা সরে গেল। বললে, 'দস্তানা হাতে দিয়ে খাবার আমার অভ্যেস নেই। তুমি কাজ করো, আমি ঘুরে ঘুরে তোমার বাড়ি দেখি।' বলে সে নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেল। নিঃশব্দে, কেনা এত শীতেও সে খালি-পা।

কিন্তু কোথাও যেন তার এতটুকু আশ্রয় বা বিশ্রাম নেই। এমন একটুও কোথাও অগোছাল নেই যে সে গুছিয়ে দেয়। বিছানাটা পর্যন্ত পাতা হয়ে গেছে।

ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলো সে দক্ষিণের বারান্দায়। দেখলো সেখানে কয়েকখানা বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। এখনো বুঝি কখনো-কখনো সুরজিৎ বসে, বসবার তার ইচ্ছে হয়, সব সময়েই তা হলে সে মস্ত টেবিলের সামনে খাড়া চেয়ারে বসে কাজ করে না। কিন্তু বাইরে কী কনকনে হাওয়া, এখানে এক মিনিট দাঁড়ায় এমন সাধ্য কার। কোথা থেকে কি একটা প্রচ্ছন্ন ফুলের ম্লান গন্ধ আসছে, তার উপর এমন চোখ জুড়ানো কালো অন্ধকার—কী ভেবে, শালটা গায়ের উপর আরো ঘন করে টেনে নিয়ে অশোকা একটা চেয়ারে ভেঙে পড়লো।

তারপর সুরজিৎ সত্যিই ফের কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছিলো। হুঁস হলো যখন ঠাকুর এসে বললে, খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে। ডাকলো : 'অশোকা!'

আশা ছিল দেখতে পাবে পাশের ঘরের ইজিচেয়ারে শুয়ে সে বই পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য, সেখানে সে নেই। বিছানাটাও অস্পৃষ্ট। দক্ষিণের দরজা খোলা দেখে চলে এলো সে দক্ষিণের বারান্দায়। দেখলো চেয়ারে শুয়ে অশোকা ঘুমিয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালতে গেল, জ্বালালো না। আলোর চেয়ে অন্ধকারেই অনেক জিনিস বেশি স্পষ্ট করে দেখা যায়।

ডাকলো : 'অশোকা, ওঠো। খেতে যাবে না?'

গলার স্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা, তবু কোনো সাড়া নেই।

হাত দিয়ে অশোকার মাথায় সে মৃদু নাড়া দিলো। তারপর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি। 'এ কি, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?' তবুও অশোকাকে মুহ্যমান দেখে দুহাতে তার দুই বাহু ধরে সবল আকর্ষণ করে তাকে সম্পূর্ণ দাঁড় করিয়ে

দিলো। বললে সুরজিৎ একটু-বা শাসনের সুরে: 'তুমি পাগল হয়েছ নাকি? এই অসম্ভব শীতে পাৎলা একটা শাল গায়ে দিয়ে বাইরে পড়ে আছ? নিমুনিয়া হবে যে! ঘুম পেয়েছে, বিছানায় শুতে পারোনি? লেপ তবে আছে কি করতে? চলে এসো বলছি।' বলে তার হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো, আর দরজাটা দিল সজোরে বন্ধ করে।

এত ঝড়-ঝাপটার পর আশ্চর্য হেসে অশোকা বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বুঝি?'

তারপর তারা নিচে খেতে গেল, টেবিলে মুখোমুখি। রাশি-রাশি খাবার। অশোকা বললে, 'তুমি আমার ঘুমটা মাটি করবে দেখছি।'

'কেন বলো তো?'

'এত সব খেলে আমার ঠিক অম্বল হয়ে যাবে। বুক জ্বলবে।'

'যদিও আমার কাছে ওষুধ আছে, তবুও তোমাকে এত খেতে বলবো না। যা পারো তাই খাও।'

'আর তুমি—তুমি এতগুলো সব খাবে নাকি?' অশোকা অবাক হবার ভঙ্গি করলো।

'না, আমি রাত্রে অত্যন্ত কম খাই।'

'তবে এত সব করেছ কেন?'

'আমি করিনি, ঠাকুর করেছে।'

'ঠাকুর করেছে! দুটো লোকের জন্যে দুশো রকম খাবার! ওকে এত সব বলেছে কে করতে? কী আক্কেল দেখ দিকি! এসব স্রেফ নষ্ট হবে তো?' অশোকা কর্ত্রীত্বের সুরে বললে।

'হোক নষ্ট। তবু তোমাকে বেশি খেতে বলে তোমার ঘুম নষ্ট হতে দিতে চাই না। কিন্তু ভাবো দেখি,' সুরজিৎ সহজভাবে বললে, 'দৃশ্যটা যদি উলটো হতো, মানে, তোমার ঘরে যদি আমি অতিথি হতুম, আর তুমি যদি আমাকে খাওয়াতে, তাহলে দুশো ছেড়ে দু'হাজার পদ করতে, আর কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিতে না, জোর করে প্রতিটি গ্রাস আমার গলার মধ্যে গুঁজে দিতে, বলো, তাই ঠিক নয়?'

'কখ্খনো না।' চামচ দিয়ে খাদ্যদ্রব্যগুলির প্রথমাংশটা দু' প্লেটে ভাগ করে দিতে দিতে অশোকা বললে, 'বরং আমার খাওয়ানোতে যদি তোমার অসুখ করতো, রাত জেগে তবে তোমার আমি সেবা করতুম। যতক্ষণ না সুস্থ হতে, ছেড়ে দিতুম না তোমাকে। বেশ তো, আজই তার পরীক্ষা হোক না।' অশোকা চেয়ারটা সামনের দিকে আরো টেনে আনলো: 'মনে করা যাক না, এ আমি তোমাকে খাওয়াচ্ছি। তোমার বাড়ি, তোমার খরচ—ভেবে নিলেই হলো, আমার বাড়ি আমার খরচ। খাও না তোমার যত ইচ্ছে। দেখ না, সেবা করতে পারি কি না!'

'মাঝখান থেকে আমার স্বাস্থ্যের সঙ্গে তোমার ঘুমটুকুও নষ্ট হয়ে

যাবে। দরকার নেই সেই এক্সপেরিমেন্টে। ফেলে-ছড়িয়ে যা পারা যায় তাই খাওয়া যাক।'

খেতে-খেতে হঠাৎ নিম্নকণ্ঠে অশোকা জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, তোমার ঠাকুর-চাকর আমাকে কি ভাবছে বল তো?'

'কী ভাবছে জিগ্‌গেস করাটা যখন সমীচীন হবে না, তখন অনুমান করতে পারি মাত্র।' সুরজিৎ সম্পূর্ণ করে তাকালো একবার অশোকার মুখের দিকে। বললে, 'কোনো আত্মীয়া—ছোট বোন-টোন ভাবছে হয়তো।'

'তাই হবে। নচেৎ আর-কেউ যে এমন একা বাড়িতে একা চলে আসতে পারে তা হয়তো ওরা কল্পনাও করতে পারে না। আচ্ছা,' গরসটা মুখের কাছে ধরে নির্নিমেষ চোখে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে অশোকা প্রশ্ন করলো : 'আচ্ছা আমাকে তোমার মনে ছিলো? তার যখন পেলে তখন চিনতে পেরেছিলে অশোকা কে?'

এই সূত্রে অশোকা সুরজিৎকে টেনে নিয়ে গেল প্রায় দশ-এগারো বছর আগে এক বে-সরকারী মেয়ে-হস্টেলে। যখন সুরজিতের বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ; যখন জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে এসে লুকিয়ে আরো একজনের সঙ্গে সে দেখা করত; যখন একটা চাপা গুঞ্জন চলেছিলো চারদিকে শেষ মুহূর্তে কার সে হাত ধরে—জয়ন্তীর না অশোকার।

সে-পরিচ্ছেদটা নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে সুরজিৎ হঠাৎ জিগ্‌গেস করলে, 'কাল ইন্টারভিয়ুর পরই চলে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ, হবিবির্না-অবস্থাতেই যাওয়া ভাল।' অশোকা হাসিমুখে বললে, 'প্রহারেণ পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

আঁচিয়ে উপরে এসে দেখলো সাড়ে-এগারোটা। কি-রকম আতঙ্ক করে উঠলো অশোকার।

টিপায়ের উপর পান রেখে গেছে। সুরজিৎ বললে, 'তুমি পান খাও?'

'তুমি?'

'খাবার পর খাই এক আধটা।'

'আমি খাই না। তবে তুমে যখন খাচ্ছ'—অশোকা তুলে নিলো একটা পান।

'পান খেলেও ঘুমুতে যাবার আগে দাঁত মাজি।'

'রক্ষে করো, রাত দুপুরে এখন আমি দাঁত মাজতে পারবো না।' অশোকা পান রেখে দিলো।

কতক্ষণ পরে, ঘরের চারিদিকে চেয়ে, জানালা-দরজা সব অটুট আছে কিনা তাই হয়তো পর্যবেক্ষণ করে সুরজিৎ জিগগেস করলে 'তোমার আর কি লাগবে? রাত্রে জল যদি খাও—'

'রক্ষে করো। শীতের রাতে উঠে জল খাওয়া!'

'তবে দোর দিয়ে শুয়ে পড়ো আর কি।'

'আর তুমি?'

'আমার দেরি আছে।'

'আমিও তবে দেরি করতে পারবো।' বলে হঠাৎ অশোকা জিগগেস করলে, 'বাড়িতে কফি আছে?'

'খাবে তুমি? আমি নিজেই প্রস্তাব করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবার ভয়ে বলতে সাহস পাইনি।'

'তবে বলে দাও না, কোথায় কি আছে, তৈরি করে নিচ্ছি।'

'কিন্তু খাবে যে ঘুমুতে তোমার অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'হোক। এখন আর আমার ঘুম পাচ্ছে না। এখন জাগতে ইচ্ছে করছে।'

অশোকা নিজের হাতে তৈরি করলো কফি। সুরজিৎকে এক কাপ দিয়ে নিজে নিলো আর এক। সুরজিৎ বসেছে ইজিচেয়ারে, অশোকা সামনে একটা লম্বা মোড়ায়—টিপাইটা দু'জনের মাঝখানে, বইগুলি মেঝের উপর রেখে দেয়া। বেড়া-দেয়া রুটিনের বাইরে যেন তারা চলে এসেছে। নিচে চাকরদের সাড়া-শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট।

কফি শেষ হয়ে গেছে কখন। অনেকক্ষণ তাদের আর কোনো কথা নেই। আর যেন কিছুতেই তারা লঘু আর তরল হতে পারছে না।

প্রকাণ্ড একটা স্তব্ধতার ঢেউ পেরিয়ে গিয়ে সুরজিৎ বললে আবার সেই আগেকার কথা, 'দোর দিয়ে এখন শুয়ে পড়ো।'

অশোকারো মুখ দিয়ে সেই আগের কথাই বেরিয়ে এলো : 'আর তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিও শোবো এবার। পাশের ঘরে আমার জায়গা হয়েছে।'

মাঝের দরজা দিয়ে অশোকা দেখলো সেই স্প্রিং-এর খাটে কখন একটা বিছানা করা হয়েছে—হাসপাতালের রুগীর মতো—পায়ের নিচে একটা মোটা কম্বল—ওয়ারছাড়া। দরিদ্র, সঙ্কীর্ণ বিছানা।

অশোকা বললে, 'তা কি হয়? তোমার বিছানায় তুমি শোবে। আগন্তুক আমি, ওখানে আমি শোব—একরাত্রির তো মামলা।'

সুরজিৎ অস্ফুটভাবে হাসলো। বললে, 'পাগলামি করো না। তুমি অতিথি, পরিশ্রান্ত।'

'অত বড়ো খাটে শুলে আমার ভয় করবে। ঐখানেই দিব্যি আমি কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে পারবো। ঘরময় অনেক জিনিস, কখনো একা মনে হবে না নিজেকে।'

'তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, এমন-কি আমাকে পর্যন্ত তোমার ভয় নেই। সে-ভয়ও যাতে না থাকে—' সুরজিৎ সরে এলো দু ঘরের মাঝের দরজার কাছে। বললে, 'মাঝখানে ওই একটা মাত্র দরজা, আর তার খিলটা তোমার দিকেই রইলো।' পরে স্বর অত্যন্ত লঘু করে বললে, 'মশারি খাটানো আছে, দরকার হলে ফেলে নিয়ো। মশা যদিও এখন নেই। আর রাত কোরো না, কথায়-কথায় অনেকক্ষণ তোমায় জাগিয়ে রেখেছি।' সুরজিৎ তার ঘরে অপসৃত হল।

অমনি তার পিছনের দরজাটা আস্তে-আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। নির্ভুল

একটা শব্দ হলো—খিল লাগানোর শব্দ। তারপর সুইচ অফ করার শব্দও সে শুনতে পেলো। তারপর, এ-ঘর থেকে দেখলো সে ও-ঘরের অন্ধকার।

অনেক রাতে সুরজিৎ একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখলো যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারছে সে, অথচ খুলছে না দরজা। অশোকাকে ডাকতে যাচ্ছে, গলায় ফুটছে না কোনো স্বর। অথচ স্পষ্ট সে দেখতে পাচ্ছে সে-আগুনের থেকে অশোকা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না।

এমনি একটা আতঙ্কের মধ্যে থেকে তার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলো, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। যাক, আগুন নয়, আলো। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সে ঘুমিয়ে পড়লো।

অন্যদিন ভোরবেলা বারান্দার দিকে খোলা জানলা দিয়ে ডেকে চাকর জাগিয়ে দেয়, আজ সে নিজেই উঠলো, এবং সেটা অপ্রত্যাশিত প্রত্যুষে। মনে পড়লো অশোকার কথা, এবং মনে হতেই নিঃসঙ্কোচে সে পাশের দরজা খুলে বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে পাশের দরজা দিয়ে অশোকার ঘরে ঢুকলো! ঘরে অশোকা নেই, সেটা বেশি আশ্চর্য নয়, কিন্তু খাটজোড়া প্রকাণ্ড বিছানার এতটুকু কোথাও কোঁচকায়নি। সুরজিতের শালখানা ভাঁজ করে ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর রাখা। সুটকেশটিও অন্তর্হিত।

উপরে-নিচে সম্ভব-অসম্ভব কোনো জায়গায়ই অশোকাকে পাওয়া গেল না। সুরজিৎ পথে বেরুলো। আর কোথাও নয়, মেয়ে-ইস্কুলের সেক্রেটারির বাড়িতে। বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'নতুন কোনো মিসট্রেস নেবার কথা হয়নি, আর অশোকা মুখার্জি বলে কারুর ইনটারভিউ দিতে আসার কথা নেই।'

এর পর স্টেশনেও যেতে পারতো—ভোরবেলা জলে-স্থলে দু'দিকের পথই খোলা আছে। অতএব পণ্ডশ্রমের প্রয়োজন নেই মনে করে সুরজিৎ বাড়ি ফিরলো। ফিরে এসে পরখ করে দেখলো দু-ঘরের মাঝখানের দরজা তেমনি অটুট বন্ধ আছে।

বন্ধই যদি আছে, তবে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ঘরে সে আলো দেখলো কেমন করে? সমস্তটাই কি স্বপ্ন?

৩২। স্বাক্ষর

হাঁড়িতে ক'রে মালাই-বরফ বেচে দীননাথ। বাড়ি যশোর।

—'আজকে দু'টো ফিরেছে। ভালো জিনিস, রাবড়ি। নে, খা একটা।' দু'হাতের চেটোতে করে টিনের খোলটা জোরে-জোরে ঘোরাতে লাগল দীননাথ।

'—আর-একটা?'

—'ওটা আমি খাব।'

গ্রীষ্মের রাতে কাঁচা-বস্তির বাঁধানো দাওয়ার উপর বসে দুইজনে বরফ খায়। শাল-পাতার উপর রেখে। চেটে-চেটে, রসিয়ে-রসিয়ে। দেশেগাঁয়ের গল্প করে।

ধামায় করে ডিম বেচে জহুরালি। বাড়ি বরিশাল।

—'মাছ পেয়েছিস আজ?'

—'চিংড়ি মাছের এইটুকু ভাগা চার আনা করে। জন্মের মত ফুরিয়ে গেছে মাছ খাওয়া।'

—'নে, এই দুটো ডিম নে।' দুটো হাঁসের ডিম বাড়িয়ে ধরল জহুরালি। 'নে, ভেঙে ফ্যাল্।'

—'দাম নিবি কত?' দীননাথ বললে সঙ্কুচিতের মত।

—'নে, বকবক করিসনে। সেদিন রাবড়ি-বরফ খাইয়ে দাম নিয়েছিলি?' দুইজন একসঙ্গে হেসে উঠল।

সে-হাসি সারল্যের বাজারে বিনি-পয়সার সওদাগিরি।

পাশাপাশি বস্তিতে তারা থাকে। শুধু তারা নয়, আরো অনেকে। সমাজের যত তলানি। যত নাজেহাল ও নাস্তানাবুদের দল। গরিব আর ছোটলোক।

ছোটলোক। ছোট-ছোট কাজ করে। ছোট করে রাখে জীবনের বৃত্ত। যাতে বড় লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়ে লভা কুড়োতে পারে ভারি-হাতে। যাতে তাদেরকে ঘোরাতে পারে নিজেদের স্বার্থের চক্রবৃদ্ধিতে।

বড়লোক। কথা বলে বড়-বড়। উচ্চ মঞ্চে বসে উচ্চ শব্দে যারা বক্তৃতা দেয়। পুচ্ছের ভারে নিজেদেরকে যারা দূরে সরিয়ে রাখে। ধুলো-কাদা বা ইট-পাটকেল লাগতে দেয় না।

পাশাপাশি থাকে জহুরালি আর দীননাথ। জীবনের কী মানে বা মূল্য কে জানে, তারা আছে নিজেদের ছোট-ছোট সুখ-দুঃখের উপায়-ফিকিরে। কী করে দুমুঠো খাবে, কী করে গা ঢাকবে আস্ত কাপড়ে, কী করে শিয়রে বালিশ নিয়ে ঘুমোবে অঘোর হয়ে। এর বাইরে আর তাদের উত্তাপ নেই, উত্তেজনা নেই, দুটো পয়সা জমাবার ধান্দা দেখে, যাতে একথোকে পাঠাতে পারে কিছু বাড়ি-ঘরে, যাতে-বা একসময় নিজেই তারা বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারে এক ফাঁকে। ততদিন ভিড়ে-ফাঁকায় তারা তাদের গাঁয়ের ছবিটির কথা মনে করে, লক্ষ্মীর মত পরিপাটি ধানখেত, গোপালের মত ঠাণ্ডা নদী আর প্রথম জোয়ারের কুলকুলের মত তাদের শিশুদের কলস্বর। কে জানে কবে ডাক আসে!

পাশাপাশি হাঁটে। জহুরালি সকালে, বিকেলে দীননাথ। কখনো বা একসঙ্গেই দুপুরবেলা, জহুরালির কাঁধে তরকারির ঝাঁকা, দীননাথের কাঁধে ফিতে-কাটা তরল-আলতার চুপড়ি। শহরের এক রাস্তায় না হাঁটুক,

জীবনের এক রাস্তায় হাঁটে। জানে না এ রাস্তা কোথায় তাদের নিয়ে যাবে, কোন রাজধানীতে। তবু তারা হাঁটে, আস্তে-আস্তে এগোয়।

'পানি-গামছা যখন একখানা কিনতেই হবে তখন তোর কাছ থেকেই কিনি। আছে তো তোর কাছে?' বললে জহুরালি।

—'নে, খুব ঘন বুনট।' লাভ নেব না এক পয়সা তোর ঠেঙে। ঠিক কেনা-দরে বেচছি।' বললে দীননাথ।

—'বা, লাভ নিবিনে কেন?'

—'দামের বদলে তোর থেকে যে ডিম-তরকারি নেব। তোর ডিম-তরকারির জন্যে মুনফা মারবি নাকি আমার ঠেঙে?'

দুই বন্ধু একসঙ্গে হেসে উঠল।

সেই হাসির উপর হঠাৎ একদিন দিক-বিদিক হ'তে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর্তনাদের ছুরি। ছিটকিয়ে পড়ল রক্তের পিচকিরি। নিরীহ পথচারীর রক্ত। নিরপরাধের অন্তিম আর্তনাদ।

মুহূর্তে যে কী হয়ে গেল দীননাথ আর জহুরালি কিছু কিনারা করতে পারল না। চোখের সামনে দোকান-দানি পুড়তে লাগল, লুট হতে লাগল। গলি-ঘুঁজির মোড়ে নিরুদ্দেশ পথিকের বুকে-পিঠে ছুরি বসতে লাগল। শান্তিপ্রিয় নিশ্চেষ্ট গৃহস্থের আঙিনা পিছল হয়ে উঠল শিশু-শাবকের রক্তে। কলকাতার রাস্তায় শকুনের পাখসাট।

এ তাকায় ওর মুখের দিকে, ও তাকায় এর। জহুরালি আর দীননাথ। দু'জনের মুখে আর স্নেহ নেই, কোমল নিশ্চিন্ততা নেই। অবিশ্বাসের ছায়া পড়েছে, ফুটে উঠেছে সন্দেহের কুটিলতা। কথার বদলে স্তব্ধতা, হাসির বদলে বিরক্তি।

কী ক'রে যে দুটো মুখের চেহারা বদলে যায় আস্তে-আস্তে তারা নিজেরাও যেন বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে, যখন বিকেলের দিকে তাদের বস্তিতে আগুন ধরে।

বস্তির লোক দু'দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে আসে হন্যে হয়ে। দীননাথ দাঁড়ায় রাস্তার এ-মোড়ে, জহুরালিরা রাস্তার ও-মাথায়। দীননাথের হাতে একখান ইট, জহুরালির হাতে সোডার বোতল।

রশি ফেলে কে মাপবে কতখানি ব্যবধান আজ তাদের মধ্যে?

কী ক'রে যে সম্ভব হচ্ছে কে জানে, দীননাথ ইটের পর ইট ছুঁড়ছে, জহুরালি বোতলের পর বোতল। একে অন্যকে জখম করার জন্যে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ-দলের একটি লোক ঘায়েল হয়, ও-দল হাঁকার দেয়; ও-দলের কেউ চোট খায়, এ-দল হুমকে ওঠে। যদি জহুরালি মরে তবে বোধহয় দীননাথ লাফায় আর দীননাথ মরলে জহুরালি নাচে।

বন্যার তোড়ে খড়কুটার মত ভাসছে তারা। হননের বন্যা।

দু'দল আরো ভারি হয়ে উঠল। যোগ দিল আরো নতুন সৈন্যসামন্ত।

দেখা দিল আরো অস্ত্রশস্ত্র। কত পড়ল, কত মরল, কত পালাল কে তার হিসেব রাখে।

সন্ধে গড়িয়ে গেছে, যুদ্ধ তবু থামেনা। কখন এ-দল এগোয় কখন ও-দল হটে। মৃতের স্তূপে হোঁচট খেতে হচ্ছে, পা হড়কে যাচ্ছে রক্তের কর্দমে।

এমন সময় সাঁজোয়া গাড়ি এল একখানা। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল শূন্যে। নিমেষে জনতা ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেল, অতলে-বিতলে পালাতে লাগল প্রাণ-পণে। আমাদের দীননাথ জহুরালি কোন দিকে ভেসে গেল কেউ জানতে পারল না।

কে কার খোঁজ করে!

মিলিটারি টহল দিচ্ছে ভারি-পায়ে। গুণ্ডা দেখতে পাচ্ছে তো গুলি ছুঁড়ছে। গ্রেপ্তার করছে। খানিক আগে যেখানে ছিল সাহসের হুঙ্কার, সেখানে এখন আতঙ্কের স্তব্ধতা।

ফাঁক বুঝে একটা অগ্নিদগ্ধ পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে দুটো লোক ঢুকে পড়ল চুপি-চুপি। এমনি অনেকে লুকোচ্ছে; তাদের মধ্যে এরাও দু'জন। একদলের লোক। দোতলার সিঁড়ির নিচে বসেছে ঘন হয়ে। সদর দরজাটা খোলা, কিন্তু যেখানে তারা লুকিয়েছে সেখানটা অন্ধকার। বুঝতে পারবে না তাদেরকে। সদর দরজা দিয়ে গুলি ছুঁড়লেও লাগবে না তাদের গায়।

সামনে দিয়ে ভারি-পায়ের বুটের শব্দ হচ্ছে। বুটের নিচেকার লোহার শব্দ। টহলদারি করছে সৈন্যরা।

ভয়ে কুঁকড়ে আরো ঘন হয়ে বসল দুজনে।

'গেছে?'

রুদ্ধ নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে আরেকজন বললে, 'গেছে।'

দু'জনেরই বড় অস্ফুট শব্দ। ক্ষণিক নিশ্চিন্ততা এলেও কেউ কারু সান্নিধ্যের উত্তাপ থেকে সরে যেতে রাজি নয়।

—'আমরা কি এগোচ্ছি?' যেন এখনো যুদ্ধ হচ্ছে এমনি নেশার ঝোঁকে জিগগেস করল একজন।

—'এগোচ্ছে বৈ কি।' যুদ্ধের খতেন করছে এমনিভাবে বললে আরেকজন। শুধু মুখ দেখেই চেনা যায় না, অন্ধকারে কণ্ঠস্বর শুনেও চেনা যায়। জহুরালি দীননাথকে আর দীননাথ জহুরালিকে চিনতে পারল।

এ কি, তারা এক দলের লোক নয়?

দীননাথ বললে, 'তোর চোট লেগেছে কোথায়?'

—'মাথায়, বুকে। তোর?'

—'আমারো।'

—'তোর কাছে দিয়াশলাই আছে?'

—'আছে। তোর কাছে বিড়ি?' আনন্দে উজ্জ্বল হল জহুরালির কণ্ঠ।

বিড়ি ধরাল দীননাথ। কয়েক টান দিয়ে চালান করলে জহুরালিকে।

আবার দু'টান পর দীননাথ। আবার এক-টান পর জহুরালি।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছে তারা। হয়েছে অনেক রক্তক্ষয়।

—'ঐ, ঐ আসছে।'

বিড়িটা হাতের চেটোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলল জহুরালি। যাতে এক কণা আলোও না বাইরের লোকের চোখে পড়ে। জীবনের আভাসটুকুও যাতে মুছে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে।

পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে কুঁকড়িসুঁকড়ি হয়ে বসেছে দু'জনে। দু'জনের শরীর একই যন্ত্রণায় ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

বাঁধানো রাস্তার উপরে বাজছে লোহা-বসানো ভারি-বুটের শব্দ। খট্ খট্ খট্।

বিড়িটা নিবে গিয়েছিল। ধরালো জহুরালি।

তিন আঙুলের মাথা একড় করে বিড়িটাকে ঘুরিয়ে ধরে শেষ টান দিল দীননাথ।

আগুনের অক্ষরে এক সন্ধিপত্রে তারা স্বাক্ষর করলে।

আবার এগুচ্ছে বুটের শব্দ।

খট্ খট্ খট্।

৩৩। জানলা

ভীষণ শব্দে জানলাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ঝড় উঠেছে নাকি? না, ঝড় কোথায়? দিব্যি মোলায়েম চুপচাপ চারদিকে। তেমন একটা ভারি গাড়িটাড়িও তো যায় নি রাস্তা দিয়ে। একটা বোমা-টোমা ফাটবার মতও কিছু হয় নি।

এ ঠিক জানলা বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়, এ সজোরে জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া, ওপার থেকে জানলার পাল্লা দুটো এপারের দিকে ছুঁড়ে মারা। একটা বন্দুক ছুঁড়তে পারে নি বলেই যেন জানলাটা ছুঁড়ে মেরেছে।

জানলার কাঠ দুটো ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে মাঝখানে একটা ফাঁক রেখে দাঁড়িয়েছে স্তব্ধ হয়ে। যদি জানলা বন্ধ করাই উদ্দেশ্য হত তা হলে এখনকার এই ফাঁকটা রাখত না জীইয়ে।

এ যেন একটা ধিক্কার ছুঁড়ে মারা। যূথিকা গম্ভীর হয়ে গেল।

উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখল, সামনের ঘরে জয়ার কাণ্ড। রণদীপ্ত মুখে রাগ যেন গরগর করছে। জানলাটা ছুঁড়ে দিয়েই সরে গেছে আলগা হয়ে। যেন, তোমার মুখ দেখব না, তোমার মুখ দেখাও পাপ, এই রকম বলা

ধমক দিয়ে। তোমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া উচিত, যেন এমনি একটা রূঢ় তর্জন।

কার উপর এই নিক্ষেপ?

যূথিকা তাকিয়ে দেখল, চেয়ারে-বসা বিভাস কি-একটা বই দেখছে নিচু চোখে। নির্লিপ্ত শৈথিল্যে।

যেন এত বড় সশব্দ অভদ্রতা চোখ তুলে চেয়ে দেখবার মত নয়। রাস্তায় হামেশা কত ঠোকাঠুকির শব্দ হয়, মোটরের কত টায়ার ফাটে, এ যেন তেমনি। ত্রস্তব্যস্ত হবার কিছু নেই।

এই তো সবে এরা পা দিয়েছে এ বাড়িতে, ও-পাশের ঘরে মেসো-মশায়ের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে বিস্তৃত হয়ে বসেছে এ-ঘরে, এ-ঘরে এখনও প্রচলিত অতিথি সৎকার হয় নি, মাসিমা হয়তো তাই জোগাড় করছেন রান্নাঘরে, জয়ারই তাতে হাত লাগানো উচিত, কিন্তু, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ছুটে এসে মুখোমুখি উল্টো ঘর থেকে এমনি প্রচণ্ড শব্দে জানলা ছুঁড়ে মারার মানে কি?

বুকের ভিতরটা কালো হয়ে উঠল যূথিকার।

বিভাসকে লক্ষ্য করে বললে, 'এবার যাবে?'

বইয়ের থেকে চমকে উঠল বিভাস। বললে, 'মন্দ কি?'

ও-ঘর থেকে সুশীলবাবু তেড়ে এলেন : 'সে কি কথা! এইতো এলে!'

রান্নাঘর থেকে মাসিমা বলে উঠল : 'যাস নে, আমি চা করে আনছি।'

জয়া একটাও কথা বললে না।

হাসিতে-খুশিতে ঝলমল মেয়েটা। এ সময় ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত বাড়িয়ে তার পথ আটকাবার কথা। কিন্তু কেমন যেন অন্য রকম। গম্ভীর-গম্ভীর। প্রায় বিখণ্ডিনী মূর্তি।

কালই তো তাদের বাড়ি গিয়েছিল জয়া। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কত হৈ চৈ করেছে, ছাদে-বারান্দায় কত শিথিল সরল ছুটোছুটি। নবীন নিবিড় মেয়েটা, জল-ভরা ঘট, কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছে একদিনে। শরীরের খেলায় যে খোলা ছুরির ঝলক ছিল, তা যেন লোপাট হয়ে গিয়েছে। চোখে কালো জ্বালার ধার।

একদিনে কী এমন হতে পারে ব্যাপার?

কাল জয়াকে বাড়ি ফিরিয়ে দেবার সময় বিভাস কি ছিল গাড়িতে?

সমস্ত ভাবনা জুড়ে মেঘ করে এল যূথিকার। কাল শনিবার ছিল। যূথিকা ফিরেছিল বিকেল তিনটেয়। বিভাস পাঁচটায়। জয়ারা এসেছিল সন্ধ্যের দিকে। না, জয়ারা কোথায়—জয়া একাই এসেছিল—ও এখন বেশ একা-একা চলতে-ফিরতে পারে—কিন্তু দাঁড়াও, গেল কখন?

কি আশ্চর্য, কালকের মাত্র ব্যাপার, চব্বিশ ঘণ্টাও হয় নি, অথচ ঠিক-ঠিক কিছু মনে করতে পারছে না যূথিকা। আজকাল কিছুই সে তেমন

মনে রাখতে পারে না। সব ঢালা-উপুড় হয়ে যাচ্ছে। তার বয়স বাড়ছে। সে বুড়ো হচ্ছে।

দাঁড়াও, হ্যাঁ, উনি বাড়ি ছিলেন যখন জয়া এল। কিন্তু, যখন গেল? হ্যাঁ, গাড়ি বেরুল গারাজ থেকে। জয়া উঠল, ঠিকই তো উনিও উঠলেন। হ্যাঁ, না, ঠিক, উনি তো ড্রাইভারের পাশে বসলেন না, ভিতরেই বসলেন। বুকটা দুরদুর করতে লাগল যূথিকার।

তারপর গাড়িটা ছাড়ল।

না, না, ছাড়বে কি! যূথিকা যাবে না? ও অমনি ছেড়ে দেবে?

হ্যাঁ, যূথিকাও উঠল। জয়া ওঠবার পরেই যূথিকা। যূথিকা বসল মাঝখানে, বিভাস আর জয়াকে বিভক্ত করে।

উনি ড্রাইভারের পাশে বসলেন না কেন মেয়েদের একলা ছেড়ে দিয়ে?

ও! ড্রাইভারের পাশে চাকর বসেছিল।

হ্যাঁ, জয়াকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল বাজার করতে। বলে গেল, কাল যাব তোমাদের বাড়ি। কই, না করল না তো!

না, গাড়িতে কিছু হয় নি। তবে, বাড়িতে? বাড়িতেই বা সময় কতটুকু? তেমন ফাঁক কোথায়? কোথায় তেমন নিরিবিলি?

তবে কি কালকের আগের কোনো ঘটনা? আগের ঘটনা হলে কাল ও যায় কেন? সারাক্ষণ কেন উল্লাস-বিলাসের ঢেউ তোলে? সোনার পাখা মেলে কেন ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায়?

কই, কাল তো ছিল না এমন রুক্ষরোষের চেহারা। বরং ফুল্লমল্লিকার মুখ করে ছিল!

চা আর মিষ্টি নিয়ে এল মাসিমা।

তবু তাই নিয়ে বিভাসকে ব্যাপৃত রাখতে পেরে যূথিকা একটু নিশ্চিন্ত হল। 'কই, জয়া কোথায়, এত আমি খাব কি করে?' বলতে-বলতে জয়ার সন্ধানে এগুলো।

দু' পা দূরেই এক চিলতে রান্নাঘর। দেখল জয়া গুম হয়ে বসে আছে এককোণে।

'এই যে তুমি এখানে। আমি এত খাব কি! এস তুমিও একটু হাত লাগাও।'

উঠে দাঁড়াল জয়া। একবার একটু-বা দেখল সজাগ হয়ে পিছনে আর কেউ আছে কিনা। না, আর কেউ নেই। স্বস্তিতে হাসল জয়া। বললে, 'সামান্য জিনিস, এর আবার ভাগাভাগি কি।'

পিড়াপিড়ি করল না যূথিকা। একটু ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলে, 'শরীর কেমন আছে?'

'ভালো।'

'মন-মেজাজ?'

'ভালো নয়।'

'কেন কী হয়েছে?' স্বর নামিয়ে কাছে একটু টানতে চাইল যূথিকা।

'জানি না।' জয়া চোখ নিচু করল। পরে কী ভেবে মুখে একটু শীর্ণ হাসি টেনে বললে, 'মেজাজের কি কিছু ঠিক আছে?'

যূথিকা স্বর এবার গোপনের ঘরে নিয়ে এল। বললে, 'তখন জানলাটা আমাদের মুখের উপর অমন ছুঁড়ে মেরে বন্ধ করলে কেন?'

'আপনাদের মুখের উপর? কই, কখন?' ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল জয়া। এর আবার মোকাবিলা হয় নাকি?

'সে কি, এই তো খানিক আগে। আমরা, আমি আর উনি, ওদিকের ঘরটায় বসে, আর তুমি মুখোমুখি ঘরটাতে দাঁড়িয়ে। জানলার পাল্লা তোমার দিকে। হঠাৎ তুমি তোমার দিকে থেকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে জানলাটা—'

একটু জোরে হাসতে চেষ্টা করল জয়া। বললে, 'শব্দ করে বন্ধ করলাম।'

'হ্যাঁ, তাই। তাই-বা কেন?'

'বাঃ, জানলার উপরে দেওয়ালে একটা টিকটিকি ছিল, সেটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।' হাসির ঢল নামাতে চাইল জয়া। কিন্তু কোথায় কোন কুন্ঠা না কষ্টের পাথরে আটকে গেল জল।

যূথিকার মন খোলসা হল না।

দুজনে চলে যাচ্ছে, সুশীলবাবু আবার কেঁদে পড়লেন। 'যদি মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারো। তোমাদের কাছে আর নতুন কী বলব। পেনসন নিয়েছি, মাইনের আদ্ধেকের চেয়েও কম। শাঁসালো বড় ছেলেটা মারা গেল, ছোট দুটো সামান্য তেলে টিমটিম করছে। বাপ-মরা ভাইঝিটা ছিল মামাদের কাছে, মফঃস্বলে। দু-দুবার আই-এ ফেল করল, মা চোখ বুজল, মামারা সুযোগ বুঝে বললে, আর টানতে পারব না জের, বিয়ে দিয়ে দিন। এখানে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে। বিয়ে যেন হাতের মোয়া। চুড়োর উপরে ময়ূরপাখা—গায়ের রঙখানা তো দেখেছ। একটা কোথাও যদি তাই চাকরি জুটিয়ে দিতে পার। মেয়েও গোঁ ধরেছে, চাকরি করবে, দাঁড়াবে নিজের পায়ে। ফেল-করার লজ্জা, অমনোনীত হবার লজ্জা, মুছে ফেলবে রোজগার দিয়ে। তোমরা দুজন আছ, তোমরা যদি কোথাও না ব্যবস্থা করে দাও—'

'স্টেনোগ্রাফি তো শিখছে।' বললে যূথিকা।

'তা শিখছে। কিন্তু কত দিনে তৈরি হবে, তা কে বলবে। শিখছে শিখুক, ততদিন সঙ্গে-সঙ্গে কিছু একটা চাকরি। ছোটখাটো, যেমন-তেমন—কোন আফিস-টাফিস—কত তো তোমাদের চেনা।'

'দেখি।' যূথিকা আবার এক-নজর দেখল জয়াকে।

রঙ কালো বটে, কিন্তু কেমন একটা আলো-আলো ভাব। যেন নতুন ধানের খোরে শরতের সোনা ভরা। সবুজ-সজীব।

কয়েক মাস পিচের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে শরীর একটু শুকনো-শুকনো

হয়েছে কিন্তু টান-টান তাজা ভাবটা একটুও ঝিমিয়ে পড়ে নি। যে নীল-নীল আকাশভরা নরম রোদ এনেছিল গাঁ থেকে তার আভাস এখনও গায়ে মাখা।

'দেখি, চেষ্টা ত করছি।' নতুন আশ্বাস দিল বিভাস।

'মেয়েদের চাকরি! শুনতেই সুন্দর, নইলে একশো গণ্ডা ঝামেলা।' যূথিকা বিরক্তির ঝাঁজ আনল গলায় : 'ট্রামে-বাসে ওঠা মানে নরককুণ্ডে ঝাঁপ মারা। তারপর আফিস ত নয়, পশুশালা। অন্যমনস্ক হয়ে, একটু নিজের মনে বসে কাজ করবার জো আছে? তার পর একেকজন বস্ যা আছেন—'

'উপায় কি।' বললেন সুশীলবাবু, 'যুগের সঙ্গে চলতে হবে মানিয়ে। যেমন গলি তেমন চলি—'

বাড়ি ফিরে এসে স্বামীকে একলা পেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল যূথিকা : 'মেয়েটা কি রকম বেয়াদব দেখেছ?'

কোন মেয়েটা জানবার দরকার নেই, তবু গোড়াতেই একেবারে লাফিয়ে ওঠা যায় না, তাই ঠাণ্ডা চোখে বিভাস বললে, 'কেন কী করল?'

'ন্যাকামি করো না। ওই যে তখন আমাদের মুখের উপর বন্ধ করে দিল জানলা!'

'মেয়েরা কখন কী করবে, হাসবে না কাঁদবে, কেউ বলতে পারে খড়ি পেতে?'

'বলল কিনা, একটা টিকটিকি ছিল, তাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।' চোখে চোখ রাখল যূথিকা : 'তুমি কি টিকটিকি?'

'বা, আমি টিকটিকি হতে যাব কেন?' ফ্যাকাশে মুখ করল বিভাস।

'তুমি ছাড়া আর কে। তোমাকে লক্ষ্য করেই ও জানলাটা ছুঁড়ে মেরেছে। তাতে আর সন্দেহ কি।' চোখের কোণে ক্রুদ্ধ শর পুরল যূথিকা : 'ওর সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেছ?'

'তার মানে?' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াবার মতন করে বললে বিভাস।

'তার মানে, কোনো দুশ্চেষ্টা—'

'ও কিছু বলেছে?'

'জিগগেস করিনি এখনও।'

'জিগগেস করলেই পারো।'

'নইলে ওর এত চটবার কারণ কি। বলা যায় না কখন কি খেয়ালের বশে কী করে ফেল আচমকা। সন্নেসী আছ, কি দেখে ফট্ করে হঠাৎ বিলাসী হয়ে ওঠ।'

'তোমার রাজত্বে বাস করে কি আর বিলাসী হবার যো আছে!' একটা ম্লান শ্বাস বেরিয়ে এল বিভাসের মুখ দিয়ে।

আলোতে কপালের কাছেকার দুটো পাকা চুল যেন আরও চকচক করে উঠেছে। যূথিকা কাছে গিয়ে চুল দুটো তুলে ফেলল। আর, একবার কটা তুললে আরও কটার জন্যে আঙুল নিসপিস করে।

সন্দেহ কি, স্বামীকে যূথিকা কড়া শাসনে সন্নেসী করে রেখেছে।

নইলে আর শান্তিতে সংসার করতে হত না। যে জানলায় প্রতিবেশী আছে সে জানলায় দাঁড়াতে পায় না। রাস্তায় বেরুলে ছাড়পত্র নেই, কোনো চলন্ত দীপশিখার উপর দৃষ্টিটা স্থির করে। না, বিভাসের একটাও কোনো মেয়ে-বন্ধু নেই। এমন কেউ নেই যার কাছে একটু শ্রীমান হয়ে বসতে পারে, নিজের কানে শোনে নি এমনি মোলায়েম সুরে বলতে পারে কথা। যা দু-একজন অনাত্মীয় আলাপী মেয়ে আছে, তাও ক্লাবের মেম্বার হবে, আর সেই ক্লাবে যূথিকাও তার সহযাত্রী। এমন কেউ নেই যে, কাগজে-কালিতে না হোক, রঙিন ভাষায় একটা আধটা চিঠি লেখে—তেমন যদি নাকের ডগায় গন্ধ লাগে নিজেই চিঠির মোড়ক খুলে ফেলে যূথিকা। যদি তেমন কেউ বাড়িতে দেখা করতে আসে, যূথিকাই গায়ে পড়ে আগে থেকে তার ভার নেয়। আলাপের পরিধি-পরিমিতি তদারক করে। মোট কথা, সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশ্যে-নেপথ্যে, অনৈক্যে-আধিক্যে, নিজেকেই সে করে রেখেছে একচ্ছত্রী। এই ত ভদ্র, প্রৌঢ় জীবনের নিয়ম-নিয়তি। নিজের কক্ষে সুষম ছন্দে এখন শুধু পাক-খাওয়া। যজ্ঞের ষাঁড় আর এখন হাল টানবে কি!

বিভাসের জীবন দেয়াল দিয়ে নিরেট গেঁথে দিয়েছে যূথিকা, জানলা খুলে রাখে নি একটাও। গানের মধ্যে রাখে নি একটুও মিশ্ররাগের অবকাশ। তুমি এখন সাংখ্যের পুরুষের মত উদাসীন থাকো আর আমি ধাত্রীভাবে দেখি-শুনি তোমাকে।

এই এখন শান্ত শালীন সুস্থ অবস্থান।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের মুখটার উপর হঠাৎ নজর পড়ল যূথিকার। মনে হল আগন্তুক কে এক মহিলা বিনানুমতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। চমকে উঠবে কিনা ভাবছিল, কিন্তু না, এ তো সে নিজে। সে নিজে? তা ছাড়া আর কে। বিভাসের জীবনের রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী। আনন্দের মূল স্পন্দ।

মাথায় চুল উঠে গিয়ে টাক-পড়ার মত হয়েছে। কটা দাঁত নড়তে-নড়তে এগিয়ে এসেছে মাড়ি ছেড়ে। গাল দুটো ভেঙে গিয়ে মুখের মাংস ঝুলিয়ে দিয়েছে। থলে জাগছে চোখের কোলে। দেহের উপর-নিচে কোথাও আর নেই বর্ত্তাভাস।

কিন্তু বিভাস পঞ্চাশ পেরোলেও এখনও কেমন ঋজু ও প্রশস্ত। বর্ণ ও বল, সুর ও ছন্দ, গতি ও যতি সমান প্রস্ফুট। কোথাও বিরূপ বক্রতা নেই, দৌর্বল্যশৈথিল্য নেই। তবু সব ফুরিয়ে-ফেলা নিঃস্বের মত বসে আছে দেখাচ্ছে। চলে যাচ্ছে যাক এমনি স্পৃহাহীন স্বাদহীন তরঙ্গহীন স্রোতে গা ভাসিয়েছে। জীবনে গাঢ়তা ও গূঢ়তা যে রস দিতে পারে যূথিকার সঙ্গে আপোস করতে গিয়ে তাই যেন খুইয়ে এসেছে। শুধু শমিত নয়, স্তিমিত। রাত্রি যূথিকার কাছে একতাল কালো ঘুম, কিন্তু বিভাসের কাছে এখনও হয়তো রহস্য-হংসী। সে হাঁস আর বুঝি ডিম দেয় না।

কেমন ক্ষীণশ্বাস ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে বিভাসকে।

'যাই বলো মেয়েটার কী স্পর্ধা, গুরুজন বলে একটুও মান্য নেই।' রাগে রি-রি করে উঠল যূথিকা।

'মেয়েদের মতিগতির মাথামুণ্ডু কিছু আছে নাকি?' সহজে নিশ্বাস ফেলল বিভাস।

'সাদামাঠা মেয়ে, দুরবস্থার সংসারে এসে উঠেছিস—' আক্ষেপের সুরে বলতে লাগল যূথিকা : 'আমরা তোর মুরুব্বি, একটা সুরাহা কোথাও করতে পারি কি না তাই দেখছি, আর তুই কি না আমাদেরই মুখের উপর—'

'মেয়েদের রাস্তায় কোনো ট্রাফিক-লাইট নেই, লেফট-রাইট নেই। কখন গলবে কখন জ্বলবে, দেবতা দূরের কথা, দানবেও বলতে পারে না।'

গলতে-গলতে যূথিকাই হঠাৎ জ্বলে উঠল : 'কিন্তু, সত্যি বলো না, কী হয়েছে!'

'বা, কিছু হলে তো বলব!'

'নইলে শুধু-শুধু জানলা ছোঁড়ে?' কটাক্ষ আবার সূক্ষ্ম করল যূথিকা।

'স্থলে-জলে-আকাশে কত কি ছুঁড়ছে মানুষে—চুপ করে যাও।' কাগজ তুলে নিল বিভাস। মুখ ঢাকলো।

মুখ ঢেকে চুপ করে থাকবার মেয়ে নয় যূথিকা। পরদিন সকাল-সকাল ফিরল আফিস থেকে। বাড়ি না গিয়ে গেল মাসিমাদের ওখানে।

জয়া শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, তাকে নিয়ে এল নিভৃতিতে। দরজা বন্ধ করে দিল।

'কী হয়েছিল সত্যি করে আমাকে বলো।'

জয়ার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আমার সব জানা দরকার। যদি কোথাও অন্যায় বা অসঙ্গত কিছু হয়ে থাকে তার সুষ্ঠু প্রতিকার করতেই হবে। তুমি কুমারী মেয়ে, কোনো বিপদের ঝুঁকি তুমি নিতে পারো না। বললে আমার সংসারে কোনো ভাঙন ধরবে এ ভয় তুমি করো না। বরং বাড়তে-বাড়তে পাপ যদি প্রলয়ের মূর্তি ধরে, তখন দশ দিকের কোনো দিকই সামলানো যাবে না। তোমাকে বলছি, কাপড় দিয়ে আগুন ঢেকে রাখা যায় না, অধর্ম বা অন্যায় কিছুই গোপন করবার নয়।'

ঘেমে নেয়ে উঠল জয়া। যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, বলো, ভয় নেই।'

'কত দিনই তো গিয়েছি, সেদিনও গিয়েছিলাম আপনাদের বাড়ি, সন্ধ্যাবেলা, একলা—' বলতে লাগল জয়া, 'ছাদে রেলিঙ ধরে নিরালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'আমি ছিলুম কোথায়?'

'বাথরুমে।'

'হ্যাঁ—তার পর?'

'উনি হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালেন।'

'উনি মানে—

'বিভাসবাবু।'

'হ্যাঁ, দাঁড়ালেন—'

'হ্যাঁ, গা ঘেঁসে। আমার হাত ধরলেন। আর কানের কাছে মুখ এনে—'

'কি, চুমু খেলেন?'

এত যন্ত্রণাতেও হাসল জয়া। বললে, 'না। অতদূর নয়। শুধু তাঁর নিশ্বাসটা গালের উপর পড়ল।'

'শুধু নিশ্বাসটা?'

'হ্যাঁ, আর বললেন, তুমি ভারি মিষ্টি মেয়ে। তোমাকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। তোমার কখনো করবে আমাকে? কি, করবে?'

'তা তুমি কী বললে?'

'আমি একটা ঝটকা মেরে তাঁর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বললাম, ছিঃ, আপনি সম্ভ্রান্ত বিবাহিত পুরুষ, এ আপনার কী ব্যবহার! পালিয়ে চলে গেলাম ঘরের মধ্যে।'

যূথিকার মুখে কথা নেই। তাকে চুপ করে যেতে দেখে ভয় পেল জয়া। ব্যাকুল হয়ে বললে, 'বলে খুব অন্যায় করলাম। তাই না? কী দরকার ছিল বলবার! আপনি এত পিড়াপিড়ি করছিলেন—'

'না, বলে ভাল করেছ। শোনো—' যূথিকা অভিভাবিকার সুরে বললে, 'তুমি আর আমাদের বাড়ি যেয়ো না।'

'যাব না।' মুখ নিচু করল জয়া।

'আর ওঁকেও বারণ করে দেব যেন এ বাড়ি না আসেন।'

'উনি আর আসেন কই?'

'বলা যায় না। দগ্ধ মাঠ হয়ে গিয়েছেন তো, একটা সবুজ ঘাসের ডগার জন্যে আঁকুপাঁকু করছেন—'

'বেশ তো বারণ করে দেবেন।' পরে আকুল মিনতিমাখা সুরে বললে, 'কিন্তু আমাকে যা-হোক একটা চাকরি জুটিয়ে দিন, যূথিকাদি। একটা চাকরি পেলেই আমি বেঁচে যাই, ছাড়া পেয়ে যাই—'

'দেখি।' গম্ভীরমুখে যূথিকা বললে, 'আমাদের ড্রাফটিং ডিপার্টমেন্টে ক-জন কপিস্ট নেবে। তুমি একটা দরখাস্ত করে দিয়ো। কপিংয়ের কাজ করতে পারবে নিশ্চয়—'

'খুব পারব।' উৎসাহে নেচে উঠল জয়া : 'তার পর চাকরি করতে করতে স্টেনোগ্রাফিটা পাস করে নিতে পারলে—'

'তখন তো লেডি-টাইপিস্ট, খোদ বস্-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি—'

কি বুঝল কে জানে, হাসল জয়া।

চাকরি জোগাড় করে আনল যূথিকা। গোড়ায় মাইনে কম, তা হোক—

এই দেখ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। পড়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না জয়া। ছোটখাট একটা ইন্টারভিয়ুও হল না? কপিস্টের আবার ইন্টারভিয়ু! দরখাস্তের হাতের লেখা দেখেই নির্বাচন। সস্ত্রীক সুশীলবাবু আশীর্বাদ করতে লাগলেন যূথিকাকে। জয়া সমস্ত শরীরে মুক্তির নিশ্বাস ফেলল।

এর আর ইন্টারভিয়ু হয় না। ডিপার্টমেন্টের বস্-এর সঙ্গে দেখা করে ডিউটি বুঝে নিয়ে কাজে লেগে গেলেই হল।

'আপনি নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।' আবদারের গলায় বললে জয়া।

'হ্যাঁ, আমিই তো নিয়ে যাব। আর শোনো', একটু ঘন হল যূথিকা : 'বেশ ছিমছাম ফিটফাট থাকবে। ঝিকমিক ঝিকমিক করবে। চট করে বস্-এর যাতে সুনজরে পড়ে যাও। যস্মিন দেশে যদাচারঃ। যেমন রেওয়াজ তেমনি আওয়াজ। চাকরি করতে আসাই উন্নতির জন্যে। উন্নতি মানেই উপরওয়ালার নেকনজর।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, সাধ্যমত। এ সব অফিসের এটিকেটই অন্যরকম। বস্-এর সঙ্গে ফ্রেন্ডলি হওয়া দরকার।'

'ফ্রেন্ডলি?' ভুরু কুঁচকোল জয়া।

'হ্যাঁ, হয়ত একটু মোটরে করে বেড়ানো, বাইরে কোথাও একটু খাওয়া, সিনেমা দেখা, কেনাকাটা করা, ছোটখাটো প্রেজেন্ট নেওয়া— এই একটু সাহচর্য, একটু বা প্রেম-প্রেম খেলা—'

'এই বুঝি রীতি?'

'হ্যাঁ, যেমন ব্রতে যেমন কথা। তা না হলে দেখবে নিচের লোক প্রমোশন পেয়ে গেছে আর তুমি পিছনে পড়ে আছ।'

'আপনাকেও অমনি করতে হয়েছে উন্নতির জন্যে?' দ্বিধা করল না জয়া।

'নিশ্চয়। এবং আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ হয়তো বেশি। পুরুষ মানেই ক্লান্ত, অপূর্ণ, বাড়ির বাইরে একটু বাগান চায়, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটু বা চুটকি রচনা। ঠিক উড়তে না চাইলেও হয়তো বা একটু ফুরফুর করতে চায়। তারই জন্যে এক চিলতে আকাশ হওয়া, একফালি মাঠ হওয়া—'

'বুঝেছি।' অচঞ্চল চোখে বললে জয়া, 'দরকার হলে শিখে নেব, জেনে নেব আপনার কাছে।'

'এ আর শেখবার-জানবার কি। মানে আর কিছু নয় একটু চালাক হওয়া। ইংরিজিতে যাকে বলে ট্যাক্টফুল হওয়া। বিতরণ নয়, একটু বিকিরণ করা। আঁটসাঁট কঞ্জুস সংস্কারগুলো একটু ঢিলে করে দেওয়া।' যেন মাস্টার উপদেশ দিচ্ছে এমনি ভাব যূথিকার : 'জল ছুঁক ক্ষতি নেই, মাছ ধরতে না চাইলেই হল—'

চালাক-চালাক চোখে তাকাল জয়া। বললে, 'কিন্তু যদি মাছ ধরবার জন্যে হাত বাড়ায়?'

'তোমার জানলা নেই? পেপার-ওয়েট নেই? হাতে কব্জি নেই? আর আমি? আমি নেই?'

শব্দ করে হেসে উঠল জয়া।

'নিজে সাবধান থাকলেই জগৎ সাবধান। তার মধ্যে যদি হালকা কটা তুলির টানে একটা মরা রঙকে জাগিয়ে দিতে পারি তো মন্দ কি।'

এখানে লিফট ওখানে সিঁড়ি, ঘরে-বারান্দায় প্রকাণ্ড অফিস। জয়াকে সাজিয়েগুছিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল যূথিকা। এখানে-ওখানে কয়েকটা মেয়ে বসছে কাজ করতে। মাথার উপরে রেফের মত দু-একটা বা হাঁটছে বারান্দায়।

ডিপার্টমেন্টের বস্-এর অফিসরুমের বাইরে দাঁড়াল দুজন। জয়ার বুক দুরদুর করতে লাগল।

যূথিকা বললে, 'ভয় কি। ঢুকে পড়ো। একটু মিষ্টি হেসে নিজেকে ইন্ট্রডিউস করো, তারপর কি ডিউটি আজ এসাইন করলেন জেনে নাও। যদি একটু বা আলাপ করতে চান একটু অপেক্ষা করো।'

সাহসে ভর করে ঢুকে পড়ল জয়া।

'বোসো।' বিভাস বললে।

জয়া ধুলোপড়া সাপের মত স্থির হয়ে রইল খানিকক্ষণ। পরে বসল আচ্ছন্নের মত। একপাশে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

'গোড়ায় এই কটা চিঠি নকল করতে হবে। পর-পর সাজানো আছে ফাইলে। হালকা কাজ। হ্যাঁ, শুরুতেই আগে জিগগেস করে নি।' মুখ তুলে পষ্টাপষ্টি তাকাল বিভাস : 'কি, কাজ করবে তো এখানে?'

যে রাত্রি, সেই আবার মুখ ফিরিয়ে—দিন।

মুখ ফেরালো জয়া। হাসিমুখে বললে, 'করব।'

৩৪। সাহেবের মা

'তোমার নাম কী?'

'সাহেবের মা।'

নাম শুনে সুমারনবীশ একটু চমকাল বোধহয়। বোধহয় বা চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে। ঘর-দোরের সঙ্গে।

এখন আর অবিশ্যি ঘর নেই। সমস্ত বেড়াটাই এখন দরজা হয়ে গেছে। দাব্বার উপর আছে একটু চালের অবশেষ। বাঁশের দুটো খুঁটি আছে এখনো আঁট হয়ে। একটাতে ঠেস দিয়ে বসে আছে সাহেবের মা। বুড়ি আধ-পাগলা। হাতের কাছে একটা শুকনো শূন্য বাটি।

'কে আছে তোমার?'

'কেউ না।'

'কে ছিল?'

'তিন ছেলে ছিল। আর ছিল আল্লা।'
'কেউ নেই?'
'কেউ না।'
অমূল্য থামল। বললে, 'গেল কিসে?'
'তিনটেই খেয়ে।'
'খেয়ে?'
'হ্যাঁ, অখাদ্য খেয়ে। ঘাস-পাতা ছাতা-মাথা খেয়ে। এখানে-ওখানে যেখানে যা পেয়েছে তাই পেটে ঢুকিয়ে। শত্তুরদের পেটে কী যে দস্যু খিদে ছিল—'
'শেষ পর্যন্ত তো কলেরাতেই মারা গেল—'
'তাই লেখ। ওরা যখন নেই তখন কে বলতে আসছে কিসে ওরা গেল?'
'কিন্তু আল্লা গেল কোথায়?'
'সে গেছে তোমাদের পকেটে। কোঠাবাড়িতে।'
অমূল্য হাসল। বললে, 'কি করে খাও এখন?'
পা দিয়ে বাটিটা ঠেলে দিয়ে বললে সাহেবের মা. 'ভিক্ষে করে।'
'শোনো। যার জন্যে আমি এসেছি—'
এই পাশের গাঁ, ডুমুরতলায় একটা তাঁতখানা বসেছে, সঙ্গে আছে চাঁচ-বাঁখারির কাজ, তালবেতে মোড়া-চেয়ার টুকরি-টুপি বানানো। কি হবে ভিক্ষে করে? তুমিও এসো না, কাজ করবে আমাদের সঙ্গে।
আঙুলের গাঁটে-গাঁটে চামড়া আছে কুঁচকে। বুড়ি বললে, 'আমি কী কাজ করব?'
'কেন, কাগজের ঠোঙা বানাবে। শিখিয়ে দেব আমরা। খাওয়া পাবে মাগনা। আর রোজ পয়সা পাবে ছ'আনা করে।'
সাহেবের মা জগৎসংসারকে বিশ্বাস করিতে চাইল না। খাওয়া, খাওয়ার উপরে আবার ছ'আনা পয়সা!
'হ্যাঁ, পয়সা দিয়ে আবার তোমার ঘর তুলবে।' কথাটা বলতেই অমূল্যের কেমন ফাঁকা ঠেকল বুকের ভেতরটা। সেই তৈরি ঘরের তীক্ষ্ণ শূন্যতার নিশ্বাস লাগল তার হাড়ের মধ্যে।
ঝড় নেই, তুফান নেই, বান-বন্যা নেই, অথচ ঘর পড়ে গেছে। যেন কতগুলো বুনো নেকড়ে দল বেঁধে চলে গিয়েছে এখান দিয়ে, সব দলে-পিষে ছত্রাকার করে দিয়ে। ক্ষুধার নেকড়ে।
বুড়ি রাজি হয়ে গেল সহজেই।
কে না রাজি হয়! মাগনা খাওয়া পাবে, উপযুক্ত মজুরি পাবে, রাজি না হবার কোনো মানে হয় না।
চাঁড়ালেরা রাতে ঢেঁকিতে চিড়ে কুটত, এখন কেরোসিন পায়না, জ্বলে না আর টেমি বা বাঁশের চোঙার কুপি। তারা এল। সরষে নেই, ঘানি

ঘুরছে না কলুদের, তারা এল। সিউলিরা তাল খেজুরের গুড় তৈরি না করে তাড়ি তৈরি করছে, এল তারা কেউ-কেউ। কাগজীরা খড়-বাঁশ-শর জোগাড় করলেও পাচ্ছে না কাগজ-তৈরির মশলা, তারাও নাম লেখাল।

গ্রামের পুনরুজ্জীবন হচ্ছে। শ্মশানকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গঞ্জগোলায়। পাণ্ডুরকে শ্যামলে।

কাঁচা মাটির ঘর উঠেছে কতগুলো, কঞ্চিতে কাদার চাপড়া লাগানো দেওয়াল। তাঁত বসেছে ক'খানা, তৈরি হচ্ছে গামছা আর টেবিল-ঢাকা। তৈরি হচ্ছে বাঁশের মোড়া আর ঝুড়ি, খাল্লা আর ডোল, টপুর আর ধানের হামার। তৈরি হচ্ছে কাগজের ঠোঙা! লাগোয়া জায়গায় তৈরি হচ্ছে শাক-শবজি।

অমূল্যর ভীষণ উৎসাহ। সরকারী সহানুভূতি পর্যন্ত সে আদায় করেছে। যারা শহরে-গাঁয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে নিজেদের মান-মুনাফা ঠিক রেখে বাঁধা-বাঁধা বুলি কপচায় তাদের কাউকে কাউকে টেনে নিয়ে এসেছে এই কাজের ঘূর্ণিপাকে। কিন্তু এক এক সময় বড় শ্রান্ত লাগে অমূল্যর। মনে হয় নিজেকে স্তোক দিচ্ছে সে। গ্রামের উজ্জীবন। কিন্তু গ্রামকে ধ্বংস করল কে? আজ গ্রামকে খাড়া করলে কালই যে সে ফের ধ্বংস হয়ে যাবে না তার ঠিক কি? আজ রুগ্নের মুখে জল দিচ্ছে। কিন্তু রোগ যাতে চিরদিনের মত উচ্ছেদ হয়ে যায় তার সে করছে কী?

বিশাল বটগাছের তলায় বসে থাকে সে নিরিবিলি।

না, এই বা কম কী! ঐ যে থাবা-থাবা খাচ্ছে এখন সাহেবের মা।

সাহেবের মা হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভাতের পাতের উপর। ভাবে, খাওয়াটা কত সহজ কত জানা জিনিস। ধান কেঁড়ে চাল ফুটিয়ে ভাত, ফেনালো ভাত, আর যদি দাও একটু নুনের ছিটে। আর না খাওয়াটা কত রাজ্যের পথ, আর কী নির্জ্জন সে পাথরের রাস্তা। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হয় সাহেবের মাকে, আর সবাইকে পিছে ফেলে। খিদের তাড়নায় নয় ভূতের তাড়নায়। তিনখানা কঙ্কালসার লোলুপ হাত তার ভাতের দিকে হঠাৎ এগিয়ে এসেছে।

এরা একবেলা খেতে দেয়। স্বাদ পেয়ে সাহেবের মায়ের সাধও যেন বেড়ে যায়। নগদ পয়সার থেকে সে খই কেনে, চিনির বাতাসা কেনে। কিছু খায় বা রেখে দেয় কাগজের ঠোঙায়।

সেদিন বিকেলের দিকে হঠাৎ একটা সোরগোল উঠল। শোনা গেল মোটরের ঝকঝকানি।

'সাহেব এসেছে, সাহেব এসেছে।'

ঠোঙা বানাচ্ছিল সাহেবের মা। তার পাশে ছিল মোক্ষমণি। সে বললে ফিসফিসিয়ে, 'তোর ছেলে এসেছে সাহেবের মা।'

'ছেলে?' সাহেবের মা চেঁচিয়ে উঠল।

'শুনছিস না সাহেব এসেছে? তুই যদি সাহেবের মা হোস, ও তো তবে তোর ছেলে!' মোক্ষমণি হাসল মুখ টিপে।

আশ্চর্য, তার একটা ছেলের নামও সাহেব ছিল না। মেনাজ, ইছব আর সদরালি—তার তিন ছেলে। একটার নামও অন্তত সাহেব থাকা উচিত ছিল, নইলে কিসের সে সাহেবের মা? উপায় কি, যখন বাপ তার নাম রেখেছে, তখন কোথায় সাহেব! বাপ তার ভুঁইা রুইত, বোধ হয় আশা করেছিল নাতি তার লাটসাহেব হবে। অন্তত আশা করেছিল সাহেব নামে সৌভাগ্য আসবে তার মেয়ের সংসারে।

সে সাহেবের মা, অথচ ছেলে তার কেউ সাহেব নয়, এই অসঙ্গতিটা আজ কেমন লাগল তার বুকের মধ্যে।

জীবেশ এ মহকুমার ছোকরা মুনিব। এসেছে পরিদর্শনে।

তাকে পেয়ে অমূল্য মহা খুসি। কৃতকৃতার্থ। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখাচ্ছে সব কাজকর্ম্ম। তাঁতের, বাশ-বেতের, ঠোঙা-ঠিলির।

'খুব ভালো কাজ হচ্ছে।' দাঁত চেপে বললে জীবেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে।

'তবে আরো দেখুন। এই শাকপাতাড়ের খেত। ফুল যা দেখছেন সব আহার্য ফুল।'

'সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আজ এই পর্যন্ত থাক।' জীবেশ মৃদু হাস্যে আপত্তি করল।

'আর একটু। এই দেখুন বাঁশের জাফরির কাজ। গোলোকধাঁধাঁ নক্সার সিলিং।'

'এবার যাই অমূল্যবাবু। আফিস থেকে এখনো বাড়ি যাইনি। খিদে পেয়ে গেছে।'

এ ছেলেমানসি ধরনের কথাটা কেউ তেমন খেয়াল করল না, কিন্তু লাগল গিয়ে ঠিক সাহেবের মার হৃৎপিণ্ডে। সন্দেহ কি এ তারই ছেলে। বলছে, খিদে পেয়েছে। বলছে, খেতে দাও কিছু।

কার কাছে বলছে?

কার কাছে আবার! সন্তান আবার কার কাছে বলে!

সন্দেহ কি, এ তারই ছেলে। পোশাক-আসাক বদলে যেতে পারে, বদলে যেতে পারে ধরন-ধারন, কিন্তু গলার স্বর বদলায়নি একটুও। বলে, খিদে পেয়েছে, খেতে দে, মা। তার মেনাজ-ইছব-সদরালি না হতে পারে, কিন্তু তার সাহেব,—যে ছেলে তার মরেনি এখনো। ক্ষিদেতে ধুঁকছে, কিন্তু মরেনি এখনো। সে যে মা, সাহেবের মা।

জীবেশ উঠছে তার মোটরে সাহেবের মা কাগজের ঠোঙায় চিনির বাতাসা নিয়ে এল তার সামনে। ঠোঙাটা মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরে বললে, 'নে, খা।'

জীবেশ পিছিয়ে গেল দু'পা। সবাই বোকা, হতভম্ব হয়ে গেল।

'তোর খিদে পেয়েছে বলছিলি না? নে খা, খিদের কাছে লজ্জা কী।'

আশে-পাশের লোককে জীবেশ জিগগেস করল, 'কে এ?'

সবাই বললে, পাগলি।

'ছেলের খিদের কথা শুনে কোন মা না পাগল হয় শুনি?' সাহেবের মা হাসল অদ্ভুত করে : 'নে, হাঁ কর, আমি খাইয়ে দি হাতে করে।'

জীবেশ তবু মুখ ফিরিয়ে রইল। সবাই হাই-হুই করে সাহেবের মাকে চেষ্টা করল হটিয়ে দিতে। কেউ বা টানল তার হাত ধরে। জলে হঠাৎ চোখ দুটো তার খুব উজ্জ্বল দেখাল। বললে, 'আমাকে চিনতে পাচ্ছিস না সাহেব? আমি যে তোর মা—সাহেবের মা। আমার একটা ছেলে এখনো বেঁচে আছে, কাঁদছে খেতে দাও বলে। আর তুই—'

না, চিনতে পেরেছে। সন্তানকে মা চিনলে মাকে সন্তান চিনবে না? জীবেশ দরজা খুলে দিল মোটরের। বুড়িকে তুলে নিল ভিতরে।

লোকে যা ভেবেছিল, তার উলটো হল। ভেবেছিল বুড়িকে হাতের ধাক্কায় ঠেলে দিয়ে চলে যাবে জীবেশ, কিন্তু না, একেবারে তুলে নিল গাড়িতে। দয়ার শরীর আছে সাহেবের।

'বা ও সাহেব যে। মার ছেলে।' বলে উঠল মোক্ষমণি।

তার বাবা আর তার নাম মিথ্যে রাখেনি। তার সাহেবের কত সুন্দর বাড়ি, কেমন সুন্দর বাগান। কেমন চমৎকার হাওয়া-গাড়ি।

বাড়িতে পা দিয়েই জীবেশ চেঁচিয়ে উঠল : 'মা, মা।' ডাকতে ডাকতে চলে গেল ভিতরে।

ডাকটা একটা দগ্ধ শেলের মত লাগল এসে সাহেবের মার বুকে। এ যেন খিদেয় কাতর হয়ে মার কাছে খেতে চাওয়ার ডাক নয়। এ যেন অন্য রকম। এ যেন আনন্দের ডাক, অহঙ্কারের ডাক।

বাঙলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাহেবের মা তাকাতে লাগল চার পাশে, ঝাপসা অন্ধকারে। তার চোখে যেন আর আশ্বাস নেই। কেমন ভয়-ভয় ভাব। যেন কোন অজানা বিরানা জায়গায় চলে এসেছে সে। যেন বালির উপরে রোদ্দুরে তার জলভ্রম হয়েছে।

'এই যে মা, এই যে। ভারি অদ্ভুত—' তার সাহেব বাড়ির ভিতর থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে আর কাউকে।

তারই মত বুড়ি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। সত্যিকারের মার মত। পিরতিমের মত। কাঁচা-পাকা চুলে লাল টকটকে সিঁদুর, চওড়া কল্কাপেড়ে শাড়ি, গা ভরা গহনা। ঝকমক করছে, গনগন করছে।

'আহা, বেচারি—' জীবেশের মা বললেন সাহেবের মাকে। 'নিজে খেতে পাচ্ছিস না, তাই পরের খিদেয় প্রাণ পোড়ে। বোস্, সরে বোস্ ওখানটায়। তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসছি আমি। আর, কাপড় নিবিনে একখানা? বোস বোস ওই নিচে নেমে।'

জীবেশ ও জীবেশের মা চলে গেল ভিতরে।

ছেলেকে খেতে দিয়ে জীবেশের মা বুড়ির জন্যে কলাপাতায় করে খাবার নিয়ে এলেন, নানারকম খাবার; কিন্তু বুড়িকে কোথাও দেখতে পেলেন না। না বারান্দায়, না বা নিচে, বসতে বলেছিলেন যেখানটায়। অন্ধকারে চলে গিয়েছে কোন দিকে। শুধু একটা কাগজের ঠোঙা রেখে গিয়েছে দরজার কাছে। তাতে কটি ভাঙা গুঁড়ো-গুঁড়ো চিনির বাতাসা।

৩৫। ওভারটাইম

'শুক্রবার এস।'

এ রকম করে আর কোনোদিন বলেনি। আবার এস. এ অনেক দিন শুনেছে। বিশেষ বার ও তারিখ, সময় ও জায়গা, আগে আগে বহুবার নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এমন ছোট করে বলেনি কোনোদিন। এমন সঙ্কেতসঙ্কুল করে।

'কোন শুক্রবার?' শুধু ব্যগ্র হলেই তো চলেনা স্পষ্ট হওয়া দরকার। সোমনাথ ফুটপাতের দিকে এক পা এগিয়ে এল।

'আসছে শুক্রবার।' মিত্রা অন্য কোনদিকে তাকিয়ে উদাসীনের মত বললে।

'কোথায়?' এবার বুঝি সোমনাথেরই চোখের দৃষ্টিটা গাঢ় হয়ে এল। কোনো গাড়িবারান্দার নিচে, কোনো বাসস্টপের কাছে না, কোনো সিনেমার সামনে একটা মুখস্থ জায়গাই ঠিক হবে ভেবেছিল। কিন্তু মিত্রা একটা পরমাশ্চর্য কথা বললে। বললে, 'বাড়িতে।'

'কার বাড়ি?' বুকের রক্ত চনমন করে উঠল সোমনাথের।

বুঝল এ প্রশ্ন অবান্তর। কেননা বরাবর মিত্রার সুবিধেতেই জায়গা ঠিক হয়েছে। তবু উত্তরটা জানা থাকলেও জিগগেস করতে অপরূপ লাগল।

অস্ফুটে হাসল মিত্রা। বললে, 'আমাদের বাড়ি।' রহস্যের পরিবেশ আরো নিবিড় হয়ে উঠল যখন মিত্রা আরো ছোট্ট করে বললে, 'আমার ঘরে।'

এমন করে বলেনি কেউ কোনোদিন। এমন করে শোনেওনি কেউ কান পেতে।

'কবে?' কখন বলতে গিয়ে আবার কবে জিগগেস করে বসল সোমনাথ।

'বললাম যে। এই—এই শুক্রবার।'

'তোমার ঘরে?' যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। ফুটপাতের উপর উঠে এল সোমনাথ : 'সত্যি? সুবিধে হবে?'

মিত্রারও বুক থরথর করছে। বললে, 'হয়তো হবে।'

'কখন?' আশ্চর্য, সময়টাই এতক্ষণ জিগগেস করা হয়নি।

'সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ।'

'সন্ধ্যে সাতটা?' উচ্ছ্বসিত হল সোমনাথ। দিনেরাতে এমনক্ষণ আর হতে নেই। ছেলে-মানুষের মতো হাসল সোমনাথ : 'প্রায় গোধূলিলগ্ন।'

'শোনো।' মিত্রাই কাছিয়ে এল : 'একতলায়, নিচেই আমার ঘর।'

'তা কি আমি জানি? আমি কি কোনোদিন তোমাদের বাড়ি গেছি?' আবার নির্মল মুখে হাসল সোমনাথ : 'তোমরা কি আমাকে ঢুকতে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, শোনো।' ষড়যন্ত্রীর মত গলা করল মিত্রা : 'সদরটা ভেজানো থাকবে। আস্তে ঠেলে ঢুকে পোড়ো। কড়া নেড়োনা যেন!'

'মানে, তুমি কাছাকাছিই থাকবে।'

'হ্যাঁ, আমিই তো সদরের খিল খুলে রাখব।'

'তুমি থাকবে কোথায়?'

'আমার নিজের ঘরে। তুমি ঠেলে ঢুকেই আমাকে দেখতে পাবে। বাঁ-হাতি আমার ঘর।'

'ঢুকেই তোমার ঘরের মধ্যে চলে যাব?'

মিত্রা শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, 'অত দিশেহারা হলে কি চলে? সদর খোলা রেখে যাবে? খিল দেবে না?'

'খিল দিলে পালাব কি করে? পালাবার পথও তো প্রশস্ত রাখা দরকার।' বাহবার ভাব করল সোমনাথ : 'চোর যখন ঘরে ঢোকে দরজা-টরজা হাট করে রাখে। কখন পালাতে হয় ঠিক কী!'

'ছি, চোর হতে যাবে কেন?' তাতে বুঝি নিজের সম্ভ্রমেই বাধে মিত্রার।

'তবে আমি কী।'

'তুমি গৃহস্থ। আমার গৃহস্থ।' মিত্রা ঘুরে দেখে নিল এদিক-ওদিক বললে, 'বেশ, তুমি ঢুকে পোড়ো, আমিই বন্ধ করব।'

'শুধু সদর?'

মিত্রা শুধু চোখে চোখ রাখল, কথা কইল না। বহু কথা দিয়ে তৈরি যে নীরবতা, দুই চোখের ডালায় করে তাই বুঝি উপহার দিল।

'তোমার অভিভাবকেরা কোথায়?' আরো যেন একটু নিশ্চিন্ত হতে চাইল সোমনাথ।

'তাঁরা দূরে কোথায় কীর্তন শুনতে যাবেন।' বললে মিত্রা, 'কীর্তন সাতটার সময় শুরু, তাই অন্তত ওঁদের সাড়ে ছটায় বেরুতে হবে।' হাসল মিত্রা : 'যাই বলো, কীর্তনকে ধন্যবাদ। কীর্তনের জন্যে ওঁদেরকে যুগল অনুপস্থিত পাব।'

'আর যাঁরা আছেন?' ভয় যেন তবু কাটতে চায়না সোমনাথের।

'দাদা-বৌদি? ধার্মিক প্রমাণ করতে বৌদিও মা-বাবার সঙ্গ নেবেন।'

'আর দাদা?'

'দাদা তো টুরে, কলকাতার বাইরে।'

'বাড়িতে তা হলে তুমি একা থাকবে?' সোমনাথের কাছে এটাও বুঝি কঠিন মনে হল।

'না, আমার ছোট ভাই সুবল থাকবে।'

'ছোট হলে কী হবে, এ ক্ষেত্রে সে মস্ত বড় কর্তা।'

'না, তাকে আমি মাস্টারের বাড়ি পাঠাব।'

'দিদিকে সে একা ফেলে যাবে বলে মনে হয় না। হয়তো সে তোমাকে আঁকড়ে ধরে তোমার ঘরেই বসে থাকবে।'

'না, তার ভয় নেই।' মিত্রা হাসল : 'তাকে আমি তবে তার ঘরে, দোতলায়, টাস্ক দিয়ে রাখবো।'

'আজকাল গুরুজনের চাইতে লঘুজনকে বেশি ভয়। সব একেকটি বিচ্ছু।' মিত্রার হাসিতেও সোমনাথের আতঙ্ক মুছে গেলনা : 'হয়তো টাস্ক শেষ করে তোমার ঘরে নিচে চলে আসবে।'

'আসুক না।' গম্ভীর হল মিত্রা : 'যখন দেখবে আমার ঘর বন্ধ, তখন আমাকে আর ও ডিস্টার্ব করবে না। ভাববে ঘুমুচ্ছি। ওর নিজের ঘরে ফিরে যাবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি এস।' সরে যাবার, চলে যাবার উদ্যোগ করল মিত্রা। আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'ধরা পড়লেই বা ভয় কিসের? একটা না হয় বোঝাপড়া হয়ে যাবে।'

এবার বোধহয় সোমনাথকেই সরে যেতে হয়। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ এমনি কথা বলা যায়? দু পা যাব-যাব করে আবার ফিরল সোমনাথ। বললে, 'কীর্তন কতক্ষণে ভাঙবে? কতক্ষণে ওঁরা ফিরবেন মনে হয়?'

'তা কে জানে? ও হিসেবে কী দরকার? সন্ধ্যে সাতটার পর কিছুক্ষণ আমরা পাব, নির্জনে নিরালায়, এই যথেষ্ট।'

এই অসহ্য আশ্চর্য। সোমনাথ অস্থির হয়ে উঠল : 'আজ কী বার? বেস্পতি?'

'আজ সোমবার।'

'উঃ, এখনো কত দেরি। কেত্তন মঙ্গলবার হতে পারে না?'

হাসির টানটি বেদনা মিশিয়ে সূক্ষ্ম করল মিত্রা। সান্ত্বনার সুরে বললে, 'দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।' তারপর ফিরে যেতে-যেতে আরেকবার বললে, 'এস কিন্তু।'

'থেকো কিন্তু।' হাসতে-হাসতে সোমনাথও পালটা বললে।

'কি রে, আজ পড়াতে গেলিনা?' অফিস থেকে ফিরে এসে তক্তপোশে একটু টান হয়ে শুয়েছে সোমনাথ, সুব্রতা নালিশ করে উঠল।

'টিউশানি ছেড়ে দিয়েছি, মা।'

'সে কী!'

'আর খাটনি পোষায় না। সমস্ত দিন খেটে এসে সন্ধ্যেয় গিয়ে আবার গাধা পেটাও।'

'সপ্তাহে তো মোটে তিন দিন।'

'বাকি চার দিনের জন্যে আরেকটা জুটলে তুমি হয়তো তাও খাটতে বলতে।'

সুব্রতা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তবু অভাবী সংসার কথা না কয়ে পারল না। বললে, 'তবু মাসে ত্রিশটা টাকা! লোকনাথটার আরো একটু ভালো চিকিৎসা হত, পথ্য হত—'

'বাকি চারদিন টিউশানি করে আরো ত্রিশ টাকা অ... :রলে, বাড়তি আয় মোট ষাট টাকা হলে, তা দিয়ে ওকে চেঞ্জে পাঠানো যেত, স্যানিটোরিয়ামে রাখা যেত—' সোমনাথের ক্লান্ত স্বর থেকে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

'তা তুই-ই বল, হত না সুবিধে?'

'আয় আরো বাড়লে তুমিও যেতে পারতে ওর সঙ্গে—'

'তোদের রান্নার জন্যে বাড়িতে একটা ঠাকুর রেখে দিতাম—'

'উঃ, যত আয় তত অভাব! একটা মেটে তো আরেকটা এসে জোটে!' উঠে পড়ল সোমনাথ : 'এর কি শেষ নেই কোনোখানে?'

'তারই জন্যেই তো—'

'তারই জন্যে আমাকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চাও? লোকনাথের সঙ্গে একই শয্যায় শোয়াতে চাও?'

'ছি, ও কথা বলছিস কেন?' সুব্রতা ছেলের গায়ে হাত রাখল। বললে, 'তুই সকলের বড়। সব চেয়ে দক্ষ, সমর্থ, উপযুক্ত। তুই না করবি তো কে করবে?' গায়ের হাত মাথায় তুলে আনল সুব্রতা : 'ত্রিশ টাকা, দিনে এক টাকা এ কি তুচ্ছ করবার মত? কিছু দুধ, একটা আপেল, দুটো ডিম—'

মায়ের হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সোমনাথ।

ছুটল আবার ছাত্র ধরতে। না, টাকাই খোলামাঠ। টাকাই মুক্ত হাওয়া।

কিন্তু, হায়, সংখ্যাটা যদি একটু বিশি হত!

সংখ্যাটা বেশি করবার কোনো কিছুই কি উপায় নেই? ভদ্র, সুস্থ, সক্ষম উপায়? আছে। মঙ্গলবার আফিসে গিয়েই টের পেল সোমনাথ।

আফিস প্রকাণ্ড একটা অর্ডার পেয়েছে। সাত দিনের মধ্যে তা সম্পাদন করে দিতে হবে। আর, তা করে দিতে হলে কর্মচারীদের ওভারটাইম না খেটে উপায় নেই।

ম্যানেজার পালচৌধুরী কয়েকজনকে বাছাই করলেন। আর যাদের বাছাই করলেন তাদের মধ্যে সোমনাথ একজন।

'আমাকে আবার কেন?' প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল সোমনাথ।

'যেহেতু তুমি দক্ষ, সমর্থ, উপযুক্ত।' হাসলেন পালচৌধুরী : 'তোমাকে দিয়ে আমার অনেক বিশ্বাস।'

'কতক্ষণ থাকতে হবে?' ছটফট করে উঠল সোমনাথ।

'ধরো রাত আটটা পর্যন্ত—সাড়ে আট।'

'আমি পারব না, স্যার।' গোঁয়ারের মতন বলে বসল সোমনাথ।

নির্বাচিত-অনির্বাচিত সকলেই ধিক্কার দিয়ে উঠল। এমন দাঁও কি কেউ ছাড়ে? হাতের পাখি উড়িয়ে দেয়?

অমনোনীত দলের কেউ-কেউ এগিয়ে এল, বললে, সোমনাথ যদি না করে আমরা করব।

ম্যানেজার গম্ভীর মুখে বললেন, 'না, সোমনাথই করবে।'

ডাকলেন সোমনাথকে। 'কেন করতে চাইছ না?'

'একটা টিউশনি আছে, স্যার।' ঘাড় চুলকোল সোমনাথ।

'টিউশনি?' হাসবেন না কাঁদবেন ঠিক করতে পারলেন না ম্যানেজার : 'পাও কত?'

'ত্রিশ টাকা?'

'ত্রিশ টাকা!' পালচৌধুরী উচ্চরোলে হেসে উঠলেন : 'তার মানে গড়ে দৈনিক এক টাকা। আর এ ওভারটাইমে তুমি দৈনিক কত পাবে জানো?'

আনন্দেও লোকে ভয় পায় বুঝি। পাংশু মুখে নিঃস্বের মত তাকাল সোমনাথ।

'তোমার যা মাস-মাইনে তার দৈনিক রেট এক টাকার চেয়ে ঢের ঢের বেশি।' পালচৌধুরী উচ্ছ্বসিত হলেন : 'এ ওভারটাইমে দৈনিক তুমি সে রেটের ডবল পাবে।'

তবু যেন সোমনাথ উত্তাল হয়ে উঠতে পারে না। মনের গহনে আর কিছুর হিসেব করে।

'আর আমি ব্যবস্থা করেছি—'

কী আশা করে সোমনাথ ক্ষণিক উজ্জ্বল হল।

'ব্যবস্থা করেছি ওভারটাইমের টাকাটা মাসকাবারে মাইনের সঙ্গে দেওয়া হবেনা, নগদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ আজ ওভারটাইম খাটলে কাল সকালেই পেয়ে যাবে টাকাটা।'

কাজ কী করে আকর্ষণীয় করতে হয়, কী নেশায় চূড়ান্ত শ্রম আদায় করা যায়, সে কৌশল জানেন পালচৌধুরী।

সকলে প্রায় জয়ধ্বনি করে উঠল কিন্তু সোমনাথ নিস্তেজ।

'তোমার টাকার দরকার নেই?' চোখের দৃষ্টি বক্র করলেন পালচৌধুরী।

'উঃ, ভীষণ দরকার।' মুখ থেকে বেরিয়ে গেল সোমনাথের।

চকিতে লোকনাথের শীর্ণ মুখটা মনে পড়ল, মনে পড়ল মার সঙ্কীর্ণ মনের কথা, ঘরজোড়া নির্দন্ত বার্ধক্যের কথা।

'তবে?' ক্রূর দৃষ্টির আরেকটা বাণ ছুঁড়লেন পালচৌধুরী।

'তবে—সুন্দর সন্ধ্যাগুলি মাটি হবে।'

হো-হো-হো করে পাগলের মত হেসে উঠলেন পালচৌধুরী : 'কেরানির আবার সন্ধ্যে! ঐ যে কী না বলে কথাটা। মেটো হুঁকোয় তামাক খায়, গড়গড়াটা কই?' পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, 'নাও, লেগে যাও।'

সোমনাথ লেগে গেল।

দেরি করে ফিরতে সুব্রতা ব্যাকুল হয়ে কাছে এসেছিল, সোমনাথ বললে, 'খুব সুখবর, মা।' সুখবর দূরের কথা, সুখবরের খবরও তো কোনো দিন পায়নি সুব্রতা।

'কেন, কী হল?'

'আফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা হল। রোজকার রোজ হাতে-হাতে রোজগার।' চোখে-মুখে দুরন্ত উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগল সোমনাথ : 'এমনিতে গড়পড়তা দৈনিক যা আয় তার প্রায় দ্বিগুণ। কোম্পানি খুব লাভ করছে, মা। নতুন নতুন সব জরুরি অর্ডার পাচ্ছে। ওভারটাইমটা বোধহয় স্থায়ী ভাবেই চালু হল। অর্ডার বুঝে রেটের হের-ফের কিছু হতে পারে, কিন্তু, মা, খাটতে পারলে আয়ের অঙ্ক মোটা করতে পারব।' স্বর আরো চড়া করল সোমনাথ : 'লোকনাথকে পাঠাব স্যানিটোরিয়ামে। তোমার জন্যে ঠাকুর রেখে দেব, উনুনের গরমে তোমাকে আর পুড়তে দেব না—'

সুব্রতা বদান্য মুখে হাসল। বললে, 'আর তোর বিয়ে দেব। রোজগার কম বলে তো পিছিয়ে যাচ্ছিলি, এবার তবে যদি আয় বাড়ে—'

মনে মনে সেই পুরোনো কথাটা আবৃত্তি করল সোমনাথ : যেমন আয় তেমনি অভাব। একটা মেটে তো আরেকটা জোটে। এক ঢেউ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আরেক ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢেউয়ের পর ঢেউ।

কিন্তু যাই বলি, আয় বাড়ার কথা শুনে মিত্রা নিশ্চয়ই খুশি হবে। বাকি পথটুকু চাইবে হয়তো হেঁটে আসতে।

তখন আর মিত্রার ঘর নয় সোমনাথের ঘর।

আজ বেনে, কাল পোদ্দার।

সন্ধ্যার সোনা গলে গলে রুপোর চাকতিতে শাদা হতে লাগল।

কিন্তু আজ, আজ শুক্রবার কী হবে? আজকের সন্ধ্যাও কি অভাবের পৃষ্ঠায় হিসেবের কালিতে কালো করে দেব?

'আজ আমাকে ছুটি দিন।' হেডবাবু পরমেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সোমনাথ।

'ছুটি আবার কী!' পরমেশ অবাক মানল।

'ভীষণ একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে।'

'কি, কোনো মৃত্যুর সংবাদ?'

'না, তা নয়--'

তা নইলে আর কিসে মানুষে ছুটি নেয়? তাও মানুষে বলে, মরেছে তো, দুদণ্ড দেরি করতে বলো, ওভারটাইমটা সেরে আসি। একমাত্র নিজের মৃত্যু ঘটলেই নাকি বাধ্য হয়ে ছুটি নেয় মানুষে।

'তা নয় তো আর কী?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল পরমেশ।

সে যেন কী সীমাহীন সুখ, বলতে পাচ্ছেনা সোমনাথ।

'পুরো ছুটি নয়, ধরুন এক ঘণ্টার য়্যাবসেন্স, সাতটা থেকে আটটা।'
'তা ম্যানেজারের কাছ থেকে নিলেনা কেন অনুমতি?'
'বলতে সাহস হলনা। আপনি যদি দয়া করেন—'
'কিন্তু কেন, ব্যাপারটা কী?' ধমকে উঠল পরমেশ।
তখন সোমনাথ বললে। বললে গোপন হয়ে, 'একটি মেয়ের সঙ্গে মিট করব।'
'মিট করবে!' হাসিতে তরল না হয়ে তিক্ততায় গরল হল পরমেশ: 'মিট করবে তো পরে কোরো। ঢিট করবে তো আরেক দিন। এখুনি এত হন্যে হবার কী হয়েছে! সাতটা থেকে আটটায় না হয় আটটা থেকে নটায় হবে। শুক্রবার না হয় শনিবার হবে। নাইট শোতে না হয় ম্যাটিনিতে হবে। তার জন্যে এত তাড়া কিসের? তার জন্যে কে গরম গরম চাকতি ছেড়ে দেয়। মেয়ে বসতে পারে টাকা বসতে পারেনা।' বলতে বলতে ক্লান্ত হল পরমেশ। পরে গলার স্বর একটু মোলায়েম করে বললে, 'তা তুমি যেতে চাচ্ছ তো যাও, কিন্তু জরুরি কাজ সারা হবে না, আমি ব্যাপারটা ম্যানেজারের কানে তুলব। তখন ওভারটাইম ছেড়ে আসল টাইমটাই চলে যায় কিনা তার ঠিক কী।'
'এই সোমেন, যাসনি।' সহকর্মী আর যারা খাটছিল, বারণ করল।
নিজেকে একটা বন্ধ বিকৃত জং-ধরা, জড় যন্ত্র বলে মনে হল, সোমনাথের। একটা নিশ্চল স্তূপাকৃত কবন্ধ।
কিন্তু, না, দিনে আট-দশটাকাই বা কম কিসে? লোকনাথকে যে ইনজেকশানটা দিয়ে গেল ডাক্তার তার দাম কত?
'কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না, সয়ে থাকলেই রয়ে যায়।'
যন্ত্র আবার নড়ে চড়ে উঠল। আওয়াজ তুলল। সে আওয়াজ সোনার তারে আওয়াজ নয়, রুপোর চাকতির আওয়াজ।
আটটার সময় পরমেশের কী মনে হল কে জানে, তাকাল ঘড়ির দিকে। সোমনাথকে ছুটি দিল।
অনেক ঘর-বার করেছে মিত্রা, দেখেছে অনেক সদর-খিড়কি, অনেকবার আলো জেবলেছে আর নিবিয়েছে। তবু সোমনাথের দেখা নেই।
তারপর আটটা যখন বেজে গেল তখন ক্লান্ত ছায়ার মত গলি পেরিয়ে দাঁড়াল ক্রমে রাস্তায়, ইলেকট্রিক পোস্টের নিচে।
আরো অনেক পরে দেখতে পেল দূর থেকে প্রায় ছুটে আসছে সোমনাথ। বিমর্ষ মূর্তি নয় উদ্দীপ্ত মূর্তি।
'জানো আমার ওভারটাইম হয়েছে।' আনন্দে উথলে উঠেছে সোমনাথ।
'সত্যি?' প্রতিধ্বনি করল মিত্রা।
'তাই ঠিক সময়ে আসতে পারিনি।' এটা যেন কোনো লোকসান নয় অন্য প্রাপ্তি, অন্য মুনাফার তুলনায়—সোমনাথ তেমনি পরিপূর্ণ কণ্ঠে

বললে, 'জানো, রোজগার অনেক বেড়ে যাবে। কোম্পানি এখন খুব উন্নতির মুখে, ওভারটাইমটা বোধহয় পার্মানেন্ট ফিচার হয়ে দাঁড়াবে। পার্মানেন্ট-লিই বেড়ে যাবে ইনকাম। তোমার ঐ হতচ্ছাড়া টিউশনির থেকে ভালো।'

'অনেক, অনেক ভালো। আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে কী বলো?' খুশিতে চোখ নাচাতে লাগল মিত্রা।

'প্রায় তাই।'

'কী সুখ! কী স্ফূর্তি!' মিত্রা তরঙ্গ তুলল।

'তোমার বাবা-মা'রা ফিরেছেন কীর্তন থেকে?' সোমনাথ ত্বরিতে এগিয়ে এল এক পা।

'এখনো ফেরেননি। তবে ফেরবার সময় হয়েছে।'

'আজ তা হলে আর হয় না?'

'কী করে হয়! সময় কোথায়?'

'যেটুকু সময় আছে—এখনো সময় আছে—রাস্তায় প্রকাণ্ড জ্যাম—ফিরতে আরো অনেক দেরি হবে। চলো না, এরই মধ্যে, যতটুকু হয়—' দুর্ভিক্ষের মত মুখ করল সোমনাথ।

'ব্যস্ত কী! আরেক দিন হবে।'

'আরেক দিন!'

'হ্যাঁ, ফুরিয়ে যাচ্ছেনা কিছুই। বেশ তো, তোমার পাওনা রইল, আরেক দিন এস।' বিপুলবিমোহন হাসল মিত্রা।

ওভারটাইম। আর সন্ধ্যেগুলি থাকবেনা। আর সিনেমায় যাওয়া যাবেনা। বেড়ানো যাবেনা এখানে-ওখানে। আর বসা যাবেনা পার্কে। ঢোকা যাবেনা রেস্তরাঁয়। একটি নির্জনতা বুকে নিয়ে ভাসা যাবেনা জনসমুদ্রে।

আর সেই সব স্বাদু মৃদু ভীরু কথাগুলি বলা যাবেনা। ক্ষণকালের অসিমুখে করা যাবেনা সেই সব রক্তাক্ত প্রস্তাব।

আর আশা নেই বসা নেই, জিজ্ঞাসাও নেই।

কত দিন মিত্রার দেখা নেই সোমনাথের সঙ্গে।

এখন সপ্তাহে শুধু এক রবিবার। টিউশনির সময় কয়েকদিন তবু ফাঁকা ছিল। ইচ্ছে করলে ফাঁকি দিতে পারত অনায়াসে। কথা রাখত মিত্রার। এখন এই ওভারটাইমে শুধু এক নিশ্ছিদ্র বধিরতা। সেই ধূসর আকাশের পরিবর্তে একটানা অন্ধকারের আস্তরণ। ঝঙ্কারের বদলে শুধু সংসারের সরঞ্জাম।

যার ওভারটাইম নেই, যার সন্ধেগুলি স্বাধীন, এমন এক স্বল্পভার অথচ শাঁসালো স্বামীর ঘর করতে গেল মিত্রা। সাধারণভাবে সবই তার আছে কিন্তু এক সম্পর্কে সে অসাধারণ। তার সন্ধ্যাগুলি আছে।

এক প্রচণ্ড দুপুরে দুর্মদ নির্জনতায় সোমনাথ চলে এসেছে মিত্রার নতুন বাড়িতে। নতুন বাড়িতে মানে তার স্বামীর বাড়িতে।

'এ কি তুমি?' দরজা খুলে দিয়ে থমকে দাঁড়াল মিত্রা।
'এই চলে এলাম তোমার কাছে।'
'কিন্তু কী মনে করে?'
শূন্য চোখে চার দিকে তাকাল সোমনাথ। বললে, 'তোমার কাছে আমার একটা পাওনা ছিল তাই নিতে এসেছি।'
হাসির আরেক অর্থ যে বিশুষ্ক নিষ্ঠুরতা তাই দেখাল মিত্রা। বললে, 'কিন্তু দেখছ তো আমি নতুন চাকরি নিয়েছি। এ চাকরিতে বাড়তি আয় নেই।'
এগুতে চাইল সোমনাথ। বললে, 'কী, শোধ দেবেনা?'
দরজা জুড়ে দাঁড়াল মিত্রা। বললে, 'কী করে দিই বলো। আমি ওভার-টাইম খাটিনা।'

৩৬। ওষুধ

ডাক্তারের ডাক পড়ল।
হুকুমালি তালুকদারের বড় ছেলে আক্কেলালির জ্বর। একজনের গায়ে দুই জনের জ্বর। এত প্রবল। বললে, 'ডাক ডাক্তারকে।'
ফকিরফোকরার তোয়াক্কা রাখেনা হুকুমালি। সে লেখাপড়া জানে না বটে, কিন্তু তার বিস্তর অবস্থা। তার জমিজায়গা অঢেল, গরু-মোষ অনেকগুলি। যারা গরিব, উমি লোক, ক্ষুদ্দুর প্রজা, তারাই ফকিরফোকরার খবর করে। ডাক্তার না ডাকলে হুকুমালির মান থাকে না।
অবস্থার গুণে হুকুমালির এটুকু বুদ্ধি হয়েছে যে তুকতাকে ব্যামো সারে না। ব্যামো সারে ওষুধে। আর, কোন ব্যামোয় কি ওষুধ লাগে, বলতে পারে ডাক্তার। তা ছাড়া, শহরে দেখে এসেছে হুকুমালি, যারা বড়-লোক তারা দরগায় গিয়ে সিন্নি মানে না, ডাক্তার ডাকে।
হুকুমালি ডাক্তার ডাকল।
তিনখানা গাঁয়ে একজন ডাক্তার। ডাক্তার আমাদের শুকলাল বারিক। আগে শহরে কম্পাউন্ডারি করত। ফেলকরা কম্পাউন্ডার। হাতে-হেতেরে কাজ শিখে নিয়ে এখন বুক ঠুকে এই বন-বাদায় বসে ব্যবসা করছে। নাপিতের কাছ থেকে ফাড়নচিরন শিখেছে এমন দুয়েকজন নরুনে কবরেজ আছে, কিন্তু ডাক্তার বলতে একা শুকলাল। আস্ত এক টাকা ফি।
'ফাড়তে পারে বটে, কিন্তু ফুঁড়তে পারে না।' কবরেজদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনা শুকলাল।
আর, শুকলাল ছাড়া কে সার্টিফিকেট দেবে শুনি? কবরেজরা তো সব টিপ-পণ্ডিত, লিখতেই পারে না, সার্টিফিকেট দেবে কি! সাক্ষীদের কেউ

গেছে ভুঁই রুইতে, কেউ গেছে হাটে সওদা নিয়ে, মোকদ্দমার মুলতুবি চাই। নিমুনিয়া, কলেরা, ব্রঙ্কাইটিশ, ডায়রিয়া—ঠিক-ঠিক বানান করে সার্টিফিকেট লেখে শুকলাল। নামের আগে জাঁকালো করে ডাক্তার লেখে। সব মুসাবিদা তার মুখস্থ। এমনভাবে বিতং দিয়ে লেখে যে কেউ খুঁত ধরতে পারে না। যদি কখনো অগ্রাহ্যও হয়, তবে ফের মোকদ্দমার ছানির সময় মোকাবিলা সাক্ষী হয়ে আরেক দফায় রোজগার করে।

তা ছাড়া ও-সব গো-বদ্যিদের কি তার মত ডিসপেনসারি আছে?

'আপনাকে ডেকেছে বড় মিয়া।' হুকুমালির হালিয়া-চাকর এসে খবর দিল: 'এখুনি যেতে হবে।'

গ্রেপ্তারী পরোয়ানার চেয়েও তেজী। শুকলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

সাধ্য নেই এ পরোয়ানা সে গরকবুল করে। তিন-তিনটে গাঁ বড় মিয়ার কবজার মধ্যে। শুকলালের যা কিছু ব্যবসা-পসার তা শুধু সে এই বড় মিয়ার তাঁবে আছে বলে। বড় মিয়ার কথার অবাধ্য হওয়া যায় না।

অথচ বাধ্য হতে গেলে দুর্দশার একশেষ। প্রথমত তিনটে মাঠের কাদা ভাঙতে হবে পর-পর। তারপর যদ্দিন না আক্কেলালি ভাল হয় আটক থাকতে হবে সে-বাড়ি। নিজের হাতে রেঁধে খেতে হবে। বিনিময়ে এক পয়সাও মজুরি পাবে না। ফি চাইবারো তার এক্তিয়ার নেই। বড় মিয়ার খুসিতেই সে বেঁচে আছে। তার খুসিতেই সে রুগী পায়, তার বাড়ি-ঘরে আগুন লাগে না।

কোটের উপর চাদর ঝুলিয়ে রবারের জুতো হাতে নিয়ে চলল শুক-লাল। আরেক হাতে ওষুধের বাক্স। পিছনে হালিয়ার মাথায় শুকলালের বিছানা। তার কাঁধের ব্র্যাকেটে ছাতা ঝুলছে শুকলালের।

'কেমন দেখলে?' হুকুমালি ফরসিতে টান মারতে-মারতে জিগগেস করলে।

ঢোক গিলে মাথা চুলকে গলা খাঁকরে শুকলাল বললে, 'একটু জটিল বলে মনে হচ্ছে। তা দুদিনেই সেরে যাবে।'

অনেক ভেবে চিন্তেই বলেছে শুকলাল। সামান্য অসুখ বললে হুকু-মালির মর্যাদার প্রতি অবমাননা দেখানো হয়, আর দুদিনে না সারলেও নিজের মান থাকে না।

'ঠিক দুদিন। মনে থাকে যেন।'

শুকলাল চোখে সর্ষে ফুল দেখল। ভাবল, আগুন লাগে বুঝি তার ডিসপেনসারিতে।

দু'দিনে গা ঠান্ডা হল না। বিছানার উপর আক্কেলালি এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল।

'কি, কিসের ডাক্তারি শিখেছ তুমি?' হুকুমালি গাল দিয়ে উঠল, 'এক কুইনিন ছাড়া বাপের জন্মে আর কোনো ওষুধ জান না?'

নিরুদ্ব হয়ে বললে শুকলাল, 'সাতদিন না গেলে জ্বরের চরিত্র ঠিক বোঝা যায় না।'

'রাখ তোমার ও সব হামবড়াই। আর দু'দিনে যদি না সারাতে পার. শহর থেকে বোস ডাক্তারকে ডেকে আনতে হবে।'

হুকুমালি সালিশী করতে গিয়েছিল পাশ-গ্রামে, দুদিন পর ফিরে এসে দেখল আক্কেলালির অবস্থা বড় সঙ্গিন। চোখ-মুখ বসে গিয়েছে, হুঁস-বোধ নেই. শরীরের গিঁট-গাঁট সব ঢিলে হয়ে পড়েছে।

'যাও, বোস ডাক্তারকে নিয়ে এস। নাও খোল শিগগির।' ফরমান জারি করল হুকুমালি।

'আমি যাই, নিয়ে আসি গে।' কাঁচুমাচু মুখে বললে শুকলাল।

'না। তুমি যাবে কি করে? তুমি গেলে রুগীর তাউত করবে কে?'

একেবারে শহরে যেতে না পারলেও নদীর ঘাটে বোস-ডাক্তারের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে দেখা করলে শুকলাল। বললে, 'ভুলটুল যদি হয়ে থাকে চিকিচ্ছায়. সবার সামনে কিন্তু ফাঁস করে দেবেন না। আর, ভুলটুল একটু না করলেই বা আপনাদের ডাকবে কেন? এক ডাক্তার ভুল করে বলেই তো আরেক ডাক্তারের ডাক পড়ে।'

বোস ডাক্তার দেখলে তন্ন তন্ন করে। বললে, 'চিকিৎসে ঠিকই হচ্ছে, তবে আরো তেজী ওষুধ দেয়া উচিত। দেয়া উচিত ইনজেকশন।'

'এতক্ষণ দাওনি কেন?' হুকুমালি তেড়ে এল শুকলালের উপর।

'গাঁয়ে এ ওষুধ কোথায়? আমার ডিসপেনসারি তো কাহিল।'

'যাও, তবে নিয়ে এস গে সহর থেকে।'

বিলিতি ওষুধ নেই, পাওয়া যাবে দিশি মার্কা। যাই পাওয়া যাক, যত টাকাই হোক, দেখে শুনে নিয়ে আসুক গে শুকলাল।

বোস-ডাক্তারকে ফি দিল পঞ্চাশ টাকা। শুকলাল চোখ টিপল। বোস-ডাক্তার বললে, 'দুই জোয়ারের রাস্তা, এখানে ফি আমার কম করে হলেও একশো টাকা।'

'তা গোসা করবার কি হয়েছে? পাইয়ে দিচ্ছি আপনাকে বাকি পঞ্চাশ।'

হুকুমালি তলব করল পড়শীদের। পাশানুল্লা, মানেরদ্দি, সোনামদ্দি, গহুরালি সরিফ মোল্লা, কলম সরদার, এমনি প্রায় কুড়ি বাইশ জন।

'শহর থেকে বড় ডাক্তার এসেছে, যার যা অসুখ, এই বেলা দেখিয়ে শুনিয়ে ব্যবস্থা করে নে সব। ব্যর কর নজরানা।'

এ তো মহা মুস্কিল। ভাদ্রমাসে এ সময় সবারই জ্বর-জারি হচ্ছে, কারু পেট খারাপ, কারু বুকে সর্দি বসা। একহাঁটু জলে মাঠে কাজ করে কে থাকতে পারে আস্ত-সুস্থ? তা, সবাই তো শুকলালের থেকে হলদে কুইনিন কিনে খেয়েছে, শুকলালকে টাকা দিয়েছে এক প্রস্ত। আবার এ গুনাগার কেন? তেমন খাওয়া-পরা নেই, বাত-বন্যার দেশ, অসুখ সবারই গায়ে একটু

না-একটু লেগে আছে। হুপ করে জ্বর না এলে বা পেটের ব্যথায় টোক্কা-খাওয়া কেন্নো না হলে কে আবার ডাক্তার ডাকে?

না, এ সুযোগ ছাড়া হবে না কিছুতেই। বাড়ির দরজায় কবে আসবে এমন পাশ-করা শহুরে ডাক্তার? হুকুমালির হুকুম। অমান্য করার সাধ্য নেই।

এর চোখ টেনে ওর জিভ বার করিয়ে এর পেট টিপে ওর বুক ঠুকে বোস-ডাক্তার নানারকম ব্যবস্থা বাৎলে দিলে। কারু দু টাকা কারু চার টাকা করে জরিমানা। বাকি পঞ্চাশ টাকা উশুল হয়ে গেল দেখতে-দেখতে।

এ পঞ্চাশের থেকে পঁচিশ টাকা শুকলাল নিলে। তার কমিশন। সব চেয়ে যে বিদ্বান ব্যবসা, ওকালতি আর ব্যারিস্টারি, সেখানেও মামলা জুটিয়ে দিলে দালালি পাওয়া যায়। ডাক্তারের বেলায়ই বা তার উলটোটা চলবে কেন? রবি বোসকে না ডেকে মনসা মুখুজ্জেকেও ডাকা যেত।

দুই ডাক্তার নৌকোয় উঠল। বোস যাচ্ছে ফিরে আর শুকলাল যাচ্ছে ওষুধ আনতে।

'কত আনলে ওষুধের জন্যে?'

'তিরিশ টাকা।'

'টাকা সাতেক লাগবে হয়ত।'

'বাকি টাকায় কিছু ওষুধপথ্য কিনে নিয়ে যাব ডিসপেনসারির জন্যে। এদের জ্বর একবার সারলেও আবার জ্বর হয়। ঘুরে-ঘুরে জ্বর হয়। ওটা বন্ধ করার জন্য কিছু টনিক দরকার। খুব ডিম্যান্ড হবে ও-সবের।'

শহরের সেরা দাওয়াইখানা গুরুচরণ ফার্মেসি। তার থেকে এক বাক্স ইনজেকশন কিনলে শুকলাল। কিনলে মিকশ্চার-পাউডার। সেলট্যাক্স সহ সাত টাকা সাড়ে তেরো আনা। আর বাকি টাকায় নিজের ডিসপেনসারির জন্যে সালসা-টনিক।

গাঁয়ে এসে যখন পোঁছুলো তখন আক্কেলালির বে-আক্কেল অবস্থা, শ্বাস উঠেছে। বোস-ডাক্তার দূরের কলে এসে এ অবস্থার সামনে কোনো দিন নিজেকে পড়তে দেয় না। পাছে চোখের উপর রুগী মারা গেলে ফি না দেয়। গেঁয়ো ডাক্তারের হাতে ফোঁড়াফুঁড়ির চরম দায়িত্ব রেখে শুধু ব্যবস্থা দিয়ে সরে পড়ে। বলে, 'আমাদেরকে ডাকেই একেবারে শেষ সময়।'

'ইঞ্জিশন এসেছে,' 'ইঞ্জিশন এসেছে,' সবাই কলরব তুলল। ছুঁচের এক ফোঁড়েই আক্কেলালি চোখ মেলবে। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসবে।

'আর ভয় নেই।' কোট খুলে ফেললে শুকলাল।

প্যাক করা আঁট বাক্স, এক কোণে খানিকটা সুতো ঝুলছে। এই সুতো ধরে টানলে বাক্সের ডালা সুতোর লাইন ধরে কেটে যাবে। ভিতর থেকে বেরুবে ইনজেকসনের য়্যামপিউল। ভিতরে ছুরির পাত আছে, তা দিয়ে ডগা কেটে ছুঁচে ভরে নিতে হবে ওষুধটা। তারপর ফুঁড়তে হবে বিসমিল্লার নাম নিয়ে।

শুকলাল বাক্সের ডালা ছিঁড়ল। কিন্তু কোথায় য়্যামপিউল। চারটে খোপে চারটে কাগজের ঢিপলে!

'ওষুধ নেই।' শুকলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল : 'খাঁচা থেকে পাখি বার করে নিয়েছে শালারা।'

হুকুমালি পাথর হয়ে রইল। হাতের লাঠিটা কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

এলোধাবাড়ি ছুটোছুটি করতে লাগল শুকলাল। এখন কি করে, কি করে বাঁচায় আক্কেলালিকে? হুকুমালি জুলুম করেছে, বোস-ডাক্তার জুলুম করেছে, কিন্তু এ জুলুমবাজির তুলনা কোথায়। মুমূর্ষুর প্রাণ নিয়ে জোচ্চুরি! প্রাণ শুধু আক্কেলালিরই যাবে না, শুকলালেরও যাবে। বাক্সের পেটের মধ্যে সে ঢুকতে পারত না এ বুঝলেও হুকুমালি তাকে ক্ষমা করবে না। ব্যবসাপত্র তুলে এবার চলে যেতে হবে চর অঞ্চলে। ডাক্তারির তকমা খুইয়ে হতে হবে হাতুড়ে-নাপিত।

ডিসপেনসারিতে চুপচাপ বসে ছিল শুকলাল। অনেক দিনের মেঘলার পর আজ রোদ উঠেছে। কিন্তু শুকলালের মনে এক ফোঁটা সুখ নেই। কবে যে হুকুমালির আক্রোশ দাঙ্গা ও আগুনের আকারে দেখা দেবে তার চারপাশে, তারই ভাবনায় সে মুষড়ে আছে। যে প্রকাণ্ড জুয়াচুরিটা শুকলালের হাতের উপর হয়ে গেল, তাতে শুকলালের কোনই অংশ নেই, এ কথা হুকুমালিকে কেউ বিশ্বাস করতে দেবে না।

লাঠির শব্দ হতেই শুকলাল ত্রস্ত হয়ে চোখ চেয়ে দেখল, সামনেই হুকুমালি। কতক্ষণ দু'জন একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

'মন খারাপ কোরো না, শুকলাল। তোমার জন্যে এই এক তোড়া টাকা এনেছি।' বলে এক থলে টাকা হুকুমালি শব্দ করে শুকলালের টেবিলের উপর রাখলে। বললে, 'তিন গাঁয়ের মধ্যে এই একটা মাত্র ডাক্তারখানা। এই টাকা দিয়ে ভালো দোকান থেকে ভালো দেখে ওষুধ কেন তুমি, তোমার ডিসপেনসারি সাজিয়ে ফেল। আমার আক্কেলালি গেছে, কিন্তু পাশানুল্লা, মানেরদ্দি, সোনামদ্দি, গহুরালির ছেলেরা যেন না মরে।'

৩৭। সরবানু ও রোস্তম

খোকা মারা গেল।

পাশেই ঝুরুলি গ্রাম। সেখানে লোক গিয়েছিল রোস্তমকে ডেকে আনতে। যদি অন্তত এ সময়েও সে আসে। কিন্তু সে এল না। বরং বলে পাঠাল, 'কার না কার ছেলে—তার ঠিক নেই।'

কাঁদতে-কাঁদতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সরবানু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

পাড়ার মুরুব্বি এসে বললে, 'এবার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হোক।' কারী এল। বাজার থেকে এল নতুন কাপড়, গোলাপজল, আতর-কর্পূর। এল খাটিয়া। খোকাকে একটা তক্তার উপরে শুইয়ে সরবানুর নানী গরম জলে তার গা ধুইয়ে দিল। খাটিয়ার উপর পাতলা কাপড়—দুটো চাদর, একটা খেলকা। ছিটিয়ে দিল আতর-কর্পূর, গোলাপজল। খোকাকে এনে তার উপর শুইয়ে খেলকা আর চাদর মুড়ি দিয়ে মাথার উপর, পায়ের তলায় আর মাজায় তিন বাঁধন দেওয়া হল। নতুন কাপড়ের সুতোর বাঁধন। তারপর কারী জানাজা নামাজ পড়ল। তারপর—তারপর খোকাকে নিয়ে গেল কবরখোলায়। জন্মের মতো চোখের আড়াল হয়ে গেল সরবানুর!

শুনেছে বাড়ির পাশেই, বাগানে, খোকাকে গোর দেওয়া হয়েছে। কবরের উপর বাঁশ দিয়ে তার উপর মাদুর দিয়ে, তার উপর মাটি দিয়েছে। জাফরির বেড়া দিয়েছে চার ধারে, যাতে শেয়ালে না খোঁড়ে। এত কাছে, তবু যেন কোথায়!

ছেলে সবে তিন মাস পেটে এসেছে, সরবানু চলে আসে তার বাপের বাড়ি। তারপর এই কেটে গেল তিন বছর। একটানা।

সে কি অমনি এসেছে? অমনি কি কেউ আসে? এলেও বাপের বাড়িতে বসে অশান্তির ভাত খায়?

তাকে তার স্বামী আর শাশুড়ী তাড়িয়ে দিয়েছে।

তাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিত, মারধোর করত, মুখে কাপড় পুরে ঝাঁটা দিয়ে ঠেসে রাখত। মার সহ্য করা যায়, কিন্তু খিদে বোধহয় সহ্য করা যায় না। ওকে দিত এই খাওয়ার কষ্ট। কুকুর-বাঁধা লোহার শিকল দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখত ওকে, কিছু এসে যেত না, যদি খেতে দিত পেট ভরে, একটু বা আদর-ভক্তি করে। থালাবাসনে না দিয়ে মালসায় করে ভাত দিত, যে-মালসায় কুকুরে খায়। তাও নুন জল ভাত সব একত্র করে। নুন-জলের বেশি আর কিছু মিলত না ডাল-তরকারি।

অপরাধ কী সরবানুর? সরবানু খুবসুরত নয়। সে বে-পছন্দের মেয়ে। ধারধোর করে বাপ বিয়ে দিয়েছিল তার। দিয়েছিল সোনার পাশি-মাকড়ি নোলক আর সিতাপাটি। রুপোর চুড়ি ছয় গাছা, তাবিজ দুই পাটি, মল এক জোড়া। সব কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা। ওরা যা দিয়েছে তা তো কোনোদিন গায়েই ওঠেনি। মুখ-দেখানি দিয়ে গিয়েছিল পাঁচটি টাকা, তাও আঁচলের খুঁট থেকে কবে খুলে নিয়েছে।

এক এক দিন রাতে রোস্তম এসে তার শিকল খুলে দিত। একদিন খাটে না উঠে সোজা দরজা খুলে সরবানু চলে এল তার বাপের বাড়ি, গাং-ভেড়ির উপর দিয়ে। এতটুকু তার ভয় করল না।

সেই থেকে তিন বছর সে আছে তার বাপের কাছে। আর এই তিন বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও রোস্তম এমুখো হয়নি। খোঁজ খবর নেয়নি। দেয়নি খোরাক-পোশাক।

তার বাপ, কছিমদ্দি, জমিজমা খুইয়ে এখন শুধু ভাগচাষী। লাঙল-গরু নেই, মজুরো কবুলতিতে চাষ করে। দিনান্তর খাওয়া হয় না। তারই সংসারে সে কিনা এসে ভাগীদার হল। ছেলে হবার পর খবর পাঠিয়েছিল, যদি এবার ওদের মন টলে। ছেলে মারা যাবার পর আবার পাঠিয়েছিল, যদি বা গলে এবার।

দু'বারই এক তুরুক জবাব : 'কার না কার ছেলে তার ঠিক নেই।'

আর নয়। গাঁয়ের মোড়ল-মাতবররা বললে, 'এবার বিয়ে-ছাড়ানোর মকদ্দমা করো। মারপিট করত, তিন বছরের উপর খোরপোশ দেয়নি—মামলা এক ডাকেই ডিক্রি হয়ে যাবে।'

দুর্বল, মকদ্দমা করবো কি!—কছিমদ্দি চুপ করে চেয়ে থাকে।

'কিছু ভাববার নেই। মকদ্দমার খরচ আকুঞ্জি সাহেব দেবেন বলেছেন। বলেছেন,—বিয়ে ছাড়ান পেলে নিকে করবেন সরবানুকে।' হোমরা-চোমরাদের মধ্যে কে একজন বললে।

'আকুঞ্জি সাহেব! কই শুনিনি তো!' মজলিসে সাড়া পড়ে গেল।

'হ্যাঁ, হাঁটানে-ছেলে-সুদ্ধ নিকে করবেন না, এই ছিল তাঁর গোঁ। ছেলে এবার মরেছে, আকুঞ্জি সাহেবও তাই এগিয়ে এসেছেন।'

তবে আর কথা কী! আকুঞ্জি সাহেবের মতো লোক! এত বড়ো গাঁতিদার! বোর্ডের যিনি প্রেসিডেন্ট! খাঁ-সাহেব হবার জন্যে আদা-জল খেয়ে লেগেছেন। তিনি চান সরবানুকে! কছিমদ্দির বুক আহ্লাদে উছলে উঠল।

তবে ডাক দাও এবার দিদার বক্সকে। কছিমদ্দিকে নিয়ে যাক উকিল-সাহেবের সেরেস্তায়। বিবাহ-বিচ্ছেদের আর্জির মুশাবিদা হোক।

এতটা হাঙ্গামা-হুজ্জত সরবানুর পছন্দ হয় না। মামলা-ফয়সালা করে লাভ কী! তার চেয়ে সবাই যদি ধরে-পড়ে চাপ-চুপ দিয়ে রোস্তমকে রাজী করাতে পারে মাস-মাস বরাদ্দ কিছু টাকা পাঠাতে, তা হলেই সে বর্তে যায়। রোস্তমদের অবস্থা তো ভালো। বাড়িতে টিনের ঘর, কাঠের খুঁটি। জোন-মান্দার দিয়ে চাষ করায়। গাড়ি-গরু রাখে। অনায়াসেই ক'টা টাকা ফেলে দিতে পারে। পেটের ভাত, পরনের কাপড়টা চলে যায়। নিকে-সাদিতে সুখ কই।

কিন্তু রোস্তম একেবারেই কাঠ-গোঁয়ার। টাকাকড়ি তো দেবেই না, বরং উলটে বদনাম দেবে। খাওয়া-পরার চেয়েও মান-ইজ্জত বড়ো জিনিস। না, আর সে কাকুতি-মিনতি করতে পারবে না। চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এবার দাঁড়াবে সে নিজের জোরে, নিজের অধিকারে। আইনের হাওয়ালায়।

তাই ডাক পড়ল এবার দিদার বক্সের। বাঘের মুখে যেন হরিণ পড়ল। তুষের গাদায় আগুনের ছিটে।

এই অঞ্চলটা হামিদ সাহেবের প্রতাপের মধ্যে। তা ছাড়া এ বিয়ে-ছাড়ানো মকদ্দমায় তাঁর মতো ওস্তাদ-ওস্তাগর আর কেউ নেই।

ঝরুলি গ্রামে সমন জারি হল রোস্তমের উপর। এ গ্রাম উকিল হরিসহায়-

বাবুর জিম্মাদারিতে। তাঁর দালাল হৃদয় ঘোষ রোস্তমকে প্রায় ঘোড়া-ছুটিয়ে নিয়ে এল তাঁর বৈঠকখানায়।

যারা দালাল তারাই মুহুরি। আর এই মুহুরিদের মুঠোর মধ্যেই যত মামলা-মকদ্দমা। তারা উকিলের থেকে মুনফা নেয়, মক্কেলের থেকে মেহনতানা। তারা আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।

রোস্তম জবাব দেয় : সমস্ত ভুয়ো, সমস্ত মিথ্যে কথা। একদিনের জন্যেও সে সরবানুর গায়ে হাত তোলেনি, দাবড়ি দিয়ে কথা বলেনি কখনো। লায়লা-মজনুর মতো তাদের ভালবাসা ছিল। সমস্ত তার শ্বশুর কছিমদ্দির জালসাজি। বিয়ে ভেঙে দিয়ে নিকে দেওয়াবে। মেয়ে মোটা টাকা পাবে দেনমোহরের, আর নিজেও সে আদায় করবে তহরি। কছিমদ্দি একটি পাকা শয়তান। বড়ো মেয়ে কুলসমকেও এমনিভাবে বিয়ে ভাঙিয়ে নিকে দিয়েছে।

দ্বিতীয় দফায় : সরবানু বাপের বাড়িতে আছে মোটে দেড়বছর। দুই বছর ধরে খোরপোশ না দিলেই তবে বিয়ে ভাঙার একতিয়ার হয়। সেই দুই বছর এখনো পুরো হয়নি। তা ছাড়া যে মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ওঠা-বসা করে না, কুমতলবে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে, তার খোরাক-পোশাক কী।

তৃতীয় দফায়—আর এখানেই হরিসহায়বাবুর নিজস্ব খোদকারি : মেয়েটা খারাপ, একেবারে খাস্তা।

তাই যদি, তিন-তালাক দিয়ে দে না। কছিমদ্দির দল রোস্তমের কাছে গিয়ে ঝাপটা মারে। যে মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, তার সঙ্গে আবার পীরিত কিসের ? যাক না সে জলে ভেসে।

'না, আমি তালাক দেব না। আমার মান আছে।' রোস্তম গম্ভীর হয়ে বলে : 'আমি বউ-ফিরে-পাবার উলটো মামলা করব।'

সুতরাং দু'-পক্ষে শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। যন্ত্রতন্ত্র। সাক্ষী সাজানোর কারিগরি। মেয়ের পক্ষে, প্রথমে, মহিম ঘাসী। তিন বছর আগে জ্যৈষ্ঠের এক জ্যোৎস্নারাতে সে সরবানুকে দেখেছিল হেঁটে যেতে গাং-ভেড়ির উপর দিয়ে, ঝুরুলি থেকে নাগরপুরের দিকে।

'তুমি তখন করছিলে কী অত রাতে?'

'কুটুম-সাক্ষাৎ করে বাড়ি ফিরছিলাম।'

হ্যাঁ, নাগরপুরে কছিমদ্দির বাড়ির থেকে বিশ-কুড়ি রশি দূরেই তার ভিটে। পাড়াসুবাদে সরবানু তাকে নানা বলে ডাকে।—হ্যাঁ, একটুখানি অন্তরে-অন্তরে থেকে বাকি পথটুকু এগিয়ে গিয়েছিল মহিম।

উলটো দিকে কাটান-সাক্ষী মমিন গাজি। সে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান। তার গাড়িতে চড়েই কছিমদ্দি তার মেয়ে নিয়ে গেছে, গেল বছর আগন মাসের শেষে। ফসল উঠে যাবার পর টানা মাঠের উপর দিয়ে। আলগা সাক্ষী আছে আরো। সাধু দালাল আর জুড়ন সরদার। এরা কেউ খাতির-খাতরার লোক নয়, চুনের ঘরে সব ধর্মকথা বলে যাবে।

আরো সব শাঁসালো সাক্ষী আছে রোস্তমের। পাড়াপড়শী। আলতাপ আর আরমান কারিকর। কেউ এরা শোনেনি কোনোদিন হুড়-ঝগড়া। খারাপ-মন্দ কথাও একটাও কানে আসেনি। যদি মারপিট হবে তবে চিক্কুড় মেরে কাঁদবে তো মেয়েটা। কোনো একটা টুঃ শব্দও কানে পৌঁছোয়নি।

কছিমদ্দির দল বলে, 'ঘরের বউ কি চেঁচিয়ে কাঁদবে নাকি? পাড়া মাথায় করে? সাক্ষী রেখে? সে কাঁদবে গুমরে-গুমরে, বন্ধ বুকের মধ্যে। তা ছাড়া সরবানুর খালু, রাজাউল্লা, নিজের চোখে সরবানুর পায়ে শেকল দেখে আসেনি? ওদের বাড়িতে জন দিত যে গোপাল মাল্লা, সে দেখেনি তার ভাত খাবার মালসা? কাঁদবে কি? মার খেতে-খেতে মারঘেঁচড়া হয়ে যায়নি সে?'

দু'-পক্ষেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। সাক্ষী ভাঙাবার ফিকির খুঁজছে দু'দলেই। দিদার বক্স আর হৃদয় ঘোষ এসে বিরুদ্ধ তাঁবুতে বসে ফিসির-ফিসির করে। এটা-ওটা তদবির করতে হবে বলে পয়সা নেয়। তারপর একই হাঁটা-পথ দিয়ে পাশাপাশি খোশগল্প করতে-করতে শহরে ফেরে।

হৃদয় বলে, 'মেয়ের ঐ খালু রাজাউল্লো ভারি তেজী সাক্ষী। বড়ো জোতদার, তাই ইউনিয়ন-বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ওকে যদি হাত করতে পারা যায় তা হলে আর কথা নেই।'

ওদিকে দিদার বক্স বলে, 'পাড়ার সাক্ষী একটা খাড়া করা দরকার। এতটা নির্যাতন হল মেয়েটার ওপর, আর পাড়ার কেউ জানতে পারবে না? পাড়ার লোক এককাট্টা হয়ে থাকে, কুচ পরোয়া নেই, আমি দাঁড় করাব পাড়ার লোক। এই তো সামনেই আছে—ফরিদ মণ্ডল। এমন শেখা-শিখিয়ে দেব যে, কলকাত্তা বোম্বাই বনে যাবে।'

এদিকে টাকা খরচ করে আকুঞ্জি সাহেব; ওদিকে রোস্তমের চাচা, বসিরদ্দি।

শুনানির দিন পড়েছে, মাস দুয়েক পরে।

এখন কথা উঠেছে সরবানুর জবানবন্দিটা কমিশনে হবে কিনা।

দিদার বক্স বলে, 'বা, কমিশনেই হবে বৈকি। পর্দানশিন স্ত্রীলোক, সে কি আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে নাকি? কী বলেন আকুঞ্জি সাহেব?'

কখনই না। যত টাকা লাগে আকুঞ্জি সাহেব রাজী।

কিন্তু সরবানু রাজী নয়। সে বলে, 'না। আমি আদালতে, হাকিমের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। উঁচু গলায় বলব আমার দুখের কথা। যারা গরিব, যাদের কেউ নেই, হাকিমই তাদের মা-বাপ।'

অন্তরালে কছিমদ্দি তাকে বোঝাতে আসে। সরবানু ঝিলিক মেরে বলে ওঠে, 'আকুঞ্জি সাহেব আমাদের কে? ওর ঠেঙে টাকা খেতে যাব কেন আমরা? বিয়ে তো এখনো ছাড়ান পাইনি।'

দিদার বক্সের বাড়া ভাতে যেন ছাই পড়ে। কমিশন-জবানবন্দি হলে আরেক কিস্তি পয়সা। উকিল-আমলা-মুহুরি-পেয়াদা। ওর যেন গো-ভাগ্য নয়, এ'টুলি ভাগ্য।

'শুনেছ? বাদিনী কমিশন করাবে না। এ যে প্রায় ধান পাকিয়ে মই দিয়ে দিলে!' দিদার বক্স হৃদয় ঘোষের কাছেই নালিশ করে!

'আর বলো কেন!' হৃদয় ঘোষেরও একই নালিশ : 'রোস্তমকে বললাম, তোমার মার একটা কমিশন-জবানবন্দি করাও। আর্জিতে তোমার মার নামে বলেছে অনেক নরম-গরম, সাফাই একটা তার দিয়ে রাখো। ছেলে তাতে রেগে প্রায় মারতে আসে! বলে, আমাতে-তে কাণ্ড, তাতে মাকে টানো কেন?

'আমি ভয় খাইয়ে দিয়ে এসেছি কছিমদ্দিকে। বলেছি, মেয়ে তোমার আদালত-আদালত করছে, হকচকিয়ে গিয়ে সব শেষে ভণ্ডুল করে দেবে।'

'আমিও ছেড়ে দিইনি! বলে এসেছি, তোমার মা যদি না নিজের মুখে আর্জির কথা অস্বীকার করে, তবে আর দেখতে হবে না, মামলা নির্ঘাত ডিক্রি হয়ে যাবে।'

দুই বন্ধু পাশাপাশি হেঁটে যায়। মুখের কাছে মুখ এনে এক কাঠিতে বিড়ি ধরায় দুজনে।

দু'-পক্ষই ভয় পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে। কেননা আপোস-নিষ্পত্তির কথা উঠেছে একটা : দশ-সালিস ডেকে মিট করিয়ে ফেলো। গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বররা নিজের থেকেই মজলিস ডেকেছে।

দু'পক্ষেরই ভয়। সরবানু যদি জেতে তবে রোস্তমের মান যায়, মুখ পোড়ে। দেনমোহরের বাজার চড়ে যায় দেখতে-দেখতে। বউ-কাঁটকী বলে মার অপবাদ হয়। আর যদি রোস্তম জেতে, তবে জন্মের মতো সরবানু অন্নদাসী হয়ে ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়ায়। মামলার ফলাফল কিছুই বলা যায় না, তরাজু কখন কার দিকে ঝুঁকে পড়ে! তাই দু-পক্ষই সায় দেয়, উস্কে দেয় সালিসবাবুদের।

সালিসের শর্ত খুব সোজা। রোস্তম সরবানুর বরাবর একটা তালাকনামা সম্পাদন করে দেবে, আর তার পণস্বরূপ সরবানু দেবে তাকে পঞ্চাশ টাকা।

মন্দ কী। ভাবলে রোস্তম। যে মেয়ে বশ মেনে থাকতে চায় না, কী হবে তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে? দূর করে দিয়ে নতুন বউ ঘরে আনবে। মন্দ কী, মাঝের থেকে পঞ্চাশ টাকা রোজগার। পড়ে পাওয়ার চোদ্দ আনাই লাভ।

মন্দ কী। ভাবলে সরবানু। যে ভাবে হোক বিয়ে ছাড়ান পেলেই হল। আখোচ করে কী হবে। গায়ে এখন আর কোনো দাগ-জখমও নেই, জ্বালা-যন্ত্রণার ঝাঁজও এখন মুছে গেছে মনের থেকে। টাকা কে দেয় না-দেয় তার খোঁজে তার কী দরকার। ছেলে একটা তার অনাদরে মরে গেছে বটে, কিন্তু তাই বলে তার শরীরের জোর মরে যায়নি।

আপোস-রফার কথা উঠতেই আরেক মহলে আগুন জ্বলে উঠল। হৃদয় ঘোষ-দিদার বক্স নয়, এবার আসল ঠাকুরের স্থান। আগুন জ্বলে উঠল হরিসহায়বাবু আর হামিদ সাহেবের জঠরে। আপোস হওয়া মানেই গোড়া ধরে গাছ কেটে ফেলা। এ বজ্রপাত মাথা পেতে সইবেন না তাঁরা কখনো। অন্তত পঁচিশ টাকা করে না পেলে তাঁরা ছোলেনামায় দস্তখত দেবেন না।

এমনিতে দু'টাকা পেলে যাঁরা টঙে ওঠেন তাঁদের হাঁকার আজ—পঁচিশ টাকা। মক্কেলের আপোস আর উকিলের আপসোস। উপায় কী? কুড়িয়ে খেতে না পেলেই কেড়ে খেতে হয়।

উকিলরা ঘাড় বেঁকায় দেখে পক্ষরাও পিছিয়ে পড়ে। দু'দিক থেকে হৃদয় ঘোষ আর দিদার বক্স শক্ত হাতে পাঁচন কষতে থাকে। শুধু উকিলের সই? মেহনতানা নেই? আমলায়ানা?

আর, দুর্বল ছাড়া আপোসে রাজি হয় কে? মোকদ্দমায় যার যতখানি জিদ, তার ততখানি জিত।

সালিসরা ছোড়ভঙ্গ হয়ে যায়। পক্ষরা আবার নিজের-নিজের কোটে ফিরে গিয়ে ঘোঁট পাকায়।

সত্যি, কোনো মানে হয় না—রোস্তম মনে-মনে বলে। আপোস হয়ে গেলে বশুর কছিমদ্দি জব্দ হয় না। থোঁতা মুখ ভোঁতা হয় না সরবানুর। রোস্তমের কী? একটা ছেড়ে চারটে পর্যন্ত সে বিয়ে করতে পারে। গায়ে পড়ে তালাক দিতে যাবার তার কি হয়েছে?

সত্যি, কোনো মানে হয় না—এ সরবানুরও মনের কথা। সে আদালত করেছে, আদালতই তাকে আশ্রয় দেবে। এমন দাঙ্গাবাজের সঙ্গে আবার আপোস-রফা কী। লাথি-চড় মেরে না-খেতে দিয়ে শরীরের জেলাস কেড়ে নিয়েছে, তার উপরে এই বেইজ্জতি! বলে,—কার ছেলে কে জানে। তাকে আবার টাকা দিয়ে তোষামোদ করা! কখনো না।

হৃদয় ঘোষ আর দিদার বক্স আবার বিড়ি ধরিয়ে শহরে ফেরে।

সরবানু সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায়।

গায়ে-মুখে বোরখা নেই। আলগা একটা ছোট কাপড় গায়ের উপর চাদরের মতো করে ভাঁজ করে নিয়েছে। মাথার কাপড় মাথা থেকে এক চুলও নেমে আসেনি। চোখ দুটো টলটল করছে। অনেক কথা বলে ফেলার অধৈর্যে।

'কি উকিল সাহেব', হাকিম জিগগেস করলেন এজলাস থেকে : 'মামলা মিটিয়ে ফেলুন না?'

সরবানু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'জীবন বিসর্জন দেব, তবু মামলা মিটিয়ে নিতে পারব না ওর সঙ্গে।'

রোস্তমের দল হরিসহায়বাবুর পিছন ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। বে-আব্রু হয়ে সাক্ষী দিতে এসেছে, সরবানুর এই বেহায়াপনায় রোস্তম প্রথমটা তর্জন করে উঠেছিল—তার স্ত্রী হয়ে এই অশিষ্টতা! কিন্তু বেগতিক হয়ে তাকে ঠান্ডা হতে হয়েছে,—সরবানু আর তার স্ত্রী থাকতে রাজী নয়। সে বেছপর, তাই সে বে-পরদা।

লম্বা জবানবন্দি হচ্ছে সরবানুর। রঙ ফলিয়ে তার মারের কাহিনী বলছে। তার না-খেতে পাওয়ার কাহিনী। গলাটা বড্ড খরখরে স্পষ্ট। এতটুকু থামে না, দমে না। জায়গা বদলায় না। সত্যের সুর যেন এসে কানে লাগে।

তারপর ছেলের কথা উঠল। এবার সরবানু ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। এ একেবারে তার আরেক রকমের চেহারা। বর্ষার আকাশের মতো। কাঁদতে যদি একবার শুরু করল, আর থামতে চায় না। কেবলই বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। শরীরটা ঝাঁকানি খেয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বড়ো রোগা হয়ে গেছে সরবানু। অনেক জুড়িয়ে গেছে তার গায়ের রঙ। ড়ান ভুরুর উপরে মারার সেই কালো দাগটা কেমন করুণ করে রেখেছে তার চোখের চাউনিটিকে। হাতে শুধু দু'গাছা গালার চুড়ি। খালি পা। পরনের শাড়িটা মোটা, আধ-ময়লা। বুকের থেকে, কোলের থেকে, দুই বাহুর মধ্যে থেকে কী যেন চলে গিয়েছে এমনি একটা খালি-খালি ভাব।

জেরায় উঠে হরিসহায়বাবু প্রথমেই ছেলের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়ে একটা জট পাকিয়ে তুললেন। তার সঙ্গে বিয়ের তারিখ, বাপের বাড়ি যাবার তারিখ, আর্জি-দাখিলের তারিখ সব একত্র করে বাধিয়ে দিলেন গোলমাল।

ধাঁধা লেগে গিয়েছে সরবানুর। ভুল করে ফেলছে। উলটা-পালটা বলছে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছে। এমনি করলে মামলা সে জিতবে কী করে? তার জন্যে কষ্ট হয়। মায়া করে।

'আফটার দি রিসেস—' হাকিম হঠাৎ কলম রেখে খাস-কামরায় নেমে যান।

এক জেরাতেই মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে—রোস্তমের দল খুশি হয়ে ওঠে।

আধ ঘন্টা পর হাকিম আবার উঠে আসতেই মামলার ডাক পড়ে। হাজিরার সব সাক্ষীই আছে, শুধু সরবানু আর রোস্তমকেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

তারা ততক্ষণে টাবুরে নৌকোয় করে ইছামতিতে ভেসে পড়েছে।

তাদের জীবনে এমন একটা দিন কোনোদিন আসেনি। তাদের চার দিকে উকিল-মুহুরি আমলা-ফয়লা সাক্ষী-সাবুদের ষড়যন্ত্র—তারি মধ্যে থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছে তারা। চলে এসেছে নদীর উপর, ঝকঝকে আকাশের নিচে। আর কে তাদের ধরে! যদি ধরে, জলে লাফিয়ে পড়বে তারা। সাঁতরে পার হয়ে যাবে।

'খোকাকে কোথায় গোর দিয়েছিস?' জিগগেস করে রোস্তম।

'বাগানে—' রোস্তমের কাঁধের কাছে মুখ গুঁজে সরবানু ফুঁপিয়ে ওঠে।

'বাগান? বাগান কোথায়?'

'নামে বাগান। আওলাত-ফসল কিছুই নেই। শুধু একটা গাব গাছ। সেই গাবগাছের তলায়—'

'চল্, দেখে আসি।'

৩৮। কালনাগ

ভবতোষ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল, আত্মহত্যা। আত্মহত্যা ছাড়া কোনো পথ নেই সমাধানের। পরাজয়-মোচনের।

সমস্ত রাত ছটফট করেই তার কাটতো, যদি না শেষ রাতের দিকে চাঁদ উঠতো পীত-পান্ডু। চাঁদ দেখে তার আশা হলো একবার, এই বুঝি আকাশ ছিঁড়ে যাবে বন্য চীৎকারে আর দেখতে-না-দেখতে সে তার সমস্ত নিয়ে আগুনে অঙ্গার হয়ে উঠবে। তার সমস্ত অর্থ—তার লজ্জা, তার দৈন্য, তার সাহসহীনতা। তার এই আনর্থক্য।

কিন্তু আজকের চাঁদ আতঙ্কের চাঁদ নয়, ঘুম পাড়াবার চাঁদ। একটু ঘুমুলোই না-হয় ভবতোষ। কাল যে আত্মহত্যা করবে চাঁদের বৈমুখ্যে আজকে তার নালিশ না করলেও চলে।

ভবতোষ সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়লো। অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে ভুললো যে কাল তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। ভুললো, তিন দিন ধরে আধপেটা খাচ্ছে, সাত দিনের উপর সে ঘুমুতে পাচ্ছে না, এক মাসেরো উপর পরনে তার একটা আস্ত কাপড় নেই। ভুললো সংসারে যে চিনির পাট নেই, জুতোর হাঁ-টা যে বোজানো যাচ্ছে না, কয়েক দিন আগে একমাত্র লেখবার টেবিলটা যে পোড়াতে হয়েছিল কয়লার অভাবে। ভুললো তার অসহায় স্ত্রী, অসহায়তর শিশুগুলি। ভুললো সে ইস্কুলমাস্টার।

সংকল্পের উত্তাপের দরুন তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙলো ভবতোষের। দিনের আরম্ভটি কেমন যেন নতুন লাগলো।

নতুন লাগলো, সুধার কাংস্য-কর্কশ কন্ঠস্বর অনেকক্ষণ শোনা গেল না। তার অগণিত অভিযোগের তালিকা। তবে কি ঘটেছে কিছু অভূতপূর্ব? শোঁকা যাচ্ছে কি উনুনের ধোঁয়া?

ভবতোষ নেমে এলো তক্তপোষ ছেড়ে। নিচে মেঝের উপর গড়াচ্ছে এখনো শিশুগুলি, সুধার জায়গাটা শুধু ফাঁক। যেখানে ঘুম মানে বিস্মরণ সেখানে এত ভোরে ওঠবার মানে কী? আর উঠলোই যদি, নিজেকে সে জানান দিচ্ছে না কেন?

ছাত নেই, ভবতোষ তাই খুঁজলো একতলাতেই। কোথাও সুধার ঠিকানা পাওয়া গেল না। রান্নাঘর থেকে কলতলা—কতটুকুই বা জায়গা—ঘুরে ঘুরে বারে-বারে ভবতোষ দেখতে লাগলো, কোথাও সুধা নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়লো সদরের খিল খোলা।

একটা ছুরির ফলা ভবতোষের বুকের মধ্যে যেন দাগ কেটে দিল—তবে

কি সুধা ঘরে নেই? দরজা খুলে গলির মোড় পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সে ঘুরে এলো, একটা ঝাড়ুদারনি ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রীলোক দেখা গেল না।

ভবতোষ কি পাগল না অসৎ যে স্ত্রীকে অসতী ভাববে? নিশ্চয়ই আছে কোথাও বাড়ির মধ্যে। সদরে খিল দেয়া নেই, মানে দিতে ভুলে গিয়েছিল।

ফিরলো ভবতোষ। ঢুকলো শোবার ঘরে। ছেলে-মেয়েগুলো তেমনি ঘুমে, কিন্তু ওদের মা কোথায়? চেঁচিয়ে ডাকা যায় না, তবু ডাকলো দুবার সুধা বলে। তক্তপোষের তলাটা শুধু দেখতে বাকি ছিল, তাও দেখলো। বাইরে যদি-বা গেছে, নিশ্চয়ই সেটাকে বাইরে বলে না। ফিরে আসবে এখুনি। রোদ ওঠবার আগেই। কিন্তু তাকে না বলে প্রায় রাত-থাকতে সদর খুলে সে বাইরে যাবে সেটাই বা কোন দিশি? রোজই যায় নাকি এ রকম?

কোনো কিছু হদিস রেখে গেছে কি না ভবতোষ তাই খুঁজতে লাগলো ব্যস্ত হাতে। তক্তপোষে তার তোষকের তলাটাই হচ্ছে সুধার চিঠিপত্র রাখার জায়গা। উলটে-পালটেও কোনো খেই পেল না কিছুর। শুধু সুধার নিজের বালিশের নিচে চাবির গোছাটা পড়ে আছে। বুকটা কেঁপে উঠলো ভবতোষের —চাবি যখন নেয়নি আঁচলে বেঁধে, তখন সে বুঝি আর ফিরে আসবে না।

চাবি দিয়ে ভবতোষ সুধার হাতবাক্সটা খুলে ফেললো। যা ভেবেছিল সে। সুধা আর নেই। সুধা তার হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি হাতবাক্সে রেখে গেছে।

ঐ দুগাছি সোনার চুড়িই সুধার শেষ আভরণ। আর বাকি যা-কিছু ছিল কাগজের টুকরোয় পর্যবসিত হয়ে জঠরের আগুনে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। ঐ দুগাছি রেখে দিয়েছিল সে আয়তির চিহ্ন হিসেবে তত নয়, যত একটা কিছু বড় রকমের বিপদ-বিশৃঙ্খলার হাত এড়াতে। যদি বোমা পড়ে কোলকাতায় আর তাদের চলে যেতে হয় শহর ছেড়ে, তবে ঐ দুগাছি সোনার চুড়িই হয়তো তাদের কিছু দূরের পথ দেখাবে। তাই সব সময়ে হাতে রেখেও তাতে হাত দেয়নি সে কোনো দিন। সেই চুড়ি দুগাছা আজ তার হস্তচ্যুত! কী মানে দাঁড়ায় এর?

স্পষ্ট, অবধারিত। সুধাই গেছে আত্মহত্যা করতে। ভবতোষের আগে, ভবতোষকে কলা দেখিয়ে। তার পতিবত্নীত্ব বজায় রেখে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভবতোষ রাস্তায় বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। যতক্ষণ না জানতে পারে। যতক্ষণ না জানতে পারে ক্ষুধার দগ্ধশলাকা।

কোথায় যেতে পারে সুধা? কোথায় আবার! গঙ্গায় নিশ্চয়। এখন জোয়ার এসেছে গঙ্গায়। আর, সুধা সাঁতার জানে না। সন্দেহ কী!

বেশি দূর নয় গঙ্গা। গলি থেকে বেরিয়ে ডান দিক খানিক গিয়ে মোড় ঘুরলেই। প্রায় ছুটতে-ছুটতে ভবতোষ পৌঁছুলো গঙ্গার ঘাটে। এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে। ভিড় জমেছে প্রাতঃস্নাতকদের। কোথাও সুধার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। না ঘাটে না জলে।

ভীষণ হৃতবল মনে হতে লাগলো ভবতোষের। নিরাশ, নিরুৎসাহ। সে

পারলো না আগে মরতে। পারলো না বাঁচিয়ে রাখতে তার আত্মহত্যার ইচ্ছা।

ফের ফিরতে হয় বাড়ি। কে জানে, হয়তো ফিরেই দেখতে পাবে সুধাকে। গঙ্গা থেকে স্নান করে বাড়ি ফিরেছে ভেজাচুলে। উনুন ধরিয়েছে। কিন্তু তারপর, রাঁধবে কী? চাল কই?

তবু, সে ফিরেছে এই লালসাটি লালন করেই; ভবতোষ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করলো। দেরি করলো খানিকক্ষণ। যেন ফিরতে সময় দিল সুধাকে।

হয়তো মন থেকে আত্মহত্যার ইচ্ছাটাকে তুলে ফেললেই সুধাকে ফিরে পাবে সে। হঠাৎ এই জন-প্রবাহকে ভালো লাগলো তার, ভালো লাগলো রোদের প্রথম ঝাঁজ, খানিক পরে ফের মেঘলা হয়ে যাওয়া। সুন্দর বলে মনে হলো সুধাকে। তার শরীরের ঠামটি মনে হলো এক টানে একটি লাবণ্যের রেখাঙ্কন। মৃত্যুর থেকে মুখ ফিরিয়ে আনতেই সাধ হলো সুধাকে স্পর্শ করে।

বাড়িতে যে-চমক দেখবে বলে সে আশা করেছিল তা দেখলো ছোট দুটোর কান্নায় আর বড়টার রুদ্ধ-শোক গাম্ভীর্যে। বড়টা মেয়ে, সাবিত্রী, বয়স দশ। ছোট দুটো ছেলে। সবশেষটা তিন বছরের। মাঝখানে দুটো কাটা পড়েছে।

'কি, মা কোথায়?' ভবতোষ জিগগেস করলো সবিত্রীকে।

'বা, তোমরা তো এক সঙ্গেই গেলে। তোমার সঙ্গেই তো মার ফেরবার কথা।'

'কী যে বলিস! আমি তো গেছলাম তাকে খুঁজতে। কোথাও পেলাম না।'

সাবিত্রী স্তম্ভিত হয়ে রইলো। ছোট দুটো খানিক থেমে আবার উচ্চে তান তুললো। সবার ধারণা ছিল বাবা আর মা এক সঙ্গেই ফিরে আসবে। কিন্তু বিপদের এমন চেহারাটা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। একটা হত-বুদ্ধিকর ঘটনা। কোথায় যাবে কী করবে ছেলেমেয়েগুলোকে কি প্রবোধ দেবে কিছুরই কিনারা করতে পারে না ভবতোষ। আর এটা এমন একটা হৈ-চৈ করবার মতো ঘটনা নয়, ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করা যায় না। মৃতদেহ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবে না আত্মহত্যা বলে। মুখে যাই বলুক, ঢোল পিটবে মনে-মনে। তার চেয়ে গলায় দড়ি বেঁধে সিলিঙের কড়ায় ঝুলে থাকলেও যেন এমন কেলেঙ্কারি হতো না। একটা প্রমাণের আরাম পেত অন্তত।

কাউকে বলা যায় না, তবে কী ব্যবস্থা করবে ছেলেপিলেগুলোর? কী খেতে দেবে তাদের? ইস্কুলেই বা সে যাবে কখন? তার পর, জোগাড় হয়েছে সন্ধ্যেয় একটা নতুন টিউশনি তারই বা কী হবে? সর্বত্র রাষ্ট্র না করেই বা কি উপায়!

সূর্য মুহ্যমান হয়ে এলো পশ্চিমে, তবু সুধার দেখা নাই। অঙ্কের মাস্টার কাশীনাথবাবু পাড়ায় থাকেন, তাঁরই বাড়িতে ছেলেমেয়েগুলোর খাওয়া হলো এ বেলা। তবু একটা ওজুহাত জুটেছিল তাদের অদৃষ্টে। ভবতোষ অভুক্ত। হয়তো সেই একই ওজুহাত।

কিন্তু কাল? কাল কি তার শূন্য হাঁড়ির খবর সে চেপে রাখতে পারবে? কিন্তু কালকের মধ্যেই কি সুধার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাবে না?

সন্ধ্যের টিউশনিটা যে খোয়া যাবে এই ভবতোষের দুঃখ। ছাত্রের বাপ ভীষণ কড়া, পাঁচ মিনিট দেরি হলেই মাইনে কাটবার ভয় দেখায়, গোটা এক দিন কামাই করলে বরখাস্ত করবে। কোন কিছুই তো সুধার অজানা নয়।

শুধু টিউশনিটাই বা কেন? তার অবোধ ছেলে-মেয়ে, তার অযোগ্য স্বামী, তার ছন্নছাড়া সংসার।

বাড়িতে বাতি জ্বালবে কি না ভবতোষ ভাবছিলো, দেখলো কে আসছে গলি দিয়ে। নির্ভুল মেয়েছেলে। পরনে খাটো ফেঁসে-যাওয়া নোংরা কাপড়—পাড় আছে কি নেই চোখে পড়ে না—হাত-গলা সব খালি, এক হাঁটু ধুলো। যেন দাঁড়াতে পাচ্ছে না এমনি তার চলা, হাতে আবার একটা পুঁটলির ভার। ভবতোষ বেরিয়ে এলো রোয়াকের উপর। সুধাই তো সত্যি।

কী যে হতে পারে সুধার, নিশ্বাস নিতে-নিতে কিছুই ভেবে উঠতে পারলো না ভবতোষ। কাছে এলে শুধু জিগগেস করলে, 'এ কী?'

সুধা বললো, 'চাল।'

'চাল?' যেন ভবতোষ কোনো দিন নাম শোনেনি ও-জিনিসের।

'হ্যাঁ, দু সের চাল পেয়েছি।' সুধা হাসলো। অসীম ক্লান্তির মাঝেও যেন জয়ের একটু স্পর্ধা আছে লেগে।

যেন বহু দূর পথ পার হয়ে ভিক্ষে করে কুড়িয়ে এনেছে এমনি মনে হলো ভবতোষের। বললে, 'পেলে কোথায়?'

'কন্ট্রোলের দোকান থেকে। রাত থাকতে গেছি আর ফিরছি এই সন্ধ্যেয়। তোমরা না জানি কত উতলা হয়েছ,' সুধা হাসলো অন্তরের স্বচ্ছতায় : 'কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চাল না নিয়ে বাড়ি ফিরবো না কিছুতেই। তাই মাঝখানে দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও লাইন ছাড়িনি। কত ধাক্কাধাক্কি কত ধস্তা-ধস্তি, তবু টলিনি এক পা, মাথার উপর তুমুল এক পশলা বৃষ্টি পর্যন্ত হয়ে গেল। ষোলো ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে পেলাম তবে এই দু সের। উঃ, আমি তো কত লোকের ঈর্ষার বস্তু, কত লোকেই তো কিছু পায়নি, যারা দাঁড়িয়েছিল আমার পিছনে। পুরুষের লাইনেও তাই। আমিও নিলুম, আর বললে, ফুরিয়ে গেছে।'

'কিন্তু এমন একটা বিশ্রী পোশাকে গিয়েছিলে কেন? হাত-পা খালি, পরনে আমার তেল-মাখবার ধুতিটা। গায়ে জামাও নেই বুঝি কোন?' ভবতোষ বিরক্তি দিয়ে আনন্দ ঢাকবার চেষ্টা করল।

'বস্তির ঝি না সাজলে কি দাঁড়ান যায় কন্ট্রোলের লাইনে?' দিগ্‌বিজয়িনীর মতো চালের পুঁটলি নিয়ে সুধা বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

মাকে ফিরে পেয়ে ছেলেমেয়েগুলির উত্তালতা তখনো থামেনি, গলির মুখে ভবতোষ দেখতে পেল একটি পুরুষমূর্তি। দ্বিধায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে

যাচ্ছে, গলিতে ঢুকবে কি ঢুকবে না। শেষ পর্যন্ত ঢুকলো, আর এগিয়ে এলো কি না ভবতোষেরই বাড়ির দিকে।

আধাবয়সী, কিন্তু যেন ঠিক ভদ্রলোকের পর্যায়ে পড়ে না। যদিও গায়ে একটা ছেঁড়া ও কুঁচকানো চীনে-সিল্কের পাঞ্জাবি। দাড়ি কামায়নি কত দিন। চুলগুলিতে চিরুনির আঁচড় নেই। চাউনিটা কেমন যেন ঘোলাটে, অপরিচ্ছন্ন।

এদিক-ওদিক চেয়ে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে লোকটা জিগগেস করলো : 'এ বাড়িতে একটি মেয়েছেলে ঢুকেছে এখুনি?'

মুহূর্তে ভবতোষ রুক্ষ হয়ে গেল। বললে, 'হ্যাঁ, কেন?'

কি-ভাবে যে বলবে কিছু ঠিক করতে না পেরে আগন্তুক বললে, 'তাকে আমার দরকার।'

'দরকার?' রাগে কঠিন হয়ে উঠলো ভবতোষের গলা : 'তাকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ, না, ঠিক চিনি না, তবে—' লোকটা আমতা-আমতা করতে লাগলো। ভবতোষ ফণা-তোলা সাপের মতো বিষিয়ে উঠলো : 'আরো দুটি গলি ছেড়ে দিয়ে শুঁড়িখানার কাছে থামের তলায় আপনার চেনা জিনিস পাবেন। যান সেখানে। এটা বস্তি নয়, গেরস্থ-বাড়ি। যাকে ঝি ভেবে পিছু নিয়েছেন, সে ঝি নয়, ভদ্রলোকের স্ত্রী।'

লোকটা যেন তবু এক কথায় চলে যেতে প্রস্তুত নয়। দোমনা করছে—ঘুর-ঘুর করছে।

'কেলেঙ্কারি বাধাবেন না বলছি। ভালোয়-ভালোয় বেরিয়ে যান গলি থেকে, নইলে পাড়ার লোক জড়ো হলে ঘাড়ের উপর মাথাটা আপনার সোজা থাকবে না বলে রাখছি। আমি অভুক্ত আছি বটে, কিন্তু পাড়ার আর সবাই আমার মতো এত নিস্তেজ হবে না বলেই বিশ্বাস। মারবে তো বটেই, পুলিশেও ধরিয়ে দেবে।'

'আমারই ভুল। মাপ করবেন।' লোকটা আবার সস্পৃহ চোখে তাকালো চার পাশে। তারপর চলে গেল।

কারু সঙ্গে একটা কিছু উত্তেজিত বচসা হচ্ছে এমনি আভাস পেয়ে সুধা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো রোয়াকে। বললে, 'সেই লোকটা এসেছিল বুঝি?'

'কে লোকটা?' আপাদমস্তক জ্বলে গেল ভবতোষের।

'সেই চীনে-সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক?'

'ভদ্রলোক? এরি মধ্যে গাঢ় পরিচয় হয়ে গেছে দেখছি।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ বুঝি?' সুধা যেন কণ্ঠস্বরে তাকে খুঁজছে।

'না, তাকে আমার খাট ছেড়ে দিতে হবে।, ভবতোষ গলার আওয়াজকে কুৎসিত করে তুললো : 'ওটা বদমাস, তোমাকে ভেবেছে বস্তির ঝি।'

'তা যা খুসি ভাবুক, কিন্তু আমিই তো ডেকে এনেছিলাম।'

কাছাকাছি বোমা পড়লেও ভবতোষ এত চমকাতো না। বললে, 'তুমি ডেকে এনেছ? কেন জানতে পারি?'

'চারটি ওকে খেতে দেব বলে। ও আমার সামনেই ছিল, পুরুষের লাইনে। আমার নেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোকান বন্ধ হয়ে গেল, আর ও আমার চোখের উপর মাটিতে ভেঙে পড়লো টুকরো-টুকরো হয়ে। বললে, বাড়িতে বসে আছে সবাই চালের প্রত্যাশা করে, সে গেলে তবে উনুন ধরবে। তবু তো স্ত্রী-পরিবারকে একবেলা আধপেটা সে খাওয়াচ্ছিল, কিন্তু নিজে সে উপোস করে আছে প্রায় চার দিন। পাছে ওদের ভাগে কম পড়ে তাই মিথ্যে করে বলতো যে বন্ধুর ওখানে তার নেমন্তন্ন। কিন্তু চার দিনের উপোসের পর নেমন্তন্নের কথা নাকি আজ সে কিছুতেই বলতে পারবে না। তাই আমি ওকে বলেছিলাম, চলুন আমার ওখানে, অন্তত ভাত খাবেন আপনি পেট ভরে। প্রথমটা বিশ্বাস করেনি। পরে বিশ্বাস করলেও রাজি হতে পারেনি। স্ত্রী-পুত্রের জন্যে চাল না নিয়ে গিয়ে নিজে ভাত খাবে লুকিয়ে, হয়তো যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু জঠরের যন্ত্রণা তার চেয়েও ভয়ানক। আহাহা, তাড়িয়ে দিলে তুমি?' সুধা গলা বাড়িয়ে তাকালো এদিক-ওদিক।

আস্তে আস্তে একটা তীব্র, ঘন, উগ্র গন্ধ ভবতোষকে আচ্ছন্ন করতে লাগলো। যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এখুনি। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে।

না, ও কিছু নয়। ও শুধু উনুনের ধোঁয়া।

৩৯। জাত-বেজাত

চিকিৎসায় ক্ষেমা দিলে। অসুখ যখন বারণ হয় না তখন আর মিছিমিছি খরচ করে লাভ কী?

যে বাঁচবার সে অল্প-সামান্যতেই বাঁচে। এতদিন ধরে লটপটানি করেনা। আর পারিনা। এমন-তেমন হয়তো হবে। করা যাবে কী! অনেক করেছি। দশ জনেও বলছে, অনেক করেছি! তবে আর কি। হাতে আর এখন পয়সা নেই। হাতে আবার টাকা হয়, তখন নাহয় আরেক পালা দেখা যাবে। তিন মাস হালুটি করি, নয় মাস সংসারী করি। এখন এই সংসারী মাসে টাকা কই? ঘরের মজুতী চাল তো আর এখন বেচা যায় না। ফসলের মুখে ধানের দাম কম এখন।

'বাপ কেমন আছে?'

'গ্যালেই পারে এহন। বোধভাষ্য কিছু নাই। চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছে।'

'হেকিম-ফকিরে কয় কী।'

'কয় মোর মাথা। কপালদণ্ড মোর। ক্যাবল টাহার ছয়লাপ।'

সঙ্গীন রুগী, অথচ টালবাহানা করছে। ধর্মকথা শুনে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ছেনা। চুপিচুপি একদিন দেব নাকি বুড়োর টুঁটি টিপে!

না, শেষ পর্যন্ত মরল সবদর খাঁ। বাঁচল বিল্লাত খাঁ।

এবার আর কি। ওয়ারিশি জমি পেলে দু কানি। বাঁধাবন্ধক নেই, প্রজাপত্তন নেই, সব নিজে চাষে। বাড়ির দরজায় জমি। দরেবস্ত হকহকুক সব তোমার।

ও, হ্যাঁ, বোন আছে বটে একটা। ফারাজ অনুসারে অংশ পায়। অবস্থা খুব বেশি না হলেও একেবারে অল্প না। জায়জমিতে এসে যে অংশ ধরবে এমন মনে হয় না। আর ধরতে এলেই বা কি। বাপকে দিয়ে নিজের পরিবারের নামে আগে-ভাগেই এক দানপত্র করে রেখেছে। হেবা-বিল-এওয়াজ। এক ছড়া তসবী আর একখানা জায়নামাজের বদলে। ব্যামোপীড়ায় পুতের বৌই তত্ত্বতাউৎ করেছে, উঁকি মারতেও আসেনি একবার মেয়ে। মেয়ে তো পরের ঘরের পরচালা। আর পুতের বৌ নিজের ঘরের টুই।

বাংলা দলিল নয়। রেজিস্টারি করে নিয়েছে বিল্লাত খাঁ।

বোনের খসমের সঙ্গে হৃদ নেই তার। কে জানে কখন কি বাগড়া দেয়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। মোকদ্দমায় ছুঁলে আটান্ন।

এবার আর কি। বাপ ফৌত হয়েছে। ওয়ারিশি পেয়েছে। জমিদারের সেরেস্তায় নাম খারিজ করে নিয়েছে একলার। নামের পিছে গং বসেনি। গয়রহ নয়, একলা তোমার জমা। তোমার বিত্তবিভব। তোমাকে আর পায় কে।

বাপ মরেছে, এবার দেশবাসীকে খাওয়াও। জেফৎ দাও। ধম্মকাম কর।

'ঠিকই তো। মাথামুরুব্বিরা ধ্যরছে, খাওয়াইতে লাগে একদিন। না খাওয়াইলে সমাজ বন্দ অইয়া যাইবে।'

জননা সায় দেয়। বলে, 'রেওয়াজরীতি যা আছে হ্যা না মানলে চলপে ক্যান? কিন্তু, পুছ করি, খাওয়াইবা কি?'

'খালি লবণভাত তো খাওয়ান যাইবেনা। দেহি মরুব্বিরা কি কয়।'

হাতে যা রেস্ত ছিল কবরখরচে বেরিয়ে গেছে। পুঁজিপাটা কিছু নাই। অল্পকম ধারকর্জ করে চালাতে হবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। গরিবের বাড়িতে হাতির পাড়ার দরকার নাই।

'কি খাঁয়ের পো, দাওয়াৎ দিবা কবে?' জিগগেস করলে জুম্মাবাড়ির মুন্সিসাহেব।

'আহারা দিন-তারিখ ঠিক করিয়া দেন হুজুর। মুই তো দরজায় হাজির।'

'কি-কি খাওয়াইবা, কারে-কারে খাওয়াইবা—হ্যা তো ঠক করন লাগে।'

'হ্যা তো লাগেই। আহারা বৈঠক লাগান একদিন। বিচার-আচার করিয়া জাহির করেন ফতোয়া!'

হ্যাঁ, মাথামুরুব্বিদের সালিশ ডাকাতে হবে। শল্লা পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে কাকে-কাকে নিমন্ত্রণ করা যায়, বেশির ভাগ লোকের কি-কি খাবার

হচ্ছে। দরকার হলে ভোট নিতে হবে। এ একটা সমাজের কাজ। জামাত খাওয়ানো। দেশদেশী রীতনীত অমান্য করার উপায় নাই।

বিয়াসাদির থেকেও এ বড় কাজ, এই শ্রাদ্ধশান্তি। বিয়ার পর খানা না দিলে বিয়া আর ভেস্তে যায় না, কিন্তু বাপ-দাদার মরার পর খানা না দিলে দোজখে-নরকে পড়তে হবে। পাড়ার মধ্যে বাস চলবে না। জায়গা হবে না জামাতে। নামাজ পড়তে হবে মজিদের বাইরে। সে কি সম্ভব?

না, না, খানা ঠিক দেবে বিল্লাত খাঁ। কিন্তু তার অবস্থা তো কারু অজানা নয়। একটু মোক্তারি যেন তার পক্ষ হয়ে কেউ করে। একটু কমে-সমে যদি সারা যায়? কী অদিন পড়েছে আজকাল!

সে হবেখন মজলিশে। গাঁয়ের লোক জামাত করে খায় এই একদিনই। এতে অত আপত্তি-নালিশ করলে চলে না। সবদর খাঁর নাম-নিশানা উঁচু ছিল। তার নাম ছোট করে দিলে লোকে বলবে কি! লোকে বলবে, সমর্থ হয়ে বিল্লাত খাঁ বাপের নাম ডুবিয়েছে। গোটা খাঁ বংশের নাম ডুবিয়েছে।

দশের একজন হয়ে থাকতে হবে তো সমাজে! সমাজ বন্ধ হয়ে গেলে আর থাকল কি! ওঠক বনেনা বৈঠক বনেনা পাড়া বনেনা পার্টি বনেনা, গাঁয়ে থেকে আর তবে লাভ কি! সে জঙ্গলে চলে যাক।

মজলিশ বসল বিল্লাতের বাড়ির খোলায়। হাটবেলার পর বাড়ি ফেরার সময়। বেলা বসবার আগখানে।

খাওয়ার নামে মজলিশ একেবারে গুলজার করে বসল। বোলবলা আছে এমনি সব গ্রাম্য ভদ্রদের দল। জুম্মাবাড়ির মুন্সি সাহেব। মহল্লার চৌকিদার। দরগার খাদেম। মোটা খাজনার তালুকদার। বোর্ডের কেরানি। মোড়ল-মাতব্বর।

আগে ঠিক কর কাকে-কাকে খাওয়াবে। জামাতের লোক তো বটেই। পার্টির লোক। জ্ঞাতি-গোত্র, ভায়াদ-দায়াদ, এমনকি পাড়াসম্পর্কের কুটুম্ব। এধার-ওধার যাদের জমি, সেই সব পাশ-আলের দখলকার। যারা এক পীরের স্যাগরেদ। ফেরস্তা করতে বসল মুন্সিসাহেব।

'কিন্তু মাপ করবেন হুজুর এন্তাজ্যারে ডাকতে পারমু না।'

'ক্যান, হ্যা কি ক্যরলে?'

'মোর লগে মামলা চ্যলছে পেটিকোটে। গরু দিয়া মোর ধান খাওয়াইছে।'

'থো, আইজ আর ক্যাইজা করেনা। যদি হকে থাকে কত চাউল-ধান ফিরিয়া পাবি।'

'হ্যা মোর ধানও খাইবে, ভাতও খাইবে?'

'খাউক! কত খাইবে! কারডা কেডা খায়?'

'কিন্তু ঐ ধলু হ্যাখেরে ক্যান? অর লেগে মোর আওয়া-যাওয়া নাই।'

'এহন থিয়া আরম্ভ হইবে আওয়া-যাওয়া। ল্যাহ, ধউল্যার নামটুকুও লেইখ্যা থোও।'

'কিন্তু বেজন গাজী?' হুমকে উঠল বিল্লাত খাঁ : 'ও তো দশধারার দাগী।'

'অয় অউক। দাগীরও খাইতে সাধ যায়। প্যাটের মদ্যেও তো দাগ লাইগ্যা আছে—খিদার দাগ। বাপের কামে খাওয়াইবি, হ্যাতে আবার দাগ-বেদাগ কি!'

কিন্তু যাই বল, আমিন সর্দারকে বাদ দিতেই হবে। তার জামাত অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কেন, দোষ কি আমিনের?

নিকা করে নিকাই বিবির বিত্তসম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে দলিল করে নিয়েছে। পঞ্চায়েত বিচার করে ঠিক করেছে এরকম জাঁহাবাজ জোচ্চোরকে সমাজ নেবেনা। তবে এখন আবার আমিনের নাম ঢোকাও কেন?

না, দোষ খণ্ডে নিয়েছে আমিন সরদার। গাঁয়ের লোককে শাহী একটা ভোজ দেবার চুক্তিতে। সে চুক্তির জামিন হয়েছেন স্বয়ং মুন্সি সাহেব।

'ল্যাহ তবে ঐ আমিন সর্দারের নামটুকু।'

আর কত লিখবে? শস্তাগণ্ডার বাজার নয় আজকাল। রাজ্যভোর লোক ধরলে চলে কি করে? আর ওরা তো সব বাজে লোক। বেপাড়া-বেপার্টির লোক। ওরা কারা? ওদের সঙ্গে আমার একটা বোলানিয়া সম্পর্কও নাই। ডাকলে উত্তর দেয় এর বেশি সম্বন্ধ নাই ওদের সঙ্গে। আবার ওদের কেন? ওদের সঙ্গে আমার মিল-মিলাত নাই, ওদের সঙ্গে আমার বেজার-বিরুদ্ধ—ওদের ডাকতে মন ওঠেনা। কিন্তু কিছু বলতে পারেনা অসাহসে। এ বিষয় বিল্লাতের কোনো স্বাধীন মত-অমত নাই। সমাজ যা বলে দেবে তাতেই সে হেঁটমুণ্ডু। এ সমাজের এলেকা। সমাজের এক্তিয়ার। কথাকার্য সমস্ত সমাজের। সমাজই সমস্ত।

বাতকে বাত দু একটা কথা তবু কইছে বিল্লাত। ভয়ে-ভয়ে কইছে। যখন ভাবছে তার ভিতরের কথা, ভবিষ্যতের কথা। তার ঘর-গৃহস্থির কথা।

কিন্তু তার অবস্থার কথা খুঁটিয়ে তলিয়ে দেখবার সময় কই সালিশ সাহেবদের? কেউ তার বান্ধব নয়। কেউই তার হিতমঙ্গল দেখতে আসেনি।

আবার নিজেকে তখুনি প্রবোধ দেয় বিল্লাত। কত বড় নাম পড়ে যাবে দেশ-গাঁয়ে। বাপের কামে সেই সন যা খাইয়েছিল বিল্লাত খাঁ! এমন আমরা বাপের আমলেও দেখি নাই! বলবে সবাই। কথাটা মনে-মনে শুনতেও কেমন ভাল লাগবে।

এবার ঠিক করো পাক হবে কোন-কোন পদ—

'পোলাও-গোস্ত তো নিশ্চয়—'

সব পান্তা-লঙ্কার লোক, জিভ এখন একেবারে লেলিয়ে দিয়েছে। দেখ একবার নমুনাটা। ঝটকা মেরে উঠল বিল্লাত খাঁ।

'পাটশাক আর চুনা মাছের খাটা খামু নাকি তবে?' কে একজন পালটা ঝঙ্কার দিলে।

মুন্সি গম্ভীরমুখে বললে, 'ছমাসে-নমাসে কারবার। বালোমন্দ দুইডা

খাইতে চাইবেই তো হগলে। বালো খাওয়াইলেই তো কুদরৎ। বালো খাওয়াইলেই বালো কাম।'

বিল্লাতালি চুপ করে রইল।

'একটি ডাইল করন লাগে। বুড়ের ডাইল।'

'আর মাছ? চুনা-ইচায় চ্যলবেনা কইলাম। বোয়াল-কোড়াল চাই। গোস্ত —খাসির গোস্ত।'

'আর পুদিনা পাতার চাটনি।'

'শ্যাষকালে দই আর রসগোল্লা।'

এর নিচে আর নামা যায় না। এ একেবারে কম-সম হিসাব। শেষকালে দই আর রসগোল্লাটাই আসল। মইষের দুধের দই। হাঁড়ি ওলটালে পড়েনা তো বটেই, ফাট-চেড় ধরেনা। আর রসগোল্লা চাই বড়-বড় মুখভর। মুখে রেখে অনেকক্ষণ যাতে চিবোনো চলে।

একটু গাঁইগুঁই করতে যাচ্ছিল বুঝি বিল্লাত খাঁ। গুড়ের উপর জিভে যাদের সোয়াদ নেই তাদের আজ দই রসগোল্লা!

যে জেফৎ দেবে সে ঠিক করতে পারবেনা আকার-প্রকার। যারা খাবে তারাই ঠিক করবে। এই সমাজের চলতা নিয়ম। মাঠের উপর চলতা-পথ দিয়ে যেমন তুমি হাঁটো তেমনি দেশগাঁয়ের এই চলতা নিয়ম ধরে তোমাকে চলতে হবে।

দিন-তারিখ এবার ঠিক করে দিন।

'লোক তো অইল পেরায় তিন চাইরশো। টাকা কত লাগপে পছন্দ করেন?' ম্লানমুখে জিগগেস করলে বিল্লাত।

'যা লাগনের হ্যা লাগপেই। হ্যার লিগা ঠ্যাকপেনা। যদি টাকা কবলাও কম, খাওনে হেইলে খ্যান্ত দাও। বোজছ?'

না, সাধ্যমত খরচ করবে বৈকি। সামাজিক কাজে সে অশ্রদ্ধা করতে পারেনা।

'হ, বুইজো, যদি সাধ্যের খাওন না হয়, সমাজেরে চটাইবা, বেনালে পড়বা।'

'সাধ্যের খাওন' অর্থ খাওয়ানোতে অসাধ্যসাধন। কিন্তু উপায় নাই। চটানো যাবেনা সমাজকে।

'এত ত্যাল চিনি-ময়দা পামু কই?'

'ক্যান, ফুড কমিটির সেক্রেটারি নাই? এমুন ব্যাপারে পেশাল পারমিট কাটান যাইবে। হ্যার মন-গতি বালো।'

ফুড কমিটির সেক্রেটারি কে? এ তো এক নম্বর ইউনিয়ন। এক নম্বরে কে পড়েছে? সকলে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। না, ভয় নেই। তেমন কেউ নয়। আমাদের জাতগুষ্টি। হবিবর রহমান।

'বলিয়া-কইয়া দিমু আমি ঠিকঠাক করিয়া।' চোখ টিপল বোর্ডের কেরানি : 'বোজলানা, একটু টিপন-টাপন লাগপে।'

বিল্লাত খাঁ চলেছে ফুড কমিটির সেক্রেটারির সন্ধানে। অফিসে নয়, বাড়িতে।

তার অর্থ বার-বাড়িতে নয় ভেতর-বাড়ির নিরিবিলিতে। মগরবের নামাজের পর। অপকামের ফিকিরে।

'হগলডি হুনছি মুই। কোন-কোন মাল চাই?'

কটু তেল, শাদা চিনি আর ফিনফিনে ময়দা। ত্যানারা ফিরনি-পায়েস খাইবেন, বাড়িতে ভিয়ান বসাইয়া রসগোল্লা বানাইবেন। হ-হ, মোগো ময়রা—বরগুনা বন্দরের ছিপাৎ উল্লা।

তাতো খাইবেই। সবদর খাঁর নাম-ডাক কেমন, তা দেখতে হবে তো। বাপের নাম তো আর মুছে দেয়া যাবেনা।

'হ্যা মুই সব দিতে পারমু। টিন-বস্তা হগল মজুত আছে। কিন্তু দাম দিবা ক্যামনে?'

'হিসাবে কি কয়?'

'কলম কাগজ ধরলে হ্যা একটা অইবেই।'

'নগদ টাকা পামু কই? ঘরে চাউল থুইছি বাইন্ধা, হ্যাই দিমু আর কি। সম্পত্তি লইয়া লাড়াচাড়া করমুনা।'

'হ্যাই বালো, চাউলই বালো। টাহার দাম কমে কিন্তু মালের দাম বাড়ে। চাউলেই দিও। ঊর্ধ্ব দামে বেচিয়া দিমু সময় অইলে। তোমার লগে দামের হিসাব কিন্তু অহনকার বাজার দর।'

খোরাকির উপরে মণ দশেক বালাম চাল মজুত করেছিল বিল্লাত খাঁ। সময় বুঝে ঊর্ধ্ব দামে বেচবে বলে। সে দশমণই সেক্রেটারি আদায় করলে। মেজবানির বাকি খরচের জন্যে এখন খোরাকির চালে হাত দাও।

'এ তো তোমার সুবিস্তাই অইল। ঘরের জিনিস দিয়াই হারতে পারলা। নগদ টাকা কর্জ করতে অইল না।'

কিন্তু ঘি? খাসি? ডাইল-তরকারি? মশল্লা?

'আরে খ্যাড় আর বাখারি যহন জোগাড় অইছে তহন দড়িও জোগাড় অইবে। যাও, পাকা হাতে ঘর ছাদন কর এইবার।'

'অন্যেরে খাওয়াইতে গিয়া নিজের কপাল খামু।' পরিবারের কাছে আপশোষ করে বিল্লাত খাঁ : 'ভাতের দুঃখে মরমু এইবার।'

'অন্যেরে খাওয়াইলে কি মরে? যে খাওয়ায় হ্যারে আল্লা আবার খাওয়ায়।' সরল মুখে বলে সোনাবান।

চাল দিয়ে এল ফুড কমিটির সেক্রেটারির বাড়িতে। নিজের ঘাড়ে করে। মজুরি বাঁচিয়ে। যে দু'চার পয়সা বাঁচে। বস্তার ভারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিল্লাত। মড়ার দাড়ি কামিয়ে সে ভার কমায়!

'খোঁজ-তল্লাস পাইছি মোরা। কিন্তু মোগো কি দোষ কন?'

কে তোমরা?

আমরা ফকির-মিচকিন অন্ধ-আতুর এতিম-তছির রাহী-মুসাফেরের দল। হুজুরের মেজবানিতে আমাদের ডাক পড়ল না?

না, এ জমিদার সমাজের নিমন্ত্রণ। এ আইনের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার নয়। এখানে তোদের জায়গা নেই। তোদের জন্যে ভিক্ষা, দাওয়াত নয়।

তোরা ফিরে যা।

কটু তেল এল, ময়দা এল কিছু বস্তা-পচা—কিন্তু চিনি কই?

সেক্রেটারি খবর পাঠাল 'ইস্টকে' চিনি নাই। যা অল্পসামান্য ছিল বেরিয়ে গেছে। বড় দাঁও এসেছিল একটা আচমকা। লোভ সামলানো লাট বেলাটের পক্ষেও কঠিন ছিল। 'এক কাজ কর। রসগোল্লা বন্ধ করিয়া দাও।

'হ্যা দেওন যাইবে। কিন্তু চিনির বাবদ যেডি চাউল দিছি হেডি ফেরস্ত দেন। চাউল না দেন নগদ দেন।'

'রাখ, বুজিয়া-সুজিয়া কতা কইয়ো মিয়া। কেডা তোমার চাউল নিছে?'

দশ দিকে আঁধার দেখল বিল্লাত খাঁ। টলতে-টলতে বসে পড়ল।

এখন উপায়? নালিশ-আর্জি করতে হবে নাকি?

সবাই বললে, নালিশ নেবেনা আদালত। কালবাজারে চোরাকারবার করতে গিয়েছিলি, তার আবার নালিশ-ফয়সালা কি? রোকা-রসিদ নাই, টিপছাপ নাই, মোকাবিলা সাক্ষী নাই—ও চেপে যাওয়াই ভালো। নিজেদের মধ্যে দ্বেষরাগ এনে লাভ কি? খেলে খেয়েছে, জাতভাইই তো খেয়েছে।

'তবে রসগোল্লা বন্ধ করিয়া দি।'

ও সর্বনাশ! রসগোল্লা বন্ধ হলে তো সবই বন্ধ হল। ঝাল-লবণ খেতে কে আসবে কষ্ট করে? বেশ, দাও তবে সব বন্ধ করে। দাওয়াত বন্ধ। জামাত বন্ধ। সমাজ বন্ধ।

রসগোল্লা তা হলে বাজারের বাসিন্দে মোদকের থেকে কিনতে হয় বায়না দিয়ে। উপায় নেই। কপালদণ্ডে বাড়িতে বসে নিজের জাতের কারিগর দিয়ে যখন জিনিস হলনা তখন বাজারের থেকেই আনতে হবে। ঠেকাঠেকির সময় জাতধর্ম দেখলে চলে কি করে?

'ব্যালোই অইল। মাল হেইলে বালোই অইবে। গোল্লাই অইবেনা, রসও অইবে। একেকজনে খাওন যাইবে আট দশটা করিয়া।'

ময়রা বিধু দাস। হ্যাঁ, জোগান দিতে পারব রসগোল্লা। কিন্তু ধারে-কর্জে চলবেনা। তোমারও নগদ ফেলতে হবে গরম-গরম গোল-গোল। আগাম দিতে হবে বায়না। অন্তত চার আনা। কিন্তু হাতে যে একটা আধলাও নাই! উপায়?

টাকা কর্জ করা ছাড়া উপায় কি?

'হ্যাই করো! আবার দিন আইবে। ল্যাভেমুলে শোধ অইবে কর্জ।' সান্ত্বনা দেয় সোনাবান।

'নিজের খাওনের লিগ্যা কর্জ না, পরের খাওনের লিগা কর্জ!' বিল্লাত খাঁ কাতর চোখে তাকায় একবার পরিবারের দিকে।

'পরেরে খাওয়াইলেই নিজের খাওন পুরা অয়। তুমি কিছু ভাববা না।' সোনাবান দুই চোখ নরম করে তাকায় খসমের দিকে।

বিল্লাত খাঁ চলল কর্জের সন্ধানে।

'কই যাও?'

'যাই অনঙ্গ সার গদিতে।'

'হেয়ানে কি?'

'কিছু টাকা লমু জমি থুইয়া। টাহার বড় ঠ্যাহা। টাহা না অইলে এদিকে রসগোল্লা অয় না।'

তার জন্যে তুমি বেধর্মীর দরবারে যাবে টাকা ধার করতে? সুদে-আসলে তাকে তুমি মোটা করবে? আসতে দেবে জমির উপর? কী সর্বনাশ! এ কী বলছ বিপরীত কথা! কেন, দেশদেশী স্বজনবন্ধুর মধ্যে মহাজন নাই? কেন, জামাল হাজী? আহম্মদ মির্ধা? তারা পারেনা টাকা দিতে? যদি জমি-জায়গা বন্ধক-উদ্ধারে বিলিয়েই দিতে চাও তবে তাদেরকেই আসতে-বসতে দাও জমির উপর। তা নয়, এ কী বেড়াঁড়া ব্যাপার! খবরদার, যেওনা ওদিকে।

পথের মুখ ঘুরিয়ে দিল বিল্লাত খাঁর। বিল্লাত চলে এল জামাল হাজীর দরবারে। এক বুক দাড়ি ভাসিয়ে বেরিয়ে এল হাজীসাহেব।

'টাকা যে নিবা শোধ দিবা ক্যামনে?'

'হাটঘাট করিয়া শোধ দিমু আস্তে-আস্তে।'

পারবেনা শোধ দিতে। জানতে বাকি নাই হাজী সাহেবের। এক নজর দেখেই সে বুঝতে পারে। তাই বললে, 'দ্যাহ মোর কাছে রেহান-মরগিজ নাই। একেবারে খাড়া কবালা। যদি কও তো, খোসখরিদ করতে পারি। দু কানি আছে এক কানি দাও। সুদের ধার ধারিনা। সুদ হারামি। বোজছো?'

তবু রেহান-বন্ধক খুলে জমি ফিরে পাবার আশা থাকত। মেয়েকে শ্বশুরঘরে পাঠিয়ে দিলে যেমন আশা থাকে তার নাইয়র আসার। কিন্তু এ একেবারে মেয়েকে কবরখোলায় পাঠানো।

কিন্তু উপায় নেই। সমাজের মুখ দেখতে হবে। চালাতে হবে যখন যে রকম ধরতাই। লাইন ছেড়ো দেওয়া চলবে না।

বেকাদায় পেয়েছে হাজীসাহেব। এক কানির দাম দু'শোর বেশি দিতে পারবেনা। কবালায় কিন্তু লিখে দিতে হবে চারশো। কোথা থেকে কোন সরিক বেরিয়ে এসে অগ্রক্রয়ের মামলা করে বসে ঠিক নেই। তাকে ঠেকাবার জন্যে কবালায় পণ বেশি ধরতে হবে। যাতে অত টাকা জমা দিতে না পারে। আর যদি ঠেকানো নাই যায়, মন্দ কি, পণের ডবল পেয়ে যাবে মুনফা।

তাই সই। যা জোটে, দুশো টাকা নিয়েই এক কানি বেচে দেবে বিল্লাত খাঁ। রসগোল্লা খাওয়াবে মেহমানদের।

না, কূট-কপটের ধার ধারবেনা সে। বোনকে দিয়ে অগ্রক্রয়ের মামলা করাবেনা। তার নিজের জমি বোনের খসম-পুত লাঙলে-কোদালে হেঁট-উপুড় করবে তাই বা সে সহ্য করবে কি করে? হাজীসাহেবকে জব্দ করে তার লাভ কি? বাপের এই শুভকামে কাউকে জব্দ করার কথা যেন সে না

ভাবে। আল্লার ফজলে এক কানি জমি নিয়েই সে টিঁকে থাকবে কোনোরকমে।

তবু গাঁয়ের পঞ্চজনের কাছে গিয়েছিল বুঝি নালিশ করতে। হাজী-সাহেবের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে।

'হাজীসাহেব যদি কিছু বেশিই নেয়, হ্যাতে আপত্তি করনের আছে কী! মোগো জাতভাই জ্ঞাতকুটুমই তো নিলে। এঘর থিয়া ওঘর। এক দ্যাশ, এক নাম, এক ধম্ম। বিদেশে-বিপাকে চলিয়া গেলেনা। বিড়ালের বাচ্চা বিড়ালেই খাউক, শিয়ালে খায় ক্যান? বোজলানা কতাটা?'

'সাধ্যের খাওয়া' খেল কিনা সবাই কে জানে, বিল্লাতদের খাওয়া অসাধ্য হয়ে উঠল।

শুধু তাই নয়। না-বেচা বাকি এক কানি জমিতে গাজুরি দখল নিতে এল হাজীসাহেব।

বেচলাম এক কানি, দুকানি চাও কোন এক্তিয়ারে? কিসের বনিয়াদে?

এই দেখ কবাল্য। বহা চারশো টাকা, জমি দুকানি। রেকর্ট-পর্চা সীমানা-নিশানা সব মিল করা। দু কানি বলেই তো চারশো টাকা নিয়েছিলে। কানির নিরিখ ধরেছিলে দুশো টাকা করে। মনে নেই? মনে না পড়ে এই দলিল দেখ? ও, দলিল পড়তে পারনা বুঝি! কিন্তু পড়িয়ে তো শুনিয়েছিল তোমাকে।

প্রথমটা বিল্লাত থম্বা হয়ে বসে রইল ঝিম খেয়ে। পরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল মাথা ঝাঁকিয়ে। বললে, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, কমজাত—

জোর করে বেদখল করে দিলে হাজী সাহেবকে।

হাজী সাহেব মামলা ঠুকল।

ঠুকুক। প্রথম আপত্তিই পক্ষাভাব। বোনের সরিকি আছে জমিতে—হ্যাঁ, আছে, একশো বার আছে—সেই বোনকে পক্ষ না করার দরুন মোকদ্দমা অচল।

হেবা-বিল-এওয়াজ ছিঁড়ে ফেলবে বিল্লাত খাঁ। শুধু সরিকি অংশ নয়, ষোল আনাই বোনকে দিয়ে দেবে সে। বলবে, বাপ মুখস্থ দান করে গিয়েছে বোনকে মরার অনেক বছর আগেকালে। জমি যে সে দখল করছে, সে শুধু বোনের হয়ে, ভাগ-চাষের সর্তে। বেরনের বদলে ধান পাচ্ছে খোরাকের। হ্যাঁ, বলবে সে শাদা গলায়, সিধে হয়ে, সাক্ষীর জোটপাট করবে। সুতরাং, জমি যদি তার বোনের হয়, কবালা করার স্বত্ব ছিল না বিল্লাত খাঁর। ঐ কবালা তাই ভান্ত, অসার, অকর্মণ্য। হাজী সাহেব তাই কিছুই কেনেনি। বা, যা কিনেছে তা ফক্কা।

বোনের খসমের সঙ্গে হৃদ নাই বিল্লাতের। না থাক। তবু আজ সইবে বোনের খসম-পুতের চাষবাস। বোনের ছেলেদের মুখগুলি একবার চেষ্টা করল ভাবতে। কচি-কচি নাবালক মুখ। গোঁফ দাড়ি ওঠেনি কারু। অনেক মোলায়েম, অনেক আপনার। হয়তো তার নিজের ছেলেদের চেয়েও আপনার।

'আরে যাও কই খাঁয়ের পো?'

'উকিল সাক্ষাতে। বর্ণনা লেখামু একটা।'
'টাম্নি কে?'
'ইমানালি।'
'তা ঠিক আছে। মামলা কিসের?'
'এককানি কিনিয়া জমিতে ল্যাখছে দুইকানি। টাহা দিছে দুই শো, ল্যাখছে চাইর শো। জালবাজিটা দ্যাহ দেহি।'
'তা তো দ্যাখতাছি। কিন্তু উকিল কেডা?'
'ভূপেনবাবু। ভূপেন গু।'
কী সর্বনাশ! ওকে উকিল দিচ্ছ কেন? কেন, আমাদের হামিদ সাহেব নাই? আমাদের বরকত মিয়া? তারা কি আইনকানুন বোঝে না? না জানেনা তদবিরের ফিকিরফন্দি? পথ ঘোরো। আপনি ইষ্টকুটুম ধরো। যদি উকিলমুহুরিই খাওয়াতে হয় নিজের জাতজ্ঞাত খাওয়াও। বিদেশীর দরজায় যাও কেন? কান্ডাকান্ডজ্ঞান লোপ পেল নাকি?
'দাওয়াত যে খাওয়াইছলা হ্যা কি বিদেশী মানুষ না নিজের জ্ঞাতকুটুম? এও হ্যাই। দাওয়াত খাওয়ান। ফির, ঠিক লোক ধর গিয়া। মোকদ্দমার হারন-জিতন বেশি কতা না। বোজছো?'
দুজনে ভাগচাষে জমি করছে একবন্দ। পরের জমি। বিলাস পাল আর বিল্লাতালি।
হাঁড়িতে করে পান্তা এনেছে বিলাস। সঙ্গে একটা কলা, একটু নুন, একটা পেঁয়াজ, একটা কাঁচালঙ্কা। বিল্লাতালি কিছুই আনতে পারেনি। আনবার আর তার সঙ্গতি নেই। পরকে খাইয়ে ঘুচে গেছে তার নিজের খাওয়া। নিজের জমি ছেড়ে ধরেছে এবার পরের জমি। রায়তি ছেড়ে বর্গাদারি।
গাঁ-দেশে দুষ্ট লোকে কানাঘুষা সুরু করেছে, হিঁদুলোকের জাত মারো। হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে ভাত পুরে মুখে দাও।
বিল্লাতালি ভাবছে বিলাসের হাঁড়িতে থাবা বসাবে কিনা। খিদেয় আর খাটনিতে পেট তার চোঁ চোঁ করছে। সেদিনকার জিয়াফতে কি-কি খাওয়া ফেলা গিয়েছিল তারই দৃশ্য চোখের উপর ভাসতে লাগল।
'কিছু খাইবা?' গায়ে পড়ে জিগগেস করলে বিলাস।
'তোমার কম প্যাড়বেনা?'
'না, কম প্যাড়বে ক্যান? নাও, গামছাখানা পাতো। অনেক খাটছখুটছ। খাইয়া লও কয় গরস। আরে, খাওয়াইতে জানলেই আবার খাওন আসে কপালে। গামছাখানা ছিড়া? হেইলে এই হাড়ির থিয়াই খাই আইয়ো।'
'তোমার জাত যাইবে না?' ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বিল্লাত।
'মোরা কি দুইজাত যে মোগো জাত যাইবে?'
'মোগো একজাত, এ তুমি ক্যামনে কও? হগলডি যে এত কওন লাগছে হ্যা মিত্যা? রাহ একডা মানপাতা ছিড়া আনি।'

পাতায় ভাত তুলে দিতে লাগল বিলাস। বলল, 'বিলাস-বিল্লাতালিরা কি দুই জাত? তুমি চাও আমার দিগে, আমি চাই তোমার দিগে। কি মনে অয়? দুই জাত? কি, প্যাঁজ লাগবে নাকি? নাও, আছে ঐ হাড়ির মদ্যে। দুই জাত নাই আর দুনিয়ায়।'

'না, আছে, তুমি জাননা।' বিল্লাতালির দুই চোখ ঝালে-পেঁয়াজে গরম হয়ে উঠল : 'সংসারে ঐ দুই জাতই আছে। তা হিঁদু-মুছলমান নয়। তা গরিব আর বড়লোক। খাতক আর মহাজন। মক্কেল আর উকিল। প্রজা আর মুনিব। দুববল আর জোরদার। মুই বোজছি এত দিনে। এক জাত যে খায়, আরেক জাত যে খাওয়ায়। এক জাত যে মারে আরেক জাত যে মরে। কও তুমি, ঠিক কইনা? একজাত মোরা, আরেক জাত হ্যারা। বোঝলানা কাগো কতা কই?'

'দাও, কইলকা দাও তোমার। মোরটা ভাঙিগয়া গ্যাছে পথে আইতে।'

'টিকা-তামুক আছে মোর কাছে।'

'মোর কাছে ম্যাজবাত্তি।'

তারপরে দুইজনে এক হুঁকোতে তামাক খায়। এক নিঃস্বতার সমুদ্রে পড়ে একে অন্যের হাত ধরে।

৪০। আপোস

'ম্যাট্রিমনিয়্যাল কেসের ফাইলিং ক্রমেই বেড়ে চলেছে।' সেরেস্তাদার বললে।

জজ অরুণেন্দু বিজ্ঞের মত হাসল : 'নতুন ছুরি পেলে আঙুল কাটবেই শিশুরা।'

'মফস্বলের নম্বরও কম নয়।'

'উপরে লিখে দিন।'

কী লিখতে হবে জানে তা সেরেস্তাদার।

'পেন্ডিং ফাইলের স্টেটমেন্টটা দিয়ে দেবেন।' জজসাহেব মনে করিয়ে দিল।

উপর থেকে প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়ে এল। সরাসরি নামঞ্জুর। লিখল, বিয়ে-ঘটিত মামলার জন্য আলাদা কোর্টের দরকার নেই। ফিগারস ডু নট জাস্টিফাই।

সেই মামুলি বুলি। মুখস্থ গৎ। যেমন-কে-তেমন থাকো। স্ট্যাটাস-কো বজায় রাখো।

যেন তেমনিই সব আছে। যেন দেশ স্বাধীন হয়নি! বিয়ে-বিচ্ছেদের আইন পাশ হয়নি ইতিমধ্যে।

'তার মানে সমস্ত মামলা তুমিই করো।' ক্লান্ত মুখে বিরক্তির রেখা ফোটাল অরুণেন্দু। বললে, 'বোঝা যখন বইছ, তখন শাকের আঁটিটাও তোমার সইবে।

শাকের আঁটি যে কখনো-কখনো বোঝার বাবা হতে পারে এ কে দেখে?'

সেরেস্তাদার নীরবে হাসল।

অরুণেন্দু ডাকল পেস্কারকে। বললে, 'সপ্তাহে একটা দিন বিয়ের জন্যে রাখুন। বিয়ে মানে ইয়ে—মানে ম্যাট্রিমনিয়্যাল কেস। মানে বিয়েভাঙার মামলা।'

'তাই ভালো।' শার্টের গুটানো হাত লম্বা করতে লাগল পেস্কার।

'আর দুটোর বেশি কেস রাখবেন না।'

'দুটোই যথেষ্ট।'

'এসব মামলা তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া উচিত। অ্যাডিসন্যাল কোর্ট চাইলুম, কর্তারা হুট-আউট করে দিল। যদি লোক না দেয়, কোর্ট না দেয়, কী আর করতে পারি? শামুক যায় হেঁটে হেঁটে, মামলা চলবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।'

'তা আর কী করা!' শার্টের হাতায় বোতাম লাগাল পেস্কার।

টেবিলের ড্রয়ারটা খোলা রেখে এসেছে মনে পড়তেই পালাল তাড়াতাড়ি।

ফাইল তুলে নিল অরুণেন্দু।

সুষমা তরফদার তার স্বামী অনাদির থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চাইছে। হেতু? হেতু অনাদি অসৎ। দেবেশ বিশ্বাস তার স্ত্রী দীপালির থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চাইছে। হেতু? হেতু দীপালি বয়ে গিয়েছে।

কেলেঙ্কারি!

কত বিচিত্র মামলার সচিত্র কাহিনী।

কদর্যেও যে এত ঐশ্বর্য আছে, তা কে জানত।

বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি দেবার আগে আইন বলছে বিবদমান পক্ষদের মধ্যে আপোস ঘটাতে কোর্টকে চেষ্টা করতে হবে।

'আমি কী চেষ্টা করব বলুন তো। ঘটকালি করব? বাড়ি-বাড়ি যাব?'

'তা কী করে হয়?' পেস্কার বললে, 'তার জন্যে কার-এলাউয়েন্স কই?'

'কিন্তু চেষ্টা তো আমাকে একটা করতেই হবে। এবং সেটা নথিতে থাকা চাই। কিছু একটা চেষ্টা করেছি এ প্রমাণিত না হলে বিচ্ছেদের ডিক্রি সিদ্ধই হবে না। তবে কি আমি ওদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আনব? ভোজ খাওয়াব?' পেস্কারের দিকে তাকাল অরুণেন্দু: 'তারও বা প্রভিশন কোথায়? তার খরচই বা কে দেবে?'

'আপনার সে-নেমন্তন্ন অগ্রাহ্য করলে স্বামী-স্ত্রীর কনটেম্পটও হবে না।'

'তবে ওদের কোর্টেই ডেকে পাঠাই। এখানে আমার এই খাসকামারাতেই বসাই মুখোমুখি। কথা বলে দেখি। মেলাবার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, অর্ডারসিটে সেই মর্মে অর্ডার লিখুন।'

'হ্যাঁ, শুধু একটা রেকর্ড রাখা।' পেস্কার সায় দিল।

'মিলবে তো কত!'

নোটিশ পেয়ে সুষমা-অনাদি এসেছে কোর্টে। দু পক্ষের উকিল নিয়ে ঢুকেছে জজের খাসকামরায়।

আপোসের চেষ্টায় এসেছে, কিন্তু দু দলই রণমুখো।

দু প্রান্তে দুই চেয়ারে বসেছে স্বামী-স্ত্রী। এ দেয়ালে-টাঙানো ছবি দেখছে, ও জানলার বাইরে গাছ দেখছে।

অরুণেন্দু সুষমাকে বললে, 'অনাদিবাবুর দিকে তাকান। একটু হাসুন।'

'ছোঃ!' ঝটকা মেরে ঘাড় বাঁকাল সুষমা। মুখ ফিরিয়ে কাঠ হয়ে রইল।

এবার অরুণেন্দু লক্ষ্য করল অনাদিকে : 'সুষমাদেবীর সঙ্গে কথা কন। ডাকুন নাম ধরে।'

অনাদি হুঙ্কার করে উঠল : 'যার-তার সঙ্গে আমি কথা কই না।' দু পক্ষের উকিল হাসতে লাগল।

আপোসের চেষ্টায় অরুণেন্দু ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিল : 'দেখুন ঝগড়াটা যতই কেননা এখন বিস্তৃত হোক, আসলে ছোট একটা বিন্দুতে তার বাসা। ছোট একটা বীজাণু থেকে সমস্ত শরীরে রোগ। ঐ ছোট্ট সুইচ-পয়েন্টটা মেরামত করতে পারলেই আবার আলোয় আলো হয়ে উঠবে। আসল উপায় কী জানেন? শুধু একটুখানি মনোভাবের বদল। নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রী আর নিজের পুরুষকে পরপুরুষ ভাবা। সাধনের শুধু এইটুকুই কৌশল। এ সাধন আমাদের দেশে অচল নয়। সহজ সাধন। তেমনি সহজভাবে দেখুন একটু পরস্পরকে—'

উকিলরা যথারীতি হাসল, কিন্তু অনাদি-সুষমা যেমনি বসেছিল ঘাড় ফিরিয়ে, তেমনি রইল নির্বিকার।

আরো অনেক কিছু বলল অরুণেন্দু। ক্ষমার কথা, দয়াদাক্ষিণ্যের কথা, সমস্ত বিরোধই যে অসার, অস্থায়ী, প্রপঞ্চমাত্র, সেসব উচ্চ দর্শনের কথা।

সমস্ত বক্তৃতা নিরর্থক। একটাও রেখা পড়ল না প্রস্তরে।

এভাবে হবে না। এত লোকজন থাকলে হবে না। উকিল থাকলে হবে না। উকিল থাকলে কি মামলা আপোস হয়?

ওদের খালি-ঘর দিতে হবে। দিতে হবে নিরঞ্জন নৈকট্য।

নাজিরকে ডাকল অরুণেন্দু।

বললে, 'নিচে মালখানায় কোনো ছোট নিরিবিলি ঘর আছে?'

'আছে।'

'দুখানা চেয়ার বসবে?'

'তা বসবে। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'কিন্তু ঘরটা একটু অন্ধকার।'

'অন্ধকার মন্দ কী! স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ তো।' নথিতে চোখ রাখল অরুণেন্দু : 'যান, গোছগাছ করে রাখুন।'

লম্বা দিন ফেলল পেস্কার। মামলার পক্ষদের আবার আসতে হবে সেদিন। আবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।

এ এক বিষম ঝামেলা দাঁড়াল দেখছি। লড়াই করতে এসেও দেখছি শান্তি নেই।

কিন্তু যাব না, এ কখনো বলা চলে না। কোর্টের নির্দেশ অমান্য করলে জরিমানা, নয়তো সরল জেল হয়ে যাবে।

কিন্তু এই চেষ্টার ঘটাও বা কতদিন চলে তার ঠিক কী।

তার চেয়ে মিটিয়ে ফেলাই ভালো।

সুষমা ভাবল।

আদালত থেকে সেদিন যখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিল সুষমা, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে, এমন কথাও মনে হল অনাদির। কী হবে আর কাসুন্দি ঘেঁটে? যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিন বাহুতে তাকে প্রবল স্নেহে জড়িয়ে ধরতে পারে, মামলা এই মুহূর্তেই ফেঁসে যায়। এও ভাবল অনাদি।

বারোটার সময় ম্যাট্রিমনিয়াল কেসের ডাক পড়ল।

খাসকামরায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল অরুণেন্দু, হাজিরা হাতে নিয়ে পেস্কার এসে বললে, 'পক্ষরা এসেছে।'

'এসেছে?' উঠে বসল অরুণেন্দু : 'আর্দালিকে বলুন ওদেরকে নিচে মালখানার ঘরে ঢুকিয়ে দিতে।'

আর্দালি লাফিয়ে এল।

অরুণেন্দু জিজ্ঞেস করলে, 'নাজির যে ঘরটা ঠিক করেছে চেন?'

'চিনি হুজুর।'

'সেই ঘরে ওদের দুজনকে ঢুকিয়ে দাও। আশেপাশে ভিড় যেন না জমে।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল অরুণেন্দু : 'আর বাইরে থেকে দরজা টেনে দাও। গার্ড থাকো। খানিকক্ষণ নিশ্চিন্তে থাক ওরা ভিতরে।'

'জী হুজুর।' চোখেমুখে উৎসাহ নিয়ে নেমে গেল আর্দালি।

দেখি মেটে কিনা। পাথর গলে কিনা। ইজিচেয়ারে আবার গা ঢালল অরুণেন্দু।

চোখে তন্দ্রার একটু ঢুল লেগেছিল, হঠাৎ নিচে একটা হৈ-চৈ উঠল।

কী ব্যাপার?

কতগুলি উকিল এল হন্তদন্ত হয়ে। পড়ি-মরি করে।

'কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে স্যার, কেলেঙ্কারি। মালখানার ঘরে অনাদির সঙ্গে তার স্ত্রীকে না ঢুকিয়ে অন্য মামলার বিবাদী দীপালি বিশ্বাসকে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'কী করে হল?' জিজ্ঞেস করলে সেরেস্তাদার।

'শুক্রবার দিন দুটো করে ম্যাট্রিমনিয়াল কেস থাকে। আজও তাই ছিল।' সাফাই গাইল পেস্কার : 'দুটো কেসই একই ভাবে একই তারিখ ধরে-ধরে চলছিল ধাপে-ধাপে। দেবেশ-দীপালিরও আজ আপোসের চেষ্টায় কোর্টে আসার নির্দেশ ছিল। এসেও ছিল দুজনে। কোর্টের স্বামী-স্ত্রীরা তো

*একসঙ্গে থাকে না, এ এ-বারান্দায় হাঁটে তো ও ও-বারান্দায়। তাই ঘরে এক-*সঙ্গে ঢোকানো যায়নি। অন্যদিকে আগে ঢুকিয়ে ওর বিপক্ষকে খুঁজতে গিয়ে আর্দালি অন্য মামলার বিবাদিনীকে এনে সামিল করে দিয়েছে।'

'অত কথায় কাজ কী?' বিপন্নের সুরে চেঁচিয়ে উঠল অরুণেন্দু : 'বলি, বেরিয়েছে ঘর থেকে?'

'বেরিয়ে আসতে পেরেছে?' কে আরেক জন ফোড়ন দিল।

'চলুন দেখি গে।' নিচে নামল সেরেস্তাদার।

সুষমা তরফদার এল খাসকামরায়। উকিল না দিয়ে নিজেই বলল হাকিমকে, 'স্যার, আমার স্বামীকে দেখুন। কী নীচ, কী জঘন্য!'

'আর দেখুন স্যার, আমার স্ত্রীর স্বভাবটা।' অন্য মামলার বাদী দেবেশ বিশ্বাস হুঙ্কার করে উঠল : 'জাবনা খেতে পরগোয়ালে ঢুকেছে।'

দুই মামলারই শুনানির দিন ফেলে দিল অরুণেন্দু। অর্ডারসিটে লিখল, আপোসের প্রাণান্ত চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আপোস সুদূরপরাহত।

৪১। হরেন্দ্র

আমার সর্দি শুনে মিস সরকার আমাকে দেখতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপটা তখন বেশ জমে উঠেছে—সর্দির ওষুধের আলোচনায় আমরা তখন য়্যাকোনাইট ছেড়ে ব্র্যাণ্ডিতে চলে এসেছি, হঠাৎ নজর পড়লো ঠিক আমাদেরই সামনেকার জানলার ওপারে কার দুটো বড়ো-বড়ো হিংস্র চোখ।

বললুম, 'কে?'

কোনো জবাব পেলুম না। চোখ দুটো বুজে গেলো। কিন্তু জলন্ত একটা নিশ্বাস শুনলুম। আবার বললুম 'কে ওখানে?'

লোকটা সন্তর্পণে সরে যাচ্ছিলো উঠে পড়লুম আচমকা। বাইরে এসে দাঁড়ালুম, সর্দিতে গলায় যতোটুকু হেঁড়েমি ছিলো একত্র করে ফের গর্জন করে উঠলুম : 'কে ও?'

'আমি।'

'আমি কে?'

'আমি হরেন্দ্র।'

হরেন্দ্র কে?

হরেন্দ্রকে আপনারা চেনেন না। হরেন্দ্র আমার আপিসে পাখা টানে।

আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি এ কেন হয়? ঠিক যে-সময়টিতে পালে অনুকূল হাওয়া লেগেছে সে-সময়টাতেই স্টিমারের ধাক্কা লেগে নৌকাডুবি হয় কেন? হয়, হবে, আগেও আরো হয়েছে। প্রেস্টিজ-হানির ভয়ে মিস্টার

সরকার নিম্নস্থ কর্মচারীর বাড়ি আসতে পারেন না বলেই ঈশ্বর হরেন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিনাবাক্যে আমি ওকে বরখাস্ত করে দিতে পারতুম, কেননা এই একটি-মাত্র লোক যাকে আমরা চাকরিতে বসাতে ও চাকরি থেকে খসাতে পারি। কিন্তু এখুনি ওকে বিদেয় করলে আজকের সংসার তো গেছেই, কালকের সংসারও চলবে না। সংসার মানে উনুন-ধরানো, বাজার-করা, বাসন-ধোয়া, ঘর-ঝাঁট-দেয়া—স্ত্রীদেরকে জিগ্গেস করে দেখবেন। হরেন্দ্র আমার আধখানা পাখা, বাকি আধখানা চাকা।

মিস সরকার কখন চলে গেছেন, রাত দশটার সময় একাদশতম পেয়ালায় চা খাচ্ছি, হরেন্দ্রকে ডেকে পাঠালুম।

ওকে অন্তত কঠিন তিরস্কার করাও উচিত ছিলো, কেন ও আমার ঘরের জানালায় এসে উঁকি দেয়, শুধু উঁকি দেয় না, প্রজ্বলন্ত প্রতীক্ষায় নিষ্পলক চেয়ে থাকে। কিন্তু ভাবলুম, মোটে সাত দিন ও এসেছে, তিরস্কার করবার আগে ওর সঙ্গে প্রথমে আলাপ করা দরকার। স্বপক্ষ-বিপক্ষ সমস্ত এভিডেন্সের মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বিচার করবার অভ্যেস আর নেই। ডাকলুম হরেন্দ্রকে।

ছ' ফুটের উপরে লম্বা, কিন্তু শরীর একেবারে দড়ি পাকিয়ে গেছে। গাল দুটো বসা, গভীর গর্তের মধ্যে থেকে চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে উঠেছে উদ্ধত বিকৃতিতে। গলাটা ঢিলে, নড়বড়ে, দেখলেই কেমন মায়া করে। বুকের জিরজিরে পাঁজর কখানা দেখলে হঠাৎ মুখ দিয়ে কঠিন কথা বেরুতে চায় না। তার দৈন্য দুর্দশার সঙ্গে চেহারার সমস্ত-কিছু অনায়াসে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়, কিন্তু তার চোখ দুটোই মেলানো যায় না। তাতে না আছে একটু বিনয়, না বা কাতরতা। সে দুটো যেমন উগ্র, তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত! আমি পুরুষ বলেই শুধু ভয় পেলুম না। জিগগেস করলুম : 'তোর কি কোনো অসুখ?'

ম্লান গলায় হরেন্দ্র বললে, 'হ্যাঁ, হুজুর।'

'কি?'

'আজ এগারো বছর সমানে মাথা-ধরা। রাতের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে, সারা রাত ঘুমুতে পারি না। এই এগারো বচ্ছর।'

'তোর এখন বয়েস কত?'

'আটত্রিশ।'

'এত দিন ধরে ভুগছিস? কেন, ওষুধ খেতে পারিস না?'

'ওষুধ! ওষুধ পাবো কোথায়?' বিচ্ছিন্নীকৃত বড়ো বড়ো পাশুটে দাঁতে হরেন্দ্র হাসলো।

বললুম, 'এই মাথা-ধরা নিয়ে কাজ করিস কি করে?'

'নইলে যে পেট চলে না হুজুর। আগে শিরদাঁড়া, তবে তো পায়ের উপর দাঁড়াবো।'

'কত পাস পাখা টেনে?'

'ছ' টাকা, আর আপনার এখানে দুই। চলে যায়।'

'চলে যায়। বাড়িতে ছেলেপুলে নেই?'

হরেন্দ্র আবার হাসলো, তেমনি সঙ্ক্ষেপে। বললে, 'বলে, ফুলই নেই তো ফল ধরবে!'

'কেন, পরিবার মারা গেছে বুঝি?'

'পরিবার করি নি, হুজুর।'

হরেন্দ্রের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। 'স্ত্রীজাতির প্রতি অমানুষিক এই বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণার কারণ কী?' কথাটা হরেন্দ্র বুঝলো না। তাই সরাসরি জিগ্‌গেস করলুম : 'করিস নি কেন বিয়ে?'

'পাবো কোথায়?' কথার শেষে হরেন্দ্রর নিশ্বাস আমার কানে এলো।

'পাবি কোথায় মানে? কেন, তোদের জাতের মধ্যে গাঁয়ে কি মেয়ে নেই?'

'আছে বৈ কি, কম আছে।'

'তবে একটা কাউকে জুটিয়ে নে না। মাথা-ধরাটা ছাড়ুক।'

হরেন্দ্র হাসলো, যে-হাসি প্রায় হতাশার কাছাকাছি। বললে, 'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি যে।'

'যে কখনো বিয়ে করে নি, সে কখনো বুড়ো হয়? কেন, তোদের গাঁয়ে বড়ো মেয়ে নেই? সব সরদা-আইনে পার হয়ে গেছে?'

'আছে বৈ কি, এই তো সন্নেসি বাওয়ালির মেয়ে বেগুনি আছে।' হরেন্দ্রর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠলো।

'বয়েস কত?'

'বাইশের কম হবে না।'

'তবেই তো দিব্যি মানিয়ে যাবে। ওকেই বিয়ে কর্ না।'

'ওর বাপ ছ' কুড়ি টাকা চায়।'

'টাকা, টাকা কিসের?'

'পণ, হুজুর।'

'তোদের দেশে মেয়েরা বুঝি পণ নেয়। উল্টো দেখছি।' আসলে খতিয়ে দেখলুম সেইটেই ন্যায্য নিয়ম। বললুম, 'পণ জুটছে না বলে চামার বাপ মেয়েটাকে বিয়ে দিচ্ছে না? মেয়েটাকে শুকিয়ে মারছে? বেটাকে পুলিশে চালান দেওয়া উচিত।'

আমার এই নিষ্ফল আক্রোশে হরেন্দ্র হাসলো। বললে, 'এর জন্যে সন্নেসি খুড়োকে দোষ দেয়া চলে না, হুজুর। ঐ আমাদের নিয়ম, নড়চড় হবার জো নেই। মেয়েরাই লক্ষ্মী, তাই মেয়েদেরই দাম।'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'সন্নেসি তোর খুড়ো নাকি?'

'গ্রাম-পরচায় খুড়ো, কোনো কুটুম্বিতে নেই। একালি জমি, বাড়ি নজদিগ্। মাঝখানে ছোট একটা জোলা। আমার বয়স যখন বাইশ আ

বেগুনির বয়েস যখন ছয়, তখনই বাবা কথা পাড়েন, সন্নেসি-খুড়ো এক ডাকে পঁয়ত্রিশ টাকায় উঠে বসলো। মহাজনের দেনা, মালিকের খাজনা, দু-দু বছর অজন্মা, জমিতে বাঁধবন্দি নেই, অত টাকা বাবা পাবে কোথায়? এ-বছর যায় ও-বছরে জমি লাটে ওঠে, রেহেনদার এসে ডিক্রির টাকা আমানত করে দিয়ে দখল নেয়। অভাবের পর অভাবের তাড়না, টাকা কোথায়? হালের একটা গরু কিনতে পারি না, তায় বিয়ে! এদিকে দিন যত গড়িয়ে যায়, সন্নেসি খুড়োর ডাকও তত এক পরদা করে উঁচু হতে থাকে। উঠতে-উঠতে এখন তা ছ'-কুড়িতে এসে ঠেকেছে। আমাদের দেশে মেয়ের যত বয়েস তত দাম!'

'ভূতের দেশ। বুড়ি মেয়েকে টাকা দিয়ে বিয়ে করবে কে?'

'আমার মতো বুড়োরাই। বুড়ির সঙ্গে-সঙ্গে বুড়োও তো গজাচ্ছে।'

'তবে এক কাজ কর। আট টাকা করে পাচ্ছিস, কিছু-কিছু জমাতে সুরু কর্। বেগুনবালার বয়েস যখন পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাকে ধরে ফেলতে পারবি।'

'আট টাকা! সব গিয়ে জমি এখন তিন বিঘেতে এসে ঠেকেছে। ফসল যা ওঠে তাতে সংসারই কুলোনো যায় না। আগে খাবো না খাজনা দেবো! বাবার বুড়ো ঘাড়ে লাঙল ফেলে দিয়ে আমি এখানে পাখা টানছি. যদি খাজনাটা, সেস্‌টা. গোমস্তার তহুরিটার কিছু অংশও মেটাতে পারি। আমার আবার বিয়ে আমার আবার ঘর! সেদিন সোজাসুজি বলেছিলুম না বেগুনিকে—' হরেন্দ্র ঢোক গিলে কথাটা গিলে ফেললে।

'কী বলেছিলি?' কথাটা ধরিয়ে দিলুম : 'বিয়ে করতে বলেছিলি?'

ঘেমে, দম নিয়ে হরেন্দ্র বললে, 'বলেছিলুম, কী হবে এমনি বসে থেকে, দিনে-দিনে দুজনেই বুড়িয়ে গিয়ে? টাকা তো আর তুই পাবি না, পাবে ঐ সন্নেসি-খুড়ো। মিছিমিছি সোয়ামির টাকা অপব্যয় করিয়ে লাভ কী? চল্, আমরা দু'জনে চলে যাই।'

মুহূর্তে অনেকটা ফাঁকা আকাশ ও অনেকটা ঢালু মাঠ যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম, 'বেগুনি কী বলল?'

'ও ঠাট্টা করে উঠলো, চোখ টেরিয়ে মাজা বেঁকিয়ে হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটলো : কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে!'

আমি হেসে উঠলুম, সঙ্গে-সঙ্গে হরেন্দ্রও হাসলো। কিন্তু মানুষে এমন ভাবে কেঁদে উঠতে পারে এ কখনো শুনি নি।

'যা যা, ঢের হয়েছে। বিয়ে করিস নি, বেঁচে গেছিস। বিয়ে করলেই পাঁচ শো ঝঞ্ঝাট। ছেলে রে, পুলে রে, আজ এটা, কাল সেটা—একেবারে নাজেহাল করে ছাড়তো। দিব্যি আছিস বিয়ে না করে, ভারও বোস না, ধারও ধারিস না। এই যে আমি এখনো বিয়ে করি নি, কী হয়েছে? আমার তাতে মাথা ধরে, না চোরের মতো পরের জানলা দিয়ে উঁকি মারি?'

সে দিন রাত ভরে বারে-বারে আমারই কথাটা কানের কাছে ঘুরে বেড়াতে

লাগলো : এই তো আমি এখনো বিয়ে করি নি, কী হয়েছে? সে কি কোনো অভাব, না শূন্যতা, না শ্রান্তি, কী হয়েছে? দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না জানি, কিন্তু দুধ টকে গেলে ঘোল হতে আর কতক্ষণ! তৃষ্ণার যখন শেষ নেই, তখন ডিকেন্টার সাজিয়ে কী দরকার!

একদিন হরেন্দ্রকে জিগ্‌গেস করলুম : 'তোর বাড়ি কোথায়?'

'কোতলগঞ্জ। হিরনপুর ইস্টিশনে নেমে মাইল দুয়েক।'

'যাবো তোদের গাঁ দেখতে।'

হরেন্দ্র বিশ্বাস করতে চায় না।

'সামনে এই রথের ছুটি আছে, সেই ছুটিতেই যাবো। তুই আমাকে নিয়ে যাবি পথ দেখিয়ে।'

রথের ছুটির দিন সত্যিই তাকে স্টেশনে যাবার জন্যে গাড়ি আনতে বললুম দেখে হরেন্দ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। বললে, 'সত্যিই যাচ্ছেন নাকি, হুজুর?'

'হ্যাঁ, দেখছিস না, সকাল-সকাল খেয়ে নিলুম।'

হরেন্দ্র আমতা-আমতা করে বললে, 'আমাদের ওখানে দেখবার কী আছে?'

'তোর বেগুনি আছে। দেখি সন্নেসিকে বলে-কয়ে তোর সম্বন্ধটা ঠিক করতে পারি কিনা।'

লজ্জায় ও আনন্দে হরেন্দ্রের সমস্ত মুখ ভরে গেলো।

বললুম, 'কি, মাথা-ধরাটা একটু কম বোধ হচ্ছে?'

হরেন্দ্র সস্নেহ চোখে বললে, 'আপনার ভারি কষ্ট হবে, হুজুর।'

'কিন্তু তোর কষ্ট যে দেখতে পারি না।'

'কষ্ট কেন, বেগুনিকে বিয়ে করতে পাবো না বলে?' হরেন্দ্রের অভিমানে ঘা পড়লো।

'না। একদম বিয়ে করতে পাচ্ছিস না বলে। নে, গাড়ি ডেকে নিয়ে আয়। বিকেলের ট্রেনেই ফিরে আসতে পারবো।'

দুপুর প্রায় দুটো, কোতলগঞ্জে সন্নেসি বাওয়ালির বাড়ি এসে পৌঁছুলুম। সন্নেসি মাঠে ছিলো, হরেন্দ্র ডেকে নিয়ে এলো। আমি যে কে সবিস্তারে হরেন্দ্র তার বিজ্ঞাপন দিতে নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি করে নি, কিন্তু মনে হলো সন্নেসি বিশেষ অভিভূত হলো না। মনে হলো প্যান্ট-কোট পরে না আসাটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে।

তবু আমি যে জমিদারের নায়েব-গোমস্তার উপরে এইটুকু সে অবিসম্বাদে বুঝতে পেরেছে। দাওয়ায় উইয়ে-খাওয়া একটা চৌকি ছিলো, তাতে তেল-চিটচিটে ছেঁড়া একটা পাটি পেতে আমাকে সে বসতে দিলো। বললুম, 'তোমার একটি মেয়ে আছে?'

সন্নেসি ঘাড় নাড়লো, ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না।

'বিয়ের যুগ্যি?'

'বউ ছেড়ে শাশুড়ি হবার যুগ্যি।' সন্নেসি নিশ্বাস ছাড়লো।

'আমাকে একবারটি দেখাতে পারো?'

এ-প্রশ্ন আরো দুরূহ। সন্নেসি হরেন্দ্রের মুখের দিকে অবোধের মতো তাকিয়ে রইলো।

'নতুন কিছু নয়, হরেন্দ্রের সঙ্গে তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করতে চাই। কি, আপত্তি আছে?'

'একটুও না।' সন্নেসি উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'টাকা পেলেই আমি ছেড়ে দিতে পারি। হরেন্দ্র ছাড়া ও-মেয়ের যুগ্যি পাত্রও সমাজে আর দেখতে পাচ্ছি না।'

'খুব ভালো কথা। আমিই যখন হরেন্দ্রর মুনিব, তখন আমিই ওর বরকর্ত্তা। কি বলো, ঠিক কিনা?'

'ঠিক।' সন্নেসী মাথা নাড়লো।

'তবে বরকর্ত্তাকে একবার মেয়ে দেখাতে হয়। মেয়ে না দেখালে সে বুঝবে কি করে কত তার দাম হতে পারে।'

'দাম হুজুর, হাজার টাকা, এক আধলাও কম নয়। এ আমি সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ করে বলে আসতে পারি। তবে হরেন্দর গরিব-গুর্বো লোক, রয়ে-সয়ে মোটে ছ'-কুড়ি টাকায় রফা করেছি।'

'সে কথা পরে দেখবো।' বললুম, 'মেয়ে তোমার বাড়ির ভেতর গিয়ে দেখতে হবে নাকি?'

'কেন, ডাকলেই চলে আসবে এখানে।' বলেই সন্নেসি ডাকলো : 'বেগনি।' তারপর হাসিমুখে বললে, 'বাজার-হাট গরু-চরানো, মাঠে আমাকে পান্তা দিয়ে আসা, আমার তামাক খাবার ফাঁকে লাঙল-ধরা, সবই তো আমার বেগুনি করে। সংসারে ওর মা নেই, ভাই-বোন নেই, কেউ নেই; আমার ওই সব।' বলে আবার ডাকলো : 'বেগনি!'

গৌরবে তাকে দরজা বলছি, একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'কী করছিলি এতক্ষক্ষণ?' সন্নেসি বললে।

হাসতে হাসতে বেগুনি বললে, 'ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিলাম।'

এতদিন মেয়েদেরকে শুধু পোশাকের সংজ্ঞায় দেখে এসেছি, কিন্তু সেই আমার প্রথম দেখা, পোশাকের অতিরিক্ত করে দেখা। কেননা মেয়েটির গায়ে সামান্য একটা সেমিজ পর্যন্ত নেই, মোটা লাল-পাড় কোরা একটা সাড়ি—সন্দেহ হচ্ছিলো ইতিমধ্যে সে বেশ-পরিবর্তন করে এসেছে কি না—দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে সমান কুন্ঠিত, মুখের কাছে আঁচলটা রাশীভূত করে হাসি লুকোতে গিয়ে এখানে-ওখানে কিছু-কিছু সে বঞ্চিত করে এসেছে—কিন্তু মনে হলো, দুপুরের রোদে গাছের ছায়াতে এসে যেন বসলুম। ভাবলুম রূপ কী, রূপ কোথায়? দেখতে ও নির্মল কালো, মুখশ্রী নিখুঁত সরল, বেশভূষার ঐ তো চেহারা, কিন্তু মনে হলো, এত সজীবতা এমন স্বাস্থ্য কোথাও আগে দেখিনি। যেন ও মাটি

থেকে উঠে-আসা সতেজ লতা, তাতে রোদ পড়েছে, জ্যোৎস্না পড়েছে, শিশির পড়েছে, শক্ত তাজা সবুজ—তবু সে একটা লতা, সেতারের তার বা পেটিকোটের দড়ি নয়। ভাবলুম এতদিন স্ক্রেপ-করা দাঁত, স্ক্রুসেন সল্‌ট্‌ আর ট্যাঙ্গিকেই সৌন্দর্য্য বলে এসেছি কারণ এতদিন বেগুনিকে দেখিনি।

বললুম, 'কি, হরেন্দ্রকে পছন্দ হয়?'

বেগুনি হাসছে, কেবল হাসছে, ঝলকে-ঝলকে হাসছে।

বললুম, 'টাকা চাই নাকি?'

বেগুনির ততোধিক হাসি. থরে-থরে পরতে-পরতে হাসি। আর সে-হাসির জলে উঠেছে লজ্জার তরঙ্গ। সেখানে সে আর দাঁড়াতে পারলো না।

সন্নেসিকে বললুম, 'কত নেবে ঠিক বলে দাও।'

'আগেই তো বলেছি, ছ'-কুড়ির এক আধলাও কম হবে না।'

'কী বলো যা-তা! টাকা দিয়ে তোমার কী হবে?'

'ওকে ছেড়ে দিয়েই বা আমার কী হবে? এমন মেয়ে আমি বিনিপয়সায় বিদেয় করবো নাকি? কেউ করে কখনো?' সন্নেসি চোখ পাকিয়ে উঠলো।

'তা করে না। কিন্তু হরেন্দ্র ছাড়া আর পাত্র কোথায়?'

'আর ও ছাড়াই বা আমার মেয়ে কোথায়?'

কোন দিক দিয়ে যে অগ্রসর হবো বুঝতে পাচ্ছিলুম না। বললুম, 'কিন্তু বিয়ে না দিয়ে মেয়ে কি তুমি চিরকাল আইবুড়ো রাখবে নাকি? ওরো তো সাধ-আহ্লাদ আছে।'

'ওর চেয়ে যার সাধ-আহ্লাদ বেশি দেখা যাচ্ছে, ছ'-কুড়ি টাকা সে ফেলে দিক না। তা হলেই তো চুকে যায়।'

'হরেন্দ্র তা পাবে কোথায়? কর্জে-খাজনায় তলিয়ে আছে।'

'আর আমি সুখের সাগরে সাঁতার কাটছি, না? টাকা কটা পেলে মহাজনের নাকের উপর তা ছুঁড়ে দিয়ে জমিটা আমার ছাড়িয়ে আনতে পারি।'

'কিন্তু টাকা ক'দিনের?'

'বলে, এক দিনের জন্যেও পেলুম না, ক'দিনের!' সন্নেসি ভেঙচিয়ে উঠলো।

'এ-ও ভেবে দেখ, হরেন্দ্রর মতো পাত্র আর দুটি নেই। আজ ও পাখা টানছে, কাল ও আর্দালি হবে, ক'দিন পরেই আদালতের পেয়াদা। ভেবে দেখ, আদালতের পেয়াদা তোমার জামাই হবে।'

'তাই বলে বিনা-পণে মেয়ে দেবো?' সন্নেসী রুখে উঠলো: 'সমাজে আমার একটা সম্মান নেই? লোকে বলবে কী আমাকে? নেমন্তন্ন খেতে ডাকবে না যে। ছি ছি ছি, সমস্ত সংসারে যা কেউ করলো না, দাম না নিয়ে মেয়ে ছাড়বো? হরেন্দর না হয়, মহেন্দর আছে, ও-পাড়ার রাইচরণ আছে, দুর্লভ আছে, দ্বারিক আছে—'

'সব, সব ওরা বয়েসে ছোট, হুজুর।' হরেন্দ্র একটা গুহার মধ্যে থেকে আচমকা শব্দ করে উঠলো।

'তাতে বাধা কী! পঞ্চাশ-ষাট বছরের বুড়ো যদি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে বিয়ে করতে পারে, তার উল্টোটাই বা চলবে না কেন? কী করা যাবে, যদি বয়েস মেপে পাত্র না পাওয়া যায়! ছোট ছেলে বড়ো মেয়ে বিয়ে করেছে, আমাদের অঞ্চলে তা একেবারে অচল নয়। টাকা যার শাঁখা তার।'

'কিন্তু ছোটরা তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হবে কেন?'

'রাজি না হয়, বিয়ে হবে না। তাই বলে জাত জন্ম খুইয়ে বিনা-পণে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সমাজের বার হয়ে যেতে পারি না তো।'

'সবই বুঝলুম, সন্নেসি—কিন্তু বাপ হয়ে মেয়ের কষ্টটা তুমি বুঝলে না সেইটেই বড়ো দুঃখ থেকে গেলো।'

সন্নেসি পাল্টা জবাব দিলো। বললে, 'আপনিও বা আপনার চাপরাশির কষ্ট বুঝে ট্যাঁক থেকে টাকা ক'টা ফেলে দিন না।'

এমনি একটা কথায় এসে শেষ হবে আগে থেকেই আশঙ্কা করছিলুম। ট্যাঁকে হঠাৎ টান পড়তেই মনে হলো এ আমি কী ছেলেমানুষি করছি! কোথাকার কে হরেন্দ্র, তার মাথা ধরেছে বলে আমার মাথা-ব্যথা! এক দিনের জন্যে নয়, সমস্ত জীবনের জন্যে একটা মেয়ের দাম একশো কুড়ি টাকা! হরেন্দ্রর মাঝে যে প্রসুপ্ত পুরুষত্ব আছে সেই একদিন আমাকে নির্লজ্জ কণ্ঠে অভিশাপ দেবে, তাকে জয়ী না করে ভিক্ষুক করেছি।

উঠে পড়ে বললুম, 'বাড়ি চল, হরেন্দ্র। গাড়ির সময় হলো।'

মাঠটা দু'জনে নিঃশব্দে পার হয়ে এলুম। হঠাৎ হরেন্দ্র লজ্জিত সৌজন্যে বললে, 'কোনো বাপই রাজি হয় না হুজুর, যে-দেশে যেমন নিয়ম। নড়চড় হবার জো নেই।'

উত্তর দিলুম না।

'বলা যায় না', হরেন্দ্র আবার বললে, 'হয়তো ঐ মহেন্দ্র কি স্বারিকই শেষ-কালে বিয়ে করবে। কিন্তু, তাও ঠিক, ওদেরই বা অত পয়সা কোথায়? বলা যায় না কর্জই করে বসবে হয়তো।'

'করুক গে।' ধমকে উঠলুম : 'ঐ তো রূপের ডালি মেয়ে, তার জন্যে দশ-বিশ নয়, একশো কুড়ি টাকা! একশো কুড়ি টাকায় গ্রিনল্যান্ডের রানী পাওয়া যায়।' সেটা কি জিনিস—হরেন্দ্র ভেবড়ে গেলো।

তারপর অনেক দিন হরেন্দ্রকে ব্যক্তিগত ভাবে দেখি নি। কিন্তু একদিন রাতে চাকরের ঘর থেকে একটা কান্নার আওয়াজ শুনলুম, ঠিক কুকুরের কান্না। মনে হলো যে-কুকুরটা রোজ খেতে আসে তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে ঠাকুর হাওয়া খেতে বেরিয়েছে! কিন্তু কোথাও একটা বন্ধনের চেতনা মনের মধ্যে জেগে বসে থাকলে সারা রাত আমার চোখে ঘুম আসবে না। উঠোনটুকু পেরিয়ে গিয়ে দরজায় ঠেলা দিলুম। দেখি কপালের উপর দিয়ে শক্ত করে একটা দড়ি বেঁধে হরেন্দ্র দুই হাতে দেয়াল ধরে বসে তাতে মাথা ঠুকছে আর পশুর ভাষায় নির্বোধ আর্তনাদ করছে। মুহূর্তে সমস্তটা শরীর জমে পাথর হ'য়ে গেলো।

বললুম, 'কী হয়েছে?'

হরেন্দ্র মুখ তুলে তাকালো না, বললে, 'মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা, ঘুমুতে পাচ্ছি না।'

মনে হলো ও একটা পরিপূর্ণ অবসাদ চায়, একটা অতলান্ত শান্তি, নিঃস্বপ্ন ঘুম—যে ঘুমে মৃত্যুর আস্বাদ। বললুম, 'আমার ঘরে আয়।'

হরেন্দ্র ঘরে এলো।

'এই পাঁচটা টাকা দিচ্ছি, যা, কোথাও একটু ঘুরে আয়।'

হরেন্দ্র ভাবলো আমি বুঝি ওকে বিদায় করে দিলুম।

বললুম, 'মদ খাস? খেয়েছিস কখনো?'

হরেন্দ্র জিভ কেটে কান মলে মুখ-চোখের একটা বিবর্ণ চেহারা করলো।

'কী হলো, না খেয়েই ওক করছিস যে? খেলে ঠান্ডা হয়ে বিভোরে ঘুমিয়ে পড়তে পারতিস।'

'কী সর্বনাশ!' মাথা ছেড়ে হরেন্দ্র যেন একেবারে তার বুকের মধ্যে অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করলে। বললে, 'মরে গেলেও ও-জিনিস মুখে তুলতে পারবো না, হুজুর। নইলে তো কলেই চাকরি নিতে পারতুম, অনেক মাইনে, অনেক উপরি। কিন্তু সেখানে শুনেছি সবাই ও-জিনিস খায়, সেখানে নাকি কারুরই চরিত্তির ভালো থাকে না।'

'সাধে আর তোদের চাষা বলে! যা, দেয়ালে মাথা ঠোক্ গে যা।'

হেসে ফেললুম। এবং সে-হাসিতে হরেন্দ্র যেন অনেকখানি অভয় পেলো। বললে, 'আর যাই হোক, হুজুর, চরিত্তির খোয়াতে পারবো না।'

বললুম, 'তবে এক কাজ কর, একটা চাঁদার খাতা খুলে ফ্যাল। যেচে-মেগে ছ'-কুড়ি টাকা তুলতে চেষ্টা কর ঘুরে ঘুরে। যদ্দিনে পারিস। নে, এই পাঁচ টাকাই আজই তোকে দিতে যাচ্ছিলুম। আমারই এই প্রথম চাঁদা—নে, তুলে রাখ বাক্সোয়।'

হরেন্দ্র হাত পেতে টাকা নিলো, নোটটা কপালে ঠেকালো ও মুহূর্তে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললে।

তারপর দেখতে দেখতে এসে গেলো পুজার ছুটি—পাখার সিজন্ চলে গেলো বলে হরেন্দ্র বিদায় নিলো।

জিগ্গেস করলুম : 'কত জুটলো এত দিনে ?'

'বারো টাকা সাড়ে তিন আনা।'

'দ্যাখ্ বারো বছরে যদি সাধনায় সিদ্ধি মেলে।'

এর পর প্রায় ছ' মাস হরেন্দ্রের কোনো খবর রাখি নি। কিন্তু ফিরতি মার্চ মাস এসে পড়তেই দেখলুম পাখার উমেদার হয়ে সে উপস্থিত। যা ছিলো তারো আধখানা হয়ে গেছে। চোখ মেলে যেমন তাকানো যায় না, চোখ বুজলেও তেমনি ভয় করে। পাশে ছাতাটা নামিয়ে রেখে হরেন্দ্র গড় হয়ে আমাকে প্রণাম করলো।

বললুম, 'কেমন আছিস?'

'ভালো নয় হুজুর।'

'চাঁদার খাতায় কত হলো এতদিনে?'

'একুশ টাকাটাক হয়েছিলো—যেমন জোরালো করে আপনি লিখে দিয়েছিলেন।'

'হয়েছিলো মানে? টাকাটা কোথায়?'

'আর টাকা!' মেঝের উপর দুই হাত চেপে রেখে হরেন্দ্র হাঁপ নিলো। বললে, "বসন্ত হয়ে গরু একটা মরে গেলো. দেখলুম লাঙল চলে না, সেই টাকা দিয়ে বাবাকে গরু কিনে দিয়েছি।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলুম। বললুম, 'তবে আর পাখা কেন? বাপে-পোয়ে মিলে লাঙল ঠেলো গে যাও। এবার আমি অন্য লোক নেবো—তোমার এখানে পোষাবে না।'

কিন্তু সেই দিনই এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেলো যাতে হরেন্দ্রকে রাখতে হলো।

পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে কে একজন এখানে স্বামীজী এসেছেন চাঁদা সংগ্রহ করতে। কি-একটা অবলা আশ্রম না মাতৃমন্দিরজাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্যে। স্বামীজীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অনেক রকম কথা হলো। তাঁদের প্রধান কাজ ও সমস্যা হচ্ছে অভাগিনীদের সমাজে ফের স্থান দেয়া, গৃহ দেয়া, গৃহস্থজীবনের নির্মল পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। যার স্বামী ছিলো তাকে ফের স্বামীর ঘরে আসন দেয়া, যার ছিলো না তাকে দেশের সেবায় উপযুক্ত করে তোলা, আর যে কুমারী তাকে সুরক্ষিত পত্নীত্বে নিয়ে যাওয়া। বললুম, 'আমাকে একটি পাত্রী দিতে পারেন?'

'কার জন্যে?'

'আমার পাঙ্খাপুলারটার জন্যে।' বলে হরেন্দ্রের অশ্রুরন্ধ্রহীন প্রস্তরীভূত জীবনের কাহিনী বললুম, শেষ পর্যন্ত তার একুশ টাকার চাঁদায় হালের গরু কেনা অবধি।

'এই হিন্দুসমাজ।' স্বামীজী বক্তৃতায় বিস্ফারিত হয়ে উঠলেন।

বললুম, 'নিচু জাতের মেয়ে-টেয়ে আছে?'

'তারাই তো বেশি।'

'তবে দিন একটি জোগাড় করে। আমার হরেন্দ্র খুব ভালো ছেলে। আর যাই হোক, তার চরিত্র সম্বন্ধে ফার্স্ট ক্লাশ সার্টিফিকেট দিতে পারি।'

স্বামীজী হাসলেন। বললেন, 'খাওয়াতে পারবে তো?'

'সেটা আপনার শহরের শিক্ষিত ছেলেদের সমস্যা। হরেন্দ্রের মতো যারা গরিব, তারা স্ত্রীদের খাওয়াবার চিন্তায় ভয় পায় না। সম্পদে-দারিদ্র্যে তাদের সমান সাহস। দিন একটি জোগাড় করে। রানীর মতো সুখে থাকবে।'

'তবে আমার সঙ্গে চলুন। পছন্দ করে আসবেন।'

হাসলুম : 'এর আবার পছন্দ!'

'তবু চলুন, কাল রোববার, দেখে আসবেন আমাদের আশ্রম।'

হরেন্দ্রকে কিছু বললুম না। শুধু বললুম, 'পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছিস, দুটো দিন এখানে জিরিয়ে নে।'

আশ্রম বলতে ভাঙা একটা দোতলা বাড়ি, নিচে আপিস বলতে একটা আলমারি আর গোটা দুই টেবিল-চেয়ার। প্রতিষ্ঠান সবে সরু হয়েছে, কিন্তু এরি মধ্যে বাসিন্দা হয়েছে বিস্তর। উপরে গোলমাল, চেঁচামেচি, খানিকটা বা ঝগড়া-ঝাটির মতো শুনতে পেলুম।

স্বামীজী উপরে একটা ফাঁকা ঘরে আমাকে নিয়ে এলেন। পর-পর তিনটি মেয়ে এনে হাজির করলেন। বললেন, 'এরা কেউ বিবাহিত নয়।'

জাত-গোত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার আর দরকার ছিলো না, কেননা, বেগুনিকে আমি চিনতে পেরেছি। আমাকে মনে করে রাখবার ওর কথা নয়। কিন্তু দেখলুম, কোথায় তার সেই রুপালি হাসি, কোথায় তার সেই সবুজ স্বাস্থ্য। যেন এক কটাহ কালিতে তাকে আধ-সেদ্ধ করে কে তুলে এনেছে।

ওর ইতিহাস জানতে চাইলুম। স্বামীজী খাতাপত্র বের করে এনে ওর কাহিনী বললেন। সেই মোটা মামুলি কাহিনী, খবরের কাগজ খুললেই যা চোখে পড়ে। 'কনভিকশান হয়েছে?'

'কয়েকজনের হয়েছে। ছাড়াও পেয়েছে কয়েকজন।'

'আর কোথাও আশ্রয় মিললো না মেয়েটার?'

'না। বাপ ছিলো কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি হলো না।'

'ভালো কথা। একেই তবে নির্বাচন করলুম। কিন্তু ওর মত আছে তো বিয়েতে?'

'এক্ষুনি।' স্বামীজী হাসলেন : 'বিয়েতে আবার কোন মেয়ের মত নেই?' পরে স্নিগ্ধস্বরে অদূরবর্তিনী বেগুনিকে সম্বোধন করলেন : 'কি মা, বিয়েতে মত আছে তো? স্বামী গরিব হোক, কুৎসিত হোক, তার সঙ্গে ঘর করে তাকে সেবা করে তার সঙ্গে সুখ-দুঃখ সয়ে নিজে তুমি সুখী হতে পারবে না?'

অশ্রু-ভরভর চোখে বেগুনি ম্লানমধুর গলায় বললে, 'পারবো।'

রাত্রেই ফিরে এলুম। ডাকলুম হরেন্দ্রকে। হাসিমুখে বললুম, 'কি, বেগুনিকে বিয়ে করবি?'

হরেন্দ্র নিরবয়ব শূন্যের মতো আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বললে, 'কাকে?'

'বেগুনিকে।'

'বেগুনিকে?' হরেন্দ্র ভীত একটা আর্তনাদ করে উঠলো : 'সে কোথায়? তাকে পাওয়া গেছে?'

যেন কিছুই জানি না এমনি ভাব দেখিয়ে বললুম : 'কেন, কোথায় যাবে সে?'

'তাকে হুজুর ধরে নিয়ে গেছলো। কত থানা-পুলিশ, কত দাদ-ফরিয়াদ। তারপর বাপ যখন তাকে কিছুতেই ফিরিয়ে নিলো না, শুনলুম বিবাগী হয়ে চলে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না।'

'ভালোই তো হয়েছে বাপ তাকে নেয়নি। তাই আজ তুই ইচ্ছে করলেই তাকে বিনা-পণে বিয়ে করতে পারিস।'

'কোথায় সে?' হরেন্দ্রর দুই চক্ষু যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

'যেখানেই থাক, নিরাপদে আছে। কিন্তু আমার কথার জবাব দে। তাকে তুই বিয়ে করতে রাজি আছিস?'

'এক্ষুনি।'

'তার এই অবস্থায়ও?'

'তার এই অবস্থা কে করেছে, হুজুর?'

'কে?'

'তার বাপ, যে ছ-কুড়ি টাকার এক আধলা কমেও মেয়ে ছাড়বে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো; আমি, যে পুরুষ হয়ে জন্মেও এ ক' বছরে সামান্য ক'টা টাকা জোগাড় করতে পারি নি।'

'বিয়ে যে করবি খাওয়াবি কী?'

'শাক-ভাত, নুন-আলুনি, ভগবান যা দেবেন।'

'থাকবি কোথায়?'

'কেন, গাঁয়ে আমার ঘর নেই, জমি-জমা নেই, হাল-গরু নেই?'

হরেন্দ্রকে মুহূর্তে আজ প্রকাণ্ড বড়োলোক মনে হলো।

বললুম, 'যা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো গে এখন!'

'ঘুম! ঘুম কি আমার কোনোদিন আসে?' হরেন্দ্র চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরলো : 'কিন্তু হুজুর, সে বেশ ভালো আছে তো?'

বই একটা টেনে নিয়ে নির্লিপ্তের মতো বললুম, 'আছে।'

হরেন্দ্র আমার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে আস্তে-আস্তে সরে গেলো। আমাকে সত্যিই বিশ্বাস করবে কিনা এই যেন সে ভাবছে।

পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে দেখলুম, হরেন্দ্র বাড়ি নেই। ঠাকুর বললে, শিগগিরই নাকি তার বিয়ে, তাই বাড়ি চলে গেছে তোড়জোড় করতে। ট্রেন-ভাড়ার পয়সা নেই। সময়ও অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাই রাত থাকতে উঠে পায়ে হেঁটেই সে চলে গেছে। আশ্চর্য, ছাতাটা কিন্তু নেয় নি, ও শিগগিরই ফের ফিরে আসবে রেখে গেছে তার নিদর্শন।

কিন্তু সেই যে গেলো হরেন্দ্রর আর দেখা নেই।

মাসখানেক পরে এক সন্ধ্যেবেলা বাবার টেলি এসেছে—আসছে একুশে এপ্রিল আমার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে, যেন এখুনি আমি ছুটির জন্যে দরখাস্ত করি—ঘুরে ফিরে বারে-বারে সেই টেলিটাই পড়ছি, এমন সময় হরেন্দ্র এসে হাজির। একটা মূর্তিমান আতঙ্ক।

কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে আকুল কেঁদে উঠলো।

'কী, কী হলো আবার?'

'কাউকে রাজি করাতে পারলাম না, হুজুর।'

'কিসের রাজি?'

'আমার বিয়ের। বাবা, ভায়েরা, সবাই এর বিরুদ্ধে, পাড়া-প্রতিবাসী জ্ঞাতি-কুটুম, স্বজাতি-বিজাতি সবাই। জমিদারের লোক পর্যন্ত খাপ্পা—বলে, ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে দেবো। সন্নেসি-খুড়ো শাসিয়ে বেড়াচ্ছে—বেগনি যদি ফের গাঁয়ে ঢোকে, কেটে কুচি-কুচি করে শেয়ালের মুখে ধরে দিয়ে আসবো। পারলাম না, কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না।' সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্বেলিত কান্না।

তার এই অবস্থাতে তার হাতে পাখাটা আবার ছেড়ে দিই—সবাই পিড়াপিড়ি করলো। কিন্তু যে যাই বলুক, আমি ওকে কিছুতেই কাজ দিলুম না এবং বাড়ি থেকে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র চলে যেতে বললুম। তার আর কোনোই কারণ নেই, সম্প্রতি আমি বিয়ে করে স্ত্রী ঘরে আনছি, এ-সময়টায় আমারই চারপাশে একটা বুভুক্ষু উপবাসী মানুষের নিরুপায় যন্ত্রণা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

৪২। ফুট নোট

'আমি কিন্তু পাশে দেখব।' সুনন্দা বললে আদুরে গলায়।

গরবিনীর দিকে সপ্রেমে তাকাল প্রবীর। বললে. 'পাশ দেয়, তবে তো?'

'পাশ দেবে না মানে? তোমার বই হচ্ছে আর তোমাকেই পাশ দেবে না? শোনো,' গম্ভীর হল সুনন্দা : 'সাতখানা চেয়ে নেবে।'

'দুখানা হলেই তো ভালো।' মুখ টিপে হাসল প্রবীর : 'আমি আর তুমি। মিস্টার য়্যান্ড মিসেস। শ্রী আর শ্রীমতী।'

'খবরদার।' চোখ পাকাল সুনন্দা : 'সাতখানার কম হবে না। দিদি বলছিল প্রবীরের বই সিনেমা হচ্ছে, তা আমরা টিকিট কেটে দেখব কেন? শোনো যা বলছি,' আবার মনে করিয়ে দিল : 'সাতখানা চেয়ে নেবে।'

'চাইতে হবে কেন, নিজেরাই এসে নেমন্তন্ন করে যাবে—'

'হ্যাঁ, আমি তুমি দিদি জামাইবাবু ঠাকুরঝি বিলটু বাচ্চু—' স্বপ্নোচ্ছল বিভোর গলায় বললো সুনন্দা। পরে বাস্তবে পা রাখল : 'কার কাছে চাইতে হবে? প্রডিউসার, না, ডিরেক্টরের কাছে, নাকি পাবলিসিটি অফিসারের কাছে?

'বলছি চাইতে হবে না, নিজেরাই দিয়ে যাবে।'

'শুভমুক্তি কবে?' খাটের উপর থেকে কাগজটা তুলে নিল সুনন্দা।

'আসন্ন।'

'আসন্ন মানে? এই যে লিখেছে—আজ কী বার?' হিসেবের ফাঁপরে পড়ল সুনন্দা। পরমুহূর্তেই হালকা হয়ে বললে, 'এই যে, এ শুক্রবারের পরের শুক্রবার।' সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : 'ও মা, দেখেছ, বিজ্ঞাপনে তোমার নাম দেয়নি। কী সাংঘাতিক কথা।' যেন ওর চেয়ে শোকাবহ কিছু হতে পারে না এমনি চোখ করল : 'যার কাহিনী তারই নাম নেই?'

'বইয়ের নামই বদলে দিল!'

'তা. মূল কাহিনীটা তো তোমার।'

'সেই রকমই তো শুনেছি! তা কাহিনীটার আলাপগুলো বদলে দিলেই বা করছি কী?'

'তা বলে লেখককে স্বীকার করবে না?' সুনন্দা তড়পে উঠল। বললে, হাড়মাসের মূল কাঠামোটাই আসল, পোশাক-আশাক বাহুল্য। মানুষটার পরিচয় কাঠামোতেই, পোশাক-আশাকে নয়। চিত্ররূপ যাই হোক মূল কাহিনীকার যে তুমি এটা উল্লেখ করবে না?'

'দেখ ভালো করে, করেছে—'

'ও মা, দেখেছ,' আরেক ধাক্কা খেল সুনন্দা : 'কত খুদে-খুদে অক্ষরে করেছে. আর শেষ দিকে, এক কোণে—'

'এটুকু না করলেও বা কী করতে!'

'আর এই দেখ পরিচালকের নাম, সুরকারের নাম, আর প্রযোজকের নাম সবচেয়ে বড় অক্ষরে!'

'তাই তো হবে।' প্রবীর হাসিমুখে বললে, 'পুজোয় দেখনি, প্যাণ্ডেল সাড়ে সাত শো, প্রতিমা ন শো, আলো পাঁচ শো আর পুরোত বাকি-বকেয়া-সহ আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা।'

'সাহিত্যিকের এই মর্যাদা?'

'লোকে তো পত্রপুষ্পই দেখে, শেকড়ের কে খোঁজ নেয়? সভায় দেখনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার পর গায়ক এমন একখানা পোজ করে যেন গানখানাও সে লিখেছে। সাহিত্যিক তো বর্জাইস অক্ষরের ফুটনোট।'

'অত শত বুঝি না।' চরম আলটিমেটাম দেবার মত করে সুনন্দা বললে. 'পাশ আদায় করো।'

দু দিন পরে মুখ ভার করে বাড়ি ফিরল প্রবীর।

'আজ সকালে প্রিমিয়ার শো হল—'

'সে আবার কী?' উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল সুনন্দা।

'রিলিজের আগে একটা শো হয় গণ্যমান্যদের দেখাবার জন্যে—'

'গণ্যমান্য মানে?'

'মানে যারা ভি-আই-পি, মন্ত্রী-তন্ত্রী, যারা সার্টিফিকেট দেবার মত লোক, যারা কাগজওয়ালা, সম্পাদক, মানে যাদের তোয়াজ করলে কাজ হবে—'

'তোমাকে বলেছে?'

'কই দেখি না তো।'

'কেন, তুমি কাহিনীকার, তুমি গণ্যমান্য নও?'

'আমাকে দিয়ে আর কাজ কী।' উদাসীন ভঙ্গি করল প্রবীর।

'সাধারণ একটা সৌজন্য নেই!'

'আমার মনে হয় ভয় পেয়েছে।'

'ভয়?'

'মানে, হয়তো কাহিনীটাকে যাচ্ছেতাই দলাই-মালাই করেছে, এন্তার বোকামি করেছে, অন্যায় করেছে, তাই পাছে সোরগোল করি, ডাকতে সাহস পায়নি!'

'পরে দেখেও তো সোরগোল করতে পারো।'

'তা একবার বই লেগে গেলে সোরগোল আর কে শোনে?'

'তাই বলে যে কাহিনীকার তাকে ডাকবে না?' জ্বালাপোড়ার মত করে বললে সুনন্দা।

'বোধ হয় প্রথম শুভমুক্তির দিন ডাকবে।' প্রবীর হাসল: 'প্রিমিয়ার শো-তে ডাকলে সাতজনে যেতে কী করে?'

'তা ঠিক।' শান্তস্বরে সায় দিল সুনন্দা: 'আমারো তাই মনে হচ্ছে. শুভমুক্তির দিনই ডাকবে।' আবার চোখ পাকাল: 'প্রথম দিনে প্রথম শো. তিনটেয়। মনে থাকে যেন—সাতখানা পাশ—'

শুভমুক্তির দিন সকাল কাটল দুপুর কাটল, কেউ এলনা, কেউ ডাকল না।

'চলো না টিকিট কেটেই দুজনে দেখে আসি।' প্রবীর করুণ মুখ করল।

'তোমার বই আমি টিকিট কেটে দেখব?' ঝলসে উঠল সুনন্দা: 'লোকে বলবে কী!'

'উপরেই বসব না হয়। কেউ চিনবে না আমাদের। কেউ জানবেও না পাশে এসেছি না টিকিটে এসেছি!'

'অসম্ভব।'

কেমন একটা উৎসবমতন হয়েছে ফার্স্ট শো-তে। কত লোক ঢুকছে গোলাপফুল হাতে নিয়ে, উপরে চলে যাচ্ছে, ঠান্ডা বোতল খাচ্ছে—ওপারের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে দেখল প্রবীর। তার ডাক নেই। তাকে কেউ চেনে না। চেনবার দরকার আছে বলেও ভাবে না।

ভগবান, যেন বইটা না চলে। ফ্লপ হয়। বাড়ি ফেরবার পথে মনে-মনে বলতে লাগল প্রবীর। যেন বইটা মার খায়, তেরাত্রিও না পোহায়। অত ফুল টুল সব উড়ে যায়, কলসী যেন ফুটো হয়, কলা যেন বীচে কলা হয়—

কিন্তু দিনে-দিনে লোকে লোকারণ্য।

প্রবীর উৎফুল্ল মুখে বাড়ি ফিরল। উজ্জ্বল স্বরে বললে, 'জানো বইটা হিট হয়েছে।'

'হিট হয়েছে?' সুনন্দাও আলো হয়ে উঠল : 'আমি জানতাম হবে। কেমন জোরালো গল্প! কার লেখা!'

'একদিন লুকিয়ে যাবে নাইট শো-তে?'

'লুকিয়ে? নাইট শো-তে? পয়সা খরচ করে?' সুনন্দা ঝামটা মেরে উঠল : 'লজ্জা করে না বলতে?' চলে গেল রাগ দেখিয়ে।

ডাকপিওন চিঠি দিতে এল। এক গাল হেসে বললে, 'আপনার বই হচ্ছে বাবু। আপনার কত পাশ—একটা দেবেন?'

গম্ভীর মুখে প্রবীর বললে, 'আহা, আগে বলোনি কেন? কত পাশ ছিল, এদিক-ওদিক বেরিয়ে গেল। তা এক কাজ করো—' মানিব্যাগ খুলে টাকা বের করল প্রবীর। ভাবল এক টাকা চল্লিশ পয়সা না দিলে সম্ভ্রান্ত দেখায় না, তাই এক—দুই—কে জানে কেন, পুরো তিন টাকাই পিওনের হাতে দিল। বললে, 'তোমরা দুজনে যেও। তুমি আর তোমার স্ত্রী। নাইট শো-তে যেও। বেশ ভালো বই। হিট পিকচার।'

টাকা তিনটি নিয়ে পিওন কপালে ঠেকাল। বললে, 'তা আর হবে না? আপনার লেখা বই! আপনার কত নাম!'

৪৩। সিঁড়ি

সিঁড়িটা অন্ধকার।

একবার একটা সাপ দেখেছিল সিঁড়িতে। যদি সেটা আবার বেরিয়ে আসে কোনো গর্ত থেকে। যদি গা বেয়ে ওঠে কিলবিলিয়ে।

উঠুক। তবু এতটুকু ভয় পাবে না কেতকী।

রেলিং ঘেঁসে সিঁড়ির ধাপের উপর জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। আঁচলটাকে বড়ো ক'রে খুলে আগাপাশতলা জড়িয়ে নেয়। মাথা কাত ক'রে রেলিঙে রেখে একটু চোখ বোজবার চেষ্টা করে। সাধ্যি কি একটু তন্দ্রা আসে। পাশের ঘরে হৈ-হল্লার ঢেউ থেকে-থেকে এসে ধাক্কা মারে।

যদিও সর্বত্র চুপ-চুপ, তবু উত্তেজনা মাঝে-মাঝে সীমা ছাড়ায়। খিল-চাপানো বন্ধ দরজাও তাকে ঠেকাতে পারে না।

একটু পরেই আবার সামলে নেয়। ফিসফিসানির শালীন স্তরে গলার স্বর নামিয়ে আনে।

ক'টা বেজেছে না জানি!

নিচে ভাড়াটেদের ঘড়িতে দুটো বাজল বুঝি। হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজল কেতকী।

টুক ক'রে পাশের ঘরের দরজার খিলটা খুলে গেল।

ঘড়ির শব্দের চেয়েও এ শব্দটা যেন বেশি মারাত্মক। ঘড়ির শব্দে তবু আশা, আর এই শব্দে আতঙ্ক।

এবার কেউ একজন নামবে। বাইরে যাবে। বাইরে মানে বাড়ির পিছনের মাঠটুকুতে, ও-পাশে দেয়ালের ধারে। আবার কতক্ষণ পরে উঠে আসবে গুটি-গুটি। যতক্ষণ না ফিরে আসে, ততক্ষণ অনড় অশান্তি।

খেলা ভেঙে গেলে একসঙ্গে অনেকগুলি পায়ের শব্দ হ'ত। খেলা এখনো ভাঙে নি। একজন শুধু নামছে।

টর্চ না ফেললে নামবে কি ক'রে! কেউ-কেউ টর্চটা একবার টিপে ধ'রেই সিঁড়িটাকে আন্দাজ ক'রে নেয়, বড়োজোর শেষ বরাবর গিয়ে আরেকবার টেপে। দেয়ালে গা লাগিয়ে বেশ চওড়া ব্যবধান রেখেই নামে-ওঠে। যেন কত অপরাধী। যার ঘর তাকেই বাইরে বসিয়ে রেখে নিজেরা ভিতরে ব'সে গুলতানি করছে, যেন গরুচোর হ'য়ে আছে।

কিন্তু একজন কিছুতেই তার টর্চের বোতামে ঢিল দেয় না। সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রেখেই আসে-যায়। ভাবখানা এই, সব দিকই ভালো করে দেখে-শুনে নামব। কোথায় নাকি কবে সাপ বেরিয়েছিল তাই একটু সতর্ক হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নামে প্রায় চোরধরা পাহারাওয়ালার মতো। তা ছাড়া আবার কি। ঘরের জন্যে রীতিমতো ভাড়া দেয় ক্লাব।

তাই টর্চটা মাঝে-মাঝে গায়ে এসে পড়ে। যখন নিচে থেকে ওঠে, অসাবধানে যদি খোলা থাকে, প্রায় মুখের উপর। দুই চোখে সঘৃণ বিরক্তির ঝলক দিয়ে টর্চের আলোর প্রত্যুত্তর দেয় কেতকী।

আজকের খেলা কি তিনটেতেও ভাঙবে না?

প্রায় শেষরাতের দিকে ভাঙল। লোকগুলো চলে গেলে কেতকী ঢুকল পাশের ঘরে। বিছানা করতে বসল।

নিজের থেকে কিছু জিগ্‌গেস করতে সাহস হয় না। স্বামীই কখন তার জন্যে কান পেতে থাকে।

'আজও কিছু পারলাম না জিততে।' যেন কোন অতল গহ্বর থেকে বলল সুধাময়।

বুকটা ভেঙে গেল কেতকী কি সে সাহায্য করতে পারে? এ একমাত্র বিছানা করা ছাড়া?

ও-পাশের ঘর থেকে কোলের শিশু দুটো কেঁদে উঠল তারস্বরে। ওরা কি ক'রে যেন বুঝতে পারে খেলা এতক্ষণে শেষ হয়েছে, বিদায় নিয়েছে লোকগুলো, ফাঁকা হয়েছে মা'র ঘর। তাড়াতাড়ি ছুটে যায় কেতকী। শ্বশুর দরজা খুলে শিশু দুটোকে ঠেলে বার ক'রে দেয়। কান্না যে শুধু মায়ের জন্যে নয়, মারের জন্যেও, এটা কান্নার স্বরগ্রাম শুনেই বোঝা যায়। মাকে পেয়ে শিশু দুটো ফোঁপাতে থাকে। একটাকে কোলে নিয়ে ও আরেকটার হাত ধ'রে চলে আসে কেতকী। নতুন ক'রে আবার ওদের ঘুম পাড়ায়।

দুটি মাত্র ঘর। তার ওদিকে রান্নার এক ফোঁটা জায়গা আর এক চিলতে কলতলা। মাঝখানে একফালি বারান্দা। আর দোতলা থেকে তেতলায় উঠবার সিঁড়ির ক'টা ধাপ।

শাশুড়ি নেই, শ্বশুর হরিসাধন থাকে সিঁড়ির দূরের ঘরটাতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যেটা ঘর সেটা সুধাময়ের। সুধাময়ের একার নয়, সুধাময় আর কেতকীর। শুধু সুধাময় আর কেতকীরই বলা যায় কি করে? সুধাময়, কেতকী আর তাদের পাঁচ-পাঁচটি শিশুর। বড়োটি নয়, ছোটোটি দুই।

এককালে খুব বোলবোলাও ছিল হরিসাধনের। আদালতের মুহুরি ছিল। কোন অন্ধিসন্ধি তাক করে হাতিয়ে-তাতিয়ে নিলেমে এই একটা বাড়ি কিনে ফেলেছিল। মেদমাংস নেই, হাড়ের উপর যেমন ঢ্যাঙা দেহ তেমনি একটা খাড়া বাড়ি। আগে শুধু একতলা ভাড়া ছিল, বেশ গা হাত পা ছড়িয়ে ছিল তখন সংসার। কি দুর্গ্রহ হ'ল, হরিসাধন গেল ব্যবসা করতে। কেতকীর যখন বিয়ে হয় তখন এই-ই রব ছিল, কলকাতায় বাড়ি, বাপের ব্যবসা, বাপের একমাত্র ছেলে, লেখাপড়া বেশি না করলেই বা কি। যুদ্ধের বাজারের ফাঁপা ব্যবসা, ফেঁসে গেল। দোতলায় ভাড়াটে বসল। বাড়িতে দু-কিস্তিতে বন্ধক পড়ল। তবু ইনকামট্যাক্স ছাড়ল না। ভাড়াটেদের উপর হুকুমজারি হয়েছে, বাড়িভাড়া হরিসাধনকে না দিয়ে আমাদের দেবে। ঘোর দারিদ্র্যে ডুবল। এমন হল ইলেকট্রিকের বিল শোধ করতে পারল না। কোম্পানি এসে লাইন কেটে দিল। ভাড়াটেদের ইলেকট্রিসিটি চুরি করতে গেল তার লাগিয়ে, ফৌজদারিতে ফাইন হ'য়ে গেল।

ঘরে হয়তো বা লণ্ঠন বা ক্যান্ডেল জ্বলে, সিঁড়িটা অন্ধকার।

এককালে মকদ্দমার দালাল ছিল হরিসাধন, এখন আরো নিচু স্তরের দালালি করে। আর সুধাময় জুয়া খেলে।

কোথায় খেলবে? নিজের থাকবার ঘরটাকেই জুয়াড়িদের কাছে ভাড়া দিয়েছে। এখন এই প্রত্যক্ষ রোজগার।

শ্বশুরের কাছে হাত পাতলে বলে, বাজার বড়ো মন্দ।

তারপর কেতকী যাতে শুনতে না পায় তেমনি ক'রে বলে আপনমনে, কে আর আসবে বলো এ দিকে? অঢেল দুধ যেখানে ব'য়ে যাচ্ছে সেখানে ঘোলের কে খবর করে?

যদি কখনো কিছু কামায় নেশা-ভাঙ ক'রে উড়িয়ে দেয়।

কোথাও ড্যালা কোথাও খোদল, ছেঁড়া তোশকে শিশু দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে কেতকী জিগগেস করে, 'কে সবচেয়ে বেশি জেতে?'

'ঐ মন্মথ।'

'কোন লোকটা?'

'ঐ যে লোকটা সবচেয়ে বেশি ঢ্যাঙা, গোঁফ আছে, আদ্দির পাঞ্জাবি গায়—তারই পকেট ভর্তি।' মেরুদণ্ড নেই এমনি ভাবে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছে

সুধাময় : 'তা অন্ধকারে তুমি চিনবেই বা কি ক'রে? আর চিনেই বা লাভ কি?'
কি রকম যেন একটা বিশ্রী সুর বাজল সুধাময়ের গলায়।
কেতকী ফোঁস ক'রে উঠল : 'তার মানে?'
'মানে আবার কি।' পিঠ যেন আরো ছেড়ে দিল সুধাময় : 'চিনলেই বা তুমি কি করতে পারো? কি তোমার ক্ষমতা আছে?'
তার যে হাড় ক'খানা জিরজির করছে, ধুলো উড়ছে তার পরনের শাড়িটা এ বুঝি তারই কটাক্ষ। গর্জে উঠল কেতকী : 'সিঁড়ি দিয়ে যখন নামবে একা-একা তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি।'
'সে কি? সে কি অপরাধ করেছে?' খাড়া হয়ে বসতে চেষ্টা করল সুধাময়।
'রোজ রোজ জিতে যাবে, আমাদের সর্বস্বান্ত করে যাবে, সেই অপরাধ।'
'তাতে তার কি হাত আছে! ভাগ্য তার পক্ষে। আমিই হেরে যাই। আমিই হেরে গেছি।'
দু-হাতের মধ্যে মুখ ঢাকল কেতকী। বললে, 'তোমার হাতেই আমার হার।'
'কিন্তু তুমি জিততে পারো।' গলার আওয়াজটা কুটিল হতে-হতে আর্দ্র হয়ে উঠল : 'তোমার জিতে আমাদের সকলের জিত।'
'তার মানে?'
'তার মানে বেঁচে থাকাটাই একটা জুয়ো খেলা। কেউ খেলে আলো জেলে. কেউ খেলে অন্ধকারে।'
'তুমি আমার স্বামী না?'
'কে জানে। আমার তো মনে হয়, কারুরই কোনো সম্পর্ক নেই, পরিচয় নেই। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়ো খেলতে বসেছি সবাই। যার-যার তাস আলাদা। তুরুপ নেই ফেরাই নেই—তুমিও হারছ, আমিও হারছি।'
'লজ্জা করে না বলতে?' বালিশে মাথা রাখতে যাচ্ছিল কেতকী, আবার উঠে বসল।
'আর করে না।'
'পরনে একটা আস্ত শাড়ি নেই, হাতে-গলার সমস্ত গয়না পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছ, হাতে শুধু এই দুটো সোনার রুলি—'
'তারপর যমের অরুচি রোগের ডিপো ঐ দেহ—যাও, বলে যাও,' বহু কষ্টে একটা বিড়ি ধরাল সুধাময় : 'সব রং-রাংতা উঠে যাওয়া মাটির ঢেলা। কিন্তু যে খেলে সে কানাকড়িতেও খেলে।'
'আমার একটা কানাকড়িও নেই। তোমাদের সংসারের সওদায় তা খরচ হয়ে গিয়েছে।' বিছানা ছেড়ে সরে বসল কেতকী।
'সব খরচ হয়েও তবু কিছু থেকে যায়।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সুধাময় : 'তাই তুমিও একেবারে শেষ হয়ে যাও নি। তোমার আবরণ আছে, অন্ধকার আছে। ভদ্রতার আবরণ, নিষেধের অন্ধকার।'

উঠে দাঁড়াল কেতকী। ঘুরে দাঁড়াল। বললে, 'আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, কাল থেকে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে। তুলে দিতে হবে এই আড্ডা।'

'এর বেশি আর পারবে না?' যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিল সুধাময়। তারপর সুর বাঁকা করে বললে, 'কিন্তু তুমি বললেই কি সব হবে?'

'নিশ্চয়ই হবে। একশো বার হবে। আমি পুলিশে খবর দেব।'

'তা হ'লে এখন তবুও বাড়ির মধ্যে সিঁড়ির উপর বসছ, তখন বাড়ির বাইরে সিঁড়ির উপর গিয়ে বসতে হবে।'

'নির্লজ্জ অসভ্য কোথাকার!' খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল কেতকী।

কান খাড়া করল সুধাময়। কি, এখুনি পুলিশে খবর দিতে ছুটল নাকি? না কি গেল ভাড়াটেদের কাছে নালিশ করতে? না কি বেরুল নিরুদ্দেশে?

না, কিছুই করে নি। অন্ধকারে তার সুপরিচিত সিঁড়ির ধাপটিতে গিয়ে বসেছে। বাকি রাতটুকু অমনি ভাবেই কাটিয়ে দেবে নাকি?

তা ছাড়া আবার কি। যার ভিতরে এত পাপ তার সংস্পর্শে সে আসবে না।

একে হারের মার তায় অনিদ্রার বোঝা। সুধাময়ের ইচ্ছা হল না যে ওঠে, সাধে, টেনে নিয়ে আসে কেতকীকে। মনে-মনে বললে, বসে থাকো। জুয়ো যে খেলে, যতই সে মাঝপথে জিতুক, শেষ পর্যন্ত সে হারে, ঘাল হয়। সেই শেষদিনটির জন্যে অপেক্ষা করো। জিতব আমরা।

সেই থেকেই স্বামী-স্ত্রীতে ভেদ। কথা বন্ধ।

কিন্তু কি কেতকীর সাধ্য এর বেশি কিছু করতে পারে?

রাত দশটার মধ্যে সংসারের সমস্ত পাট তুলে দিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে শ্বশুরের জিম্মায় রেখে আবার তার পরিচিত সিঁড়ির ধাপটিতে এসে বসে। সাড়ে দশটা থেকেই টর্চ টিপে-টিপে আসতে থাকে জুয়াড়িরা। তার শোবার ঘরের ভাড়াটেরা। সিঁড়ির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে জড়পুত্তলীর মতো বসে থাকে কেতকী।

এমনি রোজ। রাতের পর রাত।

কোন লোকটা ঢ্যাঙা, গোঁফওয়ালা, আদ্দির পাঞ্জাবি গায়, যেন চিনতে পেরেছে কেতকী।

জানোয়ার যদি শিকারী হয় সে বুঝি ঘ্রাণেও টের পায়।

খেলার থেকে উঠে-উঠে নেমে যায় একেক করে! আবার উঠে আসে। যার যেমন সুবিধে। যার যখন দরকার।

এই বুঝি নামছে মন্মথ!

কেমন ধীর নিঃশব্দ পা। কেমন ভারি-ভারি। থামা-থামা।

কোন শব্দের ভাষা নেই? পায়ের শব্দেরও ভাষা আছে।

আর-সকলের টর্চ দেয়ালের দিকে ঝাপটা মারে, মন্মথর টর্চ এদিকে-সেদিকে! আর-সকলে পথ দেখে, মন্মথ দেখে পথে কি পড়ে আছে।

নিচে থেকে ওঠবার সময় যখন টর্চ ফেলে তখনই অসহায় লাগে। না, অসহায় কেন? এক ঝলক হাসি ফিরিয়ে দেবে কেতকী। শোধ দেবে।

'আহা, কি কষ্ট আপনার!' উঠতে-উঠতে এক পা থামে। বলে ফিসফিসিয়ে।

কেতকী মুচকে হাসে। ভাবখানা, না, কষ্ট কি। স্বামী ও তার বন্ধুদের এত আনন্দের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তাতে কষ্টের স্পর্শ কোথায়? তা ছাড়া মাস-মাস ভাড়া পাচ্ছি না? কষ্ট নিংড়েই সুখ। কষ্টের দুয়ারের বাইরেই আনন্দের সিঁড়ি।

বেশিক্ষণ কথা বলা বিপজ্জনক। কে কি শুনে ফেলে। কে কি মনে করে। খেলায় যতই মত্ত থাক, যখনই কেউ নামে-ওঠে সিঁড়িতে ধারালো কান রাখে সুধাময়।

কথারই বা কি দরকার? কি দরকার টর্চের? অন্ধকারই কথা বলতে পারে। বাতাস যখন রুদ্ধ হ'য়ে যায় তখন সে রুদ্ধতাও কথা।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সুধাময় কেতকীর হাত চেপে ধরল। সারা গায়ে ছটফটিয়ে উঠল কেতকী।

'দাও, দাও, শিগগির দাও—এই শেষ সম্বল, শেষ খেলা—' বলে জোর করে বাঁ হাত থেকে রুলিগাছটা ছিনিয়ে নিল সুধাময়।

যে শুধু হেরে যাচ্ছে তারই উপর আক্রমণ? আর যে সব লুট করে নিয়ে যাচ্ছে তার উপর কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না? নখে-দাঁতে তাকে কেউ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিতে পারে না? কেড়ে নিতে পারে না তার পকেটের পুঁজি!

ডাকাতি করা কি চলে? জুয়ো খেলেই নিতে হবে। কাঁটাই কাঁটার শোধ তুলবে।

সিঁড়ির উপর মাঝে-মাঝে থামে মন্মথ। দাঁড়িয়ে জিরিয়ে মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা কয় ফিসফিসিয়ে। মাঝে-মাঝে কথা কয় না। একটুখানি বেশিক্ষণ থেমে থাকে।

গাছ কি করে দক্ষিণ হাওয়াকে ডাকে কে জানে! হাওয়া লাগবার আগেই নিজের থেকে নড়ে-চড়ে ওঠে নাকি?

এবার একবার বসুক না পাশটিতে।

সেই থামা-থামা ভারি ভারি পা নেমে আসছে। নেমে আসছে।

কি আশ্চর্য, সিঁড়ির ধাপের উপর বসল পাশ ঘেঁসে।

যেন একটা বরফের গহার মধ্যে কে ঠেলে ফেলল কেতকীকে। গাছ নেই, পাথর নেই, কিছু একটা ধরে ওঠবার আগ্রহ নেই। সিঁড়ি নেই।

বাঁ হাতটা টেনে নিল আদরে। যে সোনার রুলিটা জিতেছে তাই পরিয়ে দিতে লাগল টিপে টিপে।

না, বুক ঢিপ ঢিপ করতে দেবে না। বরফই জল হবে।

হঠাৎ বুক-পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল কেতকী। বললে, ফিস-ফিসিয়ে, 'শুধু রুলি ফিরিয়ে দিলে কি হবে? নগদ—নগদ টাকা চাই।'

পকেট ভর্তি টাকা-নোট। এক মুঠো তুলে নিল কেতকী।

'অনেক—অনেক আজ পেয়ে গেছি। তোমার সোনার রুলি আজ আমার ভাগ্য খুলে দিয়েছে।' বললে সুধাময়, 'তোমাকে বলেছি না, জুয়োয় যে জেতে সে শেষ পর্যন্ত জেতে না।'

হাত ভর্তি টাকা-নোট পকেটের মধ্যে ছেড়ে দিল কেতকী।

৪৪। বস্ত্র

'যাই বাবু, আদাব।' কাঠের ছে দিচ্ছিল মোবারক, ঘাসের উপর ফেলে-রাখা জামাটা কাঁধের উপর তুলে নিল হঠাৎ।

'চললি এখুনি?'

'হ্যাঁ, বাবু। বাড়ি যেতে-যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। লাশ-কাটা ঘর, চিতাখোলা, সব পথে পড়ে। বাবাজান বলে দিয়েছে আন্ধার না নামতেই যেন বাড়ি ফিরি। রাস্তাটা ভাল নয়।'

মোবারক উমেদার-পিওন। অল্প বয়স। দাড়িগোঁফের রেখা পড়েনি এখনো।

সেই মোবারকের অনেকদিনের আগেকার পুরোনো কথাটা মনে পড়ল হঠাৎ, নালতাকুড়ের পথে এসে। বেড়াতে-বেড়াতে কতদূর চলে এসেছি খেয়াল করিনি। এবার ফেরবার পথ ঠাহর করতে গিয়ে দেখি আঁধার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। জ্যালজেলে দিনের আলোর পর হঠাৎ আঁধারের ঠাসবুনন। কেমন ভয় করতে লাগল। আজ হাটবার নয়, পথে জনমানুষ নেই। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। সামনেই চিতাখোলা। লাশ-কাটার ঘর। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। দু'ধারে লটা ঘাস। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতে লাগলুম।

বিশাল, বলিষ্ঠ একটা পাহাড়ে-গাছ ডাল-পালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছ থেকে নাকি ভূত নামে। হেঁটে বেড়ায়। মোলাকাৎ করে। কথা কয়।

হাতে টর্চ আছে। তাতে যেন বিশেষ ভরসা হল না। মনে হল, অন্য অস্ত্র কিছু নিয়ে এলে হত পকেটে।

ভাবছি এমনি, সামনেই তাকিয়ে দেখি, ভূত। স্পষ্ট ভূত। গাছ থেকে নেমে এসেছে কিনা কে জানে, কিন্তু দস্তুরমত হাঁটছে সমুখ দিয়ে। কিন্তু যেন হাঁটতে পারছে না। ঢ্যাঙা, লিকলিকে হাত-পা। আর, আগাগোড়া কালো, একরঙা। ঠাহর করতেই মনে হল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আতঙ্কে গায়ের রক্ত শাদা হয়ে গেল।

টিপলুম টর্চ। আলোর সাড়া পেয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে ততখানি যেন শক্তি নেই। গাছ থেকে নেমে এসেছে একথা ভাবা যায় না। যেন নিজেই ভড়কে গেছে। হাঁটু মুড়ে পথের পাশে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল হঠাৎ।

এ নগ্নতাটা আতঙ্কের নয়, হাহাকারের। মৃত্যুর নয়, সর্বাপহরণের।

স্বচক্ষে ভূত দেখবার সুযোগ ছাড়া হবে না। যখন সে ভূত মিলিয়ে যায় না, গাছে ওঠে না, পথের পাশে বসে পড়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

টর্চের আলোটা নিবিয়ে ফেললুম তাড়াতাড়ি। কেননা লোকটাকে চিনতে পেরেছি। বুড়ো ছাদেম ফকির। অনুদয়ে গেয়ে-গরুর দুধ দুয়ে আমার বাড়িতে জোগান দিত। বলেছিল একদিন, 'কাপড় পাওয়া যাবে বাবু?'

বলেছিলুম, 'রেশন-কার্ড যাদের আছে তারা পাবে একখানা। বাড়ি প্রতি একখানা। আছে তোমার রেশন-কার্ড?'

'আছে।'

'কিন্তু তুমি তো মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে। আমরা এক গাঁট যা ধরেছি চোরাবাজারে, তা বিলোচ্ছি শহরের লোকদের।'

'আমাদের তবে কি হবে?'

অনেকক্ষণ ভেবে বলেছিলুম, 'সার্কেল-অফিসার সাহেবের কাছে গিয়ে খোঁজ কর।'

তারপর আর আসেনি ছাদেম। সেদিন কোমরের নিচে এক হাত অবধি একটা ন্যাকড়ার ঘের ছিল। সেই ফালিটা নিশ্চয়ই নেংটি হয়েছিল আস্তে-আস্তে। আজ একেবারে তন্তুহীন।

ওর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো স্ত্রীলোক আছে। নইলে ও কাঁদে কেন? নইলে ওর লজ্জা কিসের? কিন্তু ওখানে ও করছে কি?

দু'একটি লোক এসে জুটেছে। একজন কদমালি, আদালতের রাতের চৌকিদার। চলেছে শহরের দিকে। ভেবেছে, চোর-ছেঁচড় কাউকে ধরেছি বোধ হয়। কিন্তু চোর যদি বা কাঁদে, অমন কুকড়ি-সুকড়ি হয়ে কাঁদে কেন?

'জিগগেস করো তো, করছে কি ও ওখানে?'

'আর কি জিগগেস করব!' কদমালি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। বলল, 'শ্মশানে কাপড় খুঁজতে বেরিয়েছে। যদি পায় ন্যাকড়ার ফালি, চটের টুকরো বা বালিশের খোল—'

বললুম, কেন বললুম কে জানে, 'আমার বাড়িতে যেয়ো কাল সকালে। কাপড় দেব একখানা।'

আমার রেশন কার্ডের বনিয়াদে কাপড় জোগাড় করেছিলুম একখানা। খেলো, মোটা কাপড়, পাড়টা বাজে। যদিও সেটা আমার পরবার মত নয়, তবু সংগ্রহ করে রেখেছিলুম। চাকর-ঠাকুরের কাজে লাগবে সময় হলে। নিরবশেষ দান করব এমন সংকল্প ঘুণাক্ষরেও ছিল না। কিন্তু মৃত নয়, রুগ্ন নয়, স্বাভাবিক সুস্থ একটা মানুষ উলঙ্গ হয়ে থাকবে এর অসঙ্গতিটা মুহূর্তের জন্যে অস্থির করে তুলল। মানুষ দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তার দারিদ্র্যের চিহ্ন যে ছিন্নবস্ত্র, তার নিদর্শনটুকুও সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না?

কিন্তু কাল ও আমার বাড়ি যাবে কি করে কাপড় আনতে? ও যে এখন সমস্ত সভ্যতা, সমস্ত গোঁজামিলের বাইরে।

কদমালিকে বললুম, 'ওর বাড়ি চেন?'

'এই তো সামনে ওর বাড়ি।' খানিকটা জঙ্গলে অন্ধকারের দিকে সে আঙুল তুলল।

পরদিন কদমালির হাতে নতুন একখানা কাপড় দিলুম। বললুম, 'খবরদার ঠিকঠাক পৌঁছে দিও ছাদেম ফকিরকে। পাড় কিন্তু আমার মনে থাকবে।'

পাঁজিতে লেখে, শুভদিন দেখে নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। কত শুভদিন চলে গেছে পঞ্জিকার পৃষ্ঠায়, কিন্তু ছাদেমের হৃতবস্ত্র এল না নতুন হয়ে।

আজ নিশ্চয়ই ছাদেম ফকিরের মুখে হাসি দেখব। আজ নিশ্চয়ই রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে সে আমাকে সেলাম করবে।

সন্ধ্যের মোহানার মুখে দিনের হাল হেলতে-না-হেলতেই বেরিয়ে পড়লুম নালতাকুড়ের পথে। চলে এলুম শ্মশান পেরিয়ে।

কোন জায়গায় ছাদেম ফকিরের বাড়ি আন্দাজ করে দাঁড়ালুম কাছাকাছি। কাছেই ছোটখাট একটা ভিড়। ফিসির-ফিসির কথা।

কেউ কতক্ষণ দাঁড়ায়, দেখে, তারপর চলে যায়।

দেখলুম কদমালি আছে কিনা। কদমালি এখনো বেরোয়নি লণ্ঠন হাতে করে, তার রাত-পাহারায়। যারা জটলা করছে তাদের কাউকে চিনিনা। এগিয়ে গিয়ে শুধোলুম, 'কি ব্যাপার?'

'ঐ দেখুন।'

তখনো গাছপালা একেবারে ঝাপসা হয়ে আসেনি। দেখলুম একটা সাধারণ আম গাছ। তারই একটা ডালে কি একটা ঝুলছে। সন্দেহ কি, আমাদের ছাদেম ফকির। তেমনি নিঃস্ব, তেমনি নগ্ন, তেমনি নিরবকাশ।

কয়েকজনকে সঙ্গে করে এগোলুম গাছের নিচে। সন্দেহ কি, ছাদেম ফকিরের গলায় আমারই দেয়া সেই নব বস্ত্র। গলা ঘিরে দেখা যাচ্ছে সেই তীক্ষ্ম লাল পাড়।

এরি জন্যে কি কাপড়ের দরকার হয়েছিল ছাদেমের?

বললুম, 'বাড়ি কোনটা ওর?'

জঙ্গলের মধ্যে একখানাই শুধু ভাঙা কুঁড়েঘর সেখানে। সবাই বললে, 'ঐ তো।'

মাৎবর-মতন একজনকে ডেকে জিগগেস করলুম, 'ওর বাড়ির লোকেরা জানে?'

'কেউই নেই বাড়িতে। কাউকে দেখতে পেলুম না—'

'কতক্ষণ থেকেই তো ঝুলছে।' বললে আরেকজন।

সত্যি, একটা টুঁ শব্দ নেই কোথাও। কেউ একটা কান্নার আঁচড় কাটছে না। আশ্চর্য! তবে কাল কি ছাদেম কেঁদেছিল নিজে মরতে পারছেনা বলে?

নতুন দক্ষিণের বাতাসে বোল-ধরা ডালগুলো কাঁপছে মৃদু-মৃদু।

মনে হল, আমাকে সে সেলাম করছে। যেন বলছে, আমার তুমি মান বাঁচালে বাবু। উলঙ্গতা আর দেখতে হলনা নিজেকে।

লন্ঠন হাতে এল কদমালি। ঠেসে খানিকক্ষণ গালাগালি করল ছাদেমকে। নতুন বস্ত্রের এই পরিণাম? আত্মহত্যাই যদি করবি, তবে একগাছা দড়ি জোগাড় করতে পারলিনে? ঠাট করে নতুন কাপড়া গলায় জড়াতে গেলি? এরি জন্যে তোকে কাপড় এনে দিয়েছিলুম?

ভাবলুম, এ কি তার প্রতিশোধ, না, প্রতারণা?

লন্ঠন নিয়ে কদমালিও খুঁজে এল তার কুঁড়ে ঘর। আনাচ-কানাচ। গলি-খুঁজি। ঝোপ-ঝাড়। জঙ্গলের মধ্যে সাপের খসখসানি। ঝরা পাতার নিশ্বাস।

শুকনো ও শূন্য ঘর। মাদুর পেতে কেউ শোয়নি, শিকে থেকে নামায়নি হাঁড়িকুঁড়ি। জল বা আগুনের রেখা পড়েনি কোথাও। শুধু ছাড়া-গরুটা ঘাস চিবুচ্ছে আর বাছুরটা ঘোরাঘুরি করছে।

একা লোকের পক্ষে এই বিতৃষ্ণাটা অবান্তর নয়?

'কে ছিল এই লোকটার?'

কেউ বলতে পারেনা।

যদি বা কেউ ছিল, গত দুর্ভিক্ষে সাবাড় হয়ে গেছে, কেউ-কেউ মন্তব্য করলে। ভাতের দুর্ভিক্ষে। কাপড়ের দুর্ভিক্ষেও যে লোক মরে এই দেখলুম প্রথম।

কিন্তু কাপড়ের বেলায় দুর্ভিক্ষ কোথায় ছাদেম ফকিরের? তাকে তো জোগাড় করে দিয়েছিলুম একখানা। তা কোমরে না রেখে গলায় জড়াল কেন? কোন দুঃখে?

শেষ পর্যন্ত দুঃখ না হয়ে রাগ হতে লাগল। বললুম, 'থানায় খবর গেছে?'

'এতেলা নিয়ে গেছে দফাদার।'

'আর, কেউ যখন নেই, পঞ্চায়েতকে ডেকে আঞ্জুমানে খবর দাও। কাফন দাফনের ব্যবস্থা করাও।'

সকালবেলাটা শহরের মধ্যে হাঁটি। রবিবার বলে গেলুম নালতাকুড়ের পথে। সেই যেখানে ছাদেম ফকিরের বাড়ি। সেই আম গাছ। স্পষ্ট দিনের আলোতে নিতে হবে তার অবস্থানের জ্যামিতিটা। আয়ত্তে আনতে হবে তার অনুভবের পরিমণ্ডল।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলুম। বেশ মুক্ত কন্ঠের কান্না। আর, আশ্চর্য, নারীকণ্ঠের।

কে কাঁদছে?

এগোলুম কুঁড়েঘরের দিকে।

'ছাদেম ফকিরের পরিবার আর তার পুতের বৌ। পুত মরেছে এবার বসন্তে।' কে একজন বললে সহানুভূতির স্বরে।

'কেন, কাঁদছে কেন?' যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছি, প্রশ্নটা এমনি খাপছাড়া শোনাল।

ছাদেম ফকির গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। পুলিশের হাঙ্গামার পর লাশ এই নিয়ে গেছে কবরখোলায়।

কাল ছিল কোথায় এরা সমস্ত দিনে-রাতে? ছাদেম ফকিরের পরিবার আর পুতের বৌ? মরে গিয়েছিল নাকি? মুছে গিয়েছিল নাকি? লুকিয়ে ছিল নাকি জঙ্গলে?

পর্দানশিন হলেও শোকের প্রাবল্যে এখন আর সেই আবরু নেই। কিংবা, এখনই হয়তো আবরু আছে। লোকের সামনে করতে পারছে শোকের দুরন্ত দুঃসাহস।

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, হেলে-পড়া চালের নিচে দাবার উপরে ছাদেমের পরিবার আর তার পুতের বৌ গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে জিগির দিয়ে কাঁদছে। যেন সদ্য-সদ্য ঘটেছে ঘটনাটা। কিংবা সদ্য-সদ্য কাঁদবার ছাড়পত্র পেয়েছে তারা। পেয়েছে আত্মঘোষণার স্বাধীনতা।

তাদের পরনে, সন্দেহ কি, আমারই দেয়া সেই লাল-পাড় ধুতির দুই ছিন্ন অংশ। ফালা দেবার আগে খুলে নিয়েছে ছাদেমের গলা থেকে, লাশখানায় চালান দেবার আগে। সেই কাপড়ে সসম্মান তিন অংশ বোধ হয় হতে পারত না। আর, আগেই শাশুড়িতে-বৌয়ে ভাগ করে নিলে ছাদেম ফকির মরত কি করে?

৪৫। মণিবজ্র

'বেশ ঘর।' চারদিকে তাকিয়ে অরিন্দম ভরাট গলায় বললে।

'হ্যাঁ, দু দুটো জানলা আছে। আলো-হাওয়া যথেষ্ট।' বাড়িওলা সুখলাল বললে।

'তবে একটু যেন ছোট।' একটু যেন খুঁটিয়ে দেখল অরিন্দম। প্রথম সম্ভাষের উদারতায় একটু বা ভাঁটা পড়ল।

'আর সামনে একফালি বারান্দা আছে। এটাও আপনি পাবেন।'

'বারান্দায় দরকার নেই।' জানলা দিয়ে তাকিয়ে চিলতে বারান্দাটা একবার দেখল অরিন্দম। বললে, 'এ তো রাস্তার ধারের ঘর নয় যে বারান্দায় বসে রাস্তা দেখব।'

'না, তবে দরকার হলে বারান্দায় খানিকটা ঘিরে নিয়ে রান্নাঘর করতে পারবেন।' বদান্য ভঙ্গিতে বললে সুখলাল।

'না, রান্নাঘর দরকার হবে না।'

'খাওয়াদাওয়া?'

'সেটা বাইরে কোথাও সেরে নেব। কাছেই রাস্তায়, রেস্টোরেন্ট আছে দেখেছি, সেখানে সকালে-বিকেলে চা-টোস্টটা হয়ে যাবে।' হঠাৎ কী একটা জরুরি কথা মনে পড়তেই অরিন্দম চঞ্চল হয়ে উঠল : 'বাথরুম? বাথরুমটা কোথায়?'

'এই কাছেই।' জায়গাটা দেখিয়ে দিল সুখলাল। বললে, 'তবে এটা কমন বাথরুম।'

'কমন?' নিশ্বাসের জন্যে বাতাস যেন কিছু কম পড়ল অরিন্দমের : 'কার কার মধ্যে কমন?'

'নিচে এক-ঘরের আরেক ভাড়াটে আছে—তারা আর আপনারা।' কিছুই খিঁচ ধরবার নেই এমনি সহজ-সরল ভাব করল সুখলাল।'

'ওরা কজন?'

'স্বামী, স্ত্রী আর একটি বাচ্চা।'

'বাচ্চা?' একটু বা চমকাল অরিন্দম : 'পশুপাখিদেরই বাচ্চা হয় শুনেছি।'

'তা আর বলেন কেন?' হাসল সুখলাল : 'ছেলের নামও বাচ্চু মেয়ের নামও বাচ্চু। তা আপনার কটি?'

'আমার?' অরিন্দম শুন্যে হাত ঘোরাল : 'আমি বিয়েই করিনি।'

'তাহলে আপনি একা থাকবেন?'

'সম্পূর্ণ।'

'বা, তাহলে আর আপনার ভাবনা কী?' সুখলাল বললে, 'আপনার হেসেখেলে দিন যাবে।' পরে কথার সুরে একটু সন্দেহের খাদ মেশাল : 'আপনি কী করেন?'

'আপনাকে গোড়াতে বললাম কী!' হাসল অরিন্দম : 'আমি মেডিকেল কলেজের সিনিয়র ছাত্র। পড়াশোনার জন্যে একটি নিরিবিলি ঘর চাই। ঘরটা যে রাস্তার থেকে দূরে, একটু ভেতরের দিকে হল, এটা ভালোই হল। যখন-তখন যে কেউ এসে উঁকিঝুঁকি মারতে পারবে না। মন দিয়ে লেখাপড়া করা যাবে।'

শুধু লেখাপড়ার জন্যে গোটা একটা ঘর নেওয়া, একটু বাড়াবাড়ি মনে হল সুখলালের। বললে, 'সিনিয়র ছাত্র যখন, একটু-আধটু প্র্যাকটিসও হয় বোধ হয়।'

'প্র্যাকটিস?' স্তম্ভিত হবার ভাব করল অরিন্দম।

'এই ছোটোখাটো ওষুধ-টোষুধ দেওয়া, ছুঁচ ফোঁড়া, অপারেশনের পর ড্রেস করা—পারেন না?'

'তা আর কোনো না পারি? কেন, আপনার কোনো কেস আছে?' অরিন্দম বুঝি একটু কৌতূহলী হল।

'এখন নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ?'

'তা আছি যখন হাতের কাছে, বলবেন দরকার হলে—'

একটু বা আশ্বস্তই বোধ করল সুখলাল। কিন্তু তাই বলে এক পয়সা ভাড়া কমাল না। সেলামিও নিল ভারী হাতে।

আপত্তি করে লাভ নেই। সস্তায় ঘর কই কলকাতায়?

তা মন্দ নয় একরকম। একটু হয়তো ছোট হল। তা কতটুকু আর নড়াচড়া? ছোটই তো ভাল। ছন্দোবন্ধ। বাথরুমটা কমন বলে যা অসুবিধে। তা ভাব করে ভাগ করে নিতে পারলে বাধবে না। একখানা ঘরের টেনান্সিতে একটা আস্ত বাথরুম পাওয়া যাবে এ কোরানে-পুরাণে লেখেনি।

পরদিন সকালের দিকে একটা ঠেলায় করে মালপত্র নিয়ে এল অরিন্দম। মালপত্রের মধ্যে একটা ক্যাম্প খাট, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা ট্রাঙ্ক ভর্তি বই খাতা আর ওষুধপত্র। আর হোল্ড-অল শতরঞ্চিতে জড়ানো একটা হতচ্ছাড়া বিছানা। আরো একটা সুটকেস আছে। ওটায় বুঝি জামা-কাপড়।

কুলি দুটোই গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে গেল কোনোরকম।

সুখলাল নেমে এসেছে। তদারকির ভঙ্গিতে বললে, 'একটা চাকর নেই?'

'চাকর দিয়ে কী হবে?'

'ঝাঁটপাট দেবে কে?'

'ওসব আমি একাই পারব।' সুস্থ দেহে বল ফোটাল অরিন্দম : 'চিরদিন হস্টেলে থেকে মানুষ। এসব মুখস্ত। হস্টেলের চাকর আর কত করে। সব আমিই পারব।'

কত পারবে নমুনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ঘরময় নোংরার বিন্দুমাত্র কিনারা হয়নি। বিশৃঙ্খলাগুলিও তাকিয়ে আছে অসহায়ের মত।

মরুক গে, ভাড়াটের ভাবনা আমি ভাবি কেন? তবু আপিসফেরত উঁকি না মেরে পারল না সুখলাল। উঁকি মেরেই তাজ্জব বনে গেল।

ঘরের ভোল একেবারে বদলে গিয়েছে। জানলা-দরজায় পর্দা ঝুলছে। ক্যাম্বিশের খাটটা নেই, বারান্দায় বরখাস্ত হয়েছে। তার বদলে একটি মজবুত তক্তপোশ পড়েছে, তার উপরে নির্ভাঁজ সাদার প্রসন্ন বিছানা। টেবিলের উপর চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া ঢাকনি, তার উপর বইগুলি সযত্নে সাজানো। ট্রাঙ্কগুলি পরিপাটি করে রাখা। আচ্ছাদন করা। ব্র্যাকেটে, হ্যাঙ্গারে ঝুলছে শার্ট-প্যান্ট!

'আসব?' ভেতরে ঢোকবার কোনো শরীরী বারণ নেই, তবু এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সুখলাল।

বই পড়ছিল অরিন্দম, মনে মনে বিরক্ত হলেও হাসল। বললে, 'আসুন।'

'এ কী, এ যে একেবারে ভোজবাজি হয়ে গিয়েছে দেখছি।' ঘরের চারদিকে বিহ্বল চোখ ফেলল সুখলাল : 'কী করে হল বলুন তো?'

লোকটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, তাই বইয়ে নিবিষ্ট থেকে অরিন্দম বললে, 'কেন নিজে করলুম।'

'নিজে করলেন! নিজের হাতে?' সুখলাল যেন বিশ্বাস করতে চায় না।

'হ্যাঁ, এ ডাক্তারের অপারেশন!' চোখ তুলে অজানতে একবার হেসে নিয়েই অরিন্দম আবার বইয়ে মন দিল।

যাক গে, মরুক গে, আমার মাস মাস ভাড়া পেলেই হল। লোকটা কী করে না করে পড়ে না পড়ে তা দিয়ে আমার হবে কী!

সুখলাল চলে গেলে আলো-না-জ্বালা সন্ধ্যায় নতুন পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ল অরিন্দম। অগাধ সাদায় বিস্তীর্ণ ডুব দিলে।

'কী সুন্দর তোমার চোখদুটো। যেন পরিষ্কার পুকুরের জলে দুটো কালো মাছ টলটল করছে! আর যখন তুমি মুচকে হাস তখন তোমার উপরঠোঁটের খাঁজটুকুতে যে ছোট্ট মিষ্টি গর্ত হয়, ইচ্ছে করে—'

'কী বিচ্ছিরি যে লাগে যখন তুমি এরকম করে কথা কও।'

'একটা বৃষ্টির জল-পড়া কাঠের বেঞ্চির আধখানায় বসে বলছি কিনা, তাই বিচ্ছিরি শোনাচ্ছে। কিন্তু যদি একটি নিরিবিলি ঘর হত, খাট হত, বিছানা হত, তুমি একটি অচ্ছিন্ন রজনীগন্ধার মত শুয়ে থাকতে—'

'এসব কথা তোমাকে একটুও মানায় না।'

'কে বললে? খুব মানায়।'

'তুমি না ডাক্তার?'

'এখনো পুরোপুরি হইনি।'

'বেশি বাকিও নেই।'

'বা, তাই বলে ডাক্তার কবি হবে না? কোনো কোনো মুহূর্তেও হবে না?'

'যে সব জানে', নন্দিনী ঠোঁটের খাঁজে সেই গর্ত ফেলল, 'সে জানাশোনার মত করে বলবে।'

'স্নায়ুতন্তু জানলেই কি দেহের সমস্ত রহস্য জানা হয়ে যায়? কী বুদ্ধি! ঘি দেখতে-শুনতে কেমন জানলেই কি ঘি খেতে কেমন বলতে পারো? মোটকথা', অরিন্দম বললে হাসিমুখে, 'ও কথাটা যদি একটা নিরিবিলি ঘরে বসে বলতে পারতাম, তোমার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে, বিছানায় তোমার পাশে বসে, তা হলে দেখতে কথাটা কী চমৎকার শোনাত! একটুও বিচ্ছিরি বলতে না।'

'সত্যি যদি একটা নিরিবিলি ঘর পেতাম!' কান্নার মত করে উথলে উঠল নন্দিনী।

'সত্যি।' অরিন্দমও ধ্বনি তুলল।

সুস্থ হয়ে দু দন্ড কোথাও বসে আলাপ করা যায় না। স্বাধীনতার পর মানই যা 'একটু বেড়েছে, কোথাও স্থান নেই। সর্বত্র ভিড় আর লোকচক্ষু। ট্যাক্সি নিলে হয়, কিন্তু অত পয়সা কোথায়? তা ছাড়া যে কথা আসলে মন্থর ও মদির তা কি একটা ঊর্ধ্বশ্বাস চলন্ত রাস্তায় বসে সম্ভব? আর যে রাস্তা অল্পায়ু? সিনেমাতে যেতে পারে বটে কিন্তু আলাপের অবকাশ কোথায়? এক মাঠ আছে, কিন্তু সেখানে গুন্ডার ভয়। নয়তো পুলিসের। সত্যি একটা ঘর দরকার। নির্জন ঘর। মুক্তি দিয়ে তৈরি, নিভৃতি দিয়ে ঘেরা।

প্রাণ ভরে প্রাণ ঢেলে আলাপ পর্যন্ত করা যাচ্ছে না।

'কিন্তু সেই নিরিবিলি ঘরে, চার দেয়ালের খোলা মাঠে আলাপ না শেষে প্রলাপ হয়ে ওঠে।' গূঢ় কটাক্ষে তাকাল নন্দিনী।

'তা তো উঠতেই পারে।' সরল মুখ করে বললে অরিন্দম।

দুজনেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা অন্ধকার গহ্বরের পারে দুজনে দাঁড়াল মুখোমুখি।

এই যদি সমস্যা, তবে সাধারণভাবে মিটিয়ে, নিলেই হয়। বিয়ের আপিসে গিয়ে দিলেই হয় নোটিশ!

ছি, ছি, কী লজ্জা! কী লজ্জা! লোকে বলবে কী!

'আমি একটা ছাত্র, এখনো বেরোইনি কলেজ থেকে, আমি কিনা এক নার্সকে বিয়ে করে বসেছি! সকলে আমাকে বক দেখাবে, আমার পিছনে শুধু হাততালি নয়, ক্যানেস্তারা পিটবে।' অরিন্দম শিউরে ওঠার ভাব করল : 'ডাক্তার হয়ে বেরুলে বরং কথা ছিল।'

'আর আমার কথা তো জানো, আমার ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়র হয়ে বেরুতে আরো বছর দেড়েক বাকি। ওর সব খরচ আমি দিই। ও মানুষ হয়ে চাকরি পেলে পরেই আমি ছুটি পাই। তার আগে নয়।'

'সুতরাং, বিয়ের জন্যে এখুনি আমরা প্রস্তুত নই।' সায় দিল অরিন্দম।

'অন্তত দু বছরের মুলতুবি।' করুণ করে শ্বাস ফেলল নন্দিনী।

'ততদিনে আমার প্র্যাকটিসের প-এ র-ফলা বসবে কিনা ঠিক নেই। বলতে পারো চার বছর।'

'অসম্ভব।' চোখ নামাল নন্দিনী।

'অসম্ভব এত দিন বসে থাকা। তীর্থকাকের মত অনর্থক ঘুর ঘুর করা। এস আমরা একটা ঘর নিই।'

'আমরা?' নন্দিনী জোয়ার আসবার আগেকার নদীর মত কলরব করে উঠল।

'তুমি থাকবে না। তুমি শুধু মাঝে মাঝে আসবে।'

অরিন্দম স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হল। ঘরটা তার নামেই নেওয়া হবে। কিন্তু ভাড়ার মধ্যে বেশিটাই বইতে হবে নন্দিনীকে। অরিন্দমের স্কলারশিপের টাকা আছে, তাছাড়া যে টাকা সে আনে বাড়ির থেকে সব সে ঢালবে অকাতরে। তারো উপর, কোনো প্র্যাকটিসিং ডাক্তারের সঙ্গে সামিল হয়ে সে কিছু ছোঁড়াফোঁড়া বাঁধাছাঁদার কাজ করে টাকা কামাবে। টাকার জন্যে আটকাবে না।

'তা আটকাবে না। কিন্তু' দুই চোখে ভয় পুরল নন্দিনী : 'কিন্তু যদি বিপদ হয়?'

'তা তো হতেই পারে।'

'হতেই পারে?' নন্দিনীর কাছে অরিন্দমের এ ভঙ্গিটা যেন আরো ভয়ের।

'তুমিই বলো, পারে না?'

চুপ করে রইল নন্দিনী।

'কিন্তু তা হবে কেন, আমরা হতে দেব কেন? আমরা সাবধান হব। আচ্ছাদিত হব। কনট্রোল করব।' অরিন্দম দৃঢ় অথচ নিরাসক্ত গলায় বললে, 'তাতে সরকারী আশীর্বাদ থাকবে। সরকারই তো কত হুঁশিয়ারি প্রচার করছে শহরে গাঁয়ে, কত শেখাচ্ছে রীতিনীতি, কত কলাকৌশল—'

'তবু,' ভুবনমোহন হাসি হাসল নন্দিনী : 'ভাগ্যের রসিকতা তো জানো। হঠাৎ ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা।'

'তখন বিয়ে করে ফেলব!' উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হল অরিন্দম।

তারপর সহসা আবার দুজনে নির্বাক হয়ে গেল।

'তাছাড়া আরো একটা উপায় আছে।' বললে অরিন্দম।

অনুমান করতে পেরে অতি নিগূঢ়ে শিউরে উঠল নন্দিনী।

অরিন্দম বললে, 'যেখানে বন্ধ করা বৈধ হচ্ছে, সেখানে নষ্ট করাও বৈধ হবে। আজ না হয়, কদিন পরে হবে।' নন্দিনীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল অরিন্দম : 'তা ছাড়া আমাদের ভাবনা কী। আমাদের জন্যে বিয়েই তো আছে, সকল বিপদের ত্রাণ।'

পড়া পাখির মত শুকনো স্বরে প্রতিধ্বনি করল নন্দিনী : 'সকল অগতির আশ্রয়। কিন্তু—'

না, তবু তাদের একটা ঘর হোক। এখানে-ওখানে ওরা আর ঠুকরে-ঠুকরে বেড়াতে পারে না। ফিরতে পারে না গরুচোরের মত। নির্জনে পাশাপাশি একটু বসলেই লোকের সন্দেহ। কত কষ্ট করে কর্মের অরণ্য থেকে দুটো-চারটে সোনার মুহূর্ত চুরি করে আনা, তা এমনি অকারণে ছড়িয়ে দিতে হবে ধুলোয়, এ অসহ্য।

না, একটা ঘর হোক। একটা অনঞ্জন নির্জনতার মালিক হোক তারা। দরজার খিল আর জানলার ছিটকিনির উপর একলা ওদেরই প্রভুত্ব থাক। প্রভুত্ব থাক আলোর সুইচের উপর। কেউ কিছু বলতে পারবে না, উঁকি-ঝুঁকি মারতে পারবে না, তাড়া দিয়ে ফেরাতে পারবে না এখানে-ওখানে।

'যত রাজ্যের কথা আছে বলা যাবে প্রাণ ভরে।' দীপ্ত কণ্ঠে বললে অরিন্দম।

'আর হাসা যাবে মন খুলে।' খিলখিল করে হেসে উঠল নন্দিনী।

'বই পড়া যাবে একসঙ্গে। গান গেয়ে ওঠারও বাধা নেই।'

'চুপ করেও থাকা যাবে কখনো কখনো।'

'কিন্তু কী কী করা যাবে না তাও বলো।' চোখের কোণে হাসল অরিন্দম।

'তুমি বলো।'

'যদি সন্ধ্যেয় আস আর ঝমঝম বৃষ্টি নামে, তোমাকে আর তোমার হস্টেলে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না।' গম্ভীর-গম্ভীর মুখ করল অরিন্দম।

'তাতে চমকাবে না কেউ।' নন্দিনী নিশ্চিন্ত মুখে বললে।
'চমকাবে না?'
'মানে উদ্বিগ্ন হবে না। প্রাইভেট নার্সের পক্ষে কল পেয়ে বাইরে রাত কাটানো কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।' তরল হাসির ঝাপটা দিল নন্দিনী : 'লোকে ভাববে কোন এক রুগীর নার্সিং করতে গিয়েছি।'
না, ঘর হোক। দূরে-দূরে আর থাকা যায় না। দিনান্তে না চোখে দেখে না কথা শুনে, একটু বা না স্পর্শ করে। সাগর সেঁচে যে কটা মানিক পাওয়া যায়। যে কটা মুহূর্তের মানিক, তাই কুড়িয়ে নিই দুই হাতে।
বর্তমান অবস্থা যতখানি ঘনিষ্ঠতা অনুমোদন করে তাই বা কম কী!
তারা বিজ্ঞানের মানুষ। তারা অবহিত। অপ্রমত্ত। বুদ্ধিমান। তাদের জ্ঞান শোনা কথায় নয়, পুঁথিতে নয়. তাদের ভয় নেই। তারা জানে আবৃত হতে।
'নাও, কটা টাকা রাখো।' ব্যাগ খুলে কটা টাকা দিল নন্দিনী।
গুনে দেখে অরিন্দম বললে, 'এত লাগবে কেন? সব তো একরকম দিয়েছি মিটিয়ে।'
'তবু রাখো তোমার কাছে।'
'তুমি কত করছ!'
'আর তুমি করছ না? কি খাচ্ছদাচ্ছ তা কে জানে!' স্নেহে আর্দ্র হল নন্দিনী : 'আগে তবু তো অনেকের মাঝখানে ছিলে, দেখবার শোনবার লোক ছিল, এখন একেবারে একা। আমি আর কতটুকু থাকি, থাকতে পারি! কষ্ট আর কী তুমিই কম করছ।'
'ভালোবাসার জন্যে সব করা যায়।' বললে অরিন্দম।
'এ তো আমারও কথা।'
মেয়ের কলঙ্ক মেয়ে ছাড়া আর কে ধরে। কে রটায়!
একতলার অন্য ঘরের ভাড়াটের যে বউ সেই প্রথম চোখ কুঁচকোলো। বললে স্বামীকে। আর স্বামী তুলল সুখলালের কানে।
ইতি-উতি করে সুখলালও দেখল কে একটা মেয়ে চুপি চুপি আসে যায়।
বাইরে থেকে গলা খাঁখরে একদিন ঘরে ঢুকল সুখলাল।
'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না। যে স্ত্রীলোকটি আপনার কাছে আসে সে কে?'
রাগে অরিন্দমের মাথাটা টং করে উঠল। যে হোক সে, আপনার কী মাথাব্যথা? এমনিভাবেই এসেছিল উত্তরটা। কিন্তু অনুত্তেজিত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই সরল মুখে বললে, 'কে আবার! আমার স্ত্রী।'
'স্ত্রী?' প্রায় বসে পড়ল সুখলাল : 'তার তো কোন লক্ষণ দেখি না।'
'কী আবার লক্ষণ দেখবেন?'
'স্ত্রী তো, একসঙ্গে থাকেন না কেন?'

'তার অন্য কারণ আছে।'

'স্ত্রী তো, সব সময়েই ফিসির-ফিসির কেন আপনাদের? চেঁচামেচি নেই কেন?'

অবাক হল অরিন্দম : 'স্ত্রী হলে চেঁচামেচি করতে হবে?'

'নিশ্চয়ই।' সুখলাল জোর দিয়ে বললে, 'ঝগড়া চেঁচামেচি হলেই তো বুঝতে পারি স্বামী-স্ত্রী।'

'যা খুশি আপনি বুঝুন।' আর সহ্য করতে পারল না অরিন্দম, ঝাঁজ প্রকাশ করে ফেলল।

'আমরা বুঝেছি।' সুখলালও রুক্ষ হল : 'পাশের ভদ্রলোক খবর নিয়ে জেনেছেন মেয়েটা একটা নার্স।'

'তাতে কী?' মুখিয়ে উঠল অরিন্দম : 'নার্স কি স্ত্রী হতে পারে না?'

'তা পারবে না কেন? কিন্তু ও আপনার বিবাহিতা স্ত্রী নয়।'

'বেশ তো, অবিবাহিতা স্ত্রী, ভাবী স্ত্রী। তাতে কী হল?' মেজাজ আরো চড়ল অরিন্দমের।

'দেখুন, ভদ্রপাড়ায় এসব বেচাল চলবে না। শাক দিয়ে ঢেকে চলবে না মাছ খাওয়া।' সুখলাল খিঁচিয়ে উঠল : 'অন্য পাড়ায় ঘর দেখুন।'

'দেখেছি।' সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল অরিন্দম।

সব শুনে ম্লান হয়ে গেল নন্দিনী।

তা একটু জানাজানি হবেই, তা গায়ে মাখলে চলে না। কিন্তু বাড়িওলা কী করতে পারে? একবার ভাড়া দিয়ে উচ্ছেদ করা মুখের কথা নয়। এক নার্স ঘরে আসে সেটা কোনো উচ্ছেদের কারণ হতে পারে না। যেখানেই থাকো সর্ব অবস্থায়ই সরিকদার ভাড়াটে কালকেউটে।

'চলো অন্যত্র চলো।' নন্দিনী স্বরে বুঝি একটি আকুলতা আনল।

'না, না, ভয় কিসের। কারু সাধ্য নেই আমাদের তাড়ায়।' বললে অরিন্দম, 'আর লোকে কী বলে না বলে, বয়ে গেল!'

'তবু কী রকম যেন অস্বস্তি লাগে।' কান্না-কান্না মুখ করল নন্দিনী : 'পাপ-পাপ মনে হয়।'

'পাপ?' এক মুহূর্ত হিম হয়ে রইল অরিন্দম।

'পাশের বাড়ির বউটা এমনভাবে তাকায় যেন আমি কত মন্দ, কত জঘন্য।' নন্দিনী হাসতে চেয়েও পারল না হাসতে : 'গলি দিয়ে যখন ঢুকি পাড়ার বেকার ছোঁড়াগুলি পিছু নেয়, টিটকারি দেয়। কিছুতেই সহজ হতে পারি না। শুধু উপেক্ষা করলেই চলে না, সময়-সময় উদ্ধত হবার জোর পাইনে, সত্যের জোর। শুধু পালিয়ে-পালিয়ে আসি, পালিয়ে-পালিয়ে যাই। এটা ঠিক নয়।' নন্দিনী চোখ নামাল।

'না, না, খুব ঠিক।'

'ঘরের আগে এখানে-ওখানে যখন দেখা হত, তার চেয়েও এখন বেশি

নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। ও ঘরে থাকে, বলতে কেমন সুন্দর শোনায়; কিন্তু ও ঘরে আসে, কী বিচ্ছিরি! কেন ঘরে থাকতে পাব না?'

'তুমি তা হলে কী বলতে চাও?' অরিন্দম অস্থির হয়ে উঠল।

'তুমি একটা ফ্ল্যাট নাও।' এতক্ষণে হাসতে পারল নন্দিনী : 'আমরা নিয়ত বাস করি।'

একটা দু কামরা ফ্ল্যাট। নেবার সময় বলবে, আমরা স্বামী-স্ত্রী, দুটি মাত্র প্রাণী। তাহলেই নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া যাবে। প্রথম থেকেই এ রবটা চালু হলে আর কেউ নাক ঢোকাতে আসবে না।

এ যে দেখছি ছাগলের কল্যাণে মোষ মানা। কথার ভয়ে খরচে তলানো।

'আসল কারণটা অন্য।' মিষ্টি করে হাসল নন্দিনী।

'অন্য?' একটু কি সন্দিগ্ধ হল অরিন্দম।

'অন্য মানে একটা ঘরে আর ভরে না, একটা সংসার পেতে ইচ্ছে করে।'

'সংসার?'

'তোমার করে না? একসঙ্গে থাকা একসঙ্গে ওঠাবসা, খাওয়াদাওয়া—সকাল, সন্ধ্যে রাত—তোমার করে না?' নন্দিনী ঝলমল করে উঠল : 'কৃপণ মুঠটা ইচ্ছে করে না খুলতে?'

'অত বড় খরচ চলবে কী করে?'

'দুজনে চালাব। পারব না?'

'খুব পারব।' নন্দিনীর দু হাত সবলে আঁকড়ে ধরল অরিন্দম।

ফ্ল্যাটে ঢোকবার আগে অরিন্দম বললে, 'কপালে-মাথায় এক ঝলক সিঁদুর দিয়ে নেবে নাকি?'

'সিঁদুরে এলার্জি হয়। মেডিকেল গ্রাউণ্ডেই পরি না। প্রতিবেশিনীরা জিজ্ঞেস করলে বলব স্বচ্ছন্দে।' হাসল নন্দিনী।

'তবু—'

'না, সেই দিন পরব।' গভীর করে তাকাল নন্দিনী : 'আর সেদিনই প্রথম বিয়ে হবে।'

অনেক হুজ্জুত করে দু কামরার একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে অরিন্দম। একখানি শোবার আরেকখানি বসবার ঘর। রান্নাঘর। ভাঁড়ার। একটা সুন্দর বাথরুম।

এ যেন বিস্তীর্ণ হবার শিথিল হবার অগাধ হবার নিমন্ত্রণ। চকিতে সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র।

না, বিচ্যুত হবে না কেউ। একটুখানির জন্যে পড়বে না চূড়া থেকে।

ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে, কাটা পড়বে না।

কিন্তু ফ্ল্যাট চালানো চারটিখানি কথা নয়। অভাবে দুজনে আঁধার দেখল চারদিক। প্রাণপণ খাটছে দুজনে। অরিন্দম পড়ছে, আবার পড়াচ্ছে, ডাক্তারদের ল্যাংবোট হয়ে ঘুরছে এখানে-ওখানে। রোজগারের খামারে ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ছে।

'তোমার এবার শেষ পরীক্ষা। তুমি তাতেই একান্ত হও। আমি এদিক সব

ম্যানেজ করছি।' তারপর কথার সুরে আদর আনল নন্দিনী : 'তুমি বেরিয়ে এসে একটা চাকরিবাকরি নিলেই আমাদের দৈন্য যায়।'

'আমরা মুক্ত হই।' অরিন্দম হাসল।'

তারপর একদিন নন্দিনী বললে, 'মফস্বলে একটা কল পেয়েছি, যাব?'

'মফস্বলে?'

'রাজস্থানে। এক রাজারাজড়ার ছেলের অসুখ, দীর্ঘ দিনের মেয়াদী চাকরি, অনেক-অনেক টাকা।'

কীরকম একটা যেন ক্লান্তির সুর বাজল। চমকে তাকাল অরিন্দম। বললে, 'তোমার এই নতুন সংসার ফেলে পালাবে বিভুঁয়ে?'

ঠিক এরকম ভাবে না বললেও পারত। নন্দিনী কি আর ইচ্ছে করে যেতে চাচ্ছে? টাকার কি দুর্ধর্ষ প্রয়োজন নেই তাদের? আর টাকার জন্যে মানুষ প্রত্যন্তে পর্যন্ত যায়। নন্দিনীকে যে নিরস্ত করবে অরিন্দমের কি টাকা আছে? প্রভুত্ব আছে?

'তারপর তোমার এখানে এত রুগী, এদের দেখে কে?' অরিন্দম বুঝি নিজেকেও সেই দলে ফেলল। নইলে নন্দিনী অমন করুণ করে হাসল কেন?

যেন কী একটা অভ্যাসের মধ্যে এসে পড়েছে। যেন অন্য কোথাও সে যেতে চায়। অনেক খোলামেলার মধ্যে। নিরাবরণের মধ্যে। যেখানে অনেক মাঠ অনেক হাওয়া অনেক জল।

তারপর সেদিন সন্ধ্যায় কে একজন যুবক এসে কল দিল নন্দিনীকে।

'আপনি একবার গিয়েছিলেন আগে। ডাক্তার মজুমদারের পেশেণ্ট। ডাক্তার মজুমদারই আবার পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।'

'বাড়িটা কোথায় বলুন তো?' ঝাপসা-ঝাপসাকে স্পষ্ট করতে চাইল নন্দিনী।

ভদ্রলোক রাস্তার নাম করল।

'ও, বুঝেছি। চলুন।'

সারাদিন ডিউটি করে এসেছে, এখন রাতে আর না বেরুনোই উচিত। একবার বলতে চাইল অরিন্দম। পারল না বলতে। এখন যে টাকার দুর্দম প্রয়োজন। এখন তো আর ছোট একটা ঘর নয়। এখন ঢালা সংসার।

রাতে বুঝি আর ফিরবে না নন্দিনী। পাশের ফ্ল্যাটে কী একটা শব্দ করা ঘড়ি কিনেছে, ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। দুটো। ঘুমুতে পাচ্ছে না অরিন্দম। সেই যে কল পেয়ে বাইরে রাত কাটানোর কথা বলত অরিন্দমকে, অরিন্দমের ঘরে এসে রাত কাটাত, তাই এখন কাঁটার মত বিঁধতে লাগল সর্বাঙ্গে। কে জানে কোথায় গেছে!

পরদিন সকালে বাড়ি ফিরলেও অরিন্দম জিজ্ঞেস করতে পারল না, কে রুগী, কী করে রাত কাটালে।

নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হল, নিঃস্বত্ব মনে হল। নিষ্প্রতাপ মনে হল। একটা জবাবদিহি নেবারও তার অধিকার নেই।

সন্ধ্যের সময় আবার সেই যুবক এসে উপস্থিত। 'আপনাকে ডাক্তার মজুমদার আবার চেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, যাব। গাড়ি নিয়ে এসেছেন?'

কিছু টাকাকড়ি দিয়ে গেল অরিন্দমকে। কী কটা খরচের হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিল। বললে, 'আজ রাত্রেও ফিরতে পারব না হয়তো।'

বিনিদ্র রাত কাটায় শুয়ে না কাটিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোই ভালো। দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল অরিন্দম।

ডাক্তার মজুমদারকে সে চেনে। সেদিকে যাবার দরকার নেই। কী যেন রাস্তাটা বলে গিয়েছিল ভদ্রলোক। সে দিকে পা বাড়াল অরিন্দম। বাড়ির নম্বরটা জানে না। না জানুক, তীক্ষ্ন চোখের সন্ধানী আলোতেই সে বার করবে রহস্য। এখন রাত কটা?

ঠিক। ঠিক দেখতে পেয়েছে অরিন্দম। একটা বাড়ির দরজায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়ানো।' কেউ এল, না, যাবে।

দূরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম। দেখল ট্যাক্সিতে নন্দিনী উঠল। পাশে উঠল সেই ভদ্রলোক। তারপর ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল হর্ন বাজিয়ে। যেন অনেক মুক্তির হাওয়া ফুর্তির হাওয়ার রাজ্যে।

ঘড়ির দিকে তাকাল অরিন্দম। এখন মোটে সাড়ে আটটা। একে আর নৈশভ্রমণ বলা যায় না। বলতে হয় সান্ধ্যবিহার।

কিন্তু আশ্চর্য, দু ঘন্টার মধ্যেই ফিরে এল নন্দিনী।

'কী, আজ সারা রাত থাকতে হল না?' নিজের স্বরে চমকাল অরিন্দম।

'এখনকারমত বিপদ তো কেটে গিয়েছে। পরে আবার ডাক্তার মজুমদার যদি তলব করেন!' হাসিমুখে হালকা হতে লাগল নন্দিনী।

'তাই এখনকারমত বুঝি ছাড়া পেলে!' স্বরটাকে এখনো সোজা করতে পারছে না অরিন্দম।

'কিন্তু জানো তাড়াতাড়িতে পুরো ফি-টা নিয়ে আসা হয়নি।' তখনো মৃদু-মৃদু হাসছে নন্দিনী।

এটার উপরেও কথা বলার ছিল, কিন্তু অরিন্দম আর কথা বললে না। চুপ করে রইল।

তারপর রাত যখন বারোটা, পাশের বাড়িতে ঘড়ি বাজছে, হঠাৎ নন্দিনীর মনে হল ঐ শব্দ কটা যেন তার শরীরের গভীরে গিয়ে বাজছে, বাজছে নিরাবরণে, স্নায়ুতন্ত্রের অণুতে-রেণুতে।' বাজছে ঝঙ্কারের মত। এ কী আনন্দ, না, আতঙ্ক, বুঝতে পারল না নন্দিনী। মনে হল সমস্ত সৌরজগৎ থেকে গ্রহনক্ষত্র কক্ষ্যচ্যুত হয়ে গেল, একটা ক্ষুদ্রের মধ্যে প্রলয়ের আগুন নিয়ে দেখা দিল মহাত্রাস।

'এ তুমি কী করলে!' কেঁদে উঠল নন্দিনী : 'এ তুমি কী করলে!'

অরিন্দম হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। পরিহাসের সুরেই বললে, 'এত দিন

তোমাকে ঢেকে রেখেছিলাম, আর ছেড়ে দেওয়া নয়। যা হবার হোক, আর কিছু বাকি রাখা নয় কিছুতেই।'

পরদিন সকালে সেই ভদ্রলোক আবার হাজির।

এক মুঠ টাকা দিল নন্দিনীকে। বললে, 'তাড়াতাড়িতে আপনার টাকাটা কাল দেওয়া হয়নি। কিন্তু যাই বলুন, আপনার জন্যেই ছেলে পেলুম। আপনি তখন নিজে ট্যাক্সি করে ডাক্তার মজুমদারকে ডাকতে গিয়েছিলেন বলেই তিনি কেসটার সিরিয়াসনেস বুঝলেন। এলেন চটপট। আমার স্ত্রী বাঁচল। সুপ্রসব হল। আচ্ছা, আসি।' চলে গেল ভদ্রলোক।

ম্লান হতে লাগল নন্দিনী।

ম্লানতর অরিন্দম।

বললে, 'তার জন্যে তুমি এত ভাবছ কেন? ডাক্তার মজুমদারকে গিয়েই বলি। তিনিই সব ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

'না।'

'ডাক্তার মজুমদারের ক্লিনিকে না যাও, এত ঘাবড়াবার কী হয়েছে, তোমার সেই অকূলের কূল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে চলো।' বীর-বীর ভাব করল অরিন্দম : 'সমস্ত ক্ষতির পূরণ হয়ে যাবে।'

'না।' দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নন্দিনী।

'বা, একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে আমাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে এ অবকাশ তো ছিল—'

'না, না, দুর্ঘটনা নয়।' কান্নায় আরো উচ্ছ্বসিত হল নন্দিনী।

তারপর একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে নন্দিনীকে দেখতে পেল না অরিন্দম। সম্ভাব্য সময় অতিক্রম হয়ে যাবার পরেও নয়।

তখন ঘরের মধ্যেই এটা-ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল অরিন্দম। এত খোঁজাখুঁজি করবার কী আছে, টেবিলের উপর চাপা দেওয়া এইতো রেখে গিয়েছে চিঠি। আর্ত ভীত চোখে পড়তে লাগল অরিন্দম।

'আমাকে খুঁজো না। আমি মরতে চললাম। তোমার ঘরে শুয়েও মরতে পারতাম। কিন্তু তোমার ঘরে মরলে জানি, তুমি আবার বিশ্বাসঘাতকতা করতে। আমার কপালে-মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে দিতে। আমাকে আমার অপাপ কৌমার্যে মরতে দিতে না। খোঁজ কোরো না আমার, আমাকে পাবে না কোনোদিন।'

উদ্‌ভ্রান্তের মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল অরিন্দম। ট্যাক্সি নিল। এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। কিন্তু কোথায় যাবে? কোথায় খুঁজবে? থানায়? হাসপাতালে? রেল স্টেশনে?

এমনও হতে পারে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করল, যেমন আসে তেমনিই ফিরে এল বাড়ি!

অরিন্দম ট্যাক্সিকে বললে, ফিরে চলো।

৪৬। অপরাধ

কে পিছু নিয়েছে। দিনেশ দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। গিয়েছিল পাশ-গ্রামে, খেজুরতলায়। অজয়কে দেখতে। অজয় ডেটিনিউ। অন্তরীণ।

তবে কি পুলিশ পিছু নিয়েছে?

বা, দেখা করার তার অনুমতি-পত্র ছিল। অজয়ই ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। তাতে কি হয়? এমন উৎসাহী পুলিশের লোক হয়তো কেউ আছে যে পুরোমাত্রায় নিঃসন্দেহ হতে পারছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নিলে হয় লোকটাকে। না, এখুনি কোনো দরকার নেই। আগে হাটের এ রাস্তাটুকু পার হয়ে যাক। এখানে অনেক ভিড়। অনেক পরিচিত লোক।

হাটের পথ ছেড়ে দিনেশ মাঠে নামল। এটাই তাদের গ্রামে ফিরে যাবার সোজা পথ, খুব জোরে পা চালিয়ে গেলে বড় জোর আধ ঘণ্টা।

তা ছাড়া মাঠটা মনে হল সবুজ মুক্তির মত। লোক-জনের ঠোকাঠুকি নেই, চোখ চাওয়া-চাওয়ি নেই। নেই বা চোখের কোণের কৌতূহলে চিহ্নিত করে রাখা। নিজেরা থেমে পড়ে অন্যকেও থামিয়ে দেওয়া। এখানে অনেক ফাঁকা। দরকার হলে ছুট দেওয়া যায় সহজে।

মাঠে নেমে ঘাড় ফেরাল দিনেশ। লোকটা আর পিছু নেয়নি। আমিনুল্লার বেনেতি মশলার দোকানের সামনে এসেই থেমে পড়েছে। না, পুলিশের লোক নয়। এ তারক সা।

খেজুরতলার বাজারে তারক সা'র মস্ত বড় কাপড়ের দোকান। দু'বছর আগে তার দোকান থেকে দিনেশ একটা মশারি কিনেছিল, আজও পর্যন্ত তার দাম দেওয়া হয়নি। দেব-দিচ্ছি, আজ-নয়-কাল অনেক টালবাহানা করেছে দিনেশ, তবু কথা রাখতে পারেনি। তলব-তাগাদায় কোনো ফল হয়নি দেখে আজকাল ওরা তার পিছু নেওয়া সুরু করেছে। এত দিন দোকানের ছোকরা দুটো পিছু নিত, আজ খোদ কর্তা উঠেছে ক্ষেপে।

মশারিটা না কিনে উপায় ছিল না। ছেলে মেয়ে অসীমা ও তার—সকলের প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া। তা ছাড়া মশার কামড়ে কারু পুরো রাত ঘুম নেই। দাম সে দেবে। তার ইচ্ছে আছে ষোল আনা। দাম যে পাবে তার চাওয়ার মধ্যে যে ন্যায় আছে এ সম্বন্ধে সে সন্দেহ করে না। কিন্তু কোত্থেকে সে দেয়!

নিজের গ্রামে এসে পড়েছে দিনেশ। খালের মুখেই কেশবের সঙ্গে দেখা। 'কি মশাই, কাগজের দামটা দেবেন না?'

দিনেশ মাথা নামাল। বললে, 'দেব।'

*'দেবেন-দেবেন বলছেন তো আজ এক বছরেরও উপর, কথার তো কাণা-*কড়িরও দাম নেই। মাস্টারি করেন তো ছেলেদের কি শিক্ষা দেন শুনি?

খবরের কাগজের সামান্য একটা হকার। ইস্কুলের চৌকাঠও হয়তো কোনো দিন মাড়ায়নি। সে পর্যন্ত গলা উঁচিয়ে দুঃসাহসীর মত তাকে শাসন করে। মনে করে নর্দমার পোকা।

দু' মাসের খবরের কাগজের দাম বাকি। সাত টাকা কয়েক আনা। এক সঙ্গে যে ফেলে দিতে পারে এমন ক্ষমতা নেই দিনেশের। দু' আনা চার আনা করে নিতে কেশব রাজি নয়। সে কি ভিখিরি?

তার মানে দিনেশ ভিখিরির চেয়েও অধম।

স্বভাব-চরিত্র জাত-জন্ম নিয়ে কেশব অনেক কুকথা বলতে থাকে পিছন থেকে। শুনলেও শোনেনি এমনি ভাব করতে হয় দিনেশের। ঘেয়ো কুকুরের মত লোকের স্পর্শ বাঁচিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে যায় দিনেশ। লেজ গুটিয়ে মাথা হেঁট করে। এক বছর সে খবরের কাগজ পড়ে না। জানে না দেশ এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। জানে না কবে ঘুচবে তার এই দারিদ্র্য, এই লজ্জা আর ভয়। তার আর কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো কৌতূহল নেই।

কত দূর এগিয়ে আসতেই নগেনবাবুর সঙ্গে দেখা। সাবডিভিশনের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, প্রায়ই গ্রামে আসেন স্কুল পরিদর্শন করতে। আশে-পাশে যেখানেই যখন আসেন দিনেশের সঙ্গে দেখা করে যান। অনেক দিনের জানা-শোনা। আর, যখনই দেখা করেন, কথা-বার্তা নেই, ঘ্যানর-ঘ্যানর ঘ্যানর-ঘ্যানর করেন অনেকগুলি। বলেন তাঁর দারিদ্র্য ও দুর্দশার কথা। সকলে কেমন খুঁটে খুঁটে ঠুকরে ঠুকরে ঘুস নিচ্ছে আর তিনি খুদকুঁড়াও নিচ্ছেন না, সেই সাধুতা বা অক্ষমতার বর্ণনা। প্রকাণ্ড পরিবার, সামলে উঠতে পারছেন না এই সামান্য আয়ে। বড় ছেলেটাকে পড়াতে পারলেন না বেশি দূর, বেকার বসে আছে। মেয়ে দুটো ধাড়ি হচ্ছে দিন দিন, পাত্র জুটছে না। নিজের আমাশা না অর্শ, চিকিৎসার পয়সা নেই।

এ তো সব দুঃখের কথা। মামুলি এক-রঙা। এর মধ্যে তো অপমান নেই!

'ধার নেই আপনার? ছোট-ছোট ধার?' জিগগেস করে দিনেশ।

'না, ধার করি এমন সাধ্য কি। শোধ দেব কোত্থেকে?'

তা হলে তিনি তো পরম সুখী। যা তাঁর মাইনে তাই দিয়েই কণ্টেসৃষ্টে টায়েটায়ে তাঁর সংসার চলে যায়। তার পরেও তাঁর অভাব থাকতে পারে কিন্তু লাঞ্ছনা তো নেই। এক ধার শোধ করতে গিয়ে তাঁকে তো আরেক ধার করতে হয় না। এক গর্ত বোজাতে গিয়ে খুঁড়তে হয় না তো আরেক গর্ত! তিনি তো পৃথিবীতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন। লজ্জায় তাঁকে তো মাথা হেঁট করে চলতে হয় না। ভয় পেয়ে ইঁদুরের মত তো পালিয়ে যেতে হয় না ভিড় দেখে। তাঁর মনে বিফলকামের বেদনা থাকতে পারে কিন্তু অপরাধীর গ্লানি তো নেই। তিনি দরিদ্র হতে পারেন,

কিন্তু তিনি তো অপরাধী নন। তাঁকে তো কাউকেও ভয় করবার নেই পৃথিবীতে। তিনি সহানুভূতি পাবেন, ঘেন্না মেশানো অনুকম্পা তো তাঁকে কুড়িয়ে নিতে হবে না।

নগেনবাবুর ঘ্যানর-ঘ্যানর আর ভালো লাগে না। তার সঙ্গে তাঁর মিল নেই। সে অপরাধী। সে ঘৃণ্য। সে ধিক্কৃত।

বাড়ির কাছে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল দিনেশ। বাড়ির মধ্যে আর ঢুকল না। পাশ কাটিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল।

বাড়ির দোরগোড়ায় মহাদেব বল্লভ বসে। বল্লভ-মশাই বাড়িওয়ালার লোক। প্রকাণ্ড গোঁফ, প্রচণ্ড গলার আওয়াজ। সব চেয়ে প্রচণ্ড তার অভদ্রতা। একবার দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল এক সঙ্গে, যেবার অসীমার খুব বড় রকম অসুখ হয়। তারপর যত ভাড়া সে দিয়েছে পর-পর, সব গিয়েছে বকেয়ার উশুলে। কিছুতেই হালনাগায়েৎ হতে পাচ্ছে না। মাঝে এক মাসের জন্য দশ টাকার একটা টিউশনি পেয়েছিল, তা ফেলে দিয়েছে সে ঐ বাড়িভাড়ার অন্দরে। তবু এখনো আঠারো টাকা বাকি। চলতি ভাড়া দিয়ে দিনেশের আর সাধ্য নেই কিছু দিতে পারে বকেয়ার মধ্যে। কিন্তু কিছু আদায় না করে বল্লভমশাই আজ কিছুতেই নড়বেন না।

অসীমা ছেলেকে দিয়ে বলিয়েছে, বাবু বাড়ি নেই, কতক্ষণে ফিরবে কেউ বলতে পারে না, তাই আরেক সময় যেন সে আসে।

বাবু ভিতরে থাকলেও নেই, বাইরে থাকলেও নেই, কিন্তু এক সময় না এক সময় হয় বেরুতে নয় ঢুকতে তাকে হবেই এই দরজা দিয়ে। তাই বল্লভ-মশাই দরজা ছাড়বেন না কিছুতেই। আজ তাকে ধরে ঠিক টেনে নিয়ে যাবেন কাচারিতে।

অসীমা রান্নাঘরে উনুনের কাছে বসে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। ছেলেরাও যেন অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছে তাদের বাবা অপরাধী, অপদার্থ! তাদের এই জন্ম ও জীবন সমস্তই একটা অগৌরবের কাহিনী।

কেটে পড়লেও বেশি দূর নিশ্চিন্ত হয়ে এগুতে পারল না দিনেশ। কত দূর যেতেই স্টার ফার্মেসির অখিলের সঙ্গে দেখা। সরে পড়তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অখিল সরাসরি তার হাত চেপে ধরল।

ওষুধের বিলের পাওনাটা আজও সম্পূর্ণ শোধ করা হয়নি। তাই বলে রাস্তার মাঝে অমনি হাত চেপে ধরবে নাকি?

অথচ একটা যে সমর্থ প্রতিবাদ করে এমন ক্ষমতা দিনেশের নেই। বরং পীড়িতের মত অসহায় মুখ করে বললে, 'এ মাসের মাইনে পেলেই দিয়ে দেব টাকাটা।'

'অনেক মাইনেই তুমি পেয়েছ এ পর্যন্ত! আর ও কথায় ভুলছিনে।' অখিল হাতটা জোরে চেপে ধরে টানতে লাগল সামনের দিকে। যেন কোথায় তাকে নিয়ে যেতে চায়।

'জানো তো সামান্য মাইনে, তায় অসুখবিসুখ, সব দিক গুছিয়ে উঠতে পারিনে।'

'সামান্য মাইনে তো, ডাক্তারকে দিয়ে অসামান্য ওষুধ বাতলিয়েছিলে কোন সাহসে? তখন খেয়াল হয়নি সামান্য মাইনের থেকে অসামান্য ওষুধের দাম দিতে পারবে না?'

'বলো, স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তোলা কি স্বামীর কর্তব্য নয়?' আততায়ীর সহানুভূতি উদ্রেক করার জন্যে দিনেশ সজল কণ্ঠে বললে, 'তখন কি করে সে বাঁচবে, কি করে সে একটু আরাম পাবে, তারি সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরতে হয়। তখন ওষুধের দাম বেশি কি আমার ক্ষমতা কম এসব কথা কি মনে আসে?'

'সুবিধে আছে যে।' অখিল বিকট ভঙ্গিতে মুখ বেঁকাল : 'তক্ষুনি-তক্ষুনি যে নগদ দাম দিতে হল না। মাস্টারমানুষ দেখে তখন যে আমি বিশ্বাস করেছিলাম মাসকাবারেই দামটা পেয়ে যাব। তখন কি জানি তুমি এতখানি জোচ্চোর?'

দিনেশ বুঝতে পেরেছে তাকে পাশেই আর কারু দোকানঘরে জোর করে টেনে নিয়ে যাবে। সেখানে দরজা বন্ধ করে অখিল ও তার বন্ধুরা তাকে মারবে, মেরে গায়ের ঝাল মেটাবে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে দিনেশ। তবু বাধা দিতে গিয়েও সে বাধা দিচ্ছে না। একেকবার ভাবছে মন্দ কি, যদি মার খেয়েই এই ভার নেমে যায়, যাক। মনের যন্ত্রণা থেকে দেহের যন্ত্রণা অনেক তুচ্ছ, অনেক সহনীয়। তবু, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কে যেন ভিতর থেকে বাধা দিচ্ছে, তার জোর নেই, বৈধতা নেই, তবু বাধা দিচ্ছে। বলছে, মার খেলেও ধার মুছে যাবে না। আবার এমনি আরেক দিন অখিল হাত চেপে ধরবে।

রাস্তা থেকে কারা-কারা এসে ছাড়িয়ে নিল দিনেশকে, প্রৌঢ় ব্যক্তিরা কেউ-কেউ অখিলকে মৃদু তিরস্কার করলে। কিন্তু নির্ভুল ভাব দেখালে, সমস্ত ন্যায় ও ধর্ম অখিলের দিকে।

তক্কে-তক্কে থেকে ফাঁকা দরজা পেয়ে দিনেশের বাড়ি ঢুকতে প্রায় আড়াইটে। স্নানাহারের কাছে দিনেশের চেয়ে আগে বল্লভমশাই-ই পরাস্ত হয়েছেন। লাঠি ঠুকে তিনি শাসিয়ে গেছেন এবার যখন আসবেন চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে আসবেন, দেখা যাবে ধরতে পারেন কিনা বাছাধনকে। দূরের রাস্তা, আজ আর বেশিক্ষণ ধন্না দেবার তাঁর সময় নেই। পরের বার যেমনি কচু তেমনি তেঁতুল হয়ে আসবেন তিনি।

'এত দেরি হল?' অসীমা এসে জিগগেস করলে।

'খেজুরতলা কি সামান্য পথ? তারপর ও কি ছাড়ে!'

'কেন, ডেকেছিল কেন?'

'তিন দিন পর ও ছাড়া পাবে, অর্ডার এসে গেছে নাকি। যাবে কলকাতা। তাই ভারি ফুর্তি দেখলাম।'

'জেলে থাকতেও তো ফুর্তি কম দেখি না।'

'সে তো আর আমাদের মত জেল নয়।' দিনেশ গা থেকে সার্টটা খুলে ফেলল। অনেক নিষ্ফল ক্লেশের দীর্ণরেখা দিয়ে পাঁজর গুলি আঁকা।

'খেজুরতলা থেকে কলকাতা কোন পথে যাবে?'

'বললে যাবার পথে আমাদের এখানে থেকে যাবে এক দিন।'

'কি সর্বনাশ!' অসীমা চমকে উঠল : 'তুমি রাজি হলে?'

'কি করে না করি বল? বন্ধু লোক, তা ছাড়া এত দিন পর ছাড়া পাচ্ছে। আমিই বরং ওকে আগ্রহ করে নেমন্তন্ন করলাম।'

অসীমা ঝলসে উঠল। এমন একজন গণ্যমান্য লোককে অভ্যর্থনা করে বাড়ি নিয়ে আসবার তোমার কী সঙ্গতি আছে? কোথায় দেবে তাকে বসতে, কী বা জোটাবে তার আহার? অতিথি এলে ভালোমন্দ খেতে দিতে হয়, রান্নায় বিশেষত্ব আনতে হয় একটু, তা সংগ্রহ করবার তোমার সামর্থ্য কোথায়? ঘরে সমস্ত কিছু তোমার বাড়ন্ত, তা ছাড়া, বাজারে ধার মেলে না।

'ডাল-ভাত যাই রান্না করে দেবে তাই খাবে ও তৃপ্তি করে। তোমার রান্না সাধারণ হতে পারে, কিন্তু ও তো সাধারণ নয়। তা ছাড়া কত দিন মেয়েদের হাতের রান্না ও খায়নি, পায়নি লক্ষ্মীর হাতের সেবা।'

আহা, কী তোমার লক্ষ্মীর ছিরি! রোগে ভুগে-ভুগে শেওড়া গাছের পেত্নী হয়ে গিয়েছে। পরনে একটা আস্ত শাড়ি নেই, টেনে-বুনতে কুলোয় না। অপরিচিত কাউকে দেখে যে ঘোমটা টানবে তার উদ্‌বৃত্তি নেই। ছেলেপিলে-গুলোর নোংরা চেহারা, নোংরা ব্যবহার। সমস্ত ঘর-দোর একটা আস্ত আঁস্তাকুঁড়।

'এতে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে কেন? যে লোক দেশের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করছে তার কাছে আমাদের কিসের ভয়, কিসের লজ্জা? তার চোখে আমরাও তো তার দেশ। আমাদের এই দুঃখ আর দুর্বলতা তার চোখে তার দেশেরই দুঃখ, দেশেরই দুর্বলতা।'

শুধু কি তাই?

তারপরে সকাল থেকে পাওনাদারের মিছিল বসবে না তোমার দোরগোড়ায়? বিছের কামড়ের মত সর্বাঙ্গে তোমাকে অপমানের দংশন করবে না? তখন কলঙ্কিত মুখ তুলে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাতে পারবে? তোমার অপরাধ আর অকীর্তি ঢাকবে কি করে? এমনিতেও যদি সহনীয় হত, বন্ধুর সান্নিধ্যে তা আর সহ্য করতে পারবে না। আত্মদাহ নির্বাণ খুঁজবে তখন আত্মহত্যায়। না, দরকার নেই, বন্ধুকে গিয়ে বলো, বাড়িতে ঘোরতর অসুখ হয়েছে, অভ্যর্থনা সম্ভব হবে না। আমাদের পাপ আর গ্লানি, দুঃখ আর অপমান আমাদের মধ্যেই থাক, আত্মীয়-বন্ধু কাউকে তার মধ্যে উঁকি মারতে দিতে পারবে না। মুখে কালি মেখে তুমি মাথা হেঁট করে বসে থাকবে আর পাশে বসে তোমার বন্ধু সকরুণ স্তব্ধতায় তোমাকে সহানুভূতি করবেন বা শেষ পর্যন্ত অর্থ-সাহায্য করতে চাইবেন, সে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। ব্যঞ্জনের

সঙ্গে চোখের জলের নুন মেশান এ সইবে না আমার। অপমানিতের মত এক কোণ থেকে আরেক কোণে গিয়ে লুকোব, চোখ তুলে তাকাতে পারব না মুখের দিকে, এই অপমান থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

এবার সত্যিই ভয় পেল দিনেশ। নিজের লজ্জা স্ত্রীর লজ্জা শিশুদের লজ্জা পরের চোখ দিয়ে দেখতে হবে এ-জ্বালা সত্যিই অসহ্য। এমন ভাবে দেখেনি সে তার দৈনন্দিন জীবনের চেহারা। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। নিমন্ত্রণ করে এসে এখন আর বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

তারপর অজয় যখন এল এ বাড়িতে, মনে হল নতুন একটি দিন যেন পৃষ্ঠা বদলে দেখা দিয়েছে, আশ্চর্য দীপ্তির অক্ষরে। কোথাও দৈন্য নেই, দুঃখ নেই, অসম্মান নেই। সমস্ত পাপের চেয়ে বড় যে পাপ সে ভয় নেই। আমি অক্ষম আমি পরাজিত এ বেদনার কালিমা মুছে গেছে। ঝকমক করে জ্বলছে এখন সাহসের তলোয়ার। জীবনের ছেঁড়া তারে সে হঠাৎ বিদ্রোহের সুর বেঁধে দিয়েছে। শুনিয়েছে দেশের ডাক। নবজীবনের মন্ত্র।

রান্নাঘরে ছিন্ন আঁচলে মুখ ঢেকে অসীমা কাজ করছে আর শুনছে। তার বন্দী প্রাণ-পক্ষী স্পন্দিত হচ্ছে থেকে থেকে।

কিন্তু কে জানে এ মোহ কতক্ষণ!

'বাবুমশাই, আছেন না কি বাড়িতে?' নির্ঘাৎ মহাদেব বল্লভের গলা : 'আজ একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে এসেছি। আজ আর সহজে পথ ছেড়ে দিচ্ছি না।' লাঠি ঠুকতে লাগল মহাদেব, তার পিছনে পাইক পেয়াদা।

আওয়াজ শুনে এতটুকু হয়ে গেল দিনেশ। কি করবে কোথায় লুকোবে ভেবে পেল না। ভেবেছিল, কেন ভেবেছিল কে জানে, অন্তত আজকের দিনটি সে রেহাই পাবে তার বরাদ্দ লাঞ্ছনা থেকে। ভগবান আজ আর তাকে তার বন্ধুর সামনে নাকাল করবেন না।

বাড়ির সামনে খোলা জমিটুকুর উপর একটা চেয়ারে বসে অজয় বই পড়ছিল, জিগগেস করলে, কী ব্যাপার!

ব্যাপার ঘোরালো। শালা মাস্টার বাড়ির ভাড়া দিচ্ছে না। তাগাদা দিতে দিতে পায়ের হাড় খসে পড়ছে পচে পচে, তবু গায়ের চামড়া ফুঁড়ে ভদ্রতা গজাচ্ছে না মাস্টারের। কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘরের ভিতরে থাকলে বাইরে আসে না, বাইরে থাকলে ভিতরে ঢোকে না। রাস্তায় দেখা হলে দৌড় মারে। কিন্তু আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। যখনই হোক, যতক্ষণ পরেই হোক, মাস্টারকে আজ জমিদারের কাচারি-বাড়ি ধরে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, মধ্যম হিস্যার জমিদারবাবুই বাড়িওয়ালা।

'দিনেশ!' সবল কণ্ঠে ডাকতে লাগল অজয়।

'যতই ডাকুন, আমার গলার আওয়াজ পেয়েছে যখন, তখন ও কিছুতেই আসবে না।' মহাদেব গম্ভীর মুখে বললে, 'ও এখন ইঁদুরের গর্ত খুঁজছে। দেখুন গিয়ে লুকিয়েছে হয়ত তক্তপোষের তলায়।'

অজয় আবার তীব্র স্বরে ডাকতে লাগল।

স্ত্রীর দিকে করুণ চোখে তাকাল একবার দিনেশ। না, বাইরে না গিয়ে আর উপায় নেই।

'তুমি বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে আছ কেন? শুনছ না এই ভদ্রলোক তোমাকে ডাকাডাকি করছেন?' অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'তুমি বোসো এই চেয়ারটায়। হ্যাঁ, আমি বলছি, বোসো। আমি সব শুনেছি ও'র কাছ থেকে। তাতে তোমার অমন মুখ ম্লান করে থাকবার কথা নয়। কোনোই তুমি অপরাধ করনি যে ভয়ে-ভয়ে পালিয়ে বেড়াবে। বোসো বলছি চেয়ারটায়!'

দিনেশ বসল।

'মুখোমুখি তাকাও এখন একবার ঐ বল্লভমশায়ের দিকে। তাকিয়ে স্পষ্ট দৃঢ়কন্ঠে বল, টাকা আমি দেব না।'

'দেব না?' দিনেশ নিজেই চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, দেবে না। মানে, এখন, যতক্ষণ না পার, যতদিন না দিন ফেরে, ততক্ষণ, ততদিন তুমি দেবে না। যেই মুহূর্তে স্বচ্ছলতা আসবে সেই মুহূর্তে দিয়ে দেবে। এর মধ্যে কোনো পাপ নেই, কোনো লজ্জা, কোনো ভীরুতার লেশমাত্র নেই। ওদের বেশি ছিল ওরা দিয়েছে, তোমার অল্পতমও নেই, তুমি দিতে পাচ্ছ না। এর মধ্যে এতটুকু অন্যায় নেই। যখন আবার ওদের থাকবে না আমাদের থাকবে তখন আবার ওদেরকে আমরা শোধ দেব। হব সমান সমান। যা সত্য তা কখনো ধর্মের আইনে তামাদি হয়ে যায় না। লেন-দেন হিসাব-নিকাশ সব এক দিন বুঝসমঝ হয়ে যাবে।'

আশ্চর্য, অজয় যা বললে তাই দিনেশ পুনরুক্তি করলে। মহাদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে, স্পষ্ট দৃঢ় কন্ঠে। প্রত্যেকটি কথা বুকের মধ্যে অনুভব করে করে। বলতে-বলতে গায়ে তার জোর এল, ভঙ্গিতে এল কাঠিন্য। সে যে অপরাধী নয় চোখে এল সেই অনুভূতির দীপ্তি।

যেন একটা অনড় কুয়াশা উড়ে গেল এক মুহূর্তে। নতুন বাতাসে প্রত্যেকটি নিশ্বাস তার পবিত্র মনে হতে লাগল, রক্তে এল সাহসের তীক্ষ্ণতা। সবার সামনে দাঁড়াতে পারে সে মুখোমুখি।

এল খেজুরতলার তারক সা। 'বাবু আছেন?'

'এই যে আপনার সামনে জলজ্যান্ত বসে আছি দেখতে পাচ্ছেন না?' স্পষ্ট নির্ভীক কন্ঠে বললে দিনেশ : 'কেন মিছিমিছি ঘোরাঘুরি করছেন? আমার হাতে এখন টাকা-পয়সা নেই, আমি এখন দিতে পারব না। কখন পারি তারো ঠিক নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যখুনি সক্ষম হব যেচে গিয়ে আপনার টাকা দিয়ে আসব। আর যদি কোনো দিন নাই পারি, জানবেন, আপনারই দিন শুধু ফিরেছে, আমরা তেমনি সেই লোকসানের ঘরেই পড়ে আছি। কিন্তু যেদিন লাভের কোঠায় উঠে আসব সেদিন আমার-আপনার সকলের লাভ।'

সত্যি খোলস বদলে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে দিনেশ। অনেক ঘোরাঘুরির

পর পেয়েছে ঠিক জায়গা, ঠিক ভঙ্গি। সে অপরাধী নয় পেয়েছে এই আশ্চর্য সংজ্ঞা। জীবনে কেউ অপরাধী নয়।

'আমি আদালত করব।' বললে তারক সা। মনে হল সে-ই এবার ভয় পেয়েছে।

'করো, আদালত লম্বা কিস্তির হুকুম দেবে।' বললে অজয়, 'আর সে-কিস্তি খেলাপ করার অধিকার আছে দেনদারের।'

দিনেশ শব্দ করে হেসে উঠল। অনেক বৎসর পর এই তার প্রথম উচ্চ হাসি। আমার অক্ষমতা আমার অপমান নয়। আমার বিফলতা নয় আমার অপরাধ। দিনেশ আবার হেসে উঠল।। অক্ষমতা আর বিফলতা সত্ত্বেও আমার অধিকার আছে বাঁচবার। অধিকার আছে সেই অক্ষমতা ও সেই বিফলতা দূর করে দেবার। লোকসান থেকে লাভের ঘরে চলে আসবার।

ডাক এবার অখিল সমাদ্দারকে। দেখি তার হাতের কবজিতে কত জোর।

অখিল এল না।

তারপর বাকি আছে কেশব। ডাক তাকে। দু' আনা চার আনা করে নিতে তার এমন কি অসুবিধে? আমার ইচ্ছে আমি দু' পয়সা চার পয়সা করে দেব। আমার সুবিধে মত।

এল কেশব। একখানা কাগজ দিয়ে গেল দিনেশের হাতে। বলে গেল, 'যখন যেমন সুবিধে তেমন দেবেন।'

আজ অনেক দিন পর শান্ত, নিশ্চিন্ত সাহসে বাইরে বেড়াতে বেরুল দিনেশ। সে খুঁজে পেয়েছে দাঁড়াবার ঠিক জায়গা, দেখবার ঠিক ভঙ্গি। সে অপরাধী নয়, সে কাপুরুষ নয়। সে অভিযাত্রিক। নিজের মাঝে বহন করে বেড়াচ্ছে সে নবীন দিনের সম্ভাবনা।

বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। সন্ধ্যায় অন্ধকারে শুনতে পেল কার চাপা কান্নার শব্দ।

পা টিপে টিপে এগুলো সে দরজার দিকে।

দেখল, অজয়ের কোলের মধ্যে দু হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে অসীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তার পর ঠিক সময় ঘরে বাতি জ্বলল, উনুন ধরানো হল, রান্না করতে গেল অসীমা। অতিথির জন্যে আরেক কিস্তি রাঁধলে নতুন করে। এই রাতটা থেকেই ভোর বেলা অজয় রওনা হয়ে যাবে। বাইরের ঘরে তার বিছানা করে দিয়ে এল অসীমা। তার পর তার নিজের ঘরে সে শুতে এল, দিনেশের পাশটিতে।

কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। সেই নোংরা কাঁথা-তোষক, নোংরা মশারি, সেই উত্তপ্ত অনিদ্রা। সেই প্রতিশ্রুতিহীন কালো রাত্রি।

চোখ বুজে শুয়ে আছে অসীমা। বোঝা যাচ্ছে ঘুমুতে পারছে না। চোখের চার পাশে লেগে আছে এখনো বা জলের মালিন্য।

'আমার দিকে তাকাও। চোখ মেল।' শান্ত কণ্ঠে বললে দিনেশ। একবার চোখ মেলেই আচ্ছন্নের মত আবার অসীমা চোখ বুজল।

'না, চোখের দিকে তাকাও স্পষ্ট করে। তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো লজ্জা নেই। তুমি অপরাধী নও।' অসীমার উন্মীলিত চোখের উপর দিনেশের দৃষ্টির স্নিগ্ধতা চুম্বনের মত নেমে এল : 'যদি তুমি বুঝে থাক তোমার সন্তান, তোমার ঘর-সংসার, সমস্ত কিছুর চেয়ে তোমার দেশ বড়, তোমার দেশের জন্যে সব কিছু তুমি ছেড়ে চলে যেতে পার মুহূর্তে, তা হলে তুমি কোনোই অপরাধ করনি।'

৪৭। সারেঙ

মা নাসিমকে মেরেছে। মা মেরেছিল মারুক, কিন্তু ও মারবে কেন? ও কে?

'গরু-বাছুর রাখি না-রাখি, চাষ-রোপণ করি না-করি, তাতে ওর কী? জমি খিল যায় তো যাবে, তাতে ওর কী মাথা-ব্যথা! ঘরের খড় বদলানো দরকার কি না-দরকার তা আমরা দেখব। ভিজতে হলে ভিজব আমরা মায়ে-পোয়ে। ওকে ছাতি মেলতে ডাকবে না কেউ।

'না', গোলবানু বলে, 'এবার থেকে তত্ত্বপালন করবে গহরালি।'

'কে গহরালি?' নাসিম ঘাড় ঝাড়া দিয়ে তেড়ে ওঠে।

'মস্ত লোক। জমি আছে পাঁচ কানি। কাচারি আছে দরজায়। দায়েরী মোকদ্দমা আছে ক'নম্বর।'

'তাতে আমাদের কী?'

'ওকে ধরলে জমি-জায়গা ঠিক থাকবে, খায়ন-পিরনের কষ্ট থাকবে না, খড়-কুটার বদলে ঢেউ-টিনের ঘর উঠবে একদিন।'

'চাই না। আমাদের এই ভাঙা ঘরই ভালো। আমরা শাক-লতা খেয়ে থাকব। তুই ওকে তাড়িয়ে দে।'

শক্ত মার দিলে গহরালি। সঙ্গে-সঙ্গে গোলবানুও হাত মেলাল। ভুলে গেল দয়া-মায়ার কথা।

বাপজান বেঁচে থাকলে এমন কেউ মারতে পারত না তাকে। মাঠে যাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি করত না। সে জাল নিয়ে বিলে-বাওড়ে বেরিয়ে পড়ত মাছ ধরতে। বাপজান বলত, 'হাটে তোকে কাটা-কাপড়ের দোকান করে দেব একখানা।' 'তার চেয়ে আমাকে একটা নৌকো কিনে দাও', বলত নাসিম, 'মাটির চেয়ে দরিয়ার পানি আমার বেশি ভালো লাগে।

বাজানের নৌকো কিনে দেবার সাধ্য ছিল না। নাসিম এখনো এত বড়ো হয়নি যে, কেরায়া নৌকো বেয়ে খেটে খাবে। তার জাল কবে ছিঁড়ে গেছে। তবু

জলের টান সে ভুলতে পারে না। নদীর ধারে চুপটি করে বসে থাকে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

সে শুনেছে মা নিকা বসবে গহরালির কাছে। এক ঘরের মানুষ হয়ে থাকবে তারা। নাসিমের আর জায়গা কোথায়? হাতনেয়, পাছ-দুয়ারে। লোকে যখন মাকে জিগগেস করবে, 'এ কে?' তখন মা বলবে, 'আমার আগের পুরুষের সন্তান।' 'কার ভাতে আছিস?' যখন কেউ জিগগেস করবে নাসিমকে, সে বলবে, 'গহরালির ভাতে।' বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে নাসিমের।

মাইলখানেক দূরে ব্র্যাঞ্চ লাইনের ইস্টিমার থামে। পাট-ক্ষেতের পাশে। জেটি বা ফ্ল্যাট নেই, বাদাম গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কাছি জড়িয়ে ইস্টিমার পাড় ঘেঁষে দাঁড়ায় আশ্চর্য রকম গা বাঁচিয়ে। সটান পাড়ের উপরেই সিঁড়ি পড়ে দুখানা। সিঁড়ির এ-ধার থেকে ও-ধারে বাঁশের লগি ধরে দাঁড়ায় দুজন খালাসী। নামা-ওঠা করে যাত্রীরা। বাদাম গাছের তলায় বসে ছোট একটি টিনের বাক্সতে করে টিকিট বেচে ঘাট-সরকার। যারা নামে তাদের থেকে টিকিট কুড়োয়, ফাঁকি দিয়ে যে আসতে পেরেছে তার সঙ্গে এক ফাঁকে কথাটা সেরে রাখে। তারপর উঠে আসে ইস্টিমারে। হিসাব-কিতাব করতে জাহাজের বাবুর সঙ্গে। ঘাট-সরকার নেমে না-যাওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি তোলে না। একখানা তুললেও আরেকখানা রেখে দেয়। লগি লাগে না ঘাট-সরকারের।

ডোবা দেশ, প্রায় সময়েই জল থাকে দাঁড়িয়ে। গাছের গোড়াটাই যা একটু ট্যাঁকা-মতন। যাত্রীরা জল ভেঙে গিয়ে গাঁয়ের রাস্তা ধরে। হাতে-ঠেলা ডোঙা আছে একখানা। মালামাল থাকলে তার শরণ নেয়। বাচ্ছা-কাচ্ছারা কাঁধে-কাঁখে করে পার হয়। ছুটুলে বউ হলে পাঁজা-কোলে করে।

'সিঁড়ি তোল।' দোতলার থেকে সারেঙ হুকুম দেয়।

ঘাট-সরকার এখনো নামেনি বুঝি? না, এই নেমে গেল আঁকা-বাঁকা পায়ে তুলে নিল শেষ সিঁড়িটা। হড়-হড় হড়-হড় করে মোটা শিকলে বাঁধা নোঙর উঠে আসতে লাগল।

একটা লোক তাড়াতাড়িতে নামতে পারেনি বুঝি। লোক কোথায়, দশ-বারো বছরের ছেলে একটা। প্যাসেঞ্জার না কি? কে জানে? জাহাজ দেখতে উঠে এসেছিল হয়তো দুষ্টুমি করে। তবে নেমে যেতে বল পরের ঘাটে, পাতা-কাটায়। শেষ-বেলার ভাটিতে তরতরিয়ে বেয়ে যেতে পারবে একমাল্লার নৌকায় আন্ধার হয়ে যাবে, তড়ে যাবে কি করে! আহা! বাপ-মা কত ভাববে না জানি কত ডাকাডাকি করবে।

ছোট ইস্টিমার, উপরের ঢালা ডেকে শুধু থার্ড ক্লাস। সামনের দিকে ফার্স্ট ক্লাসের দুটো পায়রার খোপ, আর তারই সামনে খোলা কোণায় জায়গাটুকুতে সারেঙের হুইল। নাসিম একেবারে সেখানে এসে হাজির হল।

প্রথমটা কেউ দেখেও দেখেনি। ভেবেছে কলের কায়দা দেখবার জন্যে এমনি উঠে এসেছে বুঝি। কিন্তু, না, নড়ে না ছেলেটা।

'কি চাই?' চটি পায়ে, কিস্তি টুপি মাথায়, সারেঙ হুঁকো ফুঁকছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে জিগ্গেস করলে।

'হুজুরে যদি চাকরের দরকার থাকে আমাকে রাখতে পারেন।'

'তোর দেশ কই?' সারেঙ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নাসিমের মুখের দিকে।

'এইখানেই হুজুর, কনকদিয়া।'

'মা-বাপ আছে?'

'কেউ নাই।'

আবার কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল সারেঙ। বললে, 'কাজ করতে পারবি তুই?'

'কি-কি কাজ হুজুর?'

'রাঁধা-বাড়া, ধোয়া-মোছা, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা—এই সব আর কি। পারবি? বেশ, লেগে যা তা হলে। মুফৎ একটা ছোকরা যদি পাওয়া যায় তো মন্দ কি।' হুইলের লোক ইয়াদালির সঙ্গে একবার চোখ-তাকাতাকি করে: অন্তত হুঁকোটা তো সাজতে পারবে, গা-হাত-পা টিপে দিতে পারবে তো দরকার হলে।'

ইয়াদালি বলল, 'মাইনে পাবে না কিছু?'

'মাইনে না হাতি!' সারেঙ ঝামটা দিয়ে উঠল : 'সোতের শ্যাওলা দিয়ে তরকারি রান্না করে খেতে হবে। বয়ে গেছে আমার! অমনি থাকতে চায় তো থাকবে, নইলে নামিয়ে দেব জোর করে। কি, টিকিট আছে?'

'না হুজুর, মাইনে চাই না আমি।'

জাহাজে যে জায়গা পেয়েছে এই নাসিমের বেশি। বাপ নয়, চাচা নয়, মুনিব নয়, মালেক নয়, উটকো বাজে লোকের যে মার খেতে হবে না মুখ বুজে, এই অনেক। অজানার টানে যে ভাসতে পেরেছে অকূলে এই তার মহা সুখ।

'ভালো করে কাজ-কর্ম করতে পারলে জাহাজেই বাহাল করব এক সময়। প্রথমে সিঁড়ি, পরে পাটাতন, ক্রমে-ক্রমে শুখানি, শেষে একেবারে সারেঙ। কে বলতে পারে? আগে বিনি-মাইনের চাকর, শেষকালে এই জাহাজের জমিদার।' সারেঙ তার সাদা শীর্ণ দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল।

কিন্তু প্রথম দিনই রাত্রে নাসিম মার খেল সারেঙের হাতে। বেখেয়ালে ভেঙে ফেলেছিল একখানা কাচের বাসন। আর যায় কোথা! বলা-কওয়া নেই, মুখে-মাথায় ঘাড়ে-পিঠে পড়তে লাগল চাঁটির পর চাঁটি। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল নাসিম। বেশি গোলমাল করবে তো হাত-পা বেঁধে ফেলে দেবে কালোজলে

ব্যথার চেয়ে আশ্চর্য লাগল বেশি নাসিমের। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে। এই এখানকার রেওয়াজ। সবাইকেই মার খেতে হয় সারেঙের হাতে। যারা সিঁড়ি দেয়, যারা পাটাতন ধোয়, যারা আছে লগেরের কাজে, দাঁড়কাছির কাজে, যারা বা লাইট ঘোরায়, তাদের কাজের এতটুকু গলতি বা গাফিলতি হলেই শুরু হয় মারধোর। নিচে মেস্তুরির এলাকা। তাকে ঘিরে

কাজ করে কয়লাওয়ালা, আগ্নুনওয়ালা, ইঞ্জিনওয়ালা। কিন্তু চরম শাসনের ভার সারেঙের হেপাজতে। ভুল করেছে কেউ, এক কল ঘোরাতে আরেক কল ঘুরিয়ে দিয়েছে, এক ডাণ্ডা টানতে আরেক ডাণ্ডা টেনেছে, তা হলে আর রক্ষে নেই। লাথি-চড়, জাত-বেজাতের গালাগালি, জুতা-পিট্টি পর্যন্ত! তাতেও না শানায়, চাকরি থেকে বরখাস্ত।

কেনই বা হবে না শুনি? কোম্পানি শুধু সারেঙকে চেনে, সারেঙকে বোঝে। জাহাজের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সে। সমস্ত দায়িত্ব তার। চলতি-পথে ইস্টিমার যদি নৌকো ডুবিয়ে ফেলে, খেসারত দিতে হবে সারেঙ সাহেবকে। দুর্যোগে পড়ে খোদ ইস্টিমার যদি ডুবে যায়, দায়ী কে? কোম্পানির সাহেবরা নয়। যত কিছু মালি-মোকদ্দমা চলতি-পথের ইস্টিমার নিয়ে,—সমস্ত ফলাফল সারেঙ সাহেবের। আর যদি ঝড়-তুফান থেকে ইস্টিমার পাড়ে ভিড়ানো যায় তার পুরস্কারও এই সারেঙ সাহেবেরই প্রাপ্য। মেস্তুরি-খালাসীরা যতই হাঁক-ডাক দৌড়-ঝাঁপ করুক, যতই কায়দা-কেরামতি দেখাক, টাকার তোড়ার এক-আধটু ছিটেফোঁটাও কারু বরাতে জুটবে না। যত মেডেল সব সারেঙ সাহেবের গলায় ঝোলানো।

'কী হল হঠাৎ?'

ইস্টিমার চরে ঠেকেছে। চোরা চর, কুয়াশায় ঠাহর হয়নি। চাকা বসে গেছে মাটির মধ্যে, শিগগির যে ছাড়ান পাবে এমন মনে হয় না। খবর পাঠাতে হবে বন্দরের ডকে, জালি-বোটে করে লোক পাঠাতে হবে কাছের যে ইস্টিশানে টরে-টক্কা আছে। সেও এমন কিছু ধারাধারি নয়। বেশির ভাগ ইস্টিশানই তো গাছতলা বা ক্ষেত-খোলা। কম-সে-কম সাত-আট ঘণ্টা লেট্‌ আজ নিঘ্‌ঘাত মধ্যিখানে যত ঘাটে যাত্রীরা ইস্টিমারের আশায় বসে আছে, তারা সমস্ত রাত আজ দূরে ধোঁয়া দেখবে আর হুইস্‌ল শুনবে।

দোষ কার?

দোষ শুখানির, দোষ সেকেণ্ড মেটের। লম্বা-চওড়া জোয়ান মরদ সব, এখন আর মারতে আরাম লাগে না, নিজেরই হাতে-পায়ে চোট লাগে। কিন্তু যাবে কোথায়? এক মাসের পুরো মাইনে বরবাদ হয়ে যাবে এদের। খোরাক কিনতে হবে নিজের পয়সায়।

সারেঙ যেন এই জাহাজের ইজারাদার। মোকররী ইজারা। যত খরচ সরঞ্জাম বাবদ, মেরামত বাবদ, খালাসী-মেস্তুরির মাইনে বাবদ—হিসেব করে একটা মোটা টাকা সারেঙের হাতে ধরে দেয় কোম্পানি। সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা করার মালিক এই সারেঙ। যাকে খুশি পুরো মাইনে দেয়, যাকে খুশি জরিমানা করে। যাকে খুশি খোরাক কাটে, যাকে খুশি জবাব দেয়। এর বিরুদ্ধে নালিশ নেই, সালিস-ফয়সালা নেই। ভিতরের শাসন নিয়ে কোম্পানি মাথা ঘামায় না; সে দেখে, ঘাট থেকে ঘাটে মালে-মানুষে বোঝাই হয়ে ইস্টিমার মোটা মুনাফার মাশুল আনতে পারে কি না।

সমস্ত হাস্টমার তাহ সারেঙের কথায় ওঠে-বসে। সব কর্মচারী তার তাঁবেদার। ইস্টিমার তো নয়, যেন সে লাটদারি পেয়েছে।

'কেঁদে কিছু লাভ হবে না।' পাশ থেকে বললে মকবুল, 'এমনি অনেক মার খেতে হবে। মার খেতে-খেতে তবে প্রমোশন।'

মকবুলও প্রথম ঢোকে চাকর হয়ে। পাকের কাজের নয়, সারেঙের ধোপা-মুচির কাজে। তিন বছর পর সে সিঁড়ি পেয়েছে। সিঁড়ির পরে পাবে পাটাতন, তার পরেই দাঁড়-কাছি। মার না খেলে উন্নতি নেই জাহাজে। মারের আশায়ই বসে থাকা।

'সাহেবের সুদৃষ্টি না হলে কিছুই হবার নেই। দশ-বারো বছর পর সাহেবের যদি দয়া হয় সার্টিফিকট দেবে। পরে সেই সার্টিফিকটের জোরে দেয়া যাবে সারেঙগিরি পরীক্ষা।' মুরুব্বির মতো বলে থার্ড মেট, আফসারউদ্দিন, 'সেই সার্টিফিকট না হলে সবই ফক্কা। তাই ভারী হাতে সারেঙের পায়ে তেল মাখান চাই। তারপর পাস করে একবার সারেঙ হয়ে নিতে পারলে পায় কে? তখন জমিদার তবিলদার সব একজন।'

'না হে না, এর মধ্যে একটু কথা আছে। যারা চাটগাঁর লোক তাদের দিকেই সাহেবের একটু টান বেশি।' গলা খাটো করে বলে বিলায়েত আলি, বয়লারের খালাসী: 'নিজের বাড়ি চাটগাঁ কিনা। বলে, চাটগাঁ ছাড়া সারেঙ কোথায়? কথায় আছে, সারেঙ শুঁটকি দরগা, এ তিন নিয়ে চাটগাঁ। ধান ডাকাত খাল, এ তিন নিয়ে বরিশাল। সারেঙি করা তো ডাকাতি করা নয়।'

'তোর বাড়ি কোথায় রে ছ্যামরা?' সবাই জিগগেস করে একসঙ্গে।

'এ দেশে।' হতাশ মুখে বলে নাসিম। আর সবারও মুখ যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

পরদিন বেদম মার খেল আবদুল। জল মাপতে গিয়ে একটা লোহার কাঠি হারিয়ে ফেলেছে।

মারের সময় কেউ ধরতে আসে না, ছাড়াতে আসে না। এ একেবারে গা-সওয়া, নিত্যিকার ব্যাপার। তবু চোখ ছাপিয়ে কান্নার কমতি নেই। নদীর জলে চোখ মুছতে মুছতে আবদুল বলে, 'মাইনের থেকে দাম আর তার সুদ তো কেটে নেবেই, তবু মেরে খামাখা জখম করবে।'

তবু প্রতিবাদ নেই, বিদ্রোহ নেই। নিজের সমর্থনে দুটো কথাও বলা যাবে না। মার ঠেকাবার জন্যে শক্ত করা যাবে না শরীরের হাড়-মাস।

নাসিম ভাবে এরা সবাই বুঝি তার মতো নিরাশ্রয়, মা-বাপ-মরা।

তা কেন? সবাই সিঁড়ি থেকে শুরু করে উঠতে চায় জাহাজের 'ফানিলে'। সবাই সারেঙের সার্টিফিকট চায়। মার দিতে না দিলে ঐ হাতে সে কলম ধরবে কেন?

তাই সেদিন যখন মকবুলের সঙ্গে জল-তোলা নিয়ে ইয়ার্কি মারতে গিয়ে একটা বালতি নাসিম নদীতে ফেলে দিল তখন মার খেতে তার আর লজ্জা

বোধ হল না। অপমানের জ্বালা পর্যন্ত জাগল না তার মনে। মকবুলের সঙ্গে, সমস্ত খালাসীর সঙ্গে সে দোস্তালি অনুভব করলে।

'তোর কি! মাইনে নেই, শুধু মারের উপর দিয়ে গেল।' মকবুল কান্নার মধ্যে থেকে বললে, 'আর আমার পুরো মাইনেটাই বালতির অন্দরে কেটে নেবে। পরে মাস-কাবারে বলবে, আমার থেকে আগাম নে। টাকায় দু আনা করে সুদ দিবি। জাহাজে বসেই মহাজনি করে। কেউ আমাদের দেখাবার-শোনবার নেই।' বলে উপরের দিকে তাকায়। যেন উপরআলা শুনছেন এই আর্তের ফরিয়াদ।

'অন্য জাহাজে চলে যেতে পারিস না?'

'তুই আছিস কোন্ তালে? এক জাহাজ থেকে ছাড়ান নিলে আর কোনো জাহাজেই ঠাঁই নেই। সারেঙদের মধ্যে সাঁট আছে। তাই তো মার খেয়েও মুখ বুজে থাকি যেন বরখাস্ত না করে। একবার বরখাস্ত করলেই বরবাদ হয়ে গেলাম। পানি ছেড়ে তখন গিয়ে হাল ধরতে হবে।'

'আর কোন জাহাজেই বা তুই যাবি?' পাশ থেকে ইয়াদালি ফোড়ন দেয়: 'সব জাহাজেই এই রেওয়াজ।'

'এমনি পালিয়ে যাওয়া যায় না?'

সবাই হেসে ওঠে। সিঁড়ি থেকে 'ফানিলে' ওঠবার সাধনায় যারা জাহাজে ঢুকেছে, তাদের কাছে এটা নেহাত আজগুবি শোনায়।

'আর পালিয়ে যাওয়া সোজা নয়।' গম্ভীর মুখে বলে সেকেন্ড মেট: 'তোর নাম-ঠিকানা সাহেবের নোটবুকে টোকা আছে। পালাবি আর পুলিসে এজাহার যাবে। বলবে আমার জেবের থেকে মনিব্যাগ নিয়েছে, ঘড়ি নিয়েছে। কোম্পানি লড়বে সারেঙের হয়ে। ছিলি জাহাজে, যাবি জেলে।'

তবে এমনি করেই দিন যাবে নাসিমের? এই একঘেয়ে জলের শব্দ শুনে-শুনে? মাইনে নেই, থিত-ভিত নেই, এমনি করেই ভাসবে সে দিন-রাত?

'সাহেবকে খুশি করতে চেষ্টা কর, তা ছাড়া আর পথ নেই। দ্যাখ একবার সিঁড়ি ধরতে পারিস কিনা।'

আর কী করে সে খুশী করবে! যা কাজ তার উপরে সে সাহেবের গা-হাত-পা টেপে, গোসলের আগে তেল মেখে দেয়। চুলে বিলি কাটে। পাকের সময় শুখানি সাহায্য করতে আসে বলেই তার হাড়-মাস এখনো আলাদা হয়নি। তবু মন নেই, মাইনে নেই। বরং জরিমানা বাবদ কিছু তার কাটতে পারে না বলে সাহেবের বড়ো আপসোস। তাই মাঝে-মাঝে তাকে উপোস করিয়ে রাখে। সে-সে বেলার লঙ্কা-পেঁয়াজের খরচ বাঁচায়।

চাল নুন লঙ্কা আর পেঁয়াজ সারেঙ যোগান দেয়। আর সব যার-যার মর্জিমাফিক। তেল আর মশলা। মাছ আর তরকারি। মাসান্তে মাইনের টাকার থেকে যার-যার চাল-নুন, পেঁয়াজ-মরিচের খরচ কেটে রাখে সারেঙ। তাও তার মর্জি-মাফিক।

'যদি মন চাস সারেঙের, চুরি কর।' কে যেন বলে ।ফিসফিসে।

এই ইস্টিমারের সঙ্গে মাঝে-মাঝে বার্জ বাঁধা থাকে। তাতে বস্তা-বোঝাই চাল যায়, নুন যায়, লঙ্কা যায়। বার্জের সঙ্গে লোক থাকে। তার সঙ্গে কী বন্দোবস্ত সারেঙ-মেস্তুরির, স্টোর-রুমে চলে আসে চাল আর লবণ। মরিচ আর পেঁয়াজের ছালা। সেই চোরাই মালের পর আবার মুনাফা মারে।

না, আর ভালো লাগে না। কোনো আশা নেই নাসিমের। একদিন অন্তর একদিন, একই রাস্তা দিয়ে ইস্টিমার ঘোরাফেরা করে। যেখানে আসার সময় সন্ধ্যেবেলা—সেখানে আসতে কখনো মাঝ-রাত, কখনো বা পরদিন ভোর—শুধু এইটুকুই যা বৈচিত্র্য। নইলে একঘেয়ে জলের শব্দ, যাত্রীর ভিড়। নোঙর ওঠা নামার হড়-হড় সিঁড়ি ও কাছি ফেলবার সময় সেই ডাক-চীৎকার। ভালো লাগে না আর। ক'দিন পর-পর ঘুরে ঘুরে ইস্টিমার কনকদিয়ায় ফিরে আসে। নদী এত ছোট, তার স্রোত এত দুর্বল, ভাবতে পারত না নাসিম। আগে-আগে মনে হত নদী না-জানি চলে গেছে কোন সমুদ্দুরে। এই দেশ থেকে কোন দূরবিদূরের বিদেশে।

নিরালায় অন্ধকারে নদীর দিকে চেয়ে কখনো একলাটি এসে বসে নাসিম। মন কালো জলে জুনিরাত ঝিলমিল করছে। আজ কনকদিয়া এসেছে মাঝ-রাতে। বাড়ি-ঘরের কথা মনে পড়ে নাসিমের। ভাবে, কোথায় তার বাড়ি-ঘর। তার বাড়ি-ঘর নেই, সেখানে ভূতের আস্তানা। মনে পড়ে মার কথা। মার মরা মুখের মতোই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না।

বড়ো চুরি না করতে পারে, ছোট ছিঁচকে চুরি কেন করতে পারবে না? না হাতে করে ডাব বেচতে এসেছে গাঁ-গেরামের লোক, সারেঙ সাহেবের জন্যে কিনলে দুটো দশ পয়সায়। জাহাজে উঠে এসে, সিঁড়ি যখন তুলে নিয়েছে, নাসিম সারেঙের কাছ থেকে একটা একানি নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ডাঙার উপর। আর ছ-পয়সা? নাসিম জিভ উলটিয়ে মুখ ভেঙচাল। বেচনদার ছোঁড়াটা নদী থেকে কাদা তুলে ছুঁড়ে মারল নাসিমের দিকে। জাহাজ তখন সরে এসেছে, লাগল না ছিটে-ফোঁটাও। সারেঙ আর নাসিম দু'জনে একসঙ্গে হাসতে লাগল।

এমনি, মাছ এসেছে বেচতে। বাঁশপাতা আর গাং-খয়রা। নাও কিছু ছল-চাতুরী করে। দুধ এসেছে হাঁড়িতে। বাঁশের চোঙায় মেপে দেবে। দাম দেব জাহাজে উঠে। ক্ষেতের টাটকা শশা-খিরাই এনেছে ঝুড়িতে করে। কুসো চিংড়ি দিয়ে তরকারি হবে, না হয়, অমনি কাঁচা খাব। তোমার দাম মারা যাবে না। আমি সারেঙ সাহেবের চাকর।

এতদিনে একটা নিমা পেয়েছে নাসিম। একখানা পানি-গামছা। লুঙ্গি একখানা পাবে কবে?

চারটে পয়সা চাইল নাসিম। এমন স্পর্ধার কথা সারেঙ তার জীবনে কখনো শোনেনি। চোখ কপালে তুলে বললে, 'কী বললি? পয়সা?'

কী ভীষণ হারামি কথা না-জানি বলে ফেলেছে, এমনি ভয়-তরাসে চোখে তাকাল নাসিম।

'কী করবি পয়সা দিয়ে?'

'চা খাব এক খুরি।'

অমনি বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় পড়ল তার গালের উপর। ঘুরে ছিটকে পড়ল নাসিম। সারেঙ গর্জে উঠল : 'এমন বেতরিবৎ! আমার কাছে কিনা বিড়ি চায়! বিড়ি কিনবে! চা কিনবে! কোন দিন শুনব বোতল কিনবে! তেরিবেরি করবি তো নদীর গহিনে নিখোঁজ করে দেব।'

চোখের জলে আবার মার কথা মনে পড়ে নাসিমের। মরে গেলে মার মুখ কেমন দেখাবে তাই সে অন্ধকারে জলের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। মার মরা-মুখের কথা ভেবে মনে সে জোর পায়। জোর পায় এই মার সহ্য করতে। 'মাগো' বলেও যদি সে কাঁদতে না পারে, তবে নিঃশব্দে হজম না করে উপায় কি?

তবু এই অত্যাচারিতের দল একত্র হয় না। খোদ উপরআলা ছাড়া আর কারু কাছে তাদের নালিশ নেই। মুক্তিও নেই এই জাহাজের খোল থেকে। কবে কে সিঁড়ি পাবে, কবে কে পাটাতন, দড়িকাছি। নোঙর-লাইট বা মেস্তুরির ইলাকা—তারি আশায় সবাই দিন গোনে। কে কী ভাবে সারেঙের খাতির কাড়তে পারবে। সুদ দিয়ে, ঘুষ দিয়ে, চুরি করে, মার খেয়ে। চমৎকার গভর্ণমেন্ট চালাচ্ছে সারেঙ সাহেব।

সেই রাত্রেই এক প্যাসেঞ্জারের এক জোড়া জুতো সরালো নাসিম। সারেঙ তা সটান নদীর মধ্যে ফেলে দিলে। বললে, 'বুদ্ধিকে তোর বলিহারি। আমি জুতো মসমসিয়ে বেড়াই আর আমাকে পুলিসে ধরুক।' পরদিন রাতে নাসিম যোগাড় করলে একটা টিনের সুটকেস। সেটাও গেল নদীর গহ্বরে। সেটার মধ্যে মোকদ্দমার নথি, পরচা-দাখিলা, ক'কেতা বেজাবেদা নকল। কিছুতেই মনের মতো হতে পারছে না নাসিম। পারবি, পারবি, আস্তে-আস্তে পারবি। সারেঙের চাউনিটা তাই যেন তাকে বলে কানে-কানে। তার অক্ষমতার জন্যে সারেঙ রাগ করলেও, তাকে যে সরাসরি মারে না তাতেই নাসিম উৎসাহ খোঁজে।

কোম্পানির আলোতে তেজ নেই। বৃষ্টি নামলে তেরপল নেই, মেয়ে-পুরুষের আলাদা কামরা নেই, তবু সবার চোখে ঘুম আছে। এমন ভদ্র যাত্রী নেই যে অস খেলে বা গান বা খোস-গল্প করে। চাষাভুষোর লাইন। বন্যার তোড়ের মতো যারা খাটে, আর তাল-তাল মাংসপিণ্ড হয়ে যারা ঘুমোয়।

ঘুমের অগোছালে ট্যাঁক থেকে কার বেরিয়ে এসেছে টাকার পুঁটলি। নাসিম তা হাত-সাফাই করে তুলে নেয় আলগোছে। একবার ভাবে গুনে দেখি কত আছে। ভাবে পালিয়ে যাই পরের ইস্টিশানে। কিন্তু কে জানে, কী অদম্য আকর্ষণে সারেঙের কাছেই নিয়ে আসে। প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

বাঘের মুখে গরুর মতো। আশ্চর্য, যে শুধু মারে, যে হাসিমুখে কথা কয় না, নাযা অধিকারের কাণাকড়িও দেয় না হাতে ধরে, তাকেই খুশি করতে আগ্রহ হয়। যে অনবরত চুকলি শোনে, একের থেকে অন্যকে আলাদা করে রাখে, তারই মন পাবার জন্যে কাড়াকাড়ির ধুম পড়ে যায়। কে কাকে হটিয়ে দেবে, চলে তার টেক্কাটেক্কি।

'মোটে সাত টাকা সাড়ে ন'আনা।' বলে মকবুল : 'এতে কী হবে! দু'-কুড়ি সাত না হওয়া পর্যন্ত খেলা থাকে না, বলে আমাদের সারেঙ সাহেব।'

তবু কাপড়-চোপড়ের চেয়ে নগদ টাকা ভালো। সবচেয়ে ভালো, যদি হয় কিছু জেওর, সোনা-রুপা। দাম কত আজকাল! কাগজের টাকা তার কাছে রদ্দি, ওঁচা।

একখানা নতুন লুঙ্গি হয়েছে এতদিনে। এবার একটা হাফ-শার্ট।

কিন্তু গয়না কোথায় চাষার বউ-ঝিয়ারীদের? বড়ো জোর নাকে আংটি-চুংটি। হাতে কাচের ঝুরো চুরি। সোনাদানা নেই কোথাও।

না, আছে। নতুন বউ যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। গলায় সোনার হাসনা, হাতে বটফুল। পায়ে রুপোর খাড়ু, আঙুলে গুজরি। ফলসা রঙের শাড়ি পরে ঘোমটা টেনে ঘুমিয়ে আছে এক পাশে। বরযাত্রীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিক-ওদিক। কে কোথায় চেনবার উপায় নেই। নিফাঁক ভিড় আজ জাহাজে। তবু এরি মধ্যে ফাঁক খুঁজছে নাসিম।

নতুন বউয়ের গলার কাছে নাসিম হাত রাখল। নরম তার গলার কাছটা। আঙুল কাঁপল না নাসিমের। একটানে ছিঁড়ে ফেলল হাসনা।

'চোর! চোর!' ভিড় ঠেলে ক পা এগুতে-না-এগুতেই নাসিমকে ধরে ফেলল যাত্রীরা। তারপর সবাই তাকে মার লাগাল। প্রচণ্ড মার। যে এসে জিগগেস করছে কী হয়েছে, সেও পরক্ষণে মার লাগাচ্ছে। বামাল সরাতে পারেনি চোর, বউয়ের বিছানার গোড়াতেই ফেলে এসেছে। তাতে কি? মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছে তো। হার তো ছিনিয়ে নিয়েছিল গলা থেকে। মার। মার, চাঁদা তুলে মার!

'বাবা গো—' নাসিম চীৎকার করে উঠল।

আচকান গায়ে, কিস্তিটুপি মাথায়, চটিপায়ে সারেঙ এসে হাজির। বলে, 'কী হয়েছে? কে মারছে আমার ছেলেকে?'

ছেলে! সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সারেঙ সাহেবের ছেলে!

কে বললে, 'ও আপনার চাকর ছিল তো জানতাম।'

'চাকর! মিথ্যে কথা। ও আমার বিয়ার ঘরের ছেলে। আমার মা-হারা সন্তান। ওকে মারে কে?'

'ও গয়না চুরি করেছে নতুন দুলাহিনের। গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে হাসনা।'

'মিথ্যে কথা। হতেই পারে না!. কিছুতেই না। চলো, আমি নিজে পুছ করিগে বিবিকে।'

সারেঙ এগিয়ে এল নতুন বউয়ের নজদিগে। বললে, 'আপনার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছে কেউ?'

পরদার বিবি ঢাকা-মুখে গলা খাটো করে বললে, 'না। ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়।'

লতাবাড়ি ইস্টিশান দেখা যায় কাছাকাছি; বরের পার্টি নামবে এইখানে। জাহাজ ঢিমে হয়ে এল। নোঙর নামতে লাগল হড়-হড় করে।

কাছির বাঁধ পড়ল গাছের সঙ্গে।

'সিঁড়ি দে, সিঁড়ি দে—'উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল সারেঙ : 'নাসিম কই? নাসিমকে ডাক। সে আজ থেকে সিঁড়ি ধরবে।'

খালাসীদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে গেল। নাসিমের দীক্ষা হল এতদিনে, এত অল্প দিনে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েই কপাল ফিরল তার। আর যারা ধরা পড়েনি, তারা এখনো নাকানি-চুবুনি খাচ্ছে।' সিঁড়ি থেকে পাটাতনে প্রমোশন পাচ্ছে না। আর এ আজ সিঁড়ি, কাল পাটাতন, পরশু শুখানি, পরে একেবারে সারেঙ, কাপ্তেন, জাহাজ-নাখোদা।

'ধর, ধর, ও ছেলেমানুষ, ও একা কেন পারবে? তোরা সবাই মিলে ওকে সাহায্য কর'। উপর থেকে জোরালো গলায় হুকুম হাঁকে সারেঙ।

সার্চ-লাইটের আলোয় নাসিমের জলে-ভরা চোখ দুটো চকচক করে ওঠে।

নতুন বউ নেমে যাবে লতাবাড়ি। পায়ে গুজরি বাজিয়ে আসছে।

আলো পড়েছে অনেক দূর। গাছ-গাছালির মাথায়। সিঁড়ি দিয়ে লগি ধরেছে নাসিম। দুলহিনকে বলছে, 'টলে পড়ে যাবেন। লগি ধরুন।'

না, লগি না ধরেই টলতে লাগল নতুন বউ।

পিছন থেকে কে ধাক্কা মারল নাসিমকে।

চমকে চেয়ে দেখে, সেই লোকটা, ভিড়ের মধ্যে সবচেয়ে যে তাকে বেশি মেরেছে। আলোতে চিনল তাকে এতক্ষণে। গহরালি।

আলো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে গোলবানু। ঘন করে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। গায়ের চাদরটা বোরখার মতো করে চাপিয়ে দিয়েছে গায়ের উপর। ঘাটে অনেক বিরানা পুরুষের আনাগোনা।

ধরাধরি করে সিঁড়ি তুলতে লাগল নাসিম, একের পর আরেক চিলতে। পাড়ের কাছেকার ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা মুখ। আর উপরে দাঁড়িয়ে সারেঙ তাকে দরাজ গলায় বাহবা দিচ্ছে। উড়ছে তার সাদা আচকান, সাদা দাড়ি। দিনরাত করে যে সূর্য্যি, যেন তার মতো চেহারা।

৪৮ । চোর

মুদিখানা না খুলে শ্যামকান্ত বইয়ের দোকান খুলেছিল, তারপর বইএর দোকান যখন চললো না, তখন দোকান খুললে সে মনিহারি।

যখন তার বইয়ের দোকান ছিল, দোতলা-বাড়ির সিঁড়ির তলায় সেই বইয়ের দোকান, তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা চিরকাল মনে রাখবার মতো। শীতকাল, বন্ধুবান্ধব দু'-একজন আশেপাশে বসে, কুড়ি-বাইশ বছরের একটা রোগা আধ পেটা খাওয়া ছেলে দোকানে ঢুকলো বই কিনতে, বিয়েতে কাকে উপহার দেবে বলে। এ-বই দেখে, ও-বই দেখে, কোনো বইই তার পছন্দ হয় না। দাম সস্তা, নামী লেখক, রঙ্‌চঙে মলাট—সবরকমের কোনোটাই তার মনোমত নয়। অগত্যা চলেই যাচ্ছিল সে, বন্ধুদের মধ্যে থেকে হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো—'চোর! চোর!'

ছুট—ছুট—সবাই ছুটলো সেই ছোকরার পিছু-পিছু। রাস্তার ট্রাম-বাস দাঁড়িয়ে গেল, মোটরগাড়িগুলি তেড়ে এসে তার পথ আটকালো। শ্যামাকান্তই প্রথমে ধরে ফেললো তার শার্টের কলারটা, আর একটানে র‍্যাপারটা তার গা থেকে ছিঁড়ে ফেলতেই বেরুলো তার বগলের নিচে একগাদা বই—খানিক আগে যা সে একে-একে বাতিল করে এসেছে। প্রথমেই তার মুখের উপর পড়লো একটা ঘুসি, তারপর ভীষ্মের উপর শরবর্ষণের মতো চতুর্দিক থেকে বেপরোয়া ও বে-এক্তিয়ার মার। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন হঠাৎ জিগগেস করলে—'কী হয়েছে মশাই?'

'ছোঁড়া বই কেনবার নাম করে দোকানে ঢুকে র‍্যাপারের তলায় করে একগাদা বই চুরি করে নিয়ে এসেছে।'

'চুরি করে নিয়ে এসেছে! চোর!' বলা-কওয়া নেই, আগন্তুক পটাপট করে গাঁট্টা চালাতে লাগলো ছোকরার মাথার উপর।

ধরা-পড়া চোরকে বেনামীতে মারা চলে, অধিকারের কোনো প্রশ্ন তাতে নেই।

হিড়হিড় করে ছোকরাকে টেনে আনা হোলো দোকানে। তারপর শ্যামাকান্ত দরজা বন্ধ করলে। বন্ধু-বান্ধব যারা ছিল, তারা ফের ফিরে এলো কি না, দেখেও দেখল না।

শ্যামাকান্ত একটা জোয়ান মর্দ, আর এই চোর নিতান্ত দুর্বল, হাড্ডিসার, তবু শ্যামাকান্ত ছেড়ে কথা কইলো না, ছেলেটাকেই কথা কইয়ে ছাড়লো।

ছেলেটা তার শার্ট তুলে উপবাস-কুঞ্চিত পেট দেখিয়ে বললো—'বড্ড গরিব বাবু, কিছু খেতে পাই না—'

কোনো কাজের কথা নয়, তবু কেন কে জানে, শ্যামাকান্ত নিবৃত্ত হোলো। ছেলেটার কথাটাই কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো, কেমন অপ্রত্যাশিত। মেরে-মেরে শ্যামাকান্তরই নিজের দু-হাতে ব্যথা হয়ে গেছে, অথচ ছেলেটা মারের জন্যে কোনো অভিযোগ করলো না, বললে না—'ভীষণ লাগছে, হাড়গোড় চুরমার হয়ে গেল, আর পারছি না সহ্য করতে।' শুধু বললে—'গরিব, খেতে পাই না।' যেন লতা-পাতা ছেড়ে শিকড়ে গিয়ে সে টান মারলে।

শ্যামাকান্ত ছেড়ে দিলেও পুলিশ ছাড়লো না। শ্যামাকান্তরই নালিশে ও নিশানাদিহিতে ছোকরার তিন মাস জেল হয়ে গেল।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে, শ্যামাকান্ত বইয়ের দোকান ছেড়ে দোকান খুলেছে মনিহারি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে দোকান ক্রমেই জমে উঠেছে, তখন আরো একটা ছোকরা নেয়া দরকার। যেটা আছে—বিভূতি—খদ্দেরের ভিড় হলে সামলাতে পারে না একা। শ্যামাকান্তর এখন ভুঁড়ি হচ্ছে, নড়াচড়া না করতে পারলেই সে খুশি।

অনেকেই আবেদন করেছিল, কিন্তু তারাপদকে চিনতে শ্যামাকান্তর দেরি হোলো না। সেই বই-চোর তারাপদ, জেল-ফেরত। তখন শীতে গায়ে অন্তত র‍্যাপার একটা ছিল, এখন শীতে শার্টের বোতাম-কটাও সব নেই।

ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল তারাপদ। সেদিনকার ধরা পড়ার লজ্জার চেয়েও যেন বেশি। ঘাড় নিচু করে ঢোক গিলে আমতা-আমতা করে দু-একটা কথা কী বলে-না-বলে পালাতে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু কী মনে হলো শ্যামাকান্তর, কে জানে। ভাবলো, ওকেই বাঁচাই। গহ্বরের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, টেনে ধরে রাখি। জেলের ফটকটা চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিই।

একটা কাজের মতো কাজ করলো শ্যামাকান্ত। তারাপদকেই চাকরি দিল।

'তোমাকেই চাকরি দেবো।' শ্যামাকান্ত একটু গর্বের সঙ্গে বললে, 'ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তোমার শিক্ষা হয়ে গেছে। কী বলো? হয়নি?'

'হয়েছে।' অস্ফুটস্বরে বললে তারাপদ।

'তিন মাস জেল—কম কথা!' শ্যামাকান্ত আবার মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গি করলো : 'আশা করি, আর তোমার অমন দুর্মতি হবে না—আমারই বুকের ওপর বসে আমারই দাঁড়ি ছিঁড়বে না।'

'না, না, ছি ছি—' কুণ্ঠিত-কাতরমুখে বললে তারাপদ : 'যদি চাকরি পাই, কেন তবে আর অমন দুর্মতি হবে বলুন?'

'তাই তোমাকেই দিচ্ছি চাকরিটা। সৎপথে ভদ্রলোকের মতো থাকতে পারো, তারি জন্যে। তা ছাড়া, তোমাকে যেন সেদিন বেশি মেরেছিলাম, তাই না?'

লজ্জা ও কৃতজ্ঞতায় তারাপদ অধোমুখ হয়ে রইলো।

'তেমন যেন কারণ না ঘটে। যাও, কাল থেকেই কাজে জয়েন করবে। আপাতত ষোলো টাকা মাইনে দেবো, বুঝলে—ষোলো টাকা।'

সত্যি, তারাপদ বুঝতে পারেনি প্রথমটা। চাকরি, আশ্রয়, মাইনে, খাবার-সংস্থান, সর্বোপরি জীবনে এই প্রথম মর্যাদাবোধ—সব মিলে তার কাছে একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্ন বলে মনে হোলো। অন্ধকার-পথে যেন বাতি জ্বলে উঠলো, জেলের দেয়াল ভেঙে যেন বইতে লাগলো মুক্তির হাওয়া।

চতুর ও চটপটে—দুদিনেই মনিবকে খুশি করে ফেললে তারাপদ। কোথায়, কোন তাকে কোন জিনিস আছে, দুদিনেই তার মুখস্থ হয়ে গেল, সমস্ত জিনিসের দাম তার নখাগ্রে। একদিনের বেশি দুদিন তাকে ঠেকতে হোলো না, জিগগেস করতে হোলো না, হাওয়ার মুখে পালের মতো সে চালিয়ে নিলে। এতদিনের পুরোনো কর্মচারী যে বিভূতি, সে বরং মাঝে-মাঝে দামের জন্যে আমতা-আমতা করে কিন্তু তারাপদ একচুল কখনো টলে না, ঠিক-ঠিক বলে দেয় মন থেকে।

কিন্তু কেন কে জানে, এত বেশি কৃতিত্ব শ্যামাকান্তর পছন্দ হোলো না। একটু বেরঙ্গা বা সাদাসিধে হলেই যেন ভালো লাগতো। সব-কথায় একটু দোমনা-দোমনা ভাব করবে, একটু বোকাটে-বোকাটে ভাবে তাকাবে, ধমক খাবার মতো জায়গা রাখবে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে—তাহলেই ঠিক মানাতো তাকে; কিন্তু তারাপদর কাজ একেবারে নিখুঁত। শুধু তাই নয়, তাহলেও কিছু আসেতো-যেতো না—দোকানের কর্মচারীর পক্ষে সে অনেক বেশি তুখড়, পাকা, বুদ্ধিমান, বিভূতির চেয়ে তো বটেই, হয়তো শ্যামাকান্তরও চেয়ে।

তাই বাঁকা-চোখে মাঝে-মাঝে দেখতে হয় শ্যামাকান্তকে। যখন জিনিস-পত্র তারাপদ নামায় ও তুলে রাখে, তখন তো বটেই, যখন ক্যাশমেমো লিখে খদ্দেরের থেকে পয়সা গুনে নেয়, তখনো। দোকানে আগে ক্যাশমেমো থাকলেও তার কার্বন-কপি রাখবার রেওয়াজ ছিল না, তারাপদ আসবার পর থেকে সেটা চালু হয়েছে। চার পয়সার উপরে হলেই ক্যাশমেমো। তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলেই যে এটার প্রবর্তন হোলো, বুঝতে পারেনি তারাপদ, বরং বিক্রির বনিয়াদটা পাকা হোলো বলে সে সেটা সমর্থন করলে। শ্যামাকান্ত যখন বাজারে বেরোয়, ক্যাশের চার্জ দিয়ে যায় বিভূতিকে। তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলেই যে ক্যাশ তাকে ছুঁতে দিচ্ছে না, বুঝতে পারেনি তারাপদ, বরং বিভূতি তার চেয়ে পুরোনো ও বয়সে বড় বলে এটাই যে সমীচীন, তাতে আর তার সন্দেহ নেই। তবুও, সমস্ত সুশৃঙ্খল হলেও মাঝে-মাঝে কেমন যেন সে অনুভব করে, শ্যামাকান্তর চোখের দৃষ্টিটা যেন কুটিল, মুখের ভাবটা মৃত, আর ব্যবহারটা নিরুত্তাপ। অথচ তার কাজে কোথায় কী ত্রুটি হতে পারে, একেবারে ভাবতেই পারে না সে।

যত সে চোকস হতে যায়, ততই যেন শ্যামাকান্তর মন সন্দেহে ঘুলিয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই কোনো ফেরেব্‌বি মতলব আছে। দাগী—বলা যায় না। আরো কড়া পাহারা দরকার।

একদিন তাই শ্যামাকান্ত খোলাখুলি বলে ফেললে বিভূতিকে। বললে—

'আমি তো সবসময়ে দোকানে থাকি না, তুমি এবার থেকে একটু নজর রেখো ওর ওপর। স্টক কিছু না সরায়, এই শুধু ভাবি। তুমি একটু হুঁশিয়ার থেকো, বুঝলে!'

তারাপদকে বিভূতি নতুন-চোখে দেখলো, শ্যামাকান্তরই মতো চাউনিটা ঈষৎ বাঁকা করে। তারাপদ দেখলো বিভূতিরও হাবভাবে আকস্মিক অরুচি।

সেদিন বাজারে গিয়েছিল শ্যামাকান্ত, বিভূতি ছিল ক্যাশের চার্জে। রাতে দোকান বন্ধ করবার আগে ক্যাশ মেলাতে গিয়ে শ্যামাকান্ত দেখলো, বেশি নয়, দশ আনা পয়সার ঘাটতি। তলব পড়লো বিভূতির।

প্রথমটা বিভূতি হতভম্বের মতো মুখ করে রইলো। পরে কারণ খুঁজে পেয়েছে, এমনি উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'মাঝখানে আমি একবার মেসে গিয়েছিলাম আধঘন্টার জন্যে। তখন ক্যাশ ছিল তারাপদের জিম্মায়, তখন—'

কথাটা তার শেষ হতে পেলো না। শ্যামাকান্ত গর্জে উঠলো : 'সেই ফাঁকে তুমি সমস্ত দোষটা তারাপদর ঘাড়ে চাপিয়ে দাও আর কি! মজা মন্দ নয়। ভালো সুবিধে পেয়ে গেছ দেখছি। এ কারসাজি চলবে না বলে দিলুম, সাবধান!'

শ্যামাকান্ত এমন মোড় নেবে, বিভূতি ধারণাই করতে পারেনি, তাই সে থতমত খেয়ে গেল। তবু বললে, 'আমাদের দুজনের মধ্যে—'

'কাকে বেশি সন্দেহ করছি, তা নিয়ে তর্ক করতে চাই না। যেহেতু তুমি চার্জে ছিলে—তোমাকেই দায়ী করবো। তোমার মাইনে থেকে কেটে নেবো দশ আনা।'

বেশি দূরে ছিল না তারাপদ। সমস্তই সে শুনলে স্বকর্ণে, দেখলে চোখের উপর। বুঝলো, সে যে চোর, বিভূতির তা অজানা নয়; সে যে চোর, শ্যামাকান্ত তা ভুলতে পারেনি। আইনের কাছে তার অপরাধের চরম মার্জনা ঘটলেও মানুষের কাছে ঘটছে না। পুলিশ তাকে পথ ছেড়ে দিলেও মানুষ চোর বলে তার পথ আটকাচ্ছে। রাজার বিচারে দোষমুক্ত হয়েও প্রজার বিচারে সে আজো দোষী।

বিভূতির মাইনে কাটা গেলেও মাথাটা যেন কাটা যাওয়া উচিত ছিল তারাপদর—শ্যামাকান্তর এমনি মুখের চেহারা।

তারাপদর বিরস লাগতে লাগলো সমস্ত। যখনই শ্যামাকান্তর দিকে তাকায়, শ্যামাকান্তর উদ্যত দৃষ্টির সঙ্গে কঠিন সঙ্ঘর্ষ হয়। মনে হয়, শ্যামাকান্তও দেখছিল তোকে লুকিয়ে-লুকিয়ে। সব সময়েই একটা কুৎসিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাকে ঘিরে থাকে রাহুর গ্রাসের মতো। জিনিস যখন সে নামায়, যখন প্যাক করে, যখন দাম নেয়, যখন চেঞ্জ দেয়—সব সময়। যখন কোনো খদ্দের নেই, চুপ করে সে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে, তখনো। অথচ চাকরিটা ছেড়ে দেবে এমন তার সঙ্গতি নেই। চাকরিটা ছড়ে দেবারই বা বাস্তব কারণ কি!

সেদিন তারাপদর চেনা এক লোক এসেছিল বিয়ের সওদা করতে। তারাপদ কাজ করে, তাই এ দোকানে আসা। টাকা পঞ্চাশের জিনিস।

প্যাকেটে বেঁধে লোকের হাতে মাল দিচ্ছে, শ্যামাকান্ত বললে তারাপদকে, 'খোলো, আমি একবার দেখবো। ভুলে দু-এক পদ বেশি গেছে কিনা—'

'আমি ক্যাশমেমোর সঙ্গে দুবার করে মিলিয়ে নিয়েছি।'

'বলা যায় না। সেদিনও বিয়ের উপহার কিনবে বলেই তুমি এসেছিলে—সেই বইয়ের দোকানে।'

মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠলো তারাপদর। কিনতে এসেছিল যে লোক, পূর্ব-কাহিনী সে জানতো না কিছুই; কিন্তু তারাপদর মনে হোলো, পৃথিবীর কারু কাছে তার সেই কলঙ্ক আর অকথিত নেই। তার দিকে সকলেরই দৃষ্টি যেন কেমন ঘৃণার, একটু-বা অনুকম্পার।

জিনিস ঠিকঠাকই আছে, দামও বেশি ছাড়া কম নয়, যোগ নির্ভুল—তবু সাবধানের মার নেই। তারাপদ নতুন করে প্যাকেট বাঁধলো।

সেদিন শ্যামাকান্ত বললে—'দেখ, চার পয়সা পর্যন্ত দামের জিনিস তুমি বেচতে পাবে না, বিভূতি বেচবে।'

তারাপদ বুঝতে পারলো মর্মার্থ।

'অর্থাৎ যে জিনিসে ক্যাশমেমো দেবার নিয়ম নেই—যেমন নস্যি, লজেঞ্চুষ, নিব, পেন্সিল—অনেক কিছুই হতে পারে—সে-সব জিনিস বিক্রি করা তোমার বারণ হয়ে গেল।'

'আমি কি—' কী বলবে বুঝতে পারলো না তারাপদ।

'হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, কম-দামের জিনিসে ক্যাশমেমোর কড়াকড়ি নেই বলে তুমি বড্ড হাতখোলা হয়েছ। সেদিন দেখলুম, দু'পয়সায় এক খাবলা নস্যি দিলে, প্রায় দু-আনার মাল। আরো একদিন দেখেছি, চার পয়সায় লজেন্স্ হবে ষোলটা, তুমি দিলে প্রায় ডবল। ও-সব লোক তোমার সঙ্গে আগে থেকে ষড় করে এসেছে কিনা, তুমিই জানো।'

'সামান্য জিনিস—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সামান্য থেকেই অসামান্য হয়ে ওঠে। মুখে-মুখে তর্ক কোরো না। সন্দেহ করবার কারণ ঘটেছে বলেই সন্দেহ করছি। নইলে অত ছোট নজর আমার নেই। থাকলে চাকরি দিতুম না তোমাকে।'

তারাপদ চুপ করে গেল। সন্দেহ করবার কী কারণ জানতে চাইলো না।

সেদিন ব্যাপার উঠলো চরমে। দোকান বন্ধ করে সবাই বাড়ি ফিরছে, শ্যামাকান্ত হঠাৎ তারাপদকে বললে, 'তোমার পকেটে দেশলাই আছে?'

বলে তারাপদকে খোঁজবার অবকাশ না দিয়ে নিজেই তার পকেট হাটকাতে লাগলো—এমন-কি বুক-পকেট। ট্যাঁকে পর্যন্ত হাত দিলে।

হকচকিয়ে গেল তারাপদ—এমন রূঢ় ও অপমানকর সেই ব্যবহার। শ্যামাকান্ত যে দিয়াশলাই খুঁজছে না, তা বুঝতে তার বাকি নেই। বাড়ি যাবার আগে দোকান থেকে মাল সে কিছু সরায় কি না, এ শুধু তারই পরীক্ষা। কেননা বিভূতি তার নিজের পকেট থেকে দেশলাই বের করে দিলেও শ্যামাকান্ত নিলে

না হাত বাড়িয়ে। মনে হলো তারাপদর সাধুতায় সে যেন হতাশ হয়েছে।

যখন-তখন আকস্মিকভাবে শ্যামাকান্ত স্টক মেলায়। সাধারণত কিছু পায় না গরমিল, কিন্তু সেদিন পেলো—নারকোল তেল একটা কম।

গর্জন করে উঠলো : 'বিভূতি!'

বলা বাহুল্য, বিভূতি দোষ চাপিয়ে দিতে গেল তারাপদর কাঁধে।

'খবরদার, মিথ্যে কথা বোলো না। ছাই ফেলতে তুমি চমৎকার ভাঙা কুলো পেয়েছ দেখছি।'

'আমাকে যদি সন্দেহ করেন, তবে আমাকে ছাড়িয়ে দিন স্বচ্ছন্দে।'

'প্রমাণ পাবার আগে কাউকে আমি ছাড়াবো না। যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই তখন ওটার দাম তোমাদের দুজনেরই মাইনে থেকে সমান-সমান কাটা যাবে।'

তারাপদকে শুনিয়ে বিভূতি বললে, 'চোর নিয়ে বাস করে আমার যে মুস্কিল হোলো। এতদিন তো বেশ ছিলাম—'

তারাপদ মনে-মনে বললে, 'এতদিন যে মাছ ঢাকবার জন্যে শাক ছিল না।'

সময় হয়েছে, বিভূতির মাইনে বাড়লো দুটাকা।

বিভূতি বললে তারাপদকে, 'না, বাড়ালে চলে কি করে? তোমার কৃতকর্মের জন্যে আমি আর কত গুনাগার দিতে পারি?'

ভীষণ বাজলো তারাপদর, কিন্তু নিরুপায়, বাইরের বেকার জীবন সে জেনে এসেছে। চাকরিতে তাই তাকে টিঁকে থাকতে হবে; কিন্তু সে যে একদিন চুরি করেছিল, এ-কথা ভুলবে না এরা, তাকেও ভুলতে দেবে না?

এখন মাঝে মাঝে শ্যামাকান্ত আর বিভূতি নিভৃতে বসে গুজগুজ করে, তাকে নিয়েই নিশ্চয়; যে কেউ খদ্দের আসে, তাকেই যেন তারা গোপনে ডেকে চিনিয়ে দেয়। চোর—চোর—ঘরের সমস্ত জিনিস যেন তাকে সংকেত করে। পয়সা যখন সে নেয় খদ্দেরের হাত থেকে, মনে হয়, সেটা ক্যাশে না দিয়ে অজান্তে নিজের পকেটে ফেলবে; ফিরতি যখন সে দেয়, মনে হয়, কিছুটা যেন সে হাত-সাফাই করে সরিয়ে রাখবে চুপিচুপি। রাস্তায় যখন সে চলে, তার পিছনে পায়ের শব্দ শুনে মনে করে, তাকে কারা ধরতে আসছে। রাতে যখন সে নিঃশব্দে তার ঘরে ঢোকে, মনে হয়, সে চুরি করতে ঢুকেছে। ঘুমের মধ্যে চুরির স্বপ্ন দেখে।

সেদিনও শ্যামাকান্ত গিয়েছিল বাজারে, বিভূতি ছিল ক্যাশের চার্জে। সেদিনও বিভূতি মাঝখানে উঠে গেল তার মেসে, ক্যাশের ভার তারাপদকে হস্তান্তর করে।

বিভূতি এবার দশ আনার জায়গায় দশ টাকা সরিয়েছে, কিন্তু তারাপদ গুনে দেখলো—নোটে-টাকায় মিলে এখনো আটানব্বই টাকা।

বিভূতি ফিরে এসে দেখলো দোকানে তারাপদ নেই, ক্যাশবাক্সও উধাও।

ধর—ধর রব পড়ে গেল, আর তারাপদ ধরা পড়লো দিনসাতেক পরে যশোরের এক গণ্ডগ্রামে।

এবার আর হাতের সুখ করতে পেলো না শ্যামাকান্ত। শুধু একটা সঘৃণ কটাক্ষ করে বললে, 'এত উপকারের বিনিময়ে এই প্রতিদান!'

কান্নার ভিতর থেকে বললে তারাপদ, 'কেন তবে ভুলতে দিলেন না আমাকে যে, আমি একদিন চুরি করেছিলাম? কেন সব সময়ে সন্দেহ করে-করে আমাকে প্রস্তুত করে রাখলেন যে, আমি চোর, যে-কোনো মুহূর্তে আমি চুরি করতে পারি? কেন বিশ্বাস করলেন না আমাকে? বিশ্বাসের আলোয় কেন আমার অতীত কলঙ্ক মুছে দিলেন না?'

উৎফুল্ল হয়ে খবর নিয়ে এল বিভূতি, তারাপদর এবার পুরো এক বছর জেল হয়েছে।

শ্যামাকান্ত বললে—'তোমাকে জেল দিতে পারবো না বটে, কিন্তু একটি শেল দিতে পারবো। ইংরিজি, বাংলা,—যে শেল তোমার পছন্দ।'

বিভূতি শূন্যে হাতড়াতে লাগলো।

'এক কথায় আজ এইখানে তোমার চাকরিও খতম হোলো। এই মুহূর্তে—বিনা-নোটিশে। এই ক'দিনের মাইনে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

গাল চুলকোতে-চুলকোতে বিভূতি বললে, 'অপরাধ?'

'আপরাধ, তোমারই সঙ্গদোষে তারাপদ আবার চোর হোলো।'

'আমারই সঙ্গদোষে! আমিই বরং চোরের সঙ্গে থেকে-থেকে প্রায় চোর বনে যাচ্ছিলাম।'

'না, তোমার একার দোষ নয়। আমিও ছিলুম তোমার পাশে-পাশে। ও চোর, এই কথা সর্বক্ষণ বলে-বলে আমরা ওকে বুঝিয়েছি, চোর ছাড়া ও আর কেউ নয়। ঠেলে-ঠেলে শেষকালে ওকে আমরা ফেলে দিলুম সেই গহ্বরে। আমি প্রকাশক থেকে মনিহারি হলাম, তুমি হয়তো সেল্‌স্‌ম্যান থেকে মিনিস্টার হবে, কিন্তু তারাপদ আজও চোর, কালও চোর। তোমার শাস্তি তুমি আমার হাত থেকে নাও, আর আমার শাস্তি স্বয়ং বিধাতার হাতে তৈরি হচ্ছে।'

৪৯। ত্রাণ

'এবার বলতে হয়।' প্রায় কানে কানে বলার মত করে বললে সুগত।

'ওরে বাবাঃ।' মালিনী আঁতকে উঠল।

'সে কী। বলতে তো হবেই।'

'তা হবে। কিন্তু এখন নয়।' দু-চোখে মিনতি পুরে তাকাল মালিনী।

'বা, শুভস্য শীঘ্রং।'

'তা ঠিক। তবু, আগে বিয়েটা হোক।'

'বা, বিয়ের আগেই তো বলে। কত আগে থেকেই জানাজানি হয়। চিঠি

ছাপায়।' সুগত বললে ভরাট গলায়, 'আমরা যখন স্থির করেছি, বলতে পারো আমরা যখন স্থির হয়েছি, তখন আর গোপন করে রাখবার কী দরকার?'

'কিন্তু এই কাঁচা অবস্থায় বাবাকে বলতে সাহস হচ্ছে না।' মালিনী মুখ মেঘলা করল।

'কাঁচা অবস্থা মানে?'

'কাঁচা অবস্থা মানে, বিয়েটা তো এখনো রেজেস্ট্রি হয়নি—'

'হয়নি তো হবে।' অনিবার্যের সুর আনল সুগত।

'তা আগে হোক। নিশ্চিন্ত হই। সিদ্ধ হোক, সমাধা হোক বিয়েটা।'

'কিন্তু এখন বললে কী হবে?'

'তুমি তো আমার বাবাকে জানো না। এখন বললে বাবা আমাকে মারবে।'

'মারবে?' অন্ধকারে যেন ভূত দেখেছে এমনি হতজ্ঞানের মত চেঁচিয়ে উঠল সুগত।

পথ চলছিল দুজনে। চড়কডাঙার মোড় থেকে সুরু করে রাসবিহারী পর্যন্ত এসেছে। কোথাও বসবার জায়গা পায়নি, না পার্কে না বা কোনো রেস্তরাঁয়। ভিড় আর ভিড়, লাইন আর লাইন। যত সব জটিল জটলা। টালিগঞ্জের ব্রিজের মাথায় রেল লাইন ধরে নির্জনে যাওয়া যায় বটে কিন্তু নির্জনে আবার গুণ্ডার ভয়। গুণ্ডা ধরা পড়লেও ভয়। কোর্টের কেলেঙ্কার। একটা ট্যাক্সি নেওয়া যায় বটে, কিন্তু দৈবাৎ দুর্ঘটনা ঘটলে খবরের কাগজের হেডলাইন। সেই জানাজানির লজ্জা।

তার চেয়ে এই টানা লম্বা হাঁটাই ভালো। আলস্যে ঘনীভূত হলেই লোকে সন্দেহ করে। এ বেশ ছাড়াছাড়ি রেখে পথ চলা। কেউ অনুমানও করবে না তারা বাজারের কথা, অফিসের কথা বা আবহাওয়ার কথা না বলে বিয়ের কথা বলছে।

গানের ইস্কুল থেকে বেরিয়েই সমানে তারা হাঁটছে দক্ষিণে।

কিন্তু, যে যাই ভাবুক, এবার হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল সুগত। 'মারবে কী বলছ? গায়ে হাত তুলবে? এত বড় মেয়ের গায়ে হাত কেউ তুলতে পারে কখনো?'

মালিনীকেও দাঁড়াতে হল কাছ ঘেঁষে। বললে, 'তুমি জানো না—'

'জানি না মানে?'

'যেই বাবা শুনবেন, নিজের জাতে বিয়ে করছি না, খেপে যাবেন, তুমুল করবেন—'মুখখানি ম্লান করল মালিনী।

'নিজের জাতে বিয়ে করছ না মানে?' সুগত দাঁড়াবার ভঙ্গিতে দৃপ্তি আনল : 'পৃথিবীতে তো শুধু এক জাত আছে। সে জাতের নাম মানুষ জাত। মানুষে-মানুষে বিয়ে হতে বাধা কী!'

'ওসব কথা বাবা কানেও তুলবেন না।' শীর্ণ রেখায় হাসবার চেষ্টা করল মালিনী : 'যেই শুনবেন বামুন হয়ে কায়েতের ছেলেকে নির্বাচন করেছি

অমনি রেগে চণ্ডাল হয়ে উঠবেন। আর জানো তো রাগী-মানুষের চোখও নেই কানও নেই। তাই দাউ করে জবলে উঠে দু'-ঘা বসিয়ে দেবেন এটা মোটেই আশ্চর্য নয়।'

'বা, তুমি সাবালক নও?'

'তা কে অস্বীকার করবে? আর আইনে যে অসবর্ণ বিয়ে সিদ্ধ, এই বা খণ্ডাবে কে? তবু বাবা না শুনবে যুক্তি না বুঝবে আইন। ঝপ করে কোপ বসিয়ে দেবে।'

'কেন, তিনি কি তোমার গার্জেন?'

'আইনের চোখে হয়তো নন, কিন্তু শত হলেও তাঁর বাড়িতে তাঁর আশ্রয়ে আছি, তিনি জোর খাটাবার একটা সুবিধে পাবেন নিশ্চয়ই।' মালিনী সন্নিহিত হবার কৌশলে ইলেকট্রিক পোস্টটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল, যেন পোস্টের ব্যবধানের দরুন ওদের অসম্পৃক্ত দেখাবে। 'তা ছাড়া মারধোর কী, হয়তো ঘরে আটকে রাখবেন, বাইরে পাচার করে দেবেন, নয়তো জোর করে ধরে-বেঁধে অস্থানে-অপাত্রে বিয়ে দিয়ে দেবেন।'

'বদ্‌নার মুলুক চলে গিয়েছে, এ কি এখন মগের মুলুক'? সুগত ঘাড় বাঁকা করে তাকাল।

'তার চেয়েও খারাপ, গাড়ুর মুলুক।' চোখের সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে মালিনী বললে, 'ওজনে ভারী, ঠাটে সনাতন আর জলের বেলায় ছিড়িক-ছিড়িক।'

'তা হলে কি বলছ তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব?'

'ছি, পালিয়ে যাব কেন? আমরা বিয়ে করতে চেয়ে কি কোনো অপরাধ করেছি?'

'তবে?'

আবার হাঁটতে সুরু করল দুজনে।

'আমি বলছি আগে বিয়েটা হোক', দু-চোখ উজ্জবল করল মালিনী: 'তারপর একদিন আস্তে-সুস্থে বাবাকে বলি।'

'আস্তে-সুস্থে বলবে, কিন্তু তোমার বাবা যদি শোনামাত্রই দেন দু-ঘা!'

'সাহস পাবেন না। কেননা, আমি তখন একজনের স্ত্রী। মানে তোমার স্ত্রী।'

'তা দু ঘা বসিয়ে দিতে আপত্তি কী! বসিয়ে দিলে কী করতে পারো?'

'বা, তখন তুমি করবে।'

'আমি করব?'

'হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীকে যদি কেউ আঘাত করে সে তো তোমার স্বামিত্বকে, তোমার স্বত্বকে আঘাত করা। তখন তার প্রতিকার তোমার হাতে।'

'ঠিক বলেছ। তা হলে চুপিচুপি বিয়েটা আগে শেষ হয়ে যাক। তারপরে মিউজিক ফেস করা সহজ হবে।'

'সহজ হবে যেহেতু যা অবার্য তাকে আর বারণ করা যাবে না। কিন্তু,'

চলতে চলতে ঘেঁষে এল মালিনী : 'সাক্ষী পাবে কোথায়? তারা যদি বলে দেয়।'

'তোমার কী বুদ্ধি! সাক্ষী তো নোটিশে নয়, সাক্ষী একেবারে পাকা দলিলে। তখন তো কর্ম ফতে। তখন তো জানাবেই জগজ্জনকে জানাবে।' এবার সুগত ঘেঁষে এল : 'আমার অফিসের বন্ধুরা সাক্ষী হবে। ইন্দ্রনাথ তো আবার তোমার দাদারও বন্ধু।'

'রেজেস্ট্রির আগে কিন্তু ভেঙো না তার কাছে।'

'মাথা খারাপ!' সুগত সরে গেল : 'আচ্ছা, তোমার মার কথা তো কিছু বললে না—'

'তাঁর শুধু কান্না। স্বামীর জন্যেও কাঁদবেন, মেয়ের জন্যেও কাঁদবেন।'

'আর তোমার দাদা? শশাঙ্ক?'

'জানি না। চুপচাপই থাকবে বোধহয়।'

চুপচাপই বিয়ে হয়ে গেল।

দলিলে সই করে মালিনী এমন সহজে বাড়ি ফিরল যেন গানের ইস্কুল থেকে গিটার বাজিয়ে আসছে আর সুগত যেন ফুটবল ম্যাচ দেখে।

একটা ফুল নয়, এক কণা আলো নয়, এক পেয়ালা চা পর্যন্ত নয়। শুধু একটা দস্তখতেই কিস্তিমাত। মানচিত্রে দাগ টেনে দিয়েই স্বাধীনতা।

এবার বলতে হয় মালিনীর বাবাকে, কান্তিবাবুকে। কান্তিবাবু একটা অনুষ্ঠান করতে চান তো করুন, নয়তো প্রণামের বিনিময়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সুগত মালিনীকে তার ঘরে তুলুক।

ইন্দ্রনাথ কথাটা প্রথমে শশাঙ্ককে বললে।

'তুমি জানলে কী করে?'

'আমি যে দলিলে সাক্ষী। সার্টিফিকেটটা দেখবে?'

'বাবাকে দেখাও গে।' ফেটে পড়তে চাইল শশাঙ্ক।

'তোমার বোনের কীর্তি তুমি বললেই তো ভালো হয়।'

'সব কীর্তি সে বলুক।' শশাঙ্ক এমন ভাব দেখাল যেন মালিনীর মুখ-দর্শনও পাপ : 'আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, কিছুর মধ্যেই নেই।'

অগত্যা ইন্দ্রনাথই কান্তিবাবুর সম্মুখীন হল।

শশাঙ্কর বন্ধু হিসেবে এবাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল ইন্দ্রনাথের, তাকে তাই চিনতেন কান্তিবাবু। কিন্তু এমন বিরলে সরকারী ভাবে তাঁর ঘরে ঢুকবে ভাবতে পারতেন না।

কী খবর? এটুকু প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করলেন। যদি বক্তব্য থাকে ও-পক্ষই বলবে। না থাকে চলে যাবে।

যেন কী এক ভয়াবহ শোকের সংবাদ ভাঙতে এসেছে এমনি একটা স্তব্ধ মুখ করে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রনাথ। তা থাকো দাঁড়িয়ে, কৌতূহলের খোঁচা মারবার মত উৎসাহ নেই কান্তিবাবুর।

'আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছিলাম।' পরিবেশ এমনিতেই যথেষ্ট থমথমে, তায় ইন্দ্রনাথ স্বর গম্ভীর করল।

'কী খবর?' এবার চঞ্চল হলেন কান্তিবাবু।

ইন্দ্রনাথ চুপ করে রইল। তারো চেয়ে বেশি, নত চোখে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে।

'কী খবর? কার খবর?' কান্তিবাবু উত্তেজনায় পিঠ খাড়া করলেন চেয়ারে। একবার ভাবতে চেষ্টা করলেন কোন দিকে অনুমান পাঠাবেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটা। ছুটির দিন, অফিসের তাড়া নেই। খানিক আগেও বাড়ির সবাইকে বহাল তবিয়তে দেখেছেন। স্ত্রী, এক ছেলে আর মেয়ে এই নিয়েই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংসার। সকলে তাঁর চোখের উপরে। বাইরে এমন কেউ নেই যার সম্পর্কে তিনি উচাটন হতে পারেন, হতে পারেন শশব্যস্ত।

'কী, কিছু বলছ না কেন? কার খবর?'

'মালিনীর খবর।' হাসতে চেষ্টা করল ইন্দ্রনাথ।

'তার আবার কী খবর?' কান্তিবাবু ভুরু কুঁচকোলেন : 'সে তো বি-এ পাশ করেছে—'

'না, পাশ-ফেলের খবর নয়।'

'তবে তার আর খবর কী! এম-এ যদি পড়তে চায় তো পড়বে—'

'না, তাও নয়।'

'তবে?'

'সে বিয়ে করেছে।'

'কী করেছে?' হিব্রু শুনছেন না গ্রীক শুনছেন সহসা ঠাহর করতে পারলেন না কান্তিবাবু।

'বিয়ে করেছে।'

হো-হো করে হেসে উঠলেন কান্তিবাবু : 'আমি জানলাম না, শুনলাম না, আর তার বিয়ে হয়ে গেল?'

'একরকম বিয়ে আছে, যা মা-বাপকে না জানিয়ে-শুনিয়েও করা যায় আজকাল। সেইরকমই একটা বিয়ে করেছে মালিনী।' ঘুঘু হবার চেষ্টা করল ইন্দ্রনাথ।

'সে আবার কী বিয়ে।' কান্তিবাবু হতভম্বের মত মুখ করলেন।

'জানেনই তো রেজেস্ট্রি বিয়ে।'

'মিথ্যে কথা।' স্বরূপে গর্জন করে উঠলেন কান্তিবাবু।

'মিথ্যে নয়। বিয়ের ডকুমেন্ট আমার পকেটেই আছে। আমি তাতে সাক্ষী।'

'বাজে কথা।' নিচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল কান্তিবাবুর : 'ডকুমেন্ট জাল। মালিনী অমন ঘৃণ্য কাজ করতে পারে না।'

'ঘৃণ্য কাজ?'

'একশোবার ঘৃণ্য। বাপ-মাকে না জানিয়ে, তাদের মত না নিয়ে গোপনে

পারে না সে বিয়ে করতে। না, পারে না। বিশ্বাস করি না।' হুঙ্কারে প্রবলতর হলেন কান্তিবাবু।

ইন্দ্রনাথের ইচ্ছে হল সার্টিফিকেটটা বার করে পকেট থেকে। কিন্তু যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন, হয়তো ভালো করে না দেখে না বুঝেই ছিঁড়ে ফেলবেন টুকরো টুকরো করে।

'কেন এতে অবিশ্বাসের কী আছে?'

'আগাগোড়া অবিশ্বাস্য। মালিনী এত খারাপ নয়। অসৎ নয়।'

ইন্দ্রনাথ এবার তপ্ত হল। বললে, 'তাকে স্বাধীনতা দেবেন এটা খুব সৎ আর সে সেই স্বাধীনতার ফল নিতে গেলেই সেটা অসৎ হয়ে যাবে?'

'বলি কাকে বিয়ে করেছে? তোমাকে?' তাক-করা পিস্তলের মত উদ্যত হয়ে রইলেন কান্তিবাবু।

'সে কী কথা! আমি তো সাক্ষী।'

'তা স্বাধীনতার যুগে সাক্ষীকে বিয়ে করতেই বা বাধা কী!' কান্তিবাবুর ক্রোধ এবার বিদ্রূপের চেহারা নিল : 'বিয়ের সভায় কনে বললে বরকে নয়, সাক্ষীকে বিয়ে করব।'

'আমার কথা ওঠে না।' আমি বিবাহিত।'

'হিত-মিত উঠে গেছে আজকাল। একটা কিছু ধরে ঝুলে পড়লেই হল।' চোখের দৃষ্টি আগুন করলেন কান্তিবাবু : 'তোমাকে নয় তো কাকে বিয়ে করল?'

'আমাদেরই অফিসের এক য়্যাসিস্টেন্ট সুগত ঘোষকে।' স্পষ্ট বললে ইন্দ্রনাথ।

'কি বললে, ঘোষাল?'

'না, ঘোষ।'

'য়্যাবসার্ড। বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতের ছেলেকে বিয়ে করে কী করে?'

আহা কী প্রশ্ন! যেন হাবড়ার পোলের তলা দিয়ে জল যায় কী করে!

'কেন, অমন বিয়ে তো আইনে অসিদ্ধ নয়।'

'বহু কুকর্মই তো আইনে অসিদ্ধ নয়।' রাগে ফুলতে লাগলেন কান্তিবাবু : 'যাদের জন্যে ল্যাম্পপোস্ট ফাঁসিকাঠ হবার কথা ছিল তারা আজ ফাঁসিকাষ্ঠকেই ল্যাম্পপোস্ট বানিয়েছে। কথাটা আইনের নয়, নীতির। কী নাম বললে?' নাম নয়, যেন পদবীটাই শুনতে চাইলেন।

নামটা আবার বললে ইন্দ্রনাথ।

'মরে গেছে, আমার মেয়ে মরে গেছে।' চেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন কান্তিবাবু। চোখ বুজলেন।

না, নিশ্বাস পড়ছে। ইন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হল। বললে, 'সুগত বেশ ভাল ছেলে। এম-এ পাশ। মাইনেও বেশ ভালো পায়। দেখতেও সুদর্শন। মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা—'

দেখল, দু-হাতে কান চেপে ধরেছেন কান্তিবাবু। বলছেন আর্তস্বরে, 'আর কিছু শুনতে চাই না। ঘোষ—ঘোষ। মেয়ে আমার মরে গেছে, মরে গেছে—'

'মরে যাবে কেন? ঐ তো এসেছে আপনার কাছে।' দোরগোড়ায় মালিনীকে এসে দাঁড়াতে দেখে অনেকটা হালকা হল ইন্দ্রনাথ।

'বেঁচে আছে? কোথায়?' ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলেন কান্তিবাবু : 'তা হলে ও বলুক এতক্ষণ যা শুনেছি সব বাজে কথা। ইন্দ্রনাথের পকেটে যে ডকুমেন্টটা আছে বলছে, সেটা বিয়ের ডকুমেন্ট নয়। বলুক সেটাতে মালিনী সই করেনি—'

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সহসা মালিনীর উপর দৃষ্টি স্থির হল কান্তিবাবুর। জিগগেস করলেন, 'কী, কী বলছে ইন্দ্রনাথ?'

'সব ঠিক বলেছেন, বাবা।' বাধ্য মেয়ের মত শান্ত মুখে বললে মালিনী।

'ঠিক বলেছে?' এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে কান্তিবাবু হঠাৎ টেবিলের উপর কী একটা কাজে মন দিতে চাইলেন। নিচু চোখেই লক্ষ্য করলেন ইন্দ্রনাথকে। বললেন, 'তবে আর দেরি করছ কেন? যখন সব শেষ হয়েই গিয়েছে তখন আর মিছিমিছি শোক কিসের? নিয়ে যাও মেয়েটাকে।'

'কোথায় নিয়ে যাব?'

'কোথায় আবার! শ্মশানে। মরলে পরে যেখানে নিয়ে যায় বেঁধে-ছেঁদে।' কান্তিবাবু কাজে চোখ ডোবালেন।

'বা, আমি নিয়ে যাবার কে।' ইন্দ্রনাথ আহত স্বরে বললে, 'যার জিনিস সে এসে নিয়ে যাবে।'

'তাহলে ঐ ডোমটাকে ডাকো। বা, ডাকবারই বা কী দরকার!' খাতাপত্রের পৃষ্ঠা ওলটালেন কান্তিবাবু : 'মেয়েটাই যাক না বেরিয়ে। যখন একবার গেছে তখন আধখানা পা বাইরে আধখানা পা ভেতরে কেন? পুরোপুরিই আউট হয়ে যাক।'

কী আশায় দাঁড়িয়েছিল কে জানে, মালিনী দ্রুত পায়ে চলে গেল ভিতরে।

তবু এখুনি হাল ছাড়ল না ইন্দ্রনাথ। বললে, এ প্রায়ই দেখা গেছে যে, এরকম ব্যাপারে গোড়ায় সব বাপ-মাই কঠিন হয়, বিমুখ থাকে, কালক্রমে সঙ্কল্পের ধার ক্ষয়ে যায়, মেয়ে-জামাইকে স্বীকার করে নেয়। ভবিষ্যতে তাই যখন হবে তখন এ নির্দয়তা কেন?

'হবে না।' হুঙ্কার ছাড়লেন কান্তিবাবু।

ইন্দ্রনাথ আরো বললে। আইনে যখন এ বিয়ে বৈধ তখন একটা অনুষ্ঠান করাই শোভন হবে। কান্তিবাবুর সম্ভ্রান্ততাও তাই দাবি করে। অনুষ্ঠান করে তার আত্মীয়বন্ধুবর্গের একটা প্রকাশ্য সমর্থনই তো তাঁর আদায় করা উচিত। তা ছাড়া মেয়েটার মনেও তো একটা উৎসবের বাসনা আছে। তাকে উপবাসী রাখা কেন?

কান্তিবাবু আবার হুঙ্কার ছাড়লেন : 'অসম্ভব।'

'বেশ, তবে সুগতকে ডাকি, ও এসে আপনাদের প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে নিক।'

'খবরদার। ওর স্পর্ধা কী, ও আমাদের পা ছোঁয়!' লাল চোখ তুললেন কান্তিবাবু : 'ও যদি এ বাড়ি ঢোকে, বলে দিও, অপমান হয়ে যাবে।'

নিজেই হুড়মুড় করে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। বাড়ির ভিতর এসে পড়লেন। মালিনীকে বললেন, 'যেখানে বিয়ে করেছ সোজা সেখানেই চলে যাও। যদি আগে আমরা নেই, পরেও আমরা নেই।'

'এখুনি চলে যাব, বাবা?'

'এখুনি। একবস্ত্রে।' হুকুম দিলেন কান্তিবাবু।

হাতে গলায় কানে যে সামান্যতম গয়না ছিল তাও খুলে দিতে যাচ্ছিল, মা কেঁদে উঠলেন।

কান্তিবাবু বললেন, 'সব খুলে দিয়ে যাবে। শ্মশানে পাঠাবার আগে গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে রাখে সংসার। নইলে ছিটেফোঁটা যা থাকবে সব ডোম নেবে। ডোমে নিলে আমার সহ্য হবে না।'

গয়নার ছোঁয়াচটুকুও না রেখে একবস্ত্রে চলে গেল মালিনী।

ইন্দ্রনাথ শশাঙ্ককে এসে ধরল। বললে, 'ভেবেছিলাম তুমি মেয়েটার পক্ষ নেবে। তাকে এই লাঞ্ছনার থেকে বাঁচবার জন্যে তার হয়ে লড়বে তুমি।'

'ওরে বাব্বাঃ, আমি লড়ব? বাবার বিরুদ্ধে?' শামুকের মত গুটিয়ে গেল শশাঙ্ক।

'একশোবার লড়বে। বিদ্রোহ করবে। সমাজের ওসব সনাতনী ফসিলকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সমুদ্রে। নইলে আর তুমি এ যুগের যুবক কী?'

'যাও, বাজে কথা বোকো না, নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও।' শশাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে নিল।

সেই রাত্রেই কান্তিবাবু নিশ্চিন্তমনে উইলের খসড়া করলেন। এমনিতে মেয়েটাকে প্রত্যাখ্যাত করতেন কী করে, যদি জাত-ধর্মে ঠিক ঠিক বিয়ে করত? প্রত্যাখ্যাত করলেও মেয়ের মনে ক্ষোভ থাকত, পাছে কোথাকার কে পরের বাড়ির ছেলে এসে সম্পত্তিতে ভাগ বসায় তারই জন্যে আমাকে ঠকিয়েছে। সে-ক্ষোভে ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব দূরের কথা, মুখ-দেখাদেখিও থাকত না। কিন্তু এখন? এখন মালিনীকে উৎখাত করবার সুন্দর অজুহাত পাওয়া গিয়েছে। ঘোষাল হলেই বুক চচ্চড় করত, আর এ তো ঘোষ, মালিনী এক্ষেত্রে সহজেই ভাবতে পারবে, বাবা তাকে ন্যায্য কারণেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। শত হলেও বাবা সেকেলে মানুষ, যুগের প্রয়োজনে প্রেমের প্রয়োজনেই তাঁর সে-সংস্কার সে মান্য করতে পারেনি, তাই সব সময়ে নিজেকে সে অপরাধী বলে ভাববে। আর তাই যখন সে দেখবে বাবা তাকে সম্পত্তির কাণাকড়িও দেননি, উইল করে সব-কিছু একা দাদাকেই দিয়ে গিয়েছেন, তখন সে এতটুকুও ক্ষুব্ধ হবে না। নিজেকে বঞ্চিত ভেবে প্রার্থনাও করবে না ঈশ্বরের কাছে।

সম্পত্তি পায়নি বলে যদি মনে ক্ষোভ রাখে তা হলে আর প্রেম কী!

গভীর রাত্রে পায়চারি করছিলেন কান্তিবাবু। স্ত্রীকে জাগালেন ঘুম থেকে। বললেন, 'মালিনী আমাদের খুব ভালো মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে—'

ধড়মড় করে উঠে বসলেন মহামায়া।

'আমাদের একটি পয়সাও খরচ করাল না।' অন্ধকারে হেসে উঠলেন কান্তিবাবু : 'প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিল। হয়তো বা আরো বেশি। আর এত লক্ষ্মী—'

মহামায়া অন্ধকারে দেখতে লাগলেন চারদিক।

'আর এত লক্ষ্মী গায়ের শেষ সোনাটুকুও ফিরিয়ে দিল।'

তারপর কী হল?

বলা নেই কওয়া নেই, একদিন শশাঙ্ক অপর্ণা নাগকে বিয়ে করে ঘরে আনল।

'কাকে?' কান্তিবাবু বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলেন।

'নাগকে।'

'তুই—তুই—' কথা শেষ করবার আগে কান্তিবাবুর মুখ সবলে চেপে ধরলেন মহামায়া।

বললে, 'তুমি মেয়েকে পর করে দিয়েছ, ছেলেকে পর করে দিতে পারবে না। কখনোই না। ছেলেই তো সব। ছেলের জন্যেই তো যত কিছু। ছেলে না হলে আমাদের দেখবে কে, নাম-ধাম-বংশ রাখবে কে? না, আর তুমি নিষ্ঠুর হতে পারবে না। কিছুতে না।'

বেরিয়ে যা বলতে পারলেন না কান্তিবাবু। কথাটা গিলে ফেললেন।

'এবার আমি অনুষ্ঠান করব। ঢালাও নিমন্ত্রণ করব। কিছু বলতে পারবে না বলে রাখছি।' মহামায়া আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

তবু মধ্যরাত্রে কান্তিবাবু চুপিচুপি উঠলেন বিছানা থেকে। আলমারি খুলে বার করলেন উইল। ভাবলেন, ছিঁড়ে ফেলি। ভাবলেন এক অপরাধে অপরাধী ছেলে-মেয়েতে কেন আর তফাৎ করি। আইন যাকে যা দিয়েছে তাই দুজনে নিক ভাগাভাগি করে।

যা হবার হোক আমি নিরপেক্ষ থাকি।

না! মেয়ে কে? ছেলেই তো সব, ছেলেই তো ষোল আনা।

উইলটা আবার ভেতরের ড্রয়ারে রেখে আলমারির দরজা বন্ধ করলেন কান্তিবাবু।

শুলেন নিশ্চিন্ত হয়ে। শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

৫০ । পিক-আপ

'এক গুলি এক চিড়িয়া।' রামেন্দ্র প্রায় হুঙ্কার করে উঠলো।

'তার মানে?' গঙ্গাধর তাকিয়ে রইল বিহ্বল হয়ে।

মানে এক বক্তা এক গাড়ি। বুঝলেন ব্যাপারটা?

'বুঝেছি।' হাসল গঙ্গাধর।

'বোঝেননি। সেবার কি হয়েছিল তবে শুনুন।'

শুনতেই হবে, যখন গঙ্গাধর উপযাচক হয়ে এসেছে বাড়িতে।

'সেবার একই গাড়িতে আমাকে আর মঠের কোন এক সাধুকে যুগল বক্তারূপে নিয়ে গেল।' রামেন্দ্র বলতে লাগল : 'সে কোথায় শুনুন। ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে রেললাইন পেরিয়ে সে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। পান্ডবদের টুর-চার্টের বাইরে। ভাবলাম সাধুসঙ্গে যাতায়াত নির্বিঘ্ন হবে। কিন্তু কি ভাবে বিপদটা যে এল ভাবতেও পারবেন না।'

'কোনো য়্যাকসিডেণ্ট?' উপযাচক যখন, ভাবতে চেষ্টা করল গঙ্গাধর।

'ওসব মামুলি কিছু নয়। অভিনব।' আবার খেই ধরল রামেন্দ্র : 'দুজনে গল্প করতে করতে বেশ একসঙ্গে গেলাম। বাঁয়ে শেয়াল দেখেছিলাম কিছু আটকালোনা। সভায় আমি প্রধান অতিথি, সাধুবাবা সভাপতি। ফেরার পথে ডাইনে যেন সাপ দেখি, সমস্ত শুভ হয়, এই কামনা করে উঠলাম বক্তৃতা দিতে। কিন্তু আমি যদি বা ঘন্টাখানেকের মধ্যে শেষ করলাম, সাধুবাবা দু'ঘন্টায়ও ক্লান্ত হয় না। ভাবলে আমি বুঝি বা পাদপ্রদীপের সমস্ত আলো নিয়ে নিলাম, তাই একেবারে মশাল জেলে ধরল। বক্তৃতার মশাল। লোকদের বললাম, নটা বেজে গেছে, এবার আমাকে বাড়ি নিয়ে চলুন। তাঁরা বললেন, ওঁর বক্তৃতা শেষ না হলে যাই কি করে? দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের মোটে একখানা গাড়ি। দুজনকে একসঙ্গে ফিরিয়ে দেব। তার মানে? সাধুবাবা যদি এখন রাত দশটা পর্যন্ত চালায়, আমাকে রাত দশটা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে? এগারোটা পর্যন্ত? সাধুবাবার কি! বাড়ি নেই, ঘর নেই, কাজকারবার নেই, বাড়িতে চিন্তিত হবার স্ত্রীপুত্র নেই, একবারে নির্ভেজাল। তার সঙ্গে কি আমার তুলনা চলে? তা কি করব বলুন। আমরা নিরুপায়। আমাদের দুই পাখি এক ঢিল। যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। তাই ঠিক করেছি' রামেন্দ্র নিষ্ঠুর মুখে বললে, 'এক বক্তা এক গাড়ি। এক গুলি এক চিড়িয়া।'

'ঠিক আছে।' নম্রতায় গলে গিয়ে হাসল গঙ্গাধর, 'আপনার জন্যে একখানা গাড়িই থাকবে। আপনি প্রথমেই বলবেন আর আপনার বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্রই আপনি চলে আসবেন। কারু জন্যে আপনাকে ডিটেনড হতে হবে না।'

'সেবার আবার কি হয়েছিল যদি শোনেন—'

বক্তা যখন, অনেক কিছুই বকবে, জিভ ছোটাবে—গঙ্গাধর তাই উৎসাহ দেখাল না। বললে, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমিই গাড়ি নিয়ে আসব। ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

'একক গাড়ি।' তর্জনী তুলল রামেন্দ্র।

ঠিক দিনে ঠিক সময়ে গঙ্গাধর গাড়ি নিয়ে এল। গাড়িতে গঙ্গাধর আর ড্রাইভার।

জি-টি রোড ধরে মোটরে প্রায় আড়াই ঘন্টার পথ। সন্ধ্যে ছটার সময় সভা, তাই বেলা তিনটে নাগাদ বেরুল। যদি পৌঁছে সময় থাকে অগ্রিম চা খেয়ে নিতে পারবে।

খর রোদে সারা শহর জরজর।

শহর না পেরোলে সাপ-শেয়াল দেখা যাবে না, শহরের ভিতরেই যদি একটা শ্মশানযাত্রা দেখা যায়। শ্মশানযাত্রা নাকি শুভযাত্রা।

গঙ্গাধর সম্ভ্রান্ত, ড্রাইভারের পাশে না বসে রামেন্দ্রর পাশেই বসেছে।

হেসে-খেলে মনোসুখে ভেসে চলেছে গাড়ি।

চিত্তরঞ্জন দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ গাড়ি বউবাজারের দিকে গোঁত খেল।

'ওদিকে কি?' আঁতকে উঠল রামেন্দ্র।

'বউবাজার থেকে মালা আর সন্দেশ কিনে নেব।' অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল গঙ্গাধর।

ভবানীপুর থেকে সন্দেশ আর মার্কেট থেকে মালা কিনে নেওয়া যেত অনায়াসে। তা হলে বউবাজারের বিপথে ঢুকতে হত না। কিন্তু এ নিয়ে আপত্তি করতে গেল না রামেন্দ্র, যেহেতু দুটো জিনিসই হয়তো তার জন্যে। আর 'যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি—' গঙ্গাধরের হাসি-হাসি মুখে সেই ইসারা।

মালা-সন্দেশ কেনা হল।

গাড়ি কোথায় কলেজ স্ট্রিট দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তা নয়, চলল শেয়ালদার দিকে।

'ওদিকে কি?' আঁতকে উঠল রামেন্দ্র।

'একটু আমহার্স্ট স্ট্রিট যাবে।'

'কেন, সেখানে আবার কি কিনবেন?'

'কিছু কিনব না।'

'তবে?'

'তর্কভূষণ মশায় যাবেন বলেছিলেন—'

'কে তর্কভূষণ?'

'বিনোদেশ্বর তর্কভূষণ।'

'তিনি যাবেন কেন? তিনি বক্তা?' রামেন্দ্রর প্রায় চৌচির হবার দাখিল।

'না, না, বক্তা নন, তিনি শ্রোতা।' গদগদ স্বর আনল গঙ্গাধর : 'অনেক দিন ধরেই তিনি আপনার বক্তৃতা শুনতে চাচ্ছেন। সুযোগ হচ্ছে না। আজ যখন সুযোগ হয়েছে—'

তবু নরম হল না রামেন্দ্র। বললে, 'ফিরবেন কিসে? এই গাড়িতে?'

'না, না, ওখানে তাঁর মেয়ের বাড়ি, রাত্রে তিনি সেইখানে থাকবেন। সকালে ট্রেনে ফিরবেন।'

'দেখবেন—' প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিল রামেন্দ্র।

'আমার কথার খেলাপ হবে না কিছুতে।' গঙ্গাধর মুখচোখ গম্ভীর করল : 'আপনার শ্লোগানটা মুখস্ত হয়ে আছে। এক বক্তা এক গাড়ি। এক গুলি এক চিড়িয়া।'

তর্কভূষণের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। গঙ্গাধর বাড়ির ভিতরে গেল তাঁকে খবর দিতে। উজিয়ে আনতে।

প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গেল, তবু তর্কভূষণের দেখা নেই। গঙ্গাধরও বেপাত্তা।

গাড়ির মধ্যে দগ্ধ হতে লাগল রামেন্দ্র।

'শিঙে ফোঁকো। হর্ন দাও।' ড্রাইভারকে তপ্ত করেও আশু ফল হল না।

সেবার জ্যোতিপ্রসাদকে নিয়ে যেতে কি যন্ত্রণা! বাইরে এমনি গাড়িতে বসে আছে রামেন্দ্র, কিন্তু ভিতরে জ্যোতিপ্রসাদের হচ্ছে না। সাজগোজ করছে, চুল আঁচড়াচ্ছে, কোঁচায় চুনট দিচ্ছে, জুতোয় পালিশ আর মুখে স্নো-পাউডার ঘষছে। পাক্কা চল্লিশ মিনিটের ধাক্কা।

'ওঁর তো শুনেছি সাজছাড়ার সাজ। খালি পা, খালি গা, কাঁধে একখানি উড়ুনি। না কি ভুল করছি লোক? কে জানে! হয়তো সাজ পরতেও যত আয়োজন, সাজ ছাড়তেও তত আয়োজন।' আর লোক নেই, ড্রাইভারের উদ্দেশেই বলল রামেন্দ্র।

না, গঙ্গাধর দেখা দিয়েছে।

'চলো। তর্কভূষণ যাবেন না।' গাড়িতে এসে উঠল গঙ্গাধর। বললে, 'ওঁর শরীর খুব অসুস্থ।'

'সেটা জানতে এতক্ষণ সময় লাগে?'

'কি করব বলুন। ঘুমুচ্ছিলেন যে। ঘুম থেকে উঠবেন তবে তো জানাবেন, যাবেন কি, যাবেন না—'

হায়, শ্রোতার ঘুম আসে, বক্তারই ঘুম নেই।

গাড়িটা ছাড়তেই গায়ে হাওয়া লাগল।

একজনের অস্বাস্থ্যে স্বস্তি পাচ্ছে রামেন্দ্র। তার ছোট-মনটাকে মনে-মনে শাসন করল। এমনি শাসন করতে করতে যাচ্ছে, গাড়ি হঠাৎ পাঁচ-মাথার মোড় থেকে ডাইনে বেঁকল।

'ওদিকে কি?' রামেন্দ্র আবার আর্তনাদ ছাড়ল।

'একটু পাইকপাড়া যাব।'

'সেখানে কি?'
'এ গাড়ির যিনি মালিক, তিনি সেখানে থাকেন।'
'তিনি যাবেন বুঝি এই সঙ্গে?'
'তিনি নয়, তাঁর স্ত্রী যাবেন।'
'স্ত্রী? স্ত্রীলোক?'
'ভয় কি? বক্তা নন।' গঙ্গাধর মৃদু হাসল : 'গৃহে হলেও সভায় নন।'
'ফিরবেন কিসে?'
'আপনার সঙ্গে যদি টাইমিং না করতে পারেন, ট্রেনে।'
'নিজের গাড়ি থাকতে ট্রেনে?'
'সেইরকমই কথা আছে। মোট কথা আপনাকে ডিটেনড হতে হবে না। ও অঞ্চলে ভদ্রমহিলার বাপের বাড়ি, কোনো অসুবিধে নেই তাঁর।'
'গাড়ির কণ্ডিশন ভালো তো! না কি মাঝপথে—'
'কি যে বলেন!' রামেন্দ্রর কথায় অবিশ্বাসের সুর দেখে গঙ্গাধর বেদনার্ত মুখ করল।
ছোকরা বয়সে কি কেউ গাড়ির মালিক হয়! ভাবতে বসল রামেন্দ্র। নিশ্চয়ই নিরুৎসাহকরুপেই মধ্যবয়সী হবেন, আর তিনি যখন যাবেন, তখন সঙ্গে একদঙ্গল সাঙ্গোপাঙ্গ কোন না যাবে।
'সঙ্গে কতগুলো ফেচাংও নেবেন নাকি?' চিড়বিড় করে উঠল রামেন্দ্র।
'না, না, ভদ্রমহিলা একলা যাবেন।'
রামেন্দ্রের বুকের পাথর একটু তবু নড়ে বসল।
গাড়ি দাঁড়াল এসে দরজায়।
'দেখবেন, দেরি করতে বারণ করবেন।'
অসহায় মূক করে রেখে বাড়িতে ঢুকল গঙ্গাধর। ভাবখানা এই প্রসাদেরাই প্রসাধনে দেরি করেন আর এ'রা তো মূর্তিমতী জ্যোতি।
গাড়িতে বসে ঘামতে লাগল রামেন্দ্র। পিঠটা চাপ দিয়ে বসতে ভয়, চাপটা দাগ ধরে যাবে। আর আলগা করে বসতে দারুণ অস্বস্তি। কতক্ষণ চলবে এ দ্বন্দ্ব কে জানে।
সঙ্গে ব্যাফল-ওয়াল না নিয়ে ভদ্রমহিলা বসবেন কোথায়?
ড্রাইভার চেনা লোক, আপনার লোক, হয়তো সামনে তার পাশেই বসবেন। কিংবা সম্ভ্রান্ততার দরুন যদি ভিতরেই বসেন, তা হলে গঙ্গাধরকে যেতে হবে সামনে। গঙ্গাধরের অহঙ্কার যে চূর্ণ হবে এতে আরাম পেল রামেন্দ্র। এতক্ষণ এমনভাবে বসে এসেছে যেন ওই প্রধান অতিথি। রামেন্দ্র উদ্বাস্তু।
বসাবসি নিয়ে রামেন্দ্র ভাবছে, সারা গা চাদর মুড়ি দিয়ে হাতে পানের ডিবে নিয়ে দাঁড়ালেন বপুষ্মতী।
ভিতরে উঁকি মারল গঙ্গাধর। যেন দীর্ঘ দিন ধরে অসুখে ভুগছে এমনি শীর্ণশুষ্ক মুখ করল। বললে, 'আপনি যদি—'

ইঙ্গিতটা করুণ। ভদ্রমহিলা পিছনের সিটে বসবেন, আর সেক্ষেত্রে রামেন্দ্র অপরিচিত অনাত্মীয় বলে ড্রাইভারের পাশে যাবে। আর যতক্ষণ না রামেন্দ্র সরে যাচ্ছে, ততক্ষণ ঢুকতে পাচ্ছেন না ভদ্রমহিলা।

সামাজিক শিষ্টাচার মানতে হবে বৈকি। রামেন্দ্র ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল।

আর, সন্দেহ কি, কে উদ্বাস্তু! কে প্রধান অতিথি!

গাড়ি কোথায় বি-টি রোড ধরে সোজা বেরিয়ে যাবে, তা না, আবার শ্যামবাজরের দিকে মোড় নিল।

'ওদিকে কী?' একটা জান্তব যন্ত্রণার আওয়াজ তুলল রামেন্দ্র।

'শ্যামবাজার থেকে আমার মেসোমশায়কে তুলব। তর্কভূষণ মশায় যখন গেলেন না, তখন একটা সিট খালি আছে। খালি যায় কেন?' গঙ্গাধর বিনয়-ভূষণ মুখ করল : 'ভয় নেই, মেসোমশায় বক্তা নন, আপনার ভক্ত—'

খালি সিটটা কোথায়, পিছনে, না, ড্রাইভার ও রামেন্দ্রের মাঝখানে, মনে মনে গবেষণা করতে লাগল রামেন্দ্র।

শ্যামবাজারে একটা গলির মধ্যে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

'দু মিনিট—বাড়ির মধ্যে দ্রুত পায়ে ঢুকল গঙ্গাধর।

টুক করে দরজা খুলে বাইরে একটু বেরুল রামেন্দ্র। রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলা কপাল মুছল।

ড্রাইভার ভাবল, বাবুর গরম হচ্ছে। তাই বাইরে ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন।

এক পা দু পা করে গাড়ির পিছন দিক দিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করল রামেন্দ্র। ড্রাইভার ভাবল, বাবু বোধহয় কোনো যান্ত্রিক গোলযোগের উপশম খুঁজছেন।

তার পরেই ছুট দিল রামেন্দ্র।

দ্রুত পায়ে হেঁটে গেলে পিছন থেকে ছুটে এসে ধরতে পারে গঙ্গাধর, তাই গোড়াগুড়ি থেকেই দৌড় দেওয়া সমীচীন।

শুধু জিভ নয়, পা-ও ছোটাতে পারে রামেন্দ্র।

'পালাল! পালাল!' ভদ্রমহিলা থাক-থাক চিৎকার করে উঠলেন।

'ধরো! ধরো!' গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ড্রাইভার।

ছোটবার আগে রামেন্দ্রের একবার মনে হয়েছিল সন্দেশের বাক্সটা হাতাবে কি না, কিন্তু হনুমানের কথা মনে পড়তে নিবৃত্ত হল। হনুমান যখন রাবণের মৃত্যুবান নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী ফল দেখিয়ে তাকে চেয়েছিল প্রলুব্ধ করতে। হনুমান প্রলুব্ধ হয়নি। রামেন্দ্রও প্রলুব্ধ হল না। ও সন্দেশ গঙ্গাধর খাক। আর ওর মেসোমশায় যদি প্রধান অতিথি হন তাহলে মালা তিনিই পরুন।'

চেঁচামিচি শুনে গঙ্গাধরও বেরিয়ে এসেছে।

'শুনুন! শুনুন!' পিছনে ছুটতে লাগল গঙ্গাধর।

আওয়াজ আরো উচ্চে উঠলে এখুনি পাড়ার ছোকরারা বেরিয়ে পড়বে। কী বলতে কী শুনবে ঠিক কী। হয়তো বা চোর ভাববে নয় তো বা গাড়ি চাপা দেওয়া ড্রাইভার। রক্ষে রাখবে না। মেরে থক্‌থকে করে দেবে।

বড় রাস্তায় পড়তেই একটা বাস পেল রামেন্দ্র। কিন্তু বাস-এ ওঠা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে! নিশ্চয়ই ট্যাক্সি নিয়ে ধাওয়া করবে পিছে। ধরে ফেলবে। ধরিয়ে দেবে। কী বলতে কী শুনবে সোয়ারীরা ঠিক নেই। দলা পাকিয়ে দেবে।

এদিক ওদিক তাকাতেই একটা ট্যাক্সি দেখল। আর পড়ি-মরি করে হুমড়ি খেয়ে ধরল সেটাকে।

স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার জিগগেস করলে, 'কোথায়!'

রামেন্দ্র বললে, 'এলোমেলো।'

'সে আবার কোথায়!'

'জায়গা জিগগেস করা অন্যায়। যতক্ষণ কিছু না বলব সিধে চলবেন, তারপর ডাইনে বললে ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে। আর ও সব নিয়ম যদি না মানেন, এলোমেলো।'

ড্রাইভার হাসল।

অনেকটা ঘোরাঘুরি করে গঙ্গাধরকে নিঃসন্দেহরূপে নিবৃত্ত করে বাড়ি ফিরল রামেন্দ্র।

বাড়ি ফিরতেই দুটি তরুণীর সঙ্গে দেখা।

'আমরা বাণীসঙ্ঘ থেকে এসেছিলাম। আগামী রবিবার আমাদের সভা। আপনাকে প্রধান অতিথি হতে হবে।' বললে একজন।

'এসে শুনলাম আপনি কোথায় গোবিন্দপুর গেছেন। ফিরে যাচ্ছিলাম। ভাগ্য শেষ মুহূর্তে নিয়ে এসেছেন আপনাকে।'

'পিক-আপ করে এনেছেন।' রামেন্দ্র হাসল : 'আপনাদের জন্যেই এনেছেন। বসুন।'

'আমরা কত ছোট, আমাদের আপনি করে বলছেন?' বললে প্রথমা : 'আমার নাম সুমিত্রা আর এ আমার বন্ধু যূথী। দমদমে আমাদের সঙ্ঘ। সেখানেই সভা হবে।'

'আপনাদের গাড়ি আছে?'

'সে আমরা যোগাড় করব। গাড়ি না পাই ট্যাক্সি করব।' বললে সুমিত্রা।

'হ্যাঁ, ট্যাক্সিই ভালো। কিন্তু কে নিতে আসবে?'

'আমরা দু বন্ধুতেই নিতে আসব।' বললে যূথী, 'আমাদের সঙ্ঘে কোনো ছেলে নেই।'

'ভালো কথা। তাই আসবেন।'

'আর যাবার পথে মীরা-দিকে পিক-আপ করে নেব।' বললে সুমিত্রা।

'আর অলোকা-দিও যেতে পারেন।' যূথী যোগ করল।

'তা হলে আপনাদের কাউকে যে ড্রাইভারের পাশে বসতে হয়।
'তা বসব।' সুমিত্রা বললে, 'আমাদের অমন কুসংস্কার নেই।'
রামেন্দ্র জানে, ট্যাক্সি আসবে না, স্টেশন ওয়্যাগন আসবে।

৫১। নুরবানু

কুরমান হাটে কাঁচের চুড়ি কিনতে এসেছে।

মেজাজ খুব খারাপ। গা এখনো কশ-কশ করছে। তবু এ-দোকান থেকে ও-দোকানে সে ঘোরাঘুরি করে। সোনালি কিনবে না বেগুনি কিনবে চট করে ঠাহর করতে পারে না। অন্যদিন হাটে এসে তামাক কিনত, লঙ্কা-পেঁয়াজ কিনত, তিতপুঁটি বা ঘুসো চিংড়ি। আজ তাকে কাঁচের চুড়ি কিনতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে চুলের ফিতে।

চুড়ির সোয়া তিন আঙুল জোখা। চুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখে কুরমান। জোখা মেলে তো রং পছন্দ হয় না, রং মনে ধরে তো জোখায় গরমিল।

নুরবানুর কাঁচের চুড়ি সে আজ ভেঙে দিয়ে এসেছে। ফিতে ধরে টানতে গিয়ে খুলে দিয়েছে চুলের খোঁপা। চোট-জখম লেগেছে হয়তো এখানে-ওখানে।

জমি-জায়গা নেই, কর-কবুলত নেই, বর্গায় চাষ করে কুরমান। তাও লাঙল কিনে আনতে হয় পরের থেকে। ধান যা-ও হয়েছিল গত সন, পাখিতে খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে ইঁদুর। এ-বছর গাছ হয়েছে তো শিষ হয়নি। ডোবা জমি, নোনা কাটে না ভাল করে। যা ধান হয়েছে দলামলা করে মনিবের খাস খামারে তুলে দিয়ে আসতে হবে। সে পাবে মোটে তিন ভাগের এক ভাগ।

বড় দুর্বল অবস্থা তাদের। না আছে থান না আছে থিত। তাই কুরমানের একার খাটুনিতে চলে না। নুরবানুকেও কাজ করতে হয়।

নুরবানু মনিবের বাড়িতে ধান ভানে, পাট গুটোয়, কাঁথা-কাপড় কাচে, জল টানে। আর মনিব-গিন্নির খেজমৎ করে। চুল বাছে, গা খোঁটে, তেল মাখে। ভাল-মন্দ খেতে পায় মাঝে মাঝে। দরমা পায় চার টাকা।

কিন্তু শান্তি নেই। মনিব, উকিলদ্দি দফাদার, নুরবানুকে অন্যায় চোখে দেখেছে! প্রথম দিনেই নালিশ করেছিল নুরবানু : 'মুনিব আমাকে অন্যায় চোখে দেখে।'

'কেন, কি করে?'

'খুক-খুক করে কাশে, বাঁকা চোখে তাকায়, আমোদ-সামোদ করে কথা কয়।'

'তুই ওর ধারাধারি যাসনে কোনোদিন।'

'না, আমি ঘোমটা টেনে চলে যাই দূর দিয়ে।'

কিন্তু দফাদার তাতে ক্ষান্ত হয় নি। একদিন নুরবানুর হাত চেপে ধরল।

সেদিনও কাঁদতে-কাঁদতে নুরবানু বললে, 'হাত ছাড়িয়ে নেবার সময়ে খামচে দিয়েছে।'

রাগে শরীরে রগগুলো টান হয়ে উঠল কুরমানের। বললে, 'তুই সামনে গেছিলি কেন?'

'কে বললে? যাইনি তো সামনে।'

'সামনে যাসনি তো হাত চেপে ধরে কি করে?'

'আমি ছিলাম ঢেঁকি-ঘরে। ও ঘরে ঢুকে বললে, বীজ আছে ক কাটি? আমি পালিয়ে যাচ্ছি পাছ-দুয়ার দিয়ে, ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।'

তবু সেদিনও সে মারেনি নুরবানুকে। নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছিল।

আশ্চর্য, গরিবের বউএর কি একটু ছুরৎও থাকতে-পারবে না? গরিব বলে স্ত্রীর বেলায়ও কি তাদের অনুভব আর উপভোগের মাত্রাটা নামিয়ে আনতে হবে?

'খবরদার, সামনে যাবি না ওর। ওরা জোরমন্ত লোক, থানা-পুলিশ সব ওদের হাতে, ওদের অনেক দূর দিয়ে আমাদের হাঁটা-চলা। কাজ-কাম সেরে ঝপ করে চলে আসবি।'

কিন্তু আজ ওর হাত-ভরা কাঁচের চুড়ি। ফিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনুনি পাকানো। হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল নুরবানু, কুরমানের মুখের চেহারা দেখে ঝিম মেরে গেল।

'এসব কোত্থেকে?'

'মুনিবগিন্নি দিয়েছে।'

কিন্তু, জিগগেস করি, পয়সা কার? এ সাজানোর পিছনে কার চোখের সায় রয়েছে লুকিয়ে? আজ কাঁচের চুড়ি, কাল আংটি-চুংটি। নোনা জমি এমনি করেই আস্তে আস্তে মিঠেন করে তুলবে। হাত ধরেছিল, ধরবে এবার গলা জড়িয়ে। 'খুলে ফ্যাল শিগগির।' গর্জে উঠল কুরমান।

সাজবার ভারি সখ নুরবানুর। একটু সে হয়তো টালমাটাল করেছিল, কুরমান হাত ধরে হেঁচকা টান মারল। পটপট করে ভেঙে গেল কতগুলি। হেঁচকা টান মারল খোঁপায়। একটা কুণ্ডলী-পাকানো সাপ কিলবিল করে উঠল।

ডুকরে কেঁদে উঠল নুরবানু। চুড়ির ধারে জায়গায়-জায়গায় হাত কেটে গিয়েছে। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ঘরের পুরুষের এমন দুর্দান্ত চেহারা দেখেনি সে আর কোন দিন। বাবা, ভয় করে। দরকার নেই তার চুড়ি-খাড়ুতে। কিষানের বউ সে, ঠুঁটো পাথর হয়ে থাকবে। সাধ-আমোদে তার দরকার কি।

কিন্তু এ কি! হাটের থেকে তার জন্যে চুড়ি নিয়ে এসেছে কুরমান। লঙ্কা-পেঁয়াজ তামাক-টিকে না এনে। লজ্জায় গলে যেতে লাগল নুরবানু।

পাঁচ আঙুলের মুখ একসঙ্গে সূঁচলো করে চেপে ধরে কুরমান। টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে চুড়ি পরিয়ে দেয়। হঠাৎ রাগে রগ ছিঁড়ে গিয়েছিল তার। নইলে এমন যার তুকতুকে হাত তার গায়ে সে হাত তোলে কি করে?

'তুমি কেন মিছিমিছি বাজে খরচ করতে গেলে? এদিকে তোমার একটা ভাল গামছা নেই, লুঙ্গিটা ছিঁড়ে গেছে।'

'যাক সব ছিঁড়ে-ফেড়ে। তুই একবারটি হাস আমার মুখের দিকে চেয়ে।'

পিঠে চুলগুলি খোলা পড়ে আছে ভুর করে।

'তোর চুল বাঁধা দেখিনি কোনো দিন—'

আজ শুধু দেখে না কুরমান, শোনেও। শোনে চুল বাঁধার সঙ্গে-সঙ্গে চুড়ির ঠুন-ঠুন।

উকিলদ্দির বাড়িতে তবু না গেলেই নয় নুরবানুর। চারটে টাকা কি কম? কম কি একবেলার খোরাকি? ধান-পান যদি পায় ভবিষ্যৎ, তাই কি অগ্রাহ্য করবার?

কিন্তু সেদিন নুরবানু উকিলদ্দির বাড়ি থেকে নতুন শাড়ি পরে এল। ফলসা রঙের শাড়ি। নুরবানুর বর্ণ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

'এ শাড়ি এল কোত্থেকে?' বর্শার মুখের মত চোখা হয়ে উঠল কুরমান।

'আজ যে ঈদ খেয়াল নেই তোমার? ঈদের দিনে মুনিব-গিন্নি দিয়েছে শাড়িখানা।'

ঈদের দিন হলেও নরম পড়ল না কুরমান। ফিরনি-পায়েসের ছিঁটে ফোঁটাও নেই, নতুন একখানা গামছা হয় না, ঈদ কোথায়?

না, নরম পড়ল না কুরমান। শাড়ির প্রত্যেকটি সুতোয় দেখতে পাচ্ছে সে উকিলদ্দির ঘোলা চোখ, ঘসা জিভ। ফাঁই-ফাঁই করে শাড়িটা সে ছিঁড়ে ফেলল।

এবার আর সে হাটে গেল না পালটা শাড়ি কিনে আনতে। পয়সা নেই, ইচ্ছেও নেই। ক্ষুদ্দুর চাষা, তার বউয়ের আবার সাইবানী হবার সখ কেন? চট মুড়ি দিয়ে থাকতে পারে না সে ঘরের কোণে?

সত্যি, এত সাজ তার পক্ষে অসাজন্ত ছিল। বুঝতে দেরি হয় না নুরবানুর। কিন্তু তখন কি সে বুঝতে পেরেছে শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে সাপ রয়েছে লুকিয়ে? গা বেয়ে বেয়ে শেষ কালে বুকের মধ্যে ছোবল মারবে? নুরবানু তার কালো ফুলের ছাপ-মারা কালো শাড়িই পরে এবার। তার রাতের এ নিরিবিলি শান্তির মতই এ শাড়িখানা। তাই ঘুমের স্রোতে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারে সে স্বামীর স্পর্শের ঘেরের মধ্যে। ফলসা রঙের শাড়িটার জন্যে তার এতটুকুও কষ্ট নেই।

কুরমান কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনল নুরবানুকে। নিয়ে এল পর্দার হেপাজতে। উপাসে-তিয়াসে কাটবে, তবু পাপের পথের পাশ দিয়ে হাঁটবে না। দারিদ্র্য লাগুক গায়ে, তবু অধর্ম যেন না লাগে। অদিন এলেও যেন না অমানুষ বনে যায়।

কিন্তু উকিলদ্দি ছিনে-জোঁক। বয়স হয়েছে কিন্তু বিবেচনা নেই।

ধান কাটতে মাঠে গেছে কুরমান। লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটবার দিন এখন। পা টিপে-টিপে দুপুর বেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। কানের জন্যে ঝুমকো, পায়ের জন্যে পঞ্চম, গলার জন্যে দানাকবজ নিয়ে এসেছে গড়িয়ে।

বললে, 'কই গো বিবিজান। দেখ এসে কী এনেছি?'

বেরিয়ে আসতেই নুরবানুর চক্ষু স্থির। রুপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপর বাঘ দেখে।

অনেক ভয়-ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দুই নম্বর মুনিব। তিন নম্বর দফাদার। চার নম্বর একটা মাংসোখেকো জানোয়ার।

'চলে যান এখান থেকে।' চোখে মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝাপসা গলায় বললে নুরবানু।

'তোমার জন্যে লবেজান হয়ে আছি। এই দেখ, জেওর এনেছি গড়িয়ে।'

'দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে সোর তুলব এখুনি।'

কিন্তু সোর তুলবার আগেই কুরমান এসে হাজির।

রোদে সে তেতে-পুড়ে এসেছে, চোখে ঘোলা পড়েছে বোধ হয়। নইলে দেখছে সে কী তার বাড়ির উঠোনে? উকিলদ্দির হাতে রুপোর গয়না আর নুরবানুর চোখে খুসির ঝলকানি। কত না জানি ঠাট্টা-বটখেরা, কত না জানি হাসির বুজরুকি। রং-সং, আমোদ-বিনোদ। এই গয়নাতে কতো না-জানি যোগসাজসের সর্ত।

মাথায় খুন চেপে গেল কুরমানের। চার পাশে চেয়ে দেখল সে অসহায়ের মত। দেখল ধানের আঁটির সঙ্গে কাঁচি সে ফেলে এসেছে মাঠে।

'এখানে কেন?'

ধানাই-পানাই করত লাগল উকিলদ্দি। শেষ কালে বললে, 'লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটতে গিয়েছিস কি না দেখতে এসেছিলাম।'

'তা মাঠে না গিয়ে আমার বাড়ির অন্দরে কেন?'

'বেশ করেছি। সমস্ত জায়গা-জমি সদর-অন্দর আমার। আমার যেখানে খুশি আমি যাব আসব।'

কুরমান হঠাৎ উকিলদ্দির দাড়ি চেপে ধরল। লাগল ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি। উকিলদ্দির হাতে যে লাঠি ছিল দেখেনি কুররান। তা ছাড়া কুরমান আধপেটা খাওয়া চাষা, জোর-জেল্লা নেই শরীরে, সেটাও সে বিচার করে দেখেনি। উকিলদ্দি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তো দিলই, তুলে নিল লাঠিগাছটা।

কুরমানকে দেখেই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল নুরবানু। এখন মারমুখো লাঠি দেখে বেরিয়ে এল সে হন্তদন্ত হয়ে, শিকরে-পাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ল উকিলদ্দির উপর। লাঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল জোর করে। মুঠো আলগা করতে পারে না, শুধু সুরু হয় লাটপাট।

কি চোখে দেখল ব্যাপারটা কে জানে, কুরমানের রক্তের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল।

এক ঝটকায় টেনে আনতে গেল নুরবানুকে চুলের ঝুঁটি ধরে : 'তুই তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস পর্দার বাইরে? কেন পরপুরুষের সঙ্গে জাপটাজাপটি সুরু করে দিয়েছিস?' উকিলদ্দিকে রেখে মারতে গেল সে নুরবানুকে।

আর, যেমনি এল এগিয়ে, হাতের নাগালের মধ্যে, অমনি উকিলদ্দির লাঠি পড়ল কুরমানের মাথায়। মনে হল নুরবানুই যেন লাঠি মারলে। মনে হল কুরমানের মারের থেকে উকিলদ্দিকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই জোটপাট। উকিলদ্দির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য-সাধনা।

কুরমান দিশেহারার মত চেঁচিয়ে উঠল : 'এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক—বাইন।' ব্যাস, উথল-পাথল বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। সব নিশ্চুপ, নিঃশেষ হয়ে গেল।

রাগ ভুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল কুরমান। হাজার লাঠি পড়লেও এমন চোট লাগত না। আঁধার দেখতে লাগল চারদিক। নুরবানুর সেই রাগরাঙা মুখ ফুসমন্তরে ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। ফকির-ফতুরের মত তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। আর মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চাপা সুখে হাসতে লাগল উকিলদ্দি।

লোক জমতে সুরু করল আস্তে আস্তে।

কুরমান গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বললে নুরবানুকে, 'ও কিছু হয়নি, তুই চলে যা ঘরের মধ্যে।'

সত্যিই যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবেই আঁচল গুটিয়ে নুরবানু চলে গেল ঘরের মধ্যে, ঘরের বউএর মত।

কিছু হয়নি বললেই আর হয় না। আস্তে আস্তে বসে গেল দশ-সালিশ। তালাক-দেওয়া স্ত্রী এখন আলগা-আলগোছ মেয়েলোক। তার উপর আর পূর্ব স্বামীর এক্তিয়ার নেই। এক কথায় অমনি আর তাকে সে ঘরে তুলতে পারে না। বিয়ে ফস্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি। অমন হারামি সমাজ বরদাস্ত করতে পারবে না।

উকিলদ্দি দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

'রাগের মাথায় ফস করে কথা বেরিয়ে গেছে মুখের থেকে, অমনি আমার ইস্ত্রী পর হয়ে যাবে?' কুরমান কেঁদে উঠল।

পর বলে পর! এপার থেকে ওপার! একবার যখন বিয়ে ছাড়ার ফারখৎ জারি করেছে তখন আর উপায় নেই। ঘুড়ি কাটা পড়লে নাটাই গুটিয়ে কি ঘুড়িকে ধরে আনা যায়?

'মুখের কথাটাই বড় হবে? মন দেখবে না কেউ?'

মুখের জবানের দাম কি কম? রং-তামাসা করে বললেও তালাক তালাক। আর এ তো জল-জীয়ন্ত রাগের কথা। গলা দরাজ করে দিনে-দুপুরে তালাক দেওয়া।

'আর দস্তুরমত সাক্ষী রেখে।' ফোড়ন দিল উকিলদ্দি।

'এখন উপায়? নূরবানুকে আমি ফিরে পাব না?'

এক উপায় আছে। দশ-সালিশ বসল ফরমান দিতে। ইদ্দতের পরে কেউ যদি নূরবানুকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবেই ফের কুরমান নিকে করতে পারে তাকে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

কে বিয়ে করবে? কুরমানকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কে বিয়ে করবে নূরবানুকে? আর কে! দাড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে উকিলদ্দি বললে, 'আমি বিয়ে করব।' কিন্তু বিয়ে করেই তক্ষুনি-তক্ষুনি তালাক দিতে হবে। কথার খেলাপ করলে চলবে না। দশ-সালিশের হুকুম মানতে হবে। এর মধ্যে আছে খাদেম-ইমাম, মোল্লা-মুনসি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, মানী-গুণী লোক সব। এদেরকে অমান্য করা যাবে না।

একটু যেন বল পেল কুরমান। কিন্তু তার বাড়িতে থাকতে পারবেনা আর নূরবানু। বিরানা পর-পুরুষের ঘরে কি করে থাকতে পারে সমর্থ বয়সের মেয়েছেলে? পাশ-গাঁয়ে তার এক চাচা আছে, বেচারী নাচার, সেখানে সে থাকবে। ইদ্দতের তিন মাস।

এক কাপড়ে কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল নূরবানু। যেন কুরমানকে গোর দেওয়া হয়েছে। পুঁতে রেখেছে মাটির নিচে।

তা ছাড়া আর কি? কুরমানের হাতের নাগালির মধ্যে দিয়ে চলে গেল, তবু হাত বাড়িয়ে তাকে সে ধরতে পারল না।

সামান্য কটা কথা এমনি করে সব নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে এ কে জানত! কুরমানের নিজের রাগ নিজেকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

দাউলে হয়ে কুরমান চলে গেল দক্ষিণে। নূরবানু ছাড়া তার আর ঘর-দুয়ার কি! ঘরের উইয়ে-খাওয়া পাটখড়ির বেড়া ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, তেমনি ভেঙে-ভেঙে পড়ছে তার বুকের পাঁজরা। চলে গেছে দক্ষিণে, কিন্তু মন কেবল উত্তরে ভেসে-ভেসে বেড়ায়।

ধান কাটা সারা হয়ে গেছে, নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে কুরমান। গাঁয়ের হালট ধরে নিজের বাড়িতে। ঘরের ঝাঁপ খোলে। কোথায় নূরবানু! চৈতী মাঠের মত বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে একদিন আসে নূরবানু। যেন খুব একটা অন্যায় করেছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।

কুরমান বুঝি ঝাঁপিয়ে ধরতে চায় নূরবানুকে। ইচ্ছে করে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে দেয়।

নূরবানু বলে, 'না। এখনো হালাল হইনি। ইদ্দত কাবার হয়নি। হয়নি ফিরতি বিয়ে, ফিরতি তালাক।'

বলে, 'তোমাকে শুধু একটিবার দেখতে এলাম। বড় মন কেমন করে।'

বড় কাহিল হয়ে গেছে নূরবানু। বড় মন-মরা। গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে। জোর-জলুস মুছে গেছে গা থেকে।

এটা-ওটা একটু-আধটু গোছগাছ করে দেয় নূরবানু। ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে।
'তোকে কি আর ফিরে পাব নূরু?'
'নিশ্চয়ই পাবে। দশ-সালিশের বৈঠকে চুক্তি হয়েছে, কড়ায় ক্রান্তিতে সব আদায়-উশুল হয়ে যাবে। চোখ বুজে এক ডুবে মাঝখানের এই কয়েকটা দিন শুধু কাটিয়ে দেয়া।'
'আমার কি মনে হয়ে জানিস? ও তোকে আর ছাড়বে না। একবার কলমা পড়া হয়ে গেলেই ও ওর মুখে কুলুপ এ'টে দেবে। বলবে, দেব না তালাক।'
'ইস?' নূরবানু ফোঁস করে উঠল : 'দশ-সালিশ ওকে ছাড়বে কেন?'
'না ছাড়লেই বা কি, ও পষ্ট গরকবুল করবে। এ নিয়ে তো আর আদালত চলবে না। বলবে, কার সাধ্য জোর করে আমাকে দিয়ে তালাক দেওয়ায়?'
'ইস্, করুক দেখি তো এমন বেইমানি!' আবার ফোঁস করে ওঠে নূরবানু : 'বেতমিজকে তখন বিষ খাইয়ে শেষ করব। ওর বিষয়ের অংশ নিয়ে এসে সাদি করব তোমাকে।'
নূরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ।
'গা-টা তেতো-তেতো করছে, জ্বর হবে বোধ হয়।'
গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নূরবানু। হাত গুটিয়ে নিল ঝট করে। অমন সোনার অঙ্গ স্পর্শ করার তার অধিকার নেই।
একেক দিন গহিন রাতে কুরমান যায় নূরবানুর ঘরের দরজায়। নূরবানুর চোখে ঘুম নেই। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে বসে থাকে।
বলে, 'কেন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ? লোকে যে চোর বলবে। চৌকিদার দেখলে চালান দেবে।'
'কবে আসবি?'
'দফাদার লোক নিয়ে এসেছিল। আসছে জুম্মাবার কলমা পড়বে। তার পরেই তালাক আদায় করে নেব ঠিক। এখন বাড়ি যাও।'
কোথায় বাড়ি! কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে বুকের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও! কোথায় তা কে জানে? যেখানে এত প্যাঁচঘোঁচ নেই, যেখানে শুধু দেদার মাঠ আর দেদার আসমান।
শিগগির বাড়ি যাও। কুরমান চোর। কুরমান পুরপুরুষ।
জুম্মাবারে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু, কই, শনিবার তো তালাক নিয়ে চলে এল না নূরবানু।
যা সে ভেবে রেখেছে তাই হবে। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে উকিলদ্দি আর ছেড়ে দেবেনা নূরবানুকে। গলা টিপে ধরলেও তার মুখ থেকে বার করানো যাবে না ঐ তিন অক্ষরের তিন কথা। বলবে, মরণ ছাড়া আর কারুর সাধ্য নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। কুরমান খোঁজ নিতে গেল। দাবিদারের মত নয়, দেনদারের মত।

উকিলদ্দি বললে, 'আমার কোনো কসুর নেই। বিয়ে হয়েছে তবু নুরবানু এখনো ইস্ত্রী হচ্ছে না। ইস্ত্রী না হলে তালাক হয় কি করে?'

যত সব ফাঁকিজুকি কথা। তার আসল মতলব হচ্ছে নুরবানুকে রেখে দেবে কবজার মধ্যে। রাখবে অষ্টঘড়ির বাঁদি করে।

কুরমান দশ-সালিশ বসাল। জানাল তার ফরিয়াদ।

ডাক উকিলদ্দিকে। জবাব কি তার? কেন এখনো ছাড়ছে না নুরবানুকে? কেন এজাহার খেলাপ করছে?

উকিলদ্দি বললে, বিয়েই যে এখনো সিদ্ধ হয়নি, ফলন্ত-পাকান্ত হয়নি। এখনো মাটির গাঁথনিই আছে, হয়নি পাকা-পোক্ত। বিয়ে হয়েছে অথচ এড়িয়ে-এড়িয়ে চলছে নুরবানু। ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছে না। শুতে আসছে না দরজায় খিল দিয়ে। ও ভেবেছে কলমা পড়ার পরেই বুঝি ও তালাকের কাবিল হল। তাই রয়েছে অমন কাঠ হয়ে বিমুখ হয়ে। এমনি যদি থাকে তবে কাটান-ছিড়েন হতে পারে কি করে?

সত্যিই তো। দশ-সালিশ রায় দিলে। স্বামীর সঙ্গে একরাত্রিও যদি সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কি করে? বিয়ে পোক্ত না হলে তালাক চলে না। হালাল হওয়া চলে না নুরবানুর।

উপায় নেই, হালাল হতে হবে নুরবানুকে। তালাক মেনে নিতে হবে ভিক্ষুকের মত।

ঘরে ঢুকে দরজার খিল দিল নুরবানু।

পর দিন ভোরে পাখিপাখলা ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই উকিলদ্দি নুরবানুকে তালাক দিল।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যাই-যাই করছে, নুরবানু চলে এল কুরমানের বাড়িতে। কুরমান বসে আছে দাওয়ার উপর। হাতের মধ্যে হুকো ধরা, কিন্তু কলকেতে আগুন নেই। কখন যে নিবে গেছে তা কে জানে। চেয়ে আছে—শুনা মাঠের মত চাউনি। গায়ের বাঁধন সব ঢিলে হয়ে গেছে, ধস ভেঙে পড়েছে জীবনের। ভাঙন-নদীর পারে ছাড়া-বাড়ির মত চেহারা।

যেন চিনি অথচ চিনি না, এমনি চোখে কুরমান তাকাল নুরবানুর দিকে। তার চোখে গত রাতের সুর্মা টানা, ঠোঁটে পান-খাওয়ার শুকনো দাগ। সমস্ত গায়ে যেন ফুর্তির আতর মাখা। পরনে একটা জাগরঙের নতুন শাড়ি। পরলে-পরলে যেন খুশির জলের স্রোত।

সে জল বড় ঘোলা। লেগেছে কাদা-মাটির ময়লা। পচা দামের জঞ্জাল, মড়ার মাংসের গন্ধ। সে জলে আর স্নান করা যায়না।

'ইদ্দত আমি এখানেই কাবার করব। দিন হলেই মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে নাও তাড়াতাড়ি।' নুরবানু ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নেবা হুকোয় টান মারতে-মারতে কুরমান বললে, 'না। আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই। তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে।'

৫২ । লক্ষ্মী

'দাঁড়াও, দিচ্ছি।' মনিব্যাগ খুলে পয়সা দিতে হলে দুটো হাতকেই মুক্ত হতে হয়। এক হাত রড ধরে ঝুললে আরেক হাতে ব্যাগ খোলা যায় না। 'দাঁড়াও. দিচ্ছি, পালাবনা।' কেদারনাথ বললে।

এরই মধ্যে কেউ কেউ দিচ্ছে যারা দাঁড়িয়ে চলেছে। গায়ে-গায়ে এত ভিড়. দু হাত ছেড়ে দিলেও টলে পড়ছে না। চারদিক থেকে ছেঁকে-ধরা মানুষই আটকে রাখছে, দিচ্ছে না পড়তে। এই নাও ভাড়া। তালপুকুর ক পয়সা? গাবতলা?

কেদারনাথ ভাড়া দিল এমনি মনে হল লক্ষ্মীর। ভাড়া দেওয়া হয়ে গেলে বাকি রাস্তা আর মনিব্যাগের খোঁজ পড়বেনা নিশ্চয়ই। আর, পড়লেই বা কী।

লেডিজ সিটে জানলার ধারে লক্ষ্মী বসেছিল। ডানদিকের জায়গাটা খালি। ভীষণ লোভ হলেও কোনো পুরুষের সাহস হচ্ছে না বসে। অধিকার না থাক অনুমতি নিয়ে যে বসবে তেমন সপ্রতিভও কেউ নেই ভিড়ের মধ্যে।

এত লোক যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে একটা জায়গা খালি যাবে এ যেন লক্ষ্মীরই অসহ্য লাগছিল। বুড়ো ভদ্রলোক একবার রড ধরছেন, আরেকবার সিটের পিঠটা ধরছেন. কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। ধুঁকছেন. কাশছেন ঠোক্কর খাচ্ছেন।

'আপনি বসুন না।' বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে স্পষ্ট তাকাল লক্ষ্মী।

'আমাকে বলছ?' যেন এক নজরে বিশ্বাস করতে পারছে না কেদারনাথ।

'হ্যাঁ, আপনি বুড়ো মানুষ, আপনার বসতে আপত্তি কী।' আরো একটু শীর্ণ হল লক্ষ্মী।

'বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো।' কেদারনাথ পা ছড়িয়ে বসল। 'শ্রান্তকে আসন দেওয়া পুণ্য কাজ।'

লক্ষ্মী ছোট্ট একটি কটাক্ষ ছুঁড়ল। মনিব্যাগের একটা কোণ পকেটের বেড়া টপকে মুখ উঁচিয়ে আছে। পারবে কি আলগোছে ওটা তুলে নিতে?

পারবে না। কিছুতেই পারবে না। কোনোদিন আগে নিয়েছে যে সাহস হবে? কেউ তাকে শিখিয়েছে তুলে নেবার কায়দা?

বসবার আরাম পেয়ে চোখ বুজেছে কেদারনাথ। ঢুলতে শুরু করেছে। ঝিমুনির মুখে দু-একবার লক্ষ্মীর গায়েই ঢলে পড়েছে। তড়পে-তড়পে উঠেছে বুড়ো। আবার ঢুলেছে। আবার চলেছে।

নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসছে লক্ষ্মী। বিরক্ত হচ্ছে না। নিদ্রালুকে উপাধান দেওয়া বোধ হয় আরো পুণ্য।

সামনের সিটের পিঠটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে মাথা গুঁজে বসেছে এবার কেদারনাথ। ওভাবে বসার দরুন জামার বুক-পকেটটা ফুলে উঠেছে, ভিতরের ব্যাগটা আরো একটু ঝুলে পড়েছে। যেন নিজের থেকেই বলছে, আমাকে তুলে নাও।

নিশ্চয়ই বেশি কিছু নেই ওটার মধ্যে, তাই বুড়ো এত অসতর্ক হতে পেরেছে। নইলে এমন খ্যাপার মতন কেউ ঘুমোয়? ঘুমোবার মন হয়?

বেশি কিছু নেই—তারই বা মানে কী? যদি দু-চার আনাও থাকে তাও বা লোকসান হবে কেন? একটা পয়সা পথে পড়ে গেলে তাও খুঁজে কুড়িয়ে নিতে হয়। কেউ কিছু অমনি দিয়ে দিতে আসে না। তা ছাড়া ব্যাগ—ব্যাগটাও তো বয়ে যেতে আসেনি। তারও কিছু দাম আছে।

আচ্ছা, যদি টেনে নিতে পারে ব্যাগটা, সটকান দিতে পারে, তারপর বাড়ি গিয়ে দেখে, কিচ্ছু তেমন নেই, কটা শুধু খুচরো, তাহলে, ছি ছি, কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। কিন্তু, ভাগ্য যদি দয়া করে, যদি ব্যাগটা বেশ শাঁসালো হয়, তাহলে, তাহলে কী করবে? আকাশ দিয়ে একটা উড়ো জাহাজ চলে গেল বুঝি। লক্ষ্মীও তেমনি চোখের পলকে উড়ে পালাবে। কোথায়? জায়গার নামটা এখুনি জানতে চেয়ো না। লক্ষ্মীই কি জানে!

আহা, কত সে ব্যাগ নিয়ে সরে পড়তে পারছে! সোজা অমনি চুরি করে পালানো? উনি মেয়ে বলে ওঁকে কম সন্দেহ করবে! আজকাল অত খাতির নেই। চোরের কাছ থেকে নিজের জিনিস উদ্ধার করবার বেলায় আবার বলাৎকার কী! কিছুতে ছাড়বে না। কেউ ছাড়ে না। ঠিক ছিঁড়ে-ফেড়ে নেবে।

এ সব ব্যাপারে সেথো দরকার। দিব্যি টুক করে তার হাতে চালান করে দিত ব্যাগটা। সে দিত আবার আরেক হাতে। আর যদি সোরগোল উঠত, তা হলে যার হাতে ব্যাগটা নেই সেই ছুট দিত অকারণে আর যার হাতে ব্যাগ সে প্রাণপণে চেঁচাতো, ঐ চোর! ঐ চোর! একটা তালগোল-পাকানো ভোজবাজি হয়ে যেত!

লক্ষ্মী সেথো কোথায় পাবে? জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। ভেবেছিল, শুধু রাস্তাটাই বুঝি চোখে পড়বে। কিন্তু, না, তার চেয়ে অনেক বেশি দেখে ফেলল এক সঙ্গে। শুধু রাস্তা নয়, রাস্তার ধারে গাছ, গাছের ওধারে খেত, মাঠ, নদী, আকাশ, মেঘ—অনেক, অনেক বেশি। না, তার সাথি কই?

এই যে সে একা-একা যাচ্ছে বাসএ, এ কি তার নিজের ইচ্ছেয় নয়? দেখাচ্ছে নিজের ইচ্ছেয় বটে, কিন্তু যেহেতু তার বয়েস এখনো আঠারো পেরোয়নি, আর যেহেতু সে এখনো বাপের আশ্রয়ে আছে, তার ইচ্ছার পিছে-পিছে চলেছে তার বাপের কর্তৃত্ব, বাপের রক্ষণাবেক্ষণ। কিছুতেই তার নিস্তার নেই। আঠারো ডিঙোতে পারলেই সে শিকল-ছুট! সকল-ছুট। তখন তার এই যাওয়াটা নিজের যাওয়া হত, অভিভাবকের চোখের ছায়ায়-ছায়ায় যাওয়া হত না। এখন যত

দূরেই যাই না কেন, গাঁ ছেড়ে কলকাতা, আর কলকাতা ছেড়ে দিল্লি, সেই চোখ সঙ্গে-সঙ্গে ফিরবে।

তার আঠারো বছর পূরতে আর ক'দিন বাকি?

সরকারী উকিল হেরম্ব মিত্তির জিগগেস করল লক্ষ্মীকে, 'তোমাকে তো গৌর বলেছিল ওর সঙ্গে চলে যেতে। আর তুমি তারই জন্যে বেরিয়েছ বাড়ি থেকে।'

কারু দিকে তাকাল না লক্ষ্মী। না উকিলের দিকে, না বা মুখোমুখি চেয়েথাকা বাপের দিকে, না বা আসামীর দিকে। দৃঢ়স্বরে বললে, না, আমি নিজের ইচ্ছেয় বেরিয়েছি।'

বাপ বিরূপাক্ষ হৈ-হৈ করে উঠল। হেরম্বর জুনিয়র বললে, 'হোস্টাইল ডিক্লেয়ার করুন।'

'রাখো, অত চঞ্চল হলে চলে না।' হেরম্ব তর্জন করে উঠল : 'ওর বয়েস যদি আঠারোর কম হয়, ও যদি নাবালিকা হয়, তা হলে ওর আবার নিজের ইচ্ছে কী! বয়েসের কথায় পরে আসছি। যতক্ষণ ও নাবালিকা ততক্ষণ ধরে নিতে হবে, ওর বাপ যখন বেঁচে, ও ওর বাপের অধীনে আছে। দেখি না, কী বলে, ও ওর এই অধীনতা কোনোদিন ছিন্ন করেছে কিনা, ত্যাগ করেছে কিনা বাপের আশ্রয়। ওয়েট য়্যান্ড সি।'

সাক্ষীর দিকে, মানে লক্ষ্মীর দিকে, এক পা এগুলো হেরম্ব : 'তুমি যে বাড়ি ছাড়লে তখন রাত কটা হবে?'

মিথ্যে বলবে না লক্ষ্মী। বললে, 'নটা-দশটা।'

'যখন তুমি বেরোলে, তখন দোরগোড়ায় বা কাছেপিঠে কেউ ছিল, না, তুমি একাই বেরুলে?'

'হ্যাঁ, একা। নিজের ইচ্ছেয়।'

'বেশ। তারপর নিজের ইচ্ছেয় কদ্দুর পর্যন্ত গেলে?'

'ফকিরতলা, খেয়াঘাট।'

'সেখানে গৌরের সঙ্গে দেখা হল?'

'হ্যাঁ—'.

'গৌর বলেছিল সেইখানে সে থাকবে।'

চকিতে কাঠগড়ায় আসামীর সঙ্গে চোখাচোখি হল লক্ষ্মীর। বললে, 'না, আমিই তাকে থাকতে বলেছিলাম।'

'তা বলো। মানে দুজনে ঠিক ছিল ওখান থেকে নৌকো করে পালাবে।'

'হ্যাঁ, আর কোনো দিন ফিরব না।'

'নৌকো ভাড়া করল কে?'

'গৌর। তা চিরকাল পুরুষেই করে।'

'নৌকো চিনিয়ে নিয়ে তোমাকে কে তুললে?'

'যে ভাড়া করেছে সে ছাড়া কার নৌকো কে চেনে?'

'আর, এই দেখ, এসব চিঠি গৌরের লেখা?'

'তাতে কী হল?'

'কিছু হয়নি। জিজ্ঞেস করছি। তোমাকেই তো লিখেছে চিঠিগুলো।'

'আর কাকে লিখবে?'

'আর এসব চিঠিতে আছে, তোমাকে সে দূরে নিয়ে যেতে চাইছে।'

'আর কিছু নেই?'

'না তা তো আছেই, তা তো থাকবেই। কিন্তু ও-প্রস্তাবও আছে?'

'কিন্তু আমি যদি যেতে না চাই, আমাকে নেয় কে জোর করে?'

'তা তো ঠিকই।' হেরম্ব বসে পড়ল। জুনিয়রকে বললে, 'আমাদের এতেই হবে। এ কেস নয় যে মেলা দেখতে এসে মেয়ে পথ হারিয়েছিল আর গৌর তাকে তুলেছিল নৌকোয়। কিংবা এও নয় যে বাপের বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে আসার পর মেয়ে সামিল হয়েছে গৌরবের সঙ্গে। এরা পুরোনো পাপী।'

'আমরা দু'জনে এক দোষ করলুম, দিদি', মামলা -চলতি কালে বড় বোন কমলার কাছে বসে কেঁদেছে লক্ষ্মী : 'অথচ আসামীর কাঠগড়ায় শুধু একা গৌর দাঁড়িয়ে। আমি কেন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম না?'

'তোকে দাঁড়াতে দিলে তো!'

'কেন দিলে না? ও তো আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়নি, বরং আমিই ওকে ভুলিয়েছি। তবু সাজা দেবার বেলায় শুধু ওকে দেবে? আমাকে দেবে না? এ কেমন দুরন্ত আইন!' বলেছে আর কেঁদেছে লক্ষ্মী : 'উচিত ছিল কাঠগড়ায় আমাদের দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করানো। একসঙ্গে জেলে পাঠানো। দরোগাবাবু বলেছিলেন, তা যদি হতো, জেলখানাতেই আমাদের বিয়ে দিয়ে দিতেন।'

'তুই তো বোকামি করলি।' কমলা গলা নামিয়ে বললে, 'তোর উচিত ছিল ঝগড়া-ঝাটি করে এ বাড়ির ভাত খাই না বলে ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার বাড়ি পালিয়ে আসা। সৎ মা না অসৎ মা—দোরগোড়ায় লাথি মেরে ছুটে বেরিয়ে পড়া। তারপর গৌরকে খবর দেওয়া। দু'চার দিন পর গৌর এসে তোকে নিয়ে যেত আমার বাড়ি থেকে, দেখতিস, কোনো অপরাধ হত না।'

'হত না?' দিদির দু'হাত আঁকড়ে ধরল লক্ষ্মী।

'না, কী করে হবে? তখন তোর অভিভাবক বাবার হেপাজত থেকে তো নিয়ে যাচ্ছে না, নিয়ে যাচ্ছে তোর দিদির বাড়ি থেকে, যে বাড়িতে তুই বাপের আশ্রয় ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিস। তাহলে তোদের নৌকো দিব্যি তরতর করে বয়ে যেত। কেউ ধরতে পারত না।'

'আমরা অজ্ঞান, অধম—আমরা সরল, কারসাজি কারচুপির ধার ধারলুম না, তারই জন্যে আমরা ভুগলুম! বাঁ দিক দিয়ে ঘুরিয়ে খেলে দোষ নয়, ডান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে খেলে দোষ, দিদি, এ কোন বিধি?'

লক্ষ্মীর খোলা চুলে হাত বুলুতে বুলুতে কমলা বললে, 'তুই ছেলে-মানুষ, তুই এ সব বুঝবি না।'

'ছেলেমানুষ!' ঝঙ্কার দিয়ে উঠল লক্ষ্মী : 'কবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছি। সেই কবে বাবা ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন বড় হয়েছি বলে। ছেলেমানুষ হয়ে কী আমি না জানি! আর আমি বেশি জানি বলেই তো আমার এই দশা। বাবা আমাকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চাইছেন।'

'সব জানাজানি হয়ে গিয়েছে। কে আর তোকে বিয়ে করবে?' মামলা শেষ হয়ে যাবার পর আরেক দিন বলেছিল কমলা : 'তোর গোঁর জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তোকে বিয়ে করবে। তত দিনে তুই পেরিয়ে যাবি আঠারো।'

'কত আঠারো পেরিয়ে গেছি মনে-মনে।'

'তাতে কী আর হবে? হাড়ে-মাংসেও পেরিয়ে যাওয়া চাই।' কমলা শুধোল : 'কদ্দিন জেল হয়েছে রে গোঁরের?'

'ছ মাস।'

'মোটে?' আশ্বাসের সুরে বললে কমলা, 'এ দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'কই কাটছে কই? দু জনের যদি এক সঙ্গে সাজা হত তা হলে বরং কাটত তাড়াতাড়ি। দু জনেই এক সঙ্গে আগুনে হাত দিলুম, ওর হাত পুড়ল আমার পুড়ল না, এ কেমন আগুন?'

'তুই যে ছেলেমানুষ।'

বয়সের কথাটাই উঠেছিল প্রধান হয়ে।

দেখতে তো বেশ ঢ্যাঙা, ছন্দে-বন্ধে বেশ জোরদার। নির্ঘাৎ আঠারোর বেশি। রব তুলেছিল আসামীর উকিল।

উপর-উপর দেখলে কি চলবে? আর উপর-উপর দেখতে যদি চান, মুখখানি দেখুন, বললে হেরম্ব। মুখখানি কী কচি।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভেংচি কাটল লক্ষ্মী।

'তাতে কি আর বয়স বাড়বে?' জজ সাহেব স্বয়ং চিপটেন কাটলেন।

'অত কথায় কাজ কী। ডাক্তারি রিপোর্ট দেখুন। ঘটনার দিন লক্ষ্মীর বয়স বড় জোর সতেরো বছর ছয় মাস। কিছুতেই তার একদিন বেশি নয়। আজ মামলার শুনানির দিন ওর কত বয়স সেটা দেখতে হবে না। দেখতে হবে ঘটনার দিন, ওকে যখন গোঁর বার করে নিয়ে যায় তখন ওর বয়েস কত? তখন ওর বয়স আঠারোর কম ছিল কি না। একদিন কম হলেও অপরাধ হয়ে যাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে অন্তত ছয় মাস কম ছিল।'

মামলার পর লক্ষ্মী তার সই শৈলকে বলেছিল, 'শোন একবার কলঙ্কের কথা। ছ মাস পরে বেরুলে যা অপরাধ হত না, ছ মাস আগে হল বলেই তা অপরাধ।'

'তেমন হলে কটা মাস অন্তত তো হাঁসপাতালেই কাটাতে পারতিস।' প্রতিবেশিনী সখী শৈল পর্যন্ত তার দিকে।

'কত কিছুই করতে পারতাম।' লক্ষ্মী কান্নাঝরা গলায় বললে, 'এ ভদ্রলোকের মত বেরুনো কি না, তাই যত শত্রুতা। কোনো ভালোই কেউ দেখতে চায় না, আজকাল। তাই সকল ভালোর সেরা ভালো যে ভালোবাসা তাই সকলের দু' চক্ষের বিষ। তোকে কী বলব। তুই তো সব বুঝিস। হ্যাঁ, আমি বেরুতুম না বাড়ি থেকে। ঐ ছ মাস বাড়িতেই থাকতুম। কিন্তু থাকতুম বিতিকিচ্ছি হয়ে। ভূত হয়ে, কিম্ভুত হয়ে। তখন দেখতুম কী করে গৌরের জেল হত। অন্য যার-তার নাম বলে দিতুম, কিংবা বলতুমই না কিছু। যদি গৌরের সঙ্গে বিয়ে দাও তো গৌরের নাম বলি। বুঝলি শৈল, ভদ্রলোক থাকলুম কিনা, পরিষ্কার থাকলুম কিনা, তাই লোকের চোখ টাটাল—'

'ডাক্তারি পরীক্ষা অদদূর পর্যন্ত গিয়েছিল নাকি?' মাথার কাপড়টা ঘন করে টেনে শৈল জিগগেস করল গাঢ় হয়ে।

'শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল। সুযোগ পেলে ডাক্তার কখনো ছেড়ে দেয় নাকি? পুলিশ চেয়েছিল অপরাধের মাত্রাটা বাড়ানো যায় কিনা। কিন্তু তন্ন তন্ন পরীক্ষার পরও ডাক্তার কিছু পেল না। তখন শুধু ভালোবাসাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাল।'

'প্রায় এক রাত নৌকোয় কাটালি দুজনে, অথচ—' শৈল আরো এগিয়ে এল।

'গৌর যে খুব ভালো। বললে, যদি কিছু অন্যায় করি নদীতে, দেখবে, ঠিক ধরা পড়ে যাব। দেখবে এই মাঝি দুটো যেমন চোখে চাইছে ওরাই ধরিয়ে দেবে। তুমি তো লক্ষ্মী, তুমি শুধু লক্ষীটি হয়ে ঘুমোও, আমি সারারাত তোমাকে দেখব আর পাহারা দেব। দেখবে আমরা শান্তিতে থাকব, সব শান্তি হবে। কেউ আসবে না ধরতে। ঠিক চলে যেতে পারব কলকাতায়। আর কলকাতায় পেঁছুতে পারলে আর আমাদের পায় কে।'

'কিন্তু শান্তিতে থাকলেও তো সেই ধরলই—'

'শান্তকেই তো ধরবে। দুর্বল আর নিরীহকে ধরাই তো বাহাদুরি। শেষ রাত্রের দিকে দু দুটো পুলিশের নৌকো ঘিরল আমাদের। জানিস, তখনো আমি ঘুমে। গোলমালে আমি জেগে উঠতে চাইছি, আর গৌর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছে। বলছে, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়, তুমি ঘুমোও— যতক্ষণ আমি জেগে, আমি বেঁচে, ততক্ষণ তোমার ভয় কী—' কেঁদে ভেঙে পড়ছে লক্ষ্মী।

হেরম্ব বললে, 'বয়সের আরো প্রমাণ আছে, স্কুলে ভর্তি হবার সময় কী লিখিয়েছিল তার বাবা—'

'ও আবার একটা প্রমাণ!' বললে আসামী পক্ষ।

'অকাট্য নয় হয়তো কিন্তু ও যদি উলটোটা দেখাত, যদি দেখাত ঐ হিসেবে আঠারোর বেশি হয়, তা হলে একটা সন্দেহ হত নিশ্চয়ই। আর যুক্তিযুক্ত

সন্দেহ আনতে পারলেই তো আসামীর পোয়াবারো। কিন্তু ঐ স্কুলের হিসেবেও ঘটনার দিন লক্ষ্মীর বয়স সতেরো বছরের বেশি হয় না।'

'কী ছাই পড়তে গিয়েছিলি স্কুলে!' শৈল আরো দুঃখ করেছিল : মাঝপথে । বাপ অকারণে নিয়ে এল ছাড়িয়ে।'

'বাবা ঠিক নয়, ঐ অসৎ-মা। উনি কাজ করবেন আর আমি দিনমান ইস্কুলে কাটাব এ সহ্য হল না। তবু ভাগ্যিস একটু লিখতে-পড়তে শিখেছিলাম। তাই তো ভাই চিঠি লেখালেখি করতে পারলাম। কথা কইবার চেয়েও এ আরেক রকম সুখ, চিঠি লেখা, চিঠি পাওয়া। সেই লেখার লোকটি ভাই কী সুন্দর! সে যেন আরেক লক্ষ্মী, আরেক গৌর!'

স্বয়ং জজ পর্যন্ত বললে, 'বাক্যে বানানে ভুল, কিন্তু যাই বলুন চিঠিগুলিতে বেশ একটা সারল্যের ভাব আছে।'

তদন্তকারী দারোগা মন্মথ পালেরও সেই মত। বিরূপাক্ষকে বললে, 'কেন ঝামেলা করছ, গৌরের সঙ্গেই মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও। যাঁহা বাহান্ন তাঁহাই তিপ্পান্ন। যাঁহা সাড়ে সতেরো তাঁহাই আঠারো।'

লক্ষ্মীকে বললে ঠাট্টা করে, 'যদি ষড়যন্ত্রী বলে আইনে শাস্তি দেওয়ার বিধান থাকত, তা হলে জেলরকে বলে জেলের মধ্যেই তোমাদের বিয়ে ঘটিয়ে দিতাম।'

কিন্তু বিরূপাক্ষ ছাড়ে না। জুরি ছাড়ে না।

জজ ছাড়েন কী করে? কিন্তু শাস্তি দেবার বেলায় জেল দিলেন মোটে ছ মাস। বললেন, 'আজ এই মামলার নিষ্পত্তির দিন লক্ষ্মীর বয়স সতেরো বছর ছ মাস। গৌর যখন বেরিয়ে আসবে জেল থেকে, তখন যেন দেখে লক্ষ্মী স্বাধীন হয়েছে, সাবালক হয়েছে। সেটা শুধু গৌরের নয়, যেন সেটা লক্ষ্মীরও কারামোচনের দিন হয়।'

'মানে,' মন্মথ বুঝিয়ে দিলে, 'জেল থেকে বেরিয়েই যেন গৌরহরি বিয়ে করতে পারে লক্ষ্মীকে।'

'বিয়ে করাচ্ছি।' বললে বিরূপাক্ষ। ছ মাস পেরোবার আগেই লক্ষ্মীর বিয়ে সে ঠিক করে ফেলেছে। ট্রাঙ্কের কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করে, পাশালি গ্রামে থাকে অনিল দাস, সেই বিরূপাক্ষের মনোনীত।

সেই বিয়ে খণ্ডাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে লক্ষ্মী।

সে তো গোপন কোনো অভিসারে যাচ্ছে না যে তার আঠারো বছর পোরাতে হবে। সে আজ একা চলেছে। তাকে আজ কে ধরে? সে চলেছে জেলের দিকে। তার গৌরের দিকে। চোরের আবার অভিভাবক কী?

একটা সাইকেলকে বাঁচাতে গিয়ে বাসটা সবেগে ডাইনে বাঁক নিল, সঙ্গে-সঙ্গে ব্রেক।

ফলে বাসের মধ্যে হুলস্থূল।

কতক্ষণ পরেই কেদারনাথের আর্তনাদ : 'আমার ব্যাগ? মনি-ব্যাগ?'

হৈ-চৈ পড়ে গেল চারদিকে। কাউকে নামতে দেবেন না। কোমর বাঁধল একজোট হয়ে।

'নিচেটাই ভালো করে খুঁজুন, ছিটকে কোন সিটের তলায় চলে গিয়েছে হয়তো।' কে একজন নিরীহ ইঙ্গিত করল।

'মোটেই সিটের তলায় নয়।' কোণ থেকে কে একজন এগিয়ে এল : 'আমি জানি কে নিয়েছে ব্যাগ। সব দেখেছি আমি স্বচক্ষে।'

'কে? কে?' সমস্ত বাস লাফিয়ে উঠল।

'ঐ যে, উনি।' দেখিয়ে দিল লক্ষ্মীকে : 'ব্যাগ সিটের তলায় নয়, ওঁর জামার তলায়।'

'বার করে দিন ব্যাগ।' ছোকরার দল সতেজ দাবি করল।

ঠায় বসে রইল লক্ষ্মী।

ভাবতে লাগল, এর চেয়ে সেই নৌকোয় ধরা পড়াটা কী মনোহর ছিল।

'আপনি ওর জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখুন—'

বাসের যাত্রিণী এক মহিলাকে আদেশ করল সোয়ারিয়া।

যথাদিষ্ট হাত ঢোকালেন মহিলা। বেরুল মনিব্যাগ।

তা হলে আর কথা কী। সমস্ত বাস নিয়ে চলো থানায়। থানা বেশি দূরে নয় বলেই বলছি। নইলে মেয়ে-পকেটমারকে সশরীরে নিয়ে যাই কী করে! মেয়ে-পুলিশ আর এখানে কোথায়!

বাসকে দাবি মানতে হল। চোর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের নামিয়ে দিল থানায়।

থানায় সেকেন্ড অফিসর সেই মন্মথ দাসই এখনো আছে। ছন্নছাড়ার মত চেহারা, লক্ষ্মীকে চিনতে পারল এক নজরে।

'এ কি, তুমি! তুমি পকেট মেরেছ!'

'আর কী?' ঝকঝকে দাঁতে দিব্যি হাসল লক্ষ্মী : 'এবার তবে জেলে পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা ভুল করবেন না যেন। যড়যন্ত্রী হয়ে তো যেতে পারলাম না, তাই এবার শুধু যন্ত্রী হয়ে এসেছি। যেখানে গৌর সেখানেই তো লক্ষ্মী।'

সবাই অবাক মানল : 'এ কি দাগী নাকি?'

মন্মথ নিশ্বাস ফেলে বললে, 'নিদারুণ।'

পুলিশ চার্জসিট দিলে না।

কেদারনাথ চাইল না অগ্রসর হতে। দেখুন মেয়েটা বোকা, আনাড়ি। ও অনায়াসে ব্যাগটা ফেলে দিতে পারত। হাত দিয়ে তুলে না হোক তো পলকে জামার বাঁধনটা আলগা করে গলিয়ে দিয়ে। তারপরে অনায়াসে দাবি করতে পারত ওটা ওর গা থেকে পড়েনি, যার ব্যাগ তার পকেট থেকেই পড়েছে। এখন ওকে শাস্তি দেওয়া মানে ওর বোকামির জন্যে শাস্তি দেওয়া। সেটা মোটেই সমীচীন নয়। তাছাড়া ব্যাগ যখন আস্ত পাওয়া গিয়েছে তখন আবার হাঙ্গামা কী! তাছাড়া যেটা সব চেয়ে বড় কথা, এই কদিন বাদে ওর বিয়ে হচ্ছে।

'হ্যাঁ' মন্মথ বললে, 'ওর বিয়ে একবার আমরা হতে দিইনি। এবারও ভণ্ডুল করে দেব, এটা ঠিক নয়। ও বোকার মত ইচ্ছে করে ধরা দিল বলেই আমরাও বোকার মত ইচ্ছে করেই ওর জীবনের লাল দিনটা কালো করে দেব, ধর্ম বলবে কী।'

ফাইন্যাল রিপোর্ট দিল পুলিশ। ম্যাজিস্ট্রেট ছেড়ে দিল লক্ষ্মীকে।

দিদির বাড়ি মাসির বাড়ি—এখানে-ওখানে পালিয়ে-পালিয়ে ঠিক-করা বিয়েটা এড়াতে লাগল লক্ষ্মী। গৌরের বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

গৌরের বেরিয়ে আসতে-আসতে সে পূর্ণ সাবালক। তখন আর তাকে পায় কে। তখন তার নিজের ইচ্ছেয় বেরুনো। তখন আর ফুসলানোর মামলা নেই।

'তবু বাবার যা মতিগতি!' কমলা বললে, 'কী বলে পিছনে লাগে তার ঠিক কী।'

'তাই মাঝেমাঝে মনে হয় আমার বিরুদ্ধে পুলিশ মামলাটা তুলে না নিলেই ভালো হত!' লক্ষ্মীর মুখ-চোখ আলো হয়ে উঠল : 'দিব্যি জেলে যেতাম। গৌরের সঙ্গে দেখা হত। কোনো ঝামেলা থাকত না। দিব্যি জেলেই আমাদের বিয়ে হয়ে যেত।'

'ওর বেরিয়ে আসার আর কদ্দিন বাকি?'

'আর আট দিন।'

ঠিকঠাক বেরিয়ে এল গৌর। না, বিরুপাক্ষ ঝামেলা বাধায়নি। গৌরই স্পষ্ট বলে দিল—একটা পকেটমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না।

৫৩। দস্তখৎ

চৌকিদারের চাপ আর ডাকবাক্স, গ্রামের এইটুকুই শুধু আভিজাত্য। আর রানার আসে হাটবারে।

নইলে, আগে যেমন পাড়াগাঁ ছিল, এখনো তেমনি পাড়াগাঁ। জলা, বাঁওড় আর ধানখেত। হঠাৎ এক একটা দাঁড়ায় বা ডাঙা জায়গায় বসবাস।

উত্তর পাড়া আর দখিন পাড়া। মানে ভদ্রপাড়া আর চাষাপাড়া।

ভদ্রপাড়ায় পাঠশালা। চাষাপাড়া থেকেই কেউ-কেউ আসে পড়তে। প্রায় তিন পো রাস্তা ধুলো-কাদা ভেঙে। তাদের মধ্যে হলধরই প্রথম ছাত্র।

আরো ছিল কয়েকজন। মাহিষ্য আর ক্ষীরতাঁতি। তারা আগেই পালিয়েছে। শুধু হলধরই নাম-দস্তখৎ পর্যন্ত ছিল। নাম সই করতে পেরেই ভাবল, ঢের হয়েছে। এখন আর কেউ বোকা পেয়ে বুড়ো আঙুলের মাথা ধরে টিপ-সই করিয়ে নিতে পারবে না। কলম ছুঁইয়ে ঢেড়া-সই করার জোচ্চুরি থেকে সে রেহাই পাবে।

বুঝে-সুঝে ধীরে-সুস্থে সে সই করে। সই করে নানান জায়গায়। দলিলের কানিতে, জবানবন্দির নিচে, হাতচিঠার মবলগবন্দিতে।

দস্তখৎই করতে পারে, কিন্তু পড়তে পারে না আগাগোড়া। বললে, ইস্কুল খুলব। আমাদের নিজেদের ইস্কুল। আগে বলত চাঁড়াল, এখন হয়েছি তপশিলী। আমরা চাষবাস করছি করি আমাদের ছেলেরা চাকরি করবে।

দখিন পাড়ায় ইস্কুল বসল।

হোক ওদের পাকা দালান, আমাদের মাটির ঘরই ভাল। থাক ওদের পেটা-ঘাড়ি, আমাদের ক্যানেস্তরা পিটিয়েই চলবে। ব্ল্যাক-বোর্ডে দরকার নেই, আমাদের তালের পাতাই যথেষ্ট।

চলল আকচাআকচি। চলল ছেলে-ভাঙানো।

তবু দুটো ইস্কুলই টিকে রইল কোনোরকমে।

কিন্তু অন্যভাবে বদল ধরল চেহারায়। ভদ্রপাড়ায় জঙ্গল গজাতে সুরু করল। আশ-শেওড়া, কেয়োঠুটি, ভাঁট আর শেয়াকুলের ঝোপ। ঢোলকলমি, মরিচা আর তেলাকুচার লতা। ঝোপঝাড়ের মাঝে হাড়গোড় বের করা দু'-একখানা কুঁড়ে ঘর। পাকা ইমারত যা দু'একখানা আছে ঝরে-ঝরে পড়ছে। জঙ্গলে-আগাছায় এত অন্ধকার, এক ঠাঁই থেকে আরেক ঠাঁইয়ে যেতে ভয় করে। খানা-সই হতে হয়।

দখিন পাড়ায় খোলা মাঠ, অঢেল ধানখেত। ঠাণ্ডা সবুজে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাড়ির হাতায় কলা-কচুর বাগান। গোয়াল-ঘর। পোয়ালকুঁড়।

ভদ্রপাড়া পড়তি। চাষাপাড়া উঠতি। চাষা এখন চাষী হয়েছে, হয়েছে অনেক সম্ভ্রান্ত। আর ভদ্ররা হয়েছে বেকার, বাউণ্ডুলে।

চাষাপাড়ার ইস্কুলে আরো উন্নতি হয়েছে। আগে তালপাতার ছিল, এখন হয়েছে খড়ের ছাউনি। ভেলকো বাঁশের খুঁটি। ক্যানেস্তেরার বদলে ঘন্টা। চ্যাটাই ছেড়ে ছেলেরা এখন মাদুরে বসেছে। মাস্টারের মাইনে বেড়েছে আট আনা।

যাই হোক, নেই ওদের বেঞ্চি-চেয়ার, নেই ব্ল্যাকবোর্ড, নেই বা গ্লোব-ম্যাপ। ভদ্রপাড়ার ইস্কুল নাক উঁচিয়ে থাকে। বলে, গো-বদ্যির পাঠশালা। ইস্কুল বলতে পর্যন্ত স্বীকার হয় না।

চলেছে এমনি টেক্কা-টেক্কি—দেশে শিক্ষা-কর বসল। এলেন ইনস্পেক্টর। ভদ্রপাড়ার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'চলবে না ও-ইস্কুল।'

'কিন্তু দখিন পাড়ারটা?'

'ওটাও না।'

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এক গ্রামে একটার বেশি ইস্কুল থাকতে পারবে না। দুই ইস্কুল মানেই দুই দল, চলবে না আর কলহ-কচকচি। তাছাড়া, দুই ইস্কুলে খয়রাতি করবার মত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পয়সা নেই।

'বেশ তো, এক ইস্কুলই যদি রাখতে হয়, আমাদেরটাই থাকুক।' ভদ্রপাড়ার

কে বললে, 'এটাই হচ্ছে সব চেয়ে পুরোনো। পাকা বাড়ি, বেঞ্চি-চেয়ার, ঘড়ি-ঘণ্টা—সব দিক দিয়ে এরই হক-হকিয়ত বেশি। তাছাড়া এর গা ঘেঁসেই নলকূপ—ছেলেরা জল খেতে পাবে। নতুন যে কোনো জায়গায় ইস্কুল বসাবেন, কম-সে-কম হাজার টাকা খরচ। বাড়ি চাই, আসবাব চাই, নলকূপ না হলেও পুকুর চাই জল খাবার। চাই রাস্তাঘাট। অত জুটবে কোত্থেকে?'

যুক্তিগুলোকে এক কথায় হটিয়ে দেয়া যায় না। ইনস্পেক্টর সেদিক দিয়ে গেলেন না। বললেন, 'পাশেই যে ঠাকুরের থান।'

পাশেই কালীতলা। রক্ষাকালী। গাঁয়ে যখন মড়ক লাগে তখনই পুজো হয় মহানিশায়। তাও ক্বচিৎ-কদাচিৎ।

তাহলে কি হয়, পাঁচ জাতের ছেলে নিয়ে ইস্কুল, সবার মন বাঁচিয়ে চলতে হবে। যে রক্ষা করবে সেই যদি অরক্ষণীয়া হয়ে ওঠে সেটা খুব শান্তির ব্যাপার হবে না।

'ঠিক, ঠিক।' হলধর-মহীধররাও উলটো দিকে তরফদারি করতে লাগল।

পঞ্চাশ বছরের উপর এই ইস্কুল। পঞ্চাশ বছরের উপর এই ঠাকুরের জায়গা। শেষকালে তোরাও উলটো গাইলি? তুই হরি ঘড়ই? তুই অঘোর কয়াল? তুই রামতারণ দুয়ারি?

একটা জিনিস অনেকদিন ধরে চলেছে বলেই চিরকাল চলবে এমন কোনো কথা নেই। তাহলে আর মহাজনী আইন হত না, হত না ঋণশালিসী। তবে চিরকালই ওরা ফৌত-ফেরার হয়ে থাকত। তাই না?

'তবে ইস্কুল হবে কোথায়?' তিক্ত গলায় ভদ্রপাড়া জিগগেস করলে।

'আমাদের দখিনপাড়ায়।' ফুর্তিতে উজিয়ে এল তপশিলীরা।

না, তাও না। দখিন পাড়ার ইস্কুলটা একেবারে এক টেরে। ওখানে হলে ভদ্রপাড়ার ছেলেরা অসুবিধের পড়বে। ইস্কুল হবে গাঁয়ের মধ্যিখানে। প্রায় রশি মেপে। যাতে কোনো পাড়ারই না নালিশ থাকে।

ইনস্পেক্টর 'সাইট-সিলেকশন' বা স্থান নির্ণয় করলেন। চণ্ডীবাঁওড়ের ধারে। নামেই শুধু চণ্ডী। তা নিয়ে কারু আপত্তি নেই। কেননা খোদ গাঁয়ের নামই বিবিবাজার।

দড়ি ধরে সমান-সমান মাপতে গেলে ইস্কুল এনে বসাতে হয় ধানখেতের উপর, বিলের মধ্যে। তাই, উপায় না দেখে ইনস্পেক্টর ভদ্রপাড়ার দিকেই একটু আলগা দিলেন। চণ্ডীবাঁওড়ের ধার ভদ্রপাড়ার সীমানায়।

কোনো পাড়াই খুশি হলো না। তবু অন্যের ইস্কুলটা চালু হলো না বলে দু' পাড়াই খুশি হলো।

যে, জায়গাটা ঠিক করা হয়েছে সেটা নিবারণ বোস গয়রহের। তারা পাঁচ শরিক। অংশ নিয়ে ঝগড়া। এক্কেক বছর একেক জন উপরিস্থ মালেকের ঘরে খাজনা দেয় আর ভর্তব্যের মামলা করে। তবু আলসেমি করে আপোষে বা আদালতে কিছুতেই বাঁট করে নেয় না।

বিবাদী জমি—দিয়ে দিক ইস্কুলের কাজে, ভদ্রপাড়া ধরল গিয়ে বোসেদের। এ রাজি হয় তো ও রাজি হয় না; ও রাজি হয় তো এ সেলামি চায়। তাছাড়া জমিতে কোল-রায়ত আছে, হলধর মহীধরদের জাতকুটুম—হিরেলাল মিন্দে আর নন্দলাল সানাইদার। চাষাপাড়ার পরামর্শে তারা জমি ছাড়তে চায় না। খাজনা পাওনা আছে বকেয়া, উৎখাতের নালিশ করে দিলেই হয়। তবু বোসেরা উঠে বসতে চায় না। গাঁয়ে একটা ইস্কুল হলেই বা কি, উঠে গেলেই বা কি! কে আবার যায় ও সব নালিশ-ফয়শালার মাঝে!

'কই গো বাবুরা, জমি কি হল?' চাষাপাড়া ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করে।

'এই হচ্ছে—' বাবুরা কান চুলকোয়।

'তোমরা অনেক নেকাপড়া শিখেছ তোমরা সবুর করতি পার আমরা পারি না।' চাষাপাড়া ঘোঁট বাঁধল।

এ-জমি ছেড়ে ও-জমি, চন্ডীবাঁওড় ছেড়ে কালীবাঁওড়, কোথাও ভদ্রলোকেরা জমি পেল না। বিনা মুনফায় সূচ্যগ্র মেদিনী দান করতে কেউ প্রস্তুত নয়।

দখিন পাড়ার দিকে ষষ্ঠী আঁটুলির খাদাড় পড়ে আছে, তারই উপর চাষাপাড়া ঘর তুললে। দোচালা ঘর। বললে 'এই আমাদের ইস্কুল।'

এই আমাদের ইস্কুল।

চাষাভুষোরা কাস্তে দিয়ে খাগ কেটে কলম বানালে।

'ঠাকুরদের বললাম, দেই সুতো গেড়ে, ঠাকুরেরা তা শোনলেন না।' হলধর বললে মুরুব্বির মত : 'কেবল নিজেদের কোলে ঝোল টানবে। তখন বললাম উমোচরণের ভিটেয় একখানা দোচালা তুলে দিই! তা হবে কেন, তাতে ভটচাজ্জি মশায়ের ক্ষেতি হবে যে। সব শালা বিটলে। বাবুদের ক্ষেমতা কত বুঝেছি। ওদের ন্যাজ ধরে আর থাকব না। ঘর একবার খাড়া করতি পেরেছি, আমাদের এখন পায় কে। আমাদের দিকে ফজু মিয়া আছে, রাজবালী আছে, মোমরেজ আছে—কারুর আমরা আর তোয়াক্কা রাখি না।'

'ষষ্ঠীর সঙ্গে একটা নেকাপড়া করে নিলে হত না?' কে একজন টিপ্পনী কাটল।

'নেকাপড়া না আরো কিছু! ষষ্ঠী যদি কিছু হেভ্ডাপেন্ডা করে তবে তার গলা টিপে সাত হাত জিব বার করে ফেলব। কি রে ষষ্ঠী, গোলমাল করবি নাকি?'

ষষ্ঠী সামনেই ছিল, লজ্জিতের মত মুখ করে বললে, 'আমি কি ভদ্দর-লোকের মত ছোটলোক?'

ফজলে রহমান হল ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট।

আর হলধর বললে, বুক ফুলিয়ে, 'আমি ভাই-প্রেসিডেন্ট।'

গ্রামের মধ্যে প্রথম অবৈতনিক স্কুল। একেই স্বীকৃতি দিলেন ইনস্পেক্টর। ভদ্রপাড়ার টনক নড়ল। ইনস্পেক্টকে গিয়ে ধরে পড়ল, 'সেই যখন

মধ্যিখানেই ইস্কুল হল না, তখন আগের মত দুটো ইস্কুলই চলুক না। ওরা নতুন করেছে করুক, আমাদের পুরোনোটাও বেঁচে উঠুক।'

'দুটো স্কুলকে গ্র্যান্ট দেবার মত পয়সা নেই।'

'নেই তো, ঐ বেজায়গার ইস্কুলকেই বা দেবেন কেন?'

'আপনারা পারলেন না, ওরা পারল, ওদেরই তো দেব একশোবার। ঠিক মধ্যিখানে না হলেও একেবারে সীমানায় হয়নি। দু' পাড়ার ছেলেরাই বেশ আসতে পারবে।'

তর্ক করা বৃথা। তাই ভদ্রপাড়া ধরল গিয়ে ষষ্ঠী আঁটুলিকে। বললে, 'উকিল মুহুরি কিছু লাগবে না তোর, দে এক নম্বর মামলা ঠুকে। অদানে অব্রাহ্মণে যাবে অমন জমিটা!'

ষষ্ঠী চোখ পাকিয়ে বললে, 'খবরদার, ইদিক এসো না বলে দিচ্ছি। ওসব মন্দ কথায় আর কান দিচ্ছি নে। অনেক ন্যাকরা করেছ, আর লয়।'

ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেল সবাই। উপায় কি।

উপায় ফের সেই ইনস্পেক্টরকেই ধরা। তাঁকে বোঝানো, এক ইস্কুলে সমস্ত গাঁয়ের সমান সুবিধে হবে না। উত্তর পাড়া দূরে পড়বে, ঠকবে। দাঁড়ায়-দাঁড়ায় বসবাস, মাঝখানে বাদা-বাঁওড়—গ্রামের যেরকম অবস্থিতি, দু' অঞ্চলে অনায়াসে দুটো ইস্কুল চলতে পারে। সরকার থেকে দুটো ইস্কুলকেই গ্র্যান্ট দেয়া উচিত।

ইনস্পেক্টর নরম হলেন। বললেন, 'জমি পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। বোসেরা এতদিনে রাজি হয়েছে।'

এ উত্তর শুনবেন আশা করেননি ইনস্পেক্টর। বললেন, 'বেশ, সমস্ত গাঁয়ের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় ইস্কুলের জন্যে দরখাস্ত দিন, বিবেচনা করব।'

দরখাস্ত লিখে তার উপর সই নেয়ার হিড়িক পড়ে গেল।

সমস্ত গাঁয়ের পক্ষ থেকে। তাই চাঁই মুসলমান ও তপশিলীদেরও সই দরকার।

ভাগ্যধর মাঝি ইস্কুলের 'ছেরকট' বা সেক্রেটারি। সে বললে, 'তা—আমরা এট্টা ইদিকি করিছি, তোমরা—আপনারা এট্টা ওদিকি করবা, তাতে আমাদের কি? করতি পার কর। আমরা ওর মদ্দি নেই।'

'গ্রামে দুটো ইস্কুলই তো ছিল। সেই দুটোই যদি আবার হয়, তবে লোকসান কি?'

'লোকসান? তোমরা আমাদের পাঠশালাটা খাবা, তারই ফন্দি আঁটছ। আগে তো আমরা বলেলোম তোমাদের ইস্কুলডাই হোক, তোমরা ঠাকুরেরা তো ফেসে দিলে। এখন সাউগুড়ি করতে আসেছে। ওসব হবেটবে না। তোমাদের ইস্কুল তোমরা দ্যখিবা, আমরা আমাদের দ্যাখব। তখন ঘরখানা বাঁধবার জন্যি কত ব্যাগত্তা করেলাম, বাবুদের ম্যাজাজ কি! আর এখন আমরা নিজেরা যেই এট্টা খাড়া করেছি—গা জ্বালা করতি লেগেছে।'

'তোমাদের ইস্কুল তো আমাদেরও ইস্কুল।' ভদ্রপাড়া পিঠে হাত বুলোয় : 'আমাদেরটাও তোমাদের। গোটা কতক সই জোগাড় করে দাও।'

'ও সব সই-সাবুদে আমরা নেই। আমাদের কমুটি আছে। সেই কমুটি যা বলবে তাই হবে।'

'আচ্ছা, বেশ তো তোমাদের কমিটি আজ ডাক, আমরাও থাকবোখন।'

'কনে বসবা?'

'ভটচাজ্জি বাড়ি।'

'আচ্ছা বলে দেখি আর সব মুরুব্বিদের। যদি রাজি হয়, যাবনে।'

'যাবোখন নয়। যেয়ো ভাই লক্ষ্মীটি।' ভদ্রপাড়া প্রায় পায়ে হাত বুলোয় : 'দরখাস্তটা শিগগিরই দাখিল করতে হবে।'

'হেঁ-হেঁ ঠাকুর, তোমাদের তাড়া আর আমাদের তাড়া এক লয়। বুঝলে?' ভাগ্যধর অদ্ভুত করে হাসল : 'সে দিনকাল আর নেই। তোমাদের চোল আমরা বুঝি।'

ভাগ্যধর হলধরের বাড়ি গেল। হলধর দাবায় উবু হয়ে বসে তামাক খাচ্ছে। সব শুনলে আগাগোড়া। চুপ করে রইল।

'ভদ্দরলোকেরা যাতি বলতেছে। যাবি?' জিগগেস করলে ভাগ্যধর।

'হেঁ-হেঁ, তুই লে-লে।' হলধর ঘৃণায় ঝংকার দিয়ে উঠল : 'কি করতি যাবি? কেবল কথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলবেনে, আমরা কিছুই জবাব দিতি পারব না। তলে-তলে কাজ গুছিয়ে নেবে।'

ভদ্রপাড়া ফজলে রহমানের বাড়ি গেল। রহমান এক গাল হেসে বললে, 'সই করতি শিখেলোম কবে?'

'তবে অন্তত টিপ সই দাও।'

'ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে বুড়ো আঙুল দুটো পুড়ে গেছে।' রহমানের দুটো আঙুলেই ন্যাকড়ার টিপলি।

অন্তত ভাই-প্রেসিডেন্টের সই হলেও খানিক মান থাকে। গেল সবাই হলধরের বাড়িতে।

'শুধু একটা দস্তখৎ দে, হলধর।'

হলধর ঝিম মেরে রইল। শুধু একটা দস্তখৎ। তার নামের দস্তখৎ।

দারোগা এজাহারে সই করে। হাকিম রায়ে সই করে। লাটসাহেব সনদে সই করে। তেমনিই আজ তার দস্তখতের দাম।

'যে ইস্কুল তোকে দস্তখৎ করতে শিখিয়েছে সেই আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে, হলধর—'ভদ্রপাড়া কায়দা করে কথা ছুঁড়ল।

'কই দেখি দরখাস্তটা।'

উলটে-পালটে দেখতে লাগল হলধর। বললে, 'কিছুই পড়তি পাচ্ছি না যে।'

'পড়বার কিচ্ছু দরকার নেই। শুধু দস্তখৎ করে দে।'

হলধর হাসল। অশিক্ষিত বটে, কিন্তু বড় জ্ঞানীর হাসি। বললে,

'এতদিনে, এত বচ্ছর ধরে শুধু নাম-দস্তখৎটাই শিখোয়েছ। পড়াতি শেখায়োনি কাঁচকলা। পড়াতি শিখলেই যে সব ধরে ফ্যালব। তাই জোর করে রেখোছ কেবল অন্ধকারে।'

'বেশ তো, তোমাকে পড়িয়ে শোনাচ্ছি।'

'শোনা কথায় আর বিশ্বাস নেই ঠাকুর। আমার ছেলে গেছে আমাদের ইস্কুলে। লেখাপড়া শিখে আসুক সে লায়েক হয়ে। তখন সে পড়ে দেখবেনে দরখাস্ত। আমার বদলে তখন সেই সই করে দেবেনে। তদ্দিন থাক এটা আমার ঠেঙে। কি বল আপনারা?'

হলধর দরখাস্তটা সযত্নে ভাঁজ করতে লাগল। ভাঁজ করে গুঁজে রাখল চালের বাতায়।

৫৪। পাপ

হঠাৎ যেন কে কেঁদে উঠল অন্ধকারে।

লন্ঠনের শিখাটা খানিকটা আগে কমিয়ে দিয়েছিল অমিতাভ। আবার বাড়িয়ে দিল আস্তে-আস্তে।

তবু তাকাল একবার ত্রস্ত চোখে। পুব আর দক্ষিণের জানলা খোলা। তাকাল বাইরে, চার দিকে। কই, কেউ কোথাও নেই। এদিক ওদিক দুদিকের রাস্তাই কখন নির্জন হয়ে গিয়েছে। ফিরতি শেষ বাস কখন চলে গিয়েছে ডিপোয়। মুদির দোকানের আলোটাই জবলে অনেক রাত, তারও আয়ু শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। দূরে শোনা যাচ্ছে না আর খেয়াঘাটের ডাকাডাকি। আশেপাশের বাড়িতে কোথাও এতটুকু আলোর বিন্দুবিসর্গ নেই। ঘুমের মতন উদাসীন অন্ধকার।

আবার কান পাতল অমিতাভ। যেমন বন্ধ ঘরে কান পাতে তেমনি। ঠিক শুনল সেই কান্নার স্বর। অস্ফুট কিন্তু ছুঁচের মত প্রত্যক্ষ।

যেন কিছু বলে বলে কাঁদছে। কী বলছে বলো তো? কান খাড়া করল। আমাকে বাঁচাও। আমি বিপন্ন। আমাকে তোলো, আমাকে ধরো।

সেই কখন থেকে টেবিলের সামনে ঠায় বসে সে চেয়ারে। একবার ঘুরে দেখে আসতে হয়। অন্তত সামনের ছাদ থেকে টর্চ ফেলে আনাচ-কানাচ।

আশ্চর্য, যে কাঁদছে তার চেয়ে যে কান্না শুনছে তার যেন বেশি বিপদ। বেশি ভয়।

টেবিলের টানা খুলে টর্চ বের করল অমিতাভ। নিঃশব্দে চলে এল ছাদের উপর। রাতে ঘুম আসছে না তাই একটু বেড়িয়ে নিচ্ছে, এমনি ভাব করে খানিকক্ষণ পাইচারি করল। টর্চ জেবলে কাজ নেই। এমনিতেই বেশ দেখা যাচ্ছে।

তারাজ্বলা অন্ধকারেরও আলো আছে। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকতে-থাকতে বেশ ঠাহর হয় দিকপাশ। বেশ দেখা যাচ্ছে সামনের মাঠটুকু পেরিয়ে রাস্তাও ফাঁকা। ধারে-কাছে কোথাও ঝোপঝাড় বনবাদাড় নেই।

টর্চ জ্বেলে এর চেয়ে বেশি আর কী দেখা যেত! খোলা জানলা দিয়ে কারুর ঘরে গিয়ে আলো পড়লে হয়তো উঠে পড়বে। অকারণ একটা গোলমাল সুরু হয়ে যাবে। দরকার কি অন্যের শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে।

কাঁদছে তো কাঁদুক। সব কান্নাই থামে। এ কান্নাও থামবে এক সময়।

কিন্তু এ খুব দূরের কান্না কি? এক সময় মনে হল অমিতাভর, এ কান্না যেন তারই ঘরের মধ্যে। চমকে উঠল অমিতাভ। তার ঘরে বসে কে কাঁদবে? সবিতা তো কলকাতায়। কী জ্বরেই যে তাকে ধরল, কলকাতায় না পাঠিয়ে আর পথ ছিল না। দোতলায় দুখানা তো ঘর, এই একটা বসবার আর মুখোমুখি ঐ শোবার। বাইরের দরজা বন্ধ কখন থেকে। এখানে কে আসবে? কে কাঁদবে?

তবে কি নিচে? নিচে চাকর। আর ওপাশে আর্দালির ঘরে আর্দালি। তারা কাঁদতে যাবে কোন দুঃখে?

মুঠো-মুঠো করে ছড়িয়ে দেওয়া রাশি-রাশি জুঁই ফুলের মত গুঁড়ো-গুঁড়ো তারা—এতগুলি তারা এক সঙ্গে আর যেন কোনো দিন চোখে পড়েনি। চোখে পড়লেও দেখেনি। দেখলেও ভাবেনি। স্পষ্ট দিনের আলো নিয়ে কাজ করেছে, মুছে ফেলেছে অবান্তর তারার জঞ্জাল। এখন মনে হল সে না দেখুক আর যেন কে তাকে দেখছে। সহস্রচক্ষু হয়ে দেখছে। বলছে, দেখে ফেলেছি। ধরে ফেলেছি। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো চুপচাপ। ঘুমোও।

অমিতাভ আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল। আলোর শিখাটা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিল।

কান্নার শিখাটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল বুঝি। আবার শুনতে পেল তার উচ্চ তীক্ষ্ণতা। আমাকে বাঁচাও। আমার মুখ রাখো।

কি একটা অজ্ঞেয় মহাশক্তি ধরে রয়েছে তারাগুলোকে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে দিয়ে কঠিন হাতে রাশ টেনে ধরেছে। একটার সঙ্গে আরেকটার ঠোকাঠুকি হচ্ছে না। তাও কি একটা-দুটো? একের পিঠে অগণন শূন্য বসিয়েও গুনে শেষ করতে পারেনি মানুষের অঙ্কশাস্ত্র। ছেড়ে দিয়েছে। চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যা বুঝিনি, বোঝবার নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? এমনি নানা কারণে মাথা ঘামছে। এমনিতেই অনেক বোঝা। না-বোঝার বোঝা চাপিয়ে আর ক্লান্ত হবার দরকার নেই।

মানুষ ছাড়তে চাইলেও মহাশক্তি তাকে ছাড়েনি। যেমন আকাশে আছে তেমনি আবার বাসা নিয়েছে তার ক্ষুদ্র বুকের মধ্যে। অন্ধ, তবু দেখছে। বোবা, তবু কথা কইছে। কাঁদছে। সন্দেহ কি, এ তার সেই বুকে-বাসা-বাঁধা অদৃশ্য মহাশক্তির কান্না। কিন্তু দৃশ্য মহাশক্তির কান্নাও শোনো। সেই বা কম কি।

সামনের একতলা বাড়ির দিকে তাকাল আরেকবার অমিতাভ। তাকাল পরিপূর্ণ চোখে। জানলার ধারে এখনো দাঁড়িয়ে আছে হরবিলাসের বউ।

হাতে ছোট একটা লন্ঠন। সেটা নিজের মুখের কাছে তুলে ধরেছে। নববধূর মুখের কাছে যেমন প্রদীপ তুলে ধরে তেমনি।

হরবিলাস যে বাড়ি নেই তা অমিতাভ জানে। সকালে কলকাতা গিয়েছে। যখন যায় দেখা হয়েছে অমিতাভর সঙ্গে। বাড়ির গেটের সামনে।

'কি, কদ্দূর?' জিগগেস করেছিল অমিতাভ।

'কলকাতা।'

'ফিরবে কবে?'

'আর কবে! কাল সকালে। কোর্ট কামাই করলে কি চলবে?'

'দেখি—'হরবিলাসের পকেটের দিকে হাত বাড়াল অমিতাভ।

নস্যির কৌটো বাড়িয়ে ধরল হরবিলাস। অমিতাভ এক টিপ নস্যি নিল।

হরবিলাস বললে, 'একটু দেখো। চোখ রেখো।' বাড়ির দিকে সঙ্কেত করল।

এমনি রবিবার সকালে প্রায়ই যায় হরবিলাস। সোমবার ফেরে। কচিৎ কখনো এক-আধ দিন দেরিও হয়।

মোক্তারি করে হরবিলাস। ঠিক মোক্তার-পাড়ায় বাড়ি না নিয়ে বাড়ি নিয়ে ফেলেছে অফিস-পাড়ায়। কিন্তু ঠিক লুপ্ত অকারের মতন থাকেনি, মিশে গিয়েছে। মিশে গিয়েছে সকলের খেজমত খেটে। বিদেশ থেকে অচেনা জায়গায় এসে কত কি অসুবিধেয় পড়ে অফিসররা, তা সব নিষ্কণ্টক করে দেয়। কার কি অভাব কার কি প্রয়োজন তার তদারক করে। এ থেকে ফেরাফিরতি সে কোনো সুবিধে চায় না, বলে, আদালত আদালত, পরোপকার পরোপকার। কিন্তু চক্ষুলজ্জা এমনি জিনিস, তার খাতিরে কিছু যে নাও পায় তাও নয়। ধরিয়ে দিলে হাসে। বলে, এ আমার জোরে নয়, আমার মামলার জোরে। সত্য মামলাও তো আছে আর তার দু'একটা আমার হাতে বা কোন না আসবে।

প্রথম যখন এখানে আসে অমিতাভ, গায়ে পড়েই দেখা করতে এসেছিল হরবিলাস : 'ঠিক পাশের বাড়িতে আমি থাকি।'

গেটের বাইরে দেখা। অমিতাভ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'সে কি আসুন, ভেতরে আসুন।'

'গেটের বাইরেই ভালো। আমি আপনার কোর্টের মোক্তার।'

মৃদু হাসল অমিতাভ। ইঙ্গিতটা পুরোনো। বাইরে মক্কেল দাঁড় করিয়ে রেখে হাকিমের সঙ্গে মোক্তার দেখা করতে যায় আর হিসেবে হাঃ-খঃ বা হাকিম-খরচ বাবদ একটা মোটা অঙ্ক দেখিয়ে দেয় এ একটা চলতি রসিকতা।

'সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে,' হরবিলাস তাকাল ঘাড় হেলিয়ে : 'আমাকে চিনতে পারো? আমি হরবিলাস।'

"আরে হরবিলাস'?' একবাক্যে চিনতে পারল অমিতাভ : 'তুমি?'

এক সঙ্গে পড়েছিল ইস্কুলে। কত যুগ আগে। চিনতে যে পেরেছে এই ঢের। তৃপ্তমুখে হাসতে-হাসতে চলে গিয়েছিল হরবিলাস : 'কখন কি দরকার পড়ে জানিও নিঃসঙ্কোচে।'

হরবিলাসের স্ত্রীর অমনি গেটের বাইরে থেকে চলে যাবার তাগিদ পড়েনি। তার সঙ্গে কোর্ট-কাচারির সম্পর্ক নেই। সে অন্তঃপুরের মানুষ, চলে এল অন্তঃপুরে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে। কদিন পরেই সবিতা অসুখে পড়ল, সেবা করল ছুটোছুটি করে। দুপুরবেলা কোর্টে চলে গিয়েছে অমিতাভ, কে দেখবে সবিতাকে, কে জলপটি দেবে জ্বর বাড়লে—হরবিলাসের বউ আছে। যেদিন কলকাতা যায় সবিতা, সেদিনও খাইয়ে দিয়ে গেল নিজের হাতে।

বউটির কি যেন একটা নাম বলেছিল সবিতা। মনে করে রাখেনি অমিতাভ। হরবিলাসের বউই তার নাম। পরস্ত্রীর আবার নাম কি।

ঘোমটা-ঢাকা মুখে দু-একবার পড়ে গিয়েছিল কাছাকাছি। তারই মধ্যে এক পলকের জন্যে হলেও চোখ দুটি রেখেছিল ঠিক চোখের উপর। হৃদয়ের মধ্যেই যে অতল সাগর তা ঐ চোখ দেখলেই বুঝি বোঝা যায়। কৃষ্ণায়ত, কটাক্ষগর্ভ চোখ। কিছু বলে না ধরে ফেলে, কিছু চায় না নিয়ে নেয়, কিছু দেয় না দেবার আগেই পেয়ে গেছে বলে হাসে!

লাল রঙের শাড়ি আর গায়ের জামাটা বুঝি সবুজ। একটু সাজগোজ করেছে। লাল হচ্ছে ভয়, সবুজ হচ্ছে নিমন্ত্রণ। ভয়ের নিমন্ত্রণ। আবার হাতে আগুন। এ কি আশ্বাস না সর্বনাশের ভস্মশেষ!

মহাশক্তি নয় তো কি? মহাশক্তি না হলে এমন পরিবেশ তৈরি হয়? চারদিক থেকে আসে এমন নিঃসঙ্গসুন্দর মুহূর্ত? এমন কোমল আনুকূল্য?

কি দুর্দান্ত উজ্জ্বলন্ত সাহস! মৃদু-মৃদু হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এক হাতে লন্ঠন তুলে ধরে আরেক হাতের আঙুল নেড়ে-নেড়ে ডাকছে। হাত নেড়ে-নেড়ে বোঝাচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই। নিজের হাতের লন্ঠনের শিখাটা কমিয়ে দিয়ে বোঝাচ্ছে, তুমি এলেই সব অন্ধকার করে দেব। গায়ের আঁচলে একটা ঢেউ সৃষ্টি করে বোঝাচ্ছে, ঢেকে রেখে দেব সব লজ্জা। গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।

এ কে ডাকছে?

যেন ডাকছে কোন নির্জন সমুদ্রতীর, নিষ্প্রবেশ অরণ্য, গহন গিরিগুহা। যেমন রক্তকে ডাকে ছুরি, মাটিকে ডাকে ভাঙনের নদী, ফলের নিগূঢ় রসকে ডাকে সূর্য।

শোনো। যেও না। বিচার করে দেখ তুমি কে। তুমি এ মহকুমার সেকেণ্ড অফিসর। কত বড় সম্মানের, দায়িত্বের পদে বসে আছ। যদি জানাজানি হয়ে যায় কান কাটা যাবে। সমাজ-সংসারে মুখ দেখাতে পারবে না। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজনের মুখ ছোট করে দেবে। শুধু তাই নয়, চাকরি চলে যাবে। তারও চেয়ে বেশি, জেল হয়ে যাবে। শোনো। বিচার করে দেখ।

বিচার?

এত বিচার করছ আর এ বিচার করতে পারবে না?

বিচার থাকে না। বিচার পচে যায়। যে রসময় গৃহীকে সন্ন্যাসী হতে ডাকে তারও এই ডাক। এই হাতছানি। বীরকে ডাকে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতে, রাজার ছেলেকে চীরবাস পরতে, বিষয়ীকে পথের ভিক্ষুক হতে। সেও এই ডাক। এই হাতছানি।

ভগবান! ভূমা! পাপ! পরস্ত্রী। একই সেই দুর্নিবার আকর্ষণ। একই সেই দুর্মোচ্য রহস্য! একই সেই ভীষণসুন্দরের ডাক।

বিচার করবে না তো, বিদ্যাবুদ্ধি কিসের জন্য? আত্মসংযম করতে পারবে বলেই তো যুক্তি-তর্ক, শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য। অন্তত আইনকানুন। শোনো। লেখাপড়া শিখেছ বলেই সমাজ তোমাকে আরো বেশি দায়ী করবে, দোষী করবে।

মৃত্যুকে কে দমন করতে পারে? কে দমন করবে অপ্রতিরোধ্যকে?

কিন্তু বিপদের কথাই বা ভাববে না কেন? কে জানে এ হয়তো একটা ফাঁদ, তোমাকে বিপাকে ফেলবার চক্রান্ত। মানসিক গ্লানি তো আছেই, কে জানে হয়তো শারীরিক আঘাতই পেয়ে যাবে একটা। কাছে-পিঠে হয়তো হরবিলাসই কোথায় লুকিয়ে আছে। মাথায় লাঠি মেরে বসবে কিংবা ছুরি। এ বিপদটাও তো ভাবা উচিত।

কেউ ভাবেনি। আগুনে দগ্ধ করেছে। শূলে বিদ্ধ করেছে, কুঠারে ছিন্ন করেছে! কেউ ফিরে তাকায়নি। সে মহামহিমের ডাক এসে পৌঁছলে কেউ পারেনি হিসেব মেলাতে। সে জীবনসর্বস্বের কাছে বিসর্জন দিয়েছে সব প্রিয়বস্তু।

কিন্তু এ একটা কে!

মানি না। চিনি না। কেউ জানে না, কেউ চেনে না। শুধু এইটুকু জানি সে ডাকে। মহামনুষ্যলোকে সে এক দুর্বারণ ডাক। এক দুঃসাধ্য প্রলোভন।

কোথায় ভগবান, কোথায় পরস্ত্রী!

ঐ দেখ, নিজের থেকেই দরজা খুলে দিয়েছে আধখানা। নিজেকে আধখানা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে অনন্তের ছায়ামূর্তি হয়ে।

যদি কাছে গিয়ে পড়ি, কী না জানি কথা বলবে প্রথম সম্ভাষণে! মৃত্যু যখন গলা জড়িয়ে ধরে পরিপূর্ণ মমতায়, কী বলে ডাকে, কী কথাটি প্রথম উচ্চারণ করে! না কি কিছুই বলে না! না কি নিবিড় চুম্বনে রক্তিম অধর শুধু পাণ্ডু করে দেয়!

বুকের মধ্যে বসে অমন নাকি সুরে তুমি আর কেঁদো না। অজানা এক রোমাঞ্চের খবর এসেছে জীবনে, যদি আসে নিতে দাও। এর চেয়েও যদি বড় রোমাঞ্চ কিছু থাকে, নেব, বঞ্চিত করব না নিজেকে।

কিন্তু এ তো তোমার রিপু।

কে জানে রিপুই আমার মিত্র। বিপথই আমার পথমুক্তি। তুমি যখন হেরে যাচ্ছ তখন হেরে যাও। তোমার চেয়েও ঐ আকর্ষণ অদম্য। সুতরাং হেরে যাও। পথ ছেড়ে দাও। ভয়ে বা স্তোভে আমাকে নিরস্ত কোরো না।

তবে এক কাজ করো। ধীরে ধীরে এগোও। ভাবখানা দেখাও হাওয়া খেতে বেরিয়েছ। এমনি দেখতে পেলে হঠাৎ, খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রমহিলা, যেন কি সাহায্যের আশায়, তুমি কৌতূহলী হয়ে জিগগেস করতে গেলে, কি ব্যাপার? শুধু এই একটু অভিনয়। তার মানে, একটু কথা কয়ে নিলে বাইরে থেকে। বুঝতে পেলে পরিবেশটা। যদি বুঝলে নিরাপদ, ঢুকলে। যদি বুঝলে গোলমাল আছে, কেটে পড়লে।

তোমার দ্বিধাকে বলিহারি। ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। তীর যেমন লক্ষ্যের দিকে ছোটে তেমনি ছুটব। শরবৎ তন্ময় হব। বেগ না থাকলে রোমাঞ্চ কি? সহসা-অভাবনীয়কে নেব বুক ভরে। বিপদ না থাকলে কী সুখ সুখ পেয়ে!

কিন্তু তুমি তো ঠিক জানো না কেন ও দাঁড়িয়ে আছে দুয়ার আড়াল করে।

আর জানতে বাকি নেই।

এমনও হতে পারে আর কারু জন্যে।

তাই দ্বিধা করবার সময় দেব না। সেই উৎফুল্ল পুলকোচ্ছ্বাস নেব অপরিমাণ অসঙ্কোচে। জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে সেই ত্বরায়। হয়তো এমন রাত আর আসবে না। এমন ডাক আর শুনব না জীবনে।

লন্ঠনের আলোটা বাড়ানোই থাক। যদি কেউ এদিকে তাকায় ভাবতে পারবে বেশি-রাত-জাগা মানুষ কাজ করছে এখনো।

হ্যাঁ আলোটা জাগা থাক। ঘরে ফিরিয়ে-আনা নিরাপদ আশ্বাসের মত। আর, যদি সব যায় তো যাক। আমি তো জোর করে যাইনি গায়ে পড়ে। আমাকে টেনেছে। ডেকেছে, পথ ফুল-মসৃণ করে দিয়েছে, তাই গিয়েছি। এখন যদি আর না ফিরি তো না ফিরব।

শেষ শৃঙ্গে উঠেছে অমিতাভ। এর পরেই শূন্য।

ছোট্ট মাঠটুকু পেরিয়ে পৌঁচেছে হরবিলাসের বাড়ির কিনারায়। দরজার আড়াল থেকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হরবিলাসের বউ। সোনার চুড়ি-ভরা সুগোল মণিবন্ধ।

পুরনো আমলের একতলা বাড়ি। রোয়াক নেই। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়েই ঘর।

হঠাৎ অমিতাভ আবিষ্কার করল তার পায়ে স্যাণ্ডেল। চুরি করতে এসেছে তবু সম্ভ্রান্ত হবার কথা ভুলতে পারেনি। কি করবে, এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। একটি মুহূর্তের দীর্ণ-অংশও দেরি করবার সময় নেই। সিঁড়ির শেষ ধাপের নিচে ঘাসের উপর জুতো খুলে রেখেই উঠতে লাগল! মনে হল মন্দিরে উঠছে, এখানে মানাবে না জুতো। পাপের রমণীয় মন্দির।

হরবিলাসের বউ চাপা গলায় বলে উঠল, 'জুতো—'

সত্যিই তো। জুতো খুলে রেখে কেউ উঠে আসে? প্রমাণের তবে আর বাকি থাকবে কি? আলামত হয়ে যাবে। একজিবিট হবে কোর্টে।

জুতো পরতে নামল ফের অমিতাভ!

হরবিলাসের বউ বলে উঠল ব্যাকুল হয়ে, 'ও থাক, থাক। সব আমি ব্যবস্থা করছি! কোন ভয় নেই, ও আমি পৌঁছে দেব। আপনি আসুন! আসুন।'

আর কে থামে! জুতো পরে সটান ফিরে এল অমিতাভ। মনে হল কে যেন সবলে তার গায়ের উপর জুতো ছুঁড়ে মেরেছে। সে হরবিলাসের বউ না আর কেউ?

আর কোনো দিকে তাকাল না। সদর খোলা রেখে এসেছিল, বন্ধ করল। উপরে উঠে বন্ধ করল জানলা দুটো। আলো নেবাল। শোবার ঘরে এসে মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ল আলগোছে।

৫৫। বাঁশবাজি

খোড়গাছির মাঠে গাজনের মেলা বসেছে।

এবার লোকজন বিশেষ জমেনি, মাল-পত্রও বিশেষ কিছু নেই। তেলে ভাজা দুর্গন্ধি পাঁপর, বিন্নে ধানের খই আর শিল-পড়া কতক কাঁচা আম। কাগজের এবার বড় অভাব, ঘুড়ি-ফুরফুরি নেই একখানাও। মাটির পুতুল—কুকুর-বেরাল, হাতি-ঘোড়া—সক্কলের এক রঙ, শুধু চোখ বা নাকের ডগা বা লেজের শেষ বোঝাবার জন্যে কালোর দু'একটা ফোঁটা বা আঁচড় কাটা হয়েছে। আছে কিছু চাঁচের ও বাঁশের জিনিস, ঝুড়ি চ্যাঙারি, খারা-খালুই। আর আছে হাঁড়িকুঁড়ি সরা-মালসা, কলকে ধুনুচি। নেই সেই গামছা, নেই বা কাঁচের চুড়ি।

যারা তবু এসেছে সব যেন কেমন কাহিল চেহারা, ঢলকো, ঝিমমারা। যেন কি একটা আতঙ্কের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসেছে মরতে-মরতে। চলায়-বলায় ফুর্তি নেই এক রতি! পরনের কাপড় কানি হয়ে আসছে দিনে দিনে।

পাকড়া গাছের তলায়ই বেশি গোলমাল। কাছেই কোথায় একটা ট্যামটেমি বাজছে।

এগিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম একটা ছোট ছেলের কান্না।

'আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব।' আকুল আফুট চোখে কাঁদছে সেই ছেলেটা। ছ-সাত বছর বয়স, পেকাটির মত হাত-পা, কোমরের নিচে ছেঁড়া টেনি আঁটা। বাসা থেকে খসে-পড়া না-ওড়া পাখির বাচ্চার মত অসহায়।

ব্যাপার কি? কাঁদছে কেন?

সবাই বললে, বাঁশবাজি হবে।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম বাঁশ দিয়ে পিটবে বুঝি ছেলেটাকে তাই কাঁদছে অমন অঝোরে। কিন্তু সবাই বললে, মার নয়, খেলা।

বাঁশগাড়ি করে আদালতে দখল নেয় শুনেছি, তখনও নাকি ঢোল বাজে। বাঁশ নিয়ে আর যে কোন খেলা হয় দেখিনি তখনো।

'মাটিতে পুঁতে নেবে তো বাঁশটা?' কে একজন জিগগেস করলে।

না, এ সে মামুলি খেলা নয়। ওয়াকিবহাল কে একজন বললে, ভারিক্কি গলায় 'না, বাঁশটা বুড়ো পেটের ওপর বসাবে, আর সেই বাঁশ বেয়ে উপরে উঠে যাবে ছেলেটা, একেবারে ডগার ওপর। সেখানে ও বাঁশের মুখ পেটের ওপর চেপে ধরে মুখ নিচু করে ঝুঁকে পড়বে। আর, বুড়োর পেটের ওপর বাঁশ ঘুরবে বন বন করে আর ছেলেটা হাত ছেড়ে দিয়ে চরকির মত ঘুরপাক খাবে। আমি আগে আরো দেখেছি ওর খেলা!'

'ঐ বুড়ো বুঝি?'

'হাঁ, ওই মন্তাজ।'

শনের দড়ির মত পাকিয়ে গেছে বুড়োর শরীর, থুতনির উপর হলদেটে ক'গাছি দাড়ি রয়েছে উঁচিয়ে। বুকটা চিপলে মতন, পেটটা দ পড়া হাতে পায়ের মাংসগুলো হাড়ের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বিকেলের রোদে কোঁচকান চোখ দুটো চকচক করছে—সেইটুকুই যা-কিছু সাহস আর অভিজ্ঞতার চিহ্ন।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। টিনের একটা ফুটো মগ নিয়ে মন্তাজ সবার কাছ থেকে পয়সা কুড়োচ্ছে।

'খেলা সুরু হল না, আগেই পয়সা?' কে একজন ধমকে উঠলো।

'খেলা হয় কি করে? বাঁশে যে চড়বে সেই তো কেঁদে রসাতল করছে। 'পড়ে যাব, মরে যাব'—এ কেমনতর কান্না? পড়েই যদি যাবি তবে কে আসতে বলেছিল তোদের খেলা দেখাতে?'

ছেলের কান্নাতে মন্তাজের ভ্রুক্ষেপ নেই। 'হবে, হবে, সুরু হচ্ছে এখুনি।' সবাইকে আশ্বাস দিয়ে সে শূন্য মগ দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরে যায়।

'খেলা তো আর ওরা নতুন দেখাচ্ছে না, তবে কাঁদছে কেন ঐ ছেলেটা?' জিগগেস করলাম পাশের লোককে।

'এতদিন ও ছিলনা। ও নতুন।'

'তবে কে ছিল এতদিন?'

'ওর দাদা—'

'না, না, ঐ ছেলেটাও দেখিয়েছে দু'-একবার।' কে আর একজন উঠল প্রতিবাদ করে : 'সরস্বতী পুজার সময় তেঁতুলের ইস্কুলের মাঠে এই ছেলেটাই উঠেছিল বাঁশ বেয়ে। এখনো তত রপ্ত হয়নি—বেয়ে বেয়ে চুড়োয় উঠে আসাটাই সেদিনকে ওর খেলা ছিল। আসল খেলা দেখিয়েছিল অবিশ্যি ওর দাদাই। যাই বলুন আসল কসরৎ যে বাঁশ বেয়ে উঠে আসে তার নয়, যে বাঁশটা পেটের ওপর চেপে ধরে রাখে তার—মন্তাজের।

'কই ওর দাদা?'

'কে জানে!'

টুং করে একটিও আওয়াজ হল না মন্তাজের মগে। খেলা না দেখে কেউ পয়সা দিতে রাজি নয়।

অনন্যোপায় হয়ে মন্তাজ ছোট ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেল। পিছনে দেয়াল, সামনে বুনো কুকুর তাড়া করেছে এমনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে ছেলেটা। 'না, না, আমি না। আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব—!'

বাপ একবার তার হাত ধরে টান মারলে হেঁচকা। মারবার জন্যে হাত ওঁচালো একবার।

'হেঁ, ভয় দেখ না ছেলের। তোর বাপ কত খেলা দেখিয়ে এল কত জোয়ান জোয়ান ছেলে নিয়ে, আর তোকে কিনা সামলাতে পারবে না? পুঁচকে একরত্তি ছেলে।' বাপের হয়ে ছেলেকে কেউ-কেউ তিরস্কার করলে।

মন্তাজ একটু হাসল। অনেক অভিজ্ঞতায় মসৃণ, ধারালো সেই হাসি।

'পড়েই যদি যাস, বাপ তোকে দু হাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারবে না? নে উঠে আয়।'

যে লোকটা ট্যামটেমি বাজাচ্ছিল সে জোরে কাঠির বাড়ি মারতে লাগল। কিন্তু ছেলে কিছুতেই রাজি হয় না। সকল কোলাহল ছাপিয়ে তার কান্নাই প্রবল হয়ে ওঠে।

খেলা আর জমল না তা হলে। দু'একজন করে খসে পড়তে লাগল।

মন্তাজ অসহিষ্ণুর মত গলা উঁচিয়ে তাকালো একবার ভিড়ের বাইরে। কতক্ষণ পরে কে আরেকটা ছেলে দুর্বল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কাছে এসে দাঁড়ালো। হাতে একটা আধ-খাওয়া পাঁপর।

'ওই ওর দাদা।' জামা লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল।

বছর দশকের রোগা-পটকা ছেলে। লিকলিকে হাত-পা। গায়ে একটা ছেঁড়া পাতলা কাঁথা জড়ানো। ঠোঁটের চার পাশে, গালে ও থুতনির নিচে কাটা ঘা, একটা ডন্ডনে মাছি বারে বারে উড়ে এসে বসছে তার নাকের ডগায়। দুটো ভাসা ভাসা চোখে কেমন একটা শূন্য অর্থহীন চাহনি।

ছোট ভাইয়ের কাছে এগিয়ে গেল। বললে, 'তোকে কাঁদতে হবে না আকু, আমিই খেলা দেখাব।'

আকু চুপ করল। চোখের জল শুকিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আরো ঘন হয়ে এল জনতা। ট্যামটেমির বাজনা আরো টাটিয়ে উঠল।

কোমর ও হাঁটুর মাঝে যেটুকু কাপড় ছিল ভুর করে তাই আরো খাটো ও আঁট করে নিল মন্তাজ। বাঁশটাকে বসাল পেটের উপর, নাইকুন্ডলের গর্তে। কি যেন বলল বিড়বিড় করে। বোধ হয় বিসমিল্লার নাম করলে। বাঁশটা একবার কপালে ঠেকাল। গায়ে হাত বুলিয়ে মুখের খুব কাছে টেনে এনে কি বললে তাকে।

এমন করতে কেউ তাকে দেখেনি কোনো দিন। এতটা চলাবিচল হওয়া।
'চলে আয়, ইন্তাজ।' ডাক দিল সে বড় ছেলেকে।
ইন্তাজ মুহূর্তে গায়ের কাঁথাটা খুলে ফেলল।
কে যেন হঠাৎ পেটের মধ্যে টেটা ঢুকিয়ে দিল—এমনি আঁৎকে উঠলাম। ছেলেটার বুকে-পেটে টানা-টানা ঘা, কোথাও দগ দগ করছে, কোথাও খোসা পড়ছে, কোথাও বা পুঁজ উঠেছে দলা পাকিয়ে। সেই টনটনে মাছিটা হঠাৎ আর কটা গুয়ে মাছিকে ডেকে এনেছে। যখন ঘুরে দাঁড়াল ইন্তাজ, তখন খানিক স্বস্তি পেলাম। কেন না পিঠটা ওর মসৃণ, নিদাগ।
'কেমন করে হল এই ঘা? এতগুলি ঘা?' জিগগেস করলাম জনতাকে।
কেউ কেউ জানে দেখলাম। দোল পূর্ণিমার দিন চাঁপালির বাবুদের বাড়িতে খেলা দেখাবার সময় বাঁশের মাথা থেকে পড়ে যায় ইন্তাজ। বুড়ো তার কতদিন আগে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে, আমানি পান্তাও নাকি জোটাতে পারেনি তারপর, তাই বাঁশটাকে বাগ মানিয়ে রাখতে পারেনি পেটের মধ্যে। যেখানে পড়ল ইন্তাজ সেখানে ছিল খোয়া আর খোলামকুচি, বুক পেট ছড়ে কেটে একাকার হয়ে গেল। সেই থেকেই ছেলেটা একটু কাবু হয়ে পড়েছে।
'ন্যাতাটা গায়ে জড়িয়ে নিবি না?' জিগগেস করল মন্তাজ।
'না।' দু' হাতে ধুলো মেখে ইন্তাজ লাফিয়ে উঠল বাপের পেটে বাঁশ ধরে। দীর্ঘ অভ্যাসে মসৃণ, তরতর করে বেয়ে উঠতে লাগল। দু' হাত দিয়ে পেটের উপর বাঁশটা শক্ত করে চেপে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মন্তাজ।
'দেখুক, দেখুক এবার আক্কাছ। এত ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়েও তার দাদা কেমন রাজি হল খেলতে।'
আক্কাছ বা আকু ঘাড় উঁচু করে চেয়ে আছে দাদার দিকে। এখন আর তার ভয় নেই। সে এখন ট্যামটেমি বাজাতে পারে। কিংবা মগ নিয়ে ঘুরতে পারে পর-পর।
বাঁশের চূড়ার কাছে এসে ইন্তাজ একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, পেটের কাছে কাপড় জড় করে বাঁশের মুখটা ঠিক করে বসাবার জন্যে। তখন তার ঘাগুলি আরেকবার স্পষ্ট করে দেখলাম। অসহ্য লাগল। ভাবলাম চলে যাই।
কে একজন বাধা দিল। বলল, 'তার পর যখন ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরতে থাকবে শূন্যে তখন ওসব ঘা-টা কিছু দেখা যাবে না।'
'বাঁশটা কি বাপ হাতে করে ঘোরাবে নাকি?'
'কতক্ষণ হাতে করে ঘুরিয়ে বাঁশটা পেটের উপর রাখবে, তারপর মোচড় খেয়ে-খেয়ে আপনিই বাঁশটা ঘুরবে পেটের গর্তের মধ্যে। সেই তো আসল খেলা।'
'নইলে বাঁশ পুঁতে তার ওপর ডিগবাজি খাওয়াটা তো সেকেলে। তাতে আর বাহাদুরি কি!' আরেকজন ফোড়ন দিল।
ততক্ষণে বাঁশ ঘুরতে সুরু করেছে মন্তাজের দু'হাতে। চোট খাবার

পর ছেলেটা নিশ্চয়ই খুব হালকা হয়ে গেছে, ঘুরছে ফুরফুরির মত। হাত পা ছড়িয়ে। ঘা তো বোঝাই যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না ওটা কোনো মানুষ না বাদুড় না চামচিকে!

এতক্ষণে আকাশের দিকে মুখ করে ছিলাম। এবার তাকালাম মন্তাজের দিকে যখন সে হঠাৎ ঘুরন্ত বাঁশের প্রান্তটা পেটের খাঁজের মধ্যে গুজে দিলে। তারপর হাত দিল ছেড়ে। ছেলের পেটের চেয়ে বাপের পেটটাই বেশি দেখবার মত। ছেলের পেটে ঘা, বাপের পেটে প্রকাণ্ড খোদল। বাঁশটা গ্রহণ করবার জন্যে মন্তাজের পেটে এ সাময়িক গর্ত তৈরি হয়নি, যেন অনেক দিন থেকেই এ গভীর গহ্বরটা সেখানে বাসা বেঁধে আছে। সেই গর্তটা ঘুটে ঘুটে ঘুরছে না জানি কোন জ্বলন্ত মন্থনদণ্ড।

বাঁশের শেষ প্রান্তটা কত দূর পর্যন্ত চেপে ঠেলে দিয়েছে পেটটাকে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। পেটে-পিঠে এক, এমনিতে দেখেছি অনেক। এখন দেখলাম পেট বলে কিছুই নেই আর মাঝখানে, বাঁশের মুখটা সটান পিঠের উপর বসানো, সামনের দিক থেকে। পেটের সব নাড়িভুঁড়ি শুকিয়ে কুঁকড়ে কোথায় সরে গেছে, মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে-খেতে খটাখট শব্দে চলছে বাঁশের ঘুরুনি।

প্রতি মুহূর্তে যা ভয় করছিলাম। ইন্তাজ ফসকাল না, মন্তাজই টলে পড়ল। শেষ মুহূর্তে দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে লুফে নেবার চেষ্টা করেছিল মন্তাজ। কিন্তু যতই ফুরফুরে পাতলা হোক, বাপের দুর্বল বাহু আশ্রয় দিতে পারল না ইন্তাজকে।

'—আজকাল বারেবারেই বুড়োর কেবল ফসকে যাচ্ছে—' কে একজন আপত্তি করে উঠল।

মন্তাজ দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছে উবু হয়ে। দৌড়খাওয়া পাকতেড়ে ঘোড়ার মত ধুঁকছে, আর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে শূন্য মগের দিকে।

তারি জন্যে হয়তো খেলা সুরু হবার আগেই মগটা সে তুলে ধরেছিল সবার কাছে। কয়টা পয়সা আগে পেলে সে কিছুটা খেয়ে নিতে পারত, এক-আধখানা পাঁপর কি চামদড়ির মত শুকনো দু-একটা ফুলুরি! পেটে কিছু পড়লে পেট হয়তো এক চোটেই পিঠ হয়ে পড়ত না, থুত্থুরে বাহু দুটোতেও একটু জোর আসত। অভ্যাসে সব কিছুই সওয়ানো যায়, শুধু বুঝি ক্ষুধাকেই বাগ মানানো যায় না। বাঁশ, বাহু, ছেলে, ঘা—সব কিছুরই মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে—শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত। ক্ষমাহীন।

বাঁশটা ছিটকে পড়েছে দূরে। ইন্তাজ আরো দূরে। উত্থিত গোলমালের মাঝে তার গোঙানিটা শুনতে পেলুম না। কেউ বললে, হয়ে গেছে। কেউ বললে, বুকের কাছটাতে ধুকবুক করছে এখনো।

কাছেই দাতব্য চিকিৎসালয়। যতদূরে সম্ভব ঘায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ইন্তাজকে ধরাধরি করে কারা নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়। ঘটনাটা সদ্যসদ্য ঘটেছে বলে দাতব্য চিকিৎসালয় একেবারে ফিরিয়ে দিতে পারবে না হয়তো। নইলে এমনিতে ঘায়ের ওষুধ নিতে এলে ফিরিয়ে দিত নিশ্চয়ই। কেননা প্রতিবারের ওষুধ নেবার সময় এক আনা করে পয়সা দিতে পারত না মন্তাজ। যদি এক-আধ আনা পয়সা তার হাতে আসে, সে কি তা দিয়ে পেটের উপরের ঘা শুকোবে, না পেটের ভিতরের ঘা?

মন্তাজ বসে আছে চুপ করে, গোঁজ হয়ে, কিন্তু ছোট ছেলে আক্কাছ কাঁদছে একেবারে গলা ফাটিয়ে। ভাবলাম দাদার জন্যেই বুঝি তার কান্না।

কিন্তু মুখে তার সেই এক আর্তনাদ, এবার আরো নিঃসহায় কণ্ঠে। এবার আমার পালা। এবার আমার পালা। আমি নির্ঘাত পড়ে যাব। মরে যাব আমি।

মন্তাজ কিছুই বলল না। আকুর হাত ধরে চলল হাসপাতালের দিকে।

'পড়ে যাব, মরে যাব।' কোন অদৃশ্য আল্লার কাছে শিশুকণ্ঠের করুণ অথচ কোন প্রতিকারহীন কাকুতি?

মন্তাজ কিছুই বলছে না। পাথুরে মুখে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য।

৫৬। পরাজয়

এ কি, কী হলো? যতীশবাবু চেয়ারটা ঠেলে অনেক দূরে সরিয়ে নিলেন পিছনে।

আগন্তুক মেঝেয়, একেবারে তাঁর পায়ের উপর, লুটিয়ে পড়েছে।

ভিক্ষুক শ্রেণীর বলে মনে হয়,—একেবারে নিম্নস্তরের না হলেও মধ্যবিত্ত ভিক্ষুক। অর্থাৎ, ময়লা হলেও গায়ে একটা শার্ট আছে, ছেঁড়া হলেও পায়ে আছে ক্যাম্বিশের জুতো। রুগ্ন অপরিচ্ছন্ন চেহারা হলেও যেন একটু ভদ্রতার ভাব আছে কোথাও।

কিন্তু তাই বলে এমনি মাটির উপর লুটিয়ে পড়বে নাকি রাস্তার ভিক্ষুকের মতো? শুধু লুটিয়ে পড়া নয়, কুণ্ডলী পাকিয়ে আর্তনাদ করতে সুরু করেছে।

'এখানে কী?' কপালের উপর দু'চোখ তুলে যতীশবাবু স্তম্ভিতের মতো তাকিয়ে রইলেন: 'এখানে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছ কোন হিসেবে? বাইরে যাও, বাইরে চলে যাও বলছি।'

লোকটা গুঙিয়ে উঠলো : 'আমি মনোমোহন।'

'আহা, নামে একেবারে মন মোহিত হয়ে গেল।' যতীশবাবু ভেঙচিয়ে উঠলেন, 'যা বক্তব্য বাইরে থেকে বলো তো শুনতে পারি, নইলে এখুনি আমাকে চাকর ডাকতে হবে।' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ডাকতে লাগলেন : 'গোবর্ধন, গোবর্ধন, গোবরা!'

নিজেই এগিয়ে গেলেন আগন্তুকের দিকে এবং তাকে স্থির চোখে একটু দেখে চমকে উঠলেন তৎক্ষণাৎ। মনোমোহনকে চিনতে পেরেছেন বলে নয়, তার যন্ত্রণাটাকে চিনতে পেরেছেন বলে।

কেননা এ তাঁরও যন্ত্রণা। এই তো, সেদিনও তিনি এমনি কাতরিয়েছেন কুণ্ডলী পাকিয়ে।

চাকর না এসে এলেন সুরধুনী, যতীশবাবুর স্ত্রী। অক্লেশে এগিয়ে গেলেন সামনে, কেননা যে লোকটা মাটিতে শুয়ে কাঁদছে সে কখনোই সম্মানার্হ নয়, তার পদমর্যাদা নেই; সে হয় গরিব, নয় রোগক্লিষ্ট, নয় ক্ষুধাতুর। এমনি কোনো ভদ্রলোক হলে তিনি আসতেন না কখনো বাইরের ঘরে।

'কী হয়েছে? পেটে ব্যথা বুঝি?' সুরধনীও যন্ত্রণাটা চিনতে পেরেছেন এক নিমেষে। অনেকদিন আছেন এর কাছাকাছি। সেবা নিয়ে, অনিদ্রা নিয়ে, নিরুপায় উৎকন্ঠা নিয়ে।

'অসহ্য! অসহ্য!' মনোমোহন ককিয়ে উঠলো।

'তোমার সেই ওষুধটা এনে দেব?' সুরধুনী স্বামীর দিকে চেয়ে উদ্বেগ-কাতর মুখে প্রশ্ন করলেন : 'ব্যথাটা এখুনি কমে যেতে পারে তা হলে।'

'রাখো।' যতীশবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন : 'অসুখ করেছে, হাসপাতালে চলে যাক না। এখানে কেন মরতে এসেছে? কে-না-কে, তার জন্যে আমি আমার দামী-দামী ওষুধ বের করে দি।'

'কে-না-কে নই,' এক হাতে পেট চেপে ও অন্য হাতে মেঝেতে ভর দিয়ে মনোমোহন আস্তে-আস্তে উঠে বসলো : 'আমি আপনাদের ছেলে।'

কথাটা যতীশবাবু মোটেই গায়ে মাখলেন না। বললেন, 'অমন ঢের দেখা গেছে। "কাজের বেলায় ছেলে, কাজ ফুরুলে জেলে।" ও-সব চালাকি এখানে চলবে না। এখন দিব্যি উঠে বসতে পেরেছ, সটান হাঁটা দাও।'

'এখনো ব্যথাটা নরম পড়েনি, বাবা।' মনোমোহন কষ্টক্লিষ্ট মুখে বললে, 'এখনো ঠেলা মারছে থেকে থেকে।'

বাবা-কথাটা অভ্যাসবশে বাবুই শুনে থাকবেন যতীশবাবু। তাই তিনি নরম হলেন না। পরুষকন্ঠে বললেন, 'এর উপর কি আরো ঠেলা খেতে চাও নাকি? পেটের উপরে ঘাড়ে?'

কিন্তু অতটা নিষ্ঠুর হতে পারলেন না সুরধুনী। নম্রকণ্ঠে বললেন, 'কিছু পয়সা দেব?'

'পয়সা? পয়সা দিয়ে কী হবে?'

'কিছু খাবে?'

'খাবো?' মনোমোহনের চোখ ছলছল করে উঠলো, 'মাগো, খেতে পাইনি বলেই তো এই ব্যথা। কারু ব্যথা হয় খাওয়ার থেকে, আমার হয়েছে ক্ষুধার থেকে। সেইদিনের সেই ক্ষুধার সময় কেন আসোনি মা? এসেছ আজ এই ব্যথার সময়।'

'তবে তুমি কী চাও?' যতীশবাবু গর্জন করে উঠলেন।

'ছোট এক ঘটি জল।'

এত কান্নার পর এই কাণ্ড! সুরধুনী জল নিয়ে এলেন।

মনোমোহন যতীশবাবুকে লক্ষ্য করে বললে, 'এবার জুতো থেকে পা বের করে এই জলের মধ্যে ছোঁয়ান—যে-কোনো-পা।'

'তার মানে?'

'তার মানে—আপনি ছোঁয়ালে পর মা এনে ঠেকাবেন তাঁর পা!'

'তুমি কি পাগল?'

'পেট আমার গেছে বটে, কিন্তু মাথা আমার ঠিক আছে বাবা।'

বাবা-কথাটা যতীশবাবু এবার স্পষ্ট শুনলেন আর তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। প্রথম কথা—তিনি নিঃসন্তান, বাবা-ডাক শুনতে অভ্যস্ত নন; আর প্রধান কথা—এমন কিনা বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলে! যতীশবাবুর বয়স যদি চল্লিশ, মনোমোহনের পঞ্চাশ।

'জল খেয়ে কী হবে?'

'কী হবে!' মনোমোহনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো : 'কর্পূরের মত আমার ব্যথাটা উবে যাবে দেখতে দেখতে।'

সুরধুনীর কৌতূহল জাগ্রত হল। বললেন, 'কী করে জানলে?'

'স্বপ্ন দেখলাম, মা। স্বপ্ন দেখলাম, মা-কালী আমার কানে-কানে বলছেন, তোর এ রোগের ওষুধ আছে তোর বাপ-মার কাছে। বাপ-মাতো কবেই হারিয়েছি বলে কেঁদে উঠলাম। মা-কালী বললেন, এ তোর এ জন্মের বাপ-মা নয়, আগের জন্মের বাপ-মা। ফরিদপুরের যতীশ মোক্তার ও তার স্ত্রী। পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়গে তাদের, পা-ধোয়া জল খা গে এক ঘটি, দ্যাখ, ব্যথা তোর কেমন সেরে গেছে এক পলকে। তাই আমি সোজা চলে এসেছি মা—এক আধ মাইলের রাস্তা নয়,—সটান গোপালগঞ্জ থেকে। সন্তানকে দয়া করো—'

'দ্যাখো, এসব বুজরুকি এখানে চলবে না।' যতীশবাবু শাসিয়ে উঠলেন।

'আমি টাকা-কড়ি কিছুই আপনাদের কাছে চাইনা—শুধু একটু চরণের ধুলো। দিন না দয়া করে', মনোমোহনের গলায় মিনতি ঝরে পড়লো : 'যদি ব্যথাটা আমার সারে, যদি আবার আমি চাঙ্গা হয়ে উঠি।'

সুরধুনীর মন করুণায় ভিজে গেল। কেউ তাকে নিঃসংশয়ে মা বলে ডেকেছে এ তিনি প্রাণ থাকতেও উপেক্ষা করতে পারেন না। কে সে সন্তান, কত তার বয়স, কেমন সে দেখতে—কিছু আসে-যায়না; তিনি মা, এ জন্মের

না হলেও গত জন্মের মা, এতেই যেন তাঁর তৃপ্তির শেষ নেই। স্বামীকে বললেন,—এতে তাদের কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু লোকটা যদি সত্যি সেরে ওঠে—তাতে আপত্তির কী আছে।

'আর মনে করে দেখুন এই যন্ত্রণার চেহারাটা! নিজেরো তো আছে আপনার।' মনোমোহন মনে করিয়ে দিল।

যতীশবাবু শিউরে উঠলেন। পেটটা যেন চিন-চিন করে উঠলো। আমতা-আমতা করে বললেন, 'এতে কখনো সারে? কত হাজার-হাজার টাকা ব্যয় করলাম এ রোগের পিছনে। কিছুতেই কিছু হবার নয়। তার চেয়ে গাঁজা ধরলে পারতে মনোমোহন।'

'হতেই হবে। এ যে দৈবাদেশ।' মনোমোহন চোখ বড়ো-বড়ো করে বললে, 'এমন আমার জগদ্ধাত্রীর মতো মা, মহেশ্বরের মতো বাপ—এ কখনোই ব্যর্থ হবার নয়। কখনোই নয়।'

যতীশবাবু আর সুরধুনী জলের ঘটিতে পা ডোবালেন। আর এক ঢোকে ঘটিটা মনোমোহন নিঃশেষ করে বিশাল একটা ঢেকুর তুললো। আর সেই উদ্গারে তার সমস্ত ব্যথা গেল অন্তর্হিত হয়ে।

এটাকে কী বলতে হয়? ভোজবাজি না ইন্দ্রজাল? যন্ত্রণায় মুমূর্ষু লোকটা চক্ষের এক পলকে নীরোগ হয়ে গেল—চোখের সামনে দেখেও যে বিশ্বাস করা যায় না। না, সমস্তটাই অভিনয়, প্রতারণা? একটা জটিল ষড়যন্ত্র?

কিন্তু যে যাই বলুক, মনোমোহনকে সুরধুনী ছাড়লেন না। চাকর-ঠাকুর-গয়লা-মুদি সবাই তাঁকে মা বলে ডাকে বটে, কিন্তু কারুর ডাকই এমন বুকের মধ্যে এসে পড়েনা। মনোমোহন বলে, 'তুমি আমার সত্যিকারের মা বলেই তো আমার ব্যথার সময় তুমি এসেছ, ব্যথা ভুলিয়ে জাগিয়েছ এমন ক্ষুধা।'

আর নিজের হাতে তার সামনে ভাতের থালা সাজিয়ে সুরধুনী বলেন 'আর তোমার কোনো দিন উপোস করে থাকতে হবে না, মনো। আমি জোগাব তোমার ভাত।'

মনোমোহনকে সুরধুনী বাগানের কাজে লাগিয়ে দিলেন— মাইনে দিলেন সাত টাকা। এটা ঠিক মাইনে নয়, ছেলেকে কেউ মাইনে দেয় না—এটা পকেট খরচ। যে-শার্ট পরে সে প্রথমে এসেছিল, তাতে পকেট ছিল কিনা সন্দেহ; এখন তার গায়ে উঠেছে তিন পকেট-ওয়ালা ঢিলে পাঞ্জাবি ভিক্ষে করে কুড়িয়ে পাওয়া নয়, দস্তুরমতো নগদ দামে কিনে আনা দোকান থেকে। তা ছাড়া পায়ে জুতো, মাথায় তেল, গায়ে সাবান, মায় দাড়ি কামাবার জিনিস। এ মূল্য মনোমোহন তাঁকে শুধু মা করেছে বলে নয়, তাঁকে দেবতার মর্যাদা দিয়েছে বলে।

কিন্তু যতীশবাবুর সহ্য হচ্ছিলনা কিছুতেই। একটা প্রবঞ্চক যে এমন

করে তাঁরই সংসারে খাওয়া-পরার কায়েমী বন্দোবস্ত করে নেবে, এ তিনি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেননি। ঠাকুর-চাকরের উপর তম্বি—কোথায় তার বাবা-মার যত্নের এতটুকু ত্রুটি হচ্ছে কোথায় সংসারের হচ্ছে ক্ষুদ্রতম অপচয়। সহ্য হয় না তার এই মুরুব্বিয়ানা, এই বিগলিত ভক্তির ভাবটা। কিন্তু সুরধুনীকে মুখ ফুটে কিছু বলেন তাঁর সাধ্য কী।

'ও কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবে নাকি এ-সংসারে?' যতীশবাবু একদিন আর থাকতে পারলেন না।

দুবেলা দু-মুঠো ভাত—আর একটু আরাম আর আশ্রয়, এতে আমাদের কী এমন ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে যাচ্ছে! সুরধুনীরও বিরক্তিকর লাগল এই চিত্তদারিদ্র্য।

'তা যাচ্ছে না, কিন্তু ঠকিয়ে খেয়ে যাচ্ছে আরামে, প্রতি মুহূর্তে এই চেতনাটাই সইতে পারছি না। ওর অসুখটা যে আগাগোড়া ভান, তা বোঝনি তুমি?'

'হোক গে ভান, কিন্তু তার মা-ডাকটা তো ভান নয়। মার কাছে ছেলে এলে মা তাকে খেতে দেবে না বলতে চাও?' সুরধুনী রাগ করে চলে গেলেন ঘর থেকে।

কিন্তু ঘোরতর বিপদ একটা কোথাও সাজছে যতীশবাবুর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই দেখতে আসে মনোমোহনকে—যে লোকটা ভাঁওতা মেরে ভাতের ব্যবস্থা করে নিল অনায়াসে। এঁদের দিকে যদি বা তাকায়, করুণার চোখে তাকায়, এঁদের মধ্যে যে দেবতার অংশ আছে কেউ তা বিশ্বাস করতে চায় না, হাসাহাসি করে। দেবতার অংশই যদি থাকবে, যতীশবাবুর নিজের অসুখ তা হলে সারে না কেন?

যতীশবাবু সায় দেন গলা খুলে। বলেন, 'ভগবান ওর ভাত মাপিয়েছেন এ সংসারে, কিছুদিন খেয়ে নিক। হোক কিছু গুনগার। কিন্তু প্রতারিত হলেও আমি আমার স্ত্রীর বিশ্বাসে হাত দিতে পারবো না।'

সুরধুনী অটল—ঠাট্টাই করো আর যুক্তিই দেখাও। তাঁতে শুধু দেবীর মাহাত্ম্য নয়, আছে মাতার মাহাত্ম্য।

কিন্তু বিপদের দিন বেশি দূরে নয়।

সমস্ত দিন পেটে যন্ত্রণা ভোগ করে সন্ধের দিকে যতীশবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এখন রাত প্রায় মাঝামাঝি। হঠাৎ ঘরের মধ্যে কার চলাফেরার আওয়াজ পেয়ে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডাকলেন, ঘুমো গলায় উত্তর করলেন সুরধুনী, ঘরের মধ্যে চলাফেরাটা আরো স্পষ্ট ও দ্রুত হয়ে উঠলো।

শরীর দুর্বল হলেও যতীশবাবু উঠে বসলেন বিছানায়। বললেন, 'চোর।'

সুরধুনীও চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন : 'মনো।'

মনোমোহনের টিকিও দেখা গেল না। দরজা খুলে পালাতে গিয়ে চোর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। বাতি জ্বালিয়ে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করে বেরোতে-বেরোতে চোরকে আর দেখা গেল না।

আর দেখা গেল না মনোমোহনকেও।

কি যে চুরি গেছে এক নজরে বোঝা গেল না কিছু। যেখানকারটা সেই-খানেই আছে বলে মনে হয়। যা চুরি গেছে বলে ভাবা হয়, তা খুঁজে দেখা যায় সেইখানেই ঠিক আছে।

তা থাক, কিন্তু চুরি করতে এসেছিল যে তাতে সন্দেহ কী? লন্ঠন নিবিয়ে দিয়েছে, দরজার উপর পড়েছে হুমড়ি খেয়ে—এ তো সুবধুনীর নিজের দেখা, নিজের শোনা। লজ্জায় ও অপমানে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠলো। দেবী-প্রতিমার রাংতা খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো যেন ভিতরের খড়।

কিন্তু চরম একটা প্রতিশোধ নেবেন, যতীশবাবু খেপে উঠলেন। থানায় খবর দিলেন তিনি—একটা কিছু চুরি গেছে নিশ্চয়ই—না যায়, বানিয়ে বলতে বাধবে না তাঁর। মনোমোহনকে ধরতে হবে, পুরতে হবে তাকে জেলে। "কাজের বেলায় ছেলে, কাজ ফুরুলে জেলে"—ভোলেননি তিনি।

মনোমোহনকে পাওয়া গেল কাছেই, একটা গাছের তলায়। পেটের অসহ্য ব্যথায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

জেলে দেবার আগে তাকে সুস্থ করা দরকার। তাই তাকে নিয়ে আসা হলো হাসপাতালে।

অনেক পরে মনোমোহন চোখ মেলে চাইলো। ডাকলো : 'মা।'

দেখলো, কেউ কোথাও নেই।

'মাগো, আমি হেরে গেলাম, হারিয়ে দিলাম তোমাকে। সারলো না আমার এই পেটের ব্যথা, সারাতে পারলো না তোমার পায়ের অমৃত, হাতের অমৃত।' মনোমোহন কেঁদে উঠলো।

একজন কে জানতো বোধ হয় ব্যাপারটা, জিগগেস করলো : 'শেষকালে চুরি করতে গেলে কেন?'

'চুরি?' মনোমোহন চমকে উঠলো : 'চুরি করতে গিয়েছিলাম মার মানের জন্যে। সন্ধে থেকে আমারো ব্যথাটা উঠলো ঠেলা মেরে—মুখে হাসি এনে মার কাছ থেকে লুকোলাম সেই ব্যথা, কিছু হয়নি বোঝাতে গিয়ে খেয়ে নিলাম এক পেট—মা যে কাছে বসে খাওয়ালেন। কিন্তু যাবে কোথায় সেই অত্যাচারের ফল? ঘৃতে আহুতি পড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো, পেটের মধ্যে চলতে লাগলো শূল আর শাবল এক সঙ্গে। মাগো, তারপর চুরি করতে গেলাম। চুরি করতে গেলাম তোমার চরণের অমৃত নয়, বাবার ওষুধ. টেবিলের উপর যা-সব থরে-থরে সাজানো আছে—সেই ওষুধ যা খেয়ে বাবার ব্যথা নরম পড়ে গিয়েছিল, যা খেয়ে শান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সন্ধেবেলায়। চিনে রেখেছিলাম তখন থেকে, ভেবেছিলাম সেই ওষুধ খেয়ে

সারাবো এই যন্ত্রণা, ঢেকে রাখবো আমাদের পরাজয়ের কথা। কিন্তু, মাগো, অন্ধকারে খুঁজে পেলাম না সেই ওষুধ, লণ্ঠনের পলতেটা বাড়াতে গিয়ে নিবে গেল আচমকা।'

মনোমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালো।

মনোমোহনকে পুলিশ আটকালো না। কিছুই চুরি যায়নি—শেষ পর্যন্ত এই রিপোর্টই যতীশবাবু পাঠিয়ে দিলেন, যখন শুনলেন আবার ব্যথায় কাবু, জব্দ হয়েছে মনোমোহন। কিন্তু সে যেন আর তাঁর বাড়িমুখো না হয়—পরাজয়ের প্রতারণার গ্লানি যেন সে আর বহন করে না আনে—এই সর্তে।

মনোমোহন শুধু আরেক বার বললে—'মাগো'—

৫৭। একরাত্রি

রাত এখন ক'টা? গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মোটর চলে গেল পশ্চিমে। যত রাতেই হোক, দাঁড়াও এসে জানলার সামনে, দেখতে পাবে একটা মোটর সাঁ করে বেরিয়ে গেল। কোথায় যায়, কোথায় থামে কে জানে।

ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে। শীতের শেষে বসন্তের বৃষ্টি। শীতকে মনে করিয়ে দেওয়ার বৃষ্টি। আকাশের করুণা। সবাই ঘুমুবে শান্ত হয়ে। বৃষ্টির শব্দে পায়ের শব্দটি শোনা যাবে না।

যদি আসে নিশ্চয়ই খালি পায়ে আসবে। অনেক রাতে হঠাৎ-ওঠা চাঁদের হাসিটির মত আসবে। কিংবা গহন অরণ্যে ভয়পাওয়া কৃষ্ণসার হরিণীর মত।

কিন্তু আসবে কি? কেউ আসে?

আজ যদি না আসে তবে আর আসবে কবে? এমন শুভরাত্রি বিধাতা ফরমায়েস দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। জামাইবাবুর মায়ের অসুখের খবর পেয়ে দিদি আর জামাইবাবু চলে গিয়েছেন কলকাতা। পরাশরবাবু হাসপাতালে। তার স্ত্রী কাছাকাছি কাকার বাড়িতে। উপরে শুধু ও আর ওর মা। মাকে একটু ফাঁকি দিতে পারবে না তো মেয়ে হয়েছে কেন?

প্রথম দিনের ঝগড়ার কথাটাই মনে পড়ছে ভবদেবের।

একটা গাছ এসে পড়েছিল ভবদেবদের এলেকায়। গোলাপ গাছ। আর ধরবি তো ধর সেই গাছেই ফুল ধরল।

সেই ফুলই নৃশংস হাতে ছিঁড়ে নিয়েছিল ক্ষণিকা। ভেবেছিল কেউ দেখতে পাবে না বুঝি। তাড়াতাড়িতে ছিঁড়তে গিয়ে নরম ডালটাকে জখম করে ছেড়েছে।

'ও কি, ও ফুল ছিঁড়লেন যে?' চকিতে সামনে এসে হুমকে উঠেছিল ভবদেব।

'এ গাছ আপনাদের ভাড়া দেওয়া হয়নি।' রূঢ় উপেক্ষায় পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল ক্ষণিকা।

'সে কি কথা! ঘরের সামনের এ ফালি জমিটুকু যদি আমাদের, জমির উপরকার এ ফুল-গাছও আমাদের। একেবারে আমার ঘর ঘেঁসে এই গাছ, হাত বাড়ালেই ধরা যায় রীতিমত।'

কী অপূর্ব যুক্তি। মনে-মনে হেসেছিল নিশ্চয়ই ক্ষণিকা। যেহেতু হাত বাড়ালেই ধরা যায় সেহেতু আমার অধিকার! বাঁকা ভুরু সঙ্কুচিত করে বলেছিল ক্ষণিকা, 'কিন্তু এগাছ আপনারা পোঁতেননি, আমরা পুঁতেছি—'

'আপনারা তো আরো অনেক পুঁতেছেন। বাগান সাজিয়ে বিলিতি তারের বেড়া দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ফুল হয়েছে একটাতেও? গাছ পোঁতা আর তাতে ফুল ফোটানো এক কথা নয়। পুকুর অনেকেই কাটে কিন্তু পুণ্য না থাকলে তাতে জল হয় না।'

কী অপূর্ব উপমা! উপেক্ষার ভঙ্গিতে আবার পিঠ ঘুরিয়েছিল ক্ষণিকা। দীর্ঘবৃন্ত ফুলটা খোঁপায় গুঁজতে-গুঁজতে বলেছিল, 'ফুল যদি ফুটে থাকে তবে ভাড়াটেদের পুণ্যে ফোটেনি, যাদের বাড়ি তাদের পুণ্যেই ফুটেছে।'

'কিন্তু ছিঁড়ে নেবার সময় তো পুণ্যবানের ভঙ্গি বিশেষ ছিল না হাতে-চোখে। যেন কেউ দেখতে না পায় এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে চোরের মত পালিয়ে যাওয়ার মতলব।'

'নিজের পাঁঠা যে ভাবে খুশি সে ভাবে কাটব তাতে অন্য লোকের কি।'

'কী হয়েছে রে ক্ষণু?' আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল সুনয়নী।

এক মুহূর্ত দেরি হয়নি বুঝে নিতে। কতদিন বহু যত্নে দুই চোখের ভালোবাসা দিয়ে যে ফুলটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ভবদেব, তা আর নেই। মোচড় খেয়ে ডালটাও হেলে পড়েছে। কতবার বলেছে সুনয়নী, ফুলটিকে তুলে এনে ফুলদানিতে রেখে দে। উত্তরে বলেছে, তেমন কেউ যদি থাকত দেবার মত তার জন্যে তুলে আনতুম। তেমন যখন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তখন গাছের ফুল গাছেই থাক।

'আমিই ফুলটা ছিঁড়েছি দিদি।' পিঠ ঘুরিয়ে খোঁপাটা দেখিয়েছিল ক্ষণিকা। ঘষা-ঘষা ওড়া-ওড়া চুলের শুকনো খোঁপার মধ্যে টাটকা একটা রক্তগোলাপ।

'বা, চমৎকার।' গাল ভরে হেসে উঠেছিল সুনয়নী। বলেছিল, 'কেশবতী রাজকন্যের মাথায় উঠেছে, ফুলের আর কী চাই।'

সুন্দর করে হেসে উঠেছিল ক্ষণিকা। বিজয়িনীর ভঙ্গিতে মাথা উদ্ধত করে চলে গিয়েছিল সমুখ থেকে।

কোথায় যাবে! অহঙ্কারে মাথা চাড়া দিয়ে চলতে গেলে আলতো খোঁপায় থাকবে কেন গোলাপ! খসে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। যাক পড়ে। নেব না

কুড়িয়ে। পিছন ফিরে তাকিয়েও দেখব না। সোজা চলে গিয়েছিল গরবিনী—সকালের রোদ্দুরে সারা গায়ে যৌবনের ঝলক দিয়ে।

ছিন্নবৃন্ত বিধ্বস্ত গোলাপের দিকে তাকিয়ে ছিল ভবদেব। বিহ্বল বৃন্তাশ্রয় ছেড়ে মাটিতে লুন্ঠিত হয়ে পড়ে থাকলেও কম সুন্দর নয় গোলাপ।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। এখনো ঘুমুতে যায়নি ভবদেব। চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে। পরিপাটি করে বিছানা পাতা। একটিও ভাঁজ নেই, রেখা নেই। উচ্ছ্বসিত কোমলতায় প্রসারিত হয়ে আছে। সমস্ত ঘর অন্ধকার। খানিক আগে একটা মোমবাতি জ্বালিয়েছিল। পরে কি ভেবে নিবিয়ে দিয়েছে ফুঁ দিয়ে।

অন্ধকারেই আসুক পথ চিনে। আকাঙ্ক্ষার তাপ লেগে-লেগে অন্ধকারই তার মূর্তিতে দীপায়িত হোক।

কিন্তু সত্যি কি আসবে? বলে গেলেও আসা কি সম্ভব? আসা কি মুখের কথা?

এখনো বৃষ্টি চলেছে ঝিরঝির। এলোমেলো হাওয়া উঠেছে। দুদিকের দু দরজাই ভেজানো ছিল এতক্ষণ। হাওয়ায় শব্দ হতে পারে ভেবে ছিটকিনি লাগাল ভবদেব। কথা আছে, ঠেলে যদি বোঝে দরজা বন্ধ, আঙুলের টোকা মারবে। তার দরকার হবে না। এ অঞ্চলে চলে এলেই অনায়াসে বুঝতে পারবে ভবদেব। হাওয়ায় পাবে তার গায়ের গন্ধ, শুনবে তার শাড়ির খসখস।

হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে আলগোছে। মা আর মেয়ে এক ঘরে শোয়, হয়তো মা-ই এখনো আচ্ছন্ন হয়নি। অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ক্ষণিকা। প্রতীক্ষা করছে। এদিকে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মোমবাতি।

নিয়তির পরিহাসের কথা কে না শুনেছে। হাতের পেয়ালা মুখে তোলবার আগে হাত থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্যে আরেকটা সিগারেট ধরাল ভবদেব।

ফুলটাকে মাটিতে অমনি ফেলে যাবার পর, মনে আছে সুনয়নী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল : দে ঐ গাছের নির্বংশ করে একেবারে শেকড় উপড়ে। কতদিনের চেষ্টায় কত কষ্ট করে ফুল ফোটানো হল। এখন বলে কিনা বাড়ির মালিক বাড়িউলি। এর পর হাটে-মাঠে-ঘাটে যেখানেই থাকি না কেন, মাথার উপরে বাড়িওলা নিয়ে যেন না বাস করতে হয়।

কি সব দিনই গিয়েছে! নিচের তলার ভাড়াটে, বাড়িওলার ভাব সব রকমেই যেন নিচের তলায়। কুয়োর থেকে পাম্প করে জল দিত, তা ভাড়াটেরা সব শেষে। পাঁচ মিনিট হতে না হতেই সুইচ-অফ। কী ব্যাপার? ঝামা-মারা টান জায়গা মশাই, কুয়ো শুকিয়ে এসেছে। এমনি নিত্যি। ভর-গ্রীষ্মের দিনে কলসী-কুঁজোও ভরাট হয়নি; বর্ষায় যখন সচ্ছল জল তখনও বড়জোর দশ মিনিট। সট করে সুইচ অফ করে দিয়ে বলেছে, মফস্বলে কারেন্টের দাম কত।

প্রথম সরকারী ঝগড়া হয়েছিল চাকর রামলখনকে নিয়ে। নিচে আলাদা-

মতন একটা ফালতু ঘর ছিল, ভাড়া দেওয়ার সময় বলা হয়েছিল, ওটা চাকরের ঘর, ভাড়াটেদের এজমালি। কিন্তু থাকবার বেলায় বাড়িওলার ড্রাইভার আর দারোয়ান। চলবে না কথার ঘোর-ফের, চাকরের জায়গা দিতে হবে। মুখে হার মেনেছিল পরাশর, কিন্তু টিপে দিয়েছিল দারোয়ানকে। তার দাপটে সাধ্য কি রামলখন শোয় সেই ঘরের মধ্যে। তার জায়গা বারান্দায়।

সত্যি রামলখন আজ বারান্দায় শোয়নি তো? ভবদেব বলে দিয়েছে বাইরের ঘরে শুতে। কিন্তু বলা যায় না, যেমন বুদ্ধি, হয়তো প্রভুর নিরাপত্তার কথা ভেবে একেবারে বাইরের দরজা ঘেঁসে শুয়েছে। কে জানে সেইটেই হয়তো মস্ত বাধা হবে ক্ষণিকার।

খুট করে ছিটকিনি খুলে দরজা ফাঁক করে তাকাল একবার বাইরে। না, বারান্দা ফাঁকা। আশপাশ নিঝুম। দূরে স্টেশনের লাল--শাদা-সবুজ আলোর পিণ্ডগুলি জ্বলছে স্থির হয়ে। আপ দুন আর ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস চলে গিয়েছে এতক্ষণে। আরো কত ট্রেন আসবে যাবে। যে ট্রেনের অবধারিত স্টেশন এই ঘর সেই আর এসে পেঁাছুল না!

যা অবধারিত তার জন্যে কেন এই অধীরতা?

চোখের উপরে একটা তারা জ্বলছে দেখতে পেল। যা অবধারিত তাতে সুখ নেই, যা অভাবনীয় তাতেই সুখ। মেঘলা আকাশ দেখবে ভেবেছিল দেখল একটা তারা! অত্যাশ্চর্য আনন্দে ভরে উঠল মন।

এমনি একটা অত্যাশ্চর্যের জন্য প্রতীক্ষা করছে ভবদেব। অবধারিতের জন্যে নয়।

চরম ঝগড়া হয়েছিল সেদিন।

উপর থেকে ভিজে কাপড় ঝোলায় এই নিয়ে ভবদেবরা আপত্তি করেছে বহুদিন—বারান্দায় উঠতে-নামতে ঠিক নাকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়, মাথার উপরে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ে। শোনেনি বাড়িওলারা। বলেছে, ও ছাড়া জায়গা নেই কাপড় মেলবার। মুখের প্রতিবাদে কাজ হয়নি, তাই গেরো মেরে ভিজে কাপড়ের কুণ্ডলী পাকিয়েছে নিচে থেকে। ঢিল বা অন্য কিছু ধুলো-বালি বেঁধে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন অন্যরকম হয়েছিল। শুকিয়ে এসেছে একটা শাড়ি, খসে পড়েছিল নিচে, নিচের বারান্দায় সিঁড়ির উপর। বিকেলের ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল রামলখন, চোখে পড়তেই কুড়িয়ে নিয়েছিল ব্যস্ত হাতে। ভবদেব সেইমাত্র ফিরেছে আপিস থেকে, চোখোচোখি হতেই বলেছিল, 'রেখে দে।'

গুটিয়ে-পাকিয়ে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল রামলখন।

আর তক্ষুনিই তরতরিয়ে নিচে নেমে এসেছিল ক্ষণিকা।

সুনয়নীকে জিগগেস করেছিল, 'আমাদের একটা শাড়ি পড়েছে দিদি?'

'কই না তো!' সুনয়নী ভিতরের বারান্দায় চা করছিল, অবাক মানল। 'কি রকম শাড়ি? কার শাড়ি?'

'বৌদির শাড়ি। তেমন দামি কিছু নয়। কিন্তু নিচে পড়লেই যদি তা আর ফেরৎ না পাওয়া যায়—'

'বা, সে কি কথা? রামলখন তো এইমাত্র ঝাঁট দিচ্ছিল বাইরে। হ্যাঁ রে, রামলখন, বাইরে শাড়ি দেখেছিস একটা?'

মাটি-লেপা উনুনের মত মুখ করে রামলখন বললে, 'আমরা দেখতে যাব কেন?'

'বেশিক্ষণ হয়নি। আমিই তুলছিলুম, গেরো খুলতে পড়ে গিয়েছে—'

'হাওয়ায়ও তো উড়ো যেতে পারে—' ভিতর থেকে টিপ্পনী কেটেছিল ভবদেব।

উড়নতুবড়ির মত ঝলসে উঠেছিল ক্ষণিকা। বলেছিল, 'মাপ করবেন দিদি, আমি সার্চ করব।'

'সার্চ করবে!' প্রথমটা থমকে গিয়েছিল সুনয়নী। পরে মুখে হাসি টেনে বলেছিল, 'এই দেখনা আমাকে।' বলে আঁচল ঝাড়া দিয়েছিল।

'বডি-সার্চ নয়, বাড়ি-সার্চ।'

'আপনি মেয়ে-পুলিশ নাকি?' ভবদেব এবার এসেছিল মারমুখো হয়ে: 'সঙ্গে ওয়ারেন্ট আছে?'

'ও সব চোর ধরতে ওয়ারেন্ট লাগে না। কলকাতার বাসে-ট্রামে পকেট মারা গেলে প্যাসেঞ্জারদের পকেট সার্চ করার রীতি আছে।'

'এ একটু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ক্ষণু?' আপত্তি করেছিল সুনয়নী।

'হয়তো হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই।'

'উপায় নেই?' আবার ঝাঁজিয়ে উঠেছিল ভবদেব: 'আপনি কাউকে দেখেছেন চুরি করতে?'

'চোখে দেখিনি, কিন্তু কানে শুনেছি। শুনেছি, শাড়িটা নিচে পড়ামাত্রই একজন বলছেন আরেক জনকে, রেখে দে। পরের জিনিস জেনে তা ছলনা করে রেখে দেওয়াটাও অসাধুতা।'

'এতই যখন জানেন তখন সোজাসুজি এসে ভালোমানুষের মতন চাইলেই হত!'

'ভিক্ষে করে নেওয়ার চাইতে দাবি করে নেওয়ার মধ্যে গৌরব আছে।' যৌবনের অহঙ্কারে সারা গায়ে ঝঙ্কার তুলেছিল ক্ষণিকা। বলেছিল, 'দিয়ে দিন।'

রামলখনকে ভবদেব বলেছিল দিয়ে দিতে।

শাড়িটা পেয়ে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠেছিল ক্ষণিকা। মনে হয়েছিল যেন তার গায়ের অঞ্চল থেকে শূন্যে একঝাঁক বক উড়িয়ে দিল।

অবাক যত না হয়েছিল তার চেয়ে বেশি রেগে উঠেছিল সুনয়নী: 'তুই দিতে গেলি কেন? সার্চ করা বার করে দিতাম।'

'তুমিই তো লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ! নইলে ও কোন সুবাদে তোমাকে দিদি বলে? মাসি না, পিসি না, বৌদি না—'

'মনে হচ্ছে তোর সুবাদে।' ঠাট্টা করেছিল সুনয়নী।

'আমার সুবাদে! দেখি আজ থেকে সমস্ত সু বাদ দিলাম দিদি। বাসাড়ে যখন হয়েছি তখন চাষাড়েই হব ঠিকঠাক।'

লজ্ঝর একটা ফ্যান ভাড়া করে এনেছিল ভবদেব। এ-সি কারেন্টের পাখা, বাটি-শুদ্ধু ঘোরে। পুরো দমে চালালে প্রলয়ঙ্কর শব্দ হয়, ঘর-দোর কাঁপে, মনে হয় সিলিং বুঝি ফেটে পড়বে। সেই শব্দ উপরে যায়, উপর থেকে ফেরাফিরতি বল খেলে, দুপ-দাপ চালায়, কিন্তু কতক্ষণ চালাবে, এদিকে পাখা ঘুরছে দিন-রাত। শুধু তাই নয়, শুরু করেছিল দেয়ালে পেরেক ঠুকতে, শার্সি ভাঙতে, মেঝেতে হাতুড়ি পিটতে। আর কি করা, উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিল বাড়িওলা। উলটে রেন্ট কন্ট্রোলের কাছে নালিশ করল ভাড়াটে। জল বন্ধ, আলো বন্ধ।

লাগ ভেলকি লাগ।

এমনি যখন জলদতালে বাজনা বাজছে, তখন খবর এল ভবদেবের চাকরি স্থায়ী হয়েছে। প্রমোশন পেয়েছে ইউরোপীয়ান গ্রেডে। কিছুকাল পরেই কোয়াটার্স দেবে কোম্পানি।

দেখতে-দেখতে একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। খারিজ হয়ে গেল সমস্ত মালিমামলা। আকাশ বাতাসের বদলে গেল চেহারা। নিচের ঘরে আলো জ্বলল শুধু নয়, নতুন পয়েন্ট বসাল পরাশর। জল দিতে লাগল চৌবাচ্চা ছাপিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল উপরের দুপদাপ। কাপড় শুকোতে লাগল ছাদের উপর প্রসারিত হয়ে। শুধু তাই নয়, পরাশর নতুন একটা নিঃশব্দ পাখা দিলে ভবদেবকে। ভাড়া? ভাড়ার জন্যে কি।

আশ্চর্য, সময়ে অসময়ে নিচে নামতে লাগল ক্ষণিকা। সুনয়নীর কাজ-কর্মে হাত মেলাতে লাগল। দু-একটা রান্নাও নাড়ল-চাড়ল।

কখনো-সখনো হাত রাখতে গেল ভবদেবের টেবিলে। ভবদেবেরও ঘন-ঘন নেমন্তন্ন হতে লাগল উপরে। পরাশরের মা, আর বৌদিও চলে এল সামনে, নতুনতরো আত্মীয়তার আলো ফেলে।

পরাশরের মা বললেন, গায়ের রং একটু কালো হলে কি হবে, দিব্যি স্বাস্থ্য।

'আর লেখাপড়া?' ফোড়ন দিল বৌদি।

সব জানা আছে। মনে-মনে হেসেছিল ভবদেব। আসলে চাকরি, বড় বাহালি চাকরি। আসলে টাকা। আসলে কোয়ার্টার্স।

হাল ঠিক ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু মুষ্টিটা একটু শিথিল করেছিল ভবদেব। দেখি হাওয়ার টানে কোথায় গিয়ে উঠি, কোন রোমাঞ্চের বন্দরে। দেখি উদ্ধত কি করে বিগলিত হয়। দুরূহ-দুর্জ্ঞেয় কি করে সরল হয়ে আসে।

দক্ষিণের আকাশ অনেকখানি জুড়ে লাল হয়ে উঠেছে। বার্ণপুরের ফার্নেস। যেন উদ্যত বজ্রের মতো জ্বলছে কোথায় মহাভয়ঙ্কর। দাহের ওপারে নির্দয় শাসনের মত। যেন বলছে রূঢ়ভাষে, তর্জনী আস্ফালন করে, কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম চলবে না, কোনো স্খালনের ক্ষমা নেই, নেই কোনো বিচ্যুতির নিষ্কৃতি।

তাই, ভয় পেয়ে গিয়েছে ক্ষণিকা। কুঁকড়ে-সুঁকড়ে ভয়ের কুণ্ডলীর মধ্যে অভ্যাসের জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

যদি এই ভয়টুকু না থাকে তবে কিসের জয়! এই ভয়টুকু আছে বলেই তো নির্জন গিরিশিখরের ডাক। ডাক সেই পথ-হারানো গহন অরণ্যের। সঙ্গ-লেশহীন সমুদ্রতীরের। সেই ডাকটি কি এই মহান রাত্রি পৌঁছে দিতে পারেনি ক্ষণিকার কানে-কানে?

বটেই তো। সেও নুন-নেবু মেশানো ফিকে জল-বার্লি। একটি অভ্যস্ত জীবনের জীর্ণতার জন্যে অপেক্ষা করছে ধৈর্য ধরে। রাত্রির ক্লান্তিতে প্রতিটি প্রভাতকে মলিন দেখবার বাসনায়। নেই তার মধ্যে সেই আনন্দোদ্ভব উদ্ঘাটনের স্বপ্ন। সর্ব-অর্পণের ব্যাকুলতা! রাজকন্যার ভিখারিনী সাজবার তাপসশ্রী! তাহলে তাকে দিয়ে আর কি হবে? যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে আজ দেখা হবে মহারাত্রির মৌনে, সমস্ত হিসেব-কিতেবের বাইরে, কোনো রকম কৃত্রিম মীমাংসা না মেনে—এই উজ্জ্বলতাটুকু এই নবীনতাটুকু যদি সে উপহার দিতে না পারে, তবে তার দাম কী, তবে তার মহত্ত্ব কোথায়!

ভালোবাসা না ছাই! মোটা জাঁকালো চাকরি। টাকা। স্ববাসের কাছে কোয়ার্টার্স।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে দিয়েছিল পরাশর। চলুন যাই কল্যাণেশ্বরী, বরাকরের ডাকবাংলো। ওবার তোপচাঁচি। এবার আরো দূরে, পরেশনাথ।

কেমন একটা ঘোর-ঘোর নতুন দৃষ্টি এসেছিল ভবদেবের চোখে। রক্তে নতুনতরো আস্বাদ। হঠাৎ ঘুম-ভেঙে যাওয়ার মধ্যে হঠাৎ মনে-পড়ে-যাওয়ার সুগন্ধ। নতুন দৃষ্টির সঙ্গে নতুন দৃষ্টির যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সমস্তই যেন চক্ষুময় হয়ে ওঠে। অলক্ষ্য একটি নিমন্ত্রণের ভাষা নীরবে গুঞ্জরন করতে থাকে। আশ্চর্য, যে চোখে আগে চকমকি পাথর ছিল তাতে এখন একটি লজ্জা একটি গম্ভীর কোমলতা দেখা দিয়েছে। একটি ধরা-পড়ার প্রস্তুতির লাবণ্য। কি করে এ সম্ভব হতে পারে ভেবে পায়নি ভবদেব। কে রচনা করল এই রুক্ষ মাটির শ্যামায়ন! নিষ্পাদপের দেশে অজানা পক্ষিকাকলী।

কিন্তু ঐখানেই শেষ। আর কোনো ঐশ্বর্য নেই। শুধু একটি দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে সমাপ্তি পাবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

সুনয়নীকে বলেছিলেন পরাশরের মা : 'তুমিই তো কর্ত্রী। এখন বলো কি তোমার দাবিদাওয়া!'

'দাবিদাওয়া যে কিছু নেই তা আমি জানি।' সুনয়নী বলেছিল হেসে হেসে, 'কিন্তু আমিই কর্ত্রী কিনা তাই জানি না।'

সেই দাবিদাওয়া জানবার জন্যেই সেদিন এসেছিল ক্ষণিকা। ছুটির দ্বিপ্রহরে। সুনয়নীর সুতো ধরে ভবদেবের নির্জনতায়।

ভবদেব বলেছিল, 'একদিন মধ্যরাত্রে আসতে পারো?'

দু চোখে অন্ধকার দেখেছিল ক্ষণিকা। ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছিল।

'চার দিকে এত ভিড়, কোনো সম্ভাবনা নেই, তা আমি জানি।' রাজনীতিকের নিরুদ্বেগ গলায় বলেছিল ভবদেব : 'কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের ষড়যন্ত্রে যদি কোনো দিন সেই মসৃণ মহারাত্রি আসে, আসবে?'

মুচকে হেসে সম্মতির ঘাড় নেড়েছিল ক্ষণিকা।

সেই মহারাত্রি সমাগত। কিন্তু ক্ষণিকার সাড়া নেই। আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতির নিচে আত্মদানের স্বাক্ষরটি ছিল না। পরিমিত জীবনের অপ্রমত্ত শান্তির কূপে তৃষানিবৃত্তির অপেক্ষা করতে লাগল। রাত্রির মঞ্জুষায় দিল না তাকে একটি উজ্জ্বলতম দিনের উপহার। দিল না তাকে একটি বাঙ্ময়ী নিস্তব্ধতা। তার পৌরুষকে মহিমান্বিত করল না একটি বলবান বিশ্বাসে।

সত্যিই তো, বিশ্বাস কি। যদি অবশেষে ছিন্নসূত্র মালার মত ধুলোয় ফেলে দেয় ভবদেব! কে না জানে অবিবেকী পুরুষের খামখেয়াল! যদি তার কাছে সহসা সমস্ত মূল্য খুইয়ে বসে! যদি এক লহমায় সমস্ত রহস্যের অবসান হয়! যদি শেষ ছত্রের সঙ্গেসঙ্গেই কবিতাটি থেমে যায়, সমস্ত কথা, সমস্ত সুর যায় ফুরিয়ে।

তার চেয়ে নিষ্পত্তির দৃঢ়ভূমি অনেক ভালো। অনেক ভালো ধৈর্যের ফুলশয্যা।

সে তো শুধু একটা নিয়মপালনের রাত্রি। সে সব ফুল তো বাজারে কেনা। কিন্তু সে ফুলশয্যার চেয়ে এ তৃণশয্যার অনেক ঐশ্বর্য। আকাশের অনাবৃতির নিচে শ্যামলতার উন্মুক্তি।

তবে তাই হোক, এখানেই ইতি পড়ুক। তোমার অক্ষত অন্তরের পুণ্যস্থানে ফটক এঁটে দাও। তুমি থাকো তোমার অক্ষোভে অক্ষুণ্ণ হয়ে। আমি এবার শুয়ে পড়ি। ভবদেব বিছানার দিকে তাকালো। এবার শুয়ে পড়ি। বৃষ্টিটি আর নেই।

অন্যায্য অভিমান করে লাভ কি। বাধাবিঘ্নগুলোও বুঝতে হয়। বড় বন্ধনগুলো নেই বটে কিন্তু ছোট কণ্টক অনেকগুলি।

'বিমলাকেই আমার বেশি ভয়।' বলেছিল ক্ষণিকা : 'ওর দুটো রোগ, দুটোই সাংঘাতিক। এক হিংসে, দুই অনিদ্রা।'

'দুটো বড়ি দিচ্ছি, খাইয়ে দিয়ো চালাকি করে।' বলেছিল ভবদেব।

এটুকু এলাকার মধ্যে চার-চার ঘর ভাড়াটে বসিয়েছে পরাশর। সাধে কি আর ভবদেব তাকে হাড়কিপ্পন চশমখোর বলে! গ্যারেজের উপরে দুখানা ঘর তুলে ভাড়া দিয়েছে বিমলা আর বিমলার মাকে। বিমলার মা ধাইগিরি করে। রাত্রে যদি কল আসে তবে বিমলাকে ক্ষণিকার কাছে শুতে পাঠায়। তেমন যদি কিছু ঘটে আজ অঘটন তাহলেই তো বিপদ! একে পাশে শোবে তায় আবার ঘুম নেই।

কিন্তু ভবদেবের নিজের ভয় নাগমশাইকে। ভাড়াটে বসাবার আগে আর

বাছবিচার করেনি পরাশর। কোথাকার এক বিপত্নীক নিঃসন্তান ।ঠকেদারকে ঘর দিয়েছে একখানা। জীবনে দুটি মাত্র ব্যসন, রাতে চোর ধরা ও দিনে নাকের ডগায় চশমা বসিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে ইতি-উতি উঁকি-ঝুঁকি মারা। পাড়ার রক্ষীদলের সর্দার। জানলা দিয়ে কোন চোর হাত বাড়াল কোন মশারির মধ্যে, কোথায় গার্ডে ড্রাইভারে যড় করে ট্রেন থামিয়ে ওয়াগন ভাঙল—এই সবেরই ফিরিস্তি করে। বাড়ির আনাচে-কানাচে, কখনো বা ট্রেনের লাইনের ধারে টহল দেয়। যখন ঘরে থাকে, জানলার ভাঙা খড়খড়ির ফাঁকে চশমা ঠেকিয়ে চেয়ে থাকে।

শুধু নাগ নয়, কালনাগ। দুপেয়ে সাপ। তার উদ্যত ফণা ডিঙিয়ে আসা কি সহজ কথা?

তারপর এদিককার একতলার সেডের খগেন মিত্তির। সে আবার যোগধ্যান করে। করবি তো কর ঘরে বসে কর। তা নয়, ঘরের বাইরে এজমালি গেটের কাছে আম গাছটার তলায় চেয়ার পেতে বসে থাকে। চোখ বুজে শিরদাঁড়া খাড়া করে। সত্যিকার হলে ভাবনা ছিল না, টের পেত না কিছু। ভণ্ড বলেই ভয়। চোখ চেয়ে দেখে ফেলবে ঠিক সময়।

বৃষ্টিতে উপকার করেছে। যোগীবর ঘরে গেছেন। কিন্তু নাগমশায়ের খড়খড়িটির কি দৃশ্য কে জানে। কে জানে বড়ি খেয়ে কেমন আছে বিমলা! কে জানে তার মা কোথায়।

ভুল করে না ইচ্ছে করে নিজেই বড়ি খেয়ে ফেলেছে কিনা তার ঠিক কি।

বাধা হয়তো আর কোথায়ও নয়, বাধা তার মনে। সে আত্মীয় হতে চায়, আপন হতে চায় না। সংহত তুষারপিণ্ড হয়ে থাকবে, হবে না সীমাতিক্রান্তা নির্ঝরিণী। এও একরকম অহঙ্কার। আমি পবিত্র, আমি অব্যাহত, আমি অপ্রমত্ত এই অহঙ্কার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ভবদেব। বি-এন-আরের রাত্রের ট্রেনটাও চলে গেল এতক্ষণে। আর কি। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল এক গ্লাশ। এবার পরাভূত শয্যায় গিয়ে লজ্জিত ঘুমটুকু সেরে নি।

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক!

হৃৎপিণ্ড শব্দ করে উঠল নাকি? রুদ্ধদ্বার দেবমন্দিরে কি আপনা থেকেই ণ্টা বেজে উঠল!

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক!

কোন দিকের দরজা? ভিতর বারান্দার, না, বাহির বারান্দার? কোন সিঁড়ি দিয়ে নামল? বিমলা কি ঘুমিয়েছে? তার মার আজ কল আসেনি? াগমশায়ের খড়খড়ি কি বুজে গেছে? ছাড়া চেয়ারে আবার এসে বসেনি তা যোগীবর।

ও কি, কতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে? দরজা বন্ধ দেখে ও আবার ফরে যাবে নাকি?

খুট করে ছিটকিনি টানল ভবদেব। দরজাটা একটু ফাঁক করল। সুট করে ঢুকে পড়ল ক্ষণিকা। নিয়তির পরিহাস নয়, সত্যিসত্যি ক্ষণিকা।

কাঁপছে, লতার মত কাঁপছে। যত ঠান্ডায় নয় তত ভয়ে। যত উচ্ছ্বাসে নয় তত উৎকন্ঠায়। শুধু বললে, অস্ফুট নম্রস্বরে বললে, 'আমি এসেছি।'

মাধুর্যসিন্ধুর দুটি তরঙ্গের মত মনে হল শব্দ দুটোকে। আমি এসেছি হে গুহাহিত গোপন পুরুষ, আমি এসেছি। হে আকর্ষী বংশী, আমি শুনেছি তোমার ডাক, চিনেছি তোমার পথ। তুমি এবার আমাকে ধরো, আমাকে নাও আমাকে ভাঙো। আমাকে শূন্য করে পূর্ণ করো।

কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারল না ভবদেব। হাত ধরে টেনে আনল না কাছে, বসতে বলল না বিছানায়, কি আশ্চর্য, দরজায় ছিটকিনি লাগাতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

ইলেকট্রিক লাইট নয়, মোমবাতি জ্বালাল ভবদেব। স্নিগ্ধ আলোতে দেখল ক্ষণিকার ক্ষণকরুণ মুখখানি। ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনীর মুখ।

বললে, 'তুমি এসেছ। এর উত্তরে আমি কী বলতে পারি? বলতে পারি আমি আছি। একজন আছে, আরেকজন আসে। এ আছে বলেই তো সে আসে। আর সে আসবে বলেই তো এ বসে আছে অন্ধকারে। তাই নয়?'

অদ্ভুত সুন্দর করে হাসল ক্ষণিকা।

'তোমাকে কী দিই বলো তো?' পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ভবদেব খোলা জানলা দিয়ে হাত বাড়াতেই পেল সেই গোলাপ গাছ। বৃন্তাশ্রয়ে বিহ্বল একটি গোলাপ জেগে আছে। ঘ্রাণে-বর্ণে গদগদ হয়ে। শুষ্ক গর্বরূপে নয়, সুধাসরস প্রেমরূপে। নিবেদনের বেদনায় আনন্দময় হয়ে।

সন্তর্পণে ফুলটি ছিঁড়ল ভবদেব। ক্ষণিকার স্তূপীকৃত চুলের মধ্যে গুঁজে দিলে।

দরজা খুলে এগিয়ে দিতে গেল ক্ষণিকাকে।

ক্ষণিকার চোখে জলের ছোঁয়া লেগেছে। ছোঁয়া লেগেছে কন্ঠস্বরে। আর্তস্বরে বললে, 'এ কি, আপনি চললেন কোথা?'

'বা, কি কথা? তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আপনি?' দেয়ালের পাশে কুন্ঠিত হয়ে দাঁড়াল ক্ষণিকা। ছায়ায় যেন মিশে যেতে চাইল। বললে, 'যদি কেউ দেখে ফেলে, সব বুঝে নেবে।'

'যাতে ভুল না বোঝে তাই তো আমি চাই। বলো কোন সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলে? বিমলাকে কটা বড়ি দিয়েছ? নাগমশায়ের খড়খড়ির ফাঁক ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করেছ নাকি? আর যোগীবরের কি খবর? যোগনিদ্রার চেয়ে সুখনিদ্রা অনেক আরামের। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও গে। কোনো ভয় নেই—'

পরিত্যক্ত বিছানায় এসে শুলো ক্ষণিকা। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

৫৮ । হাড়

প্রথমটায় মানদাকে পছন্দ করা হয়নি। কিন্তু তার নিজের থেকে এই প্রার্থনাটা ভারি পছন্দ হল।

'আমাকেও নিয়ে চলুন।' লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারলনা মানদা। ঠিকেদার আপাদমস্তক দেখল একবার তাকে। কদাকার সন্দেহ নেই। খেতে-মাখতে না পেয়ে এমন কদাকার হয়েছে, কে না জানে। রূপ না থাক, চামড়ায় তাজা আনাজের চেকনাই আছে। মুখে গেঁয়োগেঁয়ো মোলায়েম ভাব আছে একটা। বাজে-মার্কা শস্তা রুজ-পাউডারের মধ্যে কারু চোখে লেগেও যেতে পারে বা।

বয়েস বেশি নয়। একটি ছেলে হয়েছিল দু'বছর আগে। চুকেবুকে গেছে। এখন সে একেবারে খালি-হাত, খালি-কোল।

'তোমার স্বামীর মত আছে?'

মিছে এ প্রশ্ন করা। এ-কথা ঠিকেদার নিজেও জানে। যখন ক্ষুধা আর রোগ লকলকে জিভ মেলে তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে তখন সমস্ত ভিত গিয়েছে নড়ে, খিলেন গিয়েছে খসে, ঘুণ ধরেছে কপাটে-কড়িকাঠে। আঁট দিয়ে আর গেরো বাঁধা নেই। তছনছ, অলছতলছ।

'পয়সা পেলে অমত করবেনা।' বললে মানদা পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটি খুঁটতে-খুঁটতে।

দাম ঠিক হল দশ টাকা। মানদার মনে হল যেন আঁচলে করে মাঠভরা ধান বেঁধে নিয়ে চলেছে।

কান্তরাম শুকনো হোগলার উপর শুয়ে ধুঁকছে জ্বরের ঘোরে। জিরজির করছে হাত-পা, বুক-পিঠ। পেটটা অথচ ঢাক। পেট-জোড়া পিলে। গলার নিচে বুক যেন আর দেখা যায়না।

টাকাটা স্বামীর হাতে দিয়ে মানদা বললে, 'এ টাকাটা নিয়ে তুমি কৈজুরির হাসপাতালে চলে যাও। সরকারী ডাক্তার দেখাও।'

'তুই কিছু রাখবিনে?'

'না, আমার এখন আর কী লাগবে!' চোখ নামাল মানদা।

'খেতে-পরতে দেবে তো?'

'না দিলে চলবে কেন?'

'আবার ফিরে আসবি?' কান্তরাম হাত বাড়িয়ে ছুঁলো একটু মানদাকে।

'এক মাস ধরে মেলা। মেলা ভেঙে গেলেই চলে আসব।'

'তুই আসবিনা। কিন্তু আমি থাকব তোর পথ চেয়ে।'

'আমি ফিরে এলে আবার তুমি আমাকে নেবে? ছোঁবে আমাকে?' মানদা স্বামীর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'আমি জানিনা তুই কেন যাচ্ছিস? মরণ তোকে নিতে পারে, আমি পারবোনা? আমি কি মরণের চেয়ে অধম?'

'কিন্তু তুমি হাসপাতালে যেও। ওষুধ খেও, দুধ খেও—'

দল-বিদলের মেয়ে নিয়ে নৌকো চলেছে ডুমুরতলার ঘাটে। সেখানে কার্তিক পুজার দিন থেকে মেলা বসবে।

ঠিকেদার মেয়েগুলোকে দালালের আস্তানায় এনে হাজির করলে। দরমার বেড়া, তাল-নারকোল পাতার ছাউনি। এটা বাজারের মধ্যে। মেলা বসবে দূরে, যেখানে হাট বসে তার পাশে। খদ্দের বুঝে রপ্তানি হবে। নইলে শুধু-শুধু ইজারাদারকে তোলা দিতে যাবে কেন?

কতগুলি একেবারে রোতো জিনিস এসেছে। শুধু সৎ বা নীরোগ এই সার্টিফিকেটে উতরোতে পারবে আছে এমন কতগুলি। তার মধ্যে মানদা একজন।

তা ছাড়া এ বছর খদ্দের-পাতি বড় কম। বড় নিরানন্দ বছর। যে-কেউই কয়টা পয়সা পায় কুড়িয়ে, চাল-ডাল কাপড়-গামছা কেনে। স্ফূর্তি করবার মত কারু মন নেই, স্বাস্থ্য নেই। নেশার সব জিনিসই গিয়েছে নিঝুম হয়ে। শুধু যারা ধান বেচে কাঁচা পয়সা পেয়েছে, কাগজের টাকা বলেই মাটিতে না পুঁতে এদিক-ওদিক উড়িয়ে দিচ্ছে কয়েকখানা। তা-ও এবার অনেক কম। বড়-জোর দশ-বারো নম্বর। বাজার এবার বড় মন্দা।

তাই আর ডাক পড়েনা মানদার। তার দু'নম্বর উপরে খতেজান বিবি পর্যন্ত এক দিন ডাক এসে পোঁচেছিলো, সে ঐ এক দিনই। খতেজান বিবি পর্যন্ত ঘাগরা পরল, কিন্তু মানদার পরনে সেই শত-গাঁট ছেঁড়া টেনি। দুবেলা খেতে পায় সে বটে, কিন্তু সাজতে পায়না।

আয়নাতে একেক দিন নিজেকে দেখে মানদা। আগের থেকে অনেক ভরা-ভরা হয়েছে। যেন সাহস পায়। প্রতীক্ষা করে বসে থাকবার মত শক্তি পায়।

আসবে একদিন জনবন্যা। সেদিন সেও বাদ পড়বেনা। সেও সাজবে, হাতে কেমিকেলের চুড়ি পরবে, মুখে রঙ ঘসবে। পাবে করকরে টাকা। রঙিন শাড়ি-জমা, পাবে মনোনয়নের মর্যাদা।

লোক নেই, লোক নেই। বড় খারাপ দিন।

সব দিক থেকেই খারাপ।

সে বসে-বসে তার স্বামীর কথা ভাবে, তার জীবনে একমাত্র পুরুষের কথা। হয়তো ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গেছে এত দিনে। হয়তো ফিরে পেয়েছে তার নৌকো। মাছ ধরছে আবার। হয়তো বিয়ে করেছে নতুন। তা ছাড়া আবার কি! তাকে কি আর ছোঁবে নাকি? চালানী নৌকোয় এসেছে অথচ ছোঁয়া বাঁচিয়ে আছে, বিশ্বাস করবে নাকি এমন অসম্ভব খবর?

বড় অপমান লাগে মানদার। শুধু দু'বেলা মাগনা খেতে পায় বলেই চলে যেতে পা ওঠেনা।

একেক সময় আশ্রয় নিতে চায় তার নিষ্কলুষ নিষ্ঠার নোঙরে, কিন্তু বলতে কি, সান্ত্বনা পায়না। একেক সময় সত্যিই বড় নিঃস্ব মনে হয়।

তারপর একদিন ভেঙে যায় মেলা। গুটিয়ে ফেলতে হয় তাঁবুকানাত। কেউ-কেউ দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে এরি মধ্যে। তারা উঠে আসে বাজারে পাকাপাকি ভাবে। কেউ-কেউ বা গাঁয়ের মধ্যে খালের ধারে গিয়ে ঘর নেয়। শুধু একা মানদাই বাড়ি ফিরে চলে।

'কোথাও আর ঠাঁই নেই, এইখেনেই থেকে যা বলছি।' কেউ-কেউ তাকে উপদেশ দেয়, 'সকলেই কেউ দালালের চোখ দিয়ে দেখেনা, লালচোখও আছে দুনিয়ায়।'

কিন্তু, না, কান দেয়না মানদা। যখন সে বেঁচে গেছে, তখন সে তার স্বামীর কাছেই ফিরে যাবে। কান্তরাম রয়েছে তার প্রতীক্ষা করে।

যদি দূরে সরিয়ে রাখে থাকবে না হয় দূরে সরে। যেমন এতদিন ছিল। থাকবে প্রতীক্ষা করে। যদি কোনদিন ডাক পড়ে। যদি কোনদিন পবিত্রতার জয় হয়।

তিনটে খেয়া ডিঙিয়ে অনেক হাঁটা পথ ভেঙে ভর দুপুরে মানদা পৌঁছুলো তার গ্রামে, পুইজালায়। সেই যে-কে-সে অবস্থায়। সেই কানি পরনে, আঁচল এবার গ্রন্থিহীন।

কিন্তু একি তার গ্রামের চেহারা। এ যে শুধু জঙ্গল আর আঘাসা। চেনা যায়না চারপাশ। দিনের বেলায় শেয়ালের পাল। নিচু-হয়ে-ওড়া শকুনের ভিড়।

দু' একজনের সঙ্গে দেখা হল। দিনের বেলায়ও তাদের ভূত মনে হয়। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, এই সেই পুইজালা। একে ম্যালেরিয়া, তায় লেগেছে কলেরা। উচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

এই তো তাদের বাড়ি। চিনতে পারতনা, যদি না চিনতে পারত সেই পৃথ্বীরাজ গাছটা। সেই ফণীমনসার ঝাড়। রাতে শাদা ফুলফোটানো সেই করবীর চারা।

তাদেরই তো সেই ঘর। দোচালার এক চাল কোথায় উড়ে চলে গিয়েছে, আর এক চাল রয়েছে মুখ থুবড়ে। হাঁড়িকুড়ি সব ছত্রখান। অনাবৃত ভিতের উপর ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতার দীর্ঘশ্বাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্বত্র মৃত্যুর নৃত্যচিহ্ন। যে হোগলার চাটাইয়ের উপর কান্তরাম ছিল শুয়ে তার অবশেষ এখনো পড়ে আছে পোতার উপর। দাঁত দিয়ে ছেঁড়া নখ দিয়ে আঁচড়ানো সেই হোগলার টুকরো।

কাকে ডাকবে মানদা? কার কাছে নেবে কৈফিয়ৎ?

তবু একবার মনে হল, হয়তো শহরে চলে গিয়েছে কান্তরাম। ভালো হয়ে, আগের মত স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে। হয়তো বা নৌকো পেয়েছে ফিরে, বেউতি

জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নদীতে। মড়কের তাড়ায় হয়তো গাঁ বদলেছে। জন দিচ্ছে হয়তো। লেগেছে দাওয়ালির কাজে।

না, যায়নি কোথাও। ওখানেই আছে, শুয়ে আছে। শুয়ে আছে ঐ গাব গাছটারর নিচে, শেয়ালকাঁটার ঝোপের আড়ালে। শুয়ে আছে শাদা হয়ে। কঙ্কাল হয়ে।

বলেছিল, প্রতীক্ষা করে থাকবে। কথার খেলাপ করেনি। মাসমজ্জা চলে গেলেও হাড় নিয়ে বসে আছে। কে নেবে তার সেই হাড়?

কঙ্কালটাকে কোলে নিয়ে বসে পড়ল মানদা। আশ্চর্য্য, কঙ্কাল দেখেই সে চিনতে পেরেছে কান্তিরামকে। তার সমস্ত কোটরে আর গহ্বরে ক্ষুধার শূন্যতা।

কারা আসছে এদিকে। সাহেব-সুবোর মতো। কি খোঁজাখুঁজি করছে। পিছনে একটা কুলির পিঠে বস্তা। কি সব নড়ছে-চড়ছে তার মধ্যে, খট্ খট্ আওয়াজ করছে।

'এই কঙ্কালটা কার?'

অম্লান মুখে বলবে মানদা, 'আমার স্বামীর।'

'খাসা! পুরো কঙ্কাল। আর গড়ন দেখেছ হাড়ের!' সঙ্গীটি বললে ফিসফিসিয়ে।

ইদানি মাংসই ছিলনা, ছিলনা রক্ত। হাড়ের বনেদ পাকা থাকলেও ছিলনা ছাদ-দেওয়াল।

'এটা বেচবে আমাদের কাছে?'

এমন কেলেঙ্কারির কথা শুনেছে নাকি কেউ?

হ্যাঁ, আমরা কঙ্কালের ব্যবসা করি। হাড়পাঁজরা চালান দিই। দাম দিয়ে কিনি। জ্যান্ত গোটা মানুষেব দাম না থাকলেও তার কঙ্কালের দাম আছে।

'কী হবে এ দিয়ে?'

জগৎসংসারের মহত্তম উপকার হবে। একজনের মৃত্যু দিয়ে আর একজনের চিকিৎসা হবে। কঙ্কালের সাহায্যে ডাক্তারি শিখবে ছেলেরা।

'বলো, কত দাম?'

মানদা তার কী জানে? মরে যাবার পরেই যে দাম এ কখনো শুনেছিল আগে? দু'জনে একবার চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। বললে, 'এই নাও কুড়ি টাকা।'

আঁচলে গিঁট দিল মানদা। চলল আবার ফিরে সেই ডুমুরতলায়। জয়দুর্গা বলে দিয়েছিল পাশের ঘরটা রেখে দেবে তার জন্যে। বলে দিয়েছিল, সংসারে সকল চোখই দালালের চোখ নয়, আছে অনেক লাল চোখ।

মানদা ফিরে চলল বাজারে। আরেক কঙ্কালের হাতছানিতে।

৫৯। বৃত্তশেষ

পেয়াদা-বাবু এসেছেন। ঘাটে-বাটে লোক জমে যাচ্ছে। কেউ কেউ বা গা-ঢাকা দিচ্ছে ভয়ে ভয়ে!

ইস্তাহার আছে, দখল আছে, অস্থাবরও আছে এক নম্বর।

অস্থাবরটা ক্ষেত্র দুয়ারীর নামে। দোয়া গাই, বকনা বাছুর, এঁড়ে দামড়া—কিছুই বাদ দেবে না। পোয়াল-কুড় পর্যন্ত।

যতই পেয়াদা-বাবু হোক, ক্ষেত্র চেনে মনোরথকে। এককালে সরিক ছিল তারা। উলুমাঠ ভেঙে চাষ করেছিল দুজনে। চাষকারকিত ছেড়ে দিয়ে মনোরথ চলে গেল সদরে, ঘুস-ঘাস দিয়ে আদালতের রাত-পাহারার কাজ নিলে। এদিকে জঙ্গল উঠিত হল, তবু মনোরথ ফিরে এল না। রাত-পাহারা থেকে হল সে আদালতের সেপাই, চাপরাশটা কখনো কাঁধে, কখনো কোমরে। ক্ষেত্র সেই যে-কে-সে চাষা, সেই ধান ছিটেন করে, বীজপাতার চাতর দেয়। থাকে খোড়ো ঘরে। মাটিতে গা পেতে।

'আমি ক্ষেত্তর।'

মনোরথ চিনতেই পারে না। তার এখন অনেক সম্মান। পায়ে জুতো, সঙ্গে দোত-কলম। ভাবটা ছোটলাটের মত।

'অণ্ডিম্যান্ড হ্যান্ডনোটের মামলা। ডিক্রি জারিতে পাওনা সাতান্ন টাকা তেরো আনা।' মনোরথ নিশানদারকে সনাক্ত করতে বলে।

'ওরে মনো, চেয়ে দেখ। আমি ক্ষেত্তর—'

'গরজারি করিয়ে দিতে হলে দু টাকা লাগবে।' মনোরথ বলে কানে-কানে।

'আমার গলায় ছুরি দিবি? মরলে হাঁড়ি ফেলতে হয় যেখানে'—

মনোরথ ও-সব ছেঁদো কথায় কান দেয় না। ডিক্রিদারের থেকেও সে টাকা খেয়েছে। সে পরোয়ানার মর্ম পড়তে শুরু করে।

ভর-বয়সের বলদ, হাঁসা রঙ, হেলা শিঙ, লেজ ভাঙা—

'ওরে, মনো, চার আনা নিয়ে ছেড়ে দে। মনে করে দেখ, দুজনে ভাই রুইতাম একসঙ্গে। ধান এবার অপুষ্ট ও দাগী হয়েছে, নোনা উঠেছে জমিতে। চার আনা পয়সায় দুবেলার খোরাকি হত—'

অন্যায় মনোরথ করতে জানে না। সে কর্তব্য করতে এসেছে। টলাটলির ধার ধারে না সে।

একটা গরু ধলো, আরেকটা ধুসো। বাছুরটা পাটকিলে। ডিক্রিদারের লোক জামিনদার হয়ে ধরে নিয়ে গেল। দুর্বল নাচারের মত তাকিয়ে রইল ক্ষেত্র। মনোরথ যেন নবাব-নাজিম, আর সে বাজেমার্কা। চুনোপুঁটির চেয়েও ছোট।

নাজির বললে, 'এ সাটে এবার দুটাকা দিতে হবে।'

মনোরথ বললে, 'আট আনা।'

আধুলিটা অতুল ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবার ভালো হাওলা পেয়েছে মনোরথ, অনেক শাঁসালো পরোয়ানা। দখল, ইস্তাহার, অস্থাবর। সমন-নোটিশের তো কথাই নেই। রিটার্নের দিন পেয়েছে লম্বা। এবার হাত ছোট করলে চলবে কেন?

'গরিব-গুর্বো লোক, বাবু, পেরে উঠব না। ছেলেটার আমোশা হয়েছে, ডাক্তার নিয়ে যেতে হবে টাকা কবলে।'

তাতে অতুলের কি? যা রেওয়াজ তা বজায় না রাখলে চলবে কেন?

'বারো আনা বাবু—'মনোরথ হাত কচলায়।

অতুল ফিরেও তাকায় না। তোলো হাঁড়ির মত মুখ করে থাকে।

না আর দরবিট করতে পারে না মনোরথ। যা হয় হবে, আর দিতে পারবে না সে নজরানা।

কিন্তু অত দূর যে হবে ভাবতে পারেনি সে কখনো। অতুল তার রোজ-নামচা নিয়ে পোকা বাছতে শুরু করেছে। কখানা পরোয়ানার দিন মেরে দিয়েছে সে। গরহাজির জারি করেছে লটকে, অথচ বিবাদীর নাম নেই। বাঁশের আগালে পুঁতে দখল দিয়েছে, অথচ ঢোলসহরৎ হয়নি। মোকাবিলা সাক্ষীরা দেয়নি কেউই টিপটাপ। চৌকিদার-দফাদারের টিকিরও সন্ধান করেনি। এমনি অনেক বায়নাক্কা।

মস্ত নালিশের মুসাবিদা করছে অতুল।

মনোরথ অতি কষ্টে এবার দুটো টাকাই বের করে দেয়। অতুলের নজর এখন আরও উঁচুতে উঠেছে। তার মেহনতের দাম এখন আট টাকা।

গলায় কাপড় জড়িয়ে নেয় মনোরথ। কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে, 'রিপোর্ট করলেই সস্‌পেণ্ড হয়ে যাব বাবু। আপনার তাঁবে আছি আমরা। আপনি না দরগুজর করলে—'

কোনো অন্যায় করছে না অতুল। সে তার কর্তব্য করছে। যত ঢিলেমি যত জোচ্চুরি—সমস্ত কিছুই তার চৌকি দেবার কথা। মাঝে-মাঝে খবরদারি না করলে কেউই সজুত থাকবে না।

মনোরথ ছুটো-ছাটা কাজ করে দিয়েছে অতুলের। গাছে উঠে নারকোল পেড়ে দিয়েছে। মফস্বল থেকে ডিম নিয়ে এসেছে ঝুড়ি-ঝুড়ি। ঘাটের নৌকা থেকে চালের বস্তা মাঝির সাথে হাত-ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে এসেছে মাচার উপর। সেবার তার মেজ ছেলেটার দমকা জ্বর হলে সমস্ত রাত জলধারানি দিয়েছিল সে একটানা।

কর্তব্যের কাছে আর কিছুর স্থান নেই। নালিশ নিয়ে অতুল চলে গেল হাকিমের খাসকামরায়।

'এ পাটালিখানার দাম কত নাজিরবাবু?' হাকিম জিগগেস করলে অতুলকে।

সাড়ে দশ আনা দাম, দু পয়সা কমিয়ে অতুল বললে, 'দশ আনা।'

'ওঃ!' পকেট থেকে হাকিম দশ আনা পয়সা গুনে দিলেন। গোনাটা ভুল হল কিনা দেখবার জন্যে অতুলের হাতের চেটো থেকে পয়সাগুলি তুলে নিয়ে আরেকবার গুনে দিলেন।

তবু অতুল পাটালির দাম গ্রহণ করল।

'তালবেতের সুন্দর-সুন্দর মোড়া পাওয়া যায় এখানে, কয়েকখানা জোগাড় করে দিতে পারেন?'

অতুল পারে না কী। রঙ-বেরঙের মোড়া জোগাড় করে দিলে। ক্ষীরোদ-বাবু মহা খুশি। হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখতে লাগলেন। কিন্তু অতুল হঠাৎ তাঁর খুশ মেজাজ চুরমার করে দিল। বললে, 'দাম সাড়ে চার টাকা।'

খড়ের আগুনের মত জ্বলে উঠলেন ক্ষীরোদবাবু: 'এত সব রঙচঙে আনবার কী হয়েছিল? আরেকটু ছোট দেখে আনলেও তো পারতেন।'

দপদপে খড়ের আগুন ক্রমে ক্রমে গুমরানো তুষের আগুনে এসে দাঁড়ালো। সাড়ে চার মাস পর অতুল দামের কথাটা মনে করিয়ে দিল।

ঘুরুনে বাতাসে অতুল হঠাৎ জলের ঘুরুলে পড়ে যায়। তার বিরুদ্ধে আসে উড়ো চিঠি। উপর হতে হুকুম আসে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

ক্ষীরোদবাবু বড় করে ঘুরান-জাল ফেলেন। শোল-বোয়াল অনেক অকীর্তিই এসে আটক পড়ে। এতদিনে বাগে পেয়েছেন ভেবে মনে মনে যেন বিশ্রাম পান।

শিরদাঁড়া নরম করে অতুল পাশে এসে দাঁড়ায়। খানিকটা বাঁকা ও অনেকটা কুঁজো দেখায়। শার্টের হাত দুটো রোজ কনুইয়ের কাছে গুটোনো থাকে, আজ কবজির উপর নামিয়ে এনে বোতাম এঁটে দিয়েছে।

কিন্তু এর আর ছাড়াছাড়ি নেই। দফায়-দফায় চুরি। নিলেমে, নৌকো ভাড়ায়, সাক্ষীসাবুদের খোরাকি ও রাহা-খরচে। পিওনদের মাইনের উপর উনি মাসওয়ারি মাশুল বসিয়েছেন। আস্ত কড়িকে অন্তত কানা না করে কারু সাধ্যি নেই বেরোয় ওঁর খপ্পর থেকে।

সংসারে সমস্তই কি কর্তব্য? মায়া-মহব্বত বলে কিছুই কি নেই?

'এ যাত্রা ছেড়ে দিন।' পায়ের উপর পড়তে-পড়তে অতুল থেমে যায়।

কত যে কাজ করে দিয়েছে ক্ষীরোদবাবুর। প্রথম যখন আসেন মালপত্র এসে পৌঁছয়নি, শিল-নোড়া বালতি ও বঁটি জোগাড় করে দিয়েছে। এখনো খোঁজ করলে তার একটা মগ পাওয়া যাবে, একটা বাচ্চা হ্যারিকেন। ভাঙা অপবাদ দিয়ে যা আর ফেরাননি তিনি, ফেরাবেনওনা কোনদিন। খুচরো নেই বলে একবার এক প্যাকেট সিগারেট কিনিয়েছিলেন তাকে দিয়ে, সে টাকা আর ইহজীবনে ভাঙানো হল না। কৃতজ্ঞতা বলে কিছুই কি নেই?

না, নেই, এমনি দোর্দণ্ড ক্ষীরোদবাবুর গোঁফ। সমস্ত অন্যায় ও শৈথিল্যের বিরুদ্ধে তা উদ্যত বাঁশ-ঝাড়।

যা থাকে অদৃষ্টে, পায়েই সে পড়বে আচমকা। কিন্তু তার নিচের লোক কী ভাববে? দেয়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে যে মনোরথ-মেনাজদ্দিরা।

সাহেব এসেছেন পরিদর্শনে।

ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে পড়তেন এক কলেজে। বসতেন এক বেঞ্চিতে। থাকতেন এক হস্টেলে, এক ঘরে, পাশাপাশি তক্তপোষে। তিনি খাস্তগির, উনি দস্তিদার।

এখন একেবারে চিনতেই চান না সাহেব। কর্মবাচ্যে কথা কন। আর যখন কর্তৃবাচ্যে আসেন তখন তাঁর একেবারে সংহারমূর্তি।

'আপনার টাইপরাইটার আছে?'

'না—'

তোমার আবার টাইপ-রাইটার থাকবে—তুমি যা হাড়-কিপটে! সাহেবের চোয়ালের হাড়টা আঁট হয়ে ওঠে।

ঘুস নিই না, ছেঁচড়ামো করি না, তাই কিপটেমি না করে উপায় কী—ক্ষীরোদবাবু দাস্যে নুয়ে রইলেন।

খবর এল, খেয়া পেরুবার সময় সাহেবের মনিব্যাগটা জলে পড়ে গিয়েছে। বেশি নয়, শ খানেক টাকা।

'না, না, আপনাদের কাউকে ব্যস্ত হতে হবে না। অবিশ্যি, সদরে গিয়েই আমি পাঠিয়ে দিতুম ফেরত ডাকে। না, তবু আপনাদের ব্যস্ত করে লাভ নেই। সামান্য পঁচিশ-তিরিশ টাকা হলেই—তা, যাক, সে এক রকম চলে যাব খন।'

অনেক পরে টনক নড়ল ক্ষীরোদবাবুর। যখন সাহেব চলে যাচ্ছেন, ট্রেনে উঠেছেন। কি একটা লেখবার জন্যে কলমের খোঁজ করলেন। বিনা দ্বিধায় ক্ষীরোদবাবু বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ফাউন্টেন-পেনটা।

সাহেব স্পর্শও করলেন না। ফাউন্টেন-পেনটা খেলো, পুরোনো, দাগধরা।

অমৃতের স্বাদ পেলেন ক্ষীরোদবাবু। রিপোর্ট এল পরিদর্শনের। হাতের লেখা বিতিকিচ্ছি, টাইপ-রাইটার না হলে চলবে না। কাজকর্ম একেবারে কাছাখোলা, ল্যাজে-গোবরে। ঝুড়ি-ঝুড়ি গলতি, ভুরি-ভুরি গাফিলি।

এবার ক্ষীরোদবাবু কয়েক ঘর কেঁচে যাবেন সন্দেহ নেই। কর্তব্য ও শাসনের কাছে কোনো বন্ধুতাই ঠেকা দিতে পারবে না।

তবু একবার যেতে হয় সদরে। মনে করিয়ে দিতে হয় একদিন এক সঙ্গে পড়লেও কত অধম অধস্তন হয়ে আছি। কেউ কোথাও না থাকলে জড়িয়ে ধরবেন না হয় তাঁর হাত দুখানি।

আর মেম-সাহেবের সঙ্গে গোপনে দেখা হলে, দুহাত ঠিক জড়িয়ে না ধরলেও, মৃদুস্বরে ডাকবেন, না-হয় তাকে তার ডাক-নাম ধরে। বলবেন, পূর্ব কথা স্মরণ না করো, আজকের কথা ভেবেই কৃপা করো, করুণাময়ী। তোমাকে যে নিয়ে আসিনি আমার গোয়ালে বিচালির ধোঁয়া দিতে, তোমাকে যে জায়গা করে দিয়েছি তখত-তাউসে, যৌতুক দিয়েছি যে হুজুরী তালুক, ভার্যা না করে যে আর্যা করেছি, সেই কথা ভেবেই একটু অনুকূল হয়ো।

পারঘাটে অতুল-আতিয়াররা দাঁড়িয়ে আছে। উপায় কি। ছাতা আড়াল দিয়ে যেতে হবে ঘাড় গুঁজে।

এই সে কোকিল স্বর। মেমসাহেবেরই রেশমী গলা।

'ব্যেরা!'

'জী।'

ক্ষীরোদবাবু ভাবছিলেন তিনিই বেয়ারাকে জিগগেস করবেন কোথাও একটু দেখা হতে পারে কিনা নিভৃতে। কে জানে, পর্বতই হয়তো আসছেন মেঘ হয়ে।

'নিচে যে টাইপ-রাইটারের এজেন্ট এসেছে তাকে বলে দাও আমাদের জোগাড় হয়েছে দুটো, এখন আর দরকার নেই—'

"মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে।" ক্ষীরোদবাবুর পদাবলী মনে পড়ে গেল।

স্পেশাল সেলুনে উজির আসছেন। ট্রেন মাঝরাতে এসেছে, তাঁর সেলুন আছে সাইডিঙে, ভোর সাতটায় তিনি অবতরণ করবেন। কাল হতেই সাহেব গোলাম ও তুরুপ ফেরাই জড় হতে লাগল। কিন্তু খোদ সাহেব মিস্টার দস্তিদারের দেখা নেই।

উজির আগেই নেমে পড়েছেন। রাতের দলামোচা পোশাকেই। দাঁত না মেজে, খেউরি না হয়েই।

দেরি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন দস্তিদার। নিচু হয়ে, ঘাড় নোয়াতে-নোয়াতে।

'এত দেরি তোমার!' ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন উজির। করমর্দনটা উত্তপ্ত হতে দিলেন না।

দস্তিদার দস্তবস্ত হয়! মুখ কাচুমাচু করে বললেন, 'সাতটা এখনো বাজেনি।'

'বাজেনি?' উজির তাকালেন ঘড়ির দিকে। দেখলেন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। স্প্রিংটা কাটা।

মুখ গোমসা করে রইলেন। পটকা ফুটছে, তোপ দাগা হচ্ছে না। বাজছে মোটে বিউগল, জগঝম্প নয়। শালুর মোটে একটা গেট আর সবগুলো দেবদারু পাতার। শালুর গেটের 'ওয়েলকামের' তুলো খসেখসে পড়ছে। চেঁচাড়ির গেট বেঁকে রয়েছে তে-ব্যাঁকার মত। তেমন কোনো হৈ-হল্লা হচ্ছে না, নিশান হাতে মিছিল করছে না ছেলেরা। এই ব্যবস্থা! তিনি যেন উটকো লোক এসেছেন, তিনি যেন কেউকেটা!

এরো ব্যবস্থা আছে! খোল-নলচে বদলাতে না পারলেও কলি ফিরিয়ে দিতে পারবেন। অন্তত বেমক্কা জায়গায় দস্তিদারকে পারবেন ঠেলে দিতে।

উকিল ছিল আগে। মক্কেলের ট্যাঁক হাতড়ে ও কাছা টেনে বেড়াত। নাই-কুণ্ডে এক গাদা তেল ঢেলে গামছা পরে চান করত নদীতে। একবার অনেক

দিন আগে দস্তিদার তাকে তাঁর কোর্ট থেকে বের করে দিয়েছিলেন। মাপ চাইতে এলেও বসতে চেয়ার দেন নি।

আজ দান পড়েছে উলটো। উজির ভূতনাথ দেবনাথ আজ চোখ পাকান আর দস্তিদার দস্তবরদারের মত হাত কচলান। আশাসোটা নিয়ে চলেন পিছু পিছু খাসবরদারের মত!

আশ্চর্য, চাকা ঘুরছে গোল হয়ে! বৃত্ত বলয় সম্পূর্ণ হল এত দিনে। ভূতনাথ দেবনাথ ক্ষেত্র দুয়ারীর দুয়ারে এসে উপস্থিত। তার সেই নাড়াকুচির ঘরে। গরুচোরের মত।

গোবরলেপা মেঝের উপর চ্যাটাই পেতে বসলেন ভূতনাথ। গরম মশলা নয় আজ একেবারে, রোগা পেটে পলতার ঝোল।

শক্তিধর মহীধর বলে নিজেকে আজ মনে করল ক্ষেত্রনাথ। সে আজ আর নরম মাটি নয় যে বেড়ালে আঁচড়াবে। সে এখন শক্তঘানী, জোরদার, জবরদস্ত।

রাজা-উজির সবাই আজ তার করুণার ভিখারী। তার কথায় ওঠে-বসে, হেলে-দোলে। সমস্ত পৃথিবী এখন তার করধৃত আমলকী।

'এবারে ভোট কিন্তু আমাকে দিতে হবে, ক্ষেত্তর।' ভূতনাথ ক্ষেত্রর ঘেমো পিঠে হাত রেখে একটু আদর করে : 'শুনতে পাই এ অঞ্চল তোর এক্তারে। সব ভোট আমাকে জোগাড় করে দিতে হবে কিন্তু। জানিস তো, আমার চেন্না হচ্ছে কাস্তে! ও-সব লন্ঠন সাইকেল নয়, কাস্তের বাক্সে কাগজ ফেলবি। তোদের যা আসল জিনিস—সেই কাস্তে-কাঁচি।'

ক্ষেত্র মাথা নাড়ে, মুখ টিপে-টিপে হাসে। বেড়ার গায়ে গোঁজা কাস্তের দিকে তাকায়।

৬০। যশোমতী

বাজার আর ঘাট বিলি হবে এ-সময়, মহলে রিসিভারবাবু এসেছেন। বিলি হবে বাকি-পড়া নিলামী জমি। খাস জমি পত্তন হবে কতক। কাচারিতে বহুলোকের আনাগোনা।

জমিদারির সরিকদের মধ্যে বন্টনের মামলা হচ্ছে। নানান খেচাখেচিতে ডিক্রি আর চূড়ান্ত হতে পারছে না। রিসিভার বসেছে। রিসিভারের হাতেই এখন কর্তৃত্ব। সমস্ত কিছু চলছে এখন তার [illegible]।

আগে [illegible] আমলে একটা উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব চলেছিল। অপব্যয়ের আর অপকর্মের। সে-সব দুঃস্বপ্নের কথা গ্রামের লোক এখনো ভুলতে পারেনি। তার সাক্ষ্য এখনো অনেক ছাড়া-বাড়িতে, মজা-পুকুরে ও ভাঙা-মন্দিরে লেখা আছে। লেখা আছে বেজাবেদা হিসাবের খাতায়।

কিন্তু রিসিভারবাবু একেবারে উলটো জাতের লোক। নায়েব-গোমস্তার মত ঘুষ নেন না বা বে-রসিদে টাকা নিয়ে গাপ করেন না। জমিদারদের মত মদ খান না বা কোথায় কোন বাগদি-বাইতি বা ধোপা-মুচির মেয়ে পাওয়া যাবে তার তালাস করেন না। স্বধর্মনিষ্ঠ, খাঁটি লোক। রাশভারি, নিরপেক্ষ সুক্ষ্ম নিক্তিতে বিচার করেন। অন্যায় ক্ষমাও নেই, অন্যায় জুলুমও নেই। লোকে ভয়ও করে কাছেও আসে।

নাম শৈলেশ্বর। বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ।

'আমার একটা নালিশ আছে বাবু—'

কত নালিশই তো দিন-রাত শুনছেন, শৈলেশ্বর জমা-ওয়াশিলের খাতার থেকে চোখ তুললেন না। বললেন, 'কি নাম তোর?'

'শ্রীনিবাস ঘাসী।'

'কি হয়েছে?'

'আমার পরিবারকে বার করে নিয়েছে হুজুর—'

অন্যরকম নালিশ। শৈলেশ্বর চমকে উঠলেন। মুহূর্তে তাঁর দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল। গলায় এল প্রায় বাজের হুঙ্কার : 'কে বার করে নিয়েছে?'

শ্রীনিবাস বললে, 'দুর্গগোচরণ।'

তা হলেও শৈলেশ্বর আশ্বস্ত হলেন না। হিন্দু বলেই এ দুষ্কৃতির শাসন হবে না, তিনি বরদাস্ত করে যাবেন, এ অসম্ভব।

'কে দুর্গগোচরণ?'

'দুর্গগোচরণ ভুঁইমালি। ক্রোকে-দখলে ঢোল পেটায়। থাকে পাশ-গাঁয়ে, বাঁশুরিতে।'

'ধরে আনো দুর্গগোচরণকে।' শৈলেশ্বর হুকুম দিলেন।

ছুটল কাচারির সিং। বরকন্দাজ।

'তোর বউ কোথায়?' জিগগেস করলেন শৈলেশ্বর।

'খুঁজে পাচ্ছিনা।'

'দুর্গগোচরণ কোথায়?'

'সে আছে তার বাড়িতে।'

'সে-বাড়িতে লুকিয়ে রাখেনি তোর বউকে? দেখেছিস ভালো করে?'

'তন্ন-তন্ন করে দেখেছি। সেখানে নেই। আর কোথাও গুম করেছে।'

'থানায় গিয়েছিলি?'

'গিয়েছিলাম। দারগাবাবুরা গা করেনা। বলে, বায়না দে, তবে এজাহার লিখব। আমি বাবু গরিব মানুষ—' শ্রীনিবাসের শোক অশ্রুতে ফেটে পড়ল।

'দাঁড়া, আমি শ্লিপ দিচ্ছি ও-সি-কে। সঙ্গে পেয়াদা দিচ্ছি। চলে যা থানায়। দ্যাখ, কি হয়। ভয় নেই, আমি আছি পিছনে।'

বরকন্দাজ ফিরে এসে বললে, 'দুর্গগোচরণ বাড়ি নেই। তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে।'

শিলপে কাজ হয়েছে তা হলে। কিন্তু একা দুর্গাচরণকে ধরে লাভ কি? শ্রীনিবাসের বউকে পাওয়া দরকার।

পরদিন সকালবেলা দুর্গাচরণকে এনে হাজির করা হল।

সারা-রাত পুলিসের হেপাজতে বন্ধ হয়ে ছিল থানায়। বেদম মার খেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। পিঠ দগড়া-দগড়া হয়ে গেছে! চোখ-মুখ ফোলা। কিন্তু শ্রীনিবাসের পরিবারের কোনো কিনারা নেই।

'কোথায় রেখেছিস ওকে লুকিয়ে?' শৈলেশ্বর গর্জে উঠলেন : 'ভালয়-ভালয় বার করে দে শিগগির, নইলে খাড়া মারা পড়বি। জেল তো হবেই, ভিটে-মাটি সব উচ্ছন্নে যাবে।'

'এখন সে কোথায় আমি তার কিছুই জানিনা।' দুর্গাচরণ ভার-ভার গলায় বললে। 'সে' কথাটার মধ্যে অলক্ষ্যে যেন একটু আত্মীয়তা ফুটে উঠল। কানে লাগল শৈলেশ্বরের।

'কবেকার কথা জানিস তবে?'

'পরশু যশোমতী আমার বাড়ি এসেছিল সন্ধ্যের সময়। বললে—'

'কে এসেছিল?' পরস্ত্রীর নাম এমন শুভ্র সারল্যের সঙ্গে উচ্চারিত করবে এ শৈলেশ্বর সহ্য করতে পারলেন না, ধমকে উঠলেন।

কিন্তু দুর্গাচরণের কুন্ঠা নেই। বললে, 'কে আবার! যশো—যশোমতী। শ্রীনিবাসের পরিবার।' বলে পায়ে-দাঁড়ানো শ্রীনিবাসকে ইসারা করলে। সেই সঙ্গে শৈলেশ্বরও তাকালেন শ্রীনিবাসের দিকে। কুঁজো হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে উজবুকের মত। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, অবোলা জন্তুর মত চাউনি। জোর-জবরদস্তি নেই, নিতান্ত ল্যাদাড়ে, লেজগুটোনো। তার দিকে চেয়ে শৈলেশ্বরের একবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল, কিন্তু তিনি সামলে নিলেন। শ্রীনিবাস স্বামী। শ্রীনিবাস দুর্বল। শ্রীনিবাস উৎপীড়িত।

দুর্গাচরণের চেহারায়ও কোনো জেল্লা নেই। তবে এক নজরেই চোখে পড়ে তার বয়েস কম, তার সাহস বেশি। তার অনুভবটা পরিষ্কার।

'ওদের মধ্যে বয়সে বড় কে?' শ্রীনিবাসকে জিগগেস করলেন শৈলেশ্বর।

'যশোমতীই বড়।' দুর্গাচরণ জবাব দিলে : 'আমার চেয়ে প্রায় বছর পাঁচেকের বড়। তা হলে কি হবে? বলে, আমাকে তুই নাম ধরে ডাকবি। বয়েসে ছোট বলেই তুই ছোট হয়ে যাসনি। মেয়েমানুষের কাছে পুরুষ ছোট-বড় হয় বয়সে নয়, মেয়েমানুষ যে-ভাবে তাকে দেখবে সে-ভাবে। তাই সে আমাকে ডাকত দুগগোচরণ, আমি তাকে ডাকতাম যশোমতী।'

শৈলেশ্বর মার দেবার হুকুম দিতে জানেন না এমন নয়। ইচ্ছে হল পায়ের জুতো খুলে নিজেই বসিয়ে দেন ঘা কতক। কিন্তু ভেবে পেলেন না ওর শরীরে মারের আর জায়গা কোথায়। এত বিস্তারিত মার খেয়ে এসেও যে এমন তন্ময় হয়ে কথা বলা যায় শৈলেশ্বর ভাবতে পারতেন না। ভয় নেই লজ্জা নেই আচ্ছাদন নেই।

আগের অসমাপ্ত কথায় তিনি ফিরে গেলেন। বললেন, 'পরশু সন্ধের সময় তোর বাড়ি এসে কী বললে ও?'

'বললে, হতচ্ছাড়া সোয়ামীর ঘর আর করব না দুর্গাচরণ। তুই এখান থেকে কোথাও আমাকে নিয়ে চল। দূর-দূরান্তের শহরে গিয়ে দু-জনে কুলি হব তাও ভালো।'

'তুই কী বললি?'

দুর্গাচরণের ফোলা-ফোলা চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বললে, 'আমি এক কথাতেই রাজি। চাষা থাকি কি কুলি হই আমার কী এসে যায়, যদি যশোমতী থাকে। আমি শুধু বললাম, এই রাতটা আমার এখানে থাকো, শেষরাতে ধানখালির ঘাটে গিয়ে ইস্টিমার ধরল।'

'তোর ওখানে যে থাকবে, বাড়িতে তোর পরিবার নেই?'

'ছিল হুজুর। ভাগ্যিমানি গেল-বছর গত হয়েছেন। ভালই বলতে হবে, নইলে মনে বড় দাগা পেতেন। করবার কিছুই উপায় থাকত না।'

শৈলেশ্বর হিম হয়ে রইলেন।

'তারপর কী হল?'

'রাতটা আর এরা কেউ ঘুমাতে দিলে না। চলে এল থানার দারোগা, কাচারির বরকন্দাজ। ব্যাপারটা ঝাপসা-ঝাপসা টের পেতে-না-পেতেই আগে-ভাগে যশোমতী সটকান দিলে। এখন দেখতে পাচ্ছি স্রেফ হাওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি পর্যন্ত জানি না।'

তার এই ভনিতায় কান দিলেন না শৈলেশ্বর। কি-রকম একটা কৌতূহল হচ্ছিল তাঁর, জিগগেস করলেন, 'পুলিশ গিয়ে না পড়লে শেষরাতেই বেরিয়ে পড়তিস দুজনে?'

'রাত শেষ হবার আগেই বেরিয়ে পড়তাম। ধানখালির ঘাটে না উঠে হেঁটে চলে যেতাম সেই পারগঞ্জে। যত আগে ধরা যায় ইস্টিমার। যত আগে নিবিয়ে ফেলা যায় হাতের লণ্ঠনটা।'

'কোথায় যেতিস?'

'তা ঠিক করিনি তখনো। ইস্টিমারে উঠে ঠিক করতাম।'

'যেখানে যেতিস সেখানে গিয়ে বিয়ে করতিস যশোমতীকে?'

'হ্যা, বিয়ে করতাম বৈকি। ও কি আমাকে চিরকালই 'তুই' বলবে নাকি? 'তুমি' বলবে না? বিয়ে না করলে 'তুমি' বলবে কবে?'

শৈলেশ্বর ঢোক গিললেন : 'পরের তালাক-না-করা স্ত্রীকে তুই বিয়ে করবি এমন আইন আছে সংসারে?'

উদাসীনের মত দুর্গাচরণ বললে, 'আইনের আমরা কি জানি?'

'কি জানিস মানে?'

'এখান থেকে তো চলেই যাচ্ছিলাম আমরা।'

যেন যেখানে যাচ্ছিল সেখানে কোনোই আইন নেই।

'যেখানেই যেতিস লম্বা জেল হয়ে যেত।'

'জেল হয়ে যেত?' নির্বোধ দুর্গাচরণ বললে, 'পাপ করলাম না, অধর্ম করলাম না, তবু জেল হয়ে যেত?'

'পাপ করোনি হতভাগা?' আর সহ্য হচ্ছিল না শৈলেশ্বরের: 'পরের বউকে স্বামীর আশ্রয় থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছ সেটা পাপ নয়? ঘাড় ধরে হারামজাদাকে বার করে দে তো রাস্তায়—'

বরকন্দাজের ঘাড়কাতা খেয়ে দর্গাচরণ রাস্তার উপর পড়ল মুখ থুবড়ে। শৈলেশ্বরের মনে হল শ্রীনিবাসকেই বুঝি ফেলে দেয়া হল ভুল করে। কিন্তু না, ভুল হবে কেন। শ্রীনিবাস স্বামী, তার কোনো অপরাধ নেই।

'এখনো যদি খোঁজ দিতে পারিস যশোমতীর, জেল থেকে রেহাই পাবি। নইলে রক্ষে রাখব না।'

'খোঁজ তো এখন আমারই চাই।' গায়ের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে দুর্গাচরণ বললে, 'কিন্তু ছেলের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

ছেলে? ওর আবার ছেলে আছে নাকি?

হ্যাঁ, আছে একটি আট-নয় বছরের। রুজ্জব আলি চৌকিদারের বাড়ি কাজ করে। খেতালি-রাখালির কাজ। আরো দুটি ছিল ছোট-ছোট। বছর দুই আগে মারা গেছে পর পর। যে-বছর চালের দর হয়েছিল আশি টাকা, সেই বছরই শ্রীনিবাস একটু বিদেশ গিয়েছিল টাকার জোটপাট করতে। ফিরে এসে দেখে এই কাণ্ড। এরি মধ্যে মনের মত নাগর জুটিয়ে নিয়েছে যশোমতী।

ডাক রুজ্জব আলিকে।

কি ব্যাপার? শ্রীনিবাসের পরিবার তোমার বাড়িতে আছে নাকি?

সেকি কথা? রুজ্জব আলির প্রায় ভির্মি যাবার দাখিল।

'তোমার বাড়িতে ওর ছেলে কাজ করে তো? তাকে দেখবার জন্যেও তো ওর মা যেতে পারে সেখানে।'

'কার ছেলে? ও তো আমার ছেলে। আমি ওর পালক-পিতা।' রুজ্জব আলি তেজী গলায় বললে, 'আমি ওকে নগদ কুড়ি টাকায় কিনেছি। শ্রীনিবাসই বেচেছে হাতে ধরে।'

কথাটা সত্যি, শ্রীনিবাস অস্বীকার করতে পারল না। দুর্ভিক্ষের বছর বেচে দিয়েছিল সে ছেলেকে। যাতে সে না মরে, যাতে দুটি তারা বাপে-মায়ে খেতে পারে দু'দিন।

না। এখনো মসজিদে কলমা পড়ায়নি ছেলেকে, নাম আগের মত সেই প্রহ্লাদই আছে। বেশ, টাকা ফেরৎ দিচ্ছেন শৈলেশ্বর, সুদও দিচ্ছেন কিছু, বাপের কাছে পাঠিয়ে দিক প্রহ্লাদকে। আইনকানুনই ছিল না, তখন আবার দান-বিক্রি কি! সে-দুঃসময়ে লোকের বুদ্ধি-বিবেচনাই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। শ্রীনিবাসও সেই সব হাড়-হাবাতের দলে। তার ঘর-বাড়ি রুজি-রোজগার সব

তছনছ হয়ে গিয়েছে। তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। ফিরিয়ে দিতে হবে তার ছেলে। ফিরিয়ে আনতে হবে তার পরিবার।

রজ্জব আলির আপত্তি নেই।

কিন্তু আপত্তি প্রহ্লাদের। বাপের কাছে কিছুতেই সে ফিরে যাবে না।

'কেন?'

'মা বারণ করে দিয়েছে।'

শৈলেশ্বর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'যে-বাপ ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, টাকার জন্যে ছেলেকে বিক্রি করে দেয় মুসলমানের কাছে, মা বলেছে, সে-বাপ বাপই নয়।'

বড় তেজের কথা। এ-তেজ সে নিশ্চয়ই শ্রীনিবাসের থেকে পায়নি। পেয়েছে যশোমতীর থেকে। কেমন দেখতে না জানি যশোমতীকে। এতক্ষণে এই প্রথম শৈলেশ্বরের মনে হল।

'মাকেও বিক্রি করে দিয়েছিল দু'বার। আগাম টাকা নিয়ে এসেছিল বেপারীদের ঠেঙে। কিন্তু মা যায় নি, নড়েনি বাড়ির দরজা ছেড়ে।'

'কারা তারা?'

'রহমালি আর কাঞ্চন।' বললে দুর্গাচরণ।

ডাক তাদের।

তারা এসে বললে, খবরটা মিথ্যে নয়। দু'-দুবার দু'জনের কাছে বউ বেচে টাকা নিয়েছে শ্রীনিবাস। টাকা নিয়ে সটকান দিয়েছে। কিন্তু তারা দখল পায় নি যশোমতীর। দখল নিতে গেলে বারে-বারে ঠেকিয়ে দিয়েছে দুগগোচরণ। গরু বেচে, ধান বেচে। জমি বেচে কিস্তিতে-কিস্তিতে টাকা শোধ দিয়ে দিয়েছে। তবু বিপথে যেতে দেয় নি যশোমতীকে। ভিক্ষুকের অধম হতে দেয় নি।

'তাইতো যশোমতী একদিন বললে, আমাকে তুই বিয়ে করে ফেল, দুগগো। আমার জন্যে কত আর তুই খেসারত দিবি। আমাকে তুই বিয়ে করে ফেললে কেউ আর আমাকে শ্রীনিবাসের বউ বলতে পারবে না। শ্রীনিবাসও পারবে না আমাকে বিক্রি করতে, আর করলেও সে-বিক্রি টিকবে না, বাতিল হয়ে যাবে।' দুর্গাচরণের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তাই বলে পরের স্ত্রী তুমি আত্মসাৎ করবে? এটাই বা কোন সৎপথ?' শৈলেশ্বর হুঙ্কার ছাড়লেন : 'এ-হারামজাদা বলে কী অসম্ভব কথা! বার করে দে ঘাড় ধরে।'

দুর্গাচরণ আবার ঘাড়ধাক্কা খেল।

যে যাই বলুক, শ্রীনিবাসকে আবার তিনি জায়গা করে দেবেন। বানচাল নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিল সে। আবার ফিরিয়ে দেবেন তাকে শক্ত ভিত্তির আশ্রয়। প্রথমেই যশোমতীকে ফিরিয়ে আনতে হবে। যশোমতী এলে তার হাত ধরে প্রহ্লাদও তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসবে। ততদিন সে কাচারিতেই

থাক, ছুটকো চাকরের কাজ করুক। মা এসে পড়লে তার আর রাগ থাকবে না।

ছিন্নভিন্ন বিপর্যস্ত শ্রীনিবাসের জন্যে শৈলেশ্বরের সহানুভূতির অন্ত নেই।

বড় তেজী মেয়ে যশোমতী। তা হোক। তবু বুঝিয়ে বললে বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই। নিদারুণ দুর্বিপাকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল শ্রীনিবাসের। কার না হয় শুনি? এর চেয়ে আরো কত ভয়ংকর কাণ্ড লোকে করে বসে। যশোমতী যে স্বামী বেঁচে থাকতে দুর্গাচরণকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এও সেই দুর্বিপাকের পরিচয়। না, ওদের মধ্যে আবার তিনি ফিরিয়ে আনবেন বনিবনা। শ্রীনিবাসকে মহলের আটপ্রহরী করবেন, কিছু জমি দেবেন চাকরান। নতুন করে ঘর তুলে দেবেন ওদের। ওদের জীবনে নিয়ে আসবেন শক্ত অব্যাহতি! সময় সুগম হয়ে উঠলেই আবার ওদের মধ্যে স্বীকৃতি ফুটে উঠবে। যে দুটো ছেলে মরে গিয়েছিল, আবার ফিরে আসবে যশোমতীর কোলে।

কিন্তু যশোমতী কোথায়?

যশোমতীর দেখা নেই।

ওদিকে পুলিশ, এদিকে জমিদারের লোকলস্কর, কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছেনা। সন্দেহ-অসন্দেহ সব জায়গায় তদন্ত হচ্ছে, কোথায় কে যশোমতী! ঘাটে-অঘাটে প্রত্যেকটি নৌকোর উপর কড়া নজর, এমন সোয়ারী কেউ নেই যাকে তখুনি-তখুনি সনাক্ত করা যায় না। অলিতে-গলিতে হাটে-বাজারে পাহারা। কিন্তু যশোমতী নিরুদ্দেশ।

কোথায় সত্যি যেতে পারে? যা জানা যাচ্ছে হাতে তার পয়সা ছিল না। সময় ছিলনা স্টিমার ধরে। এমন সাহস নেই নৌকো নেবে একলা। এখানেই কোথাও আছে। নিশ্চয় লুকিয়ে রেখেছে কেউ। কোনো গভীর অন্তঃপুরে।

তবে কি কোনো অবস্থাপন্ন মুসলমান তালুকদার তাকে গায়েব করেছে? বিশ্বাস হয় না। নগদ টাকায় খরিদ হয়েও যার দখল হয় না সে নিজের থেকেই গিয়ে ধরা দেবে এ অসম্ভব কথা। তেমনি অসম্ভব কথা সে আত্মহত্যা করেছে। এত যার তেজ সে কখনো আত্মহত্যা করে না।

আর কিছু নয়। শয়তান ঐ দুর্গাচরণ, সেই কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তাই ওকে আর চোখের বাইরে ছেড়ে দেয়া নয়, সব সময়েই পিছনে ওর লোক রয়েছে। হয় পুলিশের নয় জমিদারের। ও টেরও পায় না।

চাষবাসে আজকাল আর বিশেষ মন নেই দুর্গাচরণের। কেমন ছন্নছাড়া সর্বস্বান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। কোথায় কি খায় না-খায়, বড় কাহিল হয়ে পড়েছে, ঘরে না গিয়ে মাঝে-মাঝে বাইরে পড়ে থাকে। আর, সব খবর নিয়মিত রিপোর্ট হয় শৈলেশ্বরের কাছে। তবু সন্দেহ নেই, এই দুর্গাচরণের থেকেই সন্ধানের সূত্র পাওয়া যাবে। গুপ্তচরদের উৎসাহ দেন শৈলেশ্বর।

প্ররোচনা জোগান। যশোমতীর উদ্ধারের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন।

কিন্তু কোথায় যশোমতী!

মাঝে-মাঝে উড়ো খবর আসে। আজ নাকি ইয়াকুব গাজীর পুকুরে ওকে কে স্নান করতে দেখেছে। আরজ আলির উঠোনে ওর শাড়ি শুকোচ্ছে নাকি আজ। কিংবা আজ নাকি আতাহার মিঞার খলেনে ও ধান কুটছে।

ডাক ইয়াকুবকে। তলব দেও আতাহারকে। আরজ আলিকে ধরে নিয়ে এস।

সবাই প্রথম বাক্যেই অস্বীকার করে। তার চুলের ডগা, চোখের পলকটিও কেউ দেখেনি। হ্যাঁ, পুলিশ-তদন্ত হোক। তন্তুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবু আশা হারান না শৈলেশ্বর। যে-রকম জাল পেতেছেন, ঠিক সে ধরা পড়বে। ঠিক আবার তাকে তিনি মিলিয়ে দিতে পারবেন স্বামীর সঙ্গে। তাই তিনি শ্রীনিবাসকে নতুন কাপড়-জামা কিনে দিয়েছেন. রেখেছেন পরিষ্কার ফিটফাট করে। কাচারিতে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন একটা। তার জীবনে এনে দিয়েছেন একটা ভদ্রতার পরিবেশ। স্বামীত্বের মর্যাদা। এবার এনে দেবেন স্ত্রীর প্রেম, গৃহবাসের শান্তি।

তবু শত ফিটফাট ছিমছাম হলেও লোকটাকে কেমন যেন অপদার্থ মনে হয়। মনে হয় সে যোগ্য নয় যশোমতীর।

যোগ্যতার প্রশ্ন কি আর ওঠে? সে স্বামী। এখন ওঠে অধিকারের কথা।

মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গল্প করেন শৈলেশ্বর। একটু বা নিঝুম নিরিবিলিতে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানতে চান তার গেরস্তালির ইতিহাস। একেকবার ইচ্ছে করে প্রশ্ন করেন, কেমন দেখতে যশোমতীকে। মুখের থেকে ফিরিয়ে নেন প্রশ্নটা। ভয় হয়। লোকটা যেমন মিথ্যেবাদী, হয়তো বলে বসবে, কদাকার. জঘন্য। স্ত্রী বলেও বিন্দুমাত্র তার মায়া হবে না।

কিন্তু শৈলেশ্বর অনুভব করেন এত যার তেজ. এত যার জ্বালা, সে সুন্দর না হয়ে যায় না। সে-সৌন্দর্য বোঝে শ্রীনিবাসের সাধ্য কি?

যশোমতীকে যদি পাওয়া যায় তবে তাকে তিনি পাশের হাজত ঘরে রেখে দেবেন এক রাত্রি, অন্ধকারে গিয়ে চুপি চুপি আলো জ্বালাবেন। দেখবেন তার সেই তেজ, তার সেই জ্বালা।

অধিকারের প্রশ্ন কি আর ওঠে! তিনি প্রভু। এখন ওঠে আধিপত্যের কথা। শৈলেশ্বর ভয় পান। কিন্তু প্রভাত তো হবে। স্বামী-পুত্রের চাকরি হয়েছে. জমি হয়েছে, ঘর উঠেছে, দিনের আলোতে চোখ মেলে দেখবে না যশোমতী? তার জীবনের সমস্ত রাত্রি সে মুছে ফেলবে না?

স্বপ্ন দেখছিলেন শৈলেশ্বর। চর এসে বললে. 'যশোমতীকে পাওয়া গেছে।'

শৈলেশ্বর চমকে উঠলেন। বিশ্বাস করবেন কিনা বুঝতে পারলেন না।

'এখানে নিয়ে আসব?'

এখন মোটে সন্ধে। শৈলেশ্বর গলা নামিয়ে বললেন, 'এখন নয়। মাঝরাতে।'

মাঝরাতে ফরাসে চুপচাপ একা বসেছিলেন শৈলেশ্বর। উচ্চশিখায় লণ্ঠন জ্বলছে তাঁরই প্রতীক্ষার মত।

'তুমিই যশোমতী?'

জিগগেস করবার দরকার ছিল না। শৈলেশ্বর এক পলকেই তাকে চিনতে পেরেছেন।

কিন্তু তার কপালে সিঁদুর। ডগডগে সিঁদুর। ঐটেই তার তেজ। আর তার চোখে ও কি জল? না ঐটেই তার অপূর্ব জ্বালা।

জয়ী হয়েছেন শৈলেশ্বর। অনুতপ্ত হয়ে যশোমতী তার স্বামীর আশ্রয়ে আনুগত্যের অভিজ্ঞান নিয়ে ফিরে এসেছে।

তবু এ সৌন্দর্য আস্বাদ করে এ যোগ্যতা শ্রীনিবাসের নেই, হয়তো অধিকারও নেই।

চর কাচারিরই পেয়াদা। শৈলেশ্বর হুকুম করলেন : 'একে হাজত-ঘরে বন্ধ কর।'

ঘর খুলল পেয়াদা। ঝাঁট দিয়ে ধুলো ঝাড়ল। নতুন একটা লণ্ঠন জ্বালল মিটিমিটি।

'তোমাকে আজ রাতে ঐখানে থাকতে হবে।' বললেন শৈলেশ্বর।

'ঐ নোংরা ঘরে, শুকনো মেঝের উপর?' পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসল যশোমতী : 'তার চেয়ে আমার ঘরে চলুন। নরম লেপ-তোষক কিনেছি।'

'তোমার ঘর?' শৈলেশ্বর যেন চাবুক খেলেন।

'হ্যাঁ, আমি যে ঘর নিয়েছি খালপাড়ে।'

'খালপাড়ে?'

'হ্যাঁ, যেখানে খারাপ মেয়েদের বস্তি। চেনেন না? আপনারাই তো জমির খাজনা পান।'

'কেন? সেখানে কেন?' শৈলেশ্বর চেঁচিয়ে উঠলেন।

তা ছাড়া কোথায় আর যেতে পারে যশোমতী! কোথায় গিয়ে সে মুক্তি পেতে পারে স্বত্বহীন স্বামিত্বের দাবি থেকে? জমিদার আর পুলিশ তার জন্যে আর কোথায় জায়গা রেখেছে, আর কোথায় তার আশ্রয়! তাড়া-খাওয়া ইঁদুরের মত সে ঢুকে পড়েছে আঁস্তাকুড়ে। কোনো ঘাটেই নোঙর ফেলতে না পেরে সে ডুবেছে পাঁকের মধ্যে।

কিন্তু সে মুক্ত। সে অধরা। তাকে আর কেউ ধরে রাখতে পারে না।

'তাই আমাকে আপনি আর বন্ধ করতে পারেন না। আমার সম্বন্ধে আর কোনো ওজুহাত নেই। আকর্ষণও নেই।' যশোমতী শব্দ করে হাসল : 'আমার কপালে যে সিঁদুর সে আমি স্ত্রী বলে নয়, আমি চিরকালের সধবা বলে। যাবেন আমার ঘরে?'

'না।' শৈলেশ্বর চীৎকার করে উঠলেন।

অনেক রাতে যশোমতীর বন্ধ ঘরের দরজায় কে করাঘাত করল।

'কে?'

'আমি দুগগো—দুগগোচরণ।'

'মদ খেয়ে এসেছিস? মদ খেয়ে না এলে ঢুকতে দেবনা। আর-আর দিনের মতো তাড়িয়ে দেব।'

'না, মাইরি বলছি, ঠেসে টেনে এসেছি আজ।' জড়ানো গলায় বলতে লাগল দুর্গাচরণ : 'দাঁড়াতে পাচ্ছি না, টলে-টলে পড়ছি। দরজা খুলে দে শিগগির, নইলে মাথা ঠুকে-ঠুকে দরজা ভাঙব।'

না। ভুল নেই, মাতাল হয়ে এসেছে দুর্গাচরণ। যশোমতী দরজা খুলে দিল।

৬১। একটুকু বাসা

মাথায় লাঠির বাড়ির মত এক-একটা বদলির অর্ডার। ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে সেই গোবিন্দছাড়া বৃন্দাবন।

কিন্তু গৌরীর সবতাতেই ফুর্তি। পার্টি খাবে, মানপত্র পাবে, নতুন জায়গা দেখবে, নতুন সব বন্ধু জুটবে—জলে ঢেউ তুলতে তার আপত্তি কি। তুমি তিনকড়ি হালদার সর্ব ছাইয়ে ভাঙা কুলো, তোমারই হয়রানির এক শেষ।

কেউ বললে, 'জায়গা তো খুব ভালো মশাই। পাহাড় আছে।'

পাহাড় ধরে তো আর আহার করা যাবে না।

'পাহাড় কোথায়। সমুদ্র আছে শুনেছি।' বললে অন্যেরা।

'সমুদ্রে কি শয়ন চলে?' হালদার বিরক্ত মুখে বলল, 'আসলে বাড়িই নেই শুনেছি।'

ভূগোলে যাদের অমন জ্ঞান, তারা তখন ইতিহাস নিয়ে পড়ল। আগে আগে যারা ও জায়গায় গিয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার ইতিহাস। কেউ বললে আছে, কেউ বললে নেই। অন্তত যারা এডিশনাল, ফালতু, তাদের জন্যে না থাকাই সম্ভব। দেখুন না টেলিগ্রামের কি উত্তর আসে।

উত্তর এল কোয়ার্টার্স নেই। তার মানে রাজা আছে রাজ্য নেই। মন্ত্রী আছে পোর্টফোলিও নেই।

'তাহলে উঠব কোথায়?' গৌরীর মুখ পাংশু হয়ে গেল।

চারদিক আঁধার দেখল তিনকড়ি।

'বাড়ি যখন নেই,' গৌরী বললে, 'আমি থাকি। তুমি একাই যাও।'

'একা?' সে যেন কত অসম্ভব, তিনকড়ি অসহায় মুখ করল।

'বাড়িটাড়ি পেলে আমাকে নিয়ে যাবে।'

'ছেলেমেয়ে হস্টেলে, আবার তুমি এখানে! এতগুলি এস্টাবলিশমেন্ট চালাব কি করে? তাছাড়া তোমাকেই এখানে দেখবে কে?'

'এ জায়গা তো চেনা হয়ে গেছে, পারব থাকতে।' গৌরী বললে. 'বাড়িহীন অবস্থায় আমাকে নিলে অসুবিধেয় পড়বে।'

'তুমি সঙ্গে থাকলে যেমন অসুবিধে তেমনি সুবিধেও। আর কোথাও জায়গা না হয় স্টেশনে থাকব। রোজ দুটো করে কাছকাছি স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাশ টিকিট কাটব, আর থাকব রিটায়ারিং রুমে।'

'খুব মজা হবে।' সব কিছুতেই গৌরীর ফুর্তি : 'কিন্তু কদিন পরে যখন জানাজানি হয়ে যাবে?'

'তখন সটান কোর্টের খাসকামরায় গিয়ে উঠব।'

'আরো মজা।'

সেখানকার অধিকর্তাকে চিঠি লিখল তিনকড়ি : 'দিগম্বর যাচ্ছেন তার বাঘছাল যোগাড় করুন।'

'বাঘছাল মানে?' গৌরী ভুরু কুঁচকোলো।

'মানে আচ্ছাদন। এক্ষেত্রে বাড়ি।' হাসল তিনকড়ি।

অধিকর্তা প্রশ্ন করে পাঠাল : 'একা আসছেন, না সস্ত্রীক?'

'সস্ত্রীক।' উত্তর দিল তিনকড়ি : 'বৈরাগী হয়েছি যখন তখন মালা ফেলব কোথায়?'

অধিকর্তা পরামর্শ দিল, একা আসুন। তুফানের তরী ভারী করবেন না।

কে কার কথা শোনে। সস্ত্রীক পৌঁছুল তিনকড়ি আর সটান সার্কিট হাউসে গিয়ে উঠল। ফাঁকায় এসেছে, সামনে বড় ঘরটাই দখল করলে।

সন্ধ্যায় রঙ্গনাথ এল দেখা করতে। তিনকড়িকে দেখল। তাকাল ইতি-উতি। অতিরিক্তকে দেখল না।

'একা এসেছেন?'

'না—'

'কই কোথায়, দেখছি না তো।' এ এলাকায় সবই যেন তার দেখবার কথা—এমনি ভাব করল রঙ্গনাথ।

'ঘরে শুয়ে আছেন।'

'সব চেয়ে ভালো ঘরটাই নিয়েছেন দেখছি।' রঙ্গনাথ একটু বা পাইচারি করে এল।

ঘর বন্ধ। ধাক্কা খেল রঙ্গনাথ। নির্দয়ের মত বললে, 'কিন্তু, যাই বলুন, সাতদিনের বেশি পারবেন না থাকতে। নিয়ম নেই।'

ধাক্কা খেল রঙ্গনাথ। নির্দয়ের মত বললে, 'কিন্তু, যাই বলুন, সাতদিনের বেশি পারবেন না থাকতে। নিয়ম নেই।'

'বাড়ি নেই বদলি এ নিয়ম থাকলে ও নিয়ম চলে কি করে?'

'তা জানি না। রুল ইজ রুল।' তাছাড়া রুক্ষ হল রঙ্গনাথ : যে কোনো

মুহূর্তে কমিশনার আসতে পারে, মন্ত্রীরা কেউ আসতে পারে, তখন তো ভ্যাকেট করতেই হবে।'

'করব। ছাড়ব।' গা-ঝাড়ার মত ভঙ্গি করল তিনকড়ি।

সাতদিন পর রঙ্গনাথ এল খোঁজ নিতে।

'কি মশাই, বাড়ির খোঁজ পেলেন?'

'বা, এই তো পেয়েছি দিব্যি—' বাইরের ইজিচেয়ারে আরামে গা-ঢালা তিনকড়ি।

'এ নয় মশাই, বলি প্রাইভেট বাড়ি, ভাড়াটে বাড়ি দেখলেন কোথাও?'

'সে তো আপনি দেখবেন।'

'আমার বয়ে গেছে।' ছড়ি ঘোরাল রঙ্গনাথ : 'আপনার পিরিয়ড শেষ হয়েছে, আপনি এবার চলে যান।'

কোথায় যাব? গাছতলায়?' পা নামিয়ে পিঠ খাড়া করল তিনকড়ি : 'গাছতলায় বসে রায় লিখব?'

'সে আমি জানি না।'

'আপনি জানেন না তো কে জানে?'

একটু বুঝি ঢোক গিলল রঙ্গনাথ। ইতিউতি তাকাল। বলল, 'স্ত্রী নিয়ে এসেই গোল বাধিয়েছেন।'

'জীবনে স্ত্রী আনাই তো গোল বাধাবার জন্যে।'

'একা হলে হোটেলে-মেসে থাকতে পারতেন, পেয়িং গেস্ট হয়ে কারু বৈঠকখানায়, নয়তো বা স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। আমাদের হরেন তরফদার তো বাড়ির অভাবে একটা আলয়ে ছিল। সেখান থেকে আফিস করত।' নিজের মনে হেসে উঠল রঙ্গনাথ : 'কিন্তু যাই বলুন এটাকে আলয় করে তুলতে দেব না।'

'তার মানে?

'তার মানে আরো তিনদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে বাড়ি দেখে উঠে যান।'

'আমার বয়ে গেছে।' সেদিনের শোধ তুলল তিনকড়ি।

রঙ্গনাথের লোকজন অনেক বাড়ির খোঁজ আনল। একটাও পছন্দ হল না গৌরীর। কোনোটা টিনের চালা, কোনোটা কারখানার স্টোররুম, কোনোটা বা একতলায় সিঁড়ির তলা।

'বাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি তবু যাচ্ছেন না যে?' চড়াও হল রঙ্গনাথ।

'ওগুলো কি বাড়ি?'

'কি তবে?'

'ওগুলো, আর যাই হোক ভদ্রলোকের বসবাসের যোগ্য নয়।'

'ভদ্রলোকের বসবাসের যোগ্য এই সার্কিট হাউস?' জুতোর গোড়ালিতে ছড়ির মুণ্ডটা ঠুকতে লাগল রঙ্গনাথ : 'এমনতরো কখনো দেখিনি মশাই, শুনিও নি, যে কোনো ভদ্রলোক বাড়ি-ঘর ঠিক না করেই সস্ত্রীক চলে আসে হুড়মুড় করে।'

'কত আরো দেখবেন। কত শুনবেন।'

'কিন্তু যাই বলুন, আপনি এখন ট্রেসপাসার।' রঙ্গনাথ শূন্যে ছড়ি নাচাল : 'আপনার মেয়াদ এক্সপায়ার করেছে। দয়া করে এটা মনে রাখবেন।'

তিনকড়ি কথা বলল না।

নিরিবিলি পেয়ে কে একজন হিতৈষী তিনকড়ির কানে-কানে বললে, 'চটিয়ে দিয়ে লাভ নেই। যে সহায় হতে পারে তাকে শত্রু করবেন না।'

'কি করতে হবে?'

'স্ত্রীকে দিয়ে করিয়ে একটু চা খাইয়ে দিন। শাড়িটা শুধু রোদ্দুরে মেলে দিলেই কি চলে? এতে আরো বিরক্ত করা হয়। তার চেয়ে শাড়িটাকে একটু চলমান করুন। তাহলে সহজেই হয়ত আরো কদিনের মেয়াদ বাড়ে।'

গৌরীকে বললে কথাটা। গৌরী রাজি হল না। বললে, 'তুমি জানো না, বেরালের পিঠে হাত বুলোলে ক্রমশই লেজ মোটা হয়।'

কিন্তু এবার বাছাধন কি করবে? এবার স্বয়ং কমিশনার আসছে।

চল-বিচল নেই তিনকড়ির। ঝড়ে গাছ নড়ো যত তরু বদ্ধমূল তত—এমনি ভাব করে রইল।

'আর সকলে যার-যার ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে ভদ্রলোকের মত', বললে রঙ্গনাথ, 'আপনি যান নি যে?'

'কোথায় যাব? জায়গাটা বলে দিন।'

নামটা মুখে এসেছিল, চেপে গেল রঙ্গনাথ। বললে, 'অতশত বুঝি না। এই আপনাকে রিটন কুইট অর্ডার দিয়ে দিলাম। যদি না মানেন ফিজিক্যালি আউস্টেড হবেন।'

গৌরীকে একা রেখে কোর্ট-ফেরত তিনকড়ি কোথায় চলে গেল।

ফিরল রাত করে।

'এ কি কোথায় গিয়েছিলে?' গৌরী হাঁপিয়ে উঠল।

'খবরের কাগজের করেসপণ্ডেন্টের খোঁজে।'

'দেশে এত লোক থাকতে ওখানে কেন?'

'যদি জোর করে বার করে দেয় আমাদের, সে খবরটা যাতে ফ্ল্যাশ করে তাই অনুরোধ করতে। গৃহহীন বিচারক সশরীরে বিতাড়িত—ক্যাপশানটাও ঠিক করে এলাম—'

'কিন্তু এদিকে—'

'কি এদিকে? মেয়ে-পুলিস এসেছে?'

'না, কমিশনার এসেছে।'

'শোনো। এক কাজ করো।' একটু বুঝি গাঢ় হল তিনকড়ি : 'এর প্রতি গোড়া থেকেই কাঠ হয়ে থেকো না।'

'তার মানে?' ভুরু কুঁচকোলো গৌরী।

'তার মানে, কমিশনারকে একটু কমিশন দাও।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'ওর কাছে য়্যাপিয়ার করো, দুরবস্থাটা বলো একটু বুঝিয়ে—

'অসম্ভব।' ফোঁস করে উঠল গৌরী : 'আমি গৌরী বলে আমাকে তুমি গৌরী সেন পাওনি।'

'তাহলে এক কাজ করো। খুব করে চুড়ি বাজাও। অস্তিত্বটা ঝংকৃত করো।'

'চুড়ি বাজাব? চুড়ি কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল গৌরী : 'আমি কি তেমন অদৃষ্ট করে এসেছি!'

এ আবার তিনকড়ির নতুন সমস্যা। বাজারে গিয়ে এক রাজ্যের বেলোয়ারি চুড়ি কিনে আনল। 'লক্ষ্মীটি, এই-ই বাজাও আপাতত। অতিরিক্ত আছি, পাকাপোক্ত হই, সোনার কাঁকন গড়িয়ে দেব।'

কমিশনার গোস্বামী রঙ্গনাথকে তলব করল।

'এটা কি মশাই ঘর-গেরস্তালির জায়গা?'

'কেন, স্যার?'

'কে এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক বসবাস করছেন এখানে, দিব্যি সংসার পেতে রয়েছেন—বলি এটা কি—' বিড়বিড় করতে লাগল গোস্বামী।

'সস্ত্রীক আছেন?' আকাশ থেকে পড়বার মত মুখ করল রঙ্গনাথ : 'কই জানি না তো। স্ত্রীলোক তো দেখিনি। আপনি দেখেছেন?'

'দেখেছি বৈ কি।' না দেখাই ভালো ছিল এমনি মুখ করল গোস্বামী : 'রোদে চুল শুকোচ্ছেন, জামা-কাপড় সানিং করছেন, পাইচারি করতে-করতে গান গাইছেন মৃদু মৃদু—'

'অসম্ভব।'

'বলি এদের জন্যে আজও একটা বাড়ি দেখে দিতে পারলেন না?'

'যা দেখাই পছন্দ হয় না।'

'গোয়াল-আস্তাবল দেখালে চলবে কেন?' গোস্বামী সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা পিষল পা দিয়ে : 'ওরা সার্কিট হাউসকেই গোয়াল-আস্তাবল করে তুলবে, এটা আপনি—আপনার পক্ষে ডিসক্রেডিট।'

'কুইট অর্ডার সার্ভ করা সত্ত্বেও এরা যাচ্ছে না।'

'কুইট অর্ডার তো ওদের উপর নয়, আমাদের উপর।' গোস্বামী উঠে পড়ল : 'অমন ডেঞ্জরাস এলিমেন্টের সঙ্গে একত্র বসবাস মোটেই নিরাপদ নয়। যা দিনকাল, কোন কথা থেকে কোন কথা গজায় ঠিক নেই। আমি আজ বিকেলেই ফিরে যাব।'

গোস্বামী ফিরে গেল।

ডিসক্রেডিট! খেপে গেল রঙ্গনাথ। না, আর নয়, এবার পুলিসকে বলি। পুলিস লাগাই।

সত্যিসত্যিই সে রাত্রে পুলিস পড়ল সার্কিট হাউসে! হটো হটো, সব ঘর-বারান্দা আগা-পাস্তলা ক্লিয়ার করে দাও।

যে যেখানে যত অতিথি-আগন্তুক ছিল, কর্পূরের মত উবে গেল নিমেষে। কী ব্যাপার? কেউ যেন এল মনে হচ্ছে। কে এল? বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট নিয়ে রাজসমারোহে এ কার আবির্ভাব?

মন্ত্রী এসেছেন।

সর্বনাশ। মাথায় এ বাড়ি নয়, মাথায় এ সর্পাঘাত।

কিন্তু এ একেবারে না বলে কয়ে এলেন কেন? আগে জানলে আমরা সময়মত বেঁধেছেঁদে তৈরি হয়ে ধীর-সুস্থে চলে যেতে পারতাম। এমনি সব এলোমেলো হয়ে যেত না।

কি করে জানবে আগে? রাস্তায় গাড়ি ব্রেকডাউন হয়েছে। তাই পথে একরাত্রি এখানে একটু বিশ্রাম করে যাওয়া।

একরাত্রির জন্যে একটা ঘর হলেই তো চলে। সমস্ত বাড়িটাই চাই কেন?

হ্যাঁ, সমস্ত বাড়িটাই দরকার। যাতে একেবারে নির্জনে নিঃসঙ্গে থাকতে পারেন। যাতে কোনো কথা না ওঠে, না হাঁটে। সন্দেহের নিশ্বাসও না শোনা যায়। যাতে রাজ্যের সমস্যাগুলো মনের গভীরে ভাবতে পারেন তলিয়ে।

পুলিস এসে গৌরীর দরজায় দাঁড়াল।

'আপনাকে এ ঘর ছেড়ে দিতে হবে এক্ষুনি।'

'আমার স্বামী পাশের শহরে কি এক কনফারেন্সে গিয়েছেন। তাঁর ফিরতে দেরি হবে। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না।'

'সে কি? আপনি নিজে অফিসার নন?'

'আমি কোন দুঃখে অফিসর হতে যাব? পরের ঘরে পরের ঘাড়ে বসে খাব এই-ই তো আমার নিশ্চিন্ত স্বত্ব।'

'তাহলে তো কথাই নেই। আপনি ফালতু, আপনার কিছুতেই থাকা চলবে না এখানে—'

'কোন আইনে?' কোমরে প্রায় আঁচল জড়াল গৌরী।

'আপনি অন্তত এ বড় ঘরটা ওঁকে দিয়ে ঐ ছোট ঘরটাতে সিফ্‌ট করুন।' কে আরেকজন বললে মীমাংসার সুরে।

'আমরা দুজন। আমাদেরই বড় ঘর দরকার।' গৌরী নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'আর অনারেবল মন্ত্রী তো একা, একরাত্রির খদ্দের। অনারেবলকে ডাকুন না আমার কাছে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

কী স্পর্ধা! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। টের পাওয়াচ্ছি।

ট্রেন মিস করে ফিরতে-ফিরতে তিনকড়ির প্রায় শেষ রাত।

চোরের মত ফিরছে। গেটের সামনে পুলিসে ধরতেই আইডেনটিটি কার্ড দেখাল। বললে, ভেতরে আমার স্ত্রী আছেন। একেবারে একা আছেন। আর সব বাসিন্দে উধাও হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি কাল সকালেই চলে যাব, ছেড়ে দেব, ছুটি নেব।

দেখবেন, আস্তে দরজা খুলবেন। অনারেবলের ঘুমের না ব্যাঘাত হয়।

এ কি, দরজা যে খোলা। ঘর ফাঁকা। জিনিসপত্র ঠিক আছে। কিন্তু গৌরী কোথায়? গৌরী নেই।

কী সর্বনাশ! গৌরী লোপাট।

তিনকড়ির ফিরতে দেরি হচ্ছিল দেখে আর্দালিকে রেখে দিয়েছিল গৌরী। ঘুম থেকে তাকে ঠেলে তুলল তিনকড়ি। 'তোমার মা কই?'

'মন্ত্রীর ঘরে।'

'মন্ত্রীর ঘরে!' তিনকড়ির হৃৎপিন্ডটা খসে পড়ল মাটিতে।

'হ্যাঁ, মা একা আছেন দেখে মন্ত্রী তাঁকে ঘরে ডেকে নিয়েছেন।'

মন্ত্রীর ঘরের দরজায় মাথা দিয়ে ঢু' মারতে যাচ্ছিল তিনকড়ি, কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

সকাল হতে না হতেই দরজা খুলে গৌরী বেরিয়ে এল। তিনকড়িকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'আর ভয় নেই, সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

যা লাগে দেবে গৌরী সেন। শেষ পর্যন্ত গৌরী সেনের এই খয়রাত! এতদূর!

ঠিকঠাক হয়ে বেরুতে অনারেবল মন্ত্রীর কিছু দেরি হল।

কিন্তু এ তার কি অদ্ভুত পোশাক! চোখে ধাঁধাঁ লাগল তিনকড়ির। পরনে রঙিন লুঙ্গি, গায়ে ঢিলেঢালা রঙিন ফতুয়া, মাথায় চীনেদের মত লম্বা টিকি আর এমন কি এখন ঠান্ডা যে গায়ে ফেরতা দিয়ে পুরু করে কাপড় জড়ানো! তিনকড়ি চোখ কচলাল। অনুপাত ঠিক করতে করতে স্থির করল চাউনি, সামঞ্জস্যের উপশম আনল।

'গৌরীটা এখনো তেমনি ভীতু আছে।' মৃদু হাসি মেখে তিনকড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন অনারেবল : 'ঘরে নিয়ে এসে তবে তার ভয় ভাঙালাম। আমরা কলেজে চার বছর একসঙ্গে পড়েছি, থেকেছি এক হস্টেলে, কত ভাব আমাদের গলায়-গলায়। ও গৌরী, আমি উমা। লোকে বলত জোড়ের পায়রা—'

ইনি তাহলে মন্ত্রী নন, ইনি মন্ত্রিণী!

ডাকতে হয়নি, রঙ্গনাথ নিজের থেকেই এসেছে।

মন্ত্রিণী বললেন, 'দেখুন, গৌরী আমার নিজের লোক। যতদিন ওরা সুবিধামত বাড়ি না পায়, এখানেই থাকবে। উপায় কি তাছাড়া! যাতে থাকতে পারে, কেউ বিরক্ত না করে দেখুন।'

রঙ্গনাথ চেষ্টা করেও গৌরীর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। লক্ষ্মণের মতো মাটির দিকে চেয়ে রইল।

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। দেখছি। দেখব।'

আর, তাতে চাকরিটাকেও দেখা হবে।

৬২ । ভক্ত

এও কি হয়? না হয় তো যা হয়।

যেটুকু হয় তাই হতেই বা দোষ কী! আর কেনই বা হবেনা সবটুকু? যদি এতটুকু হয় সবটুকুরই বা বাকি কী?

'ও গো বাবা গো, ও গো মা গো—' হঠাৎ একটা চিৎকার ছুটে এল মাঠের ওধার থেকে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কালীপদ।

আবার চিৎকার : 'ওগো বাবাগো, ওগো মাগো, ধরগো শিগরি—'

তাকাতে লাগল চারজনে। হৈ-হুজ্জুত বাধল নাকি আবার কোথাও?

না, এ তো জামিলার গলা। কী হলো কে জানে।

শুকনো মাঠ, ডেলা-পাকানো। তারই উপর দিয়ে পায়ের পাতা ফেলে-ফেলে এঁকে-বেঁকে ছুটে আসছে জামিলা। আর ছুটে আসছে কিনা কালীপদরই দিকে।

'ধরগো ধর—সব খেয়ে ফেললে গো—কি হবে গো—' আঁচলে-কষিতে ঝটাপটি করতে-করতে আরও এগিয়ে এল জামিলা। পথের কোন রাহী লোকের দিকে মুখ করে বললে, 'তুমি দেখতে পাচ্ছনা গা—তুমি কি কাণা?'

পথের কোন লোককে জিগগেস করছে ঠিক কি।

'বাছুর বাঁট চুষে সব দুধ খেয়ে নিলে দেখতে পাচ্ছ না? গাই-বাছুরকে ঠাঁইনাড়া করে দিতে শেখনি? গরিবের ক্ষেতি করিয়ে সুখ কি?'

ওমা! তুমি? একি পোশাক? একি চেহারা?

লটাপটি করে চু বাঁধল জামিলা। শরীরের আনন্দটুকুকে কোথায় রাখবে কোথায় ঢাকবে বুঝতে পারে না।

'আমি বৎ করছি যে এ বছর।' কালীপদ লম্বা চোখে তাকিয়ে থাকে : 'ভক্ত হয়েছি।'

সে আবার কি? বাছুরটাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিল জামিলা। কই শুনিনি তো কোনো দিন। বৎ আবার কোন দিশি?

বাবা-ভোলার বৎ করি। বৎ জান না? বর্ত্ত। মায়ে-ঝিয়ে বর্ত্ত করে, যার যার বর সেই-সেই মাগে—শোননি?

থাক, আর শোনাশুনিতে কাজ নেই। কিন্তু বেটাছেলের আবার বর্ত্ত কিগো?

বা, বেটালেলের বুঝি সাধ নেই? কিছু অপূরণ নেই তার হিয়ের মধ্যে? ভগমানের কাছে মাঙবার নেই কিছু দুনিয়ায়?

কে জানে। কিন্তু তোমার হাতে ওটা কি?

'বেত। একে বলে দ্বাদশ। দেখতে পাচ্ছ না, বারোটা চোখ। তার মানে বারো সূর্জির তেজ। বড় জাগ্রত দেবতা।'

'আর গলায় কি ওটা?

'ওমা, তাও জান না? উত্তুরে। এক ছুটে কাজ করতে নেই, তাই দুটো।'

'কদিন চলবে এমনি সং সেজে?'

'এগারো দিনের ভক্ত আমরা। আমরা কেওটা, ভল্লা, রাজবংশী—'

'বা, বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে—' দুই চোখে এক ঝলক খুশি উথলাল জামিলার।

'আর তোমাকে?'

'তা তুমি জান। আর তোমার ঐ বাবা জানে।'

'কালান্তি রুদ্দুর।' কপালে জোড় হস্ত ঠেকাল কালীপদ : 'বাবা যদি একবার মুখ তোলেন তা হলে পাথর ফেটেও দুধ পড়ে।'

'খাও কি?'

'এক পাকে সিদ্ধ পাক যা হয়, তাই—একবার। আর বার ফল-জল।'

'দুধ খাবে? ঘরুটে গরুর দুধ?'

'পাই কই?'

'দাঁড়াও—' চারপাশে তাকাতে লাগল জামিলা : 'একটা ভাঁড় জোগাড় করতে পার? একটু দুধ দুয়ে দিতাম তোমাকে।'

'বল কি? জোগানে যে কম হবে তোমাদের।'

'হলে হত। বলতাম, বাছুরে খেয়ে নিয়েছে।'

'না গরিবের ক্ষেতি করিয়ে লাভ নেই।' এগুলো কালীপদ।

'যাচ্ছ কুথা?'

'গাজন খাটতে যাচ্ছি।'

ঘাটে যাচ্ছি। আমরা দেয়াশিন পাতা। তার মানে, অশন-বসন জোগাই আমরা—আমরা ভাণ্ডারী। তুমি ও-সব বুঝবে না কিছু।

না, বুঝব। কেন বুঝব না? তোমার বুঝের জিনিসে আমার কেন অবোধ হবে?

সূর্য্যি অস্ত গেলে স্নান করি সবাই। ঘাটের পাহাড়ে বেতের ছড়িগুলো গাদা দিয়ে রেখে দিই। ঢাক বাজে, টিকিরি বাজে। নাচ করি তখন। মাথা নেড়ে তালে-তালে ঠিক ভরন দিয়ে একবার লাঠির গাদার দিকে এগুই। আর একবার পিছুই। কখনো দেখনি বুঝি তুমি? গেলেই পারো একদিন।

'আমাকে দেখতে দেবে?'

'কেন দেবে না? তুমি তো দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে। ছোঁবে না তো কাউকে।'

'তোমাকে যদি এখন ছুঁই?'

'ছোঁও না। এখনো তো চান হয়নি আমার।'

'চান করার পর?'

'তখনকার কথা আলাদা—তখন তো আর—' প্রশ্নটা কালীপদর ভাল লাগল না।

'তারপর বুঝি মদ খাবে?'

মুহূর্তে কালীপদর মুখের মরা-মরা ভাবটা কেটে গেল। বললে : মদ খেলে মন খুব সরল হয়। উতলা উল্লাস হয়। জাত-বেজাত থাকে না। সবাই আপনার হয়ে যায়। ছোঁয়াছুয়ি চলে যায়। তুমি খাওনি কোনোদিন মদ?

'ধোৎ।'

পাশাপাশি পাড়া—নিকিরি শেখের পো'রা আর ওই ধীবর-কেওটরা। মাঝখানে একটা কাঁদর। ঝগড়া মারামারি আছে আবার সুখও আছে।

কিন্তু মঞ্জুর খাঁর সঙ্গে নাথু কেওটের বড় বিতণ্ডা। প্রায় দা-কুমড়ো সম্পর্ক। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। নাম শুনলে চিড়বিড় করে ওঠে।

বরাবর কিন্তু এমনটি ছিল না। এককালে গলায় গলায় ভাব ছিল দুজনের। এ কাশী যায় তো ও-ও কাশী যায়। ও মক্কা যায় তো এ-ও মক্কায় চলল। এত দোস্তালি। তখন জামিলা-কালীপদ ছোট। সেবার জামিলার বিয়ের সময়ও কত মাছ জুগিয়েছিল নাথু। কালীপদর জ্যাঠার শ্রাদ্ধের সময় মঞ্জুর খাঁ। যেমন একই নদীতে জেলাই করত তারা, তেমনি তাদের মন প্রাণও হয়ে গিয়েছিল এক নদী, এক খেয়া। জালও এক, জলও এক।

কিন্তু জমিদারের দল বিরোধ বাধিয়ে দিলে। তাদের সরিকে সরিকে ঝগড়া, তাই তারা প্রজায় প্রজায়ও মিলমিশ রাখতে দেবে না। এক সরিক বিলি করল মঞ্জুর খাঁকে, আরেক সরিক নাথুরামকে। তাদের অংশের গোলমাল মীমাংসা করতে চাইল নাথু মঞ্জুরের মধ্য দিয়ে। একটা পুকুরের জেলাই-স্বত্ব নিয়ে মামলা। কিন্তু বাড়ির উঠোনে দু-দুটো পুকুর কেটে ফললে তারা। আগে তরল রক্তে, পরে ভরল চোখের জল দিয়ে।

সোয়ামীর গাঁয়ে থাকতেই সব খবর পেত জামিলা। যমযন্ত্রণা পেয়ে বেধবা-বেওয়া হয়ে দেশে-গাঁয়ে ফিরে এসে দেখে এই অবস্থা। আগুন নিভেছে বটে কিন্তু হলকা যায়নি। বাতাস পায় তো আবার মেতে ওঠে।

উঠুক—ওতো শুধু তাদের বাপেদের কাণ্ড। তারা ছেলে-মেয়েরা, মা-বোনেরা ও সবের ধার ধারে না। তাদের খালে-বিলে যেমন সোঁত ছিল তেমনি থাকবে। দু-দুটো পুকুর কাটা যায় কিন্তু জল কখনো ভাগ করা যায় না। মাটির তলে তলে চলাচল করে।

ওদিকে পা বাড়িয়েছিল জামিলা—মঞ্জুর খাঁ হুমকে উঠেছিল : ও বাগে কি? ওরা আমার দুষমন। খবরদার—

বুঝেছিল জামিলা। এ শুধু মামলায় হেরে যাবার জন্যে নয়। এ নয় যে তার নতুন বয়স হয়েছে। এ নয় যে সে বেওয়া। এ যেন এ-বাড়ি ও-বাড়ি

নয়, এ একেবারে এ-ম্লুক ও-ম্লুক। এ-দেশ ও-দেশ। দুটো আলাদা জাতজন্ম। আগুন আর বাতাস নয়, আগুন আর জল। দুজন দুজনের দুষমন। ওর গরু এর হারাম।

কিন্তু সব যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষে মানুষে শুধু একটুখানি মিল-মিশ সৃষ্টি করতে পারেন না?

কতটুকু কুটুম্বিতেই বা সম্ভব? তবু যতটুকু হয়। যতটুকু বা ছিল! তাই বা কম কি!

জামিলা মনে মনে হাসে। বম-ভোলা না হাতি! এত মুরোদ অথচ এক ঠেলায় পৃথিবীটা উলটে দিতে পারে না? উলটে দিতে পারে না সমস্ত বিধি-বেপার, সমস্ত আইন-কানুন? পশু-পাখির মতই তো মানুষ তার সৃষ্টি, মানুষের বেলায় কেন এত গোনা-গাঁথা, কেন এত গরমিল? এত ভাগাভাগি, এত বাঁটোয়ারা?

'মাঠের দিকে গিয়েছিলি কেন?' মঞ্জুর খাঁ ধমকে ওঠে।

'গরু দিয়ে কালীপদদের কলাইয়ের ক্ষেত তছরূপ করেছি বাজান।'

'বেশ করেছিস।'

মা জিগগেস করে : 'কোথায় যেছলি?'

'কান্দরে বান এসেছে দেখতে যেছলাম।'

'ভিজেছিস কেনে?'

'কালীপদদের সেই সরফুলি বাটিটা চুরি করেছিলাম না? সেটা কাদায় পুঁতে রেখে এলাম।'

'বেশ করেছিস।'

কাঁদরে দাঁড়িয়ে গাজন-খাটার নাচ দেখছিল জামিলা। কি মাতন রে বাবা! হটতে হটতে পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল জলের মধ্যে। ধর-ধর তোল-তোল, সবাই হৈ হৈ করে উঠল, কিন্তু সবার আগে ছুটে এল কালীপদ।

চারপাশে ভিড় দেখে ঝাঁজিয়ে উঠল জামিলা : 'আমি বেওয়া মানুষ, আমাকে ধর তোমার সাহস কি?'

'যে সাহসে তুমি পড় সেই সাহস।'

'আজ বাদে কাল আমার নিকে হবে—দেশান্তরে চলে যাব। ছাড় ছাড়—'

'এখন চোত মাসের নদী। জল নাই ধারা নাই। যদি থাকত তো ভেসে যেতাম। ফিরতাম না। মনান্তর না হলে আবার দেশান্তর কি?'

'পাগল! যেখানেই যেতে সেখানেই সেই দুই মানুষের বাসা। এক দিকে ঈশ্বর আরেক দিকে আল্লা। রফা নাই রেয়াৎ নাই, মিট নাই আপোস নাই। কি বল্লো তো!'

কোথায় পাব সেই [illegible] দেশ! কোথায় পাব সেই হাওয়া-খাওয়া মাঠ!

পাবে না যখন ভালো মানুষের মত ছেড়ে দাও। ঘরের মেয়ে ঘরে গিয়ে বন্ধ হই। তুমিও জাত বাঁচাও। বাবা ভোলার মান রাখ। বাবা ভোলা না বোবা ভোলা!

তোরা কিসের ভক্ত রে ছিরু?

আমরা মালার ভক্ত। বাবাকে গোড়ের মালা জোগাই। টগর আর রক্তকরবীর। আমরা বৈরাগী। আমাদের সাত দিনের উপবাস।

আর তোরা?

আমরা স্যাকরা। আমরা সিদ্ধির ভক্ত। সিদ্ধির গোটা গাছ—একেবারে জঙ্গল নিয়ে এসেছি। বাবাকে ঢেকে দেব গাছ দিয়ে। বাবা যে সিদ্ধিপ্রদ।

'বলিস কি? সব সাধ মেটাতে পারে বাবার সাধ্য আছে?' কালীপদ তাচ্ছিল্যের ভাব করে।

'পারে বৈ কি।'

'যে গাছে শাদা ফুল ধরে সে গাছে লাল ফুল ফোটাতে পারে? রাতারাতি জাত বদলিয়ে দিতে পারে গাছের?'

'গাছের পারে না, মানুষের পারে।' বললে যুগলমির্ধাদের একজন।

বলে কি সর্বনাশের কথা! মানুষের জাত-জন্ম সব একাকার করে দিতে পারে?

নতুন ভক্ত হলি এই বছর। তুই বাবা ভোলার সামর্থের খবর জানিস কি? কণা-কণা সিদ্ধির পাতা বিলোনো হবে জনে-জনে, তাই নিয়ে যাস এক রেণু।

রেণু কেন, গোটা গাছ খেতে পারি শিলে বেটে।

ওরে অপেয়ে খেতে হয় না, কাপড়ের গিঁটে বেঁধে রাখতে হয়।

যুগল-মির্ধারা কুলের কাঁটা বুকে নিয়ে গড়াচ্ছে মাটিতে। অফলা কুলের গাছ। জীবনে বোধ হয় ফল পায় নি কিছুতে, তাই কাঁটার দাগ নিতে বুক চিরে-চিরে দিচ্ছে। যদি এবার কিছু সুফল ফলে।

কালীপদের মনে হল এমন কিছু করলে যদি হয়! বুক চিরে রক্ত না দিলে বাবা শুনবে কেন? শুধু একটা ইচ্ছে হলেই বাবারো ইচ্ছে হবে? তা কখনো হয়?

কুলের কাঁটা কেন, ইচ্ছে হল পাথরে মাথা ঠোকে। মুখ ঘসে, ঘাস-মাটি আঁচড়ায়-কামড়ায়। তবে যদি কালারুদ্দুরের দয়া হয়।

বাজে কথা। জাত বদলানো অসম্ভব। যে দেয়াশিন, সেই যুগল-মির্ধা হতে পারে না। জামিলা তো কোন ছার!

এত মানুষ, দুটো করে হাত পা, চোখ-কান, জাত জিনিসটা কোথায় লেখা আছে জিগগেস করি? একই তো রক্ত, একই তো কান্না। জাত যদি আলাদা, হাত দুটো তবে আলাদা হয় না কেন? কেন এক হাত আরেক হাতের মধ্যে ধরা দিতে হা-পিতোশ করে?

তার চেয়ে কালীপদ শাদা ফুলের গাছে লাল ফুল চাক! তা ঢের সরল।

গোল নাচ নাচছে গয়লারা :

রাত পোহালে বাবা ভোলা
করবে আলা হোম-তলা
লোকে দেবে পুজো-পালা
(বাবা) নদীর জলে করবে খেলা।

লোক সরিয়ে দিচ্ছে সীমানাদার। এক দলের জায়গা আরেক দল না চেপে বসে। মারামারির রাত। ব্রতভঙ্গের রাত। যত রকম ভক্ত সব জড় হয়েছে মন্দিরে। সারিবোলান হচ্ছে, হচ্ছে পাঁচালি-কীর্তন, চলছে ঢোল-তবলা-হার্মোনিয়ম। ধুমুল পড়েছে চারদিকে। অগ্রদানী হাঁক পেড়ে ডাকছে ভক্তদের। তার হাতে আবিরের ফোঁটা নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি লেগে গেছে।

কত জনের কত সাধ। কত মানৎ। কালীপদের মত সৃষ্টিছাড়া বুঝি কেউ নয়।

লাউসেনরা কুমড়ো-লাউ নিয়ে এসেছে। ধুপসেনেরা ধুলো বিলোচ্ছে চারধারে। যারা মায়ের পাতা তারা কালীর মুখোস পরে ডাকিনী-যোগিনী সেজে নাচছে। দাঁত বার-করা শোলার গয়না পরেছে সর্বাঙ্গে। এলানো চুল ফাঁপানো ঘাগরা—মুখ কটা আবির-মাখা। সব শুদ্ধ ষোল জন বোধ হয়। ষোড়শমাতৃকা। ওরা কি চায়? পুষ্টিতুষ্টি? না, জয়-বিজয়?

ওরে বাবা, ওরা চামুণ্ডার পাতা! শকুনি-গৃধিনী খেলছে। মাঠে বা গোপথে-ভাগাড়ে মরা পশু-পাখি নিয়ে শকুনী-গৃধিনীরা যেমন কাড়াকাড়ি করে তেমনি ঝটাপটি করছে ওরা। ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ করছে পর্যন্ত। উবু হয়ে বসে কখনো বা মাটির উপরে বুক দিয়ে পড়ে দুই হাত-পায়ের শব্দে পাখসাট দিচ্ছে। একবার এগুচ্ছে আর বার পেছুচ্ছে, কখনো বা ঘাড় তুলে লম্বা করে হেলাচ্ছে-দোলাচ্ছে।

'ওমা, তুমি এখানে!'

ভিড়ের মধ্যে জামিলা। ভয়েতে ভর-ভর মুখ, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে গা ঢাকা দিয়ে।

'তুমি এখানে কেন? ভারি ভয়ের খেলা এখন। বাড়ি যাও।'

'আমার সে ভয় নয়।' জামিলা একটু হাসে।

জামিলার ধরা-পড়ার ভয়। কিন্তু কালীপদ ছাড়া তাকে আর এখানে চেনে কে! কে বা বুঝবে কেন এসেছে! কিন্তু অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে কোনো লাভ আছে? মাঝখান থেকে লোক-জানাজানি হয়ে গেলে অপমান করবে সবাই।

করুক। অপমানের আর বাকি কি। তোমার বাবা চোখ বুজে আছেন,

থাকুন তেমনি। তাঁর দিকে আর তাকাচ্ছি না। মড়া নিয়ে আসবে যারা তাদের খেলা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আসবে না তারা?

কী সর্বনাশ! ঐ খেলা সইতে পারবে তুমি? ভয়ে চোয়ালের খিল আটকে যাবে না?

আমার চেয়ে তোমারই তো বেশি ভয়। রাজ্য-সিংহাসন কিছুই ছাড়তে পার না। ছাড়তে পার না তোমার ঐ কালারুন্দুরকে।

কে কি ছাড়ে বলো? কেউ কিছু ছাড়ে না। যদি একজন না জোর করে ছাড়ায়।

জোর করে বোলো না। দয়া করে ছাড়ায় বলো।

রোল উঠেছে ভিড়ের মধ্যে। কি ব্যাপার রে বাবা? জামিলাকে চিনে ফেলল নাকি?

না, না, তা নয়। কালকে-পাতারা মড়া নিয়ে আসতে পারবে না এ বছর। পাখমারার ডোবে মড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি নাকি। তাগ বুঝে কেউ মরেওনি এই সময়টায় যে কাঁধ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। শ্মশান পর্যন্ত শূন্য।

তারি জন্যে নৈরাশ্যের চাঞ্চল্য উঠেছে চার দিকে। মড়া নাচাবেনা এ বছর—বাবা ভোলা হল কি! এত নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে! এত বিমুখ!

'তবে এবার ফিরে যাও।'

'তোমার হাতের লতুন কাপড়খানা আমায় দাও না।' হাত বাড়াল জামিলা : 'বাবাকে দিয়ে আর কি হবে?'

'ও তো শাড়ি নয়, তুমি করবে কি?'

'গলায় বেঁধে ঐ সামনের গাছটায় ঝুলে পড়ব। মড়া পাচ্ছে না নাকি আমার দেহটা নিয়ে দিব্যি খেলা দেখাতে পারবে।'

কথাটার যেন কত কষ্ট। কালীপদ দিয়ে দিল কাপড়খানা। বাবার জন্যে এনেছিল, তাকে দিয়ে আর কি হবে? সংসার ভরা যার এত ঐশ্বর্য তার ঐ একখানা কাপড়ে কি আসে যায়? তার চেয়ে মনের মানুষের গায়ে এই কাপড়খানা গায়ের পরশের মতন লেগে থাক।

'কোথা গিয়েছিলি পোড়ামুখি?' জামিলার মা হুমকে উঠল।

'কালীপদর বাড়ির সবাই 'জাগরণে' গেছে। সেই ফাঁকে ওদের বাড়ি ঢুকে এই কাপড়খানা চুরি করে এনেছি।'

'বেশ করেছিস।' মঞ্জুর খাঁ আর তার স্ত্রী এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

না, মড়া জোগাড় হয়েছে। বাঁশের খুঁটোর সঙ্গে খাড়া করে বেঁধে এনেছে তাকে। দু' হাত দু'দিকে মেলে ঠিক সোজাভাবে দাঁড়িয়ে আছে মড়াটা। মুখে সিঁদুর-আবির মাখা। গলায়-মাথায় করবী আর আকন্দফুলের মালা। কোমরে মালকোঁচা বাঁধা। ধুপধুনো পুড়ছে, ঢাক বাজছে, আর সেই বাজনার তালে-তালে বাঁশবাঁধা সেই মড়া নাচছে। সঙ্গে-সঙ্গে নাচছে সব ভক্তেরা। আর থেকে-থেকে হুঙ্কার ছাড়ছে।

সমস্ত সংসারক্ষেত্রে এবার শ্মশান হয়ে গেছে॥ এবার, বটুকনাথ ভৈরব, হে বিভূতিভূষণ, তুমি জাগো।

আর কেউ নেই, শুধু শিব আর শক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। কালীপদ আর জামিলা।

ভয়ে সবাই ছুটে পালাচ্ছে, আবার ফিরে তাকাচ্ছে। ফিরে তাকাচ্ছে তো আবার চিৎকার করছে। বাড়ি পৌঁছেও বুকের ধড়ফড়ানি যাচ্ছে না।

কিন্তু কালীপদ নিশ্চল-নিষ্ক্রিয়। শক্তিশূন্য।

মড়া নিয়ে চলে গেল ভক্তরা। আবার লোকজন জড় হতে লাগল আস্তে-আস্তে। কিন্তু জামিলার আর দেখা নেই।

'ও কে, ও কে ঢোকে রুদ্রদেবের মন্দিরে?' হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই।

কী সর্বনাশ! ও যে চণ্ডাল। ও মন্দিরে ঢোকে কোন সাহসে?

ও জলকুমুরী। জটাধারী। এক পুরুষের বংশ ওদের। ব্রত করলেই ওদের জটা হয়। মন্দিরে ঢোকবার আজ ওদের নির্বিঘ্ন অধিকার।

তেমনি আজ বীরপঞ্চানন বাগদি। হাড়ি মশালদার।

সমস্ত অভাজনের দেবতা তুমি। সমস্ত জনগণের দেবতা। কিন্তু ভগবান, বলো, কেবল একজন কেন বাদ পড়ে? কেন তুমি সকলের হয়েও কালীপদর নও?

ওরা কারা নাচতে এসেছে আগুন নিয়ে?

ওরা ব্রহ্মার পাতা, অশ্বত্থ যজ্ঞিডুমুর আর বেলকাঠের আগুন করেছে। শুধু তাই নয়, সেই আগুনের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ব্রহ্মপদ কি আর অমনিতে মেলে?

বলা-কওয়া-নেই, কালীপদ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনের মধ্যে। গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এ আবার কোন ভক্ত?

আমি ভক্ত নই। ভক্তরা তো বাইরে দগ্ধ হয়, আমি অন্তরে দগ্ধ হচ্ছি। অন্তর্দাহ মেটাবার জন্য বহির্দাহের শরণ নিলাম। তাই যদি এবার দেখেন বাবা রুদ্রদেব। আমি ভক্ত নই। আমি জ্ঞানপাপী।

ভোরবেলা জনগণের দেবতা রুদ্রদেব বেরুলেন শোভাযাত্রায়। ময়ূরাক্ষীর তীরে হোমতলায় বিশ্রাম করে ফিরবেন আবার মন্দিরে—নিজ-নিকেতনে।

পথে তিনি পথিকের দেবতা। সমস্ত পথহীনের।

বারের বামুন বাবাকে কোলে করে এনে পালকিতে বসিয়ে দিলে। খোলা পালকি। জানলা-কপাট নেই, খিল-শিকল নেই। যেই হাত বাড়াও ছুঁতে পারো দেবতাকে। ঠেলা দিয়ে ভেঙে দিতে পারো তার কালনিদ্রা।

বাবার বিছানা-বালিশ এল। চামরবরদার চামর নিলে। বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় আলস্য রাখলেন গণদেব। সুরু হলো চামর খাওয়া। আবার কি ঝিমকিনি এল নাকি, না কি বাবা সব সময়েই ঘুমে?

পালকির আগে ঢাক, ঢাকের আগে নিশান, নিশানের আগে দগড়। কাঁধের ভক্তরা পালকি বইছে। এগুচ্ছে দু-পা দু-পা করে।

কাঁটাঝোপে আর ঝোড়জংগলের মধ্যে বাবার রাস্তা। পুকুরের গাবা বা আঁস্তাকুড়ের পাশ দিয়ে। সাধারণের যিনি দেবতা তাঁর পথ এমনি অগম্য। ধুলো-কাঁটায় ভরা। তাই দিকে-দিকে ধুলো ওড়াও। সব বাবার পদরেণু। বাবার জয়-বিজয়!

হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে ইতিলোকের। বাবাকে দেখবে. বাবাকে ধরবে, বাবার বাহনে কাঁধ দেবে। সব এলাকা ভাগ-ভাগ করা আছে। কার ক চেন, কার ক রশি! কার কি পুজো-প্রণামী, তাও ঠিক হয়ে আছে। কার চাল-চিনি, কার ফল-জল, কার বা ফুল-দুধ।

আগে চল কুরুর পাড়া, পরে শাঁখারি পাড়া, স্যাকরা পাড়া, কায়েৎ পাড়া। তল্পিদার কই হে? মাথার ধামা নামিয়ে নাও যা কিছু দেয় তারা মুঠো ভরে।

সারা পথ ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল। আরো-আরো ধুলো ওড়াও! আমাদেরই মত আমাদের দেবতা আজ পথ দেখেছেন, পথ নিয়েছেন। বোলো—বাবা ভোলার নামে প্রীতিপূর্ণ করে হরি হরি বোলো—বোলো শিবো—বোম্—

সঙ্গে-সঙ্গেই ভক্তদের বেতে-বেতে ঠকাঠকি—কাঠিতে-কাঠিতে কটকটকট। বলো কোন গাছে ফল হয় না, ঠেকিয়ে দিই। কার শক্ত অসুখ, লাঠির আচ্ছাদনের নিচে এসে দাঁড়াও।

এবারে মুচিপাড়ার হিসসা। ভাগাড়ের মুচিরা এসে ঠাকুরের গায়ে হাত বুলুতে লাগল। কত বঞ্চনার পর অঞ্চলে এল বলো তো!

তারপর মেথরেরা। নরক ফেলে তারা ঠাকুরকে তুলে নিলে কাঁধে। তাদের চৌহদ্দিটুকু পার করে দিলে।

এবারে এই পাকুড়গাছের গোড়ায় বাঁধানো বেদীতে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করবেন। জানোনা বুঝি? এই জায়গার নাম বিশ্রামতলা।

বিশ্রামের পর আবার রওনা হলেন। এবার নবগ্রামদের কাঁধে।

তারপর এই এলাকাটুকু? ওই ঢিপিটার থেকে ঐ কাঁদরের পাড় পর্যন্ত?

হঠাৎ নিকিরিয়া ছুটে এল। মঞ্জুর খাঁ, সাহাদাৎ শেখ, জুব্বারি মুন্সির দল। কি ব্যাপার? মারপিট করবে নাকি? ঠেকাবে নাকি ঠাকুরকে?

না, আমরা কাঁধ দেব। কোলে নেব বাবাকে। এটুকু আমাদের ইলাকা। আমাদের সীমানা। মুসলমানদের।

বাবা ভোলার নামে প্রীতিপূর্ণ করে—রব উঠল, জয় উঠল চারদিকে।

তিরিশ-চল্লিশ গজ রাস্তা মুসলমানরা পালকি বইলে। ঠাকুরকে পার করে দিলে বুকে করে। যুগ্যি ছেলে যেমন বুড়ো বাপকে পার করে দেয়।

বেরিয়ে এল জেনানারা। দাঁড়াও, বাবা এখন আমাদের বাড়িতে। হাতের যত্নে তার সেবা করি, আঁচলে বাতাস করি তাকে। গরিব মেয়ের বাড়িতে এসে বাবার না কোনো ত্রুটি হয়।

হঠাৎ কালো কষ্টির গায়ে তীক্ষ্ণ একটা সোনার দাগ পড়ল যেন। কালীপদ চোখ ফিরিয়ে দেখল, জামিলার হাসি, জামিলার আনন্দ।

কত বড় জীবন্ত ঠাকুর দেখ। আমাদের তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর আর আল্লা এক—আমরা এক বাবার সন্তান। কোনো ভেদ নেই, বাধা নেই। তুমি এক পুরুষ আমি এক মেয়ে। সারা সংসারে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই। আমি ছাড়া তুমি মিথ্যে, তুমি ছাড়া আমি শূন্য।

কালীপদ তাকাল একবার ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের চোখ কই! আশ্চর্য, জামিলার চোখের মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়ে আছেন। দুটি বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। আকাশ ভরা টলটলে নীলের ঢেউ।

হোমতলায় গিয়ে নিচের আসনে বসেছেন রুদ্রদেব। সবাই জল ঢালছে তার মাথার উপর, স্নান করাচ্ছে। জামিলা কালীপদও জল দিল। সবার-স্পর্শে-পবিত্র-করা জলে দেবতা পবিত্র হলেন।

শুধু জল নয়, দুজনে বাটা দিলে ঠাকুরকে। বটের পাতার ছোট ঠোঙাতে করে ফুল আর কলা আর আমের টুকরো। হোমাগ্নিতে আস্ত কলা আহুতি দিলে দুজনে। যদি দেয়াল-আড়াল ভেঙে দিলে বাবা, আবরণ-আচ্ছাদনও মুছে ফেল। জীবন পূরন্ত কর, ফলন্ত কর। অফুরন্ত কর।

কি মোহে আছে দুজনে, সন্ধ্যায় ঠাকুরের শীতল দেখলে, আরত্রিক দেখলে। রাতে শোল মাছ পোড়া দিয়ে খিচুড়ি ভোগ হল, তার প্রসাদ নিলে। আর ভয় কি! আর আপশোষ কি। বাবা আসন-বসন, শয়ন-ভোজন সব এক করে দিয়েছেন। আর কোনো ফাঁক-ফারাক নেই। তোমরা-আমরা নেই।

এক রাত্রি থেকে বাবা ফের ফিরে গেলেন ভোর বেলা। জামিলা-কালীপদ বললে, আমাদের আর ফেরা নেই। আমরা চললাম পালিয়ে। চললাম এগিয়ে। মিলিয়ে দেবার কর্তা তুমি, এগিয়ে দেবারও মালিক হয়ো। আকাশে বাতাসে না দেখি, দেখব তোমাকে আমরা আমাদের চার চক্ষুর মাঝখানে।

চলো, যাবার আগে বাবাকে একবার দেখে যাই, ছুঁয়ে যাই। সোনার অলংকার পরে সিংহাসনে বসেছেন বাবা, মাথায় চূড়ো, কাঁধে সাপ, হাতে ধুতরো আর কঙ্কন, গলায় হার আর পায়ে খড়ম, চলো দেখে আসি। পথের ঠাকুর সিংহাসনে বসেছেন। আমাদের প্রত্যহের চাওয়া চিরকেলে পাওয়ার মান পেয়েছে! এ কি কম কথা!

কে রে ওঠে মন্দিরের চাতালে? বারের বামুন গর্জে উঠল।

'আমরা।'

'কে তোরা ?'

'আমরা আবার কে! আমি আর ও! মন্দিরে ঢুকে বাবাকে স্পর্শ করতে এসেছি।'

বারের বামুন আর তার শিষ্য-সাকরেদরা ঘাড়ে রদ্দা মেরে আগুন থেকে বের করে দিলে কালীপদকে। জামিলাকে দূর-দূর করে কুকুর তাড়ানোর মত করে খেদিয়ে দিলে।

কালীপদ বললে, 'কাল যে বাবাকে দেখেছিলাম, ছুঁয়েছিলাম, ধরে-ছিলাম—'

'ঐ এক দিন।'

শুধু ঐ এক দিনের স্বপ্ন। বাবা আবার অভিষেক করে উপরে উঠেছেন। শুধু এক দিনের জন্যে নেমেছিলেম নীচকুলে। মন্ত্রে শুদ্ধ হয়ে আবার সম্ভ্রান্ত হয়েছেন। বসেছেন তাঁর পাকা স্বত্বের জমিদারিতে।

'তিনি আর আমাদের নন?' শূন্যকে জিগগেস করলে কালীপদ।

'কোনোকালেই আমাদের ছিলেন না।' জামিলা চলতে চলতে সরে গেল অজান্তে : যখন ফিরে গেছেন শুনলাম তখনই বুঝেছিলাম আমাদের ফিরতে হবে।'

'বুঝেছিলে?' জামিলার মুখটা হাত দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল কালীপদ।

জামিলা চোখ বুজল। কালীপদর মনে পড়ল ঠাকুরের চোখ নেই। শুধু নিষ্ঠুর পাথরে নিষ্পলক অন্ধতা।

৬৩। রক্তের ফোঁটা

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল অনিমেষ। মুহূর্তে রেলিংটা ধরে ফেলে সামলাল নিজেকে।

নিজের দিকে তাকাল। কই কিছুই পড়ে-টড়ে নেই তো! কলার খোসা, আমের চোকলা, নারকেলের ছোবড়া—কিছু নেই তো! জলও তো নেই এক ফোঁটা। শুকনো খটখটে সিঁড়ি। জুতোর তলাটাও দেখল একবার। সেখানেও কিছু লেগে নেই।

মনে মনে হাসল অনিমেষ। খুব তাড়াতাড়ি করছিল বলেই হয়তো পা বেচাল হয়ে পড়েছিল। ছন্দ রাখতে পারেনি ঠিকমত।

চক্ষের পলকে কী দুর্ঘটনাই না হতে পারত। ভাঙতে পারত হাড়গোড়, মাথা, মেরুদণ্ড। এতক্ষণে তাহলে রেল স্টেশনের পথে না হয়ে হাসপাতালের

পথে। ট্যাক্সিতে না হয়ে এ্যাম্বুলেন্সে। সত্যি, এক চুলের ফারাক। একটা সুতোর এদিক-ওদিক।

এত তাড়াহুড়োর কোনো মানে হয় না। অনিমেষের এখন বয়স হয়েছে। তার ধীর-স্থির হওয়া উচিত।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ঠিক সময়ে, সমর্থ হাতে রেলিংটা ধরে ফেলতে পারল। ঠিক অত দূরে রেলিং, পড়বার সময় হাতের হিসেব থাকল কী করে? মনে হল কে যেন হাতের কাছে রেলিংটা এগিয়ে এনে দিয়েছে।

কিছু বলেনি, তবু ট্যাক্সিটাও ছুটেছে প্রাণপণ। যেন ড্রাইভারেরও ভীষণ তাড়া। কিন্তু বেগে ছুটলেই আগে পৌঁছুনো যায় না সব সময়।

মনে হচ্ছিল, ট্যাক্সিটাই য়্যাক্সিডেণ্ট করে বসবে। হয় কাউকে চাপা দেবে নয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়বে কোনো গাড়ির উপর, নয়তো কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষ। অত শত না হয়, নির্ঘাৎ জাম হবে রাস্তায়। ট্যাক্সিটা পৌঁছুতে পারবে না। ট্রেন ছেড়ে দেবে।

যেন এত সুখ সহ্য করবার নয়। ভাগ্য ঠিক বাদ সাধবে। বাগড়া দেবে। না, হন্তদন্ত ট্যাক্সি শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। ট্রেনটা ছাড়েনি। কামরার খোলা দরজার উপর অনীতা দাঁড়িয়ে।

'বাবাঃ, আসতে পারলে!' অনীতা খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

'কত বাধা, কত বিপদ—'

'বাঃ, আর বাধা-বিপদ কোথায়! সব তো খোলসা হয়ে গিয়েছে।' অনীতা নির্মুক্ত মনে হাসল : 'এখন তো ফাঁকা মাঠ।'

'যাকে বলে, লাইন ক্লিয়ার।' অনিমেষও হাসল স্বচ্ছন্দে।

হঠাৎ ইঞ্জিনটা হুইসল দিয়ে উঠল।

অনিমেষ বুঝি উঠতে যাচ্ছিল, অনীতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, 'আর উঠে কি হবে? গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।'

না, ওটা অন্য প্ল্যাটফর্মের ইঞ্জিন।

'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল!' বললে অনিমেষ।

'তোমার সবতাতেই ভয়।' একটু-বা ব্যঙ্গ মেশাল অনীতা।

'না, ভয় আর কোথায়'। কামরাতে উঠল অনিমেষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সামান্য কয়েক মিনিট বাকি আছে। বললে, 'কিছুক্ষণ বাকি।'

'কিন্তু কতক্ষণ?'

'ধরো এক বছর।' কথাটাকে অন্য অর্থে নিয়ে গেল অনিমেষ।

'না না, অতদিন কেন? এ কি আমরা ডিভোর্সের পর বিয়ে করতে যাচ্ছি যে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে!'

'না, তা নয়, তবে'—অনিমেষ আমতা-আমতা করতে লাগল।

'তবে-টবে নয়।' অনীতা অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গিয়েছে, এখন আর তোমার দ্বিধা কী!'

'তব্ লোকে বলে, এক বছর অপেক্ষা করা ভালো।'

'ছাই বলে! কেউ বলে না। আমি কত বছর অপেক্ষা করে আছি বলো তো!' কণ্ঠস্বরে অভিমান আনল অনীতা : 'আর আমি দেরি করতে প্রস্তুত নই।'

'কিন্তু চলেছ তো কলকাতার বাইরে।'

'কী করব! হঠাৎ বদলি করে দিল! তাতে কী হয়েছে. তুমি দিনক্ষণ ঠিক করে চিঠি লিখলেই আমি ঝপ করে চলে আসব।' লঘ্ভার হাসল অনীতা : 'বিয়ে করতে আর হাঙ্গামা কী!'

'শ্নছি আমাকেও নাকি বাইরে ঠেলে দেবে।'

'দিক না। তাহলে মফস্বলে যাব। আর যদি না দেয়, কলকাতায়ই থাকো, চলে আসব এখানে। মোট কথা,' চোখে তীক্ষ্ণ আকুতি নিয়ে তাকাল অনীতা : 'শ্ভস্য শীঘ্রং।'

'লোকে কী বলবে!'

'লোকের কথা ছেড়ে দাও।'

'লোকে বলবে বউ মারা যাবার এক মাস পরেই বিয়ে করল।'

'এক বছর পরে করলেও বলবে।' একটু-বা তপ্ত হল অনীতা : 'লোকের হাতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভার নেই। লোকে কী জানে আমার তপস্যার কথা!'

'তপস্যা?'

'হ্যাঁ, প্রতীক্ষা আর প্রার্থনাই তপস্যা।' অনীতা ঘড়ির দিকে তাকাল : 'তোমার বিয়ের প্রায় দ্ববছর পর আমাদের দেখা। তুমি আমাকে বললে তুমি আমার পরম হয়ে এলে তো প্রথম হয়ে এলে না কেন? সেই থেকেই প্রার্থনা করছি, প্রতীক্ষা করে আছি, কবে সে চরম দিন আসবে, কবে পথ পরিষ্কার হবে। তিন বছরের পর সেই স্বযোগ আজ এল। এই তিন বছর সমানে আকাঙ্ক্ষা করে এসেছি আমাদের স্বাধীনতা।'

অর্থাৎ গত তিন বছর ধরেই অনীতা স্বরভির মৃত্যুকামনা করে এসেছে।

ব্বকের মধ্যে একটা ঘা মারার শব্দ শ্বনল অনিমেষ। সে শব্দ কি তার আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি!

না, তা কি করে হয়! স্বরভি বেঁচেছিল বলেই তো অনীতার প্রতি তার আকর্ষণ এত জ্বলন্ত ছিল জীবন্ত ছিল। স্বরভি আজ বেঁচে নেই তাই কি অনীতাও আজ স্তিমিত, নিষ্প্রভ?

'এ কী, ট্রেন ছাড়ছে না কেন?' সময় কখন হয়ে গেছে, তব্ ছাড়বার নাম নেই। ছাড়বার ঘণ্টা পড়লেই তো অনিমেষ নেমে যেতে পারে। রুমাল নেড়ে দিতে পারে বিদায়।

কি একটা গোলমালে ট্রেনটা থেমে আছে, ছাড়ছে না। দীর্ঘতর হচ্ছে এই নিষ্ফল সান্নিধ্য।

সব ট্রেনই ছাড়ে, ছেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অনীতাটারও ছাড়ল।

নামতে গিয়ে অনিমেষ আবার পড়ল নাকি পা হড়কে? না, সে অত অপোগণ্ড নয়। তার পায়ের নিচে মোলায়েম প্ল্যাটফর্ম কে ঠিক পৌঁছে দিয়েছে।

মফস্বলে বদলি হয়ে এসেছে অনিমেষ।

ভালোই হয়েছে। বদল হয়েছে পরিবেশের। মেঝেতে পায়ে-পায়ে আলতার দাগ ফেলা নেই, নেই আর স্মৃতির রক্তাক্ত কণ্টক।

ছোট ছাতওলা বাড়ি, উপরে দুখানা মোটে ঘর। একটা শোবার আরেকটা বসবার। নিচে বাবুর্চি-চাকর। এর চেয়ে আরো ছোট হলে চলে কি করে? তবু অনিমেষের যেন কি রকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। এদিক-ওদিক প্রতিবেশীদের বাড়িঘরগুলি কেমন দূর-দূর মনে হয়। মনে হয় বাড়িটাকে ঘিরে যেন অনেক গাছপালা. অনেক হাওয়া. অনেক অন্ধকার। গাড়িঘোড়ার আওয়াজ অনেক পর-পর শোনা যায়, ফিরিওয়ালারা এদিক কম আসে। অথচ নদী কত দূরে, মধ্যরাত্রে একটু হাওয়া উঠলেই শোনা যায় গোঙানি।

কাজে-কর্মে লোকজন আসে কিন্তু তাদেরও আসার মানেই হচ্ছে চলে যাওয়া। সমস্ত ভিতর-বার আশ-পাশ একটা শূন্যতার শ্বাস দিয়ে ভরা।

না, আসুক অনীতা। ঘর দোর ভরে তুলুক।

আশ্চর্য সেই রকমই চিঠি লিখেছে অনীতা। এই মফস্বল শহরেই সে একটা উচ্চতর চাকরির জন্যে আবেদন করেছে। কদিন পরেই ইনটারভিউ।

হ্যাঁ, কোথায় আর উঠবে. অনিমেষেরই অতিথি হবে অনীতা।

চিঠি লিখে বারণ করল অনিমেষ। তুমি এস, থাকো. চাকরি করো কিন্তু আমার বাড়িতে উঠো না। অন্তত এখন নয়. একেবারে আজকেই নয়। জানোই তো, আমার বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই। তোমার অসুবিধে হবে। তা ছাড়া আমি দুর্বার একা।

আগে অধিষ্ঠিত হও, পরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পাল্টা জবাব দিল অনীতা, প্রায় তিরস্কারের ভঙ্গিতে। লিখলে. আমি একজন সম্ভ্রান্ত, পদস্থ শিক্ষিকা, একটা চাকরির সম্পর্কেই তোমার কাছে একদিনের সাময়িক আশ্রয় চাইছি, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। আর, নিজেকে অত দুর্বার বলে স্পর্ধা করো না। ভাববে আমার প্রতিরোধও দুঃসাধ্য। অন্তত যতক্ষণ আমি সম্ভ্রান্ত, পদস্থ শিক্ষিকা।

না, তুমি এস। ঝগড়াঝাটির কী দরকার! তুমি এলে কত গল্প করা যাবে। কত হাসা যাবে মন খুলে। স্তব্ধতাকেও কত মনে হবে রমণীয়।

আজ সন্ধ্যের ট্রেনে আসবে অনীতা। শুধু রাতটুকু থাকবে। কাল সকালে ইন্টারভিউ দিয়েই দুপুরের ট্রেনে ফিরে যাবে নিজের জায়গায়।

সকাল থেকেই মেঘ-মেঘ বৃষ্টি-বৃষ্টি। দুপুরে ঘনঘোর করে বর্ষা

নেমেছে। সন্ধ্যের দিকে তোড়টা কমলেও হাওয়াটা পড়েনি। চলেছে জোলো হাওয়ার ঝাপটা।

স্টেশনে এসে অনিমেষ শুনল গাড়ি তিন ঘন্টার উপর লেট।

ভীষণ দমে গেল শুনে। বাইরে দুর্যোগ থাকলেও অন্তরে বুঝি একটি আগুনের ভান্ড ছিল। সেটা নিবে গেল ধুইয়ে ধুইয়ে।

রাস্তায় জনমানব নেই। দোকানপাট বন্ধ। শুধু একলা এক পথহারা হাওয়া এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সাইকেল রিকসা করে বাড়ি ফিরল অনিমেষ।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখল, এ কী! তার শোবার ঘরে আলো জ্বলছে! দরজা তালাবন্ধ। হাওয়ার দাপটে দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়েছে, তারই মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো। তবে কি ঘর বন্ধ করে বেরুবার আগে ভুলে সুইচটা অন করে রেখেছিল? তাই হবে, নইলে আলো জ্বলে কী করে? পথে আসতে দেখছিল, স্টেশনেও তাই, ঝড়ের উৎপাতে সারা শহরের কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছিল। কে জানে, কারেন্ট হয়তো ফিরে এসেছে এতক্ষণে। বারান্দার সুইচটা টিপল, আলো জ্বলল না। হয়তো বারান্দার বাল্‌বটা ফিউজ হয়ে গিয়েছে।

দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই ঘরে আর আলো নেই।

মুখস্থ জায়গায় হাত রেখে সুইচ পেল অনিমেষ। সুইচ টিপল : আলো জ্বলল না। না আসে নি কারেন্ট। কিংবা এসে এখন আবার অফ হয়েছে।

হাতের টর্চ টিপল অনিমেষ। মনে হল ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন নড়ছে-চড়ছে, ঘোরাঘুরি করছে! অন্ধকার কোথায়! একটা লোক।

'কে?' ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল অনিমেষ।

দরজা খোলা পেয়ে লোকটা পালিয়ে গেল বুঝি! অনিমেষ প্রবল শক্তিতে দরজা বন্ধ করল। প্রায়ই কারেন্ট বন্ধ হয় বলে ক্যান্ডেল আর দেশলাই হাতের কাছে মজুত রাখে। তাই জ্বালাল এখন। হোক মৃদু, একটা স্থির অবিচ্ছিন্ন আলো দরকার।

কই, লোকটা যায় নি তো! খাটের বাজু ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে!

'এ কে?' একটা বোবা আতঙ্ক অনিমেষের গলা টিপে ধরল। 'এ যে সুরভি!'

পরনে কস্তাপাড় শাড়ি, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর খালি পায়ে টুকটুকে আলতা, ঠোঁট দুখানি চুনে-খয়ের রঙিন করা—সুরভি ডান হাতের তর্জনী তাঁর ঠোঁটের উপর রাখল। যেন ইঙ্গিত করল, অনিমেষ যেন না চেঁচায় না কথা বলে।

তারপর আস্তে-আস্তে হেঁটে-হেঁটে দেয়ালের দিকে সরে গেল সুরভি। সরে গেল যেখানে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। একটা তারিখের উপর আঙুল রাখল। দুই চোখে ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা পুরে তাকাল অনিমেষের দিকে।

সেই চিহ্নিত তারিখে টর্চের আলো ফেলল অনিমেষ। দেখল, আঙুলের
য় করে এক ফোঁটা রক্তের দাগ রেখেছে তারিখে।
কোন তারিখ? এ তো আজকের তারিখ। বাংলা আঠাশে আষাঢ়।
পতিবা
আঠাশে আষাঢ় কী? আঠাশে আষাঢ় অনিমেষ-সুরভির বিয়ের দিন।
দম ভুলে গিয়েছিল। আর আর বছর সুরভিই মনে করিয়ে দিত, এবারও
নিন মনে করিয়ে দিতে এসেছে।
অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছে সুরভি। কেমন মজা। যেতে না যেতেই মুছে
মন থেকে। মুছে দিয়েছ দেয়াল থেকে। ঘুরে ঘুরে চারদিকের
দিকে তাকাতে লাগল। আমার একটা ছবিও কোথাও রাখ নি।
'সুরভি!' তাকে ব্যাকুল হাতে ধরতে গেল অনিমেষ।
হা-হা-হা করে একটা বাতাস ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। বন্ধ দরজা-জানলা
ঝর ঝরঝর করে উঠল। সিঁড়িতে শোনা গেল নেমে যাবার পায়ের
। শুধু যেন সুরভি একা নয়, তার সঙ্গে আছে আরো অনেকে। একসঙ্গে
যাচ্ছে। কেবল নেমে যাচ্ছে। ভারী পায়ে ক্লান্ত পায়ে নেমে যাচ্ছে।
ভয়ে আপাদমস্তক ঘেমে উঠল অনিমেষ।
হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। মনে হল এ আলো নয়, কে যেন সহসা হেসে
ঠছে খিলখিল করে।
তাড়াতাড়ি অল্প-স্বল্প খেয়ে শুয়ে পড়ল অনিমেষ। টর্চ, ছাতি,
প্রুফ দিয়ে চাকরকে পাঠালো স্টেশনে। যত টাকা লাগুক যেন
ঠিক রাখে। যত দেরিই হোক, ঠিকমত আসতে পারে যেন অনীতা।
তে রাত বেশি হয় নি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনন্ত রাত। গাছ-
মধ্যে বাড়িটাকে মনে হচ্ছে যেন রুদ্ধশ্বাস কবরের স্তূপ। কেবল
হা-হা, ডালপালার কাতরতা।
বিছানায় জেগে বই পড়ছে অনিমেষ। জাগ্রত সমর্থ বন্ধুর মত আলোটা
চোখের উপর।
খট-খট খট-খট। দরজায় কে আঙুলের শব্দ করল।
চমকে উঠল অনিমেষ! নিশ্চয় মানুষ! অন্য কেউ হলে আলো নিবে
হাওয়া উঠে দরজা-জানলা কাঁপাত, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হত, নয়তো
কোথাও কাঁদত মরাকান্না। মানুষ বলেই বারান্দার আলোটাও নেবে নি।
জন্যে লজ্জা হতে লাগল অনিমেষের। বালিশের নিচে হাত দিয়ে
একবার অনুভব করল।
ধীরে ধীরে খুলে দিল দরজা।
'এ কী! তুমি—অনীতা?'
'উঃ, কী ভীষণ লেট তোমাদের গাড়ি। আর তারপর কী জঘন্য বৃষ্টি!'
'তোমার জন্যে স্টেশনে চাকর পাঠিয়েছিলাম, সে কোথায়?'

'কই কারু সঙ্গে দেখা হয় নি তো। একাই চলে এলাম।' ঘরের
ঢুকে পড়ল অনীতা।

'তোমার মালপত্র কোথায়?'

'সব স্টেশনে পড়ে আছে। শোনো, আমি ভীষণ ক্লান্ত। এক
জল খাব।'

টেবিলের উপর ঢাকা গ্লাসে জল ছিল, তাই ঢক ঢক করে খেয়ে
অনীতা। বললে, 'শোবার জায়গা করেছ কোথায়?'

'পাশের ঘরে।'

'আমি যাই, শুয়ে পড়ি গে। দাঁড়াতে পারছি না।' ম্লানরেখায় হা
অনীতা : 'নিদারুণ ঘুম পেয়েছে।'

'বাঃ, সে কী! খাবে না?'

'না, পথে অনেক খাওয়া হয়েছে। আচ্ছা আসি।' পাশের ঘরে
দ্রুত হাতে দরজায় খিল চাপাল অনীতা।

তবু দরজায় মুখ রেখে বললে অনিমেষ, 'ঘরের আলোটা জেবলে
আর দেখো, নতুন জায়গায় যেন ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে আমাকে ডে

অনীতার যেন আর কিছুতে ভয় নেই, তার বুঝি অনিমেষকেই
কেন, কেন দুজনে আজ ঝড়ের রাতে একসঙ্গে একঘরে থাকবে
থাকলে জীবন্ত লোকের সংস্পর্শে পরস্পরের আর ভয় থাকত না।
যে ভয়ের কথা অনীতা ভেবেছে সে যে কত অবাস্তব গায়ের উত্তাপে
দিত।

তখন কত রাত কে জানে? দু'ঘরের মাঝের দরজায় টুক করে এ
শব্দ হল। সে শব্দ স্পষ্ট চিনল অনিমেষ। সে খিল খোলার শব্দ।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিছানায় বসে রইল অনিমেষ।

কই অনীতা এল না এ ঘরে।

না, অনিমেষকেই ডাকছে অনীতা। এক নির্জনতা ডাকছে
নিঃসঙ্গতাকে। এক ভয় আরেক ভয়কে।

পা টিপে টিপে অনিমেষই উঠে গেল। খোলা দরজায় ঠেলা দিয়ে
ওঘরে।

দেখল, আলোতে দেখল, একি, অনীতা কোথায়? তার বদলে
পাতা বিছানায়, বিলোল ভঙ্গিতে সুরভি শুয়ে আছে!

'অনীতা, অনীতা কোথায়?' চিৎকার করে উঠল অনিমেষ। টলে
গেল মাটিতে।

পরদিন সকালে হাসপাতালে অনিমেষের জ্ঞান হল। একটু সুস্থ
শুনল গতরাত্রে ট্রেন য়্যাকসিডেন্টে অনীতা মারা গেছে আর ক্যালে
তারিখে যে রক্তবিন্দুটা দেখেছিল সেটা আসলে লালকালির চিহ্ন,
অনেক আগেই তারিখটা দাগিয়ে রেখেছিল সুরভি।

৬৪। জমি

শেষ হয়ে গেল? জিগগেস করল হেলালদ্দি। জিগগেস করল আরো কে। পাড়া-বেপাড়ার দশজনে।

মোকদ্দমায় কে পেল কে ঠকল সেটা জিজ্ঞাস্য নয়। মোকদ্দমা যে শেষ গেল এটাই আপশোষের কথা।

এ ক'দিন সমানে তারা ভিড় করেছে আদালতে। কে কী বলে বা এক বলতে আরেক কথা বলে ফেলে তাই শুধু শুনেছে এ ক'দিন। কে কি হিমসিম খায়, কার কী কেচ্ছাকীর্তি বোরোয়, কার দায়মুল হয়েছিল, বেটিচুরি করেছিল, কে পড়েছিল ঘরপোড়া মোকদ্দমায়। সকাল থেকে বেলায় কাচারি পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায়। ভিড়হুড় আদালত-ঘর থেকে তাদেরকে বের করে দিলে চাপরাশি-আর্দালির টিকিটের পয়সা গুঁজে আবার গুটি-গুটি এসে দাঁড়ায়। সাক্ষীর প্রতি ভূতিতে নিজেরই অলক্ষ্যে ঘাড় নেড়ে হাঁ-না ইঙ্গিত করে বসে। শত্রু-সব যেন তাদের ঘরের লোক।

জীবনে আর কোনো নেশা নেই। রোমাঞ্চ নেই। ক্রিকেট-ফুটবল নেই, টার-বায়স্কোপ নেই, রেস-রেশালা নেই। নেই কোনো জুয়োখেলা। জা। থাকবার মধ্যে আছে এই মোকদ্দমা। দাদ-ফরিয়াদ। তার হার-র খামখেয়াল। উকিলে-উকিলে কাছি-টানাটানি।

মোকদ্দমার ফল বেরিয়েছে শুনলাম। পেল কে?' ফলের কথা একমাত্র গস করলে আমিরন।

আর কে পাবে?' সোনামদ্দি তাকিয়ে রইল দুর্বলের মত।

তার মানে? আমরা পাইনি?'

আমরাই তো পাব। যেদিকে ধর্ম সেইদিকেই তো জিত হবে।'

আহ্লাদে ঘাই মেরে উঠল আমিরন। আমরা পেয়েছি? আমাদের দিকে য়েছে? ঠকে গেছে জলিল মুন্সি? বল কি খোদাতালার এত রহমৎ আমাদের উপর? জমি-জায়গা আমাদের থেকে গেল নিজ চাষে? দমা জিতলাম তবু তুমি অমন মন-করার মত তাকিয়ে আছ কেন? জেল্লা-জলুস সব গেল কোথায়?

র পর আবার আপিল আছে। জলিল মুন্সি আপিল করবে বলছে।'

পরের কথা পরে। এখন তো আমোদ করে নাও। কাল উপোস পারি ভেবে আজকের বাড়া ভাতে তো ছাই দিতে পারি না। ন্নাও সেজে দি এক ছিলিম। উজুর পানি এনে দি। আছরের নামাজ

পড়ো। মজিদে যাও। মজিদে পয়সা দিয়ে এস কারীর হাতে। দরগার খাদেমের কাছে চেরাগী দিয়ে এস। সঙ্গে মহব্বকে নিয়ে যাও। আমাদের বুকচেরা ধন মহব্ব।

পাকা স্বত্বের জমি পেলাম। এবার আর ভাবনা কি। থিত-ভিত হল এতদিনে।

কিন্তু না, এর পর আবার আপিল আছে। আবার খরচান্ত। আবার ভোগান্তি। আবার আইনের খামখেয়াল।

তোমার কোনো ভয়-ডর নেই। কড়া করে তামাক সেজে আনে আমিরন। জলিল মুন্সির সাজানো মোকদ্দমা ফেঁসে যাবে নির্ঘাত। তার জুলুমদারি টিকবে না শেষপর্যন্ত। আমাদের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাক, জমি ছাড়িয়ে নিতে দেব না।

রায়তি স্বত্বের জমি ছিল হরুকুমালির। লড়াইয়ে গেছে সে কুলি-মজুরের ঠিকাদায় হয়ে। যাবার আগে বেচে দিলে সে সোনামদ্দির কাছে। প্রায় মাটির দরে। উনিশ গণ্ডা জমি, মোটে আড়াই শো টাকা বহায়। সোনামদ্দির বউটা সোনাচাঁপার মত দেখতে। সেই একটু দর-কষাকষি করেছিল। না, শাড়ি-জেওর টাকা-পয়সা কিছুই সে চায় না। সে জমি চায়, জোরের জমি। শুধু ফলনের জোর নয়, স্বত্বের জোর। পাকাপোক্ত স্বত্ব। যাতে কায়েম হয়ে থাকতে পারে তারা। গাঁথনিটা মজবুত হয়। যাতে না পরের জমিতে বর্গাইত হতে হয়। জমিতে চষি-রুই কিন্তু তা পরের জমি। নিজের জমি চাই স্থিতিবান স্বত্ব। যাতে না এক নুটিশেই মেছমার হয়ে যায়।

একটু মায়া পড়েছিল কি হরুকুমালির?

'কি মিয়া, বেচবেই যদি জমি, একবার আমাকে যাচতে পারলে না? না আমরা উচিত দাম দিতাম না?' জলিল মুন্সি পাকড়াল হরুকুমালিকে।

রোকের জমি। জলিল মুন্সির বাড়ির বগলে। ডাক নাম আশি-মণি। এক কানিতে আশি-মণ ধান হয়। কবালার কথা শুনে জলিল মুন্সি করাতের পাতের মত লকলক করে উঠল।

'বলি, দিয়েছে কত সোনামদ্দি? আড়াই শো? এই বাজারে ঐ জমির দাম আড়াই শো? আমি তোমাকে পাঁচ শো দিতাম।'

'দলিল এখনো রেজেস্ট্রি হয়নি।' চোখ ছোট করল হরুকুমালি। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে বলেই বুঝি মন তার শক্ত হচ্ছে।

'না হোক, রেজেস্ট্রিতে কিচ্ছু এসে যায় না।'

হরুকুমালির সঙ্গে ঘর করলে জলিল মুন্সি। নগদ দুশো টাকা দিয়ে আরেকটি কবালা লেখাপড়া করিয়ে নিলে। যোগসাজস করলে স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের সঙ্গে। সোনামদ্দির কবালার যে তারিখ, তার চারদিন আগেকার তারিখ বসালে স্ট্যাম্পবেচার তায়দাদে। সেই মোতাবেক দলিল-সম্পাদনের তারিখ দিলে। ফলে দাঁড়াল এই, জলিল মুন্সির কবালা সোনামদ্দির কবালা

আগড়ুড়ি হয়ে গেল। সোনামদ্দির কবালা যদি পাঁচুই. জলিল মুন্সির হল পয়লা। স্ট্যাম্পবেচোর খাতাপত্রেও সেই পয়লা লেখা। কোথাও আর ফাঁক-ফোঁকড়া রইল না। তক্তায় তক্তায় মিশে খেয়ে গেল।

ওয়াকিবহাল লোক এই জলিল মুন্সি। সে জানে দলিলের স্বত্ব হয় দলিল লেখাপড়ার তারিখ থেকে, রেজেস্টারির তারিখ থেকে নয়। কারসাজি করে তারিখ পিছিয়ে দিতে পারলেই তার স্বত্ব প্রবল হয়ে উঠবে।

'কোনো ভেজালে পড়ব না তো?' হুকুমালি ভয়ে ভয়ে জিগগেস করলে।

'তোমার ভয় কী! তুমি তো যুদ্ধে গিয়েছ কুলির জোগানদার হয়ে। তোমার লাগ এখন পায় কে? যখন মামলার ডাক হবে আদালত জিগগেস করবে, বায়া কোথায়· বায়া কী বলে? কোথায় বায়া,· কে তাকে সমন ধরায়! আমি বলব· বাধ্য হয়েছে সোনামদ্দির। সোনামদ্দি বলবে, দায়াদী আছে জলিল মুন্সির সঙ্গে। শুধু দলিল তজদিগ করে হাকিমের বিচার করতে হবে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ধোঁকা লাগিয়ে দেব।'

সেই মামলার রায় বেরিয়েছে আজ।

দলিললেখক· ইসাদী সাক্ষী, নিশানদায়ক সবাই হলফান জবানবন্দি দিয়েছে জলিল মুন্সির দিকে। রেজিস্ট্রি আপিসের টিকিটবরাত· ভেন্ডারের খাতা-তলব. সব কিছুরই তজবিজ হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। লখাইয়ের বজ্রসার লোহার ঘরে কোথায় একটি ফুটো লুকোনো ছিল, ঢুকল কাল-কেউটে। জলিল মুন্সির তঞ্চকী মামলা বেফাঁস হয়ে গেল।

দখল ছাড়েনি সোনামদ্দি। এক দিনের জন্যেও নয়। একবার হাল-গরু নিয়ে জবরান দখল করতে এসেছিল জলিল মুন্সির কিরষান। তারা সোয়ামী-স্ত্রীতে মিলে হাল তাড়িয়ে দিয়েছে। নিজ হাতে জুয়ালি খুলে দিয়েছিল আমিরন। বলেছিল· বুকের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পার,· কিন্তু জমি নিতে দেব না। হাট-ঘাট বাজার-বন্দর করতে সোনামদ্দি বাইরে যায়. ততক্ষণ আমিরন চোখ রাখে পাখির নোখের মতন চোখ। জমি তার বাড়ির পিন্দের সামিল, এক ঘেরের মধ্যে। খাটে-পিটে, খায়-লয় আর সব সময় চোখ রাখে জমির কিনারে। ঘেঁষতে সাহস পায় না জলিল মুন্সি।

তাই জলিল মুন্সিকেই আর্জি করতে হল। নিজের দখল-স্থিরতরের ও বিবাদীর জবরদখল উচ্ছেদের।

কিন্তু টেকাতে পারল না মামলা। ডিসমিস খেয়ে গেল। আদালত রায় দিল· সোনামদ্দির কবালাই খাঁটি, বাদীরটা জালসাজ· ফেরেবী। তাই জমিতে স্বত্ব শুধু সোনামদ্দির। তার দখল আইনী দখল। জলিল মুন্সি বেমালেক।

আপিল করবে জলিল মুন্সি। এই আদালতই শেষ নয়। আছে আরো উপরতলা। সেই ঘরে উঠবে সে সিঁড়ি ভেঙে।

উঠুক। উঠতে দাও। আমরা নিচে থেকেই আসমান দেখি। উপরের দিক তাকাল আমিরন।

'আপিল করলে ওর সঙ্গে আর পেরে উঠব না।' বললে সোনামদ্দি

'আমরা না পারি, ধর্ম পারবে। আপিল করুকই না আগে। আগেই তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? প্রথম জিতের পর যে একটু আমোদ করব তা করতে দিচ্ছ না।'

কাঁচা চিকন ধান ফলেছে জমিতে। কালচে ধরেছে এখন, ক'দিন পরেই পাকা সোনার রং ধরবে। আলের আগায় দাঁড়িয়ে যে একটু রূপ দেখি তার তুমি ফরসৎ দেবে না। দাঁড়াও, বালি দিয়ে কাস্তে-কাঁচি ধার করি আগে. আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে ধান দাইব। ঢেঁকিঘরের তদবির করি. "সুন্দই-রার হাতি" ঢেঁকিগাছটাকে ঝাড়িপুঁছি। একদিন ফিরনি-পায়েস তৈরি করি. একদিন বা চিটে গুড় দিয়ে চিতই পিঠা খাই। তুমি আগে থেকেই কু ডেকো না।

সব বিষয়ে বুঝজ্ঞান হয়নি এখনো আমিরনের। কড়ি খেলতে বসে কখন চার চিতে চক আর কখন পাঁচ চিতে পাঞ্জা—এ কে বলতে পারে। কে বলতে পারে মোকদ্দমার ফলাফল। সাজানো বাগান শুকিয়ে যায় এক শ্বাসে। আবার কখনো বা মরা গাছে বউল-মউল ধরে। কেউ বলতে পারে না। হয়তো ঘাটে এসে ঘাটের নৌকো ঘাটে পচল। আর পাল মেলল না।

'আর এমনও তো হতে পারে যে আমাদের জিত বহাল থাকল শেষ পর্যন্ত। যা সত্য তার আর রদবদল হল না। হতে পারে না এমন?' কুচকুচে কালো চোখে জিলকি খেলে গেল আমিরনের।

এতটা যেন সোনামদ্দির বিশ্বাস হয় না। যে দুর্বল তাকে নিয়ে ধর্ম শুধু খেলা দেখায়, ছলচাতুরী করে। দরজার গোড়ায় স্থির হয়ে বসে থেকে সারা জীবন পাহারা দেয় না। কখন আবার চলে যায় একলা রেখে।

আপিলের শুনানি তো আর কালকেই হয়ে যাচ্ছে না। রায়ও উলটে যাচ্ছে না রাতারাতি। এখুনিই মুখ কালো করব কেন? বাজার-সওদা কর. কুটুম্বিতেয় যাও. ভাই-বন্ধুর সঙ্গে হৈ-হল্লা কর, পান-তামুক খাও। আমিও কটা দিন একটু হাল্কা পায়ে হাঁটা-চলা করি. মেন্দি পাতায় হাত-পা রাঙাই, চোখের কোলে কাজল আঁকি। ছেলেটাকে নাচাই-খেলাই।

'তুমি কিছু ভেবো না, মন খারাপ কোরো না।' আমিরন বসে এসে সোনামদ্দির পাশ ঘেঁসে : 'আমার মন বলছে আমাদের পাওয়া-জমি আমাদেরই থাকবে। দেখছ না, জমি কেমন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে বান্ধবের মত।'

তা তো দেখছি। কিন্তু খরচ-তখরচ করতে হবে আপিলের মোকদ্দমায়। তা জুটবে কোত্থেকে?

আমিরন ঝাঁকরে উঠল ; 'আমার তো জিৎপাট্টি. আমাদের আবার খরচ কি?'

আনাড়ি, অবুঝ আদালতী কাণ্ড কিছুই জানে না। জলিল মুন্সি এরি

মধ্যে কত তালাসী-তদবির আরম্ভ করে দিয়েছে। আপিলের মামলা কার ঘরে চালান করে নিলে সুফল হবার আশা তার তদবির। অমুক হাকিম নতুন সবজজ হয়েছে, আপিল পেলেই হাতে মাথা কাটে, তার ঘরে নিয়ে চল। এর আবার উল্টা-বুঝ আছে অমুক হাকিম। বোঁটা খসতে আর দেরি নেই, বেশি লিখতে-বকতে চায়-না, নম-নম করে সেরে দেবে। যা আছে তাই বহাল রাখবে। তার ঘরে নিয়ে চল। অমুক না তমুক তার দরবিট চলবে। তারপর উকিল নিয়ে টানাটানি। কোন ঘরে কোন উকিলের পসার তার খোঁজ-তালাস। প্রতি পদে তহরি, প্রতি পদে মেহনতানা।

'তোমার কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু আল্লার নাম করে বসে থাক।'

বুঝজ্ঞান থাকলে এমন কথা কেউ বলে না। ঘরগৃহস্থি করে, সংসার-সৃষ্টির জানে কী? শেষকালে জেতা মামলা বে-তদবিরে না ফস্ত হয়ে যায়। ওষুধে-সারা ভালো রুগী না শেষকালে পথ্যের অভাবে মারা পড়ে।

নিম্ন আদালতের খরচ টানতেই সোনামদ্দি নাকাল হয়ে পড়েছে। উপরোউপরি গত দুই খন্দে ধান বেচে কতক টাকা পেয়েছে, জমি কিনে বাকি সব গিয়েছে মামলার অন্দরে। তাতেও কুলোয়নি পুরোপুরি। ভাণ্ড-বাসন বেচতে হয়েছে, বেচাতে হয়েছে আমিরনের বাউ-খাড়ু। হয়েছে কিছু হাওলাত-বরাত। তবু আমিরন জমি ধরতে দেয়নি। খবরদার, জমির গায়ে হাত দিতে পারবে না। জমি আমাদের নিটুট থাকবে। একেবারে নিষ্পাপ। বাঁধা-বেচা করতে পারবে না ওকে নিয়ে। ও আমাদের বুকের মাংস, কলজের রক্ত।

অনেক রকম লোয়াজিমা। হাঁপিয়ে উঠেছিল সোনামদ্দি। মহাফেজখানা থেকে নথি তলব করে আনতে হবে তার তদবির চাই। সাক্ষীর বারবরদারি লাগবে, অন্য পক্ষকে দিতে হবে মুলতুবি খরচ। সোনামদ্দির হাত খালি। আমিরন খোরাকির ধান বের করে দিল। বললে, বাঁধা মাইনের চাকর খেটে খাব দুজনে, তবু তোমাকে আমি জমি বেচতে দেব না। না, না, পত্তন-রেহানও না, কিছু না, আমার লক্ষ্মীকে পরের হাতে সঁপে দেব না কিছুতেই।

খরচ যখন টানতে পারে না, ভাইবন্ধুরা বলেছিল, জলিল মুন্সির সঙ্গে আপোষরফা করে ফেল। আপোষের সর্ত আর কিছুই নয়, যে দামে কিনেছিল কিছু না-হয় বেশি নিয়ে জমি বেচে দাও জলিল মুন্সিকে। কিছুটা গড়িমসি হয়ত করেছিল সোনামদ্দি, কিন্তু আমিরন হাঁকার দিয়ে উঠল: 'কিছুতেই না। ধর্মের কাছে ঠিক, বুকে ধরে জমি ওকে দিয়ে দেব স্বচ্ছন্দে। অধর্মের কাছে ঠকে জমি-জিরাত খোয়াতে পারব না। ভিখ মেগে খেতে হয়, সাধু গৃহস্থের বাড়ি মাগব, চোরের কাছে খয়রাত নেব না।'

সেই কষ্টের জমি তাদের বজায় রয়েছে। বলবৎ রয়েছে ধর্ম। তার

আবার ফির-যাচাই হবে আপিলের আদালতে। কিন্তু তার খরচ কই? খন্দ উঠতে এখনো ঢের দেরি আছে। আংটি-চুংটিও নেই আর আমিরনের কানে-নাকে। হাঁড়ি-পাতিলের দাম কি!

'ছুটা খতে আর ধার পাওয়া যায় না। জমি এবার বন্ধক রাখতে হবে।' ভয়ে-ভয়ে বললে সোনামদ্দি।

'কী করবে?'

'বন্ধক রাখব।'

'পাপ কথা মুখেও এনো না। বন্ধক উদ্ধার করবে কি করে?'

'খন্দ উঠলে ধান-পান বেচে শোধ করে দেব।'

'ওসব শোধবোধের ধার দিয়েও যাবে না মহাজন। সে শুধু ফন্দি দেখবে কি করে জমিতে ঢুকতে পারে। ওয়াশিল দিয়ে শুধু তামাদি বাঁচাবে। তাই যেই একবার খন্দ খারাপ হবে, ঝোপ বুঝে কোপ মেরে জমি দখল করে নেবে। তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের জমি তুমি পরাধীন করে দিও না।'

ভাই-বন্ধুর সল্লা-পরামর্শ নিল সোনামদ্দি।

বউ বলে, ধর্মের দুয়ার ধরে বসে থাক। এক আদালতের রায় যখন আমাদের দিকে হয়েছে, তখন সব আদালতের রায়ই আমাদের দিকে হবে। বলে, আপিলে আমাদের হাজির হবারই দরকার নেই। দেখি ধর্মের রায় কে ওলটায়!

মুরুব্বি-মাতব্বররা হেসে উঠল। ঠাট্টা করে উঠল। বলল, শুধু সদরে আপিল কি, দরকার হলে হাইকোর্ট করতে হবে। তার জন্যে তৈয়ার হও মিয়া। কারবার-দরবারের কথায় বউকে ডেকো না।

সত্যিই তো। যদি সদরে সোনামদ্দি ঠকে তবে চুপ করে সে-হার সে মেনে নেবে নাকি? শেষ চেষ্টা দেখবে না? কুটুম-মহলে বলবে না বুক ফুলিয়ে, হাইকোর্ট করেছিলাম?

আমিরন ঘরের বউ, সে আইন-বেআইনের জানে কী!

সে কিছু জানতে না পারলেই হল। জমির চাষদখল ঠিক থাকলেই সে নিশ্চিন্ত থাকবে।

কিন্তু বন্ধকী মহাজন কই আজকাল দেশগাঁয়ে? ঋণসালিশী আর মহাজনী আইন তাদেরকে কাবু করেছে। তবে যদি খাই-খালাসী দাও, দেখতে পারি। তাতে সোনামদ্দি রাজি হতে পারে না। তাহলে তাকে জমির দখল ছেড়ে দিতে হয়। তা কি করে চলে? তা হলে যে আমিরন জেনে ফেলবে।

অগ্রিম পাট্টা নেবার লোক আছে। ওয়াদা করে নগদ খাজনায় লাগিয়ে একথোকে বেবাক টাকা নিয়ে নাও আগাম। কায়েমী প্রজা নয়, ওয়াদা অন্তে জমি আবার ফেরৎ পাবে। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের জন্যেও জমির উপরে রায়ত-বর্গাইত সইতে পারবে না আমিরন। অশান্তি করবে। চোখের জলে নিবিয়ে ফেলবে আখার আগুন।

এখন শুধু সাফ-কবালার দিন। যদি বল জমি বেচব, রায়তি স্বত্বের জমি, কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। ঢোল দিতে লাগবে না, দেশবিদেশের লোক এসে হাজির হবে। কিন্তু জমিই যদি বেচে ফেলল তা হলে থাকল কী? আপিলও যদি সে পায়, সে কেবল রায়ই পাবে, জমি পাবে না।

এক উপায় শুধু আছে। রায়তি স্বত্ব বেচে ফেলে তার তলায় ফের কোলরায়তি বন্দোবস্ত নেওয়া। জমিতে জমি রইল কাবেজের মধ্যে, শুধু স্বত্বের যা একটু বরখেলাপ হল। স্বত্বের কারিকুরি অতশত বুঝবে না আমিরন। আমল-দখল ঠিক থাকলেই সে খুশি। বছর-বছর খাজনা টানতে হবে বটে, তা জমির দোয়ায় আটকাবে না। জানতে দেয়া হবে না আমিরনকে। সালিয়ানা খাজনা দিয়ে যেতে পারলে কেউ আঁচড় কাটতে পারবে না জমিতে। তাদের ভোগ-তছরুপ ঠিক থাকবে।

আশ্চর্য, সহজেই খদ্দের পাওয়া গেল। আপিলের আদালতে স্বত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার আগে কেউ কিনতে চাইবে না এই সবাই আন্দাজ করেছিল। কিন্তু যুবনালি এল এগিয়ে। মোলায়েম ভাবে বললে, 'আমি নিতে রাজি আছি। জমি নিয়ে অমন ফটকা খেলি। যদি আপিলে সোনামদ্দি ঠকে, আমিও না-হয় ঠকব। সরল কিস্তিতে শোধ করে দেয় দেবে, না দেয় তো মারা পড়ব না।'

নগদ তিনশো টাকায় কিনল যুবনালি। দশ টাকা জমায় কোলরায়তি পত্তন নিল সোনামদ্দি। কাবালা হল। কবুলতি হল। জমি রইল সোনামদ্দির নিজ চাষে।

আমিরন টুঃ শব্দটিও জানতে পেল না। দাওয়া ধান আগের মতই আঁটি বেঁধে এল তার উঠোনে। ধান ঝাড়ল, ধান সারল নিজের হাতে। এবার আগের মতই ধান কাঁড়বে ঢেঁকিতে। পাড়ার গরিব চাষানীরা আসবে তার ধানের খিদমতে। একসঙ্গে ধান ভানার গান গাইবে তারা।

খবর এল, আপিলেও সোনামদ্দি জিতেছে।

আমিরন উছলে উঠল : 'এবার কী খাওয়াবে খাওয়াও। বাউ-খাড়ু গড়িয়ে দাও নতুন করে, গড়িয়ে দাও পাশি-মাকড়ি। এবার একখানা শান্তি-পুরী তাঁতের শাড়ি কিনে দাও।'

কিন্তু সোনামদ্দির মন খারাপ। বললে, 'অনেক তত্ত্বতাউত করেছি বলেই না জিততে পারলাম। সবচেয়ে বড় উকিল লাগিয়েছি। টানাটানি করে আপিল রেখেছে খোদ জজসাহেবের কামরাতে। বহুৎ টাকা খরচ হয়ে গেছে।'

কোনো কথা আর গায়ে মাখে না আমিরন, দেখে না তলিয়ে। বললে, 'হোক খরচ, জমি তো আমাদের থাকল। লক্ষ্মী তো বাঁধা রইল ঘরের কানাচে। পাকাপোক্ত স্বত্বে তো কায়েম হলাম। যার জমি আছে তার ভাত আছে। যার ভাত নেই তার জাতও নেই।'

কিন্তু সোনামদ্দি কী করে বলে তার সত্যিকারের হারের কথা? মামলায়

সে নিচু হল না বটে' কিন্তু জমির স্বত্ব দিল নিচু করে। সব সময়ে ভাঙা-নদীর মুখে ছাড়া-বাড়ির মত বসে থাকবে এখন থেকে। ফুকো, ঠুনকা স্বত্ব। দায়রাহিতের একটা নুটিশ জারি হলেই ফক্কিকার। এক সন খাজনা না দিলেই ডিক্রি, আর ডিক্রির টাকা তিরিশ দিনের মধ্যে না দিলেই উৎখাত।

কিন্তু তা না হলে টাকার সে জোটপাট করত কি করে? মোকদ্দমা চালাত কি করে? স্বত্ব সাব্যস্ত করত কি করে?

হুঁশিয়ার থাকবে সব সময়। যুবনালি দেবতার মত লোক, সে কখনো দিললাগি করবে না। অনেক জমি আছে তার, এ উনিশ গণ্ডার জন্যে তার লোভ নেই। হয়তো বা কবালার পণ সুদসমেত ফেরৎ পেলে সে স্বত্ব ফিরিয়ে দেবে, ফির-বিক্রি করবে। তা না দিক, ঘোর দুর্দিনে কিস্তি খেলাপ হলেও উচ্ছেদ করে দেবে না।

কিন্তু শুনতে পেল যুবনালি জলিল মুন্সির বেনামদার। কবালার টাকা যুবনালি দেয়নি, জলিল মুন্সি দিয়েছে। তার হিসাবের খাতায় ঐ তারিখে ঐ টাকা খরচ লেখা। কবালাও এখন তার হেপাজতে। শুধু তাই নয়, যুবনালি জলিল মুন্সির বরাবর মুক্তিপত্র করে দিয়েছে। মুক্তিপত্রে কবুল করেছে কবালার স্বত্ব জলিল মুন্সির।

ফল দাঁড়াল এই, জমিতে সোনামদ্দি কোর্ফা প্রজা' আর জলিল মুন্সি তার মুনিব। বছর-বছর তার দশ টাকা খাজনা। আমিরন শুনতে পেলে গাঙে ডুবে মরবে।

সোনামদ্দির শরীরে-মনে সুখ নেই। খেতে-মাখতে আহ্লাদ নেই। তামুকে-বিড়িতে ঝাঁজ নেই।

'কেন, তোমার কী হয়েছে? মনের মধ্যে যেন কী ভার বেঁধে বেড়াচ্ছ! রাগ-রঙ্গ করে আর কথা কও না আমার সঙ্গে!'

জোর করে হাসল সোনামদ্দি।

বললে, 'বা, বয়স বাড়ছে না দিন-দিন?'

'সত্যি বলো তো' জমির কিছু করেছ?'

'বা, জমির কী করব? আমাদের যেমন জমি তেমনি আছে।'

'বেচা-বাঁধা নেই তো কোথাও?'

'বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি। জমি রইল আমাদের নিজ চাষে, ধান আমরা গোলাজাত করছি, আউশ বুনলাম এ বছর, জমি বেচা-বাঁধা হয়ে গেল?'

'না, জমি যদি তোমার ঠিক থাকে, আমি যদি তোমার ঠিক থাকি' তবে তোমার আর দুঃখ কী! তবে তুমি কেন মন ভার করে থাক?'

'না গো বউ না, জমি ঠিক আছে। মানুষই আর ঠিক নেই।'

এক কিস্তিও খাজনা খেলাপ করে না সোনামদ্দি, ঠিক জলিল মুন্সির তশিলদারকে পেঁৗছে দিয়ে আসে। রসিদ নেয়। সালিয়ানা হলে দাখিলা আদায় করে। যাতে খাজনার বকেয়ায় না উচ্ছেদের আর্জি পড়ে তার নামে।

আর, উচ্ছেদের আর্জি পড়লেই বা কি, ডিক্রির তিরিশ দিনের মধ্যে টাকা দিয়ে দিলেই খালাস। শুধু আমিরন না টের পায়।

জলিল মুন্সি সে-পথে গেল না। নিজে খাজনা বাকি ফেলে নিজের রায়তিস্বত্ব নিলাম করালে। কেনালে চাচাত বোনাই দরবার মোল্লাকে দিয়ে। টাকা দিলে নিজে। নিলাম ইস্তাহার গোপন করলে। ঝাঁপিয়ে পড়ল সোনামদ্দির উপর। দায়রহিতের নুটিশ নিয়ে। সোনামদ্দির কোলরায়তি বিলোপ হয়ে গেল।

এবার সোনামদ্দির দখল জবর-দখল বলে সাব্যস্ত হতে দেরি হল না। জলিল মুন্সি ঘর ভেঙে খাসদখলের ডিক্রি পেল একতরফা।

এল দখল জারির পরোয়ানা। ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে যাও হালট ধরে। পাঁচ দোরের কুকুর হয়ে।

'এ সব কী?' আমিরন চোখে আগুনের হলকা নিয়ে তাকাল সোনামদ্দির দিকে।

'তোকে ফতুর করে দিয়েছি, আমিরন। জমির জন্যে মামলা করলাম, মামলার জন্যে জমি গেল। পথের থেকে নতুন করে আবার আমাদের আরম্ভ করতে হবে।' সোনামদ্দির চোখ ছলছল করে উঠল।

রাস্তায় নেমে এল তারা মহবুবের হাত ধরে। বাড়িঘর ভূমিসাৎ হয়ে গেল চোখের সামনে। জমির দিকে তাকাল। মনে হল যেন গৃহহারার মত তাকিয়ে আছে।

কোথায় আর যায়! আতুর-এতিমের জন্যে কোথায় কোন মুসাফিরখানা! কে তাদেরকে আশ্রয় দেবে?

জলিল মুন্সিই তাদেরকে আশ্রয় দিল। জমিতে সোনামদ্দি হালিয়া খাটবে আর বাড়িতে আমিরন দাসী-বাঁদী হবে।

উপায় কি। জমি যখন নেই তখন ভাত নেই। আর যার ভাত নেই, তার জাত কোথায়!

'আমিই তোকে পথের কাঙাল করলাম।' বলে সোনামদ্দি।

'আমার জন্যে তুমি ভাবো কেন? জমির জন্যে ভাবো। আমার চেয়েও জমির অনেক দাম বেশি।'

বেশি দিন থাকতে হল না সে-বাড়ি। আমিরনকে জলিল মুন্সি নিকা করলে। মহল্লার মোল্লা এসে কলমা পড়াল।

সোনামদ্দি হতবুদ্ধির মত বলে, 'বা, তালাক দিলাম কখন?'

'ঐ হয়েছে তোমার তালাক দেওয়া। ওর কাছে নিকা বসে জমি আবার ফিরিয়ে দিলাম তোমাকে। এই দেখ কবালা।' আমিরন কবালা দেখাল।

জলিল মুন্সিকে দিয়ে ফির-বেচার কবালা করিয়ে নিয়েছে আমিরন। রেজেস্ট্রি হয়ে গিয়েছে। রায়তি স্বত্ব আবার চলে এসেছে সোনামদ্দির দখলে। ঘর তুলে দিয়েছে নতুন করে।

'আর তুই?'

'আমিই কবালার পণ। আমার জন্যে মন খারাপ কোরো না। আমার চেয়ে তোমার জমির অনেক দাম বেশি। আমি গেলে কী হয়? কিন্তু জমি তো তোমার ফিরে এল। তোমার জমির গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারল না।'

'মহবুব?'

'যদি রাত্রে খুব কাঁদে, চুপি-চুপি দিয়ে আসব তোমার কাছে।'

৬৫। আর্দালি নেই

'আপনি এখন কোথায়? আলিপুরে?' রাস্তায় চকিতে দেখা, চকিতে প্রশ্ন করল সুরঞ্জন।

নীলাম্বর হয়তো শুনতে পায়নি, চিনতেই পারেনি হয়তো।

সুরঞ্জন কাছে ঘেঁষে এল। মুখের দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলে, 'কি, আলিপুরেই আছেন তো?'

'হ্যাঁ—', পাশ কাটিয়ে ভিড়ের মধ্যে সরে পড়ল নীলাম্বর।

এই যে, ভালো তো? এমনিধারা একটা হঠাৎ দেখার পথিক প্রশ্ন। চাকুরের ক্ষেত্রে—কোথায় আছেন, কোন পোস্টে অথবা কোন ডিপার্টমেন্টে? সেক্রেটারিয়াটে হলে, রাইটার্সে, না, আত্মহত্যারটায়?

সরে যেতেই নীলাম্বরের মনে হল সুরঞ্জন না? এক সঙ্গে ছিলাম না যশোরে?

তবে ওর হাউ ডু ইউ ডু-র উত্তরে হাউ ডু ইউ ডু তো বলা হল না!

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সুরঞ্জনকে ধরল নীলাম্বর। জিগগেস করল, 'তুমি তো এখানেই? কোন ডিপার্টমেন্টে?'

'প্যাঙ্গস অফ চাইল্ড বার্থে।' হাসল সুরঞ্জন।

'তার মানে?'

'লেবারে!'

চলে যাচ্ছিল, কি মনে করে আবার ফিরল নীলাম্বর। সরাসর সুরঞ্জনের হাত চেপে ধরল। বললে, 'আমাকে দেখে মনে হয় আমি এখনো আলিপুরে আছি?'

'বা, আপনিই তো বললেন—'

'হ্যাঁ, বললুম বৈ কি। বলতে ভালো লাগে। না বলতে পারলে নিঃস্ব-নিঃস্ব মনে হয়। সেই যে হিটলার বলেছিল—'

'কী বলেছিল?'

'বলেছিল, যদি মিলিটারি পোশাক পরা না থাকে উলঙ্গ দেখায়।'

'তার মানে, আপনি'—শোক অনুমান করলে যেমন হয়, সুরঞ্জনের চোখের দৃষ্টি ধূসর হয়ে গেল।

'হ্যাঁ ভাই, রিটায়ার করেছি।'

বেলুন ছিলাম, চুপসে গিয়েছি—এমনি শোনাল।

'আপনার দাদা কোথায়?' কী বলবে বুঝতে না পেরে মামুলি সাংসারিক প্রসঙ্গে প্রবেশ করল সুরঞ্জন।

'দাদা বর্ধমান।'

'বর্ধমানে মানে?' চমকাল সুরঞ্জন।

'মানে, তিনি এখনো সার্ভিসে।'

'সে কি? তিনি রিটায়ার করেননি এখনো?' চোখ কপালে তুলল সুরঞ্জন।

'না, তাঁর বয়স আমার চেয়ে কম।'

সুরঞ্জন হো-হো করে হেসে উঠল, হাসি থামিয়ে বললে, 'কি করে ম্যানেজ করল?'

'এপিঠ-ওপিঠ করে।'

'মানে কোর্টে এফিডেভিট করে।' আদালতী পরিভাষা চট করে ধরে নিল সুরঞ্জন।

'তা ছাড়া আর কি। মিথ্যে এফিডেভিট করেছে বলে যাঁরা ডিপোনেন্টকে জেলে পাঠান তাঁদেরই মধ্যে একজনের এ কীর্তি।'

ইন্টারভিয়ুতে প্রার্থীকে যেমন দেখে তেমনি করে সুরঞ্জন সূক্ষ্মচোখে দেখতে লাগল নীলাম্বরকে। উৎসাহের সুরে বললে, 'আপনার তো সবই আছে দেখছি, কিছুই যায়নি।'

'সবই আছে মানে?' আহতের মত রুখে উঠল নীলাম্বর।

'হ্যাঁ, দেখছি, চোখ ঠিক আছে, দাঁত ঠিক আছে, চুলে—ওকে ঠিক পাক ধরা বলে না, আর,' নীলাম্বরের ডানহাতের কব্জিটা শক্ত করে ধরল সুরঞ্জন : 'সুন্দর সুস্থ শরীর আছে এখনো। প্রশ্ন হচ্ছে, কী হয়ে নয়, কী নিয়ে কত নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলেন চাকরি থেকে। ভালো স্বাস্থ্য যখন আছে, তখন আর কী চাই। আপনি তো রাজা।'

'আমি রাজা!' প্রায় মুখ ভেঙচে উঠল নীলাম্বর ; 'আমার কিছুই যায়নি?'

'মানে ব্যাবৃত্তেন্দ্রিয় হননি তো!'

'তাই বলতে চাও আমার কিছুই যায়নি?'

'আহা, মাইনে—সে তো যাবেই, তার কথা কে ভাবছে? আউট হতে হবে এই নিয়মেই তো খেলা। প্রসব হবে না শুধু বাড়বে এ আইন প্রকৃতিতে নেই।'

'তুমি কী বুঝবে', বুকভাঙা শ্বাস ছাড়ল নীলাম্বর : 'আমার আসল জিনিসই নেই।'

দাদার স্ত্রী মারা গিয়েছে নাকি? না কি কোনো উপযুক্ত পুত্র? মুখ নীরক্ত কালো করল সুরাঞ্জন। ঝাপসা গলায় অনুচ্চে বললে, 'কী নেই?'

দুটি ছোট কথায় প্রচণ্ড হাহাকার করে উঠল নীলাম্বর : 'আর্দালি নেই।'

মুখ গম্ভীর করে সুরঞ্জন নিজের গালে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'তা বটে।'

'ভাবো কার্তিক আছে, ময়ূর নেই।'

'না, না, ময়ূর নয়, ষাঁড়। ভাবুন শিব আছে ষাঁড় নেই।' হেসে উঠল সুরঞ্জন : 'এ তো ভালোই হয়েছে। ভাড় আনতে ষাঁড় পালিয়েছে।'

'তুমি বলো কী!' কাতরতার ছায়া আরো গভীর করে নীলাম্বরের মুখে পড়ল। বললে, 'আর্দালি ছাড়া বাঁচব কি করে। আর্দালি ছাড়া পেনসনী জীবনের মানে কী! আর্দালিই তো চিরকাল হাটে-মাঠে ঘাটে-বাটে বাজারে-বন্দরে পথ দেখিয়েছে, হেট-হেট করে ভিড় সরিয়েছে, চিনিয়েছে কে আসছে পিছনে। সভায় গিয়েছি কেউ চেনে না, আর্দালিকে দিয়ে বুঝিয়েছি, আর সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কেউ-কেউ অতিভক্তিতে আর্দালিকেও সেলাম করেছে। বুঝেছে সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি। শেষদিকে গাড়ি কিনলাম কেন? আমার নিজের জন্যে নয়, আর্দালির জন্যে।'

'আর্দালির জন্যে?' হাঁ হয়ে রইল সুরঞ্জন।

'হ্যাঁ ড্রাইভারের পাশে বসবে বলে। মানে, বসাবো বলে। অমনি বসিয়ে বোঝাবো বলে ভেতরে যাচ্ছেন কে আরোহী, কোন সে কৃষ্ণবিষ্ণু, নইলে শঙ্খচক্র ছাড়া বোঝে কে ভি-আই-পি-কে? সেইবার যে বাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী করলাম গেটে দু-দুটো উর্দিপরা আর্দালি রাখবার সাহসে। আর্দালি দেখে বুঝবে লোকেরা ভিতরে আছেন কে বিদগ্ধ। এমনি কনস্টেবল দাঁড় করাও লোকে চটবে, সাজাগোজা আর্দালি দাঁড় করাও গদগদ হবে। মঠে মন্দিরে যেতে হলেও আর্দালিকে নিয়ে গেছি। কত খাতির কত আসুন-বসুন। এখনও যাই, আর্দালি নেই, তাই আর কেউ পোঁছে না, এ-কে-এল-গেল কেউ বলে না ঘুণাক্ষরে। বুকের আস্ত একখানা হাড় চলে গেলেও বোধ হয় সইত। আর্দালিই তো আমাদের সাইনবোর্ড, লেপাফার ঠিকানা, টিকির জবাফুল।'

'ও জঞ্জাল গেছে, ভালোই হয়েছে। ঝাড়া হাত পা হয়েছেন।' গুমোটের নয়, হালকা হাওয়ার গলায় বললে সুরঞ্জন : 'আর্দালি আর কী! আপনার কনস্ট্যান্ট ওয়াচার, আপনার বিরুদ্ধে বেনামী চিঠি, আপনার বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল মামলায় উইটনেস নম্বর ওয়ান। ঐ লাগানো-ভাঙানো বিভীষণের কবল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তো আয়ু বেড়ে গিয়েছে আপনারই।'

'বেড়ে গিয়েছে! কী যে বলো!' যুক্তিতে এতটুকুও উদ্দীপ্ত হল না নীলাম্বর। ক্লান্ত ঘোলাটে মুখে বললে 'লাইফ-ইনসিওরের পলিসি একটা

ম্যাচিওর করেছে' কাগজপত্র পাঠাতে হবে রেজেস্টি করে। প্যাক-ট্যাক করে সব ঠিক করলুম, কিন্তু, হায়, পোস্ট করবে কে? ভুলে কলিং-বেলএর বদলে টেবলের উপর থাবা মারলুম। বাজল না, কেউ দাঁড়াল না এসে প্রত্যুত্তরে। সুরঞ্জন,' নীলাম্বর ঘন হয়ে প্রায় কানের কাছে মুখ আনল : 'কত ঘন্টা তুমি শুনেছ, মন্দিরের ঘন্টা, গীর্জের ঘন্টা, ছুটির ঘণ্টা, গরুর গলায় ঘণ্টা' কোনো খেলা শুরু হবার আগেকার ঘন্টা, নীলেমের ঘন্টা—কিন্তু সত্যি করে বলো তো কলিং-বেলএর ঘন্টার মত ঘন্টা আছে?—যখন সে ঘন্টার উত্তরে দাঁড়াবে এসে আর্দালি।'

'আজকাল আর অত দাঁড়ায় না।' বললে সুরঞ্জন : 'কলিং-বেল টিপছেন তো টিপছেন, ঠুকছেন তো ঠুকছেন, ও প্রান্তে চাঞ্চল্য নেই। ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠলেও নয়। টুলে, কোথাও বা দিব্যি চেয়ারে বসে বাবু ঘুমোচ্ছেন। আর যদি দুজন থাকে তো ঠেলাঠেলি করছেন পরস্পরে, তুই যা না' তুই যা। শেষে মাঝে মাঝে নিজেকে উঠতে হয় আর্দালি ডাকতে, যেমন কখনো কখনো মামলার ডাক হলে মক্কেলকে খুঁজে আনতে ছুটতে হয় উকিলকে।' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সুরঞ্জন।

অত হাসিতেও নীলাম্বরের দুঃখের মেঘ উড়ে গেল না। বললে, 'চাকর তো সর্বক্ষণই বাজারে আর ছেলেরা পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এসে এখন গ্রেস মার্কের জন্যে ঘুরছে। তাই নিজে গেলাম পোস্টাপিসে। চার-চারবার লাইন দিতে হল।'

'সে কি?' চার-চারবার?'

'প্রথম লাইন কত স্ট্যাম্প লাগবে তার হিসেবের জন্যে। দ্বিতীয় লাইন টিকিট কেনবার জন্যে। টিকিট তো কিনলাম, এখন সে টিকিট লাগাই কী দিয়ে? হ্যাঁ, ঐ দেখুন, জলের লাইন। জল লাগিয়ে টিকিট সাঁটার লাইন। তৃতীয় লাইন ছেড়ে আবার কাউন্টারে লাইন, সেই লাইন, সেই প্রথম লাইন যেটা তখন চতুর্থ, চতুর্থ লাইন ধরলাম। সেই লাইন তখন মাইল খানেক লম্বা হয়েছে। সকালে দশটায় গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরলাম দেড়টায়। বিজ্ঞানের ফলে ওষুধে-ভিটামিনে যে আয়ু বেড়েছিল তার বেশি ক্ষয় হয়ে গেল এই লাইন দিয়ে দাঁড়ানোয়।'

'কিন্তু চাকরিতে থাকলে আপনি ভেবেছেন আপনার আর্দালি ঐ চিঠি পোস্ট করত পোস্টাপিসে গিয়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে?' গাছের তলা থেকে সুরঞ্জন নীলাম্বরকে ফাঁকায় টেনে আনল : 'বলত এ আপনার পার্সন্যাল কাজ, এ আমার করার কথা নয়।'

'বা' আমি ইনটারপ্রিটেশান দিতাম, আমি সরকারী কর্মচারী বলেই আমার এই ইনসিওরেন্স, সরকারী কর্মচারী না হলে প্রিমিয়ম দিতুম কেমন করে? সুতরাং এই ইনসিওরেন্স-সংক্রান্ত কাজ নিশ্চিত সরকারী কাজ—' বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের কিল মারল নীলাম্বর।

মৃদু-মৃদু হাসল সুরঞ্জন। বললে, 'ওদের ইনটারপ্রিটেশান আরো সূক্ষ্ম। বলত, আমরা যে অফিসের কর্মচারী এই টাকা সেই অফিসের বিষয় নয়, অতএব বেল মারবেন না, ডাকবেন না আমাদের। মশাই অফিসে যাব, আর্দালি ট্যাক্সি এনে দেবে, কিন্তু হাওড়া স্টেশনে যাব, আনবে না। বলবে এ আপনার পার্সন্যাল ম্যাটার। সেদিন কী হল শুনুন। আর্দালিকে বললুম, এক পট চা এনে দেবে? বা এনে দেব বৈকি। আপনি অফিসর, আপনার চা আনব না? দিব্যি নিয়ে এল ট্রে সাজিয়ে। কাজ করছিলুম, বললুম, এক কাপ তৈরি করে দাও। বিশ্বাস করবেন? দিল না তৈরি করে। বললে, এ সরকারী নয়, এ আপনার পার্সন্যাল। শিবের বাহন কি শুধু ষণ্ড মশাই? পাষণ্ড। আপনি গাছ দেখেছেন তার ছায়া দেখেছেন। বৃক্ষশাখায় পক্ষী দেখেননি? যে পাখি বলা কওয়া নেই হঠাৎ আপনাকে পথে বসিয়ে উড়ে পালায়! এ ভালোই হয়েছে দাদের আনন্দ গিয়েছে। নইলে কোন কাজটা সরকারী কোন কাজটা ব্যক্তিগত প্রতিপদে এর চুলচেরা হিসেব করতে গিয়ে আরেক দুশ্চিন্তা, আরেক থ্রম্বসিস।'

'না, না, তা কেন সবই কি ঐ এক রকম?' নীলাম্বর যেন হঠাৎ অতীতে চলে যেতে চাইল, আর যে দিন যায় তাই সোনার দিন। বললে, 'প্রথম যখন সেই সার্কুলারটা এল পাশে সিনেমা দেখতে পাবে না, মফস্বলে গিয়ে প্রেসি-ডেন্টের বাড়িতে উঠতে পাবে না, আর্দালিকে লাগাতে পারবে না বাড়ির কাজে. নিজের কাজে, তখন সটান গেলুম সাহেবের কাছে।'

'তখন কে সাহেব?'

'লালমুখো টমসন।'

'কী নিয়ে গেলেন?'

'মফস্বলে কে বা যায়, আর সিনেমায় ঐ সব অধম চিত্রই বা কে দেখে। গেলুম আর্দালির বিষয় নিয়ে। বললুম, সাহেব তুমি যদি এক টিন সিগারেট আনতে বলো আনবে, সেটা বাজার করা হবে না। কিন্তু আমি যদি বলি শালপাতায় করে ভিজে তামাক নিয়ে এস আমার গুড়গুড়ির জন্যে, আনবে না, বলবে, বাজার করা বারণ হয়েছে সার্কুলারে। আমার জন্যে কাটা মাছ কিনে আনাটা বাজার, তোমার জন্যে টিনড ফিস কিনে আনাটা বাজার নয়। সাহেব ভালো ছিল, হেসে উঠল বললে, এক কাজ করো। বই বওয়াও।'

'সে আবার কী?'

'সাহেব বললে, উকিলদের বলো, খুব করে নজির সাইট করতে। বি-এল-আর থেকে এ-আই-আর—যত রাজ্যের চর্বিতচর্বণ। উকিলদের আর তা বলতে হবে না, বললুম সাহেবকে, নজর আর নজির—এ দুই নিয়েই তো আছে উকিল। আর আইন? আইন গিয়েছে পাইন বনে, হাওয়া খেতে। সাহেব আরেক কিস্তি হাসিল, বললে, সেই সব নজিরের পাহাড়, বইয়ের গিরি গোবর্ধন বওয়াও ওদেরকে দিয়ে। ওরা বুঝুক, কোন বাজার হাল্কা।'

'আমরা তো ওভারল্যেট করি, ফাইল আপ টু ডেট করে রাখি।' চালাক-চালাক চোখ করে বললে সুরঞ্জন : 'সুপিরিয়র ভাবে কী এফিসিয়েন্ট, আর—আর আমি জানি অন্তরের যন্ত্রণা। আদা জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে আর আর্দালি জব্দ "বসাইয়া রাখিলে।"

'আমি তখন চৌকিতে, আমার আর্দালি মহীমোহন আমার বাড়িতে রাঁধে, খায়, থাকে। আমি বললাম, মহীমোহন, সার্কুলার এসেছে, তোমার আর আমার এখানে রান্না করা চলবে না, সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ খাওয়া-থাকাও চলবে না।' নীলাম্বর অতীতের কথা বলতে গিয়ে একটু বুঝি বা আর্দ্র হল অলক্ষ্যে।

'কী বলল মহীমোহন?' সুরঞ্জন ধরিয়ে দিল।

'মাটিতে পড়ে আমার দু পা জড়িয়ে ধরল। বললে, বাবু, আমি যদি এখন আলাদা ঘরভাড়া করি, নিজের খাওয়া-খরচ নিজে চালাতে যাই, সদরে, ইস্কুলে আমার ছেলেটা পড়ছে, সে আর মানুষ হবে না। আমার সমস্ত স্বপ্ন ধুলো হয়ে যাবে। সদরে মফস্বলে দুটো সংসার চালাই, আমার কি সেই মুরোদ আছে?'

'তারপর? আপনি সার্কুলার অমান্য করলেন?' প্রশ্নে একটু বুঝি বা বিদ্রূপ মেশাল সুরঞ্জন।

'আমি ধমকে উঠলাম। বললাম, সরকারী হুকুম তামিল করতেই হবে আমাকে। আর আমার এখানে থাকা চলবে না তোমার। তুমি থাকো, আর কেউ বেনামীতে নালিশ করে দিক। তখন আমি কৈফিয়ৎ দিয়ে মরি। আমার প্রমোশন নিয়ে টানাটানি পড়ুক। হবে না—তুমি অন্যত্র আস্তানা নাও।'

'মহীমোহন তবুও পা ছাড়ে না—তাই না?' কথার সুর বুঝে আন্দাজে এগোল সুরঞ্জন।

'তার চেয়েও বেশি। ছেলের দোহাই দেয়। বলে, ছেলেটাকে মানুষ করব বড় করব। এই আমার একমাত্র সাধ বাবু—'

'তারপর কী করলেন?'

'বললুম বেশ, তুমি থাকো আমার বাড়ি, যেমন খাচ্ছিলে খাও দুবেলা, কিন্তু তুমি রাঁধতে পারবে না। তোমাকে দিয়ে বাড়িতে কাজ না করালেই তো হল। তোমাকে যদি আমি এমনি খেতে-থাকতে দিই তা হলে তো সরকার আপত্তি করতে পারবে না। এমন তো কোনো সার্কুলার নেই যে খেতে-থাকতে দিলে কাজ—রান্না করিয়ে নিতে হবে, তবে আর ভয় কী, কথা কী। তুমি থাকো, খাও, কিন্তু খবরদার, রান্না করতে পারবে না। রান্না কী, কুটো কেটে পারবে না দুখান করতে। বাবুর মত থাকবে।'

'থাকল?'

'থাকল। কিন্তু তার সে কী যন্ত্রণা, তোমাকে কী বলব সুরঞ্জন। খাচ্ছে

থাকছে অথচ তৃণ কাজ করতে পারছে না সার্কুলারের শাসনে—সে দিনে-দিনে শুকিয়ে যেতে লাগল। সন্দেহ হতে লাগল, খায় না বোধহয় পেট ভরে। বোধহয় পুরো রাত ঘুমোয় না। তারপর যখন বদলি হয়ে গেলাম, তখন—' থামল নীলাম্বর।

'তখন খুব কাঁদল?' হাসল সুরঞ্জন।

'শুধু ঐটুকু বললে কিছুই বলা হল না। মৃত্যু নয়, আঘাত নয়, বাড়ি-ঘর বা চাকরি চলে যাওয়া নয়, একটা জ্যান্ত মানুষের জন্যে আরেকটা জ্যান্ত মানুষ, অনাত্মীয় মানুষ যে কাঁদতে পারে এ কখনো ভাবতে পারতুম না।'

'ও বুঝি আপনার জন্যে কাঁদছে? ও কাঁদছে ভাতের জন্যে।'

'ভাতের জন্যেই তো কাঁদবে। ভাত তো অমনি আসে না, কোনো মানুষের হাত দিয়েই তো আসে।' নীলাম্বর সামলাল নিজেকে: 'কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে এলাম। হাকিমের জন্যে কে কাঁদে, আর্দালির জন্যেই হাকিমের কান্না। রাম যে হা-লক্ষ্মণ হা-লক্ষ্মণ করেছিল, তার মানে কেঁদেছিল: হা-আর্দালি হা-আর্দালি বলে।'

'সরকারের উচিত রিটায়ার্ড অফিসারের সঙ্গে রিটায়ার্ড অর্ডার্লি ট্যাক করে দেওয়া।' হাসতে হাসতে বললে সুরঞ্জন, 'এটাই সার্ভিসের কণ্ডিশন করে দেওয়া।'

কদিন পরে সকাল বেলা ছোট-ছেলে উপরে এসে বললে নীলাম্বরকে, 'নিচে তোমাকে কে ডাকছে।'

'কে?'

'আর্দালি। আর্দালির মত পোশাক।'

কংসের কাছে কে শোনাল কৃষ্ণনাম! এ কী অকরুণ! তাড়াতাড়ি চটি উলটো-উলটি করে পরে ফের সামলে-শুধরে, দ্রুত পায়ে নিচে নামল নীলাম্বর।

এই তো সেই দিব্যকান্তি রক্তবাস স্ফীতবদ্ধপরিকর মোহনমূর্তি। তাপ-তৃষাহর অমৃতের সরোবর। এই তো সেই প্রার্থিত-প্রতীক্ষিত।

এ কি, থলেতে করে কিছু শীতের তরকারি নিয়ে এসেছে—কপি বেগুন কড়াইশুঁটি টোম্যাটো। শীর্ণ হলেও কতগুলি কলা।

'মধ্যমগ্রামে একটু বাড়ি করেছি। সঙ্গে একটু তরকারির খেত। ছেলেটা মানুষ হয়েছে। কলেকটারিতে ঢুকেছে কেরানি হয়ে। শ্রীচরণে কিছু দিতে না পেরে শান্তি পাচ্ছিলাম না।' লোকটা নীলাম্বরের পায়ের কাছে নুয়ে পড়ল।

'এ কি, কে তুমি? এসব কেন দিচ্ছ?' আগুন দেখলে যেমন করে তেমনি পিছু হটল নীলাম্বর।

'আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না? আমি মহীমোহন।'

'ও! মহীমোহন? তা—তুমি আছ এখনো চাকরিতে? বা, বেশ, বয়েস

ম্যানেজ করতে পেরেছ? কিন্তু আমার কাছে আর এসেছ কেন? আমি তো আর চাকরিতে নেই। আমি রিটায়ার করেছি

'তা জানি। জানি বলেই তো এসেছি, পেরেছি আসতে। নইলে চাকরিতে থাকলে এসব কী পারতুম দিতে? সাহস পেতুম? আমি আপনার সেই আর্দালি।' স্নিগ্ধ মুখে তাকাল মহীমোহন।

'কিন্তু জানো, আমার আর আর্দালি নেই।' নীলাম্বর বললে।

'না থাক। কিন্তু আমি তো আছি।'

৬৬। ডিস্‌ক্

আমার স্ত্রী একটি রত্ন। সদ্য-কেনা চিনে-মাটির টি-পটের ঢাকনিটা সেদিন ভেঙে গেলো, স্ত্রী ফরমাজ করলেন, এক্ষুনি আরেকটা কিনে আনতে হবে। কিনে আনলুম একটা পোর্সলেনের, ভাবলুম চায়ের রং ও স্বাদ স্ত্রীর ওষ্ঠাধরের চেয়েও আকর্ষণীয় হবে। কাকস্য পরিবেদনা, পোর্সলেনেরটা নিরাপদে উঠলো গিয়ে বাক্সোয় আর সেই ভাঙা পটের উপর একটা বার্লির কোটোর কাপ চাপা দিয়ে তিনি বেমালুম চা ভেজাতে লাগলেন। একদিন অভিযোগ করে বললেন, 'বাইরে ভদ্রলোকরা আসে, এ-সব বাজে, মোটা, ভারি পেয়ালায় চা দিতে আমার লজ্জা করে।' তাই সেবার ক্যাজুয়েল লিভ নিয়ে কোলকাতা গিয়ে মার্কেট থেকে আধ-ডজন ফুল-পাড় খাঁটি বিলিতি পেয়ালা কিনে আনলুম। স্ত্রী বললেন, 'সুন্দর প্যাক করে দিয়েছে, ওগুলো আর খুলো না।' বাইরের ভদ্রলোকদের আশায় একসপ্তাহ অপেক্ষা করলুম, কারু দেখা নেই। পরে একদিন সকাতরে বললুম, 'দয়া করে আমাকেও তো ভদ্রলোক ভাবতে পারো।' স্ত্রী ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন, 'আগে এ-পেয়ালাগুলো ভাঙুক!' আর মোটে দিন দশ-বারো বাকি আছে, ইনকামট্যাক্স-অফিসারের মেয়ের বিয়ে। সেখানে ওঁকে যেতেই হ'বে, কিন্তু যেটা ওঁর সব চেয়ে জাঁকালো শাড়ি সেটা নাকি ময়লা, ভাঁজভাঙা। তিয়াত্তরখানা শাড়ির উপর নূতন শাড়ি কেনাবার বায়না করতে বোধহয় তাঁর একটু বাধলো, তাই তিনি বললেন, 'এটাকে ড্রাইক্লিনিং করে আনতে হবে।' রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিলুম কোলকাতা, একমুঠো টাকা ফেলে ভি, পি, ছাড়িয়ে নিলুম। ঠিক বিয়ের দিন দুপুরে এসে পৌঁছুলো শাড়িটা, ভাবলুম, শাড়ির অপূর্ব বর্ণচ্ছটা দেখে ভাবলুম, স্ত্রীকে বোধকরি আর নিজের স্ত্রী বলে ভাবতে পারবো না। কিন্তু যখন গাড়িতে গিয়ে উঠবো, চেয়ে দেখি, ও-শাড়িতে হাত না দিয়ে উনি একখানা বুটিদার ঢাকাই শাড়ি পরে নিয়েছেন। অবাক হয়ে বললুম, এ কি!' উনি স্নিগ্ধহাস্যে বললেন, 'কী চমৎকার ধোলাই হয়েছে শাড়িটার,

নগদ কতগুলো টাকা, পরলেই তো ভাঁজ ভেঙে একাকার হয়ে যাবে। তার বিয়ে-বাড়ির ভিড়!' তারি জন্যে, বলা বাহুল্য, আমি আমার জামা-কাপড় বার করে দেবার জন্যে ওঁকে অনুরোধ করতুম না। কেননা আমি জানতুম, যে-ধুতির ঝুলটা খাটো ও জমিটা মোটা ও যে-পাঞ্জাবির পকেটের দিকটা ছেঁড়া ও ঘাড়ের দিকটা দাগ-ধরা খুঁজে-পেতে তাই তিনি সংগ্রহ করে আনবেন।

তাই তিনি যখন সেদিন একটা পোর্টেব্ল্ গ্রামোফোন কিনলেন ও অব্যবহিত পরেই একটা দামি কাপড়ের ঢাকনি করতে বসলেন, ভেবেছিলুম ওটাও সযত্নে তোলা থাকবে, গৃহসজ্জার অন্যান্য আবশ্যিক উপকরণের মতো। কেননা আপনারা জানেন, হোল্ড-অল্-এর পরেই মধ্যবিত্ত মফস্বলে তিনটে জিনিস আমাদের দরকার; এক, পেট্রোম্যাক্স; দুই, সেলাইয়ের কল; তিন, গ্রামোফোন। এই তিনটে জিনিস আমরা বদলির সময় পার্শেলে দিই না, সঙ্গে নিই—এই তিনটে জিনিসই আমাদের পদমর্যাদার সাক্ষী। চাকরির প্রথম বছরেই পেট্রোম্যাক্স, এবং দ্বিতীয় বছরে, অর্থাৎ স্ত্রী যখন কুমারীত্ব থেকে মাতৃত্বে উপনীত হলেন, সেলাইয়ের কল হলো। কিন্তু ও-দুটোর প্রতি স্ত্রীর মোহ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। খোকা যখন বসতে শিখলো অমনি তার পেনি-ফ্রকের ভার পড়লো গিয়ে দর্জির হাতে, আর চাকর যখন উপরোপরি দু-দিন দুটো ম্যান্টল ফাটালো, পেট্রোম্যাক্সটা প্যাকিং-বাক্সের খড়ের গাদার মধ্যে আত্মগোপন করলে। তাই ভেবেছিলুম, গ্রামোফোনটাও দু'দিন পরে মাত্র একটা মেহগনি কাঠের বাক্স-হিসেবেই আমার ড্রয়িংরুমের শোভাবর্ধন করবে।

কিন্তু জগদম্বা আমাকে রক্ষা করুন, আমি ভুল বুঝেছিলুম। দিন নেই রাত নেই, মেজাজ নেই, মর্জি নেই, স্ত্রী নিরন্তর রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। আমার ব্যয়ের স্রোতস্বতীতে গভীর করে একটা খাল কাটা হলো। দেখলুম এ বিষয়ে স্ত্রীর যতোটা উৎসাহ তার এক ভগ্নাংশও সুরুচি নেই—যার-তার যা-তা গান দিনে-দিনে স্তরীভূত হয়ে উঠতে লাগলো। বলতে পারেন, আমি সুরের কী বুঝি, কাকে বলে মালকোষ কাকে বা আশাবরী। কিন্তু কথার একটা মানে হোক, তাতে ঈষৎ কবিতা থাকুক, সবিনয়ে এটুকু তো অন্তত আমি আশা করতে পারি। বলবেন জানি, গানে সুর হচ্ছে প্রাণ, কথা শুধু একটা কঙ্কাল। কিন্তু কঙ্কালেরো একটা আকার চাই নিশ্চয়। প্রেয়সীকে কোনো এক সময় যেমন স্ত্রীতে চলে আসতেই হবে তেমনি সুরকেও সম্পূর্ণতা পেতে হবে কথায়। ছেলে-বেলায় ওয়ার্ড-মেকিং খেলেছি মনে আছে, তেমনি সিনেমা যুগের এ-সব সঙ্গীত-লেখকরা বাছাই-করা কতগুলি কথা কুড়িয়ে-কুড়িয়ে গানের ছড়া তৈরি করছে এবং তাই প্রতিমূর্ত হয়ে উঠছে যত সব ন্যাব গলায় আর গদগদ গলায়। ঝালাপালা হয়ে উঠলুম।

এরি মধ্যে, একদিন আপিস থেকে ফিরেছি, স্ত্রী হঠাৎ অপরিমিত উৎসাহসহকারে বললেন, 'জানো, পাশের বাড়িতে শেফালি রায় এসেছে।'

শেফালি রায়ের সঙ্গে যে আমার এক ফালিও পরিচয় নেই তা আপনারা

সহজেই বুঝতে পেরেছেন, নতুবা আমার স্ত্রী উৎসাহে এতোটা উদার হতে পারতেন না। তাই নির্লিপ্ত গলায় বললুম, 'কে সে?'

'ও মা! শেফালি রায়ের নাম শোন নি?' স্ত্রী আমার দিকে নিতান্তই একটা অবমানসূচক দৃষ্টিক্ষেপ করলেন : 'গেলো মার্চ মাসে যার প্রথম গান বেরুলো বাজারে—রেকর্ড-সেল! কী গলা, কী তার কাজ! শোনো নি তুমি?'

অপরাধীর মতো মুখ করে বললুম, 'না তো। আছে নাকি আমাদের?'

এটাও কিনা জিগেগেস করতে হয়, এমনি একখানা মুখভাব করে স্ত্রী ডিস্‌ক্‌ ঘুরিয়ে দিলেন। মেসিনটা মুহূর্তে গীতবাদ্যমুখর হয়ে উঠলো।

বলতে কি, এই প্রথম আমি অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে গ্রামোফোন শুনতে বসেছি।

গ্রামোফোন-কোম্পানিরা দোকানদারি করতে গিয়ে সাধারণতো এক পিঠ ভালো করে অন্য পিঠে গোঁজামিল দেয়, কিন্তু এর বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়েছে দেখে মন ভারি খুশি হলো। এক পিঠে একটি বিরহব্যথার গান, সকরুণ কাকুতিতে ভরা; অন্য পিঠে মিলনোল্লাসের গান, প্রচ্ছন্ন রক্তিমোচ্ছ্বাসে রোমাঞ্চিত। কী বা সুর, কিছুই আমি অনুধাবন করতে পারছি না, চোখের সামনে দেখছি, হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আরতির আলোকে প্রতিমার মুখের মতো সুরের অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় শেফালি রায়ের মুখ অনির্বচনীয় সুন্দর হয়ে উঠেছে। দেখছি তার মুখে ধ্যানের তন্ময়তা, দু চোখে বিগাঢ় ভাব, উৎক্ষিপ্ত গ্রীবায় সুকোমল শান্তি, শরীরের রেখা ও চূড়া সুরের শিহরণে প্রস্ফুরিত। গলায় এমন উন্মাদনা, এমন বিকিরণ, এমন আত্মদান আর কোথাও দেখিনি। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি লাবণ্য, যেমন স্ফুর্তি তেমনি ভীরতা।

স্ত্রী কানে-কানে বললেন, 'ঐ দেখ, শেফালি রায় জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের গানই শুনছে হাঁ করে।' স্ত্রী ভারি কৌতুক বোধ করলেন।

লজ্জিত বিস্ময়ে তাকালুম জানলার দিকে। এত অত্যল্প সময়ের মধ্যে ই সুদূর মফস্বলে স্বকর্ণে তার নিজের গান শুনে সে ভয়ানক অবাক হয়ে গয়েছে দেখলুম। আত্মহারার মতো আমার দিকে চেয়ে সে হেসে উঠলো। জীবনে এই সে খ্যাতির স্বাদ পাচ্ছে, তাই মুখের উপর নিষ্ঠুর বিতৃষ্ণার সে একটা কাঠিন্য আনতে পারলো না, অপার সারল্যে অনির্বচনীয় হেসে উঠলো। কোনো নবাগতকে কোলকাতা দেখাবার সময় নিজেও যেমন তার :খ নতুন করে কোলকাতা দেখতুম, তেমনি আমাদের কানে ও ওর বহু-দনাভ্যস্ত গানের প্রত্যেকটি কন্ঠরেখাকে সকৌতুকে অনুসরণ করছে।

আশ্চর্য, শেফালি রায়ই একমাত্র ব্যতিক্রম, যার কল্পনার সঙ্গে আকৃতির কটা সামঞ্জস্য পেলুম। নইলে কোনো স্বনামধন্যের সঙ্গে আমাদের দেখা

হোক এ আমরা পারতপক্ষে প্রার্থনা করি না, কেননা বারে-বারেই তাঁদের সামনে গিয়ে দেখেছি আশাভঙ্গ হয়েছে, কেউ সেই কল্পনার ছায়ায় এসেও দাঁড়াতে পারেননি, বরং প্রতিমা বিসর্জন হয়ে এক আঁটি খড় উঠেছে ভেসে। তাই শেফালি রায়ের দিকে তাকাবার আগে ভেবেছিলুম মেয়েটি দেখতে নিশ্চয়ই কালো ও মোটা হবে, কেননা ও-দুটো গুণ বাঙালী গায়িকার 'করোলারি'। কিন্তু যদি বলি, শেফালির দেহই দীপ্ত একটি গীতরেখা তা হলে হয়তো বা অতিরিক্ত করে বলবো, কিন্তু মিথ্যা বলবো না। খানিক আগে তাকে না দেখে শুধু তার গান শুনে তার যে ভাবস্নিগ্ধ মূর্তি কল্পনা করেছিলুম, দেখলুম তার এ-মূর্তি সমস্ত ভাবকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে। দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে মেয়েটি, বছর সতেরো-আঠারো বয়েস, যৌবন একটু দেরি করে এসেছে বলে সমস্ত শরীরে প্রসন্ন একটি লীলার তরলিমা। তার গলা শুনেই বুঝেছিলুম তার লাবণ্যের সঙ্গে একটি সবলতা আছে, কান্তির সঙ্গে তেজ। সেই তেজ দেখলুম তার এই জানলায় উন্মুক্ত দাঁড়িয়ে-থাকায়, প্রায় সম্মোহিতের মতো। হঠাৎ খেয়াল হলো বাজনা আর নেই, সাউন্ডবক্সটা স্ত্রী ক্ষিপ্ত হাতে তুলে নিয়েছেন।

আমার প্রতিবেশীটি এখানকার এক উকিল, শেফালি তাঁর ভাই-ঝি. এখানে ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। উকিলের গৃহিণীকে আমার স্ত্রী দিদি বলতেন বয়েসে বড়ো বলে, আর আমার স্ত্রীকেও তিনি দিদি বলতেন পদে বড়ো বলে, কিন্তু দুই বোনে বিশেষ মাখামাখি ছিলো না। কেন, সেই কারণটা এখানে ব্যাখ্যা করে না বললেও চলবে। কিন্তু শেফালির আসার পর থেকে স্ত্রী তাঁর ব্যবধানটা আর রাখতে পারলেন না বাঁচিয়ে, বেড়া ডিঙিয়ে সটান ও-বাড়ি ঢুকে পড়লেন।

সেদিন সান্ধ্যভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে এসে দেখি আমাদের শোবার ঘরে গানের ছোটখাটো একটি জলসা বসেছে। পাশেরটাই আমার বসবার ঘর. আজকাল যাকে বৈঠকখানা না বলে ড্রয়িং-রুম বলি। সেই ঘরেই এসে আশ্রয় নিলুম, মাঝখানের দরজাটা স্ত্রী চক্ষের পলক ফেলতে-না-ফেলতে বন্ধ করে দিলেন।

শেফালি আমার স্ত্রীকে বললে, 'আমার তো কতগুলি হলো, এবার আপনি একখানা ধরুন।'

বুঝলুম, আমার আসার আগেই শেফালি তার পালা সাঙ্গ করেছে। কত যে হতাশ হলুম, কী বলবো!

'শেফালি আবার অনুরোধ করলে : 'নিন, ধরুন!'

ভেবেছিলুম স্ত্রী তুমুল প্রতিবাদ করবেন, কেননা বিয়ের পর তাঁর মুখে গান শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তবে, আপনারা জানেন, বিয়ের আগে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত মেয়েই দু-তিনটে গান কমা-সেমিকোলন-শুদ্ধু মুখস্ত করে রাখে যেন-পাণিপ্রার্থীদের কারু গীতশ্রুতিস্পৃহা হলে অকারণে না ঠকতে

হয়। মনে আছে স্ত্রীকে তাঁর শেষ কৌমার্যসীমায় দেখতে গিয়ে আমিও তাঁর একটা গান শুনে এসেছিলুম। কিন্তু আপনাদেরকে আগেই বলেছি, গানের চেয়ে কথাংশের দিকে আমার দৃষ্টি বেশি, তাই স্ত্রীকে আমার সেদিন পছন্দ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। দেখলুম তিন বছর আগেকার সেই মর্চে-ধরা গানটা তিনি কন্ঠনালী দিয়ে উদগীরণ করছেন। কমা-সেমিকোলনের আজো হয়তো কোনো ভুল পেলুম না, কিন্তু যা-ই তিনি বলুন, পেলুম না আর তাঁর সেই সুকুমার কৌমার্যের শুচিতা, সেই না-দেখা দেশের মায়াময় তটের স্বপ্ন।

শেফালি প্রচলিত কতগুলি প্রশংসা করলে, কিন্তু স্ত্রী তাকে এত সহজেই নিষ্কৃতি দেবেন না। বললেন, 'এবার আপনি আরেকখানা গান, আপনার রেকর্ডের গান।'

বুঝলুম, আমাকেই শোনাবার জন্যে। কিন্তু আমি গান শুনতে চাই না, দেখতে চাই। রঙকে শোনা ও শব্দকে দেখাই হচ্ছে অনুভূতির চরম।

শেফালির হয়তো আপত্তি হতো না, কিন্তু স্ত্রী একটু আলগা দিলেন না, ভেতরের দরজাটা তেমনি ভেজানো রইলো। শেফালি তার সেই বিরহব্যথার গান ধরলো, করুণ থেকে চলে এলো প্রায় গভীরে। মনে হলো, যাকে নিয়ে আমাদের বিরহ, তার সঙ্গে আমাদের শুধু একটা দরজার ব্যবধান, আর সে-দরজা এমন রাক্ষুসে দরজা নয় যে খোলা যায় না। খোলা যায়, উপসংহারের চিন্তা না করলেই খোলা যায়। আমিও তাই ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলে দিলুম।

শালীনতা আশ্চর্য বজায় রেখে স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'ভেতরে এসে বোসো।'

বসলুম এসে একটা চেয়ারে, লক্ষ্য করলুম শেফালির অঞ্চলটুকু পর্যন্ত বিচলিত হলো না, গানে সে নিজেকে এমনি ঢেলে দিয়েছে। তার গীতালোকিত সেই মুখ পৃথিবীর বলে মনে হলো না। গানের ফাঁকে নিশ্বাস নেবার জন্যে যে সে দ্রুত চেষ্টা করছে, কখনো যে হঠাৎ একটুখানি জিভ বের করে ঠোঁট নিচ্ছে চেটে, কিম্বা বাঁ-হাতে যে বেলো করছে হার্মোনিয়াম, এ-সব নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। নির্জন পার্বতী নির্ঝররেখার উপরে নিশ্চয়ই আপনারা জ্যোৎস্না দেখেছেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন শেফালিকে। নির্ঝররেখা বলছি কেননা শেফালি কৃশ, লীলাঞ্চিত; পার্বতী বলছি, কেননা তার শরীরে একটি ধূসর কাঠিন্য আছে; আর নির্জন বলছি, কেননা তার এখনো বিয়ে হয় নি। আর জ্যোৎস্না, গানের জ্যোৎস্না।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, শেফালির এ-গান আমার একটুও ভালো লাগলো না। আমি ভেবে দেখেছি সব-কিছুর ফুরিয়ে যাওয়াটাই সৌন্দর্য, যা যতো বেশি সুন্দর তার উচিত ততো শিগগির ফুরিয়ে যাওয়া। ডিস্‌ক্‌-এ শেফালির গান তিন মিনিটের বেশি থাকতো না বলেই ইচ্ছে করতো তিন দিন বসে শুনি, আর এখন সেই তিন মিনিটকে টেনে-হিঁচড়ে তেত্রিশ

মিনিটে নিয়ে এলেই বা মারে কে! এত কাজ, এত কসরৎ, এত কুন্তি দেখাবার সময় কোথায় ডিস্‌ক্‌-এ? তাই শেফালি আমাদের ভক্তির প্রশ্রয় পেয়ে নির্বাধ গলা ছেড়ে দিলো।

ভালো লাগলো না। ইচ্ছে হলো, অনেক যখন রাত, শেফালিও যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, চুপি-চুপি ডিস্‌ক্‌টা ঘুরিয়ে দিই। কিন্তু, লাভের মধ্যে স্ত্রীকেই শুধু জাগিয়ে দেয়া হবে।

তারপর শেফালি চলে গেছে এ সহর ছেড়ে; তার বাপের কাছে, কোলকাতায়। তাকে নিয়ে হয়তো কত মজলিস, কত জলসা, কত চা-চক্র। আমরা বড়ো জোর মফস্বলে বসে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা হাটকাতে পারি, মাসান্তে গ্রামোফোন-ডিলারের কাছে গিয়ে জিগগেস করতে পারি; 'শেফালি রায়ের কিছু বেরুলো এ-মাসে?' যদি বলে, 'বেরিয়েছে', খুশি হয়ে কিনে আনতে পারি একখানা। এই পর্যন্ত।

কিন্তু ঘোরতর আশ্চর্যের বিষয়, সেই মার্চ মাসের পর আজ জুলাই মাস পড়লো, শেফালি রায়ের আর গান নেই। অথচ তার একখানা রেকর্ড বাঙলা দেশে এমন এক তরঙ্গ এনে দিয়েছিলো যে আজ তা আপনি অনেক অলি-গলি ঘুরে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের মুখে শুনতে পাবেন।

একদিন স্ত্রী বললেন, প্রায় কারু একটা কলঙ্ক বলার মতো : 'জানো, শেফালি রায়ের বিয়ে হচ্ছে। আজ উকিল-দিদির মুখে শুনলুম।'

খবরটাতে অনুৎসাহিত হবার কারণ নেই, তাই প্রকৃতিস্থ গলায় বললুম, 'ওর ভাবনা কি, গানের জোরেই পাত্র জোগাড় করে নিয়েছে।'

এমনি যেন অনেকেই নিয়েছে স্ত্রী একটা কটাক্ষ করলেন।

কিন্তু যদি বলি, এর পর শেফালির গান আর আমার ভালো লাগলো না, তা হলে, জানি, আপনাদের নিশ্চয়ই সহানুভূতি পাবো। মনে হলো, গানের ছলে এ যেন শুধু ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বলা : 'আমাকে কেউ তোমরা শিগগির বিয়ে করো।'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'থামাও ও-গান। আরো অনেক ভদ্র গান আছে বাড়িতে।'

স্ত্রী ঈষৎ কৌতুকান্বিত হয়ে বললেন, 'সে কী কথা! এ-গানে যে পাহাড় গলে ধারা বেরুতো। ভাবে একেবারে ভোলানাথ হয়ে যেতে।'

'ছাই! গলার ও নির্লজ্জ ন্যাকামো সইতে পারিনে। যেন ঢলে-পড়ার ইচ্ছে।' নিজেই বন্ধ করে দিলুম গানটা। বললুম, 'এর চেয়ে শ্যামা-সঙ্গীতে পুণ্য আছে।'

আমি এটা বিলক্ষণ দেখেছি, অন্য কোনো মেয়েকে নিন্দে করলে মনে মনে স্ত্রী বেশ প্রসন্ন হন, হয়তো ভাবেন অন্তত একটি মেয়ের সংস্পর্শ থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার কাছে মেয়েদের শুধু দুটো গায়ের রঙ ছিলো, হয় ফর্সা, নয় কালো। আর একেবারে কৃষ্ণ-কালো না

লে আমি কাউকে প্রাণ ধরে কালো বলতে পারতুম না। সেই ধারণাতে সদিন শেফালিকেও ফর্সা বলে ফেলেছিলুম। প্রকাণ্ড একটা ধমক খয়েছিলুম স্ত্রীর কাছে। গৌরাঙ্গী বলে আমার স্ত্রীর একটা শারীরিক র্ব ছিলো, এবং তিনি আমার কাছে স্পষ্ট এটা আশা করতেন যে তাঁর তুলনায় সংসারের সমস্ত স্ত্রীলোককে আমি কালো দেখি।

তাই বললুম, 'যেমন রূপের ছিরি, তেমনি গলার কেরদানি।'

এমনি অনেক তারার কণা আকাশ থেকে ঝরে গেছে, রাত থেকে অনেক স্বপ্নের টুকরো। কোনো কিছুরই খেয়াল হতো না, যদি না বছর দেড়েক পরে স্ত্রী একদিন এসে বলতেন, 'জানো, শেফালি রায় এসেছে।'

আমূল চমকে উঠলুম : 'কোথায়?'

পাশের বাড়ি ছাড়া সে আর কোথায় আসতে পারে! স্ত্রী গলার সুরে সুলভ একটি বিষাদ মাখিয়ে বললেন, 'কিন্তু ওর ভারি অসুখ। এখানে একটু হাওয়া বদলাতে এসেছে।'

সুলভ কৌতূহলের বশে বললুম, 'কী অসুখ?'

'একটা সন্তান নষ্ট হবার পর থেকে একেবারে ঝরে গেছে, চেনা যায় না। মাসখানেক ধরে নাকি ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে সন্ধ্যেবেলা।'

খবরের কাগজের একটা খবর শুনছি এমনি নির্লিপ্ততার সঙ্গে গ্রহণ করলুম। বিয়ের পর কোনো মেয়ে মোটা হবে বা কোনো মেয়ে রোগা হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

আমিও আশ্চর্য হতুম না, যদি না এর দিন তিনেক পর শেফালির সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হতো। আপিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেছি, দেখি কে একজন অপরিচিত মহিলা একটা ঢালু চেয়ারে বসে স্ত্রীর সঙ্গে করুণ মিহি গলায় গল্প করছে। অপাঙ্গে স্ত্রীর শাণিত শাসন পাবার আগেই সরে যাচ্ছিলুম, কিন্তু অপরিচিত মহিলা সোজা হয়ে বসবার উদ্যমের মাঝে দু' হাতে দুর্বল একটি নমস্কার করে স্মিতহাস্যে বললে, 'চিনতে পারেন?'

দেখে পারতুম না, শুনে চিনলুম। বললুম, 'আপনি কি, মিসেস—'

'শেফালি রায়।' শেফালি মলিন মুখে হাসলো।

'আপনার খুব অসুখ?'

'হ্যাঁ।' শেফালি তার বাঁ হাতের পরিস্ফুট একটা শিরের উপরে ডান হাতের একটা আঙুল বুলুতে লাগলো।

বললুম, 'এখন কেমন আছেন?'

'ভালো নয়। এখানে যেদিন আসি, সেদিন জ্বরটা হয়নি। ভাবলুম, সেরে উঠবো বুঝি। কিন্তু পর্শু থেকে আবার যে-কে-সে।'

তার শীর্ণতার দিকে চেয়ে থেকে বললুম 'এ-রকম কতদিন হয়েছে?'

রোগা মুখে তার চাহনিটি খুব বড় মনে হ'লো। শেফালি বললে, 'এই মাস তিনেক।'

'মাস তিনেক!' কোটের একটা বোতাম ঘোরাতে-ঘোরাতে বললুম, 'কিন্তু এতদিন আপনাকে দেখি নি কেন?'

'দেখেন নি মানে?' শেফালি যেন কথাটা ধরতে পারলো না : 'আমাকে দেখবেন কি করে?'

হাসিমুখে বললুম, 'আপনি জানেন না, গান আমি শুনি নে, গান আমি দেখি।'

'ও! এতদিন আমার গান বাজারে দেখেন নি কেন তাই জিগগেস করছেন?' শেফালি হাসলো।

'হ্যাঁ, অসুখ তো আপনার তিন মাস, কিন্তু এর আগে হিসেব করে দেখতে গেলে অন্তত পনেরো-কুড়িখানাও রেকর্ড বেরুতে পারতো বাজারে। কী করছিলেন এতদিন, গ্রামোফোন-কোম্পানিই বা কি লালবাতি জেবলেছে নাকি? মাঝখান থেকে আমাদেরই ক্ষতি, যারা মেসিন কিনে বসে আছি, আর বসে আছি মফস্বলে।'

'গান দেবো কি করে?' শেফালি মুখ নিচু করলো। বললে, 'ওরা যে আমাকে গাইতে দেয় না।'

'কারা?' কথাটা জিগগেস না করলেও পারতুম।

শেফালি মুখ তুললো না। ধীরে বললে, 'এ-বিয়ে আমার হতেই পারতো না, যদি না আমার বাবা শ্বশুরমশাইকে আন্ডারটেকিং দিতেন যে বিয়ের পর ও-বাড়ি আমি গান গাইবো না কোনোদিন। ভেবেছিলুম একটু-আধটু বাজালে হয়তো দোষ হবে না, তাই এসরাজটা নিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু ও-বাড়িতে পদার্পণ করার পরদিনই সেটাকে শাশুড়ি জবলন্ত উনুনে গুঁজে দিলেন।'

বজ্রাহতের মতো চেয়ে রইলুম।

বললুম 'কিন্তু' আপনার স্বামীও কি গান পছন্দ করেন না?'

'স্ত্রীলোকের গান করেন না, কেননা তাঁর মতে গান আর এক প্রকারের স্ত্রীলোক সমশ্রেণীর।'

এতক্ষণে স্ত্রী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। বললেন, 'বলেন কি, এমন লোকও আছে নাকি সংসারে?'

'আছে।' শেফালি অন্যমনস্কের মতো বললে, 'নইলে সংসার বিচিত্র হবে কি করে?'

'তবে জেনে-শুনে ও-জায়গায় বিয়ে বসতে গিয়েছিলেন কেন?' স্ত্রী তপ্ত, অসহিষ্ণু গলায় অসতর্কের মতো প্রশ্ন করে বসলেন।

এর অবিশ্যি উত্তর নেই। কিন্তু প্রশ্নটাও অবান্তর। কেননা যে-বিয়ের জন্যে গানের এত হট্টগোল মেয়েদের, বোবা হয়ে থাকলেই যদি সেটা বিনা পরিশ্রমে সমাধা হয়ে যায় তো মন্দ কী।

স্ত্রী বুঝলেন প্রশ্নটা কিছু কঠিন হয়েছে। তাই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে

বললেন, 'একা-একা আপন মনেও তো গাইতে পারেন, ছাতে, নিরালায়, মাঝরাতে?'

শেফালি শূন্য চোখে খোলা জানলা দিয়ে কতদূর যেন চাইলো। বললে, একা-একা নিজের মনে গাইতে ভালো লাগে না, সে তো সকলেই গায়, যে জানে না সে-ও। কিন্তু আমি চাই শোনাতে, কিম্বা আপনি যা বললেন, দেখাতে—স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যা চান। বলুন, আপনি যদি সত্যি কাউকে ভালোবাসেন,' উত্তেজনায় শেফালি দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে লাগলো : 'তবে কি তা আপনি মনের মধ্যে পুষে রাখতে পারেন, উদ্বেল বন্যার মতো সমস্ত পৃথিবী আপনার ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না? আমি তো শুধু নিজেকে নিয়ে আমি নই, সমস্তকে নিয়ে আমি। নিজের জন্যে তো চোখের জলই আছে, গান কেন?'

বিষাদের কুয়াশাটা উড়িয়ে দেবার জন্যে বললুম, 'আপনার সেই গানটা আজ একবার শুনবেন?'

'না, দরকার নেই। আমি এখন উঠি। আপনি এই আপিস থেকে এসেছেন, জামা-কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করুন।'

ভঙ্গুর, বিশীর্ণ কতগুলি রেখায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে শেফালি উঠে দাঁড়ালো। গান ফুরিয়ে যাবার পর পিনের সংঘর্ষে ডিস্‌ক্‌-এ যে খানিক কর্কশ আওয়াজ বেরোয়, যদি বলি, শেফালির শরীরে সেই কর্কশতা, তবে তাকে আপনারা কিছুটা বুঝতে পারবেন হয়তো।

এখানে তার অসুখটা আরো জটিল হয়ে উঠলো, তাই তাকে ফের ফিরে যেতে হলো কোলকাতায়, তার বাবার কাছে।

সেদিন রাত্রে, স্ত্রী যখন খোকাকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, চুপিচুপি জাগিয়ে দিলুম শেফালিকে, সেই ফুলন্ত শেফালিকে। কতদিন তাকে দেখি নি। আজ দেখলুম, এতটুকুও সে ম্লান বা শীর্ণ হয় নি, গানের জ্যোৎস্নায় শরীরে তার সেই তরল তরঙ্গিমা। সেই তার কপালে আভা, মুখে রক্তিমা, বুকে উদ্বেলতা। সমস্ত শরীর যেন প্রার্থনার মতো কোমল, উচ্ছ্বসিত। আবার তাকে দেখলুম, কতদিন তাকে দেখিনি।

স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এ কী কাণ্ড! পাড়ার লোক যে পাগলাগারদ ভাববে।'

পরদিন, তাঁর ঘোরতর সন্দেহ দাঁড়ালো, যখন দেখলেন আপিস থেকে ফিরে ফের গান দিয়েছি।

'কাল রাতে বুঝি এই গানটাই দিয়েছিলে?'

লুকোলাম না।

'কেন, আর গান নেই?'

'আছে।'

'তবে?' স্ত্রী ধমক দিয়ে উঠলেন।

'জানি না।'

সত্যিই জানি না। কিন্তু আপনারা জানেন, না-জানারো একটা সীমা থাকা উচিত। ভবিষ্যৎ না জেনে আমি যখন-তখন ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শেফালিকে দেখতে লাগলুম। আপিসে উপরালার থেকে যখন ধমক খাই, যেদিন অনেক খরচ হয়ে যায়, যখন রাত করে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ওঠে, এবং যেদিন সত্যিই কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু ভাবতেও পারিনি শেফালির অপমৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী হবো।

স্ত্রী একদিন তেরিয়া হয়ে বললেন, 'তখন না বলতে একটা ন্যাকা, বিচ্ছিরি ঢলে-পড়া গান—'

'কতো কথাই তো আমরা বলি,' দার্শনিক হবার চেষ্টায় বললুম, 'আর যা বলি তা বলবো না বলেই বলি।'

'ঐ তো হাড়-বার-করা কেলে-কিসকিন্দি চেহারা', শেফালি যেখানটায় সেদিন বসেছিলো সেই দিকে হাতের একটা ভঙ্গি চালনা করে স্ত্রী বললেন, 'ওর আর আছে কী?'

স্ত্রীলোকমাত্রেই সঙ্কীর্ণজীবী, তা আমার আগে আরো বড়ো-বড়ো দার্শনিকরা বলে গেছে। তারা ঘুরছে শুধু বর্তমানের ডিস্ক্-এ; তাদের না আছে অতীত, না আছে ভবিষ্যৎ, না স্মৃতি, না বা স্বপ্ন। তাই বর্তমান নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকুন, আমি আমার সেই সঙ্গীতময় অতীতের একাকীত্বে ফিরে যাই।

চা-টা আশানুরূপ গরম না অনুচিতভাবে ঠাণ্ডা এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার একটু বচসা হ'লো, এর চেয়েও তুচ্ছ কারণে আপনাদের হ'য়ে থাকে। কিন্তু তখুনি আপনারা গ্রামোফোন বাজাতে বসেন না। ঐখানেই আমার ভুল হয়েছিলো, আমি তক্ষুনিই, সক্কালবেলাতেই, গান দিলুম, আর আপনাদের বলে দিতে হবে না, শেফালির গান।

সিগারেটটা ঠোঁটে করে পাশের ঘরে দিয়াশলায়ের সন্ধানে গিয়েছিলুম, স্ত্রী কখন ঘরে ঢুকেছেন টের পাই নি। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ শুনে ফিরে গিয়ে দেখি স্ত্রী ডিস্ক্খানা মেঝের উপর আছড়ে ফেলে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছেন।

তখন আমার বদলি হবার সময়। উপরালার কাছে অনেকে অনেক রকম তদ্বির করে থাকে, কেউ চায় কোলকাতার কাছে, কেউ চায় সস্তার যায়গা, কেউ একেবারে দেশের বাস্তুতে। আমি গিয়ে বললুম, আমার প্রার্থনা খুব বিনীত, আমাকে এমন জায়গা দাও, যেখানে ইলেকট্রিসি আছে, সে টাঙ্গাইলই হোক কি বরিশালই হোক। প্রার্থনা মঞ্জুর হ'লো। তাই রেকর্ডসমেত গ্রামোফোনটা এক-পঞ্চমাংশ দামে এক প্রোফেশনারি ডিপার্টে কাছে বেচে দিয়ে এখানে তারো চেয়ে বর্বর, তারো চেয়ে পৈশাচিক, এব রেডিয়ো খুলে বসেছি।

৬৭। কাঠ

খালি গাছ আর জঙ্গল। নদীতে চর জাগবার সঙ্গে-সঙ্গেই গাছ গজায়—ছইলা আর আরগুজি, কেওড়া আর লোনা-ঝাউ। দেখতে-দেখতে লতার দল লেলিয়ে ওঠে, কুটুম-পাগলি যে লতা সে বাঘকে পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে। বালির চর দেখতে-দেখতে কালিজঙ্গলে ভরে যায়।

হ্যাঁ, জঙ্গল হাসিল কর। বন-বাদায় আবাদ বসাও। গোলা-গঞ্জ হাট-বাজার বাগান-বাগিচা পত্তন কর।

জঙ্গল উঠিত না হয়, ঝড় আসুক একটা। নদী যেখানে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে সেই অগ্নিমুখ থেকে সর্বনাশা ঝড় আসুক একটা—সব গাছগাছড়া ভূমিসাৎ হয়ে যাক।

তাই যাবে এক দিন। কয়লার খাদ যখন শূন্য হয়ে যাবে তখন মানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মত গাছ কাটবে। তার এক দিকে চাই শস্য, অন্য দিকে চাই আগুন।

চালানি নৌকোয় কাঠ এসেছে নদীর ঘাটে। মঙ্গল চাপরাশি নদীর ধাপায় ঝাঁপিয়ে পড়ল : 'কি কাঠ?'

কে একজন বললে, 'সুপারির চেলা।'

কিছু কাল আগে এ অঞ্চলে রাঙা মেঘের এক লাল ঝড় এসেছিল। তাতে কয়েক শো মাইল একেবারে ফর্সা হয়ে গিয়েছিল, গাছের বংশ ছিল না। সাদা ও সিধে সাদাসিধে যত সুপুরি গাছ ছিল, সব নির্মূল হয়ে গেছে। আর-সব কাঠ শেষ হয়ে গেলেও সুপুরির চেলা আসছে নৌকো-বোঝাই হয়ে।

ঝড়টা এসেছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত। বানবন্যায় গরু-মানুষ অনেক ভেসে গিয়েছিল বটে, কিন্তু গাছও ভেঙে পড়েছিল অগণ্য। গাছ না পড়লে মানুষ জ্বালানি পেত কোথায়? রান্না করত কি করে?

কয়লা নেই।

এখন এ অঞ্চলে নেই, কত দিন পরে সমস্ত পৃথিবীতে থাকবে না। তারপর আস্তে-আস্তে গাছ যাবে অদৃশ্য হয়ে।

'আঁটি কত কাঠের?'

'দেড় টাকা।'

দাম একটা বলে দিলেই হল! যা মুখে আসে তাই আজকাল দাম বলে চলে যায়।

কিন্তু দাম নিয়ে এখন হুড়ঝগড়া করে লাভ নেই। এই কাঠের জন্যে মঙ্গলকে কম হয়রানটা হতে হচ্ছে না। আজ শনিবার—তার বাড়ি যাবার

কথা, নদীর ওপারে, খেয়া পেরোলেই তার গ্রাম। বাড়িতে তার পরিবার, ছেলে-মেয়ে। মাইনে তেরো, আর মাগগি-ভাতা চোদ্দ। শহরে বাড়ি-ভাড়া বেশি, তাই পরিবার আনতে পারে না। ছ'দিন অন্তর একবার শুধু যায় ছেলেমেয়েগুলিকে দেখে আসতে। সোমবার ফিরে আসে। আবার শনি-বারের ধ্বনি শোনে।

কিন্তু বাবু বলে দিয়েছেন কাঠ জোগাড় করতে না পারলে বাড়ি যাওয়া বন্ধ। খেতে কাঠ, মরতে পর্যন্ত কাঠ।

সুশীলের ইচ্ছে করে হাতে কুড়ুল তুলে নেয়, কাঠুরে সাজে। পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করেছিল, সে এ সংসার নিষ্পাদপ করে। কিন্তু হায়, কাটবে কি? যে বাড়িতে সে ভাড়াটে আছে সেখানে আগে গোটা দুই আম আর কুল গাছ ছিল। যিনি ছিলেন তিনি প্রথমে প্রশাখা, পরে শাখা, শেষে দণ্ড-কাণ্ড সাবাড় করেছেন। সুশীলের জন্যে কুটোকাটা ছাল-বাকলও রাখেন নি। হাতের কাছে তাই দা-কুড়ুল না থাকলেও এমন সে মেজাজ করে রেখেছে যে এই বুঝি কোপ বসায়।

'নিয়ে চলো ছয় বোঝা।' মঙ্গল হুকুম করল।

জলে মাঝি, ডাঙায় মুটে, মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলল।

বাড়ি ফিরে এসে সুশীল দেখল উঠোনে কাঠ ভুর করা। মরা কাঠে ফুল ফোটার মত সুশীলের মুখে হাসি দেখা দিল।

'কাঠ এল কোত্থেকে রে?' জিগগেস করল চাকরকে।

'মঙ্গল পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'কি রাঁধছিস এবেলা।'

'কাটলেট।'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে সুশীল সিগারেট খাচ্ছে, বাইরের অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল।

'কে?'

'আমরা হুজুর। মাঝি।'

'কেন?'

'কাডামি নৌকোয় আমরা কাঠ নিয়ে এসেছি। বাবুর বাড়িতে দিয়ে গেছি ছ আঁটি।'

'তোমরা?' সুশীল অন্তঃপ্রবাহিত মানবপ্রীতির একটা স্রোত অনুভব করল।

'দাম নিতে এসেছি হুজুর। ভোর রাতেই আবার আমরা চলে যাব বন্দরে।'

বেতালা লাগল। জিগগেস করল, 'কত দাম?'

'আঁটি আড়াই টাকা করে।' সেয়ানা মাঝিটা বললে।

'এত?' সুশীল বসে পড়ল। মবলগ পনেরো টাকা।

'খুব ভাল কাঠ হুজুর। গাব, করমচা, তেঁতুল—'

'কাঠের কন্ট্রোল হয়নি এদিকে?'

মাঝির কথায় হাসির একটা সূক্ষ্ম টান পাওয়া গেল : 'কন্ট্রোল হলে দাম আরো তেজী হত, হুজুর।'

সুশীল ধমক দিয়ে উঠল। ধমক দেবার কারণ আছে। কন্ট্রোলের হেনস্তা সে সইতে পারে না। সে হচ্ছে এখানকার সিভিল সাপ্লাইয়ের নতুন-ইনস্পেক্টর। নামের শেষে আগে আই-সি-এস লিখত, উপরালার হুকুমে এখন আই-ও-সি-এস লিখছে, ইনস্পেকটর অফ সিভিল সাপ্লাইজ।

চাল কণ্ট্রোল হয়েছে বটে, কিন্তু চুলো এখনো বশে আনা যায়নি।

'আমার চাপরাশিটা বাড়ি গেছে। সে ফিরে এলে দাম ঠিক করে দেব।'

মাঝিরা নড়তে চায় না। বলে, 'আমাদের আসতে আবার সেই হাটবার।'

সুশীলও নেইআঁকড়া। 'সেই হাটবারেই তবে নিয়ে যেয়ো।'

ফিরতি হাটবারেই আবার মাঝিরা এসে হাজির।

গা গুলিয়ে উঠল সুশীলের। খেয়াল ছিল না আজই মঙ্গলকে এক সপ্তাহের অনুগ্রহবিদায় দিয়ে দিয়েছে। বউয়ের অসুখ, বাড়ি-মেরামত, অনেক রকম কাঁদুনি। এখন নিরুপায় রাগে জ্বলতে লাগল সুশীল। বললে, 'সে স্টুপিডটা তো ছুটি নিয়ে গেছে। আর ক ঘন্টা আগে এলেনা কেন?'

'নিকট-পথ তো নয়, হুজুর, লোকলস্করও বেশি নেই—' মাঝিরা বললে মিনতি করে।

'দামটা এখনো বোঝাপড়া হয়নি চাপরাশির সঙ্গে—'

'এর আবার বোঝাপড়া কি! ল্যাজ্য দামই তো দেবেন।'

একেবারে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। সুশীল তিন টাকা বার করে দিল। বললে, 'বাকি দাম মঙ্গল এলে চুকিয়ে দেব।'

কেঁচা-মারা পাঁকের মাছের মত গুটিয়ে গেল মাঝিরা। অবিচারটা এত প্রত্যক্ষ যে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। শেষে ক্ষীণস্বরে বললে, 'সে কবে আসে তার ঠিক কি।'

'এক হপ্তা মোটে ছুটি। ছুটির শেষেই মাস কাবার। না এসে যাবে কোথায়?'

তবু কালো চিটে-পড়া নোট তিনটে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না মাঝিরা। বলে, 'বড় আতান্তরে আছি, হুজুর, দিনান্তর খাওয়া হয় না—'

কিন্তু সুশীল কাঠ। বললে, 'হবে, হবে, মঙ্গল ফিরে আসুক।'

তবু আরো কতক্ষণ বসে রইল মাঝিরা। শেষে নিরুপায়ের মত চলে গেল।

কারা যেন আস্তব্যস্ত হয়ে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ছে।

'শুনুন।'

ভিতর থেকে সুশীল বললে, 'কে?'

খুব ভারি গলায় উত্তর এল : 'বাইরে আসুন।'

বাইরে এসে দেখে? তিনজন যুবক ভদ্রলোক। একজন পাজামা, দ্বিতীয়জন লুঙ্গি, তৃতীয় মালকোঁচা।

'আমরা এখানকার কমিউনিস্ট—'

সম্ভ্রমে চেয়ার এগিয়ে দিতে লাগল সুশীল।

'না, বসতে আসিনি। বসে থাকবার সময় কই আমাদের!' বলে রাস্তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল : 'আপনি কাঠ কিনে কাঠের দাম দিচ্ছেন না, তার মানে কি?'

সুশীল লক্ষ্য করে চেয়ে দেখল সেই দুটো কাঠওয়ালা মাঝি। বুঝল আদালতে না গিয়ে পঞ্চায়েতিতে গেছে।

রাগে শরীর রি-রি করে উঠল। দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে রাগটা থামাতে পারলেও ঝাঁজ কমাতে পারল না ; 'দাম দিচ্ছি না মানে?'

'হ্যাঁ, জানি, তিন টাকা দিয়েছেন। কিন্তু তিন টাকা দাম নয়। দাম সাতাশ টাকা।'

'কোন হিসেবে?'

'সোজা হিসেবে। ওদের থেকে আপনি ন আঁটি কাঠ নিয়েছেন, তিন টাকা করে আঁটি—তিন-নয় সাতাশ, নামতা না পড়েও জানা যায়।'

সুশীল একবার তাকাল মাঝিদের দিকে। মাঝিদের চোখে এখন রাগ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা।

'নয় আঁটি নিয়েছি? ভাল করে খোঁজ করেছেন?'

'খোঁজ নেবার দরকার হয় না। এরা মাটির কাছাকাছি মানুষ, এরা সত্য ছাড়া মিথ্যে বলে না—'

'আর যদি বেশি কিছু নেয়ই আদায় করে, দোষ দিতে পারেন কি?' বড় শান্ত গলায় বললে লুঙ্গিধারী : 'এতদিন অনেক শুষেছি এদের, এবার আদায়ের পৃষ্ঠে মুশমা দেবার সময় এসেছে।'

'তাই বলে তিন টাকা করে সুপারির চেলা?'

'সুপারির চেলা নয় তো কি আপনাকে শাল-সেগুন লোহা-সুঁদরি দেবে?' মালকোঁচা প্রায় মুখিয়ে এল।

সুশীল বসল চেয়ারে। সিগারেট ধরাল। বললে, 'সব ছেড়ে এখন বুঝি কাঠে এসেছেন?'

'শুধু কাঠে কেন, হাটে-মাঠে-ঘাটে, সর্বঘটেই আছি। যেখানে যত কিছু শোষণ ও পেষণ সেখানেই আমরা এগিয়ে আসি—'

'শেষ পর্যন্ত শোষণটা বুঝি আমার এখানেই আবিষ্কার করলেন? কিন্তু আমি যদি সিভিল সাপ্লাইয়ের না হয়ে পুলিশের ইনস্পেকটর হতাম, এগোতে সাহস করতেন? কিংবা আমার চাকরির আদ্যাক্ষরের 'ও'-টি যদি না থাকত, তা হলে?'

'বাজে কথা বলবার সময় নেই আমাদের। দিয়ে দিন টাকাটা।'

'আপনারা আদালতের পেয়াদা নন, ক্রোক বা দখল-উচ্ছেদের পরোয়ানা নিয়ে আসেন নি। সুতরাং আপনাদের আদেশ বা অনুরোধ কোনোটা শুনতেই আমি বাধ্য নই।' সুশীল গম্ভীর হল।

'দেবেন না?'

'আমার চাপরাশি কাঠ এনেছে, সে ফিরে আসুক, বাকি দাম তখন দিয়ে দেব। কি দর, কটা বা বোঝা সব সে জানে।'

'আর আমরা জানি না?' মাঝিরা ঝাঁজিয়ে উঠল।

সুশীল আর কথা বলল না। আর তার এই স্তব্ধতাটাই মনে হল প্রবল গলাধাক্কার মত।

মাঝিরা অনেক আশ্বাস পেয়ে এসেছিল, আর সেই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে খাঁইটাও বাড়িয়ে দিয়েছিল স্বচ্ছন্দে। এখন পারে এসে ভরাডুবি হয় দেখে বিগলিত গলায় বললে, 'কমিয়ে-টমিয়ে রফানিষ্পত্তি করে যা হয়, হুজুর—বড্ড গরিব—'

কর্মীরা ধমকে উঠল। হেঁচকা টান মারল হাত ধরে। বললে, 'অধিকারের কাণাকড়িও ছাড়বিনে। এখন কেস আমাদের। চলে আয়—'

পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে প্রায় মার্চ করে চলে গেল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে সুশীল দেখল কতগুলি স্কুলের ছেলে-মেয়ে কতগুলি কঞ্চি হাতে করে তার বাড়ির চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। যেমন নিশান ধরে, তেমনি ভাবে কঞ্চিগুলি ধরা। শহরে কাগজ নেই বলেই নিশান হয়নি, শুধু কঞ্চি হয়েছে। কি একটা বলছে তারা ছড়ার মত। লাইনের আধখানা একজন বলছে, বাকি আধখানা আর সবাই বলছে সমবেত কণ্ঠে। কান খাড়া রেখে অনেকক্ষণ পর ধরতে পারল কথাটা :

কাষ্ঠ কেন' মূল্য দাও।
কাষ্ঠ কেন' মূল্য দাও।

অনুগ্রহ-বিদায় শেষ করে মঙ্গল এসে হাজির।

বিনাকাষ্ঠের আগুনের মত জ্বলে উঠল সুশীল। প্রথমে দপ করে, শেষে দাউ-দাউ করে।

'কোত্থেকে কাঠ নিয়ে এসেছিলে?'

মঙ্গল ধাক্কা খেল বুকের মধ্যে।

'ক বোঝা এনেছিলে? দাম কত ঠিক হয়েছিল?'

মঙ্গল থতমত খেতে লাগল।

'বলে সাতাশ টাকা। ঐ তোমার ন বোঝা কাঠ?'

মঙ্গল তাকিয়ে রইল হতবুদ্ধির মত।

'ভদ্দরলোক মাঝি না ধরে ধরতে গিয়েছিল পলিটিক্যাল মাঝি? দরিদ্র হলেই যে নারায়ণ হয় না, জানতে না তুমি? শুয়ার, স্টুপিড—'

মঙ্গল পাথর হয়ে গেছে। শ্বাস পড়ছে না, চোখ নড়ছে না।

'আমি অতশত বুঝি না বাপু। শিগগির এ হাঙ্গামা মেটাও। তুমি কিনে এনেছ কাঠ, তা তুমি জান। ওরা এখানে আসবে কেন? এখানে কি?'

'আমি যাচ্ছি এখুনি।' উদ্‌ভ্রান্তের মত বললে মঙ্গল।

'যদি না মেটাতে পার, চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।'

'হুজুর—'

'কথাটি নয়। চাকরি যাবে, রেশন যাবে, সব যাবে। এ কদিন আমার ঘুম নেই, হজম নেই—আমি শুধু তোমার জন্যে বসে। যদি না মেটাতে পার—'

খুঁজতে-খুঁজতে কর্মীসংঘের আখড়ায় এসে দাঁড়াল মঙ্গল।

'বাবুর কাঠের দামটা দিতে এসেছি।' বললে কাঁপতে-কাঁপতে, 'হ্যাঁ, আমি সুশীলবাবুর চাপরাশি। কত দিতে হবে?'

সর্বকন্ঠে রব উঠল : 'সাতাশ টাকা।'

মঙ্গল ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করতে চাইল : 'না বাবু, অত নয়, শুনুন—'

'ঢের শুনেছি আমরা। সাতাশ টাকার এক পাই কম হলে চলবে না।'

'তেরো টাকা আমার কাছে আছে।' মাইনের তেরোটি টাকা বার করে দিল মঙ্গল।

'ফুঃ—' ফু উড়িয়ে দিল সবাই ; 'যতক্ষণ পুরো না দেবে ততক্ষণ বন্ধ হবে না প্রসেশন।'

মাগগি-ভাতার চোদ্দটা টাকা আছে এখনো পকেটে।

'আর পাঁচটা টাকা নিন, বাবু। ছেড়ে দিন—'

'ছাড়াছাড়ি নেই। গরিবের টাকা ঠকিয়ে নিতে দেব না। সব টাকা ঝপ করে ফেলে দিতে বল বাবুকে। নইলে—'

'পায়ে পড়ি বাবু, আর দুটো টাকা নিয়ে রেহাই দিন। দয়া করুন।'

'দয়া নেই। কাষ্ঠ বলতে-বলতে সবাই কাঠ হয়ে গেছি।'

কে আরেকজন এগিয়ে এল। বললে, 'হেরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত টাকাটাই পাঠিয়ে দিয়েছে। ও ব্যাটা শুধু চালাকি করে দিচ্ছে না। ভাবছে, এর থেকে যদি কিছু মুনাফা মারা যায়। যত মুনাফাখোর—' এই বলে সে মঙ্গলের পকেটের উপর থাবা বসাল।

মঙ্গল হটল না, নিজের থেকেই বার করে দিল বাকি সাত টাকা। তার এক মাসের সমস্ত রোজগার। তার বাড়ি-তৈরির কাঠ-খড়ের স্বপ্ন। তার সর্বস্ব।

সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল।

পর দিন থেকে বন্ধ হল শোভাযাত্রা। ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে তাকিয়ে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে লাগল সুশীলের। শুনতে-শুনতে ছন্দ-তাল মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই নিজেই সে তুড়ি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে সুর ভাঁজতে লাগল, 'কাষ্ঠ কেন, মূল্য দাও। কাষ্ঠ কেন, মূল্য দাও।'

দরজা খুলেই দেখতে পেল, মঙ্গল। ভয় পেল দেখে। যেন এক রাত্রেই বুড়ো হয়ে গেছে।

কে জানে, ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি বুঝি চোখ থেকে।

সুশীলা হালকা গলায় বলে উঠল, 'গান গাও, মঙ্গল। কাষ্ঠ কেন—'

মঙ্গল হাসল। মুখ থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুট কান্নার মত : 'মূল্য দাও।'

৬৮। নতুন দিন

বাকি-পড়া জমি নিলেম হয়ে গেছে। কিনেছে তৃতীয় পক্ষ।

তবু শেষ হয়নি। পরবর্তীকালের খাজনা বাকি আছে। সে আবার কি? তর্জমা করে বুঝিয়ে বলো।

যে-মামলার ডিক্রি-জারিতে নিলেম হয়েছে সে-মামলার রুজুর তারিখের পর থেকে নিলেম বহাল না হওয়া পর্যন্ত জমি খেয়েছে তো জোনাবালি! তা তো খেয়েইছি। খেয়েছ তো সে সময়ের খাজনা দেবে না?

জোনাবালির মুখ বিরস হয়ে গেল। মিথ্যে কি, পরবর্তী সময়ের খাজনা তো শোধ হয়নি।

তার কী হবে?

তার জন্যে মালেক সুন্দর খাঁ ফের মামলা করল। সমন যাচনা করলেও নিলনা জোনাবালি। হাজির-লটকানো জারি হল সমন। ডিক্রি হল এক তরফা। জোনাবালি ছানি করল। ফল পেল না। করল আপিল। করল মোশন। সুরু হল ঝটাপটি। কিন্তু শেষপর্যন্ত সুরাহা হল না। সুন্দর খাঁর ডিক্রি বজায় রইল।

সেই ডিক্রি ফের জারিতে দিয়েছে। সুন্দর খাঁ এবার ধরতে চাইছে জোনাবালির অন্য সম্পত্তি। অন্য জমার জমি। বাড়ির বগলে সতেরো গণ্ডার বন্দ।

পিওনকে বলেছিল জোনাবালি, নোটিশ গরজারি দিন। পিওন রাজি হয়নি; জোনাবালির চেয়ে সুন্দর খাঁর হাত অনেক দস্ত-দরাজ।

আচ্ছা, জোনাবালিও নিরস্ত্র নয়। সে সালিশী বোর্ডে দরখাস্ত করল। এক নোটিশে বন্ধ হয়ে গেল ডিক্রিজারি।

কখন আবার যে ভারি হাতে তদবির করে বোর্ডের মামলা সুন্দর খাঁ খারিজ করিয়ে দিলে জোনাবালি কেন কাকপক্ষীও জানতে পারল না।

বাঁধন খুলে ডিক্রিজারি ফের বলবন্ত হয়ে উঠল।

ছেঁড়ার উপরে চলছে এমন জোড়াতালি, দেশে ভোট এল। গাঁ-গেরাম গরম হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

মামলা-মোকদ্দমা পড়ে রইল, খেত-খামার পড়ে রইল, ধান্ধা-ধান্দা পড়ে রইল, সবখানে কেবল ভোট আর ভোট। তোমার ভোট আছে তো বড় মিয়া? কাকে দিচ্ছ ভোট? ইউনিয়ন নম্বর কত তোমার? নাম উঠেছে তো লিস্টিতে? জওজের নাম বাপের নাম হয়ে যায়নি তো?

ভোট কাকে বলে ঝাপসা ঝাপসা বোঝে জোনাবালি। সবাই মিলে বলে-কয়ে ধরাধরি করে একজনকে শুধু বড়লোক করে দেয়া। যেমন সবাই করেছে এই বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে, বক্‌সো-সাহেবকে। সবাই মিলে ভোট দিল আর ফাঁকতালে উনি একজন জোরমন্ত লোক হয়ে দাঁড়ালেন। ঢেউটিনের ঘর হল পাঁচ সাতখানা, সনামা বিনামা বিত্তসম্পত্তি হল, টিপকল বসল বাড়ির নগিজে, গরু-মোষে খেত-খামার জাঁকিয়ে উঠল দেখতে দেখতে। সেই থেকে হল সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান, ফুডকমিটির সেক্রেটারি। আর যারা ভোট দিল তাদের কি অবস্থা? তাদের খাওনপিরনের কষ্ট, ঘরে এক ফোঁটা কেরাসিন নেই, গরুবাছুর দল-ঘাস খেয়ে বেড়ায়। এক দিকে শান অন্য দিকে শেওলা। ভোটের কি মানে জানা আছে জোনাবালির।

আরে, এ গেরামি ভোট নয়। এ দিল্লির ভোট।

জোনাবালির মাথা ঘুরে যায়। চোখে ধাঁধা লাগে।

'হাঁ, ঠিকমত সবাই এবার ভোট দিতে পারলে আমরা আবার বাদশা হব।' বলে সেরাজ মিয়া। শহর থেকে লোকলস্কর নিয়ে সে ভোট-তদন্তে এসেছে।

'সবাই মিলে বাদশা হব কী মিয়া?' জোনাবালি বিশ্বাস করতে চায় না।

'হ্যাঁ, সবাই মিলেই বাদশা হব।' সেরাজ মিয়া হটে না, জোর করে বলে : "সবার অবস্থা তখন বাদশা-নবাবের মত সচ্ছল হবে। থাকবে না দুঃখকষ্ট, অভাব-অনটন। ভাতের অভাবে মরবে না আর কেউ। থাকবে না আর কেউ এমন মুখখু হয়ে। দিন ফিরবে এবার।'

দিন ফিরবে এবার! শুনতেও কেমন ভাল লাগে।

জোনাবালি বললে, 'আমিরি-উমিরি চাইনে হুজুর। রাতে একটু কেরাসিন পাব? পিন্ধনের কাপড় পাব একখানা?'

মাঠে ফসল আর মারা যাবে না? খিল যাবে না জমি? বাটি-ঘটি বাঁধা পড়বে না? ধার-কর্জ মুছে যাবে দেশ থেকে?

'সব ঠিক হবে, কিন্তু মনে থাকে যেন, ভোট দেবে লতিফ সরদারকে।'

'আর খবরদার, হানিফ শিকদারকে নয়।'

লতিফ সরদার খোদার খাসবান্দা। আর হানিফ শিকদার ফেরেববাজ, বেইমান।

সুন্দর খাঁর হাতে ভোটারের লিস্টি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সবার নাম ঠিকমত উঠেছে কিনা। যদি না উঠে থাকে তো মোজাম দিতে হবে। শুধরে নিতে হবে লিস্টি। একটি নামও ফসকাতে দেয়া হবে না। কে জানে এক ভোটেও জিত হতে পারে। ফোঁটা ফোঁটা জলেই বৃষ্টি নামে মাঠ ভরে।

'আরে, জোনাবালিরও দেখছি ভোট আছে।' সুন্দর খাঁ হেসে তাকায় জোনাবালির দিকে।

হ্যাঁ, তারও খানা আছে, ট্যাকসো আছে, হালগৃহস্থি আছে। সে-ও এবার সুদিনের নৌকোর সোয়ারী। জোনাবালিও হাসল সুন্দরের দিকে চেয়ে।

সুন্দর লেখাপড়া জানে, জোনাবালি নিরক্ষর। সুন্দর মুনিব, জোনাবালি প্রজা। সুন্দর মহাজন, জোনাবালি দায়িক। কিন্তু দুইজনের মাঝে নেই আর কোনো শত্রুতালি। নতুন দিনের আশায় দুজনেরই চোখে আজ ঘোর লেগেছে। সুন্দরকে আর খাজনার জন্যে তাগাদা দিতে হবে না, জোনাবালিকেও হবে না আর হালের বলদ বেচতে। সুন্দরও তখন মুক্ত লোভের থেকে, জোনাবালিও তখন মুক্ত লজ্জার থেকে।

মুখতাকাতাকি করে আবার হাসল দুজনে। দুজনের মাঝে নেই আর কোনো আড়াআড়ি। নতুন দেশের হাওয়া ছুঁয়েছে দুজনকে।

আমরা আবার বাদশা হব নিজের এলাকায়।

'কিন্তু খবরদার, লতিফ সরদারকে ভোট দেবে।'

কে লতিফ কে হানিফ, ল্যাজামুড়া কিছুই বোঝে না জোনাবালি। সে শুধু এইটুকু বোঝে ঠিকমত ভোট দিতে পারলেই পয়মন্ত দিন এসে দেখা দেবে। হালের মুখ যাবে ঘুরে। একটা হাজাশুকা নোনাশিকস্তি দেশের থেকে চলে আসবে তারা ফসল-গুলজারের দেশে।

কাপড় পাবে, কেরাসিন পাবে, গোলার ধান দালাল-ফড়েরা কিনে-কেটে নেবে না। তামাম বছর খেতে পারবে দিয়ে-থুয়ে। দাম কমবে জিনিসের। চিকিৎসার অভাবে জোয়ান-মর্দ ছেলেগুলো আর মরবে না তড়পে-তড়পে। লাভে-মূলে সব ফিরে আসবে। খোদা আর বেরাজী থাকবেন না।

আর, একেই তো বলে রাজত্ব পাওয়া। একেই তো বলে নবাব-নাজিমের দেশ।

জোনাবালির চোখে আর ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগে না, যেন আলো দেখতে পায় আসমানে। বুকের মধ্যে বিশ্বাসের জোর আসে।

হুলুস্থুল লেগে গেছে। নৌকো করে দলে-দলে লোক আসছে লতিফ সরদারের। চেঁচামেচি করে কানে তালা লাগাচ্ছে। উর্দু-ফারসি নানারকম বুকনি ছুঁড়ছে. মানে কিছু বোঝে না জোনাবালি, কিন্তু রক্তে হঠাৎ ঝাঁজ আসে। মনে হয় বয়েস কম থাকলে সেও দাপাদাপি করত লাঠি নিয়ে।

কিন্তু হানিফ শিকদার কই?

তার লোকেরা সব ফেরার হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে আসতে দেয়া হয়নি এ-অঞ্চলে। আসবে তো লাঠি খাবে। ইট পাটকেলে কানা হয়ে যাবে।

কেন, তাদের কেন এ দশা?

'হানিফ দুষমন। হানিফ বেইমান।' লতিফ সরদারের পাটোয়ার সুন্দর খাঁ বলে গলা ফুলিয়ে।

অত প্যাঁচোয়া ব্যাপার বুঝতে পারে না জোনাবালি। অত চুলচেরা তর্ক।

'অত সব বোঝা তোমাদের কারবার নয়, কাজও নেই বুঝে। শুধু এইটুকু জেনে রাখ ভোট দেবে লতিফ সরদারকে।'

লতিফ সরদারকে। সবার মুখে ঐ এক কথা। এ-পাড়া ও-পাড়া, সবাই এক জোট। প্রেসিডেন্ট-চৌকিদার, মোল্লা-মুন্সি, প্রজা-মুনিব, গোমস্তা-পেয়াদা, মহাজন-খাতক সবার মুখে এক মন্ত্র।

জোনাবালির মনে আর সন্দেহ থাকে না। সে ঘরে গিয়ে ঘরের মানুষকে বলে, 'এবার আর দুঃখ থাকবে না হালিমের মা—'

হালিমের মা শোনেনি এমন গজব কথা। দুঃখ থাকবে না মানে রাতের বেলায় আন্ধার থাকবে না। এ কখনো হয়?

'কেন, নতুন কর্জদাদন পাবে বুঝি?'

'না গো না। তুমি বড় কম বোঝ। কর্জটর্জ সব উঠে যাবে। ধার খেতেও হবে না, দিতেও হবে না। আইন-কানুন সব বদলে যাবে। প্রজা উচ্ছেদ করার আইন ছিল না এত দিন? এবার দুঃখ উচ্ছেদ করার আইন হবে।'

হালিমের মা হাঁ করে রইল।

'হ্যাঁ গো, আমাদেরই জাত ভাই কে এক মিয়া নতুন বাদশা হবে।'

কোথাকার কে মিয়া দিশ পায় না হালিমের মা।

কিন্তু তাতে তাদের কি? কে না কে তক্ত-তাউস পাবে, তাতে তাদের এই হোগলা-পাটির কী এসে যায়?

'তাতে আমাদের কি?'

'তুই চিরকালই একটু কম বুঝিস। আমাদের কি? আমাদেরই তো সব। নতুন বাদশা এসে নতুন ফরমান জারি করবে। বৃষ্টি হবে সময় মত, বাত-বন্যা হবে না, ধান আর খেয়ে যেতে পারবে না পাখিতে। খাজনা-টাজনা সব মাপ হয়ে যাবে, যার চাষ তারই খাস হয়ে যাবে জমি-জায়গা কী সুখের হবে বল তো!'

'কাপড় পাব?'

'পাবি, পাবি। শাড়ি পাবি, জেওর পাবি। নাকে বটফুল, কানে ঝোমকা। খোঁপায় বেড়চিরন দেব গড়িয়ে। ধুলোর মত সব সস্তা হয়ে যাবে।'

'ধান সেদ্ধ করার জন্যে রাতে কেরাসিন পাব?'

'জুনি রাত হয়ে থাকবে সব সময়।'

'হালিম-জালিম দু ভাই-ই জ্বরে ধুকছে পড়ে-পড়ে। লাটা ফলে জ্বর ছাড়ছে না। ফকিরের ঝাড়ফুঁকও মিছে হচ্ছে। ওদের জন্যে ওষুধ আনতে পারবে?'

'বলিস কি? প্রত্যেক গাঁয়ে দাওয়াইখানা বসবে, কুইনিন বিলোবে বিনি পয়সায়।'

হালিমের মা তার ঘরের পুরুষের কাছটিতে ঘন হয়ে বসে। নতুন দিনের পদধ্বনি শোনে।

'জানিস হালিমের মা, আমার নাম বেরিয়েছে ছাপার অক্ষরে। সরকারী লিস্টিতে। যারা যারা বাদশা বানাতে পারবে তাদের নামের ফিরিস্তি। আমরা সবাই বললেই নতুন বাদশা বসবে। আমরা সবাই বললেই দুঃখ দূর হয়ে যাবে আমাদের। তুই অত সব বুঝবি না হালিমের মা। তুই শুধু বসে থাক আমার পাশটিতে।'

কবে ভোট হবে, সুন্দর খাঁকেই একদিন জিগগেস করে জোনাবালি।

'দিন ঠিক হয়নি এখনো।'

দিন ঠিক হলেই সবাইকে তারা নিয়ে যাবে শহরে। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। হ্যাঁ, খোরাকি পাবে। রাহা-খরচ পাবে, আর যারা নেহাৎই অবাধ্য, পাবে তারা হয় ঘুস নয় ঘুসি।

না, না, জোনাবালি অবাধ্য নয়। সে খোরাকি-খরচও চায় না।

তবু যদি সে ব্যস্ত হয়ে থাকে, তার কারণ হালিমের মার পরনের শাড়িতে আর সেলাই চলে না, ছেলে দুটো জ্বরে ভুগে-ভুগে কাঠি হয়ে গেছে, ঠিক সময়ে বৃষ্টি হয়নি বলে ধান পুষ্ট হয়নি এ বছর। সে চায় যত শিগগির পারে উলটিয়ে দেয় এই দিনের পৃষ্ঠাটা।

সত্যি, ওলটাল বুঝি পৃষ্ঠা। তার উকিলের মুহুরি এসে খবর দিল, সুন্দর খাঁর ডিক্রিজারি খারিজ হয়ে গেছে।

বলেন কী? জোনাবালি বিশ্বাস করতে চাইল না।

হ্যাঁ, আইন অনেক বদলে গিয়েছে এর মধ্যে। খাজনার ডিক্রিতে বাকি-পড়া জমি ছাড়া আর কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ধরা যাবে না। এইখানে বাকি-পড়া জমি যখন আগেই নিলেম হয়ে গেছে তখন জোনাবালির আর কোনো জমি-জায়গা ক্রোক হতে পারবে না।

প্যাঁচঘোঁচ বোঝে না অত জোনাবালি। উজু করে সে নামাজ পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি করে উলটে যাক পৃষ্ঠাগুলি। এই পচা পুঁথিটা শেষ হয়ে যাক।

তারপর একদিন মাঠে সে লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটছে, আলে দাঁড়িয়ে সুন্দর খাঁ বললে, 'কাল নিয়ে যাব তোমাদের। কালকে তোমাদের ভোটের দিন।'

সুন্দর খাঁর মুখে এততেও কোনো দ্বেষ-দুঃখ নেই। জোনাবালির একখানা জমি নিতে পারেনি তো কী হয়েছে, বাদশাহি এলে কত জমি সে জায়গীর খাবে।

কিন্তু আধামাঠের ধান ফেলে রেখে যাবে কি করে কাল? রাখ, রাখ। এক দিনেই আর ধান চুরি যাবে না। গেলে যাবে, তাই বলে ভোট দেবে না সে? আগন্তুক শুভদিনের সংবর্ধনায় সে তার সম্মতি জানিয়ে রাখবে না?

ধানকাটা শেষ না করেই জোনাবালি শহরে চলল। লুঙ্গি আর ছেঁড়া একটা কুর্তা। কাঁধের উপরে শুকনো একখানা গামছা।

সে একা নয়, নৌকোয় আরো অনেক সোয়ারী. পান-তামুক খেতে দিয়েছে, ফেরবার পথে খেতে দেবে শহরের রসগোল্লা।

শেষ পর্যন্ত যে জায়গায় তারা এসে পৌঁছুলো সে একটা মাঠের মাঝখানে টিনের বেড়ার ইস্কুল-ঘর। চারদিকে ভাঙা হাটের গোলমাল। যেমন ভিড় তেমনি হৈ-হল্লা। এ হাত ধরে টানে, ও হাত ধরে টানে। এ কানের কাছে চেঁচায়, ও কানের কাছে চেঁচায়। মাথা খারাপ হয়ে যাবার দাখিল।

পাটোয়ার সুন্দর খাঁ সঙ্গে আছে বলেই রক্ষে। সে দল-কে-দল নিয়ে গেল লতিফ সরদারের আস্তানায়। তাদেরকে এক-এক করে কাগজের টুকরোতে ইউনিয়নের নম্বর ও ভোটারের নম্বর টুকে দেবে। তা নিয়ে যাবে তারা ভোটের ঘরে। কাগজ দেখাবে বাবুদের। ছাপানো নাম পরখ করে দেখে ঠিক হলে ভোটের কাগজ দেবে পিঠে ছাপ মেরে। সে-কাগজ নিয়ে ঢুকবে শেষে পর্দা-ঘেরা কোণের খোপে। সেখানে গিয়ে ভোট দেবে।

ভোট কি করে দিতে হয় জানো তো?

কি করে?

যাকে ভোট দেবে তার নামের পাশে পেন্সিল দিয়ে চিকে মারবে। দেখো ঘরের লাইন যেন ডিঙিয়ে যেও না।

'আমি যে হুজুর পড়তে পারব না।' জোনাবলি ডুকরে ওঠে।

ভয় নেই, ভোটের হাকিমকে বললেই ঠিক জায়গায় চিকে দিয়ে দেবে।

এত গোলমাল, সকল কথা ভাল করে বুঝতে পারে না জোনাবালি। ও সব চিকে-ফিকের মামলায় কী দরকার? হাত তুললে হয় না?

'তারপর? চিকে কাটা হয়ে গেলে?'

একটা ডাক-বাক্স আছে, তাতে ফেলে দেবে ঐ ভোটের কাগজ। এবার লড়াই শুধু দুজনের মধ্যে বলে বাক্স মোটে একটা। এবার বিশেষ হাঙ্গামা নেই। পরের বারে ভোটের বেলায় ছাতা-লন্ঠন গাড়ি-গরু দেখতে পাবে অনেক।

পরের বার পর্যন্ত বাঁচবার সাধ নেই জোনাবালির। এবারেই যেন সে দিনের নাগাল পায়।

'আরেকবার বুঝিয়ে বলো।' জোনাবালি শাদা মুখে তাকিয়ে থাকে।

কিছু ভয় নেই। একেবারে সোজা। ঘরের মধ্যে ঢুকলেই বুঝিয়ে দেবে বাবুরা। ওখানে আমাদের এজেন্ট, গোমস্তা আছে। এই নাও চিরকুট।

কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে ভিড় ঠেলে ভয়ে-ভয়ে ঢুকল জোনাবালি। এজেন্ট সনাক্ত করলে। কাগজের টুকরোতে নম্বর দেখে ভোটারের লিস্টিতে নাম বেরুল। জোনাবালি মৃধা, বাপের নাম জিন্নাতালি মৃধা।

'হ বাবু, আমার নাম।'

কলের মধ্যে থেকে চাপ দিয়ে পিঠে ছবি ফুটিয়ে ভোটের টিকিট নাবালির হাতে দিল। আমলাবাবু জিগগেস করলে, 'লেখাপড়া জানো?'

'না বাবু।'

'তবে যাও ঐ হাকিমের কাছে।'

ভয়ে-ভয়ে এগুলো জোনাবালি।

হাকিম তাকে নিয়ে গেল একটা ঘুপসি মতন ঘরের মধ্যে। সবই ভারি জব লাগছে জোনাবালির। তার এত হিম্মত? তার হয়ে হাকিম নিজে আর্জি মুসাবিদা করে দেবে? খোদার কাছে জানাবে তার ফরিয়াদ?

'কাকে ভোট দেবে?' মাথা নিচু করে কানের কাছে মুখ এনে হাকিম তাকে পি চুপি জিগগেস করলে।

মুহূর্তে কিরকম গুলিয়ে যায় জোনাবালির। তালগোল পাকিয়ে যায়। মধ্যে ঢিপঢিপ সুরু হয়।

'বড় গোলমাল হুজুর। মাথা ঘুরে যাচ্ছে।'

'কতক্ষণ আর! বলো, কাকে ভোট দেবে?'

ঢোক গিলে ইতি-উতি তাকাতে লাগল জোনাবালি। বন্ধ ঘর, কারু ক কোনো ইশারা পাবার আশা নেই। অনেকক্ষণ পরে যন্ত্রণা আঁকা মুখে বললে, যাকে সবাই দিচ্ছে তাকে।

'বা, কাকে কে দিচ্ছে তা আমি জানব কি করে? তুমি বলো তার নাম।'

'নাম আমার মনে নেই।' অন্ধকার মুখে বললে জোনাবালি।

'নাম মনে নেই তো আমি বলে দিচ্ছি, দুজন আছে। এক হানিফ কদার, দুই লতিফ সরদার। কাকে ভোট দেবে নাম বলো, আমি তোমার দাগ দিয়ে দিচ্ছি।'

যাক, নাম শুনে ধড়ে প্রাণ এল জোনাবালির। আসান পেল। নইলে সব ল ভরাডুবি হয়ে। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'হানিফ কদার।'

হাকিম চিকে কাটল। বললে, 'এবার এটা ঐ বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাও ঐ দরজা দিয়ে। খবরদার, কাউকে বলো না কাকে ভোট দিয়েছ। বলবে তার জেল হয়ে যাবে।'

এই চিঠির বাক্সে করে চিঠি যাবে বুঝি মহারাণীর কাছে। কিংবা, কে ন, হয়তে এই নালিশ পৌঁছুবে গিয়ে খোদ খোদার এজলাসে। দিন এত দিনে।

'কাকে ভোট দিলে?' ঘর থেকে বেরুতেই ধরল তাকে সুন্দর খাঁ : 'কি, সরদারকে দিয়েছ তো?'

ধরল মেহেরালি, তার বাড়ির ধারের পড়শী : 'কি, লতিফ সরদারকে দিয়েছিস তো?'

ধরল হোসেন পেয়াদা। ধরল আতাহার।

কথা না বলিয়ে ছাড়বে না জোনাবালিকে। জোনাবালি বললে, 'নাম বলতে হাকিম বারণ করে দিয়েছে। যে বলবে তার জেল হয়ে যাবে।'

জোনাবালির মনে সুখ নেই, তার গাঙে ডুবে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। তার সুখের দিনের সে কবর খুঁড়ছে নিজের হাতে।

বললে, 'তোরা এগো, আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। হুপ করে জ্বর এসে যাবে বুঝি।'

নৌকাতে সবাই রসগোল্লা খেল, জোনাবালি বললে, দরদ হয়েছে পেটে। সবাই হৈ-হল্লা করছে. আর সে বসে আছে গোমসা মুখে। হাত-ফিরতি হুঁকো টানছে সবাই, তার কলকেতে আগুন নেই। মাঠে গিয়ে বাদবাকি ধান কাটে, মনে হয় তার কাঁচির ছোঁয়াচ লেগে ধান যেন আগাছা হয়ে গেছে। হালিমের মার দিকে তাকায়, তার শাড়ির ছেঁড়াটা মাথা ছেড়ে পিঠের দিকে নেমে এসেছে।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাসও বুঝি ঘুরে আসে. নতুন বাদশাহি আর আসে না। এ যে তারই কৃতকর্মের ফল তাতে আর সন্দেহ কি।

এক দিন দুঃখের কথা বলে হালিমের মাকে।

বলে, 'ভূত চেপেছিল কাঁধে. কি রকম ভুল হয়ে গেল। আর আমারই ভুলের জন্যে দিন আর বুঝি ফিরল না, হালিমের মা।'

হালিমের মা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কতক্ষণ। শেষে বলে, 'ঐ বাক্সে কত রাজ্যের কাগজই তো পড়েছে। তোমার কাগজ ওরা টের পাবে কি করে? তুমি তো আর ওতে হাতের টিপ দিয়ে দাওনি। কি করে ওরা তোমার ভুল ধরবে শুনি?'

ওরা ধরতে পারবে না, না পারুক, কিন্তু তাতে জোনাবালির সান্ত্বনা কই? খোদা তো জানতে পেরেছেন। তিনি তো জেনে গিয়েছেন যে জোনাবালি নতুন বাদশাহি চায় না. চায়না সুদিনের সূর্য।

হালিমের মার বুকের কাছে মুখ রেখে অস্ফুট গলায় কাঁদে জোনাবালি।

কিন্তু বৃথাই জোনাবালি কাঁদছে। খবর এল, লতিফ সরদারই ভোটে জিতেছে।

'বলিনি তখন? খোদাতালা কি মনের কথা না শুনে পারেন?' হালিমের মা আহ্লাদে ফেটে পড়তে লাগল : 'পীরের দুয়ারে গিয়ে সিন্নি দেব এবার।'

জোনাবালি দম বন্ধ করে বসে ছিল এ কদিন। আল্লার কাছে কেবল মাপ চেয়ে বেড়িয়েছে। তার পাপের কি আর শেষ ছিল? উমি লোক, লেখাপড়া শেখেনি, সব কেবল অস্মরণ হয়ে যায়, তার উপরে গলৎকুষ্ঠ গরিব, তার অপরাধের ইতি-অন্ত ছিল না। কিন্তু ফকির-ফতুরের মালিক যিনি তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন।

এবার দিকে-দিকে বসে যাবে দৌলতখানা।

কিন্তু কোথায় কাপড়! কোথায় কেরাসিন! কোথায় ওষুধ-বিষুধ!

দুয়ারে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে আদালতের পেয়াদা। নিশানদিহি সুন্দর খাঁ।

কি ব্যাপার?

পরবর্তী কালের খাজনার জন্যে সুন্দর খাঁ দস্তক করেছে।

সে কি কথা? শুনেছিলাম না দেনদারের শরীর আর দায়ী হবে না? গেছে গ্রেপ্তার?

হ্যাঁ, সে যাদের খত-তমশুকের দেনা। বাকি-ফেলার ফাঁকিদার রায়ত-নয়। খাজনা-আদায়ের মোক্ষম অস্ত্র হাতছাড়া হয়নি জমিদারের। খাজনা না দেয়া চুরি-ডাকাতির সমান।

পেয়াদার জিম্মা হয়ে জোনাবালি চলল আদালতে।

বললে, 'হালিমের মা, জেলটা একবার ঘুরে আসি। আমাদের নতুন দিন বুঝি ঐখানেই আটকা পড়ে আছে।'

৬৯। সূর্যদেব

সবাই যাচ্ছে। হরিপদ কাবাসী, সাধু দালাল, জটিরাম কাহার, ফক্কর বক্স, মাতব্বর গাজি পর্যন্ত। মেয়েরাও আছে। নীরদা, কৃপাময়ী, সুভঙ্গবালা। ও-পাড়ার সাহেবের মা, ইংরেজের মা।

দিন থাকতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। পৌঁছুতে-পৌঁছুতে প্রায় মাঝরাত। দলের সঙ্গে দুটি মাত্র হেরিকেন। সাপ্লাইঘর থেকে শিলপ বের করে এনে কিছু তেল জোগাড় করেছে ভাগ্যধর।

'তেল তো একবার নিয়েছিস রেশন-কার্ডে।' বললে পাটোয়ারবাবু।

'সে তো ঘরে জ্বালাবার জন্যে। এ আলোটা আমরা পথে জ্বালাব। যাব সবাই হোসেনপুর ইস্টিশানে। দল বেঁধে। আপনি যাবেন না?'

পাটোয়ারবাবু তবু গড়িমসি করছে।

'এ দেবে তোমার রিজার্ভ-স্টক থেকে। দু'বোতলের একটা শিলপ কেটে দেবে', বললে লক্ষ্মণ বাগ; 'খয়রাতি নয়, দাম দেব। এতগুলি লোক যাচ্ছি আমরা তীর্থ করতে।'

তবু যেন পাটোয়ারবাবু ইতি-উতি করে। বাড়তি তেলের অনুমতি হবে কিনা তাই বোধহয় যাচাই করে মনে-মনে।

'তুমি কেমনধারা লোক গা?' ঝামটা মেরে উঠলো বুড়ি রতন দাসী : এমন দিনে বাড়তি দু'বোতল তেল ছাড়তে পার না তুমি? আমরা সবাই ঘর-বাড়ি ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাচ্ছি, আর তুমি তোমার দোকান আঁকড়ে বসে আছ?'

'অত ফুটুনি কিসের?' বললে বাবুচরণ, 'কনট্রোল উঠে যাবে এবার।
দুই নয়, অনেক কষ্টে একবোতল বাড়তি তেলের শিলপ কাটল পাটোয়ার
সেই তেল দুই হেরিকেনে ভর্তি করে চললে তীর্থযাত্রীরা। কতক্ষণ পরেই
উঠে আসবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ। .

'আমিও যাব। আমাকেও তোদের সঙ্গে নিয়ে চল্।' বললে ঠাকুরদাস
বয়স সত্তরের কাছে, জীর্ণ-শীর্ণ অথচ সিধে শিরালো চেহারা, খালি
খালি পা, হাতে লাঠি, কোমরে জড়ানো ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো। কিছু নেই
জীবনে কোনোদিন কিছু পায়নি, তবু নবীন আশার বাতাস লেগেছে তা
কুঁচকানো চামড়ায়। যেমন বসন্তের বাতাস লাগে নিষ্পত্র বৃক্ষশাখে। হাতে
আর বেশিদিন নেই, তবু সেও যেন চায় একটি নতুন দিন।

'এত দূরের রাস্তা, তুমি যাবে কি করে?' বললে বাবুচরণ, 'তোম
নাতি কোথায়?'

'মনু? সে আজ কুড়ি পঁচিশদিন ধরে বিছানায় শোয়া। তার অসুখ'

'তার অসুখ খুব বেশি।' বললে লালু, লালচাঁদ। বছরদশেকের এক
রোগা-পটকা ছেলে। মনুর সমানবয়সী। সে এসে বুড়োর হাতের লাঠি চে
ধরলো। বললে—'মনু না যাক, আমি আছি। আমি তোমাকে ঠিক নি
যাব দাদু!'

বুড়ো ঠাকুরদাস হাসলো। কাউকে তাকে নিয়ে যেতে হবে না।
রাস্তায় একা হলেও সে ঠিক পথ চিনে নিতে পারবে আজ। সে আর
নয়, নতুন করে সব আবার আরম্ভ হবে বলে সেও যেন ফিরে চলেছে শৈশবে

কিন্তু দলের পাণ্ডা ভাগ্যধর আপত্তি করে। বলে, 'তুমি যাচ্ছ খামোক
একদম মিছিমিছি।'

'বাঃ, মনুর জন্যে ধুলো নিয়ে আসবো।'

'ধুলো?'

'হ্যাঁ, সেই ধুলো বুকে-কপালে মেখে দিলেই মনু ভাল হয়ে উঠবে।'

সেই কথা মনুর মা সুফলাও বলে দিয়েছে বার-বার করে। বলেছে, 'বাব
আর কিছু না হোক—পথের থেকে কিছু ধুলো নিয়ে এসো। গায়ে-মা
মাখিয়ে দিলেই মনু আমার ভালো হয়ে উঠবে। আর ট্রেন যদি না থামে বা
তবে লাইনের ছোট একটা পাথরের কুচি কুড়িয়ে নিয়ে এসো। মাদুলি ক
গলায় পরিয়ে দেবো মনুর।'

আগে কথা ছিল, সুফলাই যাবে, ঠাকুরদাস থাকবে মনুর পাশটিতে; কি
সুফলা যায় কি করে? বাইরে বেরুবার মতো তার একটা আস্ত শাড়ি নে
যা শীত, নেই একটা গায়ে দেবার মোটা কাপড়।

এমনি অনেক মেয়েই যেতে পারেনি ঘরে-ঘরে; কিন্তু পুরুষদের ক
আলাদা। তারা শীত-গ্রীষ্ম মানে না, ঝড়-দঙ্গলে তাদের ভয় নেই।

'কিন্তু তোমার যে শীত করবে বাবা!' বললে সুফলা।

'রেখে দে।' ঠাকুরদাস এক হাসিতে সমস্ত শীত-বর্ষা উড়িয়ে দিলে। বললে, 'মাঝরাতেই আজ সূর্ষি উঠবে শুনেছি। শীত-টিত কিছুই থাকবে না।'

বাবাকে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা। বুড়োমানুষ, কতদিনই বা আর বাঁচবে। তবু মনু যখন ঘুম থেকে জেগে উঠে জিগগেস করবে—'কেমন দেখে এলে মা?' তখন কী বলবে সুফলা? তাই সে বারে-বারে বলে দিলে—'ধুলো নিয়ে এসো। না পেলে পাথরের কুচি।'

ঠাকুরদাস যখন যায়, জ্বরের ঘোরে মনু তখন বেহুঁস হয়ে আছে। সাঁঝরাতে তার ঘুম ভাঙলো। বললে, 'মা, তুমি গেলে না?'

'না বাবা, তোমার দাদু গেছে।' সুফলা ছেলের পাশে ঘন হয়ে বসলো। ক্লান্তিভরে চোখ বুজলো মনু। বললে,—'একজন গেলেই হোলো।'

জ্বরটা আজ বেড়েছে। তাই মনু সব ঠিকমত বুঝতে পারছে না। তার মা না গিয়ে দাদু গেছে, এতে তার কোনো নালিশ নেই।

অনেক পরে আবার চোখ মেললো মনু। বললে, 'ট্রেন যখন আসবে মা, বাঁশি শুনতে পাবো?'

'রোজই তো শোনা যায়।'

'আজো শোনো যাবে, না? আজ নিশ্চয় আরো বেশি জোরে বাজাবে। আমি কি শুনতে পাবো? যদি আমি ঘুমিয়ে থাকি তখন?'

'তোমাকে জাগিয়ে দেবো মনু!'

'তাই দিয়ো মা! আজ নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে বাঁশি দেবে। আমাকে জাগিয়ে দিয়ো মা! আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি শুধু বাঁশি শুনবো।'

ফকিরালির জন্যেই বারে বারে সবাইকে পিছিয়ে পড়তে হয়। ধমকে ওঠে ভাগ্যধর, তুই এসেছিস কেন? নেচে-নেচে হাঁটিস, তোর জন্যে শেষকালে কি আমাদের ট্রেন ফেল হয়ে যাবে?'

'ল্যাংড়া মানুষ, তাই অমন চলি একটু নেচে-নেচে। তা তোমরা এগোও না, আমি যতক্ষণে পারি, পৌঁছুব গিয়ে।' বিরসমুখে বলে ফকিরালি, 'এখন না-হয় ঠাট্টা করছো, কিন্তু ফেরবার সময় দেখবে, খোঁড়া-পা সিধে হয়ে গেছে, পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছি টগ্‌বগিয়ে। আল্লা করেন, এক-বার যেন দেখা পাই।'

রাত নেমে পড়েছে।

ভাগ্যধর আর আমিনদ্দির হাতে জ্বলছে দুটি হেরিকেন, ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কাঁচামাটির রাস্তা ধরে চলেছে তীর্থযাত্রীরা।

এ-গ্রাম ও-গ্রাম—আশে পাশের সমস্ত গাঁ-গেরাম ভেঙে পড়েছে সকলের পথ আজ মিশেছে এসে হোসেনপুরের ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে।

প্ল্যাটফর্মে ধরছে না সবাইকে। লাইনের দু'পাশে ছাপিয়ে পড়েছে। সব

লালচাঁদ চলে গেল তার বাড়ি, ছুতোরপাড়ায়। ঠাকুরদাস ডাকলে 'সুফলা!'

সুফলা দরজা খুলে দিল। শীত নেই, খিদে নেই, ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই, ঠাকুরদাস যেন আরেকরকম লোক হয়ে গিয়েছে।

'মনু কেমন আছে?'

'রাত্রেই জ্বরটা ছেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। যেই ইঞ্জিনে সিটি দিল, অমনি জাগাতে গিয়ে দেখলাম, গায়ে তার জ্বর নেই।'

'ঘুমুচ্ছে মনু?'

'ঘুমুচ্ছে।'

আবছায়ায় হাতড়ে-হাতড়ে ঠাকুরদাস, ঘরে ঢুকল। পুবের জানালাটা খুলে দিলে। বসলো মনুর পাশটিতে। পাথরের কুচিটা তার মাথায় ঠেকিয়ে রেখে দিলে বালিশের তলায়। এক টিপ ধুলো নিয়ে ছুঁইয়ে দিলে কপালে।

মনু চোখ চাইল। প্রফুল্লকণ্ঠে বললে, 'দাদু! তুমি? তুমি এসেছ? কখন এলে?'

'এই তো।'

'দেখে এলে? দেখে এলে তাঁকে?'

'দেখে এলাম বই কি।'

'তুমিও দেখতে পেলে? ভারি আশ্চর্য তো।'

'হ্যাঁ দাদু, ভারি আশ্চর্য। যে অন্ধ, যার চোখ নেই, সেও তাঁকে দেখতে পায়।' ঠাকুরদাসের দুই চক্ষুহীন কোটর থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল।

'কেমন তাঁকে দেখতে, বলো না?' মনু অন্ধ হবার চেষ্টায় চোখ বুজলো।

'ঠিক সূর্যের মতো। যেই এসে দাঁড়ান, অমনি চারদিক আলো হয়ে ওঠে। ভয়ের, দুঃখের, বিবাদ-কলহের লেশমাত্র থাকে না। বড় সুন্দর, বড় শান্ত রে দাদু।'

'তুমি দেখলে? সত্যি দেখলে?' মনু দৃঢ় করে চোখ বুজে রইল।

'কিছুই আমি দেখি না চারদিকে, তোর মুখখানা পর্যন্ত নয়। তবু তাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। কুয়াশা সরিয়ে হঠাৎ রোদের ঝলক দিয়ে উঠছেন যে এখন সূর্যদেব, ঠিক তাঁর মতো। তুই চোখ বুজে আছিস কেন দাদু? চেয়ে দ্যাখ্। নতুন সূর্য উঠেছে।'

মনু চোখ চাইল। দেখলো, কাঁচা সোনার রোদ্দুরে ঘর-দোর ভরে গেছে। পাখি ডাকছে কতরকম কাকলীতে। মুক্ত, স্নিগ্ধ বাতাস বইছে ঝিরঝির করে।, তার শরীরে আর জ্বর নেই।

৭০ । শিল্কের ব্যাণ্ডেজ

আপনি যদি শোনেন যে আপনার প্রতিবেশী তার স্ত্রীকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে, আপনি, যদি মানুষ হন, তবে নিশ্চয়ই ছুটে যাবেন তার ক্রুদ্ধ প্রতিবিধানে, আর যদি তা না পারেন অন্তত আপনার রসনাটা বিষিয়ে উঠবে, কিন্তু যদি শোনেন যে মূর্খ, গোঁয়ার, দজ্জাল স্ত্রী স্বামীকে প্রহার করছে, আপনি কিছুই করবেন না, কেননা এমন কথা কর্ণগোচরই হবে না কোনোদিন।

কেননা যে স্ত্রী মার খায় সে চ্যাঁচায় আর যে স্বামী মার খায় সে হাসে। কান্নাটাই শোনা যায় আর হাসিটা মনে-মনে।

বাইরে থেকে কে বলবে ওরা আদর্শ দম্পতি নয়, বিভূতি আর অরুণা! এখন যদি তাদের কেউ দেখে, বিলের জলে সান্ধ্য নৌ-বিহার করছে। মাঝিটা চুপ করে আছে বসে, পদ্মের দল ঠেলে বিভূতি দুই হাতে দাঁড় টানছে, আর গুন গুন করে গান গাইছে অরুণা।

আমরা তো এইটুকুই শুধু দেখি। অন্তরাল দেখেন অন্তর্যামী।

'তুমি সন্ধে না হতেই ঘরের দরজা এমনি বন্ধ কোরো না বলছি।' বিভূতি বললে।

'নিশ্চয়ই করবো। নইলে যে ব্যাঙ ঢোকে।' বললে অরুণা।

'ব্যাঙ তো ঢুকেই আছে ঘরে। সঙ্গে কিছু হাওয়া ঢুকুক।' দরজাটা খুলে গেল।

কথাটা বিভূতি তরল গলায়ই বলেছিলো, কিন্তু বলা-কওয়া-নেই, অরুণা হঠাৎ পা দিয়ে লাথিয়ে বিভূতির আপিসের এক পাটি জুতো বাইরে ফেলে দিলো।

তারপর ব্যাপারটা যেখানে এসে থামলো সেখানে অরুণার মাথাটা জায়গায়-জায়গায় ফুলে গিয়েছে আর বিভূতির দুই হাত তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।

এখানেও হয়তো থামতো না যদি সে-সময় গণেশ নৌকো নিয়ে না আসতো।

'নৌকো নিয়ে এসেছি, দিদি।' বাইরে থেকে বুড়োটে গলায় কে বললে।

দশ আঙুলে তখন বিভূতির টুঁটিটা নখবিদ্ধ করেছে এমন সময় আর্ত গলায় বিভূতি শব্দ করে উঠলো : 'নৌকো। নৌকো!'

'কে, গণেশ-দাদা নাকি?' মুহূর্তে শিকার ছেড়ে দিয়ে অরুণা ত্রস্ত হাতে বস্ত্রাঞ্চলে দ্রুত বিন্যাস এনে বাইরে বেরিয়ে এলো।

এ-এলেকায় জমিদারের যে কাচারি আছে সেখান থেকে এসেছে এ নৌকো।

অরুণার মামা সে-জমিদারের নায়েব। এ-অঞ্চলে বদলি হয়ে এসে অবধি মামাকে সে চিঠি লিখছে নৌকো পাঠাতে—গ্রীন বোট। এমন এখানে বিস্তীর্ণ হাওড়। এখন বর্ষার সময় নদীর মত ঢেউ, অথচ কচুরিপানার বদলে পদ্মপাতায় ভরা।

প্রথম লিখেছিলো ক্ষণাংশিক একটা প্রেমের মুহূর্তে। পরে যে-গুলি লিখেছিলো সেগুলি প্রশ্নোত্তর-পরম্পরায়।

গণেশ এ-কাচারির হালসাহানা। স-কর্ণধার নৌকো নিয়ে এসেছে।

'চলো দিদি, দেরি কোরো না।'

'না, আর দেরি কিসে!' বিভূতি বললে।

'আমার পাঁচ মিনিটো লাগবে না।' বললে অরুণা।

বিভূতি ক্ষতাক্ত জায়গাগুলিতে আইডিন ছুঁইয়ে দিতে লাগলো। অরুণা এক বালতি জলে এক শিশি অডিকোলন ঢেলে মাথা ধুতে বসলো।

তারপর বিভূতি পরলো ফিনফিনে সাদা, আর অরুণা পরলো ঝলমলে জর্জেট।

তারপর তারা যখন নৌকো ছাড়লো তখন ঘাটে কত লোক দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখলো সুদূর সম্ভ্রমে আর সবিস্ময় ঈর্ষায়।

আর এখন তো গলা ছেড়েই অরুণা গান ধরেছে ও বৈঠার ঘায়ে বিভূতি জলে দিচ্ছে তাল।

সেদিনের ঝগড়াটা হয়েছিলো আরো তুচ্ছ কারণে। ভর্জিত বেগুনের আকারের শীর্ণতা নিয়ে।

বিভূতি বললে. 'এ তো ভাজার বেগুন নয়, এ বেগুনির বেগুন।'

উত্তরে অরুণা যা বললে তার প্রাঞ্জল অর্থ হচ্ছে এই যে বিভূতির পিতা-পিতামহ চিরকাল আলুপোড়া খেয়েছে, বেগুন খায়নি।

কথাটা যে সমানুপাতিক হয়নি, নিরপেক্ষ কেউ প্রশ্ন করলে অরুণা হয়তো মানতো কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলতো যে পুরুষ হয়ে কেন সে এমনি তুচ্ছ মুলো-বেগুন নিয়ে আলোচনা করবে।

বিভূতি বলবে, যাই কেন না বলি ও বাপ তুলবে কেন। বেগুন নিয়ে বলি ও কুমড়ো নিয়ে বলুক।

এর কোনো মীমাংসা হয় না যতক্ষণ না ডাক্তার ডাকা হয়।

আর ডাক্তার ডাকা হয় বিভূতির জন্যে।

কেননা অরুণা বুঝেছে অত বড় একটা মোটা বই বিভূতির বুকে ছুঁড়ে মারাটা ঠিক হয়নি।

'ঠাফর, ঠাকুর!' বিভূতি বিছানায় গড়াতে গড়াতে গোঁ গোঁ করে উঠলো : শিগগির এক ছুটে মহেশ-ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এস। আমার বুকটা কেমন করছে।'

অরুণা ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলো।

পরে বিছানার পাশে এসে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'ডাক্তার এলে কী বলবে?'

'কী আর বলবো!' যন্ত্রণায় কাতর মুখে বিভূতি বললে, 'কী আর বলতে পারি? বলবো, বলতে হবে, ঘুমের মধ্যে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।'

আশ্বস্ত হয়ে অরুণা এলো বুকে হাত বুলিয়ে দিতে।

'যেটুকু নিশ্বাস এখনো আছে সেটুকু এখনি বন্ধ করে দিতে চাও নাকি?' বলে বিভূতি স্ত্রীর হাতটা ছুঁড়ে দিলো।

অরুণা খাট থেকে এক ঝটকায় নেমে এল। বললে, 'কিছু দেয়নি, অম্বলের ব্যথা হয়তো, তা করছে কী দেখ না।'

হন্ত-দন্ত হয়ে হাফ-প্যান্ট পরা মহেশ-ডাক্তার এলো ছুটে।

'কী হলো হঠাৎ?' স্টেথিস্কোপ উঁচিয়ে মহেশ খাটের কাছে সরে এলো।

বিভূতি সহজ গলায় বললে, 'আমার ব্লাডপ্রেসারটা একটু দেখাবে! বলে ডেকেছি। যন্ত্রটা নিয়ে এসেছেন?'

'ঠাকুর বললে বুকে কী ব্যথা উঠেছে হঠাৎ!'

'সুপুরি খেয়ে বিষম লেগেছিলো, তাই ঠাকুরের একটা ব্রেন-ওয়েভ হয়েছিলো মনে হচ্ছে।'

মহেশ-ডাক্তার স্টেথিস্কোপ গুটোতে-গুটোতে বললে, 'যন্ত্রটা তো আনিনি।'

'তা কাল সকালে দেখলেই হবে। একরাত্রেই আশা করি রগ ছিঁড়ে মারা পড়বো না।'

সেদিনের ঝগড়াটা ধোপার হিসেবের যোগফল নিয়ে। হবে কুড়িখানা, অনেক কাটাকুটি করে পাঞ্জাবিকে শার্ট বানিয়ে অরুণা লিখেছে বাইশ।

আর যায় কোথা!

অরুণার দাদা যে ইস্টিমারের বুকিংক্লার্ক, যোগ দেয়া যে সে তাঁরই কাছে শিখেছে এ নিয়ে বিভূতি টিপ্পনি করে। আর বিভূতির দাদা যে টোলের পণ্ডিত, যোগ-বিয়োগেরই যে সে ধার ধারে না এ চিমটি কাটতে অরুণা কসুর করে না।

বিভূতির অভিযোগ হচ্ছে শালা-সম্বন্ধে এমন একটা রসিকতা করলে সাধারণ স্ত্রীরা সহজেই চেপে যায়, ভাসুর নিয়ে আলোচনা করে না। আর অরুণার অভিযোগ হচ্ছে এই যে পুরুষের পক্ষে ধোপার হিসেবের খাতায় উঁকি মারাটা বর্বরতা।

সমাধান হয় না যখন বিচারক নেই।

অতএব বিভূতির হাতঘড়িটা গুঁড়ো হয়ে যায় আর অরুণার কপালের একটা পাশ ছোট্ট একটা পেপার-ওয়েট হয়ে ওঠে।

অরুণার চুলগুলি তখনো বিভূতির হাতের মুঠোয়, হঠাৎ অরুণা মাথায়

ঘোমটা টানবার সচেষ্টতায় স্বাভাবিক গলায় বললে, 'ছাড়ো, মুন্সেফবাবুর বৌ আসছে।'

নিমেষে হাত ছেড়ে দিয়ে বিভূতি বললে, 'আমি ঘরটা গুছিয়ে দিচ্ছি, তুমি শাড়িটা বদলে নাও।'

পদাশ্রিত, এমনি একখানা ভাব থাকার জন্যে বিভূতি মুন্সেফ-গিন্নির সামনে বেরিয়ে থাকে। আপ্যায়িত হতে-হতে ঘরে এনে বসালো। দিলো চেয়ার।

'আপনার স্ত্রী কোথায়?' মুন্সেফ-গৃহিণী জিগগেস করলেন।

'এই তো উঠলেন ঘুম থেকে। পুকুরে গেছেন মুখ ধুতে।'

কতক্ষণ পরেই ভেজা মুখে অরুণা এলো মুখে ভদ্র হাসি টেনে। বিভূতি তখন আর সেখানে নেই।

'কী, ঝুলন দেখতে যাবেন না?' মুন্সেফ-গৃহিণী মাথার কাপড়ের নিচে খোঁপাটা অনুভব করতে-করতে জিগগেস করলেন।

'যাবো বৈ কি!'

'যাবেন তো এখনো ঘুমুচ্ছেন কী?'

'ছুটির দিন—' যেন কী-একটা গূঢ় রসিকতা করছে এমনি ভাবে অরুণা হাসলো।

'ও মা, আপনার কপাল অমন ফুলে উঠলো কি করে?'

'আর বলবেন না, বাথরুমের দরজাটা হয়েছে ছোট, তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে আসতে চৌকাঠের সঙ্গে ধাক্কা।'

'দেখেছ?' মুন্সেফ-গৃহিণী শিউরে উঠলেন। বললেন, 'তবে যাবেন কি করে ঝুলনে?'

'কেন, কপাল ফুললে যাওয়া যায় না?'

'আমার তো মুখে একটা ব্রন উঠলেও বাইরে বেরুতে লজ্জা করে।'

'এতে আর লজ্জার কী! ঘরের কাজ-কর্ম করতে গিয়ে একটা ব্যথা পেয়েছি, এতে লুকোবার কী আছে।'

'তবে চলুন।'

'দাঁড়ান, চুলটা ঠিক করে বেঁধে নি।'

সেদিনের ঝগড়াটা নির্মম মধ্যাহ্নে।

চোখের উপর রোদ এসে পড়েছে, বিভূতি মুখোমুখি জানলাটা দিয়েছিলো বন্ধ করে। খাটে শুয়ে অরুণা উপন্যাস পড়ছিলো, হঠাৎ তার আলো কমে যাওয়াতে রসভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরেই এই জানলা বন্ধ করা নিয়ে বচসা চলছিলো। জানলা একটা বন্ধ হলেই ঘরের আলো একেবারে নিবে যায় না—এ বলে বিভূতি। জানলা একটা খোলা থাকলেই ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয় না—এ বলে অরুণা।

অতএব, শেষকালে যখন বিভূতি জোর করেই জানলা বন্ধ করে দিলো,

অরুণা হাতের উপন্যাসখানা টুকরো-টুকরো করে নস্যি-বেচার কাগজে রূপান্তরিত করলে।

উপন্যাসটা একটা ছোকরা-লাইব্রেরির।

ব্যাপারটা যেখানে এসে থামলো সেটা অরুণার বৈধব্যের কাছাকাছি।

অর্থাৎ বিভূতি কঠিন দুই হাতে অরুণার মণিবন্ধ নৃশংস চেপে ধরলো, পাঁচগাছি করে পাৎলা সোনার চুড়ি গেল বেঁকে, দুমড়ে, কম্ভু[illegible] হয়ে। আর সবই বোধ হয় সওয়া যায় গয়নার এই অপমান ছাড়া। দুই টানে ঢলঢলে চুড়িগুলি হাত থেকে খুলে ফেলে অরুণা ক্ষিপ্র বেগে মেঝের উপর ছুঁড়ে মারলো। ক্ষণলীন বিদ্যুতের জিহ্বা মেলে স্বর্ণচ্ছটাগুলি কে কোন দিকে মিলিয়ে গেল বোঝা গেল না।

জেলে যাওয়ার জন্যে তত নয় যত লোক-জানাজানির ভয়েই বিভূতি অরুণাকে খুন করতে পারলো না. নিচু হয়ে চুড়িগুলি কুড়িয়ে নিতে-নিতে বললে, 'আর কী। দু'হাত খালি করেছ, এবার রাস্তায় বেরিয়ে গেলেই তো চলে।'

কথাটা কিছু ভেবে বলেনি বিভূতি। কিন্তু অরুণা হঠাৎ গায়ে একটা জামা আঁটলো ও স্যাণ্ডেলটা পায়ে দিয়ে সোজা রাস্তার মুখে বেরিয়ে গেল হনহন করে।

স্পষ্ট দিনের আলোয়, শহরের মধ্যে। লোক-জনের যাওয়া-আসা, পাঁচ-সাত মিনিটের পথ রেলোয়ে-স্টেশন। লোকে বলবে কী! এমন ভাবে চলেছে যেন সতীদাহে যাবে, কিম্বা ঘন্টা-বাজিয়ে-দেয়া ট্রেন ধরতে হবে, কিম্বা স্বামীকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে বেরিয়েছে সে ডাক্তারের খোঁজে। ভীষণ বিশ্রী দেখায়, শুধু এই ওজুহাতে বিভূতিও বেরিয়ে পড়লো। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে নয়, শুধু তার সন্নিহিত থাকার জন্যে, নইলে রাস্তায় একাকিনীকে ভালো দেখায় না।

যতই ছুটুক, রসনায় না পারলেও পরে অরুণাকে বিভূতি ধরে ফেললো।

কাগজিবাগিচার উপেন মোক্তারের সঙ্গে দেখা। বললে, 'এখুনি যাচ্ছেন? স্পেশ্যাল ট্রেনটা তো রাত্তির এগারোটা পর্যন্ত আছে।'

কিছু না বুঝেই বিভূতি বললে, 'এখনই তো ভালো।'

ব্যাপারটা বুঝলো সে স্টেশনের কাছাকাছি এসে, নতুন রকমের ট্রেন ও অগুনতি মানুষ দেখে। পুজোর বাজারে ব্যবসায়ীরা কোলকাতা থেকে নানান রকম দোকান সাজিয়ে স্পেশ্যাল ট্রেন ভাড়া করে এসেছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় একদিন থেকে আরেক দিন ঘুরে বেড়াবে।

বিভূতি বললে, 'চলো, দেখে আসি।'

অরুণা কোনো আপত্তি জানালো না।

প্রথমেই চোখে পড়লো কি না একটা [illegible] দোকান। সম্ভ্রান্ত ও সার্ধাঙ্গ ভদ্রলোক দেখে দোকানিরা কী আপ্যায়নটাই না করলে!

ডায়মনকাটা এই প্যাটার্নের চুড়িই অরুণার পছন্দ। আট-আট যোল গাছ। এই বারো-গাছ চুড়ি যাবে—বলে পকেট থেকে ব্যাঁকানো চুড়িগুলি বিভূতি বার করে দিল।

'আর ঐ নেকলেসটা!' এমন আদুরে ভঙ্গি করে অরুণা বললে যা ফিল্মে তোলার মতো।

বিভূতি দ্বিরুক্তি করলে না। বললে, 'আমার সঙ্গে কাউকে পাঠিয়ে দিন বাড়িতে, আমি চেকে পেমেন্ট করবো।'

এ আর বলতে! লোক এলো সঙ্গে। বিভূতি চেক কাটলে।

'যাক, ফাঁকতালে কিছু গয়না হলো!' অম্লান খুসিতে উছলে উঠে অরুণা বললে। নিজের বাক্স খুলে তিনটে টাকা বার করে বললে, 'নাও, নাও এই তিন টাকা, আমার জমানো থেকে দিচ্ছি, লাইব্রেরিকে ঐ উপন্যাসটা কিনে দিয়ো। শুধু-শুধু কারু আমি ক্ষতি করতে চাই নে।' বলেই সে একটু হাসলো।

কিন্তু কতক্ষণ!

এই বর্তমানের সঙ্কীর্ণ চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে বিভূতি একবার নিচের দিকে তাকালো, যেখানে গভীর গহ্বর আছে মুখ মেলে আর যরি নাম হচ্ছে ভবিষ্যৎ।

তারপর সেদিন রাত্রে যখন আবার অরুণা বেরিয়ে গেল ঘরের থেকে বিভূতি আর তাকে অনুসরণ করলে না।

মরা জ্যোৎস্নায় নিঃসাড় রাত, খিল খুলে অরুণা গেল বেরিয়ে। সাজগোজ করলো না, স্যান্ডেল পরলো না, ছোট টর্চটাও নিল না সঙ্গে।

বিভূতি স্তব্ধ হয়ে রইলো।

যাক যেখানে খুশি। এত রাত্রে ট্রেন নেই, এত রাত্রে বন্ধুও নেই কোথাও জেগে। তবে একমাত্র মরতে যেতে পারে—নদীর জলে। সে একটা ভয়ানক জানাজানি হয়ে যাবে বটে, কিন্তু যে মরবে সে তো আর কিছু জানতে আসবে না। দুজনে বেঁচে থেকে যে জানাজানি সেইটেই খারাপ। আর তবু, খুনের চেয়ে তো সেটা ভদ্র!

বিভূতি লন্ঠন জেলে তার টেবিলে এসে বসলো।

পেড়ে নিলো একটা বই। যেন রাত জেগে কী একটা গভীর গবেষণায় সে ব্যাপৃত।

কতদূর যেতেই সারদা-পিওনের বাড়ি। দেখতে পেয়েছে সারদা-পিওনের বউ।

'এত রাত্রে বাইরে, মা?'

'দেখছ না কী গুমোট করেছে। বাইরে তাই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'একলা কেন? বাবু আসেন নি সঙ্গে?'

'এসেছেন বৈ কি। ঐ এগিয়ে পড়েছেন খানিক।'

লজ্জায় জিভ কেটে ঘোমটা টেনে সারদা-পিওনের বউ জানলা থেকে সরে গেল।

যেন বাবুকেই ধরতে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছে অরুণা। কোথায় যাচ্ছে, জানে না—একবার ভাবছে স্টেশনে, একবার ভাবছে থানায়, আরেকবার ভাবছে নদীর জলে। স্বামী যে তাকে আজ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই কথাটার সে আজ চরম ঘোষণা করবে।

কাছেই দেখলো ঝলমল করছে নদী। কী ভেবে ঢাল বেয়ে জলের দিকেই সে নেমে গেল।

সেখানেও নিস্তার নেই।

সেখানে মাখন-জেলে মাছ ধরছে।

'এখানে মা, এত রাত্রে ?'

'আর বোলো না, তোমার বাবুর ভীষণ পেটে ব্যথা, একটা শেকড় খুঁজতে বেরিয়েছি।'

'কী শেকড় ?' মাখন ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

'নাম বলতে নেই। নাম বললেই গুণ চলে যায় ওষুধের।' সামনের একটা ঝোপ-ঝাড়ের দিকে অরুণা অগ্রসর হলো : 'মাঝরাতে উঠে স্ত্রীকে গিয়ে উপড়ে তুলে আনতে হবে। পরে বেটে খাওয়াতে হবে রুগীকে।'

'আলো নেই, খুঁজে বার করবে কী, মা ? শেকড় ভেবে শেষকালে সাপ-খোপ—'

'সত্যি—' অরুণা রাস্তায় উঠে এলো।

তারপর কোন দিকে না-জানি তাদের বাড়ি। অরুণা অন্ধকারের উপর অন্ধকার দেখলো।

কে-একটা লোক তার পিছু-পিছু আসছে। চেয়ে দেখলো চেনে না লোকটাকে।

অরুণার ভয় করতে লাগলো। সামনে একটা গলি পেলো, তার মধ্যে গেল ঢুকে। আশ্চর্য, লোকটাও তার পিছনে।

মুহূর্তে অরুণা রুখে দাঁড়ালো। বললে, 'কী চাই আপনার ?'

'মনে হচ্ছে আপনি যেন কোথায় যাবেন, খুঁজে পাচ্ছেন না। কোথায় যাবেন আপনি ?' পিছন থেকে লোকটা প্রশ্ন করলে। ব্যবহারটা ঠিক পরিচ্ছন্ন না হলেও কথার স্বরটা বেশ বিনীত।

'আমি বিভূতিবাবুর বাড়ি যাবো।'

'সেটা ও দিকে কোথায় ? আসুন এদিকে।' বলে সে-গলির মধ্যেই লোকটা অরুণাকে হঠাৎ আকর্ষণ করে বসলো।

অসহায় আতঙ্কে অরুণা চেঁচাতে যাচ্ছিলো, বিভূতি তাকে সবলে পার্শ্বসংলগ্ন করে অস্ফুটগলায় বললে, 'চেঁচিয়ো না, লোক-জানাজানি হয়ে যাবে যে।'

৭১। মা নিষাদ

কাজটা খুব তাড়াতাড়িই চুকে গেল যাহোক। এখন শিবদাস কী করে, কোথায় যায়!

ভেবেছিল অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখবে। ফাইলটা খুঁজে পেতেই লেগে যাবে ঘন্টাখানেক। কিংবা গিয়ে হয়তো দেখবে অফিসর লাঞ্চ খেতে বেরিয়েছে। তা হলে কতক্ষণে ফেরে তার ঠিক কী। স্বস্তিতে প্রতীক্ষা করতে পারবে শিবদাস। যদি লাঞ্চে না বেরোয়, ক্যান্টিন থেকে আনিয়ে ঘরে বসেই টিফিন করে, তাহলে সে সময় দু-একজন বন্ধু কোন না জুটবে। আর একবার আড্ডার মধ্যে পড়লে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা কষ্টকর।

সে ক্ষেত্রে চারটে বাজিয়ে, নিশ্চিন্তে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে শিবদাস।

কিন্তু অন্য রকম হয়ে গেল। অফিসারকে পাওয়া গেল তার চেয়ারে, ফাইলটা টেবিলের উপর, আর ডিলিং ক্লার্ক পাশে দাঁড়িয়ে। এমনও হল না যে একটা লোক আগে থেকে বসে আছে, অপেক্ষা করতে হবে।

আধঘন্টার মধ্যেই কাজ শেষ। কিছুটা এগিয়ে জি-পি-ওর ঘড়ি নজরে পড়ল। ছি ছি মোটে এখন দেড়টা। এখন কোথায় যায়, কী করে!

বাড়ি ফেরার কথা ভাবতেও পারে না। আস্তে-আস্তে প্রায় নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে এ পর্যন্ত বেশ ভাবা যায়, সিঁড়ির মুখে বন্ধ দরজায় টোকা মারছে এও না হয় কল্পনা করা চলে, কিন্তু তারপর? দরজা খুলে দেবে কে? ডেকে নেবে কে ভেতরে? ভাবতেই শিবদাসের বুকের মধ্যিখানটা এতটুকু হয়ে গেল।

বাড়ির মধ্যে এখন, এ সময়টায়, মোটে একজন প্রাণী উপস্থিত। সে আর কেউ নয় স্বয়ং বিভাবতী।

আরো একদিন দুপুরে বেরিয়ে দুটো-তিনটের মধ্যে ফিরেছিল শিবদাস। আঁচল লুটোতে-লুটোতে উঠে এসেছিল বিভাবতী। দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, 'এরই মধ্যে হয়ে গেল?'

সে কী লজ্জা, এরই মধ্যে হয়ে যাওয়া! চারটে-পাঁচটার আগেই বাড়ি ফিরে আসা।

দরজাটা ফের বন্ধ করতে করতে বিভাবতী বলেছিল, 'আমার ঘুমটা নষ্ট করে দিল! একেবারে চারটে বাজিয়ে বাড়ি ফেরা যেত না?'

দুপুর একটা থেকে চারটে পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র ঘুমোয় বিভাবতী। আজ ত্রিশ বছর ঘুমুচ্ছে।

'ত্রিশ বচ্ছর?' হিসেবে ভুল ধরতে চাইত বিভাবতী।

গণনায় অব্যর্থ শিবদাস। 'আটাশ বছর চাকরি করেছি আর রিটায়ার করেছি দু বছর। আটাশে আর দুয়ে যোগ করলে কত হয়?'

'তুমি তো এ দু বছর বাড়িতে বসে থেকে আমার ঘুম দেখছ। বাকি আটাশ বছরের তুমি কী জানো? বাকি আটাশ বছর তো দুপুরে তুমি আপিসে, বাড়ির বাইরে। আমি কী করেছি না করেছি তা বলো কী করে?'

'এ দু বছর ঘুমের যা নমুনা দেখছি তা থেকে বলি।' মাথা চুলকেছে শিবদাস : 'আটাশ বছর একটানা সাধনা করা না থাকলে দু বছরে এমন পাকাপোক্ত ঘুম হয় না।'

'কিন্তু তুমি একটা সমর্থ পুরুষমানুষ হয়ে কী করে যে দুপুরে ঘুমুচ্ছ দু বছর, ভাবতে লজ্জায় মিশে যাই মাটির সঙ্গে।'

লজ্জায় শিবদাসও মিশে যায়। কিন্তু করবে কী? রিটায়ার করার পর কর্তৃপক্ষের কাছে কত ঘোরাফেরা করেছে একটা রি-এমপ্লয়মেন্ট-এর জন্যে, কিন্তু পাত্তা পায় নি।

'আপনার মাথায় চুল পেকে গিয়েছে।' কর্তৃপক্ষের মুখে এই এক বুলি।

'ওটা আমাদের বংশের বৈশিষ্ট্য। চুল পেকে গিয়েছে বলে আমি তো আর অথর্ব হয়ে যাই নি। যে বয়সে আর পাঁচজন রি-এমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছে আমারও সেই বয়েস।'

'তা হলে কী হবে? সবাই আপনার মাথার চুল দেখে বলবে, ঐ দেখ, আর রাজ্যে লোক ছিল না, কোত্থেকে এক বুড়োকে এনে বসিয়েছে।'

'বুড়ো না হলেও বুড়ো বলবে?'

'তা বলতে, গালাগাল দিতে, বাধা কী! দিলেই হল। তা ছাড়া—'

'কী তা ছাড়া?'

'তা ছাড়া আপনার অবস্থা ভালো। আপনি একখানা বাড়ি করেছেন।'

'তা ছোটখাটো একখানা করেছি। রিটায়ার করে কে না করে?'

'নিচের তলাটা ভাড়া দিয়েছেন।'

'কেন দেব না? আমার ফ্যামিলি ছোট, দুই ছেলে আর আমরা স্বামী-স্ত্রী—অক্লেশে ভাড়া দেওয়া যায় নিচেটা। বলুন, আপনি হলে দিতেন না?'

'তা ছাড়া আপনার বড় ছেলে ভালো চাকরি করে।'

'হ্যাঁ, বার্নার-মরিসনএ আছে, সাতশো টাকা মাইনে। ছোট ছেলেটা স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনে গিয়েছে ডক্টরেটের জন্যে।'

'তবেই দেখুন—'

'কী দেখব? আর্থিক অবস্থা দেখে রি-এমপ্লয়মেন্ট হবে নাকি? না কী যোগ্যতা দেখবেন? লোকটা দুঃস্থ বা কন্যাদায়গ্রস্ত বা অনেকগুলো তার নাবালক শিশু আছে এই বিবেচনায় চাকরি হবে?'

'এ সব বিবেচনা করতে হবে বৈকি। আপনার যখন ডিপেন্ডেন্ট নেই—'

'ডিপেণ্ডেন্ট নেই মানে? আমার স্ত্রী ডিপেণ্ডেন্ট। তার দ্বিপ্রহরের ঘুম আমার ডিপেণ্ডেন্ট।'

'ঘুম?'

'দুপুরে আমি আপিসে আবদ্ধ ছিলাম বলেই আটাশ বচ্ছর একটা থেকে চারটে একটানা ঘুমুতে পেরেছেন। এখন আমি ঘরে এসে বসেছি বলে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। আর ঘুমের ব্যাঘাত হলেই ব্লাডপ্রেশার।'

'কেন, আলাদা ঘরে থাকলেই হয়!'

'কী যে বলেন! উপরে ঘর তো তিনখানা। একখানা বড় ছেলের, আরেকখানা জিনিসপত্রে ঠাসা, ছোট ছেলে ফিরলে ছোট ছেলের হবে। আর তৃতীয়খানা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর।'

'আপনার বড় ছেলের বিয়ে হয়েছে?'

'না, হয়নি এখনো। তবে এবার হবে। সম্বন্ধ আসছে।'

'যতদিন না হচ্ছে ততদিন দুপুরবেলাটা আপনি আপনার ছেলের ঘরে বসে কাটান। গৃহিণীকে রাখতে দিন তাঁর পূর্বাবস্থা।'

'অসম্ভব। ছেলে যতক্ষণ না থাকে ততক্ষণ দোরে তালা ঝোলানো। ছেলের ফিরতে-ফিরতে আটটা। তাই ওঘর আর আমাদের কাজে আসে না।'

'তবে ছেলের বিয়ে হয়ে গেলে?'

'তখন আর তালা ঝোলাবে কোনখানে? তখন ওর বউ তো আমাদের হেপাজতে, আমাদের তত্ত্বাবধানে, যা বলব তাই শুনবে। কিন্তু সে কবে আসবে, ভবিতব্য জানে।'

'ছোট ছেলের ঘরটায় যান না।'

'কতদিন স্ত্রীকে বলেছি ঐ ঘরেই আমার একটু জায়গা করে দাও। বলেছেন ঐ ধুলো বালি আবর্জনার মধ্যে তোমার জায়গা হয় না। তোমার একটা মান নেই? শুনুন কথা! চাকরি থেকে বার হয়ে যাওয়া সরকারী বুড়োর আবার মান! শিবের খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা। আমি বলি কী, রিটায়ার করার পর আমি তো এখন জিনিস হয়ে গিয়েছি, আমি তোমার ঐ জিনিসপত্রের সামিল হয়ে সেখানেই পড়ে থাকি গে। তাতেও আবার মায়া! বলুন, তবে আমি কী করি, কী করে আমার দুপুরগুলো কাটাই ভদ্রভাবে?'

'দুপুর কাটাবারই জন্যে আপনাকে তা হলে চাকরি দিতে হবে?'

'সত্যি কথা বলতে কী, শুধু দুপুর কাটাবার জন্যে। আর সেটা বুঝতেই পাচ্ছেন, মানী চাকরি। নইলে কী রকম উচ্ছন্নে গিয়েছি দেখুন, রিটায়ার করার পর থেকে দুপুরে সমানে ঘুমুচ্ছি দু বছর। চাকরিতে থাকতে দুপুরের রোদের কী রকম চেহারা তাই জানতাম না।'

'না ঘুমিয়ে ঘরে বসে অন্য কোনো কাজকর্ম করলেই হয়। ধরুন লেখাপড়ার কাজ। রিটায়ার করার পর অনেকেই তো বই লেখে, ধর্মের বই, কিংবা পূর্বস্মৃতি—'

দুপুরে জেগে থেকে কাজ করব? তা হলে ওপক্ষ ঘুমুবেন কী করে? খুটখাট হবে, কাগজ ওলটাবার খসখস, হয়তো একবার চেয়ারটাকে টানলাম টেবিলের কাছে—আর কথা নেই, অমনি ভস্ম থেকে হুতাশন জেগে উঠবেন। তা ছাড়া যাতে আলো না আসে জানালাগুলোও তো বন্ধ করে দেবেন। করুন আপনার লেখাপড়া। সুতরাং জাগন্ত লোকটাকে ঘুমন্ত করে ছাড়বেন। আমাদের রিটায়ারমেন্ট আছে, ওদের তো রিটায়ারমেন্ট নেই। না ঘুম থেকে, না বা রসনা থেকে। সুতরাং—'

এত আবেদন-নিবেদন করেও চাকরি হয়নি শিবদাসের। ঘরের অন্ধকূপেই বন্দী হয়েছে দুপুরগুলো।

একবার মনে হল এখন বাড়ি না ফিরলে কেমন হয়?

যদি আরেকটা কোনো ঘর থাকত। আরেকটা কোনো বিশ্রাম। আরেকটা কোনো ঘনিষ্ঠতা। যেখানে বেকারত্বের ক্ষমা আছে। বার্ধক্যেরও প্রশ্রয় আছে। আছে সমস্ত আলস্যের অভিনন্দন।

হায়, সে মরীচিকাই বা কোথায়? অন্বেষণের অভ্যাস বাঁচিয়ে না রাখলে মরীচিকার পিছনেও ছোটা যায় না।

ডাক্তার ঠিকই বলে, 'জীবনে সিদ্ধ হতে হলে একটি নিষিদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।'

কোথায় সেই নিষিদ্ধা?

ভাবতে-ভাবতে বাড়ির দিকেই পা বাড়াল শিবদাস। আপিস পাড়ায় এমন কোনো বন্ধু নেই যে যার সঙ্গে সহৃদয় গল্প করা চলে। কারু সঙ্গে আজকাল বক্তব্য বিষয়ে সমতা খুঁজে পাওয়াই কঠিন। এমন নিশ্চয়ই উৎসাহ নেই যে ঘুরে ঘুরে দোকান দেখেই দিন কাটাতে পারে। কিংবা মাঠে গিয়ে শুতে পারে গাছতলায়। আর ট্রামে-বাসএ যে ঘুরবে ট্রাম-বাসএ জায়গা কোথায়?

দড়িছেঁড়া গরু আবার গোয়ালের দিকেই ফিরে চলল।

সিঁড়িটা যেখানে দোতলার দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে ছোট একটা মোড়া রেখে এসেছে শিবদাস। পা টিপে-টিপে উঠে গিয়ে সেখানে বসে অপেক্ষা করবে। চারটা বাজো-বাজো হলেই ধাক্কা দেবে দরজায়।

যদি একটা নাতি থাকত, এখুনি, অসময়েই, খুলে দিত দরজা। হ্যাঁ, বয়সে নিতান্ত ছোটই হবে সে, কিন্তু অত্যন্ত দুরন্ত বলে ঘুমুত না সে দুপুরে। হয়তো হাত বাড়িয়ে খিলের নাগাল পেত না, কিন্তু দুষ্টু ছেলে, ঠিক একটা টুল এনে, তার উপর দাঁড়িয়ে খিল ধরত। আর হাসত খিলখিল করে।

কতদিনে এত বড় নাতি হবে তার! নিজের মনেই হেসে উঠল শিবদাস।

নাতি না হোক বড় ছেলের বউ তো হতে পারত। সংসারে আর এক বন্দী বাসিন্দে। সে নিশ্চয়ই তার শাশুড়ির মত বিরুদ্ধ-বিমুখ হত না। নিঃশব্দে উঠে এসে আরো নিঃশব্দে খুলে দিত দরজা।

শাশুড়ি যে ঘুমে সেই ঘুমে। জানতেও পেত না ঘুণাক্ষরে।

না, আর দেরি করবে না। এই মাসের মধ্যেই ছেলের সম্বন্ধ করবে। ছেলে বলে দিয়েছে যে মেয়ে বাবা পছন্দ করবেন তাতেই সে সম্মত। সারাজীবন যিনি সাক্ষী দেখে এসেছেন, তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস করেছেন, তাঁর বিচার ভুল হবার নয়। আর তুমি এত বড় একটা মানী লোক, বলেছে বিভাবতী, তোমার হাঁ-কে আমি না করতে যাব না।

ঘুমিয়ে পড়লে দুপুরটা তবু কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সন্ধে কাটানো আরো কঠিন।

'সন্ধেবেলা ঘরের মধ্যে বসে আছ কী গুম হয়ে?' ঝামটা দিয়ে ওঠে বিভাবতী : 'যাও না, দু দণ্ড ঘুরে এস না।'

কোথায় যায়! কী করে।

পার্কে যাবে? দলের মধ্যে বসে অতীতের গন্ধ শুঁকবে? না, পথে-পথে ঘুরবে আবোল-তাবোল? এত বয়সেও ধর্মে মতি হল না যে, লোকের কাছে উপোসী সেজে ডুবে-ডুবে জল খাবে? এখন কোনো পাঠাগারে ঢুকে বই-ম্যাগাজিন পড়া মানে মেটে হুঁকোয় তামাক খেয়ে গড়গড়ার খোঁজ করা।

কোথাও ভালো লাগে না, নরহরি ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে এসে বসে। আধুনিক সমাজের নানা বিচিত্র কাহিনী শোনায় নরহরি। শোনা কথা নয়, দেখা কথা। হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া-করা কথা। যদি বলেন তো আপনাকে দেখাব একদিন।

'না, না, ভালোও যথেষ্ট আছে।' মুখচোখ গম্ভীর করল শিবদাস।

'বা, ভালোই তো অনেক। তবে খারাপও কিছু মন্দ নয়। কনট্রোলের যা একেকটা হাওয়া উঠছে না থেকে-থেকে—' নরহরি তার ডাক্তারি ব্যাগের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'কিন্তু খারাপ কী, তুমি খারাপ কাকে বলো?'

'একমাত্র দারিদ্র্যই খারাপ। একমাত্র দারিদ্র্যকেই খারাপ বলি।' শিবদাসের কানের কাছে মুখ আনল নরহরি : 'দেখবেন একদিন?'

'কী রকম খারাপ?' অলক্ষ্যে শিবদাসের গলাও মন্থর হল।

'সে আপনি বুঝবেন, আপনার বিচক্ষণ চোখ বুঝবে।'

কী ভেবে পিছিয়ে গেল শিবদাস। বললে, 'দরকার নেই।'

'না, না, দরকার আছে।' ডাক্তারি পরামর্শ দিচ্ছে এমনিভাবে বলে উঠল নরহরি : 'একটুও মন্দের গন্ধ না থাকলে আনন্দ নেই জীবনে। আপনাকে আগেও বলেছি, এখনো বলি, সব সময়েই বলি, জীবনে একটি নিষিদ্ধা না থাকলে সিদ্ধ হওয়া যায় না।' বলে দরাজ গলায় নিজেই প্রচুর হেসে উঠল নরহরি।

'কী রকম খারাপ তবে? শিবদাস আবার কৌতুহলী হল : 'ঐ যারা রাস্তায় বারান্দায় জানলার শিক ধরে—'

'না, না, ওরা কোথায়? ওরা কবে হটে গিয়েছে, সরে পড়েছে, কিংবা গিয়েছে ডাইলিউট হয়ে।'

'তবে তোমার হাতের কাটা-ছেঁড়া অপারেশন-করা রুগীরা?'

'না, তারা ভালো হয়ে বাড়ি ফিরেছে। নির্বিঘ্নে বিয়ে করেছে।'

'তবে এরা কারা?'

'এরা এক নতুন দল। এরা শুধু প্রেমালাপ করে। এদের চাহিদা কম, এরা খারাপ হতে-হতেও খারাপ হয় না। ক্যানিউটের মত ঢেউকে এরা শাসনে রাখে। রাখতে পারে। দেখবেন একটি?'

গলার কাছটা দলা পাকিয়ে এল শিবদাসের। বললে, 'এদের ভবিষ্যৎ কী?'

'বিয়ে নয়তো ভদ্র চাকরি। দারিদ্র্যের জন্যেই তো সব। দারিদ্র্যের সমাধান হয়ে গেলেই আর এটার দরকার হয় না।'

'কিন্তু বিয়ে বা চাকরি সব জায়গাতেই একটা-কিছু এনকোয়ারি থাকে।' বিচক্ষণের মতই মুখ করল শিবদাস: 'সেই এনকোয়ারিতে যদি জেনে ফেলে মেয়েটা এই রকম—'

'বা, সেই রিস্ক তো আছেই।' হাসল নরহরি: 'অফিসারের ঘুষ নেওয়াতেও তো সেই রিস্ক। তাই বলে কি ঘুষ নিচ্ছে না অফিসার?' স্বরের মৃদুতায় অর্থকে তীক্ষ্ণ করল নরহরি: 'কী, চাই? দেখবেন একদিন? একটি বিষণ্ণ সন্ধ্যা রমণীয় করে তুলবেন?'

যেমন অভ্যেস এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল শিবদাস।

'ভয়ের কিছু নেই।' চিরকাল আশ্বাস দিতে অভ্যস্ত তেমনি মসৃণ গলায় বললে নরহরি।

'ভয়ের কথা ভাবি না।' শিবদাস হাসল: 'রিটায়ার করার পর ভয়ও রিটায়ার করেছে।'

'তবে আসুন একদিন।'

'আসব? কোথায়?'

'আমার গাড়িতে।'

'তোমার গাড়িতে?' মূঢ়ের মত তাকাল শিবদাস: 'গাড়ি করে শেষ পর্যন্ত কোথায়? কার বাড়িতে?'

'ঐ গাড়িটাই বাড়ি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাড়িই ভালো।' যেন খানিক আশ্বস্ত হল শিবদাস; 'গাড়িটা চালাবে কে?'

'আমার গাড়ি আমিই চালাব।'

'বা, তা হলে তো আরো ভালো।' বুকজাঁতা পাথরটা নেমে গেল শিবদাসের।

'সামনের সিটে বসে আমি চালাব। আর আপনারা পিছনে বসে দুটিতে প্রেমালাপ করবেন।'

'সেই ভালো।'

'দেখবেন অন্যরকম লাগবে। আর বুঝবেন,' ডাক্তারও দার্শনিক হল : 'সব কিছুর থেকে রিটায়ার করলেও আকাঙ্ক্ষার থেকে রিটায়ারমেণ্ট নেই।'

দিন-ক্ষণ ঠিক হল। ঠিক হল রাস্তার মোড়। আর নরহরির গাড়ি আর তার নম্বর সম্বন্ধে শিবদাসের কোনোই অস্পষ্টতা নেই।

হঠাৎ এক পাশে সরে গিয়ে শিবদাস জিজ্ঞেস করলে, 'কত দিতে হবে?'

'টাকা? না, না, টাকা পয়সা কিছু দিতে হবে না।' নরহরি বুঝি কথায় এবার কাব্যের আমেজ আনল ; 'এই এমনি একটু ঘুরে বেড়ানো। স্বাস্থ্যের জন্যেই ঘুরে বেড়ানো।'

'কী সন্ধেবেলা ঘরের মধ্যে বসে আছ গুম হয়ে?' মুখিয়ে উঠল বিভাবতী ; 'যাও না দু দণ্ড ঘুরে এস না।'

'শরীরটা ভালো নেই।'

'বাইরে খানিকক্ষণ ঘুরে এলেই ভালো লাগবে।'

তবুও গড়িমসি করছে শিবদাস। যেন কত অনিচ্ছা এমনি ক্লিষ্ট করছে চোখমুখ। এ ছলনাটুকুতেও কত রঙ কত রহস্য।

'কী আশ্চর্য, এখন আমি স্নান করে এসে সারা গায়ে-পিঠে পাউডার মাখব।' বিভাবতী হুঙ্কার করে উঠল : 'তোমার জ্বালায় আমার কি একটু প্রাইভেসিও থাকতে নেই?'

'আহা, কী গোপন করে রাখবার মত সম্পত্তি!' বিনা তর্কেই বেরিয়ে গেল শিবদাস। কিছু বলতে পারবে না যদি ফিরতে দেরি হয়। তুমিই ঘরের বার করে দিয়েছ। তুমিই বলেছ ঘোরাঘুরি করে করে শরীর চাঙ্গা করে নিয়ে আসতে। আমার কোনো দোষ নেই।

আজই সেই ধার্য দিন। সোনার হরিণের ধরা পড়ার কথা।

অনেকক্ষণ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে শিবদাস। কোনোদিন দাঁড়ায়নি এমনিভাবে। মাঝে মাঝে রেলস্টেশনে খোলা প্ল্যাটফর্মে গাড়ি-ইনএর জন্যে দাঁড়িয়েছে। একবার এক মন্ত্রীর জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল হাঁ করে। হাসল শিবদাস। কিসের সঙ্গে কিসে, সোনায় আর সিসে!

ঠিক সময়ে নরহরির গাড়ি এসে দাঁড়াল।

উপরে-নিচে দুরকম কাঁচ চশমায়, কোন ভাগে চোখ রাখবে সহসা ঠাহর করতে পারল না শিবদাস, মনে হল, গাড়িটা ফাঁকা এসেছে।

এগিয়ে হাত বাড়িয়ে নরহরিই খুলে দিল দরজা। বললে, 'চলে আসুন।'

এখানটায় বুঝি বেশিক্ষণ দাঁড় করানো যায় না গাড়ি, ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল শিবদাস। না, গাড়ি শূন্য নয়।

'আহা, লাগল?' শিবদাসের কণ্ঠে মমতার সুর এসে লাগল।

'না, লাগেনি কিছু।' গাড়ির মধ্যেই পার্শ্ববর্তিনী হঠাৎ নিচু হয়ে শিবদাসকে প্রণাম করল।

নরহরি স্পিড দিল গাড়িতে। বললে, 'আপনারা নিঃসঙ্কোচে আলাপ-পরিচয় করুন। গাড়ি একটা চলেছে এই শুধু জেনে রাখুন, কে চালাচ্ছে ভুলে যান। জীবন একটা পেয়েছি এই শুধু হিসেবে আছে, কে চালাচ্ছে তার খবরে কী দরকার।' খানিক পরে অন্য আরোহীকে লক্ষ্য করলে : 'তোমার কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই। ইনি কত বড় সম্ভ্রান্ত লোক পরে বুঝবে।'

গাড়ি চলল নরহরির খেয়ালে।

শিবদাসের মনে হল, এ বুঝি সে কোন গ্রহান্তরে এসেছে। এখানে বুঝি সব অতিমানবের বাসা কিন্তু অতিমানবের ভাষা কী তাই তার জানা নেই।

শিবদাস জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'অনীতা চক্রবর্তী।'

'কী করো? পড়ো?'

'না।'

'কদ্দুর পড়েছিলে?'

'আই-এ পাশ করে আর পড়িনি।'

'পড়োনি মানে পারোনি পড়তে।'

'হ্যাঁ, তাই। সংসারের আয়ে আর কুলোল না।'

কী অপূর্ব প্রেমালাপ! এ কথা শুধু নরহরিরই নয় স্বয়ং শিবদাসেরও মনে হল।

কিন্তু এছাড়া বুঝি অন্য আলাপ সম্ভব নয়। মেয়েটি এত সুশ্রী, এত ভদ্র, এত পরিচ্ছন্ন দেখতে। বড় বড় চোখদুটিতে ভয় আর বিষাদ ছাড়াও আরেকটা কী আছে, যা ভয় আর বিষাদেও মুছে দিতে পারেনি। আর গলার স্বরটা কী অকৃত্রিম কোমল! যেখানে গাছ নেই, পাখি নেই, সেখানে এমন কন্ঠস্বর ও কার কাছ থেকে শিখল?

বয়েসটা সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না। তাই শিবদাস ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল : 'ম্যাট্রিক পাশ করেছ কবে?'

বছরটা বললে অনীতা। শিবদাস হিসেব করে দেখল একুশ-বাইশ হবে।

'এখানে এসেছ কবে?'

'দ্বিতীয় দাঙ্গা যেটা হয়ে গেল ঢাকায়-বরিশালে, তখন—'

'এসব আলাপের সময় কি চলে গেছে?' সামনে থেকে টিটকিরি দিয়ে উঠল নরহরি : 'পরে কি আর সময় পাওয়া যেত না?'

দুজনেই চুপ করে গেল।

যে আলাপটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, তাই করা যাচ্ছে না। সেটা হচ্ছে ঐ পাষণ্ড নরহরি তোমাকে কোথায় পেল, কী করে তুমি ওর সংস্রবে এলে, আর কোন অতল অধঃপাতে ও তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে?

মফস্বলে আগে যেখানে নরহরি ডাক্তারি করত এককালে, আমি সেখানে

পোস্টেড ছিলাম। সেই সূত্রে ওর সঙ্গে হৃদ্যতা। পার্টিসনের পর এখানে এসে আবার ব্যবসা ধরেছে, সস্তায় কিস্তি মারবার আশায় ডাইং ক্লিনিং-এর দোকান খুলেছে। ডাক্তারি ডাইং ক্লিনিং। তার মানেই ক্লিনিক আর নার্সিং হোম-এর ব্যবসা। ঘ্রাটন-পাটনের যজ্ঞ। কিন্তু তুমি তো সেরকম নও। তোমাকে তো সে রকম মনে হচ্ছে না।

এসব একটু বিশদ করে নেওয়া দরকার ছিল। সবচেয়ে দরকার ছিল সেই পরামর্শ—ঐ পাষণ্ডটার হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করা যায় কী করে?

কিন্তু সাধ্য নেই গোপনে প্রাণ খুলে আলাপ করা যায়। নরহরি কান খাড়া করে রেখেছে।

অনীতার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল শিবদাস। আদ্যোপান্ত খালি। শাঁখের একটি আংটি পর্যন্ত নেই।

'বাড়িতে ঝি-চাকর নেই?'

'না।'

'নিজেই বাসন মাজো?'

'উপায় কী তা ছাড়া?'

'রান্না?'

'মা করেন, আমিও করি।'

'খুব বড় পরিবার বুঝি?'

'অনেকগুলো ভাই-বোন।'

'বাবা নেই?'

'আছেন।'

'কিছু করেন না?'

'না। দাঙ্গায় মার খেয়ে অচল হয়ে রয়েছেন।'

'তুমি কিচ্ছু করো না?'

'একটা সামান্য ইস্কুল-মাস্টারি আছে।'

'তাতে আর কত হয়! কিছুই হয় না। চলে না সংসার।'

এ কে না জানে! নরহরি বিরক্তিতে হর্ন বাজিয়ে বসল। একটা বস্তাপচা মামুলি কাহিনী শুনতে কী এত আগ্রহ। বিশ্বসংসারে কথা বলবার আর কোনো বিষয় নেই? কথা বলারই বা কী দরকার? স্তব্ধ হয়ে থাকো না। দ্যাখো না স্তব্ধতা কী কথা বলে।

বুড়োকে এবার নামিয়ে দিতে হয়।

হ্যাঁ, সামনে ঐ তিন আলোর মোড়ের কাছে নামিয়ে দিলেই হবে।

মনিব্যাগের বাইরে দুখানা দশ টাকার নোট ভাঁজ করে ছোট্ট করা ছিল পকেটে। গাড়ির মধ্যেই অগোচরে এ প্রক্রিয়াটা সমাধা করেছে শিবদাস। যদি নরহরিকে ডিঙিয়ে গিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসা যায় মেয়েটার সঙ্গে। একটা গোপন জানাজানি।

নামবার সময় নোটের দলাটা অনীতার হাতের মধ্যে গ্নঁজে দিল শিবদাস। প্রত্যাখ্যানের কথাটা ম্নখে ফুটে ওঠবার আগেই অনীতার বাঁকাচোরা আঙ্নলগ্নলি দলাটাকে আঁকড়ে ধরল, ল্নকিয়ে ফেলল।

'ঠিকানাটা?' ম্নখ বাড়াল শিবদাস।

নরহরি হর্ন বাজিয়ে দিল। বলতে দিল না। দিল না শ্ননতে।

হর্ন থামিয়ে নরহরি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার ছেলের বিয়ের কদ্দ্নর? সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছে?'

'হয়নি এখনো। একটি এখনো দেখতে বাকি।'

'দেখে ফেল্নন চটপট। ফাইন্যাল করে ফেল্নন।'

বিভাবতীই একদিন ঠিকানাটা দিলে। নগরের মধ্যে পল্লী, পল্লীর মধ্যে নগর. সে এক মস্ত ঠিকানা। বললে,'এই একটি দেখলেই লিস্টি শেষ হয়।'

খ্নঁজেপেতে একাই গেল শিবদাস। সমস্ত মনপ্রাণ বলছে এ ঠিকানা অনীতার ঠিকানা। আর যাকে দেখবে, সে-মেয়ে অনীতা ছাড়া কেউ নয়।

ঠিক-ঠিক অনীতা এসে দাঁড়াল।

এক ম্নহ্নর্ত তাকিয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। ম্নখ নামিয়ে রইল। এক পোঁচড়া কালিতে সমস্ত রঙ-রেখা ম্নছে একাকার হয়ে গেল।

হোক। তব্ন শিবদাসের মনে হল সেই অন্ধকারের চেয়ে এই রোদ্দ্নরের অনীতা ঢের বেশি আপনার।

'তোমার নাম কী?'

'অনীতা চক্রবর্তী।'

'কী করো? পড়ো?'

'না।'

'কদ্দ্নর পড়েছিলে?'

'আই-এ পাশ করে আর পড়িনি।'

সন্দেহ কী, সেই অনীতা। সেই দ্নখানি রিক্ত হাত, আড়ষ্ট করতল।

বাড়ির লোক বেশি কুন্ঠিত। এত কইয়ে-বইয়ে চালাকচতুর মেয়ে সে এমন ঘাবড়াচ্ছে কেন? তারি কিসের এত লজ্জা, কিসের এত দৈন্য? এমন একেবারে অপরাধীর মত ম্নখ করে থাকবার কী হয়েছে!

তা হোক। ওকেই আমি নেব। সমস্ত লজ্জা, সমস্ত দৈন্য থেকে উদ্ধার করব ওকে। ওকে পাতাল দেখতে ডুবে যেতে দেব না। ওকে স্থান দেব। প্রতিষ্ঠা দেব। ও আমার ঘর-সংসার আলো করে রাখবে।

বললে, 'একেই আমি পছন্দ করলাম। এখানেই বিয়ে দেব ছেলের।

মেয়েরা উল্ন দিয়ে উঠল। শাঁখ বাজাল। আনন্দের কলরোল পড়ে গেল।

'কিন্তু, শেষ পর্যন্ত বিভাবতীই অন্নযোগ করল ; 'কই, মেয়ের দল তো কথা পাকা করতে এল না! নাও, ওঠো, বাড়ির বার হও, খোঁজ করো।'

নরহরির কাছে খোঁজ করতে গেল শিবদাস।

সে কী কথা? এমন হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে? ভরা এনে পারে ডোবায়?

'কি রে? তুই নাকি রাজি নোস?' একেবারে ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়ল নরহরি।

'না।'

'কেন?'

'আমি ঝুটা হয়ে গিয়েছি।'

'সে কী? তা কী করে হয়?'

'লোকটা আমাকে টাকা দিয়েছে।'

'টাকা? এত করে বারণ করলাম—' নরহরির মুখ বেদনার্ত হয়ে উঠেছে: 'কত টাকা?'

'কুড়ি টাকা।'

'ছি-ছি, দিল?' বেদনা নরহরির মুখে শাসনের মূর্তি ধরল; 'তুই নিতে গেলি কেন? কত ছেলেবেলা থেকে তোর বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব—তোদের সঙ্গে। তুই এমন লোভী, এমন দুর্বল তো কোনোদিন ছিলি না। টাকাটা কেন ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলি না মুখের উপর? আমাকে কেন বললি না, নরুকাকা, লোকটা টাকা দিচ্ছে—'

'কেন বলব? কেন ছুঁড়ে ফেলব?' অনীতা দু হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকল কান্নায়; 'কুড়ি টাকার যে ভীষণ দরকার। ছোট ভাইটার ফিস দেবে কে? বাবা বলে দিলেন, পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই। নাম কাটিয়ে আন।'

'তা যাক গে।' অনীতার কাঁধের উপর হাত রাখল নরহরি। বললে, 'ওর জন্যে ভাবিসনে। ও টাকা শোধ হয়ে যাবে।'

'না, তা হয় না।' মুখ আরো ডুবিয়ে দিয়ে অনীতা বললে; 'আমি এক বাড়িতে দুজনের হয়ে থাকতে পারব না কিছুতেই।'

৭২। টান

একে পীর-বংশ তার জমিদার। আল্লারাখা চোখে অন্ধকার দেখলে।

পেয়াদা বললে, 'কি, রাজি?'

মেঘলা মুখে ভার-ভার গলায় আল্লারাখা বললে, 'ভেবে দেখি।'

'ভাবাভাবি কিছু নয়। সাক্ষী তোমাকে দিতেই হবে। জমিদার না মানো, পীর তো মানবে?'

'তা মানতে হবে বৈকি।' আল্লারাখা নির্বোধ চোখে তাকিয়ে রইল।

'তবে ঐ কথা রইল। আর নড়-চড় নয়। মনে থাকে যেন, আসছে সাতাশে

তারিখ মামলা। তা ঠিক সময়ে আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে যাব। তুমি ঠিক থেকো।'

হ্যাঁ-না কিছুই বললে না আল্লারাখা। নিঝুমের মত হুঁকো টানতে লাগল।

মামলার দুদিন আগে আবার এল পেয়াদা। বললে, 'পশুর্ মামলা, দশটার মধ্যে আদালতে চলে যাওয়া চাই। পীরসাহেব এই দুটো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমাকে। নাও, ধরো। তোমার খোরাকি আর ভর দিনের মজুরির খেসারৎ। আর, জানো তো, এর মাঝে আমার আট আনা বখরা।'

আল্লারাখা হাতে করে ধরল না টাকা দুটো। বললে, 'না, ও তুমি ফিরিয়ে নাও।'

'কেন, গোসা হল নাকি? সাক্ষীর বারবারদারি থেকে আট আনা পেয়াদা-কোটালের প্রাপ্য। এই দেশদেশী দস্তুর। তুমি আবার এ একটা কী মামলা বাধালে?'

'না, ও তুমি ষোল আনাই নাও না। ও আমি চাই না।'

'কেন, মিনিমাগনায় সাক্ষী দেবে? ন্যায্য মজুরিটাও নেবে না? জমিদার বলে কি এত খয়েরখাঁই?' পেয়াদা রাগ করে উঠল। আল্লারাখার হাতের মুঠটা খোলবার চেষ্টা করতে-করতে বললে, 'নাও, অত ভয়-ভক্তির দরকার নেই। টাকা যখন পাঠিয়ে দিয়েছে তখন না নেওয়ার কোনো মানে হয় না। তোমার বোকামির জন্যে আমার মুনাফাটাও কাটা যাক!'

হাতের পাঁচ আঙুল কঠিন প্রতিরোধে আঁট করে চেপে ধরে রেখে আল্লারাখা বললে, 'তোমার ভাগ তুমি নাও গা, ষোল আনাই নাও গা, আমি কিছু বলতে যাব না।',

'কেন, কি হল?' মুঠ ছেড়ে দিল পেয়াদা।

অনুচ্চ গম্ভীর গলায় আল্লারাখা বললে, 'আমি সাক্ষী দেব না পেয়াদা-সাহেব।'

পেয়াদা হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল। এমন তাজ্জবের কথা জীবনে সে শোনেনি। জমিদারের জন্যে প্রজা সামান্য একটা মৌখিক সাক্ষী দিতে নারাজ হবে, এ একেবারে ধারণার বাইরে।

'সাক্ষী দেবে না মানে?' পেয়াদা প্রায় গর্জন করে উঠল।

'আমাকে মাপ করো আপনারা।' কাকুতিতে চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠল আল্লারাখার, 'আমাকে বাদ দাও। আমাকে হাজির হতে বোলো না। সাক্ষীমান্যর দরখাস্তে নাম দিও না আমার। আমি পারব না, পারব না মিথ্যে বলতে।'

থ হয়ে রইল পেয়াদা : 'কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একটা শেখানো কথা বলে আসবে, তার আবার সত্য-মিথ্যা কি?. বেফাঁসে-বেভুলে কতশত অমন মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে অহরহ, তার জন্যে আবার মাথাব্যথা কিসের?'

'কিন্তু ধর্মত হলফ নিয়ে বলতে পারব না মিথ্যে কথা। বলতে পারব না, একটি অসহায় প্রতিবেশী নাবালকের সম্পত্তি কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্রে।'

আগুন হয়ে পেয়াদা বারে বারে মাটিতে লাঠি ঠুকতে লাগল।

তবু একচুল টলল না আল্লারাখা। বললে, 'ছেলেটার মুখ দুবেলা নিত্যি আমি দেখি আসতে-যেতে, হাত বাড়ালে হাসতে হাসতে আমার কোলে ওঠে, আধ আধ বুলিতে আমাকে তাতা বলে—চাচা বলতে পারে না—না, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে ওকে আমি পথের ভিখিরি করতে পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু এর পরিণাম?'

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল আল্লারাখার। বললে, 'আমি কোন অধন-অধম লোক, আমার কথার দাম কি! লিখতে জানি না; ক বলতে হ বলে ফেলি। তার চেয়ে অনেক ভালোমানুষ ভদ্দরলোক পাবে, দু কথা বলতে পারবে ভেবে-চিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে। তাদেরকে পাকড়াও কর।'

এ কথা বললে কি হয়? ঠিক লাগ উত্তরে আর পুবে আল্লারাখার জমি। দখল সম্বন্ধে তার সাক্ষ্যেরই দাম বেশি। পশ্চিমে খাল, দক্ষিণে গোচর। সুতরাং সে ছাড়া সাক্ষী নেই দখলের। নিজের চোখে দেখা চষা-খোঁড়া ধান কাটার সাক্ষী।

কিন্তু তাই বলে নাবালকের পক্ষে তার খুড়ো যে জমি চাষ করছে, আল্লারাখা বলবে সে জমি চাষ করেছে সে নিজে, জমিদারের বরগাদার হয়ে? মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে একটা নিরীহ অবোধ শিশুকে বঞ্চনা করবে? ধর্মের নামে হলফ নিয়ে, আল্লার নিচে যে হাকিম, সেই হাকিমের দরবারে?

কিন্তু যে পাতে খায় সেই পাতই ছিঁড়বে আল্লারাখা? আখেরে তার কি হবে তার খেয়াল আছে?

আল্লারাখা মুখ নিচু করে ভাবতে লাগল। দেখল অস্পষ্ট একটা সর্বনাশের চেহারা। কিন্তু তাই বলে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে একটি নাবালক শিশুর সে সর্বনাশ করবে, মনের মধ্যে কিছুতেই সায় খুঁজে পেল না।

অনেক তম্বি-তাড়না করে চলে গেল পেয়াদা।

কলকে নিবে গেলেও হুঁকো ছাড়ল না আল্লারাখা। টানতে লাগল একভাবে। ভাবখানা এই, নিবে-পুড়ে যাক, আমার কথা আমি ধরে থাকব। কিছুতেই ঠাঁই নাড়া হব না।

কথায় বলে, ঠেলায় পড়ে ঢেলায় পেন্নাম। গরিবের দুয়ারে হাতীর পাড়া। ক্ষুদ্দুর চাষা আল্লারাখার ঘরে খোদ জমিদার! পীর-পেগম্বর!

কোথায় বসতে দেবে, কি করবে, কি বলবে, দিশ-বিদিশ বুঝতে পারে না আল্লারাখা।

লোকলস্করের ভিড়-ভাড় সরে গেল এক ভিরকুটিতে। বাজে লোক কাছে ঘেঁসতে পেল না। আল্লারাখার সঙ্গে গোপন সল্লা আছে জমিদারের

জমিদারের আজ বড় দায়। উমেশ বাউরির দেড় বিঘের জমির বন্দটা তাঁর চাই।

আমিন-কানুনগোর সঙ্গে ষড় করে পরচায় ঐ জমি তিনি তাঁর নামে খাসে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু উমেশ বাউরি দখল ছাড়ে না যে! বলে, বাপুতি সম্পত্তি, বরাবর খাজনা দিয়ে দখল করে আসছি, জমিদারের খাস হল কবে? চাষা-ভুষো মানুষ, ফন্দি-ফিকিরের ধার ধারি না, জমিতে বুক দিয়ে পড়ে থাকব। দেখি কে আমাকে উচ্ছেদ করে!

সেই উমেশ মারা গেল। রেখে গেল শুধু এক নাবালক ছেলে—দু বছরের শিশু। আরো অনেক ছেলে-মেয়ে হয়েছিল উমেশের, কিন্তু একটাও বেঁচে নেই। অসুখে-বিসুখে শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু এই টিমটিমে পিদিম—মায়ের কোল পোঁছা। ঝড়ের ঝাপটা থেকে কে এবার বাঁচায় একে? কে দেয় আড়াল-আবডাল?

এইবার জমিদার আর্জি করল আদালতে। খাস-দখলের আর্জি।

নাবালকের পক্ষে কে করবে তদবির-তালাস! উমেশের ছোট ভাই মহেশ আছে বটে, কিন্তু দু ভাই ঝগড়া করে অনেক আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছে। ভাগ বাঁট করে খারিজ করে নিয়েছে জমি-জমা। দু বাড়ির মাঝখানে তুলে দিয়েছে তেশিরা মনসার বেড়া—শেয়াল কাঁটার জঙ্গল।

সেই বেড়া টপকে মহেশ আজ এল বটে, কিন্তু নিঃস্বার্থ স্নেহের টানে নয়, যদি মাতব্বরি করার সুযোগে নিজের কোলের দিকে কিছু ঝোল টানতে পারে!

উমেশের বউ বললে, 'নাবালকের দেখাশোনা করবার আর কে আছে আপনি ছাড়া! যদি জমিটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, কোনোমতে মানুষ হতে পারবে ও, নইলে পাঁচ দোরের কুকুর হয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবে। মাথার উপরে এক কুটো খড়-পাতা থাকবে না—'

মহেশ আপনা জনের মত বুক দিয়ে পড়ল। বললে, 'আমি ছাড়া আর কে আছে? আমিই নেব সব ভার-বোঝা, আমিই করব সব দেখা শোনা। আপনার কিচ্ছু ভাবনা নেই। কারু সাধ্যি নেই জমি ছিনিয়ে নেয় আমার হাতের থেকে।' মহেশ তার চাষাড়ে হাতের থাবাটা অলক্ষ্যে একবার প্রসারিত করল।

কিন্তু মহাবল জমিদারের সঙ্গে কি সে পারবে? কেন পারবে না? যুধিষ্ঠির পারেনি দুর্যোধনের সঙ্গে?

'জমিদার মিথ্যে করে পরচায় খাস রেকর্ড করিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের দখল তো মুছে দিতে পারেনি! আগে দাদা দখল করেছে; এখন আমি, তার ভাই, দখল করছি। আমার দখল নাবালকের পক্ষে। আমরা এক বংশ, এক রক্ত—একই ফসলে আমাদের গায়ের তাকৎ।'

'কিন্তু খাজনা দেয়ার চেক-রসিদ তো একখানাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

মুখে বললে উমেশের বউ : 'কখনো চালের বাতায় কখনো বা কাঁথা বালিশের নিচে গুঁজে রেখেছে। কখন কোনটা খোয়া গেছে কেউ খেয়াল করতে পারেনি। এখন একখানাও রসিদ না পেলে আমরা যে খাজনার প্রজা, তা প্রমাণ করবে কি করে?'

'কেন, সাক্ষী নেই? পাড়াপড়শি নেই? ভাইভায়াদ নেই? তারা সব দেখেনি নিজের চক্ষে?'

'তুমি নাকি সাক্ষী দিতে চাও না?' জমিদার তাকালেন কুটিল চোখে।

আল্লারাখা চুপ করে রইল।

'কেন বাধছে কোথায়?' জমিদার ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

মুখ কাঁচুমাচু করে আল্লারাখা শুধোল : 'কি বলতে হবে হুজুর?'

'বলবে, ঐ দেড় বিঘে জমি জমিদারই বরাবর খাসে দখল করে এসেছে। ও জমি কোনো দিন প্রজাবিলি ছিল না, উমেশ কোনোদিন দখল করেনি নিজ চাষে। বলবে। মুনিষকিরষান দিয়ে জমিদারই আবাদ করিয়ে এসেছে—তুমিই একজন সেই মুনিষকিরষান।'

আল্লারাখার মুখ যন্ত্রণায় কালো হয়ে উঠল। কাতর স্বরে বললে, 'সে যে মিথ্যে বলা হবে হুজুর!'

'ও, কী আমার সত্যবাদী এসেছেন!' জমিদার দাঁতখামাটি দিয়ে উঠলেন। শেষে মুখ বাড়িয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'কেন, ওদের জন্যে আবার মায়া কিসের? ওদের বেলায় আবার সত্য-মিথ্যা কি! ওরা তো বেধর্মী।'

'বেধর্মী!' আল্লারাখা হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল।

'ওরা তো আমাদের শত্রু।'

'শত্রু!'

উমেশের সঙ্গে কত দোস্তালি ছিল আল্লারাখার! এর গরু ওর হাল, ওর গরু এর হাল—বদলাবদলি করে কত চাষ করেছে তারা। এর খাটুনি ও খেটে দিয়েছে। ওর খেজমৎ এ। একই হুঁকোয় তামাক খেয়েছে একই গাছের ছায়ায় বসে। একে অন্যের ছেলে কোলে পিঠে করেছে। আপনার মনে করে নিজের গায়ে মুছে নিয়েছে পরের ছেলের ধুলোমাটি।

শত্রু বললেই শত্রু হয়ে গেল?

'শুধু তাই?' জমিদার চোখ পাকালেন : 'ওরা-আমরা ভিন্ন জাত, এ-দেশ ও দেশ, দুই বিদেশের লোক।'

'তা কি করে হয়? দুই বিদেশের লোক তো, আছি কি করে ঘেঁসাঘেঁসি করে? একই খানা খাই, একই অসুখে ভুগি, একই ভাষায় কাঁদি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে। একই খাজনার ডিক্রিতে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাই।'

'যা বলি তা শোন্!' জমিদার ধমক দিয়ে উঠলেন : 'মোটেই তোরা এক নোস। ও বসে পুবে তুই পশ্চিমে, ও খায় পাতের এ-পিঠে তুই ও-পিঠে, ও কাটে ঘাড়ে তুই গলায়। ওর গাড়ু তোর বদনা। হাজার রকম অমিল, হাজার

রকম অবস্থিত। ওর জন্যে ভালোমানসি হয়তে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।'

আল্লারাখা তাকাতে লাগল এদিক ওদিক।

'মোট কথা, কালকে আমার মোকদ্দমা। আমার পক্ষে এ সাক্ষীটা তোকে দিতেই হবে।' জমিদার জবরদস্ত গলায় বললেন, 'তুই হচ্ছিস পাশাড়ি জমির দখলকার, তোর সাক্ষীটাই সব চেয়ে তেজালো! তাই কাঠগড়ায় হলফ নিয়ে দাঁড়াতেই হবে তোকে। এক কথায় শত্রু নিপাত করে আসবি।'

শুকনো গলায় ঢোঁক গিলল আল্লারাখা। জমি-বাড়ি স্ত্রী-ছেলে হাল-গরু কারুর কথা মনে পড়ল না। শুধু মনে পড়ল ধর্মের কথা, সত্যের কথা। আশ্চর্য শান্তস্বরে বললে, 'গোস্তাকি মাপ করুন, হুজুর, দোস্ত-দুষমন বুঝি না, ধর্মের ঘরে দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যে বলতে পারব না কিছুতেই।'

জমিদার থ বনে গেলেন। প্রথমে রাগ, পরে মিনতি. কিন্তু এক চুল টলল না আল্লারাখা। শেষকালে জমিদার চরম অভিশাপ দিয়ে উঠলেন : 'তোর সর্বনাশ হবে।'

সর্বনাশটা এমন চেহারা নিয়ে দেখা দেবে বুঝতে পারেনি আল্লারাখা। ঘর-দোরে আগুন লাগল না, ক্ষেতের ধান তছরুপ হল না, গোয়াল ঘর থেকে চুরি গেল না গরু-বাছুর। ও সব কোনো নির্যাতনই নয়। শুধু দু-তিন বছরের ছোট ছেলেটার ভেদ-বমি সুরু হল। সুরু হতে না হতেই এখন-তখন!

সব কথা শুনে আল্লারাখার স্ত্রী ঝামরে উঠল ঃ 'এ তুমি করেছ কি? উনি শুধু আমাদের জমিদার নাকি? উনি আমাদের পীর না? আমরা ওঁর মুরিদ না. যজমান-শিষ্য না? তাঁকে তুমি ফিরিয়ে দিলে বাড়ির দুয়োর থেকে? তাঁর সামান্য একটা কথা রাখলে না? ছেলের গায়ে শাপ লাগালে?' আল্লরাখার স্ত্রী আফুট কাঁদিতে লাগল : 'যাও ছুটে গিয়ে বলে এস তাঁকে, সাক্ষী দেবে তুমি. যা বলতে বলবে তাই মুখস্ত বলবে, যে জমি তাঁর দরকার তাই পাইয়ে দেবে তাঁকে। যাও, শিগগির যাও—তোমার নিজের ছেলের চেয়ে পরের এক কেতা জমির দাম বেশি?'

আলারাখা উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটল। জমিদারের বাড়ি নয়, কবরেজের বাড়ি। দু হাতে কবরেজের পা জড়িয়ে ধরে হাপুস চোখে বললে, 'আমার ছেলেকে বাঁচান। ধর্মের মুখ রাখুন।'

হরিনামের ঝুলিতে হাত ঢুকিয়ে কবরেজ মালা ফেরাচ্ছে, বোজা চোখে বললে, 'নামের সময় এসেছিস, এখন দু টাকা।'

দু টাকাই সই। ধর্মের নাম বজায় রাখবে আল্লারাখা।

নামের ঝুলি ফেলে রেখে কবরেজ ছাতা তুলে নিল। রুগী দেখে মাথা নাড়লে। বললে, 'নামুনে লেগেছে। কারুর কুদৃষ্টি পড়েছে নিশ্চয়। শাপ-শাপান্ত লেগেছে। সেই গ্রহদোষ না কাটালে—'

আল্লারাখার স্ত্রী কান্নায় উথল-পাথল করতে লাগল। স্বামীর দিকে

তাকিয়ে ঝামরে উঠল আবার : 'তুমি এখনও যাওনি জমিদারের ঠেঁয়ে, পীরের দরজায়?'

'এই যাই।' আল্লারাখা আবার বেরিয়ে পড়ল।

মিশমিশে অন্ধকার। ধারে-কাছে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে, হাওয়া বইছে শনশনে। পাল্লা দিয়ে ছুটেছে আল্লারাখা।

সটান ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তার ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে বসে পাশা খেলছিল হুমড়ি খেয়ে পড়ল আল্লারাখা। বললে, 'আমার ছেলেকে বাঁচান। ধর্মের মুখ রাখুন।'

ডাক্তার একটা অসম্ভব ফি হাঁকলে। একে মেঘলা বাতাসের রাত তার উপর এই ঘোরালো অন্ধকার।

'দেব, যা চান তাই দেব। জমি বেচে টাকা শোধ দেব আপনার।'

'নিজের জমি বেচে পরের জমি বাঁচাবে! কী ঘোলা-ধরা বুদ্ধি!' স্ত্রী ধিক্কার দিয়ে উঠল।

অনেক টানা-হেঁচড়া করে একটু সম্বিত আনল ডাক্তার। প্রায় দম বন্ধ করে সমস্ত রাত সজাগ বসে রইল আল্লারাখা—যেন কার পায়ের আওয়াজ শুনবে! পায়ের আওয়াজ শুনবে তার উঠোনে, তার দাওয়ায়, তার ঘরের মধ্যে। ধর্ম আসবে কিন্তু মৃত্যুর বেশে নয়, আরোগ্যের বেশে।

সকাল থেকে অবস্থা খারাপ হতে থাকল। রোদ চড়বার সঙ্গে সঙ্গেই নিঝুম হতে লাগল। আল্লারাখার স্ত্রী এবার আর কাঁদা-কাকুতি না করে বকাবকি সুরু করল। পারে তো দু ঘা বসিয়ে দেয় এই সৃষ্টিছাড়াকে। নিজ হাতে আগুন লাগিয়ে দেয় ঘর-দোরে। ঘর-গুষ্টি জ্ঞাত-কুটুম কেউই আল্লারাখাকে সমর্থন করে না, বাহাদুরি দেয় না। বোকা, গোঁয়ার, অধার্মিক বলে টিটকিরি করে।

'অধার্মিক?' আল্লারাখা ফুঁসে ওঠে।

'তা ছাড়া আবার কি। পীরবংশের তুমি মর্যাদা রাখ না—'

'সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির মধ্য থেকে চাপা কান্নার রোল উঠল।'

আল্লারাখা রোদের দিকে চাইল একবার বাইরে। বললে, 'বেলা কত হল? আদালত ধরতে পারব?' বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে দিলে। তাদের গাঁ থেকে আদালত প্রায় তিন কোশ।

ক' পা এগুতেই উমেশের বাড়ি। বাড়ির কাছের জমিতে উমেশের বিধবা শুকনো ডাল-পাতা কুড়োচ্ছে। ছেলেটা গাছতলায় বসে খেলা করছে দুধ-সাদা একটা ছাগলছানার সঙ্গে।

ছেলেটাকে দেখে আল্লারাখা থেমে পড়ল। সাধ্যি নেই একটু আদর না করে। হাস-হাসন্ত সুস্থ-সুন্দর ছেলেটা। কাছে এসে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে ছড়া কাটতে লাগল আল্লারাখা, 'ঝাঁ গুড়গুড় বাদ্যি বাজে, ঝাঁ গুড়গুড় বাদ্যি বাজে—'

ছেলেটার হাত তুলে তুলে হাসি। বলে—'তাতা, তাতা—'

উমেশের বউকে শুধোল আল্লারাখা : 'মহেশ কোথায়?'

'আদালতে গেছে। মামলার দিন আজ।'

মনে পড়ে গেল আল্লারাখার। থেমে গেল বাদ্যির বাজনা। আবার ছুট দিলে।

আদালত পেয়েছে ঠিক আল্লারাখা। মামলার এখনো ডাক হয়নি। আল্লারাখাকে দেখে জমিদারের গোমস্তা-পেয়াদারা লাফিয়ে উঠল। আর তাদের পায় কে!

কিন্তু আদালতের কাঠগড়ায় উঠে হলপ নিয়ে বললে কি আল্লারাখা? বললে, 'বিরোধীয় জমি উমেশের অবর্তমানে তার নাবালক ছেলের। উমেশের জীবমানে উমেশ দখল করেছে, অবর্তমানে দখল করছে তার ওয়ারিশ।'

'তুমি?'

'আমি এক দিনের তরেও পা দিইনি ঐ জমিতে। ওর এক দানা ধানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।'

বড় কঠিন জায়গা এই কাঠগড়া। মাথা ঘুরে যায়, কি কথা বলতে কি কথা বলে ফেলে। বুক দুর দুর করে, হাতে পায়ে খিল ধরে, সব তালগোল পাকিয়ে গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাই জমিদারের উকিল আল্লারাখাকে সামলে উঠতে সাহায্য করলে : 'বেশ ভেবে-চিন্তে বলো।'

জমিদারের পক্ষে ভেবে-চিন্তে বেশ বলে আসছিল আল্লারাখা, কিন্তু জেরায় আরেকবার জেরবার হয়ে গেল। নিজের মরন্ত ছেলের মুখ না মনে পড়ে চোখে ভাসতে লাগল উমেশের সেই হাসন্ত ছেলের মুখ। বললে, 'না, না। এ জমি উমেশের। উমেশের দখলী।' বলতে-বলতে টলতে-টলতে পড়ে গেল আল্লারাখা।

যখন সুস্থ হয়ে সে বাড়ি ফিরল, দেখল, তার আগেই তার ছেলে শেষ হয়ে গেছে।

শেষ হয়ে গেছে?

মিথ্যে কথা।

হা-ক্লান্তের মত এল সে উমেশের দরজায়। মহেশের একটা ছোট মেয়ে উমেশের ছেলেটাকে কাঁখে করে দাঁড়িয়ে আছে। 'ঝাঁ গুড়গুড় বাদ্যি বাজে'—বলে আল্লারাখা দু হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে বুকে টানতে গেল।

কোত্থেকে মহেশ এল তেড়ে, মারমুখো হয়ে। ঠেলে আল্লারাখাকে সরিয়ে দিলে দু হাতে। বললে, 'বেধর্মী হয়ে আমাদের ছেলে ধরতে যাও কোন সাহসে?'

'বেধর্মী!' আল্লারাখা পাথর হয়ে গেল : 'তাই বলে আমি পর?'

'পর নও? তুমি শত্তুর। শত্তুর বলেই তো বিরুদ্ধ পক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালে।'

কিন্তু কী সাক্ষী দিলাম কি বলতে কী বলে এলাম তা আর তোরা বুঝলি না। যে হেতু দলে পড়ে উলটো দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, অমনি ভাবলি আমি তোদের পর। আমি তোদের বিদেশী! একবার বুঝে দেখলি না আমার কথার কী দাম! চেয়ে দেখলি না আমার মন!

মহেশ ছেলেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। যেন, জমি যায় যাবে, কিন্তু তাদের ছেলে, তাদের বংশধর, তাদের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি যেন বেঁচে থাকে!

'আহা, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক উমেশের ছেলে।' একমনে আশীর্বাদ করল আল্লারাখা।

আর যেমনি ছেলেটার ঐ হাস-হাসন্ত মুখখানা মনে পড়ল, নিজেরও অজানতে আল্লারাখা পথের মাঝখানে নেচে-নেচে ডান হাতে তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠল —'ঝাঁ গুড়গুড় বাদ্যি বাজে, ঝাঁ গুড়গুড় বাদ্যি বাজে।'

৭৩। ঘুষ

ঘরে পর্দা একটা আছে বটে কিন্তু সে একটা ব্যবধানই নয়। মে আই কাম ইন সার—এ সব মামুলি শিষ্টাচারও উঠে গেছে। স্লিপ ঝুলছে না দরজার কড়ায়? ও সব অবান্তর। লেখার ধৈর্য নেই। পার্পাস অফ ভিজিট বা দেখা করার উদ্দেশ্য এমন হতে পারে যা লিখে জানাবার নয়। আরদালি দুটো করে কি? ওদেরকে প্রস্তুত হতে সময় দিলে তো! যদি বাধা দেয় হয়তো বা বাইরে থেকেই হৈ-হল্লা শুরু করবে। কে জানে বা, আওয়াজ তুলবে।

মুখ-চোখ লাল, খুব উত্তেজিত অবস্থায় ভদ্রবেশী এক যুবক ঢুকলো খাসকামরায় : 'আপনার কাছে একটা নালিশ আছে।'

ঘরের মধ্যে পাইচারি করছিল হিমাদ্রি, শান্তস্বরে বললো, 'বসুন।'

বসলে যেন উত্তেজনা কমে যাবে, এমনি ছটফট করছিল আগন্তুক। বললে, 'এমনি ধারা অত্যাচার আর কতদিন সইতে হবে?'

'বেশি দিন নয়।' স্বর যথেষ্ট হালকা করলো হিমাদ্রি : 'সিগারেট খান?'

সিগারেট বাড়িয়ে ধরলো। খাই বলতে সাহস হল না যুবকের। নিমেষে নিস্তেজ হয়ে পড়লো। বসলো।

হিমাদ্রি বেড়িয়ে বেড়িয়ে সিগারেট ফুঁকতে লাগল।

'আপনি আমার নালিশ শুনবেন না?'

'নিশিদিন নালিশ শুনছি। সন্ধ্যের দিকে শ্মশানে গিয়েছি মড়া পোড়াতে সেখানেও বেইল-পিটিশন নিয়ে ধাওয়া করেছে।' জানলা দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ওড়াল হিমাদ্রি।

'তবে আমার নালিশটা শুনুন।'

'নিশ্চয় শুনব।' হিমাদ্রি নিজের চেয়ারে বসলো : 'কিন্তু বলি কি, নালিশ দু রকমের আছে। এক, লিখে; আরেক মুখে। বলি কি, লিখে দিন। আপনার উকিল নেই?'

'উকিল কখনো লিখবে যে আমলা ঘুষ খেয়েছে?' যুবক মাথা নাড়লো : 'কোনোদিন লিখবে না।'

'লিখবে না?' হাসলো হিমাদ্রি।

'লিখলে কি প্র্যাকটিস করা চলবে এ রাজত্বে? যা শত্রু পরে-পরে, আমলায়-মক্কেলে, বলে সরে পড়বে।'

হিমাদ্রি গম্ভীর হবার মত মুখ করলো। ব্যাপারটা কী তবে বলুন।

যুবকের নাম বীরেশ বসু। একটা টাকার মামলা আছে দ্বাদশ সাবজজ কোর্টে। অগ্রিম ক্রোকের অর্ডার হয়েছে হাকিমের, কিন্তু কেরানি পরোয়ানা বার করছে না।

'কী বলে?'

'কী আবার বলবে! টাকা চায়।'

'দিয়েছেন?'

'না।'

'তবে তো ভালোই।' টান-টান ভাবটা নরম হল হিমাদ্রির।

'ভালোই?' যুবক টেবিলের উপর চাপড় দিয়ে বসল : 'কিন্তু ও চাইবে কেন?'

'চাওয়া পর্যন্ত অপরাধ নয়।'

'নয়?'

'না। কত জিনিসই তো আমরা চাই, কত অন্যায় চাওয়া, কত অপরাধের চাওয়া, কই, কেউ বলতে আসে না। আপনিই বলুন, চাইলেই কি আর নেওয়া হয়? হাত বাড়ালেই কি কাঙ্ক্ষিতকে ধরা যায়?'

কাব্যে-দর্শনে নেই লোকটা, নিরেট কাঠঠোকরা। ঝাঁজালো গলায় বললে, 'তাহলে ক্রোকের পরোয়ানা বেরুবে না আমার?'

'নিশ্চয়ই বেরুবে।' হিমাদ্রি পাশ থেকে নথি টেনে নিল : 'আপনার উকিলকে দিয়ে বলান হাকিমকে। দ্বাদশ গোপালকে।'

'উকিলকে দিয়ে বলাবো?' বিরক্তি-লেখা মুখে যুবক বললে, 'বলাতে গেলেই আবার হাঁকবে।'

'এই সামান্য একটা কথা—' বেদনার্ত ভাব করলো হিমাদ্রি।

'ওদের কথা বলবেন না। ওরা চতুর্ভুজ। এপাশে-ওপাশে হাত তো আছেই, ওদের আবার সামনে-পিছনেও হাত। উকিল লাগাতে গেলে আরও লোকসান।'

'তা ছাড়া,' নথির মধ্যে চোখ ডোবালো হিমাদ্রি : 'পরোয়ানা কোর্ট থেকে

বেরুলেই বা কী! নাজিরখানা আছে না? পিয়নের কাছে হাওলা হওয়া আছে না? জারি দেরিতে না তাড়াতাড়ি হবে তার প্রশ্ন আছে না? সব চেয়ে বড় কথা, ঠিকমত জারির রিপোর্ট আছে না?'

'মানে প্রতি পদেই—'

'প্রায়। বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা।'

'কোনই প্রতিকার নেই?'

'কত যুগ-যুগ ধরে গবেষণা হচ্ছে, বার করুন না প্রতিকার। কুষ্ঠের মতই প্রাচীন রোগ—'

'কুষ্ঠ সারছে—'

'কিন্তু ঘুষ সরবে না। যতদিন উকিলকে ফি দেওয়া থাকবে ততদিন আমলাকেও ঘুষ দেওয়া থাকবে। ভেবে নিন আমলাকে যেটা দিচ্ছেন সেটা উকিলেরই ফি-এর মধ্যে দিচ্ছেন—'

কোনো দর্শন-ইতিহাস শুনবে না বীরেশ, না-কোনো অর্থনীতি-সমাজনীতি, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো হঠাৎ। বললে, 'তবে আপনার কাছে এসেছিলাম কেন?'

'অকালযাত্রা করেছিলেন। যে কোর্টের ব্যাপার সেই কোর্টের হাকিমের কাছে গিয়ে নালিশ করুন।'

'আপনি সকলের মাথা।'

'সেই জন্যেই তো হাতে মাথা কাটতে পারি না।' হিমাদ্রি নথি ওলটাতে লাগলো : 'যেখানে অপরাধ এখনো হয় নি, যেটা মাত্র আকাঙ্ক্ষায়, সেখানে আইন, তার বাহু যতই দীর্ঘ হোক, পারে না ঢুকতে। এ তোমার বাঙালি জজের খাসকামরায় ঢোকা নয়—'

'অসম্ভব।' রাগে চোখ মুখ লাল করে বেরিয়ে গেল বীরেশ।

'শুনুন—' ডাকলো হিমাদ্রি। সঙ্গে-সঙ্গে কলিং-বেলও টিপলো।

না। ফিরেছে বীরেশ। আরদালি একটা এসেছিল ঘন্টা শুনে, তাকে হিমাদ্রি চলে যেতে বললে।

'বসুন।'

বসলো বীরেশ।

'আপনি কী করেন?'

'চাকরি।'

'কী চাকরি? কোথায়?'

নাম-ধাম দিল চাকরিটার। বেশ মোটাসোটা চাকরি।

'বিয়ে করেছেন?'

'না।'

'তাই—' এক নথি ছেড়ে আরেক নথিকে মন দিল হিমাদ্রি।

'তাই মানে?'

'আজ অফিস যান নি?'

'না, ছুটিতে আছি।'

'তাই! অত অঢেল সময় ও ঢিলেঢালা জীবন না হলে কেউ কি এ নিয়ে মাথা ঘামায়? যা দিতে হবে তা দিয়ে দেয়। গভর্নমেন্টকে কোর্ট-ফি দেন নি? তলবানা? এভিডেভিট?'

'ওই আর এ এক হল?' বীরেশ আবার ছটফট করতে লাগলো।

'এ পিঠ আর ও পিঠ। আসলে বস্তু এক, সার এক। মন্দিরে প্রণামীর থালায় পয়সা দেন না? তীর্থে, রেল-স্টেশনে, হোটেলে, হাসপাতালে? যা পরে দিলে বকশিস তা আগে দিলেই ঘুষ। চুমু পরে দিলে আদর, আগে দিলে বলাৎকার। আপনাদের অফিসে এই কারবার নেই?'

'কী কারবার?'

হাসলো হিমাদ্রি : 'এই লেনদেন, গোঁজাগুঁজি, ঘুষাঘুষি—'

লজ্জিত হল বীরেশ। বললে, 'থাকলেও এত নয়। এ স্যর, যেখানে হাত রাখি সেখানেই ঘা।'

'তা তো বটেই। পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে।'

'একটা অন্যায় আছে বলে আরেকটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হবে?' আবার মুখিয়ে উঠলো বীরেশ : 'এটাই বা কোন ন্যায়?'

'তা ঠিক। বিয়ে করেন নি কিনা তাই আদর্শের কথা ভাবছেন।' হিমাদ্রি আরেকটা সিগারেট ধরালো। বললে, 'তা, কোথাও-কোথাও সঙ্গীত আছে, কবিতা আছে, থাকলই বা না আদর্শ। হ্যাঁ, ওই কেরানিটার নাম কি বললেন?'

'কোন কেরানি?'

'যে আপনার কাছে টাকা চেয়েছে।'

'উপানন্দ না রূপানন্দ।'

'রূপানন্দই ঠিক। শুনুন।—' কণ্ঠস্বরে একটু ঘনিষ্ঠ হল হিমাদ্রি : 'যদি কিছু ফল চান, তা হলে ওকে সত্যি সত্যি টাকাটা দিন।'

'দেব?'

'বেশ, সাক্ষী রেখে দিন। স্বার্থহীন সাক্ষী। পুলিস-টুলিস মুহুরি-ফুহুরি না হয়। যদি পারেন নোটটা মার্ক করে সাক্ষীদের দেখিয়ে নিয়ে গুঁজে দিন। তারপর ওর পকেটস্থ হবার পর ওকে চ্যালেঞ্জ করুন। সবাই মিলে হামলা করে পড়ুন ওর ঘাড়ের উপর। যদি নোটটা সারেন্ডার করে করুক, অফেন্স আগেই হয়ে গিয়েছে, নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হয়ে গিয়েছে। সারেণ্ডার না করে বা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে, কিছু এসে যায় না। আপনার সাক্ষী আছে ওর চাওয়ার আর আপনার দেওয়ার। তাতেই হবে। সাক্ষীর জোরেই মামলার জোর। যান, ব্যাপারটা চাওয়ার মধ্যে না রেখে খাওয়ার মধ্যে নিয়ে যান। তারপর দেখবো।'

খুব উৎসাহিত হল বীরেশ।

'আচ্ছা—' বেরিয়ে গেল বীরদর্পে।

এত তৎপরতা কল্পনা করতে পারতো না হিমাদ্রি। পরদিন বীরেশ একেবারে বিস্তৃত এক দরখাস্ত নিয়ে হাজির।

'একেবারে আজই?'

'হ্যাঁ, দেরি করে ফেললে সাবধান হয়ে যেত'—নিজের থেকেই সশব্দে বসলো বীরেশ : 'বুঝতে পারতো কল পাতা হচ্ছে। তাই লোহা গরম থাকতে-থাকতেই মেরেছি হাতুড়ি।'

বারান্দায় আরো কতগুলি লোক।

'এরা কারা?' পশ্চাতে ইঙ্গিত করল হিমাদ্রি।

'এরা সব সাক্ষী। এরা দেখেছে।'

দরখাস্তে আছে এদের বিবরণ। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সম্ভ্রান্ত সাক্ষী। দুজন বীরেশের অফিসের লোক আর বাকি তিন জন আদালতে আসা ভাগ্যহত।

নিবিষ্ট হয়ে দরখাস্তটা পড়ল হিমাদ্রি। বললে, 'দেখুন, দুরকম হতে পারে।'

'দুরকম?' তাকালো বীরেশ।

'দরখাস্ত যদি আমাকে বিচার করতে দেন তাহলে ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি হবে আর যদি ফৌজদারিতে দেন তাহলে দস্তুরমত কেস করতে হবে।'

'আপনার কাছে বিচার হলে ফল হবে না?'

'হবে। তবে কম হবে।'

'কম হবে মানে?' বীরেশ নড়েচড়ে উঠলো : 'যদি প্রমাণিত হয় ও ঘুষ খেয়েছে তাহলেও কম?'

'কম হবে মানে শুধু ডিসমিস হবে।' হিমাদ্রি শান্ত স্বরে বললে: 'আর ফৌজদারিতে প্রমাণিত হলে জেল হবে, আর জেল হলে ডিসমিস তো হবেই। তবেই দেখছেন ফৌজদারি হলে জেল আর ডিসমিস আর আমার কাছে হলে শুধু ডিসমিস। তাই একটু কম হল না?'

এক মুখ হাসলো বীরেশ। বোধ হয় বা একটু দয়া হল উপানন্দের জন্য। বললে, 'আপনার কাছেই হোক। ডিসমিসই যথেষ্ট। সঙ্গে আর জেলের দরকার কী? মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘায়ে দরকার নেই।'

পিছন থেকে একজন সাক্ষী বললে, 'নিচের পোস্টে নামিয়ে দিলেও যথেষ্ট শাস্তি।'

'কপিং ডিপার্টমেন্টে কিংবা রেকর্ডরুমে—' আরেকজন কে পরামর্শ দিল।

'কিংবা কয়েকদিন সাসপেন্ড করে রাখলেই সমুচিত শিক্ষা পাবে।'

'হ্যাঁ, সার্ভিস-বুকে একটা কালো দাগ পড়লেই এনাফ—'

এখন একে-একে সকলেই উপানন্দের প্রতি সহানুভূতিতে নরম হচ্ছে।

যতক্ষণ সে ঘুষখোর ততক্ষণ সে অত্যাচারী, আর যেই সে আসামীর পর্যায়ে তখনই তার প্রতি সমবেদনার ঢেউ।

যে ছিল সর্বমারা সেই আবার এখন সর্বহারা।

'না, যখন লিখিত নালিশ হাতে এসেছে তখন আর কথা নেই। আর পাশ কাটিয়ে যাওয়া নেই, এখন আইন তার পথ নেবে।' হিমাদ্রি নির্বাষ্প আইনের গলায় বললে।

সংশিলষ্ট কোর্টের হাকিমের কাছে দরখাস্ত ফরোয়ার্ড করে দিল হিমাদ্রি। নির্দেশ দিল, প্রসিডিং কর উপানন্দের বিরুদ্ধে আর তদন্তান্তে পাঠাও তোমার রিপোর্ট।

সংশিলষ্ট কোর্টের হাকিম ফলাও করে তদন্ত শুরু করলো। আর তিন মাসের মাথায় রিপোর্ট দিল, অভিযোগ সত্য। ঘুষ খেয়েছে উপানন্দ।

পরিচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত। স্ফটিকস্বচ্ছ।

এখন শাস্তি দেওয়ার ভার হিমাদ্রির—জেলাধিপতির।

ডিসমিস করার এক্তিয়ার শুধু তার। নিম্নের হাকিমও ডিসমিস সুপারিশ করেছে।

উপানন্দ এসে কেঁদে পড়লো খাসকামরায়।

বোধ হয় সে এতদিন ভেবেছিল ঘটনাটা বিশ্বাস করবে না হাকিম। কেউ কি এমন বোকা হয় যে সরাসরি কোনো পক্ষের থেকে ঘুষ নেবে! ঘুষ নিতে হয় উকিল-মুহুরির কাছ থেকে, যারা লক্ষ্মী, যারা কোনোদিন নালিশ করবে না—ঘুষ আদায় করতে হয় সেরেস্তায় চাপরাসি পাঠিয়ে, আদালত উঠে যাবার পর। যা কাহিনী বীরেশের, আষাঢ় মাসে ঘোর বর্ষার দিনেও চলে না। কিন্তু কে না জানে দুর্লোভে লোকে দুঃসাহসী হয় আর দুঃসাহসই বোকামি করে বসে।

উপানন্দের সগোত্রীয়দের সেই অভিযোগ—বোকামি, স্রেফ বোকামি। বোকা না হলে অত লোকের সামনে কেউ হাত পাতে? নিজের হাতে কেউ তামাক খায়?

কে অপরাধী? বোকাই অপরাধী। যে সারতে পারে সেই সারাৎসার।

সেই মামুলি কান্না উপানন্দের—প্রকাণ্ড সংসার, রুগ্ন স্ত্রী, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, ছোট দুটো ভাই কলেজে পড়ছে, বোনটার বিয়ে দিতে পারি নি, অন্ধ মা—আর কেউ তেমন রোজগেরে লোক নেই—

'ধরা পড়ার সময় মনে ছিল না?' ধমকে উঠল হিমাদ্রি।

'বুঝতে পারি নি এমন ষড়যন্ত্র।'

'তা বুঝতে পারবেন কেন? বুঝতে পারলে এমন দশা হয়?' গলা নামালো হিমাদ্রি : 'বুঝতে পারলে কেউ এখানে আসে?'

'এখানে না আসব তো—'

'এখানে আসে মানে খাসকামরায় আসে?' হিমাদ্রি খিঁচিয়ে উঠল :

'প্রত্যক্ষ সাক্ষী রেখে ঘুষ, প্রত্যক্ষ সাক্ষী রেখে তদবির! বোকা কি আর লোকে মিছে বলে?'

এতক্ষণে উপানন্দের বুদ্ধি খেললো। চট করে গুটিয়ে নিল নিজেকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাইরে নিজে গাঢাকা দিয়ে থেকে হিমাদ্রির বাড়িতে, বসবার ঘরে পাঠিয়ে দিল ঊর্মিলাকে।

রাত্রে আরদালিরা বিদায় নিয়ে গিয়েছে এমন সময়।

চাকর এসে বললে, কে একজন এসেছে।

'কে? এ অসময়ে কে?'

অসময়ে রসময়ই আসেন—হিমাদ্রির এমনি মনে হল ঘরে ঢুকে।

ঋদ্ধিতে-বুদ্ধিতে সমুজ্জল একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। ঘনপীন লাবণ্যের উচ্ছ্বাস। সাম্যে স্বাস্থ্যে সুস্থিরশ্রী।

'এ কে?' হিমাদ্রির মুখে কথা নেই।

দুহাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলো ঊর্মিলা।

'সে কি? বসো।'

কথা শুনছে এমনি বাধ্য ভঙ্গিতে বসলো ঊর্মিলা। চোখ নিচু করে রইলো।

'কোথাকার মেয়ে তুমি?'

'কী অদ্ভুত প্রশ্ন। কান্নাভরা ফুলো ফুলো চোখে তাকালো ঊর্মিলা। কার মেয়ে না, কোথাকার মেয়ে! মানে তুমি থিয়েটারের, না, সিনেমার? ইস্কুলের, না অফিসের? রেলের না টেলিফোনের?

মোটেই সে ইঙ্গিত নয়। তাৎপর্য হচ্ছে তুমি স্বর্গের না পৃথিবীর?

ঊর্মিলা বললে, 'আমি হাসপাতালের মেয়ে।'

'রুগী?'

'না।' নিজের গতি ও গঠন সম্বন্ধে সচেতন, ঊর্মিলা লজ্জার ভাব করলো।

'তবে? হাসপাতাল?' উকিল মামলা বোঝাতে পারছে না—তেমনি ধারা বিরক্তি হিমাদ্রির কণ্ঠে।

'না। আমি জুনিয়র নার্স, সবে ট্রেনিং শেষ করে কাজে ঢুকেছি। কাজে মানে হাসপাতালে। প্রাইভেট হাসপাতাল। হাসপাতালটা বাজে—'

'তুমি নার্স?' কণ্ঠের খুশিকে চেষ্টা করেও চাপতে পারলো না হিমাদ্রি। 'তবে তোমার মাথায় শিখীপুচ্ছ কই? কুলোপানা চক্র?'

হাসলো ঊর্মিলা। বললে, 'এখন আমার অফ-ডিউটি।'

'কিন্তু এ বাড়িতে তোমার কোনও ডিউটি আছে বলে তো মনে হয় না।' হিমাদ্রি বসলো এতক্ষণে: 'আমরা সবাই তো আপাতত সুস্থই আছি।'

'কিন্তু আমরা?' দু হাঁটুর উপর বুক-মুখ নামিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলে ঊর্মিলা।

বুক-মুখ ঢেকেছে কিন্তু ব্যক্ত করেছে পিঠ আর ঘাড় আর চুলের পিণ্ড

যাকে একবার ভালো লাগে তার সব কিছুই বুঝি ভালো দেখায়। এক ভালোকে অবলম্বন করেই সহস্র ভালো। গাছের একটা পাতা দেখ। একটা মুখ্য শিরাকে অবলম্বন করে শত-শত প্রশিরার বিস্তৃতি। দেখ মানুষকে। একটা মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে সর্বাঙ্গের স্নায়ুজাল। এক ভালোতে সব ভালো।

'কিন্তু ব্যাপারটা যদি খোলসা করে না বলো কিছু বুঝবো না।' হিমাদ্রি যেন মমতার থেকে বললে।

'আমি উপানন্দ বিশ্বাসের ছোট বোন।'

মস্তিষ্ক বেশ পরিষ্কার উপানন্দের। গুচ্ছের ছেলেপিলে সমেত রুগ্ন স্ত্রীকে যে পাঠায় নি তদবিরে, বাহবা দিতে হয়।

'সামান্য মাইনে, মেহনত অকথ্য। চেয়ারে বসে বসে ঘুমনো, আর ঘণ্টা শুনে ছোটা—'

'মহৎ কাজ।'

'আপনি যদি একটু মহৎ হন, সদয় হন। আর যা শাস্তি দিন, চাকরিটা নেবেন না। এই প্রথম অপরাধ—'

'প্রথম? বলতে পার ধৃত প্রথম।' হিমাদ্রি তাকালো তীক্ষ্ণ চোখে : 'কিন্তু তোমার, তোমার কী অবস্থা?'

কথাটা হয় বুঝলো না, নয় গায়ে মাখলো না ঊর্মিলা। বললে, 'দাদার যদি চাকরি যায় আমারও চাকরি যাবে। নতুন হাসপাতাল, রুগী তত আসে না। রুগী কম পড়লে অফ হয়ে যাই। বাড়ি থেকে চাকরি করা। তা দাদার যদি চাকরি যায়, মাথা গোঁজার ঠাঁই উঠে যাবে। সব ছন্ন হয়ে যাবে। পথে এসে দাঁড়াবো।'

'বেশ তাই দাঁড়াও তবে।' তির্যক চোখে তাকালো হিমাদ্রি। কঠিন কথা কিন্তু কঠিনের মত শোনালো না।

'পথে?'

'না, আমার সামনে।'

'দাঁড়াবো?' সত্যি-সত্যি দাঁড়িয়ে পড়লো ঊর্মিলা।

'না, আজ নয়, আরেক দিন।' ঘুষ নেওয়ার মতন করে চাপা গলায় বললে হিমাদ্রি : 'দাঁড়াবে তোমার সেই পাখামেলা ফণাতোলা পোশাকে। ভারি রোমান্টিক লাগে আমার ওই পোশাকটা। আর ওই খুটখুট জুতোর আওয়াজ—'

'বেশ, আরেকদিন তবে আসবো।' দরজার দিকে পা বাড়ালো ঊর্মিলা : 'কবে বলুন?'

শুধু দিন নয় ক্ষণও ঠিক করে দিল হিমাদ্রি।

একেই বলে বুঝি ঘুষ। ফাউ। বাঁধা বরাদ্দের বাইরে মহান উপরি পাওনা। বাইরে এসে উপানন্দের সঙ্গে সামিল হল ঊর্মিলা। বললে, 'আরেক-দিন আসতে হবে।'

কড়া ইস্ত্রির ধোপদস্ত পোশাক পরে দাঁড়ালো এসে ঊর্মিলা। দিন নয়, রাত, আর ক্ষণ? ক্ষণ নয়, লগ্ন।

'যার যা পোশাক তাকেই তা মানায়।' ঘুষখোরের চোখে তাকালো হিমাদ্রি : 'ময়ূরকে মানায় তার পুচ্ছে। আর সে পুচ্ছ যখন পেখম হয়ে ওঠে। তুমিও তেমনি এখন পেখম মেলেছ।'

'আমি?' লজ্জায় বিহ্বল হল ঊর্মিলা : 'আমার এ হুড-এর জন্যে বলছেন?'

'হ্যাঁ। মাথায় ঘোমটা থাকলে বলতাম না।' হিমাদ্রি বসলো চেয়ারে। 'এ শিরশ্ছদের আরেক রূপ আরেক ইঙ্গিত। তুমি সীমন্তিনী না, তুমি চিরন্তনী।'

'তেমনি আপনারও তো পোশাক আছে।' নিজেই বসলো ঊর্মিলা।

'সে তো যাত্রাদলের পোশাক। রঙ্গমঞ্চে ভীমের পার্টের।'

'ভীমের পার্টের? আপনি ভীম নাকি?'

'হ্যা, আর কলম আমার গদা। ভীম কি আর সাধে হয়েছি? সামনে যে সব শকুনির দল। শকুনির সঙ্গে কি ধর্মাবতার যুধিষ্ঠির পারে? ভীম পারে।'

'তাই তো ভয় করে আপনাকে।'

'কিন্তু তোমার কাছে তো আমি রুগী। রুগীকে কী ভয়! আর জানো—' হিমাদ্রি বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেললো : 'পোশাকের নিচেই নগ্নতা। কবরের নিচেই কঙ্কাল, সাফল্যের নিচেই দারিদ্র্য।'

করুণ করে হাসলো ঊর্মিলা। কথা বললো না।

'তবু এই পোশাক আছেই মুক্ত হবার জন্যে।' হিমাদ্রি ক্লান্ত সুর আনলো ভঙ্গিতে : 'কবর শূন্য হবার জন্যে। আর সাফল্য সুনাম,—সব খরচ হয়ে যাবার জন্যে।'

'এবার তবে উঠি—'

'সে কি?'

'যাই পোশাক থেকে মুক্ত হই গে।' হাসিতে ঝলমল করতে-করতে উঠে দাড়ালো ঊর্মিলা : 'কৃত্রিমকে দূর করে স্বাভাবিক হই। বাড়ি গিয়ে হই আবার সাধারণ মেয়ে সংসারী মেয়ে—' দরজার দিকে স্পষ্ট পা বাড়ালো।

'বা, আমি যে রুগী, আমাকে ফেলে যাবে কি করে?'

'রুগী? বেশ তো, চলুন হাসপাতালে, বেড নিন।' বিদ্যুতে স্থির হয়ে দাঁড়ালো ঊর্মিলা।

'বেড নিতে হবে, বিছানায় হবে না? তার মানে বাড়িতে রুগী হলে চলবে না বলছ?'

'না, তাও চলবে। কিন্তু তার জন্যে লিখতে হবে, দরখাস্ত করতে হবে প্রপার চ্যানেলে। সব কিছুরই একটা রীতি আছে, প্রসিডিউর আছে। যেমন দেশে যেমন আচার—' ইশারায় ভর-ভর চটুল চোখে তাকালো ঊর্মিলা।

ঠিকই তো। সব কিছুরই একটা সিঁড়ি আছে, ধাপ আছে, পর্ব-পরিচ্ছেদ আছে। আইনকানুন আছে। এ তো হোটেলে ডাকবাংলোয় ধরে আনা নয়, নয় বা কোথাও ক্ষণিকের অতিথি হওয়া; লেফাফা পোশাক না মানলে চলে কই? ঊর্মিলা ঠিকই বলেছে। যে ব্রতে যে কথা।

'হাসপাতাল অনুমতি না দিলে প্রাইভেটে যেতে পারি না।' ঊর্মিলা সরল মুখে বললে : 'শেষে শেষ-সলতে চাকরিটাও খসে যাক আর কি।'

'তা হলে ঠিক মতন ডাকলে ঠিক মতন আসবে? মানে যদি ঠিক ছন্দ ধরে ডাকি ঠিক ছন্দ ধরে আসবে?'

'নিশ্চয়।' ঝুঁকে পড়ে কাগজে ঠিকানা লিখে দিল ঊর্মিলা ; 'এই বাড়ির ঠিকানা, আর এই হাসপাতালের। অসুখ হয়েছে সাব্যস্ত হলে ঠিক চলে আসব। কিন্তু তার আগে—' ঊর্মিলা এগোলো দরজার দিকে।

চেয়ার থেকে উঠে হিমাদ্রি দু'পা গেল এক সঙ্গে। বললে, 'আমার অসুখটা বুঝি এখনও সাব্যস্ত হয় নি?'

'না। কাগজে-কলমে হয় নি।' যেতে-যেতে থামলো ঊর্মিলা : 'কিন্তু তার আগে, মনে থাকে যেন—কাগজে-কলমে আপনার অর্ডার চাই।'

উপানন্দ বদলি হল আরেক কোর্টে। লোকে ভাবলে শাস্তি দেওয়া হল বুঝি। কিন্তু শহরের মধ্যেই আরেক কোর্ট, আর তার এমন এক বন্দর, যেখানে সপ্ত ডিঙ্গাতেই মধু—জান্তা লোকেদের বুঝতে দেরি হল না।

'এ কী হল? এটা কী করলেন?' বীরেশ আবার একদিন মারমুখো হয়ে ঢুকল খাসকামরায়।

'কেন, বদলি করে দিয়েছি।'

'বদলি একটা শাস্তি?'

'কী শাস্তি না-শাস্তি তা আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে নাকি?' ক্রুদ্ধ হল হিমাদ্রি : 'বিচার আমি করছি আপনি নন।'

'আমি এবার ফৌজদারি করবো।'

'একশো বার করুন। তা এখানে তম্বি করছেন কেন?' কলিং বেল বাজলো হিমাদ্রি।

বীরেশ বুঝলো এটা বিতাড়নের গর্জন। ঘর ছেড়ে চলে যেতে-যেতে বললে, 'আর কেন, কিসের জন্যে ছাড়ান পেল উপানন্দ তাও বার করে ফেলবো।'

কলিং বেলে ঝড় তুললো হিমাদ্রি।

'এবার ঘুষের মামলায় কে পড়ে দেখে নেব নিঘ্‌ঘাত।' হিংস্র ইঙ্গিত ছুঁড়ে অদৃশ্য হল বীরেশ।

ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যেতে কতক্ষণ—ছুটির দরখাস্ত করলো হিমাদ্রি।

তার আগে একবার ঊর্মিলার খোঁজ নিতে হয়। তার মানেই উপানন্দের খোঁজ। সেরেস্তাদারকে ডাকলো।

'উপানন্দের বিরুদ্ধে সেই ফৌজদারির কী হল?'

'বা, সে মামলা তো তুলে নিয়েছে, ডিসচার্জ হয়ে গিয়েছে উপানন্দ।' বললে সেরেস্তাদার।

'সে কি? লোকটা এত তেজ নিয়ে গেল? কী ব্যাপার?'

'ফোন করবো?'

'দেখুন তো—'

ফোন করে জানা গেল উপানন্দ ছুটিতে আছে। ক্যাজুয়েল লিভ। কেন ছুটি তা আর কী জিগগেস করবে। হয়তো অসুখ বিসুখ করেছে।

নিজেই খোঁজ নেবে হিমাদ্রি। ছুটি মঞ্জুর হয়ে এলে ডাকবে উর্মিলাকে। হাসপাতাল থেকে কী করে সহজেই অনুমতি পাওয়া যাবে তারও অন্ধিসন্ধি নিতে হবে। দরকার হলে চাঁদা দেবে হাসপাতালে আর অগ্রিম দাদন উর্মিলাকে।

ফৌজদারি মামলা যখন আর নেই তখন বীরেশ তো পরাভূত।

ঠিকানা নিয়ে সন্ধ্যার দিকে উপানন্দের বাড়িতে হাজির হল হিমাদ্রি।

এ কি, তার বাড়িতে যে বিয়ে!

'কার বিয়ে?'

'আর কার। উর্মিলার।'

'সে কি, নার্সেরও বিয়ে হয়?'

'হয় বৈ কি। মাথায় আরেক রকম হুড দেয়। আরেক রকম ফণা তোলে। দেখবেন আসুন।'

'কিন্তু বর কই? এসেছে?'

'এসেছে।'

'কী, রুগী নাকি?'

'না। ঘুষখোর। দেখবেন আসুন।'

বর আর কে। বর বীরেশ।

৭৪। গাছ

তারপরে রাত করে ঝড় উঠল।

সন্ধে থেকেই মেঘ জমছিল, থমথমে হয়ে ছিল দিশপাশ। একটা গাছের পাতাও নড়ছিল না। কী যেন একটা ঘটবে তারই ভয়ে বোবা অন্ধকার তটস্থ হয়ে আছে। কান্নার সুরে দূরে একটা শেয়াল ডেকে উঠল বুঝি।

ঘরে-বারান্দায় লোক বলাবলি করতে লাগল, ও শেয়াল নয়। শেয়াল কখনো একা ডাকে না। ডাকলেও এমনি ক'কানো কান্নার সুরে নয়।

শেয়াল ছাড়া এ অঞ্চলে অন্য কোনো জানোয়ার আছে বলে তো শুনিনি। শেয়াল যদি না হয় তো, এ আরো অলক্ষণ।

আস্তে-আস্তে বারান্দার লোকজনও ঘরে আসতে লাগল। আগেভাগেই আগল পড়ল দরজায়। এখানে-ওখানে যে দু-একটা জ্বলছিল টিপ টিপ করে নিবে গেল। যে যার মনে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। যা হবার তা ঘুমের মধ্যেই হোক।

তারপরেই তুফান ছুটল।

আগুনের গোলা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে গোটা কুড়ি এঞ্জিন যেন ছুটেছে মহাশূন্যে। কেউ লাইন রাখেনি, একে অন্যের সঙ্গে কলিশন বাধিয়েছে। সে কী শব্দ! কী গর্জন!

কত যে গাছ পড়ছে, চাল উড়ছে ঠিক-ঠিকানা নেই। নদী থেকে নৌকো ধরে এনে গাছের উপর তুলে দিচ্ছে। এ-বাড়ির সিন্দুক উড়িয়ে নিয়ে ও-বাড়ি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পারাপারের খেয়া বন্ধ, তাতে কী, নদীর এ পারের মানুষকে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে ওপারে।

সিন্দুক-ওড়ানো, মানুষ-ওড়ানো ঝড়।

দিকে-দিকে শোনা যাচ্ছে মানুষের চিৎকার।

সুভঙ্গবালা মনোরথকে খুব জোরে আঁকড়ে ধরেছে ; 'ভীষণ ভয় করছে।'

'চোখ বুজে থাকো।' মনোরথ বললে অস্ফুটে।

'কী হবে?'

'মরতে হলে একসঙ্গে মরব। কথা বোলো না।'

একটু পরেই আবার কথা বললে সুভঙ্গ। বললে, 'শুনছ?'

মুখ যখন খুলেছে তখন শোনাবেই শোনাবে। মনোরথ কান পেতে রইল।

'গঙ্গামণির মা কাঁদছে—'

টুকরোটাকরা কত কান্না কত ডাকই তো শোনা যাচ্ছে।

কেন কাঁদছে তাও সুভঙ্গর বলা চাই। 'ওগো শুনছ, গঙ্গামণিকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঝড়ে কোথাও উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

'নিলে নিয়েছে।' বাঁধন আরো আঁট করল মনোরথ।

কিন্তু এ কী, গঙ্গামণির মায়ের কান্না যে সুভঙ্গদের ঘরের দরজায়। 'ওলো সুভঙ্গ, গঙ্গামণি কি তোদের বাড়ি এসেছে? তোর ঘরে আছে?'

ঝড়ের তেজ কিছু কমেছে বটে কিন্তু আলো জ্বালাবার সাধ্যি নেই। দরজা একটু ফাঁক করে বললে, 'না, আমাদের এখানে আসেনি তো।'

'আসেনি? ঘরে লোক কে?'

'তোমাদের জামাই।' দরজার ফাঁকটা কমিয়ে আনল সুভঙ্গ। গলার স্বরও বুঝি নামিয়ে আনল সঙ্গে-সঙ্গে : 'ভাগ্যিস বেলাবেলি চলে এসেছিল। নইলে এ সময় নদীতে থাকলে, রাস্তায় থাকলে কী হত কে জানে।'

কিন্তু ঘরেতে থেকেও তো বিপদ কিছু কম নয়। বিছানায় শোয়া শক্ত-সমর্থ মেয়েটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

'উড়িয়ে নিয়ে গেলে পাওয়া যাবে হয়তো,' ঘরের ভিতর থেকে মনোরথ বলে উঠল : 'হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেই বিপদ।'

'যা, দরজা বন্ধ করে দে। জামাই ডাকছে—' গঙ্গামণির মা ফিরে চলল।

'কিন্তু তুমি কোথায় ওকে খুঁজবে?'

'দেখি—' অদেখা আকাশের দিকে তাকাল গঙ্গামণির মা।

ঘরে জলের ছাঁট ঢুকছিল। দরজা বন্ধ করে দিল সুভঙ্গ। চলে এল বিছানায়। যে যার নিরাপদ আশ্রয় আঁকড়ে ধরে আছে। কিন্তু গঙ্গামণি কাকে ধরবে?

ঝড়ের বেগ আরো কমে এলো আস্তে-আস্তে। বৃষ্টিও ঝিরঝির হয়ে এল। বিদ্যুৎও আর ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা হয়ে নেই, থেকে থেকে আলোর খানিকটা ঝলস দিচ্ছে মাত্র।

লন্ঠন জ্বালিয়ে রাখা যাচ্ছে। টেপা বাতি দেখা যাচ্ছে এদিক-ওদিক। শোনা যাচ্ছে ব্যস্ত মানুষের গোলমাল।

অনেকেই খোঁজ-তালাসে বেরিয়েছে। গরু-বাছুর লোক-জন গাছ-গাছালি। খেত-খামারের কী দশা! কত মাঠ তছনছ হল! কত চাল উড়ে গেল! কে জানে কার কী সর্বনাশের চেহারা! নদীর ঘাটের খবর কী! হাট-বাজারের কোনো চিহ্ন-টিহ্ন আছে কিনা।

দেখা গেল, আশে-পাশে একটা গাছও কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। সমস্ত ভূমিসাৎ।

না, একটা মাত্র খাড়া আছে। আর, সেটা কিনা গঙ্গামণিদের বাগানে।

'যাই গঙ্গামণিকে খুঁজি গে।' সুভঙ্গ উঠে পড়ল : 'তুমি যাবে?'

অনেকেই উঠে পড়েছে, এসেছে বেরিয়ে। সুভঙ্গদের বাড়ির আর সব পুরুষেরাও। কিন্তু মনোরথ গা করল না। বরং আরো ছড়িয়ে শুল। বললে, 'আমার কী দায় পড়েছে! তোমার সই, তুমি খোঁজো গে।'

দরজায় ছিটকিনি দিয়ে বেরিয়ে গেল সুভঙ্গ।

মনোরথের মনে হল আবার কতক্ষণ পরেই আরেকটা ঝড় আসবে নিশ্চয়ই। তারই আশায় চোখ বুজে রইল।

ঠিক এসেছে। একেবারে ঢেউয়ের মতই উছলে পড়েছে গায়ের উপর।

'ওগো শুনছ?' মনোরথের গায়ে ধাক্কা মারতে লাগল সুভঙ্গ।

'শুনছি।' আধো ঘুমের মধ্য থেকে মনোরথ বললে, দরজাটা খোলা রেখেছ কেন? বন্ধ করে দাও।'

সেদিকে তাকালও না সুভঙ্গ। 'শুনছ, গঙ্গামণিকে পাওয়া গিয়েছে।'

এ আবার গায়ে ঠেলা মেরে ঘুম ভাঙিয়ে বলবার মত কী কথা! ত কি, চমকে উঠল মনোরথ, তবে কি গঙ্গামণি বেঁচে নেই?

'কোথায় পাওয়া গিয়েছে?'

'ওর ঘরের কাছেই, বাগানে।'

'তবে কি—'

'না, বেঁচে আছে। কথা বলছে।'

'কথা বলছে?'

'হ্যা গো, কথা বলছে।'

'কার সঙ্গে কথা বলছে?'

'ওর স্বামীর সঙ্গে।'

'স্বামীর সঙ্গে?' বিছানায় উঠে বসল মনোরথ : 'কী বলছে?'

দুহাত দিয়ে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছে, আর বলছে, না, না, না—'

'না-না-না কোনো কথা নয়, ও একটা শব্দ।' মনোরথ আবার শোবার উদ্যোগ করতে লাগল।

'শুধু না-না-না নয়,' সুভঙ্গ সর্বাঙ্গে আবার ঝিলিক দিল : 'বলছে, স্পষ্ট বলছে, তুমি যেও না, তুমি যেও না।'

'বলছে?'

'চলো না, নিজের চোখে দেখবে চলো।' সুভঙ্গ এবার হাত ধরে টান মারল : 'কত লোক জমায়েত হয়েছে। স্বকর্ণে শুনছে। তুমিও শুনবে চলো।'

এমন অঘটন কে না দেখে! কে না শোনে!

'চলো।' তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল মনোরথ।

'কিন্তু যাই বলো, গঙ্গাটা কেমন বেহায়া! সবার চোখের সামনে যা করছে—' সুভঙ্গ লজ্জায় মুখ ফেরাল।

'কী করছে?'

'স্বামীকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আছে, আর গায়েতে গাল লাগিয়ে আদর করছে আর বলছে, তুমি যেও না, তুমি যেও না। শত হলেও স্বামী তো বাঁচা। এত লোক দেখছে—'

'দেখছে তো বয়ে গেল।' বালিশের তলা থেকে ছোট টর্চটা কুড়িয়ে নিল মনোরথ : 'স্বামী-স্ত্রীতে আছে, লোকে দেখছে কেন?'

'আহা, কথা বলছে যে—'

'তা স্বামী-স্ত্রীর কথা। অন্য লোকের কী! চলো—' এবার মনোরথই ঠেলা দিল সুভঙ্গকে।

ঝড়ের জের একটা কাতর হাওয়া শুধু বয়ে চলেছে। বৃষ্টিও আর নেই, গাছের ডাল-পাতা থেকেই পড়ছে যা ফোঁটা-ফোঁটা।

কতটুকুই বা পথ, মনোরথকে নিয়ে সুভঙ্গ এগিয়ে গেল।

'ঐ দেখ।' বললে সুভঙ্গ।

দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে অনেকে দেখছে। মনোরথও দেখল।

আর সকলের আতঙ্ক কেটে গেলেও গঙ্গামণির বুঝি যায়নি। সে দুই বাহুতে গাছটাকে বুকের মধ্যে সজোরে জাপটে ধরে তার গায়ে গাল লাগিয়ে বলছে কাতরস্বরে; 'না, না, না, তুমি যেও না, তুমি যেও না।'

শুধু কান্নার মতই তো শোনাচ্ছে না, স্পষ্ট কথার মতই শোনাচ্ছে।

আশ্চর্য, মুখে কথা ফুটেছে গঙ্গামণির।

আর সব গাছ পড়েছে, গঙ্গামণির গাছ পড়েনি। সন্দেহ কী, গঙ্গামণির জন্যেই পড়েনি। তার আকুলতা বুঝি ঝড়কেও হার মানিয়েছে। হাত-পা— একটা ডালও ভাঙতে দেয়নি। যেমন কে-তেমন নিখুঁত দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

কিন্তু এখন আর ভয় কই? ঝড় কই? বৃষ্টিও তো ধরে গেছে কখন। এবার তবে গঙ্গামণি ঘরে যাক। কী রকম ভরপুর ভিজে গিয়েছে! গায়ে একটা জামা পর্যন্ত নেই। তার মুখের কথা তো শুনেইছে সকলে, তবু ভিড় পাতলা হয় না কেন?

গঙ্গামণির মা কাছাকাছি হয়েও শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারছে না। পারছে না মেয়েকে ছিনিয়ে নিতে। কী করে পারবে? ওটা যে মেয়ের নিজের এলেকা। অতদূর পর্যন্ত যাবার যে কারু এক্তিয়ার নেই। অন্তত এখন তো নেই।

শম্ভুপদ বললে, 'এবার মেয়েকে ঘরে নিয়ে চলো। বিপদ তো কেটে গিয়েছে।'

তবু শাসনের সুরে কিছু বলতে সাহস হয় না দেবুবালার। মুখে যে কথাটুকু ফুটেছে তা যদি মিলিয়ে যায়!

গঙ্গামণির যখন ইচ্ছে হবে তখনই ঘরে ফিরবে।

কিন্তু কী রকম লোক জমছে দেখেছ?

তা লোকে দেখতে চায় তো দেখুক না, চোখ মেলে দেখুক। দেখুক কেমন একটা মেয়ে তার স্বামীকে ভালোবাসতে পারে! নির্ঘাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে রাখতে পারে বাঁচিয়ে। দেখুক, আরো দেখুক। কী করে, কিসের জোরে কিসের টানে, বোবা মুখেও কথা ফুটতে পারে!

'ও মা, এখনো বুকে করে আছিস?' সুভঙ্গ একেবারে কাছে চলে এল : 'তোর স্বামী তো বেঁচে আছে, মরে যায়নি। জ্যান্ত স্বামীকে কি কেউ এতক্ষণ জড়িয়ে থাকে?'

সুভঙ্গর দেখাদেখি গঙ্গামণিরও চোখ পড়ল মনোরথের উপর।

ও লোকটা এখানে কেন? ও কী চায়?

গঙ্গামণি গাছের আড়ালে নিচু হয়ে মুখ লুকোল। আমাদের মাঝখানে ও কেন?

সুভঙ্গ এগিয়ে এল গঙ্গামণিকে মুক্ত করে নিতে। কতক্ষণ আর এমনি ভিজে কাপড়ে বাইরে পড়ে থাকবি? আর তো ভয় নেই, আকাশে তারা উঠে গিয়েছে। এবার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোগে।

কথার সঙ্গে-সঙ্গে সুভঙ্গ ইঙ্গিতেও সুস্ফুট হল।

পাশ থেকে মনোরথ চিপটেন কাটল : 'বরং ছোট একটা ডাল ভেঙে নিয়ে যাক। মানুষ তো জুটল না, ঐ ডালটাকেই পাশে নিয়ে শুক।'

খবরদার! গঙ্গামণি সুভঙ্গের হাত ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমার জিনিসে হাত দিসনে। সরে যা! লজ্জা করে না? স্ত্রীর সামনে তার পুরুষের গায়ে হাত দিস? আর, দূরে দাঁড়িয়ে তোর স্বামী তাই বরদাস্ত করে?

শুধু ইঙ্গিতেই মুখর হতে পারল।

তারপর নিজেই গঙ্গামণি শেষবারের মত গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে, তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে বলে, ফিরে চলল নিজের ঘরে।

ভিড় ভেঙে যেতে লাগল।

'বোবা মেয়ে কথা কয়ে ফেলেছে।'

'একটা গাছের জন্যে মানুষের এত টান!'

'লোকে আশ্রয়ের জন্যে ঘরে ঢোকে, আর এ মেয়ে আশ্রয়ের জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।'

'মরতে হয় দুজনে একসঙ্গে মরবে, তেমনি ভাবে আঁকড়েছে প্রাণপণে।'

'যাই বলো সতী-সাবিত্রীর মত বাঁচিয়ে দিয়েছে স্বামীকে। বিচ্ছেদ ঘটাতে দেয়নি।'

নানা জনের নানা রকম বলাবলি।

পরে আবার খোঁজ নিতে হবে। একবার যখন কথা কইল, বরাবরের মতই কইল কি না।

'আচ্ছা, মেয়েটার বোবামি যদি সেরে যায়, শম্ভুপদ কি আবার ওর বিয়ে দেবে?'

'কেন দেবে না? বাধাটা কী?'

'ঐ গাছ।'

'রাখো! গাছের সঙ্গে মানুষের বিয়ে!' বলাবলি হাসাহাসিতে এসে ঠেকল।

ছোট বোন গয়ামণির বিয়ে হয় না যদি না গঙ্গামণি পাত্রস্থ হয়!

কিন্তু বোবা মেয়েকে কে বিয়ে করবে? তার উপরে কিছুটা জড়বুদ্ধি। কানেও শুনতে পায় না। দেখতে অবশ্য ভালো। যেন রজনীগন্ধার ফুটন্ত ডাঁটি। কিন্তু শুধু উপর-উপর দেখিয়েই কি মেয়ে পার করা যায়?

ভাগ্যিস শুনতে পায় না, কত লোক ওকে গঙ্গা না বলে গোঙা বলে ডাকে।

কিন্তু তাই বলে ও গয়ামণির সুখের কণ্টক হবে?

কেন হবে? তোমরা ওর একটা ব্যবস্থা করে দাও। কারু সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। মানুষ না জোটে, ছুরি কাঁচি শিল-নোড়া যা হোক একটা কিছু নিয়ে এস। ছি, ছি, ওদের কাউকে গঙ্গামণির পছন্দ নয়। দরজা-জানলা? দূর! ওদের কি প্রাণ আছে? না, পৌরুষ আছে?

তবে গাছের সঙ্গে বিয়ে দাও। যে সরল সতেজ গাছটা ওর ঘরের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে সেই গাছের সঙ্গে।

গঙ্গামণি মাথা উঁচু করে তাকাল গাছের দিকে। অনেক পাতা, অনেক ছায়া। কিছুটা আবার ফুল। কিছুটা আবার গন্ধ।

গঙ্গামণি পছন্দ করল। বেশ নির্ভীক, বলবান গাছ। পুরুষ-পুরুষ দেখতে। একেবারে হাতের কাছটিতে।

পাড়ায় অনেক বিয়ে দেখেছে গঙ্গামণি। জানে বিয়ের দিন কনে কেমন সাজে, গয়না পরে, কেমন রঙচঙে হয়। বেশ, তবে সে-সব আয়োজন করো।

তাই বলে কি বলছি আলো হবে, না, বাজনা হবে, না, ভোজ হবে? অত-শত আশা করে না গঙ্গামণি। কিন্তু মুখচন্দ্রিকা তো হবে! আর মালা-বদল? বা, তা নইলে বিয়ে কী! সপ্তপদীও হবে। পুরোতের সামনে মন্ত্র আউড়ে শম্ভুপদই করে দেবে সম্প্রদান।

সবই শাস্ত্রমত হল। শুধু মালা-বদলের সময় নিজেরই দেওয়া মালাটা নিজেই গলায় তুলে নিল গঙ্গামণি। আর যখন একলা বিছানায় শুতে গেল, খুলে রাখল গাছের দিকের জানলাটা। থেকে-থেকে, ঘুমের মধ্যে থেকে, তাকাতে লাগল বাইরে। যেমন গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সে তো তারই মত বোবা। তারই মত অবোধ। সাধ্যও নেই বোঝে কী কান্ডটা ঘটে গেল, কত বড় দায়িত্ব টেনে নিল নিজের উপর।

কিন্তু যাই বলো, বিয়ের পর গঙ্গামণি অনেক শান্ত হয়েছে। গম্ভীর হয়েছে। পাগলামি কমে গিয়েছে। সব সময়ে চোখের সামনে ধীর-স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কী করে তুমি চপলতা করো, উচ্ছৃঙ্খল হও! আগে-আগে যে বিকট শব্দ করত তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে! পাশের পুরুষটা ভাববে কী!

ছাই ভাববে! কিছুই ভাবে না। কিছুই করে না। শুধু সম্ভ্রান্ততায় নিশ্চল হয়ে থাকে।

শুধু মাঝে-মাঝে মাঝরাতে যখন হাওয়া দেয় তখন শত-শত পাতায় বেজে উঠে গঙ্গামণিকে ডাকে : চলে এস। চলে এস।

গঙ্গামণি এদিক-ওদিক তাকায় ত্রস্ত হয়ে। না, কেউ নেই। মনোরথ আসেনি এ সপ্তাহে। এখন বেশ নিরিবিলি। অন্ধকার।

কত রাতে উঠে এসেছে গঙ্গামণি। গাছের নিচে বসেছে চুপচাপ। গাছটাকে ছুঁয়েছে, ধরেছে, আদর করেছে। মনে হয়েছে, এইখানেই তার বাসরঘর। এইখানেই আঁচল পেতে ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু কতক্ষণ বসতে না বসতেই মা এসে ধরে নিয়ে গেছে। এখন আর আগের মত মারধর করে না মা। বিয়ের পর মেয়ে সম্ভ্রান্ত হয়েছে। তার উপর তাকে ঘিরে তার পুরুষ দাঁড়িয়ে! সাধ্য কী তার গায়ে কেউ হাত তোলে!

দিনের বেলা লোকের আনাগোনায় যাওয়া যায় না কাছে। আর সব

রাতেই হাওয়া-লাগা পাতার শিরশির শোনা যায় নাকি? বৃষ্টি আছে, বাদল আছে, হাড়কাঁপানো শীত আছে, বেরুনো অসম্ভব হয়ে ওঠে! তুমি তার একটা ব্যবস্থা করতে পারো না? যাতে ঘর থেকে না বেরিয়েই, ঘরের মধ্যেই পেতে পারি তোমাকে।

গাছ তার ব্যবস্থা করল। একটা সরু ডাল পাঠিয়ে দিল গঙ্গামণির দিকে।

আর একটু। আর একটু। আর একটু বাড়িয়ে দিলেই জানলা থেকে ছুঁতে পারবে গঙ্গামণি। ইচ্ছেমত পারবে আদর করতে।

আমার আরো নালিশ আছে। তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলব? না, হিন্দুস্থানী মেয়েদের বিরুদ্ধে নয়। তারা তো তোমাকে পুজো করে, তোমার গোড়ায় জল ঢালে। তা ঢালুক। তাতে আপত্তি কী! তোমার গায়ে যে সিঁদুর লাগাতে চেয়েছিল, তখন ধমকে দিয়েছি। না, ছোঁয়াছুঁয়ি হতে দেব না। তারা তাই মেনে নিয়েছে। উলটে সিঁদুর আমার মাথায় মাখিয়ে দিয়েছে। কেমন দেখতে হয়েছে বলো দেখি?

নালিশ তবে তোমার কার বিরুদ্ধে?

ঐ মুখপোড়া মনোরথটার বিরুদ্ধে। পাশের বাড়িতে ঐ যে আমার বন্ধু থাকে, সুভঙ্গ, তার বর। মাঝে-মাঝে আসে, দু'একদিন থেকেও যায়। আর ওদের ঘরের জানলা দিয়ে আমার ঘরটা দেখা যায়, তাই ও ওদের জানলায় দাঁড়িয়ে আমার ঘরের মধ্যে ইশারা পাঠায়। দপ করে রাগ হয়ে যায়, এমন ইশারা। তুমি যদি দেখ! দেখলে তুমি যে ওর কী করবে তার ঠিক নেই।

কী ইশারা করে!

বলে, রাতে ঘরের দরজা যেন খুলে রাখি, ও আসবে।

ওর বউকে বলে দিতে পারো না?

আমি কি কথা কইতে পারি যে সব বুঝিয়ে বলব? কী ভাবে বোঝাতে চাইব আর ও কী ভাবে বুঝবে তার ঠিক কী। তা ছাড়া ওকে বলতে যাব কেন? তুমি আমার আপনজন, তোমাকে বলব। তুমি তার প্রতিবিধান করবে। শাস্তি দেবে।

শাস্তি দেব? আমার কী সাধ্য!

সাধ্য নেই তো স্বামী হয়েছ কেন? নিজের স্ত্রী থাকতে পরস্ত্রীর দিকে লালসা করবে তুমি স্বামী হয়ে তার শাসন করবে না? চুপ করে সহ্য করে যাবে? তোমার এত শক্তি এত তেজ কোনো কাজে লাগবে না?

দেখি। ভাবি—

তুমি যদি কিছু না করো তো না করবে, কিন্তু আমার দুঃখের কথা তোমাকে বলে রাখলাম। তুমিও বোবা আমিও বোবা। বোবার অন্তরের দুঃখ আর কে বুঝবে? আমার কথা কইতে না পারার অতলে যে একটা কথা আছে, তার ভাষা একমাত্র তোমারই জানা।

গাছের তলায় বসে গঙ্গামণি কাঁদতে লাগল।

তারপর, দিনের পর দিন, কী দেখল? দেখল, গাছ পাঁচিলের উপর দিয়ে আরেকটা ডাল সুভঙ্গেদের বাড়ির দিকে বাড়িয়ে দিল। যে জানলায় মনোরথ এসে দাঁড়ায় ঠিক সেই জানলাটা লক্ষ্য করে। ক্রমে-ক্রমে গুচ্ছ-গুচ্ছ পাতা গজিয়ে দিল।

ঠিক হয়েছে। দুই জানলার মাঝে আড়াল গড়ে উঠেছে। মনোরথ আর স্পষ্টাস্পষ্টি দেখতে পায় না গঙ্গামণিকে। ইশারা করতে পারে না। জানলা খোলা রেখে নিজের ঘরের মধ্যে নড়তে-চড়তে পারে গঙ্গামণি। তার আপন পুরুষের সঙ্গে কথা কইতে পারে, কথা কইতে না পারার সব অপরূপ কথা।

কে বলে প্রাণ নেই, ইচ্ছে নেই, ভালোবাসা নেই? কে বলে প্রতিকার করতে জানে না?

গঙ্গামণি সুভঙ্গদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসে। আমাকে আর দেখবে কী? এখন শুধু আমার পুরুষকে দেখ! যে সমস্ত কিছু পূর্ণ করে আচ্ছাদন করে, সেই-তো পুরুষ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল কী? সেই যে ঝড়ের উত্তেজনায় গঙ্গামণির মুখে কথা ফুটেছিল তা স্থায়ী হল কই?

ঝড় শান্ত হয়ে যেতে গঙ্গামণিও শান্ত হয়ে গেছে। আর ভয় নেই, তাই আর কথাও নেই। যেমন বোবা তেমনি বোবা হয়ে রয়েছে।

প্রতিবেশীরা বললে, 'কথা যখন একবার ফুটেছিল তখন নিশ্চয়ই আবার ফুটবে।'

'শুধু গাছের উপরে একটা আঘাতের ভয় সৃষ্টি করতে পারলেই ফল হবে হয়তো।' অনেক যুক্তি-তর্ক খাটিয়ে মনোরথই কথাটা দাঁড় করাল।

কথাটা শম্ভুপদর কাছে খুব অসার মনে হল না। স্বাভাবিক স্ত্রীর মত গঙ্গামণি তার স্বামীকেই মনে-প্রাণে ভালোবাসে। আর এইখানে আঘাত পড়লেই তার চরমতম যন্ত্রণা। যন্ত্রণা হলেই আবার কথা বলে ওঠবার সম্ভাবনা।

একবার শোনবার পর সকলেরই আবার নতুন করে শোনবার লোভ।

কিন্তু তাই বলে সমূলে সমস্ত গাছটাকে কেটে ফেলবার আয়োজন করতে শম্ভুপদ রাজি নয়।

'না, না, সমস্ত গাছটাকে কাটা নয়। তাহলে হয়তো মেয়েটাই মরে যাবে।' বললে অন্য প্রতিবেশী।

'আমি বলি কী, এক-আধটা ডাল আগে কেটে দেখা যাক, কী রকম হয়।' মনোরথ বললে হিতৈষীর ভঙ্গিতে : 'তারপরে না হয় সমস্তটার কথা ভাবা যাবে।'

তাই ভালো। যদি একটা ডাল কাটলে কিছু ফল পাওয়া যায়, তাহলে আরেকটা ডাল। এমনি ক্রমে-ক্রমে।

একটা ডাল কেটে ফেলতে আর কতক্ষণ! গভীররাতে সব যখন ঘুমে চুপচাপ, তখন কাটারির দু'ঘায়েই ডালটা কেটে ফেলল মনোরথ। সেই পাঁচিলের উপরকার শত্রু ডালটা।

সকালে উঠে টের পেল গঙ্গামণি। পুব দিকটা কেমন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। এ কি সেই ডালটা কোথায়? ওপারের জানলায় যে মনোরথ দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় গঙ্গামণির মুখে কথা কই? এ যে দেখি শুধু কান্না, শুধু চুল ছেঁড়া, মেঝে-দেয়ালে রক্তাক্ত কপাল ঠোকা।

নায় না, খায় না, ঘুমোয় না, গঙ্গামণি একটা কান্নার সমুদ্র।

তার যত কথা যত নালিশ সব তার পুরুষকেই। সমস্ত উচ্চারণ সেই অতলান্ত স্তব্ধতায়।

তুমি আমাকে জাগিয়ে দিলে না কেন? দেখতাম কেমন তোমার বাহুতে কোপ মারে! তুমি নীরবে সব সহ্য করলে কেন? অত ভালোমানুষ হলে কি চলে? তোমাকে মারবে আর তুমি তা ফিরিয়ে দেবে না? ডালটা কেটে ফেলে আবার কেমন তা দিব্যি নিয়ে গেল! তুমি নিয়ে যেতে দিলে? প্রতিশোধ নিলে না? না, না, তুমি নাও প্রতিশোধ। আমাকে তৃপ্তি দাও। মুখ বুজে সব সহ্য করে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। তোমার যে প্রাণ আছে টান আছে তা প্রমাণ করো।

মনোরথ হাসে। বলে, 'একটা ডাল কাটলে কিছু হবে না, সম্পূর্ণ গাছটাই শেষ করে দিতে হবে।'

কিন্তু তার আগেই আরেকটা ঝড় উঠল।

মেঘে-বিদ্যুতে ঝড় নয়, এ ঝড় রক্তে আর আগুনে, লুটপাটে, খুনখারাপে। ছুরি-ছোরা বন্দুক-মশাল নিয়ে পঙ্গপালের মত দুর্বৃত্তের দল বেরিয়ে পড়েছে। গাঁ-কে-গা উজাড় করে দিচ্ছে। হাতের কাছে পাচ্ছে আর কাটছে, বাড়ি-ঘরে আগুন লাগাচ্ছে, জরু-জেওর বাগে পেলেই চুরি করে নিচ্ছে।

সে এক চরম সর্বনাশের প্রহর!

যে-যে-পথে পারো পালাও। একবস্ত্রে। একলক্ষ্যে। আর কিছু নয়, শুধু প্রাণটুকু বাঁচানো। কী গেল-থাকল, আর কোনো হিসেব নয়, শুধু নিশ্বাস-টুকুর হিসেব।

শম্ভুপদদের গ্রামও বেরিয়ে পড়েছে পায়ে হেঁটে। ঘুর-পথে। বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। নদীনালা সাঁতরে।

আশ্চর্য, সমান্ত পর্যন্ত তারা পেঁছুল নিরাপদে।

'আপনাদের কিছু খোয়া যায়নি?' সীমান্তের অফিসর জিগগেস করলে।

শম্ভুপদ বললে, 'না।'

'তবে এই দুই মহিলা কাঁদছে কেন? অফিসর সুভঙ্গ আর গঙ্গামণির দিকে ইঙ্গিত করল : 'কোনো অত্যাচার হয়েছে নাকি?'

'না।' শম্ভুপদ সুভঙ্গকে দেখিয়ে বললে, 'এর স্বামী খুন হয়েছে, আর

'এর স্বামী—' একবার বুঝি অলক্ষ্যে ঢোক গিলল শম্ভুপদ : 'এর স্বামী আসতে পারেনি।'

আসতে পারেনি? খুন হয়ে যাওয়ার চেয়ে আসতে না পারাটাই যেন বড় খবর।

অফিসর খাতা-পেন্সিল বাগিয়ে ধরল। 'ওর স্বামীর নাম কী?'

নাম? স্বর্গ-মর্ত খুঁজতে লাগল শম্ভুপদ।

তারপরে অফিসরকে একপাশে একটু টেনে নিল। বললে, 'মেয়েটা বোবা। আর যে ওর স্বামী, যার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে, সে একটা গাছ।'

'গাছ?' চট করে কন্ঠস্বরটা শুধরে নিল অফিসর। গঙ্গামণির দিকে এগিয়ে এসে চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বললে, 'তাহলে আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার স্বামী তো বেঁচে আছে। আপনার তবে কিসের ভাবনা?'

ভাবনা করবার কিছু নেই? ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল গঙ্গামণি।

'সে যেমন আছে তেমনি থাকবে। তাকে কেউ মারবার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাববে না। সে আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করবে। আবার একদিন দেখা হবে আপনাদের।'

দেখা হবে? কথা কিছু শুনতে পারে না গঙ্গামণি তবু তার ভাসা-ভাসা চোখ আলোতে-আশায় ভরে উঠল।

'আমরা শিগগিরই একদিন দলবল নিয়ে সেখানে যাব।' বললে অফিসর, 'আপনি আবার আপনার ঘরবাড়ির দখল পাবেন। ফিরে পাবেন স্বামীকে। দেখবেন সে ঠিক আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ি আগলে।'

দাঁড়িয়ে আছে। সুভঙ্গ কাঁদুক, গঙ্গামণি তার চোখের জল মুছে ফেলল। তার স্বামী মরেনি। সে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। অটল সহিষ্ণু একনিষ্ঠ।

৭৫ । সারপ্রাইজ ভিজিট

খবরের কাগজে দেখলাম বডমিলার পতনের পর চীনদরদী ক'টা বাঙালি বিভীষণ ঠোঙায় করে খাবার কিনে এনে খেয়েছে।

মনে পড়ল।

তখনও দেশ ভাগ হয়নি। এক মফস্বলী সদরে মুন্সেফিতে আছি। বদলির অর্ডার এসে গিয়েছে, সেরেস্তাদারকে চার্জ দিয়ে জয়েনিং টাইম 'এভেইল' করছি। জিনিসপত্র প্যাক হচ্ছে।

হঠাৎ সন্ধ্যের দিকে ছোকরা এক আমলা এসে হাজির।

এখন তো উদীয়মানের কাছেই যাওয়া উচিত, অস্তায়মানের কাছে কে আসে।

'স্যার, ওরা ফিস্টি করছে।'

'কারা ?'

'কোর্টের আমলারা।'

'উপলক্ষ্য ?'

'আপনি বদলি হয়ে গিয়েছেন, তাই।'

তার মানেই শত্রুপক্ষের পতন হয়েছে বলে উল্লাস। আমিও উল্লসিত হলাম যেহেতু বিভীষণরাও নিরাপদ নয়। বিভীষণের মধ্যেও বিভীষণ।

বললাম, 'তা ওদের ঘুষ-ফুস নিতে অসুবিধে হচ্ছিল—আমি চলে গেলে ফুর্তি তো হবেই—'

'স্যার, একবার সারপ্রাইজ ভিজিট দেবেন ?'

চার্জ দিয়ে দিয়েছি, সারপ্রাইজ ভিজিট দেবার আর এক্তিয়ার কই ? তবে বাঙালি মতে এমনি গিয়ে পড়লে কে আটকায়।

বললাম, 'চলুন।'

হাকিমি পোশাক নয়, সাদাসিধে ঘরোয়া ধুতি-পাঞ্জাবিতেই চললাম। শুধু র‍্যাপার দিয়ে মুড়িসুড়ি দিলাম—যা কনকনে শীত।

'এই যে এস। এত দেরি করলে কেন ?' সেরেস্তাদার স্বয়ং অভ্যর্থনা করল : 'শালা ভেগেছে এত দিনে। চার্জ দিয়ে দিয়েছে।'

বুঝলাম দেখামাত্রই চিনতে পারেনি আমাকে। কোনো অনুপস্থিত আমলা বলে ভুল করেছে।

বললাম, 'কই আমার ঠোঙা কই ?'

যা কণ্ঠস্বর, পলকে চিনে ফেলল।

'স্যার, স্যার—' সকলের প্রায় নাড়ী-ছাড়ার অবস্থা।

'বা, ফিস্টি তো ভালো কথা। কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে কেন ? যার জন্যে ফিস্টি তারই নেমন্তন্ন নেই ? আমার একটাও ফেয়ারওয়েল মিটিং হয়নি, এইটেকেই বরং তাই করা যাক। খাবার ঠোঙায় কেন, প্লেট নিয়ে আসুন। আর ওপেনিং সং গাইবার জন্যে একটা হারমোনিয়ম—'

কেউ বা প্লেট আনবার কেউ বা হারমোনিয়ম আনবার নাম করে কেটে পড়ল।

সেই রাত্রেই ট্রেনে করে কলকাতা গেলাম। সকালে হাইকোর্টে দেখা করতে গেলাম রেজিস্ট্রারের সঙ্গে। ভাগ্যক্রমে রেজিস্ট্রার ইংরেজ।

স্থানীয় জেলাজজকে বাই-পাশ করে গেলাম। প্রথম কারণ, চার্জ দিয়ে দেবার পর সে আর আমার জজ নয়; দ্বিতীয় কারণ, বাঙালি "ইউরোপীয়ান" জজের রসবোধ নেই বললেই চলে।

কার্ড পাঠালেও ডাকছেন না রেজিস্ট্রার। সে নির্ঘাত বুঝেছে বদলি ক্যানসেল করতে এসেছি। আর ওজুহাত সেই মামুলি—স্ত্রীর ডেলিভারি আসন্ন।

'কী, স্ত্রী অসুস্থ?' ঘরে ঢুকতেই হুমকে উঠল রেজিস্ট্রার।

হাসলাম। বললাম, 'না, স্যার। বদলি রদ করবার তদবিরে আসিনি। শুধু একটা গল্প বলতে এসেছি।'

'গল্প?'

'হ্যাঁ, এখন না বলে গেলে বলবার আর চান্স পাব না কোনোদিন।'

বলে সব ব্যক্ত করলাম।

রেজিস্ট্রার গম্ভীর মুখে বললে, 'তোমার প্রতি ওরা এত বিরূপ কেন?'

'ঐ সারপ্রাইজ ভিজিট।' হাসলাম। 'একেবারে না বলে-কয়ে কোনো পূর্বাভাস না দিয়েই সারপ্রাইজ ভিজিট। কখনো-কখনো সরাসরি এজলাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে। কখনো বা অফিস-টাইমের বাইরে, রাত্রে।'

'কিছু আবিষ্কার করেছ?'

'তার আর লেখাজোখা হয় না। উকিল নথি থেকে সারেপটিসাস কপি নিচ্ছে, আউটসাইডাররা ভাড়ায় কাজ করছে, আমলারা সাইকেলে বেঁধে নথি নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে, আর সেরেস্তাদার দিব্যি খালি গা হয়ে থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন—'

'কিছু সুফল হয়েছে?'

'সুফলের মধ্যে প্রিসিডিং করে-করে নিজের কাজ বাড়িয়েছি আর পেছন থেকে চুপি চুপি এসে সেরেস্তাদারের হুঁকো থেকে জ্বলন্ত কলকে তুলে নিতে গিয়ে হাত পুড়েছে। আর, শেষ পর্যন্ত, ঐ ফিস্টি—'

'তুমি কি আজই ফিরে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ, তা, আজই।'

'তবে নেক্সট ট্রেনেই ফিরে যাও। আর অর্ডারের য়্যাডভান্স কপি নিয়ে যাও সঙ্গে করে।'

পরদিন যথাসাজে কোর্টে গিয়ে কলিং বেল-এ বাড়ি মারতেই হৈ-হৈ পড়ে গেল। সেরেস্তাদার কাছে এসে দাঁড়ালেন। এ কী।

বললাম, 'চর্জ টেক ওভার করব। বদলি রদ হয়ে গেছে।' অর্ডারের য়্যাডভান্স কপি দেখালাম; 'আর শুনুন। অফিসে এখন আমি একবার সারপ্রাইজ ভিজিট দেব। সব টিপটপ করে রাখুন। ভিড়ভাড় সরিয়ে দিন। হুঁকো-কলকে সরা-মালসা—সমস্ত। আর যদি কালকের ঠোঙা ফোঙা থাকে তাও। আর শুনুন—' সেরেস্তাদার আবার ফিরল। 'সিগারেট খান না? সিগারেটটা মন্দ কী! চট করে বাইরে ফেলে দেওয়া যায়। এই নিন একটা—দেখুন—'

'না স্যার, না স্যার—' পায়ে যেন হাড়মাংস নেই এমনি টলতে-টলতে চলে গেল সেরেস্তাদার।

এজলাসে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

মনে পড়ল।

তার মানেই বমডিলা আবার অধিকৃত হল।

বিভীষণরা বোধহয় আরো একবার খাবে। ভাব দেখাবে আমার ফিরে-আসা যেন ওদেরই আমাকে ফিরে-পাওয়া।

৭৬। তাজমহল

'তোমার মায়ের কাণ্ডটা দেখলে?' মণিশঙ্কর গর্জে উঠল।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে বোকার মতন তাকিয়ে রইল নিখিল।

'এ সব কেলেঙ্কারি চলবে না এখানে।'

নিখিল মাথা চুলকোতে লাগল। কতক্ষণে মাথাটা পরিষ্কার হবে কে জানে।

'দেখ, এক জীবন আমি সব দেখেছি-শুনেছি।' গম্ভীর হল মণিশঙ্কর : 'এখন তোমার হাতে সংসার। তোমাকেই সব প্রতিকার করতে হবে। তাই যাও, মাকে গিয়ে বারণ করো, বলো, চলবে না এসব।'

তাই, কী ব্যাপার, মায়ের কাছেই যাচ্ছিল, মণিশঙ্কর আবার ডাকল। বললে, 'বৌমাকে ডাকো।'

শতদল কাছেই ছিল, এক দমকে চলে এল।

'কী, এটা তোমার সংসার তো? মা ষষ্ঠীর কৃপায় গুচ্ছের ছেলেমেয়ে হয়েছে তো তোমাদের?' বক্র কটাক্ষ হানল মণিশঙ্কর : 'মা হয়ে তাদের মঙ্গল চাও তো? না, কী—'

মুখ ফ্যাকাসে করে তাকিয়ে রইল শতদল। 'তবু নিখিলের চেয়ে তার সাহস বেশি। ঢোক গিলে জিগতেস করলে, 'কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে! দেখ গে তোমার শাশুড়ির ঘরে। স্পষ্ট নিষেধ করে দাও।' মণিশঙ্কর অন্যদিকে মুখ ফেরাল : 'না। এ সব নোংরামি সইবে না কিছুতেই।'

নিখিল আর শতদল বিমলাবালার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'কী করেছি আমি?' বিমলা প্রখরস্বরে ফেটে পড়ল : 'এই দেখ না। দুটো শুধু পাখি রেখেছি।'

বেতের একটা সাজিতে দুটো ঘাসের বিড়ের উপর ছোট্ট দুটো কাদার ডেলা।

পাখি-টাখি কিছু বলেই ঠাহর হয় না। নড়াচড়ার নামগন্ধও নেই। কী ব্যাপার? এই নিয়ে এত তর্জন-গর্জন!

নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ল শতদল। ক্রমশই, কৌতূহলের তীক্ষ্ণতায়, বসে পড়ল মাটিতে। 'ওমা, সত্যিই তো, পুটুর-পুটুর করে তাকাচ্ছে।' শতদল

স্বভাব-আনন্দে উছলে উঠল : 'কিন্তু কই, মুখ কই, ঠোঁট কই? ভালো করে ফোটেনি এখনো। গায়ে লোমও তো ওঠেনি দেখছি।' ছোঁবার জন্যে হাত বাড়িয়েও বাড়াল না শেষ পর্যন্ত। বললে, 'সুন্দর কিন্তু। যমজ বোধ হয়।'

যেন কোনো দোষ কাটাতে চাচ্ছে এমনি শোনাল শতদলকে। বিমলা ঝামটে উঠল : 'যমজ হতে যাবে কেন? জোড়ের পাখিও তো হতে পারে।'

আলগা দিয়ে উঠে পড়ল শতদল।

নিখিল জিগগেস করলে, 'কী পাখি এ দুটো?'

বিমলা মেঝের উপরেই বসে ছিল, ডালাটা টেনে নিল কোলের কাছে। বললে, 'বলে গেল তো চন্দনা!'

ফুঃ। ঠিক এতটা নয়, এমনি ধরনের কাছাকাছি একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করল নিখিল। বললে, 'এও আবার কেউ কেনে নাকি?'

'কিনলাম কোথায়! পয়সা দেবে কে?'

'কেননি তো—'

'লোকটা দিয়ে গেল।'

'দিয়ে গেলেই রাখতে হবে নাকি?'

'কী করব তবে?' ছেলের মুখের দিকে তাকাল বিমলা : 'জ্যান্ত দুটো বাচ্চাকে ফেলে দেব বাইরে? কুকুরে-বেড়ালে খাবে?'

'নইলে কী হবে ওদের দিয়ে?'

'ওদের পুষব। বড় করব।'

শতদল ফোড়ন কেটে বসল : 'বাবা কিন্তু আপত্তি করছিলেন—'

সে আর বেশি কথা কী! সারা জীবনই তো আপত্তি করলেন। আমি যদি পুব বলেছি উনি বলেছেন পশ্চিম। সোজা বললে বাঁকা, সুন্দর বললে হতকুচ্ছিত। আমার যা চোখের কাজল তাই ওঁর চক্ষুশূল। ঝগড়া ছাড়া আর কী করলেন তিনি! আজ একুশ-বাইশ বছর কথা বন্ধ, মুখোমুখি ঝগড়া করতে অসুবিধে বলে পরোক্ষে আপত্তি চালাচ্ছেন। রিটায়ার করলে কী হবে, কুচক্কুরে স্বভাব। বদলাল না কিছুতেই। ছেঁকা দিয়ে কথা বলার আর অবসর নেই। ঘর আলাদা করে নিয়েছে তবু মুখ-চুলকুনি ঠিক আছে। কিন্তু যে যতই তড়পাক, এদের আমি ছাড়ব না। সামান্য একটা শখ, তাতে পর্যন্ত বাদ সাধা।

'বাবা বলেন, বনের পাখিকে খাঁচায় বন্দী করা কেন?' শতদল টিপ্পনী জুড়ল।

'তুমি-আমি কোথাকার পাখি? আর আমাদের যেখানে এনে পুরেছে সেটাকে কী বলে? মুক্ত আকাশ?' ঝলসে উঠল বিমলা।

নাতি-নাতনির দল পঙ্গপালের মত ভিড় করে এল। দেখি দেখি কেমন পাখি।

তাড়াতাড়ি গায়ের আঁচলটা ডালার উপর টেনে ধরল বিমলা। 'খবরদার,

কাছে আসতে পারবি নে কেউ। ছুঁতে পারবি নে।' ডালাটা টেনে নিল নিজের কাছে : 'না, উঁকি মারতেও পারবি নে।' তারপর বুঝি বা স্নেহ ঢালল গলায় : 'আগে বড় হোক।'

'বড় হোক।' 'বড় হোক।' সমস্বরে রব তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল নাতি-নাতনির দল।

'কী, পারলে তাড়াতে?' মণিশঙ্কর ডাকল শতদলকে।

'এখনো পাখাই গজায়নি। তাড়াব কাকে? তাড়ালেই বা যাবে কোথায়;'

'পাখাই গজায়নি?' যেন কত বড় দুঃসংবাদ, মণিশঙ্কর মুখ-চোখের এমনি চেহারা করল।

'পাখা গজালেই একদিন উড়ে পালাবে।' আশ্বস্ত করতে চাইল শতদল।

'ততদিন অপেক্ষা করতে হবে না।' নিখিল আরো সাহস দিল : 'তার আগেই টেঁসে যাবে।'

'তাই তো বলছি।' চেঁচিয়ে উঠল মণিশঙ্কর : 'কাচ্চাবাচ্চাদের সংসারে সেটা কি মঙ্গলের হবে? পোষা পাখি-টাখি মারা গেলে শুনেছি সংসারে অঘটন ঘটে। তা তোমাদেরই সংসার। তোমাদেরই ছেলেপিলে।'

দেখ লোকটার অলক্ষুনে কথা! কোথায় গিয়ে ঘা মারছে। অনাথ অসহায় পাখি দুটো যদি মরে যায় সেটা অঘটন নয়। আর, ঈশ্বর না করুন, তেমন কিছু যদি ঘটে, তার সঙ্গে পাখি পোষার সম্পর্ক কী। যাদের বাড়িতে পাখি নেই তাদের বাড়িতে আর অঘটনেব ছায়া পড়ে না? তার মানে, ছেলে-বউকে শত্রু করে তোলা। যত সব কুমন্ত্রণার ডিপো। কুচিন্তা ছাড়া নিষ্কর্মার আর কাজ কী।

'পাখি দুটো রেখেছে কিসে?' মণিশঙ্কর আবার জিগগেস করল।

'বেতের ডালায়।' নিখিল বললে : 'আরেকটা দিয়ে চাপা দিয়েছে।'

'ভারি একটা ইট চাপা দেয়নি? তা হলে তো—' মনের গহনে হেসে উঠল মণিশঙ্কর। শতদলকে ডাকল। বললে, 'রঞ্জু-মঞ্জুদের ও ঘরে যেতে দিও না। ওটা অকল্যাণের ঘর।'

'বারণ কবে দেব।' শতদল মুখ থমথমে করে তুলল : 'রঞ্জু-মঞ্জু হয়তো শুনবে। কিন্তু রতু-সতু-পিনকুকে বিশ্বাস নেই। ছুটোছুটি করে খেলতে গিয়ে যে কোনো মুহূর্তে ডালা উলটিয়ে দিতে পারে।'

'ডালা উলটিয়ে দিতে পারে!' হো হো করে হেসে উঠল মণিশঙ্কর : 'ইচ্ছে করলে ভেঙেও দিতে পারে। তুমি তার করবে কী! তবু একটু ওদের চোখে-চোখে রেখো।' মণিশঙ্করই চোখে চোখ রাখল।

'ভাঙুক না কেউ!' ও দিক থেকে বিমলা গর্জে : 'দেখি সে কেমন আস্ত থাকে।'

লোকটা কী ভীষণ কুচুটে। নিমপাতা যতই ঘি দিয়ে ভাজ না কেন সে তার জাত ছাড়বে না।

একটা বেরাল মণিশঙ্করের পাতের কাছে ঘুরঘুর করত। লাঠি নিয়ে বসত মণিশঙ্কর। খাবি তো আঁস্তাকুড়ে খাবি, পাতের কাছে মুখ আনতে পারবি নে। এগোবি তো পিঠ ভেঙে দেব।

মণিশঙ্কর লাঠি সরিয়ে রাখল। পাতের কাছে মাছ রাখল থুব করে। ভয় ভাঙিয়ে দিল বেরালের। পায়ে-পায়ে ঘুরতে শেখাল।

বেরালের নাম রাখল সিদ্ধেশ্বর।

'এ সব সেদ্ধ করা জিনিস খাচ্ছিস কী?' বেরালকে ফিসফিসিয়ে বলে মণিশঙ্কর : 'বাড়িতে কাঁচা টাটকা মাংস আছে তার খোঁজে যা না। মাঝের হলঘরটা বাদ দিয়ে ঐ পশ্চিমের ঘরে আছে। একটা মাত্র ডালা দিয়ে ঢাকা। তুই একটা ঢু মারলে ডালা কতক্ষণ! যা না ওদিকে।' মণিশঙ্কর হাত তোলে। বেরালটা নড়ে না, চোখ বোজে। তারপর অন্য দিকে চলে যায়।

'যাবি তো বোনপোর বাড়ি যা।' নিরুদ্দেশ বেরালকে আপন মনেই লক্ষ্য করে : 'রক্তের কেমন স্বাদ জেনে আয়।'

'এই ঘরে ঢুকবি তো মাথা ফাটিয়ে দেব।' লাঠি এখন বিমলার হাতে উঠে এসেছে : 'একটা ইঁদুর মারতে পারে না, ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ানো।'

নাতি-নাতনিদের নাম ধরে হাঁক পাড়ে বিমলা। 'তাড়া দেখি তো এ অনামুখোকে।'

কেউ লাঠি, কেউ ঢিল নিয়ে তেড়ে যায়।

'এ সব কী হচ্ছে?' শতদলকে ডেকে শাসিয়ে ওঠে মণিশঙ্কর : 'বেরাল মা-ষষ্ঠীর বাহন না? একে তো অনাসৃষ্টি পাখি পোষা, তার উপর আবার এই বাহনের উপর নির্যাতন! বারণ করে দাও।'

'বলছি কত। শুনছে না।' অসহায়ের মত মুখ করল শতদল।

'শুনছে না? তা হলে নিজেই নিজের অমঙ্গল ডেকে আনতে চাও?'

'আপনি একটু বলুন না ডেকে।'

'আমার কী! তোমাদের সংসার, তোমরা বলবে, তোমরা দেখবে।' চেয়ারে পিঠ ছাড়ল মণিশঙ্কর : 'আমি তো রিটায়ার করেছি।'

পর দিন পাতের কাছে বেরাল এলে খেঁকিয়ে উঠল : 'বেটা ভূত! শুধু সেদ্ধ খাবার জন্যেই তোর নাম সিদ্ধেশ্বর রেখেছি নাকি? কার্য সিদ্ধি করবি তো? থোঁতা মুখ করে বসে আছে দেখ না। মারব টেনে এক ঘা।' মণিশঙ্কর বাঁ হাতে চড় ওঁচাল।

ডালাটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরল বিমলা। আগে আগে খাটের নিচে রাখত, এখন খাটের উপরে রাখছে। পাহারা দিচ্ছে রাত-দিন।

ঘুমের মধ্য থেকে উঠছে ধড়মড় করে। ছোট্ট টর্চ জেবলে দেখছে ডালা তুলে। ঠিক আছে। ডেলা পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে নিঝুম হয়ে। গায়ে-গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি করে বসেছে।

রাত্রের অন্ধকারই পছন্দ করে পাখি দুটো।

কে না করে!

কিন্তু দিনের আলোটুকুই বা কী কম মিষ্টি!

আহা, দেখ না, একটু-একটু করে কেমন বড় হচ্ছে দিন-দিন। গায়ে পালক জাগছে। সবুজে-হলুদে ফুটছে কেমন রঙের আলপনা। ঠোঁটে লালের ছিটে। আর কুতকুতে চোখ কেমন জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে সত্যি।

'ও রঞ্জু-মঞ্জু, দেখে যা।' ছোট-ছোট নাতি-নাতনিদের নাম ধরে একদিন ডেকে ওঠে বিমলা : 'ওরে রতু-সতু-পিনকু ছুটে আয় শিগগির—'

ওমা, পাখি দুটো কী সুন্দর হয়েছে দেখতে। গোল ছিল, লম্বাটে হয়ে উঠেছে। লেজের দিকটা ছুঁচলো হচ্ছে, তাই না? নোখ-ঠোঁটও শক্ত হয়েছে আগের চেয়ে। ক দিন পরেই ঠিক ঠোকরাতে শিখবে।

'কিন্তু আসল বিপদ অন্য রকম।' বিমলা হাসল : 'বড় হবার সঙ্গে-সঙ্গে পাখিদের পাখাও তেজী হচ্ছে। এখুনি না আটকালে একদিন ঠিক উড়ে পালাবে।'

'কখনো না। দেব না পালাতে?' শিশুগুলো উৎসাহে টগবগ করে উঠল।

'তবে তোদের দাদুকে গিয়ে বল, একটা লোহার খাঁচা কিনে দিতে।'

কে বলবে! রঞ্জু-মঞ্জু অনেক ঠেলাঠেলি করেও একা এগুতে সাহস পেল না। কিন্তু সতুকে রুখতে যাওয়া বৃথা। সে একেবারে মণিশঙ্করের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'একটা খাঁচা কিনে দাও দাদু।'

'কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে পাখি দুটো!' দূর থেকে রঞ্জু-মঞ্জু মোক্তারি জুড়ল: 'তুমি একবারটি দেখবে চলো।'

'সে কী, ও দুটো এখনো বেঁচে আছে নাকি?' মণিশঙ্কর অবাক হবার ভাব করল।

'বা, বাঁচবে না কেন? ঠাকুমা কত যত্ন করে ওদের খাওয়াচ্ছে। ছোট-ছোট দানা করে ছোলার ছাতু, কলার কুচি দুধের সর—'

'যা, যা, ফাজলামো করিস নে।' ধমকে উঠল মণিশঙ্কর : 'অনটনের সংসারে পাখির জন্যে দুধের সর!'

'আহা সে আর কতটুকু!' রঞ্জু-মঞ্জু হাসতে লাগল।

'বেশ তো, দই-রাবড়ি খেয়ে ওদের তাগদ বেড়ে গিয়ে থাকে, ওরা এখন উড়ে পালাক।'

'সেই জন্যেই তো খাঁচার কথা বলছি তোমাকে।'

'না, যার যেখানে দেশ নয় সেখানে তাকে বন্দী করে রাখা অন্যায়। তোমাকে এ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে অন্য বাড়িতে আটকে রাখলে কেমন হয়? না, খাঁচা-টাচা চলবে না কিছুতেই। বনের পাখি বনে যাক।'

'বনে কত দুধের সর খেতে পাবে!'

'খোলা আকাশে যে উড়তে পাবে তাই ওদের দুধের সরের চেয়েও বেশি।'

মণিশঙ্কর গম্ভীর হল : 'জোর করে কারু স্বাধীনতা নষ্ট করে দিতে নেই।'

তত্ত্বকথায় শিশুদের মন ভিজছে না। তারা বলতে লাগল, 'তুমি একবার ওঠ। নিজের চোখে দেখবে চল। দেখো, তোমারও কেমন ভালো লাগবে।'

'আমি ও ঘরে যাই না।'

ও, হ্যাঁ, ঠিকই তো। ঠাকুমাও তো আসবে না এ-ঘরে। ডালাটা তাদের হাতে ছেড়েও দেবে না। তবে দাদুকে পাখি দেখাই কী করে? আর না দেখালে দাদুর মায়া পড়বে কোত্থেকে।

নাতি-নাতনিরাই মধ্যস্থ পথ বার করল। বিমলাকে গিয়ে বললে, 'দাদু খাঁচা কিনে দিতে পারে যদি তুমি ওটা বারান্দায় টাঙিয়ে রাখো।'

তাতে আর আপত্তি কী! পাখি দুটো যখন ক্রমশই শোভা ধরছে, গায়ের রঙ গাঢ় হচ্ছে, তখন আর সকলের সঙ্গে বুড়োও দেখুক, চোখ সার্থক করুক। পাখি দেখে যদি তবু বন-বনানী পাহাড় পর্বতের কথা মনে পড়ে। যদি তাতে ভঙ্গিটা একটু কোমল হয়, উদার হয়!

'কিন্তু রাত্রে খাঁচাটা আমার ঘরে এনে রাখব। বাইরে থাকবে না।' বিমলা হুঁশিয়ারি দিল।

না, তাতে মণিশঙ্করের অসুবিধে কী। বারান্দায় এলেই তো তার খপ্পরে এসে পড়ল। সব সময়ে কে অত পাহারা দেবে। শিথিল মুহূর্ত খুঁজে নিতে বেগ পেতে হবে না। আর কিনে দিচ্ছে তো একটা বাঁশের খাঁচা।

বারান্দার কড়ায় ঝুলন্ত খাঁচায় দুলল দুই বাসিন্দে। দুই জ্বলন্ত আনন্দ।

'দেখ দাদু, একটা কেমন একটু মোটাসোটা। আরেকটা হিলহিলে। আর, দেখছ', মঞ্জু চোখ বড় করল : 'মোটাসোটাটার গলায় কেমন একটা রঙিন কলার জাগছে।'

'ও, হ্যাঁ, লাল কাটি বেরুচ্ছে। ওটা তা হলে পুরুষ।' সগর্বে বললে মণিশঙ্কর।

'আর ওটা?'

'ঐ হতচ্ছাড়ীটা? ওটা মেয়ে না হয়ে যায় না।'

কিন্তু একই খাঁচায় পুরুষ আর মেয়েকে এত ঘনিষ্ঠ করে রাখাটা শোভন হচ্ছে না। বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে কুদৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

সেই নালিশটাই করল সেদিন শতদল।

'দেখেছ আদরের কী ঘটা! প্রায় সারাক্ষণই ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে রয়েছে। আর, আশ্চর্য, পুরুষটাই বেশি পাজি।'

'কে জানে। হয়তো বা বেশি উদার। হতচ্ছাড়ী জেনেও আদর করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না।' নিখিল পাশ ফিরল বিছানায়।

'কিন্তু যাই বলো এ সব দেখে ছেলেমেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। বইয়ে

শিখেছে বাচ্চাদের প্রথম জ্ঞান কখনো-কখনো পশুপাখিদের আচরণ থেকে।'
'কখনো কখনো বা বাপ-মায়ের অসাবধানতা থেকে।'
'যাই বলো, তুমি ও দুটোকে আলাদা খাঁচায় রাখবার ব্যবস্থা করো।'
'তুমি ব্যস্ত হয়ো না। বাবা সহ্য করবে না এ ঢলাঢলি।' নিখিল আশ্বাসের সুরে বললে, 'খাঁচার দরজা খুলে উড়িয়ে দেবে একদিন।'
তাই হয়ত দিত, কিন্তু শুনল রাত্রে বেরাল এসে পুরুষ পাখিটার লেজ ধরে টেনেছে। পালক-ছেঁড়া জখমি পাখি এখন ওড়ে কী করে?
যথারীতি খাঁচাটা ঘরে নিয়ে কালো কাপড়ে ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল বিমলা। মাঝরাতে খাঁচার মধ্যে পাখার ঝটপট শুনে টর্চ টিপে উঠে বসে দেখল, সিদ্ধেশ্বর।
বিমলা এমন ভাব করল যেন তার ঘরে ডাকাত পড়েছে।
পুরুষটারই লেজ বড়, খাঁচার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আর, চোরা বেরালের তাই ধরে টানাটানি। মেয়েটার গায়ে একটা আঁচড়ও পড়ে নি। পুরুষটাই বুঝি তাকে ঢেকে রেখেছে বুক দিয়ে।
চোর দায়ে ধরা পড়ল মণিশঙ্কর। নিজেই বড় দেখে একটা লোহার খাঁচা কিনে আনল। আর ঢালা হুকুম দিল, সিদ্ধেশ্বরকে যে পারবে মারবে। বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেবে না। এক থাবায় সাবড়াতে পারে না, আঁচড়-কামড় সার। অপদার্থের একশেষ।
পুরুষ পাখিটার মুখে সুন্দর শিস ফুটছে।
'বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ।' খাঁচার বাইরে থেকে রেলিঙের কাছে মুখ এনে বলে মণিশঙ্কর।
পাখি সাড়া দেয় না। শুধু শিস দেয়।
'বল হরি হরি।'
পাখি তেমনি নিরুত্তর।
'বল রাম-রাম।'
পাখি ঘাড় গুঁজে রইল। শিসটুকুও দিল না।
বিরক্ত হয়ে ধমক ঝাড়ল মণিশঙ্কর: 'দুত্তোর!'
তার পর থেকে যখনই মণিশঙ্কর খাঁচার কাছে আসে, কিছু ফরমায়েশ করতে চায়, পুরুষ-পাখিটা ঝলক দিয়ে ওঠে: 'দুত্তোর।'
গোড়ায় আওয়াজটা যা একটু আড়ষ্ট ছিল, এখন একেবারে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে।
'শালা পাজি ছোটলোক—' মণিশঙ্কর গালাগাল দিয়ে ওঠে।
'ও সব বলে লাভ কী।' নিখিল বাধা দেয়: 'শেষকালে গালাগালগুলো শিখবে।'
'তাই তো শিখবে।' বললে মণিশঙ্কর, 'এতদিন শুধু কুসঙ্গ করেছে। পাপমুখে হরিনাম আসবে কেন?'

হলুদ মাখিয়ে পাখিদের স্নান করায় বিমলা। খাঁচার মধ্যে বাটিতে জল ভরা থাকে, তাই ঠোঁট দিয়ে তুলে নিজেরা নিজেদের ঘাড়ে-পিঠে ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে পুরো স্নান না করালে গায়ে পোকা পড়তে পারে, তাই বিমলা খাঁচার থেকে বার করে আনে পাখিদের। মানুষের হাতে যত কোমলতা সম্ভব সবটুকু ঢেলে দিয়ে তাদেরকে স্নিগ্ধ করে। বলে: 'নিজে জীবনে কোনোদিন হরিনাম করল না এখন অন্তিমে এসে পাখিদের দিয়ে করানো। ভণ্ডামির চূড়ান্ত। বাইরের লোককে শোনানো, যেন কত বড় ধর্মের সংসার। শেখেনি যে ঠিক করেছে। আন্তরিকতা থাকলে তো শিখবে।'

পুরুষ-পাখিটা সায় দেয়। সোনার সুরে শিস দিয়ে ওঠে।

স্ত্রী-পাখিটাকে নিয়ে পড়ে তখন বিমলা। বলে, 'হ্যাঁ লো, তোর কি কোনো গুণ নেই? তুই কি শিসটুকুও দিবি নে? তোর পুরুষ কি তোকে সব বিষয়ে টেক্কা দেবে? রূপে তো বটেই, গুণেও? তোর কি কোনো গুণই থাকতে নেই?'

স্ত্রীটা ঠোঁট ফাঁক করে। আর পুরুষটা তার যুক্ত ঠোঁট তীক্ষ্ন করে ঢুকিয়ে দেয় গহ্বরে। আদরের ছড়াছড়ি পড়ে যায়।

বুঝি। এইটুকুই শুধু তোর গুণ। পুরুষের ভালবাসাকে আকর্ষণ করবার শক্তি। কিন্তু এও জানি, তুই মরে গেলে তোর পুরুষ আরেক পাখিনীর সঙ্গে জোড় মেলাতে ছুটবে। মানুষই ছোটে, আর এ তো পাখি।

কিন্তু এ যে দেখি আদরের ঢলসমুদ্র।

এ নিয়ে সারাক্ষণ শতদলের ঘ্যান-ঘ্যান। ওদের আলাদা করে দাও। আরেকটা খাঁচায় হতচ্ছাড়ীটাকে আটকাও। বেশি দিন একসঙ্গে থাকলে ডিম পাড়তে শুরু করবে। সে এক মহাকেলেঙ্কার। তা ছাড়া সারা দিন পাখার ফরফর, ঠোঁটের ঠকাঠক—ছেলে-মেয়েদের সংসারে এ এক অশালীন আদর্শ।

'আর, পাড়লেই বা না ডিম!' মুখ বেঁকাল বিমলা: 'এ সংসারের পাখি বেশি ডিম পাড়বে তা আর আশ্চর্য কী!'

কিন্তু মণিশঙ্কর শতদলের পক্ষ নিল। ঠিকই তো। সামান্য একটা হরিনাম করে না, ও বেটার আবার অত বাদশাহি কেন? আলাদা-আলাদাই থাকা উচিত। কামিনী-কাঞ্চন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর যদি ওর সুমতি হয়। মুখে নাম আসে।

মণিশঙ্কর নিজেই আরেকটা লোহার খাঁচা কিনে আনল। একা থাকার মত, আগেরটার চেয়ে ছোট। নিজেই হাত বাড়াল স্ত্রীটাকে সরিয়ে নিতে।

'দুত্তোর!' ধমকে উঠল পুরুষটা।

'তবে রে—' কায়দা করে পুরুষটাকে নিরস্ত করে স্ত্রীটাকে আলাদা করে নিল মণিশঙ্কর। দ্বিতীয় খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে সামনেই টাঙিয়ে রাখল। পুরুষটাকে লক্ষ্য করে বললে, 'এই কাছাকাছিই রাখলাম। দেখতে পাবি, যদি

নতুন কোনো ভাষা থাকে বলতে পাবি পরস্পর। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। ঘণ্টা নেই মিনিট নেই, সারাক্ষণ প্রেম করতে পাবি নে, পাবি নে ঠোঁটে ঘষা-ঘষি করতে। জল ছিটিয়ে নাইয়ে দেওয়া, একে-অন্যের ঘাড়ে ঠোঁট ডুবিয়ে ঘুমুনো, ও সব এবার ভুলে যা। শিষ্টাচার শেখ। নিঃসঙ্গ হয়ে থাকলেই ধরতে পারবি হরিনাম।'

'দুত্তোর।' পুরুষ-পাখিটা যেন গর্জে উঠল।

বিকেলে আলো পড়ে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই পাখি দুটো ক্যাঁ-ক্যাঁ ধরল। সন্ধ্যে হতে-না-হতেই কালো কাপড়ে ঢাকা পড়ে ঘুমোবে—এই সবাই অনুমান করেছিল, কিন্তু সারা রাত ওদের ঘুম নেই, থেকে-থেকেই সেই কর্কশ আর্তনাদ হতে লাগল। যত করুণ তার চেয়েও কঠিন।

মণিশঙ্কর-বিমলা কেউই ঘুমুতে পারল না।

'বিচ্ছেদে যে ওরা মরে যাবে।' ও ঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে বিমলা: 'গোড়াগুড়ি থেকে ওরা একসঙ্গে থেকেছে, ওদের একত্রই থাকা উচিত।'

'তাই। তাই—' ও-ঘর থেকে বলে উঠল মণিশঙ্কর।

সকালে উঠেই মণিশঙ্কর দু পাখি একত্র করে দিল। আর ক্যাঁ-ক্যাঁ নেই। সোনার সুরে শিস দিয়ে উঠল পুরুষটা। স্ত্রীটা পুরুষের গলার নিচে ঘাড় গুঁজে ঘন হয়ে রইল।

মণিশঙ্কর বললে, 'হারানিধি পেয়ে একেবারে যেন দিশেহারা হোস নে। মাত্রাটা একটু মেনে চলিস।'

'দুত্তোর!' চোখ পাকিয়ে পাখা ঝাপটে হুমকে উঠল পুরুষটা।

ওদের পুনর্মিলন উৎসব উদ্‌যাপন করবার জন্যে রেকাবে করে নতুন খাবার এনেছে বিমলা। ছোলা-ভুট্টা তো আগেই খেয়েছে, ঠোঁটে-নখে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে খেয়েছে—আজ এনেছে পাকা পেয়ারার কুচি, আখের টিকলি আর লাল লঙ্কা। সবচেয়ে লাল লঙ্কাতে খুশি। নিজের ঠোঁটে করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে, সঙ্গিনীকে দেখাচ্ছে। ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে খাচ্ছে-খাওয়াচ্ছে।

মণিশঙ্কর থিন এরারুট বিস্কুট নিয়ে এসেছে। আজ খুশ-মেজাজে নিয়েছে মুখ বাড়িয়ে। দুত্তোর বলছে না। পাখা ঝাপটাচ্ছে না।

'এ তোদেরকে সেবা করা নয়—তোরা আমার কে—এ তোদের ভাল-বাসাকে সেবা করা।'

নিজেরও অলক্ষ্যে হঠাৎ শিস দিয়ে ওঠে মণিশঙ্কর।

পুরুষ-পাখিটাও মধু হয়ে ওঠে। যার গলায় ক্যাঁ-ক্যাঁ তারই গলায় আবার স্বর্গের বাঁশি।

কিন্তু হলে কী হবে, একদিন রাত পোহালে দেখা গেল, স্ত্রী-পাখিটা মরে রয়েছে।

'হায় হায়, কী করে হল?' মণিশঙ্কর স্খলিত পায়ে ছুটে এল বারান্দায়।

বেয়ালটা আসেনি তো? না, কই। তার চিহ্ন কোথায়? রক্তের ছিটে-ফোঁটাও তো নেই। দু-একটা বা পালকের টুকরো।

তবে?

'নিশ্চয়ই ডিম পাড়তে গিয়ে মরেছে।' বললে শতদল।

'মাথা খারাপ!'

না, ডিমের নামগন্ধ নেই। নিশ্চয়ই সাপ এসেছিল ঘরে। সাপেই কেটেছে।

'যেই কাটুক, রানী তো আর নেই।' বিমলা আকুল হয়ে উঠল।

'কিন্তু রাজাটাকে দেখেছ?' মণিশঙ্কর তাকাল খাঁচার মধ্যে : 'কি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বসেছে উদ্ধত হয়ে। যেন মৃতদেহটাকে ছাড়বে না।'

'কিন্তু টেনে বার করে নিতে হবে তো! নইলে যে পিঁপড়ে ধরবে, গন্ধ বেরুবে।' নিখিল খাঁচার মধ্যে হাত ঢোকাতে চাইল।

অমনি পুরুষ-পাখিটা ঝাঁপিয়ে পড়ল মরিয়ার মত। জখম করে ছাড়ল।

'দাঁড়া, তুই আমার সঙ্গে পারবি?' একটা চিমটে নিয়ে এল নিখিল। অনেক কসরত করে মরা পাখিটাকে বের করে আনল।

ফেলল মেঝের উপর।

ঘাড় নিচু করে স্তব্ধ চোখে পুরুষ-পাখিটা তাকিয়ে রইল স্থির হয়ে।

কোত্থেকে একটা কাঠের বাক্স নিয়ে এল মণিশঙ্কর। বললে, 'মরা পাখিটাকে ডাস্টবিনে ফেলতে পাবি নে, ওকে আমি গোর দেব।'

বাক্সটাতে নুন পুরল। মরা পাখিটাকে শুইয়ে দিল নুনের বিছানায়। নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে বাগানের এক কোণে বাক্সটাকে পুঁতল মণিশঙ্কর।

তারপর এবার রাজাকে দেখ। ও বুঝি শোকেও মহান। যেমন ক্রোধে তেমনি স্তব্ধতায়।

'রাজা, তোর এ কী হল?' জলটুকও খাবি নে?' বাটিতে জল ঢেলে দিল বিমলা।

পা দিয়ে বাটিটা কাত করে ফেলল।

'জল না খাস, স্নান করবি আয়। মাথাটা ঠাণ্ডা কর।'

কিন্তু সাধ্যি কী তাকে তুমি বার করো খাঁচা থেকে। আমাকে তুমি মরা পাওনি যে চিমটে দিয়ে টানাটানি করবে।

'আচ্ছা, থাক। কত তো নিজের ঠোঁটে করে জল ছিটিয়ে স্নান করতিস, তাই কর লক্ষ্মী রাজা।' বিমলা আবার জল ঢেলে দিল বাটিতে। পাখি আবার উলটে দিল বাটি।

'আচ্ছা, স্নান না করিস, খা। এই দ্যাখ তোর সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য, লাল লঙ্কা এনেছি। একটা নয়, দুটো এনেছি। নে, ফাঁক কর ঠোঁট—'

পাখি মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। নায় না, খায় না, ঘুমোয় না, চোখেচোখিও হতে চায় না কারুর।

'শোকেও পুরুষই সুন্দর।' টিপ্পনী কাটে মণিশঙ্কর : 'মেয়ে হলে চেঁচাত, গলা শুকিয়ে গেলে সরবত খেত। জল-ভাত খেয়ে ঘুমুত এক গা। তারপর ঘুম ভাঙলে সিনেমায় যেত শোক ভুলতে। সেদিন কাকে যেন দেখলাম মাছ-মাংস খেতে। বললে, উনি মাছ-মাংস খেতে বলে গেছেন। ওঁর শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করছি।'

নিখিলও অবাক হয়ে গেল। বললে, 'আশ্চর্য, চেঁচাচ্ছে না একটুও। এক দিনের ঝগড়াঝাঁটিতে কত তো সেই ক্যাঁ ক্যাঁ করেছিল। আজ কি ওর স্বভাবের আদিকান্নাটাও নেই?'

'রাজা, আর কি তুই শিস দিবি নে?' সজলকণ্ঠে মিনতি করে বিমলা।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে পাখি।

'তবে এইবার কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বল। বল হরি-হরি। রাম-রাম।'

পাখি আর সেই 'দুত্তোর' করেও ওঠে না।

'দুত্তোর।' কথাটা মণিশঙ্কর মনে করিয়ে দিল। তবুও না।

সব যেন হিসেবের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুরুষের দুঃখে বুঝি তাই যায়। সে তো নিজের কী হল ভেবে শোক করে না, যাকে হারিয়েছে তার জন্যে শোক করে।

রোজ ঘুমের আচ্ছাদনে ঢাকবার আগে খাঁচার মধ্যে কত রকম খাবার সাজিয়ে দেয় বিমলা, আশা করে ঘুম থেকে উঠে দেখবে কিছু অন্তত রাজা খেয়েছে। কিন্তু যেমন-কে-তেমন এক বিন্দুও ছোঁয় না, মুখে ঠেকায় না।

ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, কান্না নেই, শব্দ নেই—এ তোর কী হল? এ আমাদের তুই কোন দেশে নিয়ে এলি?

সাত দিন ঠায় অনাহারে থেকে বসে-বসে মরে গেল রাজা।

মণিশঙ্কর আবার কাঠের বাক্সে নুন পুরল। পাখিটাকে শোয়াল বাক্সের মধ্যে যেখানে রানীকে রেখেছিল তারই পাশে মাটি খুঁড়ে গোর দিল রাজাকে।

দেখল বিমলা কখন নম্র মুখে পাশ ঘেঁসে এসে বসেছে।

বাক্সের উপর মাটি ফেলতে ফেলতে মণিশঙ্কর স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'ভয় নেই। মৃত্যুতে আমরাও এমনি কাছাকাছি হব।'

৭৭। ডাকাত

হাওয়াতে কাপড় শুকোতে দিয়েছে তসলিমা। শুকোতে দিয়েছে দড়ির উপরে নয়, পাশাপাশি দুটো গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে। দড়ি পর্যন্ত একটা জোটানো যায় না আজকাল।

নদীর পারে হিজল গাছ। গুঁড়িটা জলের মধ্যে ডোবানো। বর্ষায় জল বেড়েছে এ সময়। তা ছাড়া এখন জোয়ার। পুবে হাওয়া দিয়েছে। ডালের সঙ্গে আঁচলের দ্বিতীয় প্রান্তটা বেঁধে ভিজে গায়ে জলের মধ্যে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল তসলিমা।

নদীর পারটা এখন নিরিবিলি। নৌকোও অনেক কম। বেলা হেলে গিয়েছে। শাড়িটা আধছেঁড়া। ঐ একখানা শাড়িই তসলিমার। টেনেবুনে টায়টোয় চলে কোনো রকমে।

চান অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। এখন জলে গা ডুবিয়ে আছে শাড়িটা শুকোতে দেবার জন্যে। রোদ তত নেই। হাওয়াতেই শুকিয়ে যাবে দেখতে-দেখতে।

কি রকম অদ্ভুত লাগে এমনি গা ডুবিয়ে বসে থাকায়। সরম লাগে না বটে, কিন্তু কেমন নিশ্চিন্তও মনে হয় না। জলকেই এেকেক সময় নির্লজ্জ মনে হয়।

দূর দিয়ে-দিয়ে একেকটা নৌকো যায়। মাঝি-মাল্লার কথা আসে কানে ভেসে। অমনি মাথা ডুবিয়ে তলিয়ে যায় তসলিমা।

কে জানে কার নৌকো। মহাজনের হতে পারে, সোয়ারীর হতে পারে। হতে পারে বা ডাকাতের দলের। কয়েক মাইল উজিয়ে গেলেই ডাকাতদের ইলাকা। সময়ে-অসময়ে গির্দের বাইরে ওরা ঘোরাঘুরি করে। খবর থাকলে নিয়ে যায় সর্দারের কাছে।

দুটো জিনিসের উপর ওদের দৃষ্টি। এক সোনারুপো, টাকা-পয়সা; দুই মেয়েলোক। আগেরটা আসল, পরেরটা ফাউ। পারে শাড়ি শুকোচ্ছে আর জলের উপরে ভাসছে তার খোঁপা, বুঝতে পেলে ডাকাতের দল এখুনি এসে ছোঁ মারবে। ফাউ যদি এমন অসহায় ভাবে ভেসে বেড়ায় তবে আসলে তাদের দরকার নেই।

তসলিমার ঘরের পুরুষের নাম পবন গাজী। চুরি করে তিন মাস জেল খেটে বেরিয়েছে। যে অবস্থা, বলে-বলে তসলিমাই তাকে চুরি করতে পাঠিয়েছে। কিন্তু সামান্য সিঁদ কাটবার পর্যন্ত মুরোদ নেই পবনের। বন্ধ ঘরের বাইরে বারান্দায় একখানা কাপড় টাঙানো ছিল, ছিল ঘটি আর বালতি, তাই ধরে সে টান মারল। হায়, তা নিয়েও সে সটকাতে পারল না। পড়ল পা হড়কে। হুমড়ি খেয়ে।

জেল থেকে বেরিয়ে সে দিব্যি করেছে আর কোনোদিন চুরি করবে না। সৎপথে থেকে চাষবাস করবে। তাই শহরে গেছে সে বীজ ধানের জন্যে লোন আনতে। বলেছে, খোদার মার খাই অনেক ভালো, মানুষের মার খেতে পারব না।

চোর সত্যি ভালো লাগে না তসলিমার। তারা বড় দুর্বল, নিরীহ। রঙচঙ নেই, রপট-দাপট নেই। তার চেয়ে ডাকাত অনেক ভালো। মুখোস

আছে, মশাল আছে, হাতিয়ার আছে। অনেকে দল বেঁধে থাকে বলে ভয়-ডর কম। ধরা পড়ে না বললেই হয়। পুলিশ পর্যন্ত হাত-ধরা। হাকিম-মোক্তাররা পর্যন্ত সমঝে চলে। অনেক মানী ব্যবসা।

জেল থেকে বেরিয়ে এলে পর পবনকে বলেছিল তসলিমা : 'ডাকাতের দলে গিয়ে চাকরি নাও। এমনি করে চলবে না আর। সবাই ভাসব তবে।'

'ভাসান-ডুবান খোদার হাতে। আমাকে পাপের পথের কথা আর বলিসনে, লক্ষ্মী। আমি আরেকবার চেষ্টা করে দেখব।'

তসলিমা কোনোই ভরসা পায় না। ক' দিন পরে তাকে হয়তো রাতের অন্ধকারে চান করতে আসতে হবে।

কি ভাবতে ভাবতে জলে বুজকুড়ি কাটছিল তসলিমা। হঠাৎ চেয়ে দেখল হাওয়ায় তার শাড়িটা উড়ে চলেছে। উড়ে চলেছে তার মাথার উপর দিয়ে। লাফিয়ে দু' হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল তসলিমা, পারল না। নৌকো নেই, পাল উড়ে চলেছে।

তক্ষুনি-তক্ষুনি জলের মধ্যে নেমে পড়তে হবে বলে গিঁট দুটো ভাল করে দেয়া হয়নি বোধহয়। কিন্তু এখন উপায় কি? ছেঁড়া ধুকড়ি হলেও একটা কিছু অন্তত চাই তো কোমরে জড়াবার। নইলে পারে সে ওঠে কি করে? উঠেই বা যায় কোথায়? দিনের আলোর মুখ দেখে কোন সাহসে?

এমন সর্বস্বান্ত বলে আর কখনো অনুভব করেনি নিজেকে। হাওয়া চুরি করতে এসে ঠকে গেছে অনেকবার, কিন্তু আজ একেবারে ডাকাতি করে নিয়ে গেল।

না, ছেড়ে দেয়া হবেনা ডাকাতকে। তসলিমা তার পিছু নেবে। ডাকাতের উপরে ডাকাতি। উচ্ছৃঙ্খলকে বশ করবে তার এই নতুন উচ্ছৃঙ্খলতায়।

শাড়িটা উড়ে পড়েছে জলের উপর। যদিও মাঝ গাঙে। সাঁতার জানে তসলিমা। ডুব-সাঁতার। মাছের মত জল কেটে ঠিক চলে যাবে গা ডুবিয়ে। ধরবে শাড়িটা, হাওয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। সে এখন সমান দুর্দাম।

তসলিমা সাঁতার দিল।

সাপ্লাই-ঘরের বড়বাবু বাড়ি চলেছেন। সাথি পেয়েছেন খাসমহলের তশিলদার। দু'জনেরই চারদেঁড়ে পানসি। সঙ্গে বহুৎ মালামাল। নৌকোর উপর-নিচ, গলুই-মালকোঠা, সব একেবারে ঠাসা।

মাইনে কম পেলেও দু'জনেরই মোটা আয়। দু'জনেরই উমি লোক নিয়ে কারবার। একজনের রেশন-কার্ড আর সাপ্লায়ের শিলপ নিয়ে কারসাজি, আরেক জনের দাখিলা আর চেকমুড়ি নিয়ে। দু'জনেরই বিস্তর অবস্থা।

দু'জনেরই দূরের রাস্তা। রাত পড়ে নদীতে। তাই কেউই পরিবার নিয়ে থাকেন না। সঙ্গে নৌকোতে তাই কোনো মেয়েছেলে নেই। শুধু বড়বাবুর দুটি ছেলে চর অঞ্চলে বাপের কর্মস্থানে স্বাস্থ্য সঞ্চয় করতে এসেছিল, এখন ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। তশিলদার রঘুবাবুর সঙ্গে একটা চাকর।

নৌকো দুটো পাশাপাশি চলেছে। জোয়ারের সঙ্গে গা মিশিয়ে। নদী এখন গোপালের মত ঠান্ডা। আকাশের মেঘের চেহারায় ঝড়ের ইসারা নেই।

সন্ধে নাগাদ ফুলঝুরি বন্দর পাওয়া গেল।

'কে যায়?' ঘাটে-বাঁধা নৌকোর ভিতর থেকে কে জিগগেস করলে।

'সরকারি।'

'ফ্ল্যাগ টাঙানো নেই কেন?'

'আরে, নায়েব মশাই নাকি?' গলা ঠাহর করে মুখ বাড়িয়ে সাণ্ডাইবাবু হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

'আরে, আপনি? সঙ্গে রঘুবাবুও আছেন? বাস, কুছ পরোয়া নেই।'

নায়েবমশাইও বাড়ি চলেছেন নৌকো করে। কোনটা ফস্ করে ডাকাতের নৌকো হয়ে যায় তাই প্রত্যেকটা নৌকোই একটু প্রথমে চাপাচুপি দিয়ে থাকে। বড় একটা ধার ঘেঁসে না। বৈঠার মুঠি আলগা করে না একটুও।

নায়েবমশাই সঙ্গীর জন্যে বসে ছিলেন ঘাপটি মেরে। এবার তিনিও খুলে দিলেন নৌকো। সঙ্গে তাঁর জমা-সেরেস্তার মুহুরি।

'হাতিয়ার আছে কিছু সঙ্গে?' জিগগেস করলেন বড়বাবুকে।

'একটা শুধু ছাতা। আপনার?'

'এই থেলো হুঁকোটা। আপনার কিন্তু একটা বন্দুক করা উচিত ছিল, রঘুবাবু।'

রঘুবাবু তাঁর নৌকো থেকে বলে উঠলেন : 'পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ি। একবার চেষ্টা করেছিলুম লাইসেন নিতে। উঃ কি গরমাই! চোরের ধন শেষকালে বাটপাড়ে খেয়ে যাক আর কি। হেতের-শাবলে দরকার নেই বাবা, নি-রাখালের খোদাই রাখাল।'

তিন-তিনটে নৌকো। মাঝিমাল্লা অনেকগুলি। তা ছাড়া সবাই পুরুষ। তেমন ভয় করবার আছে কি?

আশে-পাশে ছড়ানো ছিটানো জেলে নৌকো। মাছের অপেক্ষায় বসে আছে জাল পেতে।

সাঁ করে একটা ছিপ নৌকো তীরের মত বেরিয়ে গেল। রঙচঙে ঘাগরা ও ফোলানো-ফাঁপানো একটা খোঁপা দেখা গেল।

'ঐ কে যায়? মেয়েমানুষের মত মনে হয় না?' জিগগেস করলেন নায়েব মশাই।

'মগনী আর মগ।'

'ওদের ধরেনা ডাকাত?'

'সঙ্গে ছেনা আছে মগনীর। সটান বসিয়ে দেবে ঘাড়ের উপর।'

'আর মগ?'

'সে আফিঙে বুঁদ হয়ে বসে গোল পাতার বিড়ি টানবে।'

হঠাৎ দূরে কতগুলি ফোঁটা-ফোঁটা আলো দেখা গেল। যেন জলের দর্পণে একখানা শহর জ্বলছে।

এক ঝাঁক বেদের নৌকো। গায়ে-গায়ে লাগিয়ে রান্নাবাড়া খাওয়া-দাওয়া করছে হয়তো।

বিশখালীর মুখে পড়তেই চারদিক কেমন হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে এল। আসলে শব্দ আছে অনেক, কিন্তু কেরোসিনের আলো নেই এক বিন্দু। মানুষের হাতের তৈরি কোথাও একটুও পরিচয়চিহ্ন নেই বলেই যেন এত বেশি শব্দশূন্য মনে হয়।

মাঝিরা বললে : আরেক জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ছ'ঘন্টা। এই তক্কে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়া যাক।

ঘুমে একেবারে সব মজে যায় না যেন, অন্তত মাঝিরা যেন হুঁসিয়ার থাকে। শোনা গেছে ঘুমন্ত নৌকোর কাছি কেটে দিয়ে গেছে ডাকাতে। স্রোতের টানে ঠিক চলে গিয়েছে তাদের কোটের মধ্যে।

রাত প্রায় তিনটে, নৌকোগুলি ফের খুলে দিল। জোয়ারের জোর জেগেছে নদীতে। সবাই ঘুমুবেনা-ঘুমুবেনা করেও ঘুমিয়ে পড়েছে। মরা-মরা জ্যোৎস্না উঠেছে শেষ রাতের।

একখানা ডিঙি নৌকো পুব পাশ কেটে চলেছে উত্তর দিকে। যেতে যেতে জিগগেস করছে হাঁক দিয়ে : 'আরে পানসি, যাও কই?'

মাঝি বললে, 'বটতলি।'

'গ্যাছেলে কই?'

'লাটগাছি।'

'ক্যান?'

'হদায় আনতে।'

'কি হদায়?'

'দাফনের কাপড়।'

ভিতর থেকে বড়বাবু গর্জে উঠলেন : 'যার মনে যে যায়, অত গায়ে পড়ে আলাপ করবার দরকার কি?'

মাঝিরা হেসে উঠল : 'সব বুল ঠিকানা দিয়া দিছি। মোরা অমন বোকা-বলদ না। হুঁসবোধ আছে মোগো।'

'যখনই কেউ জিগগেস করবে কার নৌকো, বলবি মোক্তারের নৌকো, রামহরি মোক্তারের।' নায়েব মশাই বললেন তাঁর নৌকো থেকে : 'ওরা পুলিশকেও তত মানে না যত মোক্তারকে মানে। জামিন দাঁড়াতে মোক্তার, খালাস করতে মোক্তার।'

'জে বাবু।' মাঝিরা সায় দিল।

'আর কতদূর এগিয়ে আসতেই দু'দিক থেকে দু'খানা নৌকো বড়বাবু আর নায়েবমশাইয়ের চলতি নৌকো দুখানা ঘিরে ধরল। বিপদ বুঝে মাঝি-

দাঁড়িরা হাল বৈঠা দিলে ছেড়ে, আর নৌকোর ভিতরের জিনিসগুলি একটার গায়ে একটা লেগে এদিক-ওদিক উলটে পালটে পড়ল। মাথার উপর ঝুলছিল লন্ঠন, এ পাশে ও পাশে দুলে বাড়ি খেতে লাগল ছইয়ের সঙ্গে।

'এ সব কি?' মূঢ়ের মত জিগগেস করলেন বড়বাবু।

'এ পথে যা অয়।'

বলতে বলতে বারো চৌদ্দ জন লোক একযোগে লাফিয়ে উঠল দুই নৌকোর উপর। পরনে খাকি হাফ-প্যান্ট, গায়ে খাকি হাফ সার্ট, মুখে সাদা রং মাখা, গলা থেকে মাথা পর্যন্ত খাকির গলাবন্দ জড়ানো। কারু হাতে এক বাঁও লম্বা ল্যাজা, কারু হাতে বা চোখ আঁকা রাম দা। কারু হাতে ঠ্যাঙা।

ডাকাতদের নৌকোর ভিতর থেকে বুড়ো সর্দার দর্জন আলি বলে উঠল : 'যা হালোরা মিডা কথায় কাম হয়না, হাইন্দা যাইয়া দ্যাক, গয়না গাডি কি আচে।'

উত্তর এল ডাকাতদের : 'মাইয়ালোক নাই একডাও।'

'নাই?' হতাশটা প্রায় সকলের গলায় ফুটে উঠল হাহাকারের মত।

রঘুবাবুর নৌকো পিছনে পড়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাবার রাস্তা নেই।

জিগগেস করলেন মাঝিকে : 'তিন নৌকোয় এত লোক, কিছুই কি করবার জো নেই?'

'না বাবু। অরা অনেক মানু, হুদাহুদি পরাণ খুয়ামু।'

'মাঝি, যা চায় তাই দেব প্রাণে যেন মারেনা।'

'কেমনে কমু বাবু। তয় বাদা দেলে কি অয় আল্লা জানে।'

পুব দিক থেকে একখানা ছিপ এসে রঘুবাবুর নৌকোয় পশ্চিম ধার ঘিরে ভেড়াল হঠাৎ। লোক উঠলনা কেউ। রঘুবাবু মনে করলেন, বেঁচে গেলেন বোধ হয়। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলেন তাঁর নৌকোতে বঁড়শি গেঁথেছে। মোটা দড়িতে বঁড়শি বাঁধা, দড়িটা ডাকাতের হাতে। গেঁথেছে ছইয়ের বাঁখারির সঙ্গে। টানতে টানতে নিয়ে চলেছে আগের নৌকো দুটোর পাশে। মিলিয়ে দিচ্ছে গায়ে গায়ে।

কিন্তু যে আছে তার ভয় মেয়েছেলের চেয়েও বেশি। যদি চিনতে পারে তাকে, প্রমাণ গুম করবার জন্যে কচমচ করে কচুকাটা করে ফেলবে।

'এই হালা মাঝিরা, তামাক খাওয়া দেহি।' একটা মাল্লার মাথায় লাঠির এক ঘা বসিয়ে দিল সর্দার : 'হালারা বইয়া বইয়া তামাসা দ্যাহে, এ পোথে যাও, তোগো বাবাগো চেনো না?'

'দেই বাবারা, এ্যাহোনই তামাক দেই, মাইরো না বাবারা।'

'আবার কতা কয়! আগে দিয়া ল।' আবার আরেক ঘা।

বড়বাবুকে পাকড়াল কয়েকজন। ল্যাজার গোড়া দিয়ে তার বুকে এক

খোঁচা মেরে বললে, 'এই হালা, চাবি দিয়া খোলবার টোলবার মোগো সময় নাই। তোগো কাপড়-চোপড় থাল-গডি, তোরাই রাখ, টাহা-পয়সা সোনা-রূপা গয়না-গাডি আস্তে আস্তে খুইলা দে। তো জীবনে মারমু না, হ্যা না অইলে—বোজজো?' মাথার উপরে দা ধরল উঁচিয়ে।

'আরে এই তো পাইছি। হা আল্লা, এই দুইডাও পোলা, এউগাও মাইয়া না।'

বড়বাবুর দুই ছেলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল জড়সড় হয়ে। উঠে বসে কাঁদতে সুরু করল।

মনের মত বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। তিন নৌকোতেই শুধু কাপড়ের পুঁটলি। বড়বাবু সরিয়েছেন সাপ্লাই ঘর থেকে, নায়েবমশাই হাটের তোলা থেকে, আর রঘুবাবু কালোবাজার ঘুরে। গ্রামাঞ্চলেই আজকাল কালোবাজার। গাঁ যত অজ, বাজারও তত তেজী।

নগদ মোটে তিন শো বাইশ টাকা পাওয়া গেল। গয়না গাঁটি নেই, সোনারুপা নেই। এমন সৃষ্টিছাড়া সংসারী মানুষ সবাই, সঙ্গে কারুর জরু-বেটি নেই। একটা দাসী-বাঁদিও নেই খেদমত খাটবার।

এই বলে দমাদম মার সবাইকে। লুন্ঠনের উত্তেজনার পরে বিশ্রামের উদ্দীপনা নেই।

'এই দুইডারে কাডলেই আরো পাওন যাইবে। দেহি রে রামদাওহান।' দর্জন গর্জন করে উঠল।

বেরুল হাতের আংটি, সোনার বোতাম, আরো সাতচল্লিশটা টাকা। কিন্তু হায়, চুড়ি-বালা নেই, হার-চিক নেই, বাজু-বিচে নেই। রুপোর কিছু গেঁয়ো জেওর হলেও মন্দ হত না। খাড়ু বা তোড়া, বেঁকি বা বটফুল। মারল আরো কতগুলি লাঠির বাড়ি।

বুনো বর্বর। দয়া-মায়া নেই, বোধ-বুদ্ধি নেই। হামি হয় না কেউ, বাধা দেয়না কেউ, তবু মার খায়। কেন সব ঠিকঠাক মনের মত হয়নি তাই মার। বাধা দিলে ল্যাজার ল্যাজ নয়, মুখ উঠত মৃত্যুমুখ হয়ে।

'ফাটকি দ্যাও না কি দ্যাও দেইক্যা লই—' সব অলছতলছ করতে লাগল। অনেক কষ্টে বেরুলো কটা তামার পয়সা। বহুদিনের বিস্মরণের মুখ।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মার-খাওয়া নৌকো তিনটে চলল উত্তরে।

নায়েবমশাই বললেন, 'আর যা নিয়েছে নিক বাবা, কাপড়ের গাঁটরিটা যে নেয়নি।'

সকলেই তাই একমত। টাকা-পয়সা একবার গেলে আরেকবার হবে। কিন্তু কাপড় পাবে কোথায়? বেটারা অজবুক আহম্মক।

সত্যি যে আহাম্মক, তাতে সন্দেহ কি। এতক্ষণে মনে হল দর্জন আলির। ভোরের আবছায়ায়। দেখলে তার বাড়ির ঘাটের মুখে খালের মুখটা যেখানে সরু হয়ে এসেছে সেইখানে কচুরিপানার মধ্যে একটা কচি মেয়েমানুষ। মরে

আছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে মরে আছে। সারা গায়ে লজ্জার এতটুকু একটা আঁশ নেই।

হয়তো ব্যামো-পীড়া হয়েছিল কিছু, ভাসিয়ে দিয়েছে। কিংবা খুন-খারাপি করেছে কেউ। কিংবা মরেছে জলে ডুবে।

মরে যখন আছে, আর তার বাড়ির ঘাটের কিনারে, গোর দিতে হয় নিশ্চয়। অধর্ম করতে পারে না দর্জন আলি।

কিন্তু দাফনের কাপড় কই?

কাপড়ের বাণ্ডিল ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত গোখুরি করেছে। ছোকরারা বেরুল আবার নৌকো নিয়ে। এবার আর সোনা-রুপো নয়, টাকা-পয়সা নয়, শুধু একখানা নতুন কাপড়।

দিনের দিকে শিকার মিলবে কোথায়? ও তিন নৌকো কখন চলে গিয়েছে সরহদ্দের বাইরে।

ফিরে এল ছোকরারা। বলাবলি করতে লাগল, 'আগে জোড়লেই তো বালা অছেলে।'

সে কি কাপড় না ঐ দেহ—কে বলবে।

অনেক লাশ মাটির তলায় পুঁতে রেখেছে দর্জন আলি। কিন্তু এমন নিঃসহায় অবস্থার লাশ সে দেখেনি আগে। বাতবন্যা হোক, আত্মহত্যা হোক, খুন খারাপি হোক, এরকম নিস্তন্তু হয়ে কেউ জলে ভাসে না।

দর্জন আলির 'সাজিয়া' বিবির ঘরে নতুন কাপড় আছে। তাই সে বার করে দিতে বললে একখানা।

কচুরিপানার জঙ্গল থেকে লাশ টেনে তোলা হল ডাঙার উপরে। গরম জলে গোসলের দরকার নেই, কারীও মিলবে না হাতের কাছে। শুধু কাপড়টা বিছিয়ে দেয়া হল গায়ের উপর।

অমনি সরমের পুঁটলি হয়ে উঠে বসল তসলিমা। তাড়াতাড়ি কোমরের নিচে ঘের দিলে বুকের উপরটা একটু গোছালো করে নিয়েই টেনে দিলে ঘোমটা।

সবাই উল্লাস করে উঠল। মরা দেহটা বেঁচে উঠেছে বলে নয়, আসলের পর ফাউ জুটেছে বলে।

তসলিমা বুঝতে পেরেছে সে সটান একেবারে ডাকাতের বাড়ি চলে এসেছে। ঐ তার টিনের ঘর, এই কোলা, নদীর ঘাট। এখুনি তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবে পাথালিকোলা করে। বড়ু বিবি আছে, মজু বিবি আছে, সাজু বিবি আছে, সে হবে ছুটু বিবি। আল্লা আজ তাকে একেবারে সৌভাগ্যের ঘাটে এনে পৌঁছে দিয়েছেন।

দর্জন আলি খানিকক্ষণ থ হয়ে রইল। ভাবলে, মনে একটা সদিচ্ছা হয়েছিল বিনাবস্ত্রে তাকে গোর দেবে না, সেই সদিচ্ছার জোরেই মেয়েটা বেঁচে উঠেছে।

সবার উৎসাহের আগুনে জল ছিটিয়ে দিল দর্জন আলি। বললে, 'অরে অর বাড়তে দিয়া আয় জলদি। কোন হানে বাড়ি জিগাইয়া ল। আর হোন—'

দর্জন আলি চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল। বললে, 'মোগো নাওয়ে যাবি না, একডা চলতি নৌকা কেরাইয়া করিয়া ল। মোগো নাওয়ে গেলেই হগলডি বাববে বেডির হুরমত গ্যাচে। আর হোন—'

দর্জন আলি আবার ফিরে এল। এবার গলা রুক্ষ, শাসনের তেজ দুই চোখে। বললে, 'আর, খবরদার, বেডির গায়ে হাত ছোয়াইতে পারবি না। যে কাপড় দিছি ওর গায়ে হ্যা যেন নিটুট থাহে।'

ম্লানমুখে বাড়ি ফিরে এল তসলিমা।

লোনের তদবির সেরে তখনো ফিরে আসে নি পবন গাজি। ফিরল পরদিন সন্ধ্যায়। লোন পায়নি সে কাণাকড়িও, বড় মিয়াকে ঘুস দিতে পারেনি বলে। না দিক, ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনের পাওয়া-লোনের আঠারো টাকা সে বেমালুম পকেট মেরে নিয়ে এসেছে।

পবন গাজি ফুর্তিতে হাসতে লাগল। বললে, 'তুই কাপড় পেলি কোথায়?'

ধরে নিয়ে গিয়েছিল নদীর ঘাট থেকে। সমস্ত রাত রেখে ওদের বাড়ির মধ্যে। সকালবেলা নতুন কাপড় পরিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল।' তসলিমা বললে প্রায় স্বপ্নের মধ্যে থেকে।

'তবু যাক পেয়েছিস তো নতুন কাপড়।' পবন গাজি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

৭৮। অন্য প্রান্ত

আর কিছু জানবার নেই, একমাত্র প্রশ্ন : ক্যানটেঙ্কেরাস কে?

'ডিস্টিক্ট টাউন যখন তখন মোটামুটি সবই আছে ধরে নিচ্ছি—বাজার, ইস্কুল, হাসপাতাল—' প্রশ্নের সাফাইয়ে ব্যাখ্যা জুড়ল অলকেশ : 'কিন্তু উকিলদের মধ্যে ক্যানটেঙ্কেরাস কে এ আগে থেকে জানা না থাকলে অসুবিধে হতে পারে।'

সিনিয়র সাবজজ দুর্গানাথ হাসতে লাগলেন। বললেন, 'ওদের আবার জিজ্ঞাস্য, কোন হাকিমটা গ্যারুলাস? কোনটা ডেফ-য়্যান্ড-ডাম্ব? কোনটা ব্লকহেড?'

'তা ওরা জানুক। স্টেশনে হাকিম আর কটা? আর উকিল? এক মাঠ পঙ্গপাল, গুনে শেষ করা যাবে না।' অলকেশ ব্যস্ততার ভাব দেখাল : 'আপনি

তো অনেক দিন ধরে আছেন, সবাইকে চেনেন, দিন না নাম কটা টুকে রাখি। ফোরওয়ার্নড ইজ ফোরআর্মড—'

'নতুন এসেছ, মন ওপেন রাখো। প্রিজাজ করা ঠিক নয়।' অভিজ্ঞতার নিটোল গলায় বললেন দুর্গানাথ : 'ব্যবহার করতে করতেই জানতে পারবে।'

'ব্যবহার করতে-করতে!' হাসল অলকেশ : 'তার জন্যে বুঝি উকিলদের ব্যবহারজীবী বলে।'

হ্যাঁ, আদালত দু পক্ষেরই শিক্ষালয়।

কোর্টের টানা বারান্দা দিয়ে দুর্গানাথ নেজারতের দিকে যাচ্ছিলেন, তাকিয়ে দেখলেন অলকেশের কোর্টে তুমুল কোলাহল।

কী ব্যাপার?

উকিলের সঙ্গে অলকেশের বিতণ্ডা চলেছে। কী নিয়ে বিতণ্ডা? কান সুক্ষ্ম করলেন দুর্গানাথ। তর্ক স্বাভাবিক আইন প্রসঙ্গ নিয়েই। কেউ কারু ব্যাখ্যা মানতে চাইছে না। এই নিয়ে কাটাকাটি।

'তা কী করে হয়?'

'কেন হবে না? এই দেখুন না লাহোর কি বলছে।'

'দুত্তোর লাহোর। ভুভারতে আর আপনি জায়গা পেলেন না?'

'জায়গা যাই হোক, আইনের ইন্টারপ্রিটেশানটা দেখতে দোষ কী?'

'অত দূরে কে যায়! যে অর্থটা সহজ, স্পষ্ট—'

'সহজ আর স্পষ্ট কথাই তো অনেকের মাথায় ঢোকে না।'

'তাতে আর সন্দেহ কী। নইলে—'

'তা তো বটেই। নইলে—'

দুর্গানাথ চলে গেলেন নিজের কাজে।

টিফিনের সময় ডেকে পাঠালেন অলকেশকে।

'উকিলের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে দেখছিলাম—' সানুকম্প দৃষ্টি ফেললেন দুর্গানাথ : 'তুমি পারবে নাকি ওদের সঙ্গে?'

'দেখুন না কী ইমপসিবল কাণ্ড। লাহোর-রেঙ্গুন দেখায়!'

'তা যা খুশি দেখাক, তুমি চোখ বুজে দেখে যাও। কথা বলো কেন?'

'যা-নয়-তাই ব্লাফ দিয়ে যাবে আর তাই মুখ বুজে সহ্য করব? অসম্ভব।'

'চোপায় পারবে তুমি? তর্কে পরাস্ত হবার জন্যে মক্কেল ওকে পয়সা দিয়েছে?' দুর্গানাথ গম্ভীর হলেন : 'তা ছাড়া ওর কত সুবিধে। ও দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি বসে। দাঁড়ানোর সঙ্গে বসা পারে? দাঁড়িয়ে ও হাত-পা ছুঁড়তে পারে, টেবিলে ঘুষি মারতে পারে, ইচ্ছে হলে একটা বই ছুঁড়তে পারে—বসে-বসে তুমি কিছুই করতে পারো না।'

'পেপারওয়েট ছুঁড়তে পারি। চাপরাসিকে বলতে পারি, বার করে দিতে।'

'না, না, তুমি ওসব করবে কেন?' দুর্গানাথ গভীরে গেলেন : 'তুমি শুধু কলমে মারবে।'

অলকেশকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। ক'দিন পরে ফের হিমাংশু মুখুজ্জের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে।

হিমাংশু তো কাঁচ জুনিয়র। বছর খানেক বেরুচ্ছে। তার সঙ্গে এমন কী সংঘর্ষের সম্ভাবনা!

'সরেজমিন তদন্ত করে কমিশনার রিপোর্ট দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে অবজেকশান পড়েছে। সেই অবজেকশানের শুনানির দিন আজ। বার তিনেক মুলতুবি নিয়েছে হিমাংশুর মক্কেল। আজ আর মুলতুবি নয়। ডাকো উকিলদের।

হিমাংশু বললে, 'মাই সিনিয়র ইজ অন হিজ লেগস ইন য়্যানাদার কোর্ট—'

দাঁতে দাঁত দিয়ে রাগ দমন করল অলকেশ : 'তার আমি কী করব?'

'একটা শর্ট য়্যাডজোর্নমেন্ট দিতে হয়।'

'কই কোনো পিটিশন তো দেখছি না।'

খস খস করে একটা সোয়া বারো আনার পিটিশন লিখে ফেলল হিমাংশু।

পত্রপাঠ রিজেক্টেড। ঢের মুলতুবি দেওয়া হয়েছে, আর নয়।

'সিনিয়র না থাকে, আপনিই তো আছেন।' অলকেশ আমীরী চালে বললে, 'আপনিই আর্গু করুন।'

'সিনিয়রই সমস্ত বিষয়ে পোস্টেড, আমি কী জানি।'

'জানেন না তো ওকালতনামা সই করেছেন কেন?'

'আমি তৈরি নই স্যার—' জলের তলা থেকে হিমাংশু বললে।

'তৈরি নন কেন? তৈরি নন তো মরবেন। আপনার অবজেকশান ওভাররুলড হবে। মরতে তো আর তৈরি হতে লাগে না।'

'তবে, বেশ, রিপোর্টটা একবার পড়ে নি। অন্তত ততটুকু সময় তো দেবেন—'

'তা দিতে পারি।'

'তবে কাইন্ডলি রেকর্ডটা দিন—' কোর্টের দিকে হাত বাড়াল হিমাংশু।

'রেকর্ড দেব মানে? আপনারা কপি নেন নি?'

হিমাংশু মক্কেলের দিকে তাকাল। মক্কেল বললে, কপি নেবার টাকা সিনিয়রকে দেওয়া হয়েছে। তা তিনি নিয়েছেন কিনা বলতে পারি না।

'যাই হোক, কপি নেই। সুতরাং আদালতের নথিটাই দরকার।'

'আদালতের নথি আপনাকে দিলে আমি দেখি কী, আমি কী ফলো করি?' অলকেশ দৃঢ় হল : 'আই ক্যানট পার্ট উইথ মাই রেকর্ডস।'

'এ হাইহ্যান্ডেডনেস অসহ্য।' হিমাংশু ফেটে পড়ল।

'হোয়াট ডু ইউ মিন? কথাটা উইথড্র করুন বলছি।' অলকেশও ততোধিক ফাটল।

'আমি বলতে চাচ্ছি—আমাকে আগে শুনুন—'

'কোনো কথা শুনব না। কথাটা উইথড্র করুন। নচেৎ নিজেই উইথড্রন হোন।'

'বেশ, আমিই চলে যাচ্ছি।' কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল হিমাংশু। বলতে-বলতে গেল : 'উকিলের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না।' বারান্দায় এসে হুঙ্কার ছাড়ল ; 'আমি এর শোধ নেব।'

এর পর যে জায়গায় বদলি হয়ে এল অলকেশ, সেটা একটা সুদূর শহর—এত দূরে যেখানে এখনো ইলেকট্রিসিটি পৌঁছয়নি। যেখানে কয়লা নেই, কাঠে রান্না হয়। খবরের কাগজ দেড় দিন পরে আসে। বেশির ভাগ রাস্তাই কাঁচা, বৃষ্টি হলেই খালি-পা। আর যত্রতত্র সাপ, আনাচে-কানাচে, শিকে-রেলিঙে, মশারির দড়িতে।

অলকেশ তখন অনেক শান্ত হয়েছে। ফিলসফিক্যাল ভিউ নিতে শিখেছে। কথা কম কইছে আর হাসছে মৃদু-মৃদু।

কিন্তু পাশের কোর্টেই এ কী তুমুল তাণ্ডব!

হাকিম চেঁচিয়ে উঠেছে : ওয়াক আউট অফ মাই কোর্ট।

কী ব্যাপার?

ব্যাপারটা লঙ্কাদহন।

পুরানো একটা মামলার আর্গুমেন্ট করছিল উকিল। নিশাপতি বাগচী। হাতেধরা কতগুলো টাইপ-করা কাগজ, তার থেকে সাক্ষীদের জবানবন্দী পড়ছে আর টিপ্পনী ঝাড়ছে।

'কিসের থেকে পড়ছেন?'

'টাইপস্ক্রিপট থেকে।'

'এ পেলেন কোথায়?'

'যেখান থেকেই পাই না কেন, কোর্ট হ্যাজ নো বিজিনেস টু এনকোয়ার—'

'এ তো সার্টিফয়েড কপি নয়। এ সারেপটিসাশ কপি।'

'তা নিয়ে আপনার কী দরকার?'

'একশোবার দরকার। কোন টাইপিস্ট আপনাকে এ চোরাই কপি সাপ্লাই করল, তা জানতে হবে। দয়া করে কাগজগুলো আমাকে দিন।'

'আপনি আমাকে চোর বলছেন?' নিশাপতি ফোঁস করে উঠল।

'আপনাকে কিছু বলছি না। বলছি মালটা চোরাই। দিন দেখি—'হাত লম্বা করল হাকিম।

'আমার হাতের কাগজ চেয়ে নেবার আপনার কোনো রাইট নেই। এই কাগজ আমি পকেট পুরলাম। পারুন তো পকেট থেকে নিন—'

'বা, আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পিউরিটির জন্যে কোর্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না?'

'বললাম তো পকেট থেকে নিন—'

সঙ্গে-সঙ্গেই হাকিম গর্জে উঠল : 'বেরিয়ে যান আমার কোর্ট থেকে।'

হইহই রইরই কাণ্ড।

'কোন কোর্ট?' সন্ত্রস্ত চোখে পেস্কারকে জিজ্ঞেস করল অলকেশ।

'সেকেণ্ড মুন্সেফ স্যার, হিমাংশু মুখুজ্জে।'

'হিমাংশু? ও তো ডিরেক্ট রিক্রুট নয়, ও তো বার থেকে এসেছে।'

'তারই জন্যে বুঝি কালাপাহাড়।'

হিমাংশুকে ডাকাল অলকেশ।

'তুমি এটা কী করলে? কাক হয়ে কাকের মাংস খেলে?'

'নইলে কী করতে বলেন?'

'আহা, উইঙ্ক-অ্যাট করবে। দেখেও দেখবে না। চোখ অন্য চিন্তায় মগ্ন, নাকের ডগায় কী হচ্ছে দেখতেও পাবে না।'

'রাখুন।'

'শত হলেও তুমি উকিল ছিলে. তুমি যদি এদিক-ওদিক ওদের একটু না দেখ—'

'এখন শীল্ডের আরেক দিক দেখছি। উপরে বসে যেটা দেখা যায়, নিচে দাঁড়িয়ে সেটা দেখা যায় না।'

'কিন্তু লাভ কী! পপুলারিটির সার্টিফিকেট পাবে না। এযুগের সব-চেয়ে দামী সার্টিফিকেট হচ্ছে পপুলারিটি। আহা, অফিসর-পপুলার কিনা। এফিসিয়েন্ট কিনা নয়, পপুলার কিনা।'

'যে ডেফিসিয়েন্ট, সেই পপুলার।'

ও পক্ষের তোড়জোড় কী রকম?

সভা-সমিতি করছে। শোভাযাত্রা করছে, বয়কট করছে, হিল্লি-দিল্লি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।

'কী না জানি হবে!' শোকাকুল মুখ করল অলকেশ। সে এখানকার সিনিয়র মুন্সেফ, কোর্টেও প্রথম মুন্সেফ, তারই এখন এনকোয়ারি করতে হবে, রিপোর্টিং করতে হবে। তারই যত কর্মবৃদ্ধি।

'আপনার কাজ কিছুই বাড়েনি দাদা।' একটা খাম হাতে নিয়ে হাসতে-হাসতে হিমাংশু এসে হাজির।

'কী ব্যাপার?'

'বদলির অর্ডার এসে গিয়েছে।'

'আসতে-না-আসতেই বদলি?'

'হ্যাঁ, কথাই আছে, যদি বদলি চাও উকিলদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাও। কথাটা ফলল। বাবাঃ, বাঁচলাম।' হিমাংশু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল : 'এ একটা জায়গা নাকি? ইলেকট্রিক নেই, কয়লা নেই, খবরের কাগজ নেই—'

বোকার মতন তাকিয়ে রইল অলকেশ। কত দিন ধরে সে এই জায়গায় আছে, তার একটা বদলির অর্ডার নেই।

হিমাংশুকে স্টেশনে তুলে দিতে এল অলকেশ।

দেখল রাস্তায় একটা কুকুর স্টেশনের হাতায় ঘুরছে। তার গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা প্ল্যাকার্ড ঝোলানো। তাতে লেখা : 'সেকেন্ড মুন্সেফ।'

'দাদা, চোখ অন্য চিন্তায় মগ্ন, নাকের ডগায় কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না।' হাসতে-হাসতে ট্রেনের জানলা থেকে হাত নাড়তে লাগল হিমাংশু।

হিমাংশুকে তুলে দিয়ে শহরে ঢুকতেই রাস্তায় অলকেশ একটা গাধা দেখতে পেল। চমকে উঠল সর্বাঙ্গে। ওর গলায় প্লাকার্ড ঝুলছে নাকি?

না, ঝোলে নি। ঝোলবার সময় হয়নি এখনো।

৭৯। ছেলে

আজ মা-মণি আসবে! আজ মা-মণি আসবে! কী মজা, আসবে আজ মা-মণি। সকাল থেকেই মন্তু হল্লা শুরু করে দিয়েছে।

'মোটেই আজ আসবে না।' জেঠতুত ভাই পিন্টু খেপাতে এল।

'আসবে না! তুমি বললেই হবে?'

'কী করে আসবে? আজ কি রবিবার?'

'ও মা, কী বোকা! আজ রবিবার নয় তো আমি ইস্কুল যাচ্ছি না কেন? বাবা কেন এখনো খবরের কাগজ পড়ছে? জেঠু কেন এখনো দাড়ি কামাতে বসেনি?' ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মন্তু।

'কেউ আপিস-ইস্কুল যাচ্ছে না বলেই আজ রবিবার হল?' পিন্টুও চলে এল বারান্দায়।

'তবে কি আজ শুক্রবার?' মন্তু ঝাঁজিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, শুক্রবারই তো। ক্যালেন্ডার দ্যাখ না।' হাত ধরে ঘরের দিকে টানল তাকে পিন্টু।

মন্তু ক্যালেন্ডারের কী বোঝে! তবু ফের এল ঘরের মধ্যে। পিন্টু দু বছরের বড়, অনেক সে বেশি জানে, তাই তাকে সমীহ করতে হয়। কিন্তু আজকের বার সম্বন্ধে কী সে প্রমাণ দেয় একবার দেখা ভালো।

ক্যালেন্ডারে একটা লাল তারিখের উপর সরাসরি আঙুল রেখে ভারিক্কি চালে পিন্টু বললে, 'কী এটা শুক্রবার তো? আর দেখছিস, এটা লাল। তার মানে কী?'

ড্যাবডেবে চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মন্তু। কী মানে, তা সে কী জানে? তার মা-মণি এলে পারত বুঝিয়ে দিতে।

'তার মানে', পিন্টু বললে, 'আজকে শুক্রবারটা ছুটি। লালটা যে ছুটির চিহ্ন তা জানিস তো? ছুটির দিন হলেই সেটা রবিবার হবে এমন কোনো কথা নেই। অন্যবার, শুক্রবারও ছুটি হতে পারে। তাই আজ

দেখছিস তো ক্যালেণ্ডার, শুক্রবার হয়েও ছুটি। ইস্কুল-আপিস সব বন্ধ।'

'মিথ্যে কথা।' কোনো ব্যাখ্যাতেই বিচলিত নয় মন্তু।

'কি মিথ্যে কথা?'

'ঐ যে বলছ মা-মণি আজ আসবে না। মিথ্যে কথা। মা-মণি আজ আসবে ঠিক আসবে।' রাস্তায় কী শব্দ শুনে মন্তু আবার বারান্দায় ছুটে গেল : 'ঐ এল বুঝি।'

পিছু নিল পিন্টু। কই, কিছু না, ফক্কা।

'কী করে আসবে? শুক্রবার তো আর তার দিন নয়।' বললে পিন্টু।

'হ্যাঁ, দিন। আজ যে বারই হোক, আজই মা-মণি আসবে। তুমি দেখে নিও।'

'তুই একটা গাধার মতন কথা বললে আমি শুনব কেন?' উকিলের মত তর্ক তুলল পিন্টু : 'যদি আজ শুক্রবার হয় তা হলে কোর্ট থেকে তোর মা-মণিকে আসতে দেবে কেন?

'দেবে। দেবে।' কেঁদে ফেলল মন্তু।

কান্না দেখে পিন্টু দে-দৌড়।

'এ কী, কাঁদছিস কেন?' জেঠাইমা, সুভদ্রা দেবী, কোলের মধ্যে মন্তুকে জড়িয়ে ধরলেন : 'কে কী বলেছে?'

'বড় মা, আজ রবিবার না?' ডাগর চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল মন্তু।

'না কে বলছে?'

'পিন্টু-দা বলছিল, আজ শুক্রবার। কোর্ট থেকে মা-মণিকে আজ আসতে দেবে না।'

'দেখেছ পিন্টুটা কী বজ্জাত! ছেলেটাকে খেপাচ্ছে। এই, পিন্টু!' কোথায় পিন্টু!'

'ছেলেটা কবে থেকে দিন ঠেলছে। সেই বুধবার থেকে। কবে রোববার আসবে, কবে আসবে ওর মা-মণি!' মন্তুর মাথা-ভর্তি চুলে হাত বুলুতে লাগলেন সুভদ্রা : 'একদিনেই কেন দুটো করে রোববার আসে না, দিনে একটা রাতে একটা, রোববারটা কেন এত দেরি করে, কেন এত আস্তে হাঁটে—এ নিয়ে ছেলের কত আমাকে অনুযোগ।'

ইতিমধ্যে ছোট জা দীপিকা সামিল হয়েছে, তাকেই লক্ষ্য করলেন।

'তারপর বহু প্রতীক্ষার পর যদি রোববারের নাগাল পেল, তাকে বলা হচ্ছে কিনা, এটা শুক্রবার। হতচ্ছাড়াটা গেল কোথায়?'

সুভদ্রার শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছে এক মুখ সুখ নিয়ে মন্তু বললে, 'তাহলে মা-মণি আজ ঠিক আসবে বড়-মা?'

'আসবে তো! কিন্তু এখন তো প্রায় সাড়ে দশটা—' টেবিলের উপর টাইমপিস ঘড়িটার দিকে তাকালেন সুভদ্রা।

মন্তুকে এবার দীপিকা টেনে নিল। বললে, 'বেলা হয়েছে। চলো এবার তোমাকে চান করিয়ে দি।'

সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিল মন্তু। বললে, 'না। আজ আমাকে মা-মণি চান করিয়ে দেবে।'

'রোজ তো আমিই করাই।'

'তার মধ্যে দু-একদিন মা-মণিকে ছেড়ে দিতে পারো না? মা-মণি কেমন সুন্দর আঁচল দিয়ে গা মোছায়—' মন্তুর চোখ আবার ছলছল করে উঠল : 'কত সুন্দর গল্প করে।'

'দে, ছেড়ে দে।' বললেন সুভদ্রা, 'এখুনি এসে পড়বে তপতী।'

ছেড়ে দিতেই মন্তু ফের বারান্দায় চলে এল।

দেখতে লাগল কোথায় কতদূরে রিক্সা চলেছে। মা-মণি তো রিক্সা করেই আসে। রাস্তাঘাট কোনো বারই তো ভুল হয় না। আজ দেরি হচ্ছে কেন?

খোলা রিক্সা যা দেখা যায় তা এক নজর তাকিয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারে মন্তু। ওসব রিক্সাতে মা-মণি নেই। মা-মণির রিক্সা ছপ্পর-তোলা। অমনতর রিক্সা দূর দিয়ে চলে গেলেই মন্তুর ভাবনা শুরু হয়, বুঝি ভুল পথ দিয়ে চলে গেল! বেশ তো এদিকে দিয়ে একটু ঘুরে গেলেই হতো! তাহলে মন্তু ঠিক বুঝতে পারত রিক্সাটাতে একটা বাজে লোক চলেছে।

'এই যে, এই বাড়ি।' কাছাকাছি একটা ঢাকা রিক্সা দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছে মন্তু। পারে তো রাস্তায়ই নেমে পড়ে।

রাস্তার ধারের পানের দোকানের কাছে রিক্সাওয়ালাটা কী যেন হদিস নিচ্ছে, আর পানের দোকানের লোকটা মহাপণ্ডিতের মত হাত-মাথা নেড়ে দূরের কী একটা গলির ইশারা করছে। পানের দোকানের লোকটা কিচ্ছু জানে না। শুধু ভুল খবর দেয় আর খামোকা হায়রানি বাড়ায়। ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিতে হয় দোকানটাকে।

ঠিক হয়েছে। রিক্সায় যে যাচ্ছে সে পানওয়ালার কথা শোনেনি, উল্টো দিকে, মন্তুদের বাড়ি দিকেই আসছে। জুতোর স্ট্র্যাপ আর শাড়ির পাড় দেখা যাচ্ছে। নির্ঘাৎ মা-মণি। নির্ঘাৎ।

না, অন্য কারু মা। রিক্সাটা সামনে দিয়ে চলে গেল ঘন্টা বাজিয়ে।

পিন্টু আবার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কেন মিছামিছি তাকিয়ে আছিস রাস্তার দিকে? তোর মা-মণি আজ আসবে না।'

টিটকিরি দিয়ে উঠল মন্তু, 'আজ শুক্রুরবার? তাই না? আজ লাল তারিখ? হেরে গিয়ে আবার কথা কইতে এসেছে!'

'হলই বা না আজ রবিবার। কিন্তু ঘড়ি দেখেছিস?'

'কেন?' ভয় পেল মন্তু : 'ঘড়িতে কটা বেজেছে?'

'বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট।'

'মিথ্যে কথা।' ঝামটা মেরে উঠল মন্তু।

'তা ঘড়িটা গিয়ে দ্যাখ না।'

অসহায় মুখ করে মন্তু বললে, 'আমি কি ঘড়ি দেখতে জানি?'

'তা হলে যা বলছি তা মেনে নে। আরো এক মিনিট এর মধ্যে কেটে গেল। তাহলে এখন বারোটা বাজতে চার মিনিট।' পিন্টু মুরুব্বিয়ানা চালে বললে, 'এখন যদি তোর মা-মণি আসেও মোট চার মিনিট সময় তাকে তোর কাছে পাবি। এই চার মিনিটে না হবে স্নান, না বা খাওয়া, না বা কাছে নিয়ে একটু ঘুমোনো।'

'বড় মা! বড় মা!' চেঁচাতে শুধু করে দিল মন্তু : 'দেখ না পিন্টু-দাটা আবার আমাকে খ্যাপাচ্ছে। জ্বালাচ্ছে!'

সুভদ্রা লম্বা হাঁক পাড়তেই পিন্টু আবার অদৃশ্য হল।

বাইরের ঘরে ঢুকল এবার মন্তু। দেখল হিমাদ্রি তখনো খবরের কাগজ পড়ছে।

'কটা বেজেছে বাবা?' গা ঘেঁসে দাঁড়াল এসে মন্তু।

'য়্যাঁ?' চমকে উঠল হিমাদ্রি। দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল : 'এগারোটা বাজে। একি, তোর মা-মণি আসেনি এখনো?'

এই মুহূর্তে তার জন্যে মন্তুর তত ভাবনা নেই, পিন্টুর চালটা যে টিকল না এতেই সে খুশি। ম্লান মুখখানিতে হাসির রেখা ফুটিয়ে মন্তু বললে, 'পিন্টুদা বলছিল বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট।'

'তা বারোটার আর বাকি কী! আসছে না কেন তোর মা-মণি?'

'কেমন করে বলি?' মুখে আরো এত পোঁচ কালি মাখাল মন্তু।

ঘড়ির দিকে আবার তাকাল হিমাদ্রি। প্রায় নিজের মনে বললে, 'আর কখনই বা আসবে! এলেও বা থাকবে কতক্ষণ। আর ঘন্টাখানেক তো মেয়াদ।'

হিমাদ্রির গায়ের উপরে মৃদু হাত রাখল মন্তু। বললে, 'বাবা, তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসবে?'

'না, না, আমি যাব কোথায়?' খবরের কাগজেই মন দিল হিমাদ্রি।

'আমার মনে হচ্ছে কী জানো?' খুব বিজ্ঞের মত মুখ করল মন্তু।

সর্বসমস্যাতেই মন্তুর এই কল্পনার দৌড়। আমার মনে হচ্ছে কী জানো, বলেই এক অদ্ভুত মন্তব্য।

সে মন্তব্য শোনার আর এখন স্পৃহা নেই হিমাদ্রির। স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি এনে বললে, 'তোমার কী মনে হচ্ছে তাই জেনে তো আর কিছু এগুচ্ছে না। তুমি এখন যাও, কাকিমাকে বলো স্নান করিয়ে দিতে।'

দরজার পাশেই দীপিকা তৈরি। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'চলে এস। কেমন তোমার জন্যে নতুন তোয়ালে এনেছি দেখ। রঙিন তোয়ালে।'

'না, না, মা-মণি আসবে। মা-মণি স্নান করিয়ে দেবে।' মন্তু আর্ত প্রতিবাদ করে উঠল।

'এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই।' হিমাদ্রি আবার নিজের মনে তর্জন করে উঠল : 'ছেলেটা যে সকাল থেকে আশা করে থাকে, দেরি করে এলে যে ওর নাওয়া-খাওয়াও পিছিয়ে যায়, এতটুকু ভাবে না। সবটাই যেন ছেলেখেলা।' পরে ছেলের দিকে রুষ্ট চোখে তাকিয়ে বললে, 'না, আর দেরি নয়। বেশি দেরি করে খেলে শরীর খারাপ হবে। আজ কাকিমার হাতেই নাও-খাও গে। ওগো, নিয়ে যাও মন্তুকে।'

চেয়ারের হাতলটা সজোরে আঁকড়ে রইল মন্তু। কান্নাভরা গলায় বললে, 'দেরি করে খেলে কখনো আমার অসুখ করবে না। মা-মণিই আমাকে নাইয়ে-খাইয়ে দেবে। নাওয়ানোর সময় মা-মণি কেমন সুন্দর গান গায়। কাকিমা পারে গাইতে?'

'কিন্তু তোর মা-মণি না এলে কী করা যাবে? উপোস করে থাকবি?' হিমাদ্রি ঝাঁজিয়ে উঠল।

'ঠিক আসবে, ঠিক আসবে দেখো।' বিশেষজ্ঞের মত মুখ করল মন্তু : 'এর আগে আর কোনো রবিবারই তো মা-মণির দেরি হয়নি। আজ যখন দেরি হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।'

'কোনো কারণ নেই।' হিমাদ্রি অস্থির হয়ে উঠল : 'দিন তারিখ স্রেফ ভুলে গিয়েছে। এত মত্ত, কোনো দিকে, পেটের ছেলেটার দিকেও আর হুঁশ নেই—'

'মোটেই তার জন্যে নয়।' আবার বিচক্ষণ টিপ্পনী কাটতে চাইল মন্তু, 'আমার মনে হচ্ছে কী জানো?'

'তোমার কী মনে হচ্ছে তা জেনে আমাদের কাজ নেই। তুমি এখন চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।' জোর করেই মন্তুর হাতের মুঠটা চেয়ারের হাতল থেকে আলগা করে নিল হিমাদ্রি : 'চলো, আমার সঙ্গেই চান করবে।'

'না, মা-মণি ছাড়া আর কারু সঙ্গে আমি চান করব না।' সাধ্যমত বাধা দিতে চাইল মন্তু।

'না, আর মা-মণি নয়।' হুমকে উঠল হিমাদ্রি।

'না, বারোটা পর্যন্ত তো দেখবে।' গাঢ়সিক্ত চোখে তাকাল মন্তু : 'কোর্ট তো বারোটা পর্যন্ত টাইম দিয়েছে।'

'তা হলে তুই বারোটার পর স্নান করবি?' মন্তুর হাত ধরে আবার টানল হিমাদ্রি।

বাইরে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সোয়ারিকে নামিয়ে দিয়ে টুং-টুং-টুং করে তিনটি শব্দ তুলল।

উৎসুক হয়ে তাকাল মন্তু।

'এসেছে! এসেছে! মা-মণি এসেছে।' তিনটি মিষ্টি আওয়াজ তুলল মন্তু।

কখন অজান্তে হাত ছেড়ে দিয়েছে হিমাদ্রি মন্তু ছুটে গিয়ে তপতীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল। উৎফুল্ল কন্ঠে বললে, 'ট্যাক্সি করে এসেছ না-মণি?'

'হ্যাঁ ভাগ্যিস, পেলাম ট্যাক্সিটা।' মন্তুর গায়ে-পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে তপতী বললে, 'না পেলে আরো কত না জানি দেরি হত।'

'কিন্তু এত দেরি করার মানে কী?' প্রায় তেড়ে এল হিমাদ্রি।

যেন কৈফিয়ৎ চাইছে। যেন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য তপতী। তবু ভুরু দুটো আপনা থেকে একটু কুঁচকে উঠলেও চোখে মুখে রাগ আনল না। বললে, 'সম্প্রতি শ্যামবাজারের দিকে গানের দুটো টিউশান পেয়েছি। রোববার সকাল ছাড়া ছাত্রীদের নাকি সুবিধে নেই। তাই টিউশান সেরে আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'তোমার টিউশানে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই।' রুক্ষস্বরে বললে হিমাদ্রি, 'কিন্তু না-নেয়ে না-খেয়ে তোমার জন্যে কতক্ষণ হাপিত্যেশ করবে ছেলেটা?'

হাত-ঘড়ির দিকে তাকাল তপতী। বললে, 'তা খুব বেশি আর কী দেরি হয়েছে? এখন মোটে এগারোটা বেজে দশ। ছুটির দিন—'

'হোক ছুটির দিন। এগারোটার মধ্যেই ছোট ছেলেপিলেদের খাওয়া দাওয়া সারা উচিত। সেই রকমই কথা।'

'কখন নাইতে হবে বা কটার মধ্যে খেতে হবে এমন কোনো নির্দিষ্ট কড়ার করে দেয়া হয়নি।' তর্ক করবে না ভেবেছিল, তবু তপতীর জিভে তর্ক এসে পড়ল। পরমুহূর্তেই আবার সামলে নিল তাড়াতাড়ি। 'যাক গে, এখুনি নাইয়ে-খাইয়ে দিচ্ছি সোনাটিকে।' বলে চিবুক ধরে মন্তুকে একটু আদর করল। গলা নামিয়ে বললে, 'তোমার জন্যে সেই জিনিসটা এনেছি সেই যে সেদিন চেয়েছিলে?'

'এনেছ?' মা-মণির হাতব্যাগের দিকে লোলুপ দৃষ্টি ছুঁড়ল মন্তু।

ব্যাগের থেকে একটা কাগজের ঠোঙা বের করল তপতী। আর, ঠোঙার মধ্যে চোখ পাঠিয়ে মন্তু দেখল তার লোভনীয়তম সম্ভার, কাগজে মোড়া নানান রঙের লজেন্স আর টফি, আর ওগুলো বুঝি চকলেট—

ঠোঙাটা তপতী মন্তুর দু হাতের মধ্যে সঁপে দিতে যাচ্ছে ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিল হিমাদ্রি। মুখিয়ে উঠে বললে, 'খাবার জিনিস এনেছ কোন সর্তে?'

'ওগুলো কি খাবার জিনিস?' তপতী হতভম্বের মত মুখ করল।

'খাবার জিনিস নয় কি দেখবার জিনিস? ঘর সাজাবার জিনিস?'

'কোনো রান্নাকরা জিনিস আনব না, এনে খাওয়াব না, যতদূর মনে হচ্ছে, এই তো আছে ডিক্রিতে।' পাংশু মুখে তাকাল তপতী।

'মোটেই তা নয়। লেখা আছে কোনো খাবার জিনিসই আনতে পারবে

না, দিতে পারবে না ছেলেকে। খাবার জিনিসকে কোনোভাবেই কোয়ালিফাই করা নেই। দেখবে ডিক্রিটা? পড়ে মনে করিয়ে দেব?'

'না। তুমি যখন বলছ তখন সম্ভবত তাই আছে।'

'সম্ভবত?' জ্বলে উঠল হিমাদ্রি।

তপতী আবার নম্র হল। 'সম্ভবত নয়, যথার্থই তাই আছে। কিন্তু এ সামান্য কটা লজেন্স—খোকন কত ভালোবাসে—এ ওকে দিতে তোমার আপত্তি কী?'

'একশোবার আপত্তি। কোর্টের ডিক্রিতে যা বারণ বা নির্দেশ আছে তাই মানতে হবে অক্ষরে-অক্ষরে। এক চুল এদিক-ওদিক হতে পারবে না। তুমি যে আজ এ বাড়িতে ঢুকতে পেরেছ তাও কোর্টের কথায়। নইলে ঐ ট্যাক্সি থেকে তোমাকে আর নামতে হত না, ঐটে করেই ফিরে যেতে হত।'

'তা, সবই ঠিক কিন্তু লজেন্সে তো কিছু সন্দেহ করবার নেই।' করুণ চোখে তাকাল তপতী : 'আমি তো ওর সঙ্গে এমন নিশ্চয়ই কিছু মিশিয়ে আনতে পারি না যা খেয়ে আমার খোকনের অনিষ্ট হবে।'

'কী জানি কী হবে। আইনত আনতে যখন পার না আনবে না।' বলে ঠোঙাটা বাইরে রাস্তায়, গ্যাসপোস্টের কাছে যেখানে আবর্জনার কুড় হয়েছে, সেইখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল হিমাদ্রি।

মূক শোকে মন্তু তপতীকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরল।

তপতী এবার ফণা তুলল : 'খুব বাহাদুরি দেখালে।'

'আমি কেন দেখাতে যাব? বাহাদুরি তো তুমি দেখালে?' পালটা ছোবল মারল হিমাদ্রি : 'আর কিছু পেলে না, ঢঙ করে সস্তায় কটা লজেন্স কিনে আনলে। নতুন সংসারে এর চেয়ে বেশি আর কিছু জুটল না।'

'সস্তা বলে নয়, সবচেয়ে নির্দোষ বলে লজেন্স এনেছিলাম। কিন্তু তুমি যে এখনো সেই আগের মতই ছোটলোক আছ তা বুঝিনি।'

'গালাগাল দেবে তো বাড়ি থেকে বার করে দেব।' তেরিয়া হয়ে দাঁড়াল হিমাদ্রি : 'ছেলেকে ধরতে দেব না।'

সঙ্ঘাতে দৃঢ় হল তপতী : 'রবিবার সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ছেলে আমার হেপাজতে—হলই বা না এ বাড়িতে—আমার হাতের মধ্যে। কেন, ডিক্রির সেই সর্তটা মুখস্ত নেই? বাধা দিয়ে দেখ না। দেখ না তখন পুলিশ ডেকে আনতে পারি কিনা। পুলিশ মোতায়েন রেখে পারি কি না ছেলেকে ধরতে।'

'কী তোরা এখনো ঝগড়া করিস!' সুভদ্রা এসে তপতীকে টেনে নিয়ে গেলেন : 'এদিকে খিদেয় ছেলেটার যে কী দশা তা কারু খেয়াল নেই। যা, ছেলেটাকে নাইয়ে-খাইয়ে দে শিগগির।'

মন্তুকে নিয়ে তপতী বাথরুমে ঢুকল।

কিন্তু আজ মন্তুর স্নানটা তেমন জুতসই হচ্ছে না। মা-মণির জল

ঢালাটা কেমন যেন আজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে, লাইন দিয়ে বেয়ে গিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে ভেঙে যাচ্ছে না। তা ছাড়া আজ গান গাইছে না মা-মণি। জলধারানির গান।

বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি লাগাবার হুকুম নেই। মন্তু শুধু আলগোছে ভেজিয়ে রেখেছে। হলই বা না সে মোটে পাঁচ বছরের তবু সে মনে করে বে-আব্রু হবার মত সে অপোগণ্ড নয়। শুধু মা-মণির কাছে তার লজ্জা নেই।

রাথরুমের নিরিবিলিতে মন্তু ভার-ভার গলায় বললে, 'মা-মণি আর কতক্ষণ বাদেই তো তুমি চলে যাবে। আবার আসবে সেই আরেক রবিবার।'

'কী করব বলো।' তোয়ালে দিয়ে মন্তুর গা মোছাতে-মোছাতে তপতী বললে, 'কোর্টের তাই হুকুম।'

'কোর্টটা খুব পাজি, তাই না?'

'ভীষণ।'

'আমি যদি পারতুম এক চড়ে ওকে উড়িয়ে দিতুম।'

'তাই দেওয়া উচিত।' মিষ্টি হেসে সায় দিল তপতী।

'আচ্ছা মা-মণি, আমার ইস্কুলে তো বেস্পতিবারটাও ছুটি। সেদিন আসতে পারো না?'

'কোর্টকে বলে দেখব।'

'হ্যাঁ, দেখো না বলে। শুনেছি', মুখে-চোখে বিজ্ঞ গাম্ভীর্য আনল মন্তু 'কোনো-কোনো কোর্ট খুব ভালো। কথা শোনে।'

'হ্যাঁ, তারপর—' ষড়যন্ত্রীর মত গলা নামাল তপতী : 'তারপর তুমি বড় হবে। পথঘাট নিজেই সব চিনতে পারবে। কটা রাস্তার পরে এই কাছেই তো আমার নতুন বাসা। ঠিক পথ চিনে চলে যাবে একদিন। আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই, কোর্ট আমাকে বকবে, কিন্তু তুমি যদি চলে যাও একা-একা, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না—'

'কী মজা! তখন তোমার কাছে গিয়ে পড়লে তুমি আমাকে কত গল্প বলবে টার্জনের—'

'কী, এতক্ষণ কী হচ্ছে?' ভেজানো দরজায় ধাক্কা মারল হিমাদ্রি।

'বাথরুমের দরজায়ও ধাক্কা মারার বিদ্যে হয়েছে নাকি আজকাল—' তপতী মুখের রেখাটা কুটিল করল।

'তা তোমার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো।' নিষ্ঠুরের মত বললে হিমাদ্রি।

স্নান করাবার সময় হাতের ঘড়িটা খুলে রেখেছিল তপতী, তা ফের পরতে-পরতে বললে, 'আমার দিকে লক্ষ্য রাখবার আর তোমার এক্তিয়ার কী।'

'তোমার দিকে নয়। বলতে ভুল হয়েছে। আমার ছেলের দিকে।'

'কেন, ছেলেকে আমি কী করব?'

'কে জানে কী করবে! হয় তো নিরিবিলি পেয়ে কুশিক্ষা কুমন্ত্র দেবে। তোমার কিছুই অসাধ্য নয়। তাই চোখে-চোখে রাখা দরকার।'

'স্পাইং করতে পারবে কোর্ট এমন নির্দেশ দেয়নি তোমাকে।'

'এ আর নির্দেশ দেবে কী। এ তো স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেটার কিছু অসুবিধে বা অনিষ্ট হচ্ছে কিনা এ তো খোলা চোখে পরিবার দেখবেই।'

'আমি মা হয়ে ছেলের অনিষ্ট করব?' জ্বলে উঠল তপতী।

'থাক, বেশি বক্তৃতা দিয়ো না। ছেলেকে খাওয়াবার কথা, খাওয়াও। তারপরে পথ দেখ।' বাইরের ঘরে চলে যাবার উদ্যোগ করল হিমাদ্রি।

কী একটা তপতী বলতে যাচ্ছিল, সুভদ্রা বাধা দিলেন : 'কথার তো শেষ হয়ে গিয়েছে, নতুন করে আবার কথা কেন?' ভাতের থালা রাখলেন টেবিলের উপর : 'খিদেয় ছেলেটার মুখ শুকিয়ে গেছে। নে, খাওয়া, ছেলেটাকে দুটো মিষ্টি কথা বল।'

মন্তুর পাশে আরেকটা চেয়ারে বসল তপতী। মন্তু নিজের হাতেই খেতে পারে। শুধু তাকে একটু মেখে দিতে পারলেই সে খুশি। আর নচ্ছার ঐ মাছের কাঁটাগুলো যদি একটু বেছে দাও।

'জানো মা-মণি, যদি একটা মাছের কাঁটা গলায় বেঁধে', হাসতে-হাসতে মন্তু বললে, 'তাহলে বাবা নিশ্চয়ই বলবে তুমি ইচ্ছে করে বিঁধিয়েছ।'

চোখ নিচু করে কাঁটা বাছতে বাছতে তপতী বললে, 'আমি নাকি ছেলের অনিষ্ট করব আর তাই কিনা এরা পাহারা দিচ্ছে।'

দীপিকা টেবিলের কাছে ঘুরঘুর করছিল। তাকে লক্ষ্য করে মন্তু চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি এখানে কী করছ? আমার আর কিছু লাগবে না। যদি লাগে মা-মণিই দিতে পারবে। তোমাকে সর্দারি করতে হবে না, তুমি চলে যাও।'

হাসতে-হাসতে দীপিকা চলে গেল রান্নাঘরে।

চারদিকে তাকিয়ে কেউ কোথাও নেই দেখে মন্তু বললে, 'তুমি কিছু ভেবো না মা-মণি, আমাকে একটু পথঘাটটা চিনিয়ে দাও। আমিই ঠিক চলে যাব তোমার কাছে। বলো না মা-মণি, তোমার নতুন বাসাটাটা কেমন? কে কে আছে সে-বাসায়?'

তপতী দই দিয়ে ভাত মেখে দিতে লাগল।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রিটার নকলে আরেকবার চোখ বুলোলো হিমাদ্রি। হ্যাঁ, স্পেশ্যাল ম্যারেজ য়্যাক্টের বিয়ে আপোসেই বিচ্ছেদ করে নিয়েছে। আর যে কন্টক-বীজ ফাটল ধরাবার মূলে সেই হিমাদ্রির বন্ধু অমিতাভকেই পরে বিয়ে করেছে তপতী। আর পূর্ব বিবাহের ফল যে একমাত্র সন্তান মন্তু, তার সম্বন্ধে আদালতের সাময়িক নির্দেশ হয়েছে যে সে তার বাবার কাছে, হিমাদ্রির অভিভাবকত্বেই থাকবে, শুধু প্রতি রবিবার দু ঘন্টা, বেলা দশটা

থেকে বারোটা, হিমাদ্রির বাড়িতে এসে তপতী ছেলের সঙ্গে থাকতে পারবে। যদি চায়, নাওয়াতে-খাওয়াতে পারবে। নাওয়াতে মানে হিমাদ্রিদের বাড়ির জলে নাওয়াতে, খাওয়াতে মানে হিমাদ্রিদের বাড়ির রান্না খাওয়াতে। ঐ দু ঘন্টার মধ্যে তপতী ছেলেকে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, কোনো জিনিস উপহার দিতে পারবে না, চাই কি, ছেলে নিয়ে নিরালা হতে পারবে না। সকলের চোখের সমুখে ব্যয় করতে হবে সেই দু ঘন্টা।

হ্যাঁ, রবিবার, দু ঘণ্টা। আরেকবার ভালো করে দেখে নিল হিমাদ্রি। হ্যাঁ, রবিবার যে কোনো দু ঘণ্টা নয়। নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বেলা দশটা থেকে বারোটা।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে খাবার ঘরে ঢুকে হিমাদ্রি তপতীর হাতের তলা থেকে ভাতের থালাটা কেড়ে নিল। পরুষ কণ্ঠে বললে, 'তুমি এবার ওঠো, বারোটা বেজে গিয়েছে, চলে যাও এবার।'

'সে কী?' মূঢ় নিস্পন্দ হয়ে রইল তপতী।

'নিজের হাতেই তো ঘড়ি বেঁধে এনেছ। দেখ না কটা।'

'আহা, ছেলেটা শেষ ভাত কটা খাচ্ছে দই দিয়ে—'

'খাবে। নিশ্চয়ই খাবে। দই মাখা ভাত ও নিজেই খেতে পারবে হাত দিয়ে। তোমাকে আর সাহায্য করতে হবে না। তোমার টাইম-লিমিট পার হয়ে গিয়েছে। উঠে এস টেবিল ছেড়ে।'

তপতী নড়ল না। বললে, 'মোটেই পার হয়ে যায়নি। আমার দু ঘন্টা থাকবার কথা। দু ঘন্টা হয়নি এখনো।'

'তোমার ইচ্ছেমত দু ঘন্টা নয়। দশটা থেকে বারোটা দু ঘণ্টা। উঠে এস বলছি। আমাকে না মানো কোর্টকে তো মানবে । আর কোর্টকে যদি না মানো অন্য উপায় দেখতে হবে।'

'তার মানে গায়ের জোর ফলাবে?'

'ওভারস্টে করতে চাইলে তাই করতে হবে বৈকি। বেলা বারোটার পর তুমি তো ট্রেসপাসার—'

'একেই বলে ছোটলোক।' উঠে পড়ল তপতী।

থালাটা তখন মন্তুর সামনে নামিয়ে রাখল হিমাদ্রি। বললে, 'আর তোমাকে কী বলে তা আর ছেলেটার সামনে শুনতে চেয়ো না।'

এই নিয়ে তুমুল শুরু হয়ে গেল।

আর সেই ঝগড়ার মধ্যে গম্ভীর মুখে দই-মাখা ভাত কটা নীরবে খেতে লাগল মন্তু।

পরের রবিবার আবার তপতী এল। তেমনি দেরি করে।

কিন্তু আশ্চর্য, মা-মণিকে দেখে আজ মন্তুর এতটুকু উৎসাহ নেই। এতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করে আছে, দুই চোখে নেই সেই ঔজ্জ্বল্য। ছুটে এসে কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। উথলে উঠেছে না আনন্দে।

দরজা ঘেঁষে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, নায়নি, খায়নি। চুলগুলি রুক্ষ, হাতে-পায়ে ধুলো, মুখখানি শুকনো।

নিজেই ছেলের দিকে হাত বাড়াল তপতী।

কী আশ্চর্য, মন্তু গুটিয়ে গেল, পিছিয়ে গেল।

'সে কী, চান করবে না আজ?' দু পা এগিয়ে গেল তপতী।

'না।' সরে গেল মন্তু। বললে, 'কাকিমা চান করিয়ে দেবে।'

তক্ষুনি, কোত্থেকে, দীপিকা এসে হাজির। মন্তুর গা থেকে জামাটা খুলে নিয়ে দিব্যি তার গায়ে-মাথায় তেল মাখিয়ে দিতে লাগল।

আর দিব্যি তাই চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তপতী।

'কার হাতে খাবে?' তপতী আবার জিজ্ঞেস করল।

কেউ শিখিয়ে দিচ্ছে না, মন্তু নিজের থেকেই বলছে, 'কাকিমার হাতে।'

ম্লান রেখায় হাসল তপতী। বললে, 'কেন, আমি কী দোষ করেছি?'

চোখ নত করে মন্তু মাটির দিকে তাকাল। বলল, 'তুমি এসেই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করো, অশান্তি করো। তাই তোমার হাতে আর নাব না। খাব না।'

দীপিকা কত সহজে বাথরুমে টেনে নিয়ে গেল মন্তুকে। মন্তু একবার ফিরেও তাকাল না।

'ওর বাবা কোথায়?' পিন্টুকে জিজ্ঞেস করল তপতী।

'বাড়ি নেই।' পিন্টু পালিয়ে গেল সামনে থেকে।

হিমাদ্রি বারোটা বাজিয়েই তবে বাড়ি ফিরল। এসে দেখল তপতী তখনো বসে আছে।

'তোমার জন্যেই বসে আছি।' তপতী স্নিগ্ধ কন্ঠে বললে।

'এস বাইরের ঘরে। ঐ ঘরটাই এখন নিরিবিলি।'

দুজনে মুখোমুখি বসল দু চেয়ারে। 'তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে।' তপতী বললে।

'কী, বলো?' সমস্ত ভঙ্গিটা কোমল করল হিমাদ্রি।

'রোববার-রোববার যখন আসব তখন তুমি আমার সঙ্গে একটু ভালোবাসার অভিনয় করবে।'

'কিসের অভিনয়?' চমকে উঠল হিমাদ্রি।

'ভালোবাসার অভিনয়।'

'তার মানে?'

'ছেলেটা আজ আমার হাতে নাইল না, খেল না, কাছেই এল না। বললে, তুমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করো, অশান্তি করো। তোমার হাতে নাব না খাব না।' বলতে বলতে তপতীর চোখ ছলছল করে উঠল।

'আমাকে কী করতে হবে বলো?' সহানুভূতিতে আর্দ্র হিমাদ্রির কন্ঠস্বর।

'ওর সামনে আমাকে একটু মিষ্টি করে কথা কইবে, কথায় আদর দেখাবে,

একটু বা ভালো বলবে আমার। পারবে না?' সজল চোখ তুলল তপতী : 'এমন একটা ভাব দেখাবে যে আমি তোমার পর নই, তোমার পর না হলে ওরও পর নই ও ভাববে। আমাকে দেখে খুশি-খুশি ভাব করবে। এস-এস ভাব করবে, একটু খাতির যত্ন করবে—'

'সে আর কী করে হয়?' গম্ভীর হল হিমাদ্রি : 'সে আর হয় না।'

'তোমার পায়ে পড়ি, কেন হবে না? আমি তো আমার জন্যে বলছিনা, ছেলেটার জন্যে বলছি।' অঝোর কাঁদতে লাগল তপতী : 'নইলে বলো, আমি আসব আর মন্তু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমাকে পর ভাববে, শত্রু ভাববে, আমার কাছে আসবেনা আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, আমাকে নাওয়াতে-খাওয়াতে দেবে না—এ আমি কী করে সইব?' দু হাতে মুখ ঢাকল তপতী।

কখন এক ট্যাক্সি এসে থেমেছে দরজায়, কেউ খেয়াল করেনি।

অমিতাভ ঘরে ঢুকে একেবারে থ হয়ে গেল। বলল, 'এ কী, এত দেরি হচ্ছে কেন? দেরি দেখে ভয় হল, কোনো বিপদটিপদে পড়লে নাকি? এখন প্রায় একটা।'

তপতী পত্রপাঠ উঠে পড়ল। দ্রুত আঁচল বুলিয়ে মুছে নিল চোখ-মুখ। কোনোদিকে দৃষ্টিপাত না করে—ট্যাক্সিটা অমিতাভ ছেড়ে দেয়নি—ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল।

অমিতাভ পাশে বসল।

'আমি কিন্তু এতক্ষণ ছেলের জন্যে কাঁদছিলাম।' ট্যাক্সিটা চলতেই অন্যমনস্কের মত বললে তপতী।

অমিতাভ একটাও কথা বলল না। নীরবে সিগারেট ধরাল।

৮০। কালো রক্ত

মধ্য রাতের সে-কান্নাটা কেমন অচেনা, অদ্ভুত মনে হলো।

ওটা কি কোনো পাখির কান্না? কিন্তু কলকাতার পাথুরে আকাশে অমন পাখি কই?

না, মানুষের কণ্ঠস্বর। ভগ্ন, ছিন্ন, বাণবিদ্ধ।

'এত রাতে কে ওকে ফ্যান দেবে?' বললে দেবকুমার ম্লান শীর্ণ কণ্ঠে।

বিভা স্বামীর পাশ ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কান্নাটা মনে হলো তাদের গলিতেই, বস্তির পিছনে।

'বার্লি আর খানিকটা আছে না বাটিতে?'

'কেন, খাবে?' জানলা ছেড়ো বিভা ফের চলে বিছানার কাছে।

'না, আমি নয়। ঐ মেয়েটাকে ডেকে বার্লিটুকু দিয়ে দাও।'

মেয়ের কান্না! বিভা খানিকক্ষণ কান পেতে রইল। সত্যিই তো, মেয়েই কাঁদছে।

কিন্তু কত কষ্টে জোগাড় করেছে সে বার্লি। এমনিতে কেনবার শক্তি ছিল না, ভিক্ষে চাইবারো শক্তি ছিল না প্রথমে। কেনবার শক্তি অর্জন করতে না পারলেও ভিক্ষে চাইবার শক্তি অর্জন করা যায়। যখন আর ক্লেশ থাকে না, যখন হতাশা চলে যায় ক্লান্ত হয়ে।

এক চুমুক খেয়েই বার্লির বাটিটা সরিয়ে রেখেছিল দেবকুমার। জ্বরের তাড়সে নয়, বিস্বাদে। শুধু বার্লিই জোগাড় হয়েছে, চিনি জোগাড় হয়নি। বহুদিনের পচা জ্বরে মুখের মধ্যে একটা চ্যাটচেটে মিষ্টি-মিষ্টি ভাবের জন্যে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু কোথাও জোগাড় হয় নি এক কুঁচ।

তাই বলে বার্লিটা দিয়ে দিতে হবে নাকি বিলিয়ে? কাল সকালেই তো আবার বেরুবে বিভা। কাল চিনি, চিনি ছেড়ে চালও মিলে যেতে পারে।

কান্নাটা চাপা, ভারি। মুক্ত নয়, আচ্ছন্ন। যেন অনেক লজ্জা ও অনেক লাঞ্ছনা দিয়ে চেপে ধরা।

'আমি যাই। দেখে আসি।' যেন তার রুগ্ন স্বামীর চেয়েও বেশি বিপন্ন, এমনি ভাবে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বিভা।

ঠিক তাদের বস্তির পিছনে। ছাই-কুঁড়ের পাশে।

মোছা-মোছা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পেল বিভা। বেড়ার গায়ে পিঠ রেখে আধ-ভাঙা অবস্থায় বসে আছে একটা মেয়ে, দু'হাতে তলপেট চেপে ধরে। চোখ বেরিয়ে আসছে ঠিকরে, গলাটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে এক পাশে, মুখে যেন কে ঘুসি মেরেছে সোজাসুজি।

বিভা বুঝতে পেরেছে নিমেষে। তাই ফুটপাত ছেড়ে মেয়েটা চলে গেছে নিরিবিলিতে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে আন্ডা-বাচ্চাগুলোকে। ফুটপাতেই কি, বা আঁস্তাকুড়েই কি, সবখানেই সমান খিদে। মার এই গোঙানিতে তাদের হুঁস নেই, যেমন তাদর গোঙানিতে হুঁস নেই সমস্ত পৃথিবীর।

বাচ্চা হ'তে মিনি বেরালটা আসত এই আঁস্তাকুঁড়েই। আসত লেড়ী-কুত্তিটা। তেমনি এসেছে ভিখিরিনি। ঠিক সেই মান গাছের আড়ালে, পেঁপে গাছের তলায়।

যে জীবন আসছে সে আবর্জনা ছাড়া আর কি।

কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছে কী বিভা? কী বা করতে পারে সে? কিচ্ছুই তার জানা নেই। সে জানেনা এ যন্ত্রণার ইতিহাস।

ভাগ্যিস জানেনা! হাড্ডিসার চামদড়ি-পাকানো ঘুমন্ত শিশুগুলোর দিকে তাকিয়ে সে নিশ্বাস ফেললো।

কিন্তু একেবারে না জানলে চলবে কি করে? তাড়াতাড়ি সে চলে এলো রাস্তায়, ফুটপাথে। দেখলো অনেক মেয়ে ঘুমিয়ে আছে দলে-বিদলে।

একজনকে টেনে তুললো। বলল, 'চল শিগগির, ছেলে হবে। তোমাদের কে ব্যথা খাচ্ছে ভয়ঙ্কর—'

বোধহয় একটা স্বজাতীয়তা আছে, মেয়েটা আপত্তি করলনা। বিভা আশ্চর্য হয়ে গেল। এ মেয়েটাও পেটের ভারে ঝুঁকে পড়েছে। এরও ভিক্ষান্নে হাত বাড়াচ্ছে কে আর একজন অনাগত ভিক্ষুক। তার গ্রাসের পাশে আরো একটি ক্ষুধা রয়েছে উদ্যত হয়ে।

'শিগগির কিছুটা নেকড়া নিয়ে এসো, আর একটা ছুরি—'

তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এল বিভা। ডালা-খোলা টিনের প্যাঁটরাটা বেশি হাটকাতে হলো না, কেননা সমস্তই ন্যাকড়া। কিন্তু ছুরি?

দেবকুমার মুহ্যমানের মত জিগগেস করলো, 'কি কি?'

ঝর্ণার জলের মত উজ্জ্বল কন্ঠে বিভা বললে, 'খোকা গো খোকা—'

বাইরে এসে দেখলো অনেক রক্ত পড়ে আছে মাটিতে। মরা জ্যোৎস্নায় কেমন কালো মনে হলো। কালো রক্ত। যেন অনেক ক্লান্তিতে ও ক্ষুধায় লাল রক্ত কালো হয়ে গেছে।

ছুরি নেই, কিন্তু বেড়া থেকে বাখারি ভেঙে নিয়ে ধারালো ধার দিয়ে নাড়ী কাটা হয়েছে। ন্যাকড়ায় জড়িয়ে শিশুটাকে শোয়ানো হয়েছে মাটির উপর।

খুদে, পুঁচকে এক রতি একটা শিশু। কাঁদছে অতি নিরীহ নিস্তেজ কন্ঠে। অসহায় অপরাধীর মত।

'ওকে আমি ঘরে নিয়ে যাই—' অতি সন্তর্পণে ন্যাকড়ায় জড়ানো জেলির মত তলতলে সেই এক ডেলা নরম ললিত মাংসকে বুকে তুলে নিল বিভা। ছেলে, ছেলে, সত্যিই ছেলে। তার হাড়ের হাড়, তার মাংসের মাংস।

বিস্তৃত বিষণ্ণ চোখে তাকাল মা, তাকাল বিভার দিকে। জ্যোৎস্নায় তাকে বড় আশ্চর্য মনে হলো। বলল, 'নিয়ে যাও। আমার তো কত আছে—'

বুকের গরমে কি ভাবে নরম করে ধরবে ছেলেকে বুঝতে পাচ্ছে না বিভা। মা আবার বললে, 'যদি পারো বাঁচিয়ে রেখো। বড় হয়ে উঠে তবে ও ঠিক লোককেই মা বলবে।'

হয়তো সুখে থাকবে। বিভা গরিব নিশ্চয়ই। কিন্তু মাথার উপরে এখনো চাল আছে, কোমরের কাপড়টা নামানো আছে হাঁটুর নিচে। এদের মত জনবন্যায় গা ঢেলে দিয়ে ফুটপাতের চড়ায় এসে ঠেকেনি। এখনো হয়তো আশা আছে। সুদিনে বিশ্বাস আছে। ভাগ্যের দয়ায় ছেলেটা বেঁচেও যেতে পারে বা।

ওর তো কতগুলি আছে। সবগুলিই যাবে একে-একে। যদি বাঁচে একটা, এই শেষেরটা। তাতে তার কী? সে কোথায়? তবু যতক্ষণ সে বেঁচে থাকবে, ভাবতে পারবে, একটা অন্তত বেঁচে আছে। বিদ্রোহীর মত বেঁচে আছে।

যে খাই এসেছিল সেও হয়তো শাদা জ্যোৎস্নায় দেখতে পেল কালো রক্ত। কালো মৃত্যু। তার অনাগতের জন্যে ঘর কোথায়?

ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট ও করুণ একটা শব্দ শুনে দেবকুমার চোখ চাইল। এ কে?

যেন কোন সাত রাজার ধন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে এমনি গলায়, বলতেও পারছে না, না বলেও পারছে না—বিভা বলে উঠল, 'খোকা গো খোকা—'

উঠে বসবার শক্তি থাকলে দেবকুমার উঠে বসত। নিজেরা শুতে পায় না, কোত্থেকে আবার শঙ্করাকে ডেকে এনেছে।

'এটাকে তো মেরে ফেলবে তুমি—'

বিভা কিছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। কত মা প্রসব করেই মারা যায়, তারপর আর কেউ এসে বুকে তুলে নিয়ে বাঁচায় সে ছেলেকে। তিল তিল করে মানুষ করে তোলে। তেমনি একেও সে বড় করে তুলবে। একে দিয়ে তার কত কাজ কত আশা।

তুমি ছিলে ইস্কুলের কেরানি, আর এ হবে দেখো স্কুলের মাস্টার—জগৎগুরু। কিছুই বলা যায় না। কোন ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো লুকিয়ে আছে, বলতে পারো তুমি?'

তাকে আনাড়ি তো বলবেই। যখন তার নাড়ী ছিঁড়ে আসেনি এ ছেলে, যখন তার চোপসানো বুকে আনেনি এ ক্ষীরভার। কিন্তু এ অবস্থাতেও তো কত ছেলে বেঁচে ওঠে, ইটের ফাটলেও তো কত গাছ ওঠে মাথা উঁচিয়ে। সংসারে কেউই মরতে আসে না। বাতাসে যে বীজকণা উড়ে বেড়ায় সেও ইটের ফাটলে আশ্রয় খোঁজে।

'কিন্তু খাওয়াবে কী?'

সত্যিই, খাওয়াবে কী? ধুয়ে পাখলে ছেলেটাকে শুইয়েছে এখন মান পাতায়, ন্যাকড়া জড়িয়ে টেনে নিয়ে এসেছে বিশীর্ণ কোলের মধ্যে। সত্যি খেতে চায় ছেলেটা। তার যে কান্না, সেও অনাহারের কান্না। তার প্রথম যে দাবি সেও ক্ষুধারই দাবি। সেও এক ক্ষুধার্তেরই ওয়ারিশ।

কী খেতে দেবে? মধু? মিছরির জল দু-এক ফোঁটা? মিছরির বদলে চিনি দু-এক দানা? চিনির বদলে বার্লি?

পলতে করে দু-এক ফোঁটা বার্লিই ছেলেটার মুখে ঢেলে দিতে লাগল। বিভা বললে গর্বিতের মতো, 'কে কাকে খাওয়ায় তার ঠিক কি! তুমি কিছুই বলতে পারো না।'

সকালবেলা ছেলেটাকে দেবকুমারের পাশে শুইয়ে বিভা বেরিয়ে গেছে। মধুর খোঁজে। চিনির খোঁজে।

যারা ভিক্ষে দেয় তারা ফ্যান পর্যন্ত বোঝে। তার উপরে বা নিচে আর কিছুই বুঝতে চায় না। আর সব কিছুই মনে হয় বাচাল বাবুগিরি। মিষ্টি তাদের ঘরেও নেই, মুখেও নেই।

নিজেদের জন্যে চেয়ে অনেকদিন সে রিক্ত হাতে ফিরেছে। কিন্তু ছেলের জন্যে শূন্য হাতে ফিরতে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। ছোট ছেঁড়া আঁচলের ফাঁক দিয়ে নিজেই একবার তাকালে সে তার বুকের দিকে, শরীরের মরুভূমির দিকে। আশার এতটুকু একটা অক্ষরও কোথাও লেখা নেই।

আশে-পাশে তাকালো সে মায়ের সন্ধানে। ফুটপাতে, ছাইকুড়ের আনাচে-কানাচে। দেখা হলে জিগগেস করত, বুকে তার দুধ এসেছে কিনা। কিন্তু কোথায় চলে গিয়েছে ভিক্ষের সন্ধানে কে জানে।

ছোট একটি বারুদের বিন্দু—এই প্রাণ-কণা। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই খালি ভাবছে দেবকুমার যুদ্ধের প্রতিবেশে। যেন মৃত্যু ও পরাজয়ের উপরে উড়ন্ত পতাকা। সমস্ত ক্ষুধা ও কাতরতার উত্তরে পরম নির্ভয় বাণী। কিন্তু এই বারুদ-বিন্দুর সঙ্গে যে মিলবে সেই বহ্নিকণা কোথায়?

'সমস্ত দিন এই ছেলের জন্যেই মিষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার জন্যে ওষুধ-পথ্যি বা আমার জন্যে চাল নুন কখন জোগাড় হবে কে জানে।'

'তখনই বলেছিলাম—'

কথাটা ফিরিয়ে নিল দেবকুমার! বিভার মুখে সুন্দর হাসি। ছেলেটাকে বুকে তুলে নিয়ে বললে সে সুন্দর গলায়, 'আমার যে ছেলে হয়েছে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। আমি সবাইকে দেখাব, আমার কেমন সুন্দর ছেলে। আমার কত সাধনার জিনিস। খেতে আসেনি আমাদের ঘরে, আমাদের খাওয়াতে এসেছে।' বলে ছেলেটার মাথাভরা এক রাশ লতানো-লতানো কালো চুলের মধ্যে সে ঠোঁট রাখল।

রোদ পড়ে এসেছে এতক্ষণে। অনেক হেঁটেছে বিভা। যত না হেঁটেছে তার চেয়ে বেশি বসে-বসে প্রতীক্ষা করেছে দোরগোড়ায়। আজ সে অনেক সাহসী। অনেক সুরক্ষিত। তার বুকের কাপড়ের নিচে তার ছেলে রয়েছে ঘুমিয়ে।

কেউ আর তার দিকে আঠালো চোখে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না! ছেলের গায়ে লেগে সে দৃষ্টি ধাক্কা খেয়ে গুটিয়ে যায়। করুণার বাজারে বেড়ে গেছে তার দাম, লালসার বাজারে বেড়ে গেছে তার মর্যাদা।

শুধু তার এক ভয়। একজনের থেকে।

আঁচলে আজ তার অনেক পয়সা—সে ভয় নয়। বুকের কাপড়ের নিচে যে তার ছেলে সে ভয়। যদি সে মা এসে এখন আঁচল থেকে পয়সা নয়, বুকের থেকে তার ছেলে নিয়ে যায় ছিনিয়ে। তার এই সৌভাগ্যে, এই ঐশ্বর্যে যদি তার গায়ের রক্তে আগুন ধরে যায়!

বিকেল হতেই কোন বাড়িতে ভিড় বসে গেছে ভিখিরিদের। বাপের শ্রাদ্ধে কোন বড় লোকের ঘরে-পড়া বিলাসিনী মেয়ে ভিখিরি বিদেয় করছে। সন্ধে হয়ে গেলেও ফুরোচ্ছে না ভিখিরির দল।

৬২৫

বিভাও গেছে সেখানে। তার যা নেবার আজই নিতে হবে কুড়িয়ে-বাঁচিয়ে। অনেক পেয়েছে সে আজ ছেলের দৌলতে, প্রায় আশাতীতরূপে। আরো চাই। যত পাই তত চাই। তার বুকের মধ্যে দাগা রয়েছে আজ প্রয়োজনের প্রমাণ।

শুনল টিকিট লাগবে। ফটকের বাইরে তাই দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। দেখছে, প্রত্যেক ভিখিরি পাচ্ছে রুটি আর গুড় আর দু'আনা করে পয়সা। ঝোলা গুড় পেলেই বা মন্দ কি! আঙুলে করে দিয়ে দিতে পারে মুখের মধ্যে।

কিন্তু তার উপরে চোখ পড়ল সে বিলাসিনীর। উপরের বারান্দা থেকে। না পড়েই যে পারে না। তার বুকের কাছে সদ্যোজাত শিশুর আভাস। মুখ-বুক ঢাকা রইলেও বেরিয়ে আছে তার পা দুটি। বাতাবিনেবুর দানার মত ছোট-ছোট আঙুল।

না থাক টিকিট, ডেকে আনো ভিতরে। ক'দিন আগে জন্মেছে শিশু, আহা, এরি মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। ভদ্রলোকের ভস্মাবশেষ হয়তো। দেখছ না, ঘোমটাটা এখনো একেবারে সরিয়ে ফেলতে পারছে না। কন্ঠস্বরে আনতে পারছে না কাকুতির নির্লজ্জতা। শুধু সদ্যোজাত শিশুর সার্টি-ফিকেটটা বুকে করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্লান্ত কালিমার মধ্য দিয়ে। ছেঁড়া কাপড়ে অপসৃত সুষমার অস্পষ্ট ইসারা রেখে।

সবাইকে যদি দু' আনা, ওকে দু' টাকা। বোতলে করে ছেলের জন্যে দুধ কাগজের ঠোঙায় কিছু চিনি-মিছরি। আর এই নাও কিছু শাড়ি জামা। তোমার জন্যে, তোমার ছেলের জন্যে।

ওর সঙ্গে কার কথা! ও একেবারে তলায় পড়া কাদা-মাটি নয়, ও শ্যাওলা, মূলহীন শূন্যচারী মধ্যবিত্ত ভদ্রতার দুঃস্থ প্রতিনিধি। যে মধ্য-বিত্ততা একদিনে দাঁড়াবে এসে যে চেহারায় যেন তারই পূর্বাভাস। ওকে বাঁচাতে হবে। ওর ছেলেকে বাঁচাতে হবে। বাঁচাতে হবে ওর সংস্কার স্বভাব। ওকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। ওকে মিশে যেতে দেওয়া হবে না। ফিরিয়ে নিতে হবে ঘরে, সম্মানের সীমাবোধের মধ্যে! ওকে বেশি করে দাও।

ফটকের থেকে যখন বাইরে বেরিয়ে এসেছে বিভা, তখন অন্ধকার। এখানে ওখানে তখনো ভিক্ষুকের জটলা। অন্যায় পক্ষপাতের জন্যে অনেক নালিশ চলেছে পরস্পরের মধ্যে। দানের বেলায় যে বন্টন সেখানে পর্যন্ত পক্ষপাত!

কত দূর এগিয়ে আসতেই কে পিছু নিয়েছে বিভার। অন্ধকারে চমকে চেয়ে দেখল বিভা, সেই মা। সঙ্গে সেই কটা চলন্ত হাড়ের শিশু। অনেক ক্লান্ত, অনেক বঞ্চিত-প্রতারিত!

কিন্তু, আশ্চর্য, মার মুখে কোনো অভিযোগ নেই। বরং যেন তৃপ্তি। স্নেহ।

'কেমন আছে ও?' ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করল মা।

ভয় পেয়ে দ্রুত দৃঢ় হাতে ছেলেটাকে বুকের মধ্যে আরো গুটিয়ে নিল বিভা। এ কি, কেড়ে নেবে নাকি? ইস, নিলেই হল? কে বলবে এ তার নিজের ছেলে নয়? কোথায় লেখা আছে এ ওর ছেলে?

না, অত ভয় পাবার কিছু নেই। মার মুখে অগাধ শান্তি।

ম্লান হেসে বিভা বললে, 'কেন ছেলে ফিরিয়ে নেবে নাকি।'

'না, ও কথা মনেও আনতে পারি না। তোমার কাছে ও বেঁচে থাকবে, কত সুখে থাকবে। আমাদের কোলে ছেলের আবার একটা দাম কী। তোমাদের কোলে ওর দাম লাখ টাকারো বেশি। এই তো দেখলাম আজ চোখের উপর, আমরা পেলাম কি,, আর তুমি পেলে কি। এমনি খালি হাতে গেলে হয়তো টিটকিরি পেতে, কিন্তু বাছাকে বুকে করে নিয়ে গেছ বলে—'

বিভা তাড়াতাড়ি হাঁটিতে সুরু করল। বাঁ হাতে তার ছেলে চেপে ধরা, ডান হাতে কাপড়ের বোঁচকা।

'শোনো, দাঁড়াও না একবারটি এই থামবাতির নিচে। হোক ঠুলি-পরা, তবু দেখতে পারব বাছার মুখ। ও পেটে আসবার কদিন পরেই ওর বাপ মারা গেল, একবার দেখব সেই মুখের ছাঁদ এসেছে কিনা ফিরে! দেখাও না, সরাও না একবার তোমার বুকের কাপড়টা। শুধু একবার—'

অসম্ভব। আরো তাড়াতাড়ি হাঁটিতে লাগল বিভা। ছেলেটাকে বোঁচকার মধ্যে পুরে নিতে পারলে আরো জোরে হাঁটা যেত, এক হাতের ভার যেত কমে। কিন্তু তখন এই রাস্তার মধ্যে ছেলেটাকে বোঁচকার মধ্যে চালান দেয়া সম্ভব নয়।

না, আর পিছু নেয়নি। ছেড়ে দিয়েছে তো ছেড়েই দিয়েছে। শরীরের শ্রমটুকু ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াবার জন্যে জমিয়ে রাখলে বরং কাজ দেবে।

এটা একেবারে একটা নির্জন গলি। একটা ভিক্ষুক পর্যন্ত নেই। যদিও কাছেই একটা ডাস্টবিন রয়েছে কানায়-কানায় ভর্তি।

বোঁচকাটা নামিয়ে ছেলেটাকে বার করে নিল সে বুকের তলা থেকে।

কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদ উঠে আসতে তখনো অনেক বাকি। তবু মরা মুখটা চোখের দৃষ্টিতে অনুভব করে নিতে তার এক নিশ্বাসও দেরি হল না। তার গায়ে যে কোত্থেকে কালো-কালো পিঁপড়ে বেয়ে উঠেছে তার চলন্ত সার পর্যন্ত তার চোখে পড়ল।

উপরের থেকে ছাই-পাশ কুটোকাটা কিছুটা সরিয়ে নিয়ে ডাস্টবিনের মধ্যে ছেলেটাকে বিভা গোর দিলে। তারপর বোঁচকাটা কুড়িয়ে নিয়ে হাওয়ার মত হালকা হয়ে বেরিয়ে গেল।

যদি দেবকুমার জিগগেস করে, ছেলে কোথায়, তখন সে না হয় বলবে, ভীষণ ঝঞ্ঝাট। তার মার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি।

কী করে সে বলবে, তাকে তো বাঁচাতেই পারিনি, বাঁচাতে পারিনি তার জন্মের সুনামটুকুও! তার লাল রক্ত কালো করে দিয়েছি।

৮১। ঘর কইনু বাহির

বিভাস বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝি। তাকাতে ভয় করে। ট্রাউজার্স আর শার্ট পরেই যাচ্ছে। গলায় টাই ঝুলছে। কোট বুঝি অফিসেই থাকে। কিংবা কোট বুঝি লাগে না আজকাল। নিয়ে যেতে অফিসের গাড়ি এসেছে বোধ-হয়। কী রকম টান হয়ে গটগট করে চলে যাচ্ছে দেখ না। এদিক ওদিক একটু চেয়ে দেখবার নাম নেই।

'এই শোন।'

বিভাস দাঁড়াল।

'একটা টাকা দিতে পারিস?' খুব আস্তে করে বললেন সুরেশ্বর।

পকেট থেকে পার্সটা বার করে ঘরগুলো দেখল বিভাস। বললে, 'খুচরো টাকা নেই। শুধু দুটো দশ টাকার নোট। কিছু ভাঙতি আছে। ভাঙতি দিলে চলবে?'

সুরেশ্বর কথা বললেন না। যেমন খবরের কাগজে চোখ দিয়ে ছিলেন তেমনি চোখ দিয়ে রইলেন।

'মাকে বলে যাই।' সারা বারান্দা আবার হেঁটে গিয়ে রান্নাঘরে মায়া-লতার সামনে এসে দাঁড়াল বিভাস। বললে, 'মা, বাবা একটা টাকা চেয়েছে। দিয়ে দিও।' বলে আবার গটগট করে বেরিয়ে গেল। নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

'তুই দিবিনে তো দিবিনে, সোজা চলে যা। বাহাদুরি করে আবার মাকে বলতে যাওয়া কেন?'

যা ভেবেছিল, যথাসময়ে মায়ালতা তেড়ে এল 'টাকা—টাকা দিয়ে কী হবে?'

সুরেশ্বর চুপ করে রইলেন।

'কী দরকার টাকার?'

কী একটা নিদারুণ খবর যেন এড়িয়ে গেছে এমনি তীক্ষ্ন চোখে খবরের কাগজের উপর ঝুঁকে পড়লেন সুরেশ্বর।

'দরকার তো আমার কাছে চাইলেই হয়।'

একবার মায়ালতার মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করল সুরেশ্বরের। বুড়ো বয়সের আরো অনেক লোভের মত এ লোভও দমন করলেন।

'নিজের টাকা থাকতে ছেলের কাছে কে হাত পাতে?'

নিজের টাকা! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি-ফেলি করেও ফেললেন না সুরেশ্বর।

রিটায়ার করার সঙ্গেসঙ্গেই থোক টাকাটা দিয়ে এই বাড়িখানা কিনেছিলেন সুরেশ্বর। নিচের তলায় ভাড়াটে ছিল, তাতে কী, উপরটা তো ফাঁকা পাওয়া গেল। একমাত্র ছেলে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সংসার, উপরের তিনখানা ঘরে কুলিয়ে যাবে আপাতত। পরে আস্তে-সুস্থে ভাড়াটেকে উঠিয়ে দিয়ে বসা যাবে বিস্তৃত হয়ে।

বাড়ি কিনে অল্প টাকাই ছিল ব্যাঙ্কে। কিন্তু আয় তো কিছু আছে এখনো। আছে মাসিক পেনসন আর বাড়িভাড়া। অবশ্য উপরালাকে চরম তুষ্ট করতে পারেননি বলে শেষ পর্যন্ত উন্নতিতে কনফার্মড হতে পারেননি, তাই পেনসনের টাকাটা যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হয়নি। দলের লোকেদের তুলনায় থেকে গিয়েছে বিকলাঙ্গ। আর ভাড়াটেও মান্ধাতার আমল থেকে চলে এসেছে বলে ভাড়াটাও কৃশকায়।

এ সমস্তই, মায়ালতার বিচারে, ডাহা অযোগ্যতা। নইলে শেষ ধাপে পৌঁছে চূড়োর সঙ্গে ঝগড়া করে কে? আর একটা ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করার মত যার হিম্মত নেই তাকে অথর্ব বলে না তো কী বলে!

'কতগুলো টাকার লোকসান!' সর্বক্ষণই হা-হুতাশ লেগে আছে মায়ালতার মুখে : 'পেনসনটা প্রমাণসই থাকলে ভাবনার কিছু ছিল না। মুখপোড়া ভাড়াটেটা যদি উঠে যেত তা হলে তিনগুণ ভাড়ায় অনায়াসে নতুন পত্তন হতে পারত। এক মুঠেই একরাশ সেলামি। ওঠো,' থেকে থেকে সুরেশ্বরের গায়ে ঠেলা মেরেছে মায়ালতা : 'একটা ফিকির বার করো না, এককালে তো কত-ডিসমিস করেছ, হতভাগাকে দাও না ঘোল খাইয়ে।'

সুরেশ্বর শুকনো মুখে হেসেছে : 'নিজে ডিক্রি-ডিসমিস করা এক কথা, পরের হাতে ডিক্রি পাওয়া বা ডিসমিস খাওয়া অন্য কথা।'

'তেমন যদি পুরুষ হতে হৈ-চৈ করেই তাড়িয়ে দিতে পারতে লোকটাকে।'

'আহা, কী যে বলো! এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ভদ্রলোক যাবে কোথায়?'

'যাবে কোথায়! তার জন্যে হতচ্ছাড়া আমাদের ঘাড়ে পড়ে থাকবে?' মায়ালতা সর্বাঙ্গে ঝেঁকে উঠল : 'অন্তত লোকটাকে মুখে বলতে পারো তো!'

'বলতে গেলে শোনে নাকি কেউ?'

'অন্তত একটা কথা-কাটাকাটির তো চান্স হয়।'

'কথা-কাটাকাটি থেকে মাথা-ফাটাফাটি। শেষকালে শ্রীঘর।'

'তা হলেও তো বুঝতাম একটা পুরুষের ঘর করছি।' ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছে মায়ালতা : 'এমন অক্ষম আর অপদার্থ দেখিনি কোথাও। জজ না হয়ে একটা পেয়াদা হলেই তো পারতে।'

'জজের চেয়ে পেয়াদার ক্ষমতা বেশি। পেয়াদা হতে হলে ভাগ্য চাই।'

তবু এরই মধ্যে সামান্য ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেছেন সুরেশ্বর। তাঁর ব্যাঙ্ক একাউন্টটা তাঁর ও মায়ালতার নামে একত্র করে নিয়েছেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে যে কেউ যখন খুশি লেনদেন করতে পারবেন।

'এটা ভালো হল না?' সন্তপ্তকে প্রবোধ দেবার চেষ্টায় বললেন সুরেশ্বর : এমন পর্যন্ত হয়েছে, ব্যাঙ্কে স্বামীর অগাধ টাকা মারা যাবার পর স্ত্রীর হাতে পয়সা নেই, শ্রাদ্ধ করতে পারেনা। স্বামীর টাকায় হাত দেবার অধিকার নেই, যেহেতু একাউন্ট শুধু স্বামীর নামে। সাকসেশান সার্টিফিকেট নাও, পরে টাকায় হকদার হবে। ততদিন শ্রাদ্ধ স্থগিত থাক!'

'কী সর্বনাশের কথা!'

'তার চেয়ে এটা ভালো হলনা? অন্তত ঐ দুরবস্থার হাত থেকে তো বাঁচলে! এ তুমি ইচ্ছেমত চেক কেটে টাকা তুললে, কারুর তোয়াক্কা রাখলে না, কাউকে দিতে হলে চেক ক্রশ করে দিলে, টাকা তুলতেও হলনা। ব্যবস্থাটা ভালো নয়?'

'মন্দ কী।'

সুরেশ্বর মায়লাতাকে সযত্নে শিখিয়ে দিলেন কী করে চেক কাটতে হয়।

তারপরে আর যায় কোথা!

মায়ালতা চেক আর পাশ-বই নিজের বাক্সে বন্ধ করল। যদি টাকা তুলতে হয় আমি তুলব, তোমার তোলবার কী দরকার!

'না, আমার আর কী দরকার!' কান চুলকোলেন সুরেশ্বর।

'তোমার দরকার পড়বে মরে গেলে, শ্রাদ্ধের সময়। সে আমি বুঝব।'

মায়ালতা এটা ধরে রেখেছে সুরেশ্বরই আগে মরবেন।

'ধরব না কেন?' ঝটকা দিয়ে বলে উঠল মায়ালতা, 'যে আগে জন্মায়, সেই আগে মরে।'

তা মরুক, কিন্তু ব্যাঙ্কে নতুন টাকার আমদানি কই? সামান্য যা আছে তা আছে, কিন্তু জমার ঘরে নতুন টাকা না পড়লে চেক কেটে সুখ কই মায়ালতার? যা আছে তাই যদি সে তুলে তুলে শেষ করে দেয়, তবে তো শ্রাদ্ধ দূরের কথা মুখাগ্নিও হবে না।

তাই জমার ঘরে আমদানি বাড়াও।

ভাড়ার টাকাটা মায়ালতা নগদ পায় আর তা তো সংসারই পুরো গ্রাস করে। পেনসনের টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। কিন্তু মায়ালতা সেটা পুরো তুলতে চায় না। যদি সেটাও সম্পূর্ণ তুলে আনে তা হলে সেটাও সংসার আত্মসাৎ করবে। তা হলে রইল কী মায়ালতার? তা হলে ঢং করে আর জয়েণ্ট একাউন্ট খোলা কেন?

টানাটানি তবু যায় না কিছুতেই।

কত ব্যয়সংক্ষেপ হয়েছে, তবুও না। শার্ট কোট প্যাণ্ট উঠে গেছে— দর্জির খরচ বলতে কিছু নেই। ধোপাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আগে-আগে

জুতোর কালিই বা কত লাগত। এখন তো জুতো স্বাভাবিক হয়ে রয়েছে। আগে আগে লোকজন আসত, চায়ের পেয়ালার চাকচিক্য ছিল। এখন চায়ের পেয়ালার ডাঁটি ভেঙে গেলেই তো সামঞ্জস্য থাকে, আর যদি পেয়ালার বদলে কাঁচের গ্লাস আসে, তাও বা বেমানান কোথায়। বলে, চায়ের কাপ রিটায়ার করেছে। কদিন পরে গ্লাশের বদলে খুরি আসে কিনা তাই দেখ। তার মানে, বাজার কঠিন হলে আরো হাতটান। আগে-আগে ইংরিজি-বাংলা দুখানা খবরের কাগজ আসত, এখন ইংরিজিখানা উঠে গিয়েছে। কাগজ-কালি-কলমও ওঠার মধ্যে। আগে-আগে ক্বচিৎ কখনো বই-টই কেনাকাটা ছিল, সে এখন স্বপ্নের কথা। যদি পড়তে চাও তো, মায়ালতা যে আট আনা চাঁদা দিয়ে লাইব্রেরির মেম্বর হয়েছে সে লাইব্রেরি থেকে মায়ালতার ফরমাসমত গল্প-উপন্যাস নিয়ে এস আর, মায়ালতা ছুটি দিলে, তাই একটু নাড়ো-চাড়ো। তাই লেখাপড়ার খরচ বলতেও না থাকার মধ্যে। আগে এক প্রধান খরচ ছিল সিগারেট। দিয়ে থুয়ে দিনে আগে তিন প্যাকেটে হত। এখন তো দেওয়া নেই, তাই এক প্যাকেটই যথেষ্ট। আর রিটায়ার করার পর সিগারেটেরও জাতে পতিত হওয়া বিধেয়। আর বাজার আরো চড়া হলে সিগারেট যে খাকির পোশাক পরে আসবে তার জন্যে সুরেশ্বর প্রস্তুত।

এমনি এক কলে-ইঁদুর-পড়া অবস্থায় সুরেশ্বর বলেছিলেন : 'পেনসনের গোটা টাকাটাই তুলে নিলে পারো। আমার একটা হাত-খরচের টাকা হয়।'

'হাত-খরচ? তোমার কোন খরচ মেটানো হয়না শুনি? এর উপর আবার কিসের জন্যে দরকার?' মায়ালতা তুমুল করে ছাড়ল : 'টাকা নিয়ে কোথাও যাবে নাকি লুকিয়ে?'

কতক্ষণ চুপ করে ছিলেন সুরেশ্বর। পরে বললেন, বলবেন না বলেই ঠিক করেছিলেন, তবু বললেন 'পেনসন থেকে সেভিং হয় কোনোদিন শুনিনি।'

'শুনবে কেন? এবার দেখ। তেমন হাতে পড়লে হয়।' মায়ালতা চলে যাচ্ছিল, বিষ সম্পূর্ণ ঢালা হয়নি বলে আবার ফিরল : 'কী আমার পেনসন আর কী আমার সেভিং। সব মেরে দিলে নগদ কটা টাকা আর আমার জন্যে রেখে যাবে শুনি? যখন তোমার হাত-খরচের জন্য টাকার দরকার, তখন ফের আরেকটা চাকরি নাও। যাও, ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দরবার করো।'

কী কুক্ষণে কথাটা তুলেছিলেন সুরেশ্বর, কেঁচো হয়ে রইলেন।

কিন্তু সেই থেকে মায়ালতা এক মন্ত্র জপাতে লাগল অনুক্ষণ : 'ওঠো, বেরোও, এর-ওর বাড়ি গিয়ে দেখা করো। একটা কিছু বাগিয়ে নাও। আউট হয়ে যাবার পরেও যদু মধু সবাই আবার মাঠে নামছে, তুমি কেন দলছাড়া হয়ে থাকবে? ওকে দিলে আমাকে দেবেন না কেন, এই যুক্তিতে আদায় করে ছাড়বে। নাও, ওঠো, দাড়ি কামাও।'

চিরকাল তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে কেটেছে। রিটায়ার করার পর, সুরেশ্বর ভেবেছিলেন, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকবেন প্রাণ ভরে, দেয়ালের ঘড়িতে

একটার পর একটা বেজে গেলেও চঞ্চল হবেন না। কী শান্তি, কোমরে আর বেল্ট আঁটতে হবে না, জুতোয় নিচু হয়ে বাঁধতে হবে না ফিতে, আর গলায় পরাতে হবে না সেই দুর্ধর্ষ 'কলার'। কী না জানি করলাম, কী না জানি করিনি, কী না জানি করা উচিত, সর্বক্ষণ কাটবে না এই বিবেকের উদ্বেগে। ঘুমুতে পারবেন নিশ্চিন্ত হয়ে। জাগতে পারবেন নির্মলতায়।

'কই, উঠলে?' ঘরে ঢুকে ফ্যান বন্ধ করে দিল মায়ালতা।

তবু যদি আরো গড়িমসি করতে চান সুরেশ্বর, মশারির চার কোণ খুলে দিয়ে মায়ালতা তাঁকে পল-চাপা দেবার ব্যবস্থা করবে।

সুতরাং বাধ্য ছেলের মত উঠে পড়ো।

তবু এক-আধবার বলেছেন সুরেশ্বর, 'আর গোলামি করব না।'

'এত সব যারা চাকরি করছে, গোলামি করছে?'

'তা ছাড়া আবার কী!'

'মোটেই না, দেশসেবা করছে।'

'নিজের পেটের সেবা করছে। পেটের সেবাই দেশসেবা। আমি না বাঁচলে আবার দেশ কী!'

'তবে সবাই যা করছে তুমিও তাই করবে।'

'তবু উচ্চের গোলামি সহ্য হয়, তুচ্ছের গোলামি সহ্য হয় না।'

ও সব কোনো যুক্তিই শোনবার মত নয়। মোটকথা টাকা চাই, আর টাকা মানেই আরো টাকা। সুতরাং ক্লৈব্য ত্যাগ করে ওঠো, বেরিয়ে পড়ো। মায়ালতার ব্যাঙ্ক একাউন্টের সম্মান রাখো।

'সন্ধেয় মঠে-মন্দিরে যাই পাঠ-ঠাট শুনতে, কখনো বা কোনো সভা-সমিতিতে,' মায়ালতা আপশোষ করে : 'কত ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হয়, সবাই কেমন স্বামীর নামে উজ্জ্বল হয়ে আছে, অমুক স্পেশাল অফিসরের, অমুক জয়েন্ট সেক্রেটারির, অমুক ট্রাইবিউন্যাল জজের স্ত্রী—আর আমি? কিছু বলতে-কইতে পারি না, লজ্জায় মাটি হয়ে থাকি। অনেক চাপাচাপি করলে বলি, রিটায়ার করেছি। সবাই কপালে চোখ তুলে বলে, সে কী, এরই মধ্যে রিটায়ার করেছেন? মুখখানি এখনো পুরন্ত, শরীর দিব্যি আঁট-সাঁট, এখুনি পাততাড়ি গুটোবেন কী! একটা কিছু ধরে আবার ঝুলে পড়ুন। শেকড় গেলে কী হয়, ঝুরি তো আছে।' এবার বুঝি কথা নাকের ভিতর দিয়ে আসতে থাকে : 'কিন্তু আমার দুঃখের কথা কে বোঝে, কাকে বা বলি। কী এক অপদার্থ অকর্মণ্যের হাতে পড়েছি। সব মুছে-টুছে বিধবা সেজে বসেছি স্বামী থাকতে।'

অগত্যা বেরোতে হয় সুরেশ্বরকে। এ দরজায় ও দরজায় গিয়ে ধন্না দিতে হয়। বোকা-বোকা মুখ করে বসতে হয় জড়সড় হয়ে।

বলা বাহুল্য কিছুই হয় না। হয়তো বা সুরেশ্বরের নিজের জন্যেই হয় না। চোখে মুখে আনতে পারে না দীনহীন কাঙাল-কাঙাল কাকুতি।

পায়ে-পড়া ব্যাকুলতা। চাকরি না পেলে মরে যাব শেষ হয়ে যাব এই নিঃশব্দ আর্তনাদ।

সারা জীবন চাকরি করে এসে শেষ জীবনে আবার এই চাকরির উমেদারি—পার্কের রেলিঙ ধরে হাঁপ নেন সুরেশ্বর।

বাড়ি ফিরেও সুখ নেই। আবার তাড়া। আবার গলাধাক্কা।

'দুপুরে অফিসে গিয়ে হয়নি, সকালে-সন্ধেয় এবার বাড়িতে যাও। আমি পয়সা দিচ্ছি, ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে নাও না-হয়।'

আগে ঘড়ি তাড়া দিয়ে ফিরেছে এখন থেকে তাড়া দিচ্ছে মায়ালতার ধমক।

'তোমার না দুপুর দুটোয় সময় দেখা করবার কথা?' মায়ালতা হুমকে ওঠে : 'এখুনি শুয়ে পড়লে কী।'

চোখে একটা জান্তব অসহায়তা নিয়ে সুরেশ্বর বললেন, 'একটুখানি গড়িয়ে নি। এই একটুখানি। ঠিক সময়ে উঠে পড়ব দেখো।'

'না, বিশ্বাস নেই। ঘুম সব কিছু ভণ্ডুল করতে পারে। তা ছাড়া দুপুরের ঘুমে মুখ ভীষণ বোদা দেখাবে, একেবারেই স্মার্ট লাগবে না।' প্রায় চাবুকের হাত তোলে মায়ালতা : 'উঁহু, চলবে না গড়ানো। উঠে পড়ো।'

অগত্যা উঠে পড়তে হয় সুরেশ্বরকে।

'এ কী দাড়ি কামাবার ছিরি! চোয়ালের নিচে সব রয়ে গিয়েছে।' সাজাগোজায়ও মনোযোগ দেয় মায়ালতা : 'আর যাই করো সঙ্গে ঐ ছাতাটা নিও না।'

'নইলে রোদ্দুরে মাথা ধরে যে।'

'ছাই ধরে।' ঘৃণায় কিলবিল করে ওঠে মায়ালতা : 'এইটুকু সহ্য করতে না পারলে আর পুরুষ কী!'

'চাপরাশি তো আর নেই। এই ছত্র সিংই এখন চাপরাশি।' লঘু হবার চেষ্টা করেন সুরেশ্বর, আদরের ভঙ্গিতে তাকান ছাতার দিকে।

'ঐ ছাতাটা দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারো।'

অগত্যা ছাতাটাকে রেখে যেতে হয়।

রোদে-জলে ষাঁড়ে-কুকুরে ছাতাছাড়াই সুরেশ্বরের গতায়াত। কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল। সমস্ত পাথরে কোপ। সুরেশ্বর ছাড়া দেশসেবা হচ্ছে না এমন কোথাও কারু বিন্দুবিসর্গ ভাব নেই।

তবু, গরু শিং ছাড়লেও মায়ালতা তাড়া ছাড়ে না।

'ওঠো, নিজের ডিপার্টমেণ্টে না হলে না হবে, মার্কেটে আরো ঢের-ঢের চাকরি আছে। দেবা মিত্তির তো তোমারও সিনিয়র। ডিপার্টমেণ্টে না পেয়ে কর্পোরেশনে ঢুকেছে।'

'দেখি—'

বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই যেন সুরেশ্বরের মুক্তি। গড়ের মাঠে, দুপুরে, যারা গাছতলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, তাদের দিকে শ্যামল স্নেহে

তাকিয়ে থাকেন সুরেশ্বর। ইচ্ছে করে ওদের শান্তির সমতলে তিনিও অমনি শোন পাশাটিতে, ঘুমিয়ে পড়েন।

কখনো কখনো বা একটু কোমলের দিকে যায় মায়ালতা। বলে, 'দাঁড়াও, তোমার সামনের এই পাকা চুল কটা তুলে দিই।'

বাঁশি-ভোলা হরিণশিশুর মত এগিয়ে আসেন সুরেশ্বর। কিন্তু সামনের চুল তুলতে গিয়ে মায়ালতা হঠাৎ জুলপির চুল ধরে টান মেরে বসবে এ কল্পনাও করতে পারতেন না। সুরেশ্বরের চোখে জল এসে যায়।

কিন্তু ভবী কিছুতে ভোলে না।

'কর্পোরেশনে না হোক, কোনো কোম্পানির ম্যানেজারি পাও না? বড় বাজারে ঘোরো না দিনকতক।'

কখনো-কখনো কোথাও একেবারে যানই না সুরেশ্বর। হাটে কলা, নৈবেদ্যায় নমো করে বসে থাকেন পার্কে। বসে-বসে, যা এতদিন দেখেননি চাকুরে জীবনে, দুপুর দেখেন, দুপুরের রোদ দেখেন।

সন্ধের দিকে বাড়ি ফেরেন গরুচোরের মত মুখ করে।

'কিছু হল?'

মুখেই তা প্রকাশ পায়, কথায় আর বলতে হয় না।

'তোমার দ্বারা আবার হবে? তুমি অকর্মার ঢেঁকি, ষাঁড়ের গোবর—' শেষে একেবারে মর্মমূলে ঘা মারে মায়ালতা : 'নইলে জজিয়তিতে কনফার্মড হও না—'

তবে ছেড়ে দাও। আমি মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকি।

না, ছাড়বে না মায়ালতা। চাকরি না পাও একটা ইস্কুল-মাস্টারি?

মন্দ কী। তাও তো মানুষে করে!

'কিন্তু আমি কি মানুষ?'

একটু বুঝি মায়া হয় মায়ালতার। বলে, 'আমার কী! তোমার ভালোর জন্যেই বলা। বাড়িতে ঠায় বসে থাকলে শরীর ভেঙে যাবে। কাজেকর্মের মধ্যে থাকলেই বরং ভালো থাকবে, বাহাত্তুরেয় পাবে না। নিষ্কর্মার আর কাজ কী! শুধু আহার, নিদ্রা আর ক্রোধ।'

হায়, ক্রোধ কবে গেছে দেশান্তরী হয়ে।

লোকে তো একটা প্রাইভেট টিউশানিও পায়? তাই দেখ না চেষ্টা করে।

'কাকে পড়াব?' প্রায় আকাশ থেকে পড়বার মত মুখ করলেন সুরেশ্বর।

'তা খুঁজেপেতে দেখ না। কত লোকের তো গার্ডিয়ান টিউটার থাকে—'

'তা থাকে। কিন্তু আমি পড়াব কী।'

'পড়াবে আমার মুণ্ডু।'

'কিছু কি লেখাপড়া শিখেছি যে পড়াব বলে সাহস করব?'

'তবে কিছুতেই যখন আয় বাড়াবার মুরোদ নেই, তখন,' মায়ালতা ডান হাতের বুড়ো আঙুল দেখাল : 'তখন হাতখরচ না, এই।'

আয়ের পথ মায়ালতাই বার করল। একটা চাকর ছিল, তাকে তুলে দিয়ে মায়ালতা ঝি রাখল। চাকর সুরেশ্বরের দু-একটা ফুট-ফরমাস খাটত, স্নানের আগে তেল মাখিয়ে দিত, টিপে দিত গা হাত-পা, সেটা বন্ধ হল। যার আয় নেই তার আবার আরাম কিসের? চাকরের চেয়ে ঝি-এর খরচ কম, আর দৈনিক বাজারটা যদি এখন সুরেশ্বর করেন, তা হলে আরো সাশ্রয় হয়।

তার অর্থ বাড়িতে চাকর দিয়ে মাসাজ না করিয়ে বাজারের ভিড়ে গিয়ে দলাইমলাই হোন।

'নাও, ওঠো, চাকর নেই, বাজারটা করে আনো।' মায়ালতা একটা জলজ্যান্ত পরোয়ানা হয়ে ওঠে : 'ফর্দ করে লিখে নাও, যেন ছেড়ে না আসো।'

ফর্দ করে লিখে নিলেন সুরেশ্বর। আইটেম তো বেশি নয়, লিখে না নিলেও চলত, এমনি করুণ করে তাকালেন। কে জানে কী, স্মৃতিশক্তি বলে তো কিছু আর আশা করে না ঐ গোবরভরা মাথার মধ্যে, তাই মায়ালতা সাবধান হয়। বলে, দরটাও পাশে-পাশে লিখে নাও।

এ মন্দ হয়নি একরকম। প্রিভিসেসর-ইন-অফিস বরখাস্ত চাকরটাকে মনে-মনে প্রণাম করলেন সুরেশ্বর। ওর দেওয়া দরটাই ফর্দে তুলে দিয়েছে মায়ালতা। তাতে প্রায় পাঁচ-ছ আনার ব্যবধান।

প্রথম দিন চুরির পয়সা দিয়ে গরম-গরম জিলিপি খেলেন সুরেশ্বর। খোলা থেকে নামছে এমন জিলিপি কতদিন খাননি। দ্বিতীয় দিন দেখলেন কাঁচের বোয়মে সদ্যভাজা ভেজিটেবল চপ। তাই খেলেন একটা আর তৃতীয় দিন—তৃতীয় দিনই ধরা পড়লেন।

'ঐ কাপড়টা ছেড়ে এই কাপড়টা পরো।' মায়ালতা হুকুম জারি করল : 'ধোপা এসেছে।'

বাঁচানো পয়সা কটা পকেটে রাখলে বেজে উঠতে পারে ভেবে সতর্ক হয়েই ট্যাঁকে গুঁজেছিলেন সুরেশ্বর, এখন কাপড়টা ছাড়তে যেতেই বিশ্বাস-ঘাতকেরা মেঝের উপর পড়ল ছত্রখান হয়ে।

'এ পয়সা এল কোত্থেকে?'

'বাজার থেকে বাঁচিয়েছি।'

'বাঁচিয়েছ তো, আমাকে ফেরত দাও নি কেন?'

'এই তো যাচ্ছিলাম দিতে।'

'যাচ্ছিলে তো ট্যাঁকে গুঁজেছ কেন?' মায়ালতা আর আচ্ছাদন মানল না, যা চাকরকে বলতেও সাহস পেত না তাই বলল : 'চোর কোথাকার!'

ম্লান চোখে হাসলেন সুরেশ্বর : 'নিজের টাকা নিজে নিলে চুরি করা হয়?'

'হয় না? চোরের বেলায় স্বত্বের কথা কী, দখলের কথা।' মায়ালতা ঝলসে উঠল : 'আমার দখল থেকে সরিয়ে নিচ্ছ পয়সা, আমার অনুমতি না

নিয়ে, অন্যায়রূপে লাভবান হবার জন্যে। চুরি নয়? আইনের এই রকম জ্ঞান বলেই তো কিছু হল না। শুধু চোর? চোরের বেহদ্দ—বাটপাড়।'

চোরাই মাল, রদ্দি কটা নয়া পয়সা, মায়ালতা কুড়োল মেঝের থেকে। কুড়িয়ে বাঁধল আঁচলে।

সদ্য-সদ্য খরচ করে এলেই পারতেন, নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন সুরেশ্বর। জানেন সঞ্চয়েই যত অনর্থ, তবু সেই সঞ্চয়ই করতে গেলেন।

চাকরিতে কনফার্মড হতে পারলেন না সুরেশ্বর। বাজার ঝি-এর হাতে চলে গেল। জুনিয়র এসে সুপারসিড করলে।

তবু কি রেহাই আছে?

'এই, ওঠো, ধোপাকে তাগাদা দিয়ে এস।'

'কই উঠলে, গেলে ইলেকট্রিক মিস্তিরির কাছে?'

'গতরখানা একবার নাড়াও, বিভাসের নামে মানত আছে, পুরুতঠাকুরকে খবর দাও।'

সুরেশ্বরকে মায়ালতা শুকনো সেরেস্তায় বদলি করেছে, যেখানে শুধু খাটনি—মান নেই মুনফা নেই, পোষানি নেই এক কণা।

শুধু তাড়ার পরে তাড়া। বল মা 'তাড়া', দাঁড়াই কোথা?

'এই, ওঠো, গয়লা দুধ দুইছে, দাঁড়াবে এস।'

'কই উঠলে, কয়লাটা মেপে নাও।'

'শোনো, বেরুচ্ছি, এসে যেন দেখি ওষুধটা এনে রেখেছ।'

হতশ্রদ্ধার মধ্যে এমনি করেই দিন যাবে?

না, ভাগ্য মুখ তুলে চাইল। ফক্স কোম্পানিতে বিভাসের সাহেবি গ্রেড চাকরি হল। স্টার্টিঙএই সাড়ে চারশো।

আহ্লাদে আটখানা হলেন সুরেশ্বর। আশার দোকান দিয়ে বসলেন। এবার তা হলে সচ্ছল হবে সংসার। সুরেশ্বরের হাতে আসবে এখন হাত-খরচ।

'না বিভাসের মাইনের এক টাকাও এ সংসারে যাবে না। এ সংসার তোমার।' ফরমান জারি করল মায়ালতা।

'তবে ওকে সংসারী করো।'

'তাই করব। তোমাকে বলতে হবে না। তার আগে ভাড়াটে তাড়াও। জায়গা খোলসা করো।'

বিভাস মাতৃভক্ত। জীবনে অনেক উন্নতি করবে। মাইনে থেকে মাকে মাস-মাস পঞ্চাশ টাকা হাত-খরচ দেয়। বাবাকে দেবার কী দরকার—বাবার তো পেনসনই আছে। কিন্তু সে পেনসনের কী হাল তা দেখেও দেখতে চায় না। মাইনের বাকি টাকা নিজের হাত-খরচ বাদ দিয়ে এখানে ওখানে সঞ্চয় করে। ইনসিওরই করেছে কুড়ি হাজার। মায়ে-পোয়ে এক জোট।

একটা টাকা চাইলাম, ভাঙানি নেই বলে দিল না। ভাঙানি নেই তো, দশ

টাকার একটা নোটই দিয়ে যা। দশ টাকা দিলে কি আর চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হত? বেশ তো, নেই, দিলিনে, কিন্তু তোর মাকে বলে যাবার কী দরকার? তোর মাকে এখন সামলাই কী করে?

সুরেশ্বরের মনে হল ওরা মায়ে-পোয়ে মিলে ঠেঙিয়ে একদিন মেরে ফেলবে তাঁকে। বুড়ো গরুর বিয়েন শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন এটাকে কসাইয়ের হাতে তুলে দাও।

'কই, বললে না তো টাকার কী দরকার!' মায়ালতা খেঁকিয়ে উঠল।

'বিভাসের ঐ সম্বন্ধটার জন্যে শ্যামবাজারে যাবার কথা ছিল না, তারই ট্রাম ভাড়া।'

'সে তো শুক্রবার—আজ কী?'

'ও, শুক্রবার নাকি? আমার খেয়াল ছিল না—'

'আর সে ট্রাম ভাড়া আমি দেব। তুমি খোকার কাছে চাইতে গেলে কোন লজ্জায়?'

'না, না, তা হলে ঠিক আছে। আর চাইব না কোনোদিন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন সুরেশ্বর।

মনে-মনে প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান, বিভাসের বউ যেন দজ্জাল হয়, মুখরা হয়, শাশুড়িকে যেন ছেঁচা দেয়, কোণঠাসা করে, আর অপমানে জর্জর হয়ে সেদিন যেন সুরেশ্বরের কাছে খুব আপন হয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে এসে বসে। স্বামীর থেকে স্নেহ নেয়, উপশম নেয়।

মাকে বলে যাই! তর্জন-তাড়ন ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থাই করল না মায়ালতা।

'একবার কোর্টে যেও।' উপদেশ দিয়ে গেল পালটা।

'আজ তো দিন নয়।' ভয়ে-ভয়ে বললেন সুরেশ্বর।

'দিন না হোক, তবু ঘুরে আসতে ক্ষতি কী। তদবির কিছু আর লাগবে নাকি জিজ্ঞেস করতে পারো উকিলকে।'

'যাব।'

বিকেলে, যেমন যান, পার্কে গেলেন সুরেশ্বর। কিন্তু যে বেঞ্চিতে বসেন আজ সেদিকে গেলেন না, দূরে-দূরে ঘুরতে লাগলেন। ছোটর দল বেঞ্চির চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল, দাদু কই, লজেন্স কই! দাদু কই, টফি কই? দাদু কই, কই আমাদের ডাবল-বাবল?

ঐ, ঐ দাদু। কেউ-কেউ বুঝি দেখতে পেয়েছে দূর থেকে। ছুটে পাকড়াও করেছে। জামার পকেট ধরে টানাটানি করছে। দাও, দাও, ওরা না আসতে আমাদের দিয়ে দাও চকোলেট। দিয়ে দাও ললি-পপ।

ছলছলে চোখে সুরেশ্বর বললেন, 'আজ কিছু আনতে পারিনি।'

ছেলেমেয়ের দল বিশ্বাস করতে চায় না। পকেট হাতড়াবার জন্যে হামলা করে। সত্যিই নেই। সত্যিই আনতে পারিনি।

'আনতে পারোনি তো এসেছ কেন?'

এই কথাটাই ভাবতে-ভাবতে বাড়ি ফিরলেন সুরেশ্বর। 'আনতে পারোনি তো এসেছ কেন?' সঙ্গে করে যদি সৌভাগ্য আর সাফল্য আনতে পারিনি তবে এসেছি কেন পৃথিবীতে? কোন কর্মে লাগতে? এসেছ কেন? যখন জানো দুই হাত শূন্য, তখন কেন এসেছ, কোন অহঙ্কারে? এসেছ শুধু নয়, থাকছ, ঘোরাফেরা করছ। কেন, কেন?

বাড়ি এলে মায়ালতা জিজ্ঞেস করল, 'সিনিয়র যে দিলে, কী বলছে?'

'বলছে আশা কম।'

'কেন, কম কেন?' ঝিকিয়ে উঠল মায়ালতা।

'ঘর দরকার, সেইজন্যেই তো উচ্ছেদ চাই। সিনিয়র বলছেন, উপরে আপনাদের তিনখানা ঘর আছে, তিনখানাই তো যথেষ্ট।'

'যথেষ্ট? এ কী রকম সিনিয়র?'

'বলছেন, তিনটি মোটে আপনারা প্রাণী, বিয়ে করে বউ নিয়ে বিভাস একখানা ঘরে থাকতে পারে অনায়াসে। তার জন্যে নিচের ঘরের দরকার নেই।'

'দরকার নেই? আধুনিক দম্পতি একখানা ঘরে কুলিয়ে উঠতে পারে?'

'বলছেন, আপনি আর আপনার স্ত্রী যদি এক ঘরে থাকেন তবে তৃতীয় ঘরটাও তো বিভাস নিতে পারে বিয়ের পর।'

'আমি আর তুমি এক ঘরেই তো আছি, তাই বলে, তুমি একটা এক্স-জজ, তোমার একটা বৈঠকখানা চাই না?' অশেষ কৃপার চোখে সুরেশ্বরের দিকে তাকাল মায়ালতা। বললে, 'এ সিনিয়রে চলবে না। তুমি হাইকোর্ট থেকে উকিল আনো।'

'দরকার-ব্যাপারটা দু পক্ষে তোল করে দেখতে হবে কিনা। আমি না, উকিল বলছেন, আইন বলছেন,' অপরাধের মত মুখ করলেন সুরেশ্বর : 'যেখানে আমাদের তিনজন্যের জন্যে তিনখানা, সেখানে নিচে দশজনের জন্যে তিনখানা। ওদের দরকারটাও তো আইন দেখবে।'

'ছাই দেখবে। তুমি ব্যারিস্টার লাগাও।' রি-রি করতে লাগল মায়ালতা : 'আধুনিক দম্পতিকে এক ঘরেই আবদ্ধ করে রাখতে চায় এ আইন আইনই নয়। আর বাপ যতক্ষণ না ছেড়ে দিচ্ছে ততক্ষণ তার বসবার ঘরটা ছেলে দখল করে কী করে? ছেলে কি জবরদস্ত হয়ে বাপকে তাড়াবে? তুমি বিলেতফেরত ব্যারিস্টার লাগাও, দেশী ব্র্যাণ্ডের কাছে যেও না, বিলেতফেরতই বুঝবে আধুনিক দম্পতির তাৎপর্য।'

'তাই লাগাব।'

শুনানির দিন সকাল থেকেই মায়ালতার তাড়ার ঘন্টা বেজে চলেছে। উঠলে? ঘুম ভাঙল? ওঠো, দাড়ি কামাও। স্নান করে এস। পুজো সারো চটপট। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। অত আজ বিতং করে খেতে হবে না। দইয়ের ফোঁটা নাও। পূর্ণঘট দেখে যাও।

ঠিক সময়েই রওনা করিয়ে দিয়েছে মায়ালতা। দুষ্টু ভাড়াটের অনেক মুলতুবি নেওয়ার পর আজ শেষ দিন নির্ধারিত।

কথা আছে, কোর্টে গিয়ে সুরেশ্বর যদি বোঝেন শুনানি হবে, বিভাসের অফিসে ফোন করে দেবে, সে যেন এসে হাজিরা দেয়। উকিল বলেছে, বাপ আর ছেলের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

সেই উদ্দেশেই সুরেশ্বর চলেছেন কোর্টে। আর সর্বক্ষণ মনে-মনে প্রার্থনা করছেন, ভগবান, মামলায় যেন হার হয়। গরিব ভাড়াটেকে যেন উৎখাত হয়ে অতগুলি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বেরুতে না হয় রাস্তায়। ধারে-কর্জে-খরচে না তল হয়ে যেতে হয়। উপরে তিনখানা ঘরে মায়ালতার আর বিভাসের আর তার নতুন বধূর স্থান হয়ে যাবে।

চিরকাল এজলাসেই বসেছেন সুরেশ্বর, আজ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন!

প্রায় একটার সময় বিভাস ফোন পেল, শিগগির কোর্টে চলে এস।

ট্যাক্সি করে চলে এল বিভাস। কী, ব্যাপার কী?

'কই, তোমার বাবা সুরেশ্বরবাবু তো আসেননি কোর্টে।'

'আসেননি?'

'না। মামলা ডিসমিসড ফর ডিফল্ট হয়ে গিয়েছে।'

'সে কী সাংঘাতিক কথা। আসেনইনি কোর্টে।' নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগল বিভাস : 'বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরলে, এ রকমই হয় বোধ হয়।'

ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি এল বিভাস।

বললে, 'বুড়ো কোর্টেই যায়নি। মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে।'

'সে কী!' মায়ালতা দেয়াল ধরে সামলাল নিজেকে।

'রাস্তায় কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো।'

রাস্তায় নয়, রেল লাইনের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে।

সনাক্ত করতে দেরি হল না। পোস্টমর্টেমও এড়ানো গেল। ঘর-ঘর করে ঘুরছে, ঘুরছে ঘরের খোঁজে, এমনি একটা পাগলামির ছিট ছিল মাথায়, এটাও পুলিশকে বোঝাতে বাধল না। পুলিশ ছেড়ে দিল।

খণ্ড বিখণ্ড দেহটা ঢাকা, শুধু মুখটা বাইরে বার করা, ঘুমে স্নিগ্ধ প্রশান্ত সে মুখ, খাটিয়াটা তোলা হল দোতলার বারান্দায়।

'এখানে কেন?' গর্জে উঠল মায়ালতা : 'নিয়ে যাও নিচে, বাইরে। চিরকাল তাড়িয়েছি, ঘরের বার করে দিয়েছি। আজ আবার সখ করে উঠে এসেছে কেন? নিয়ে যাও। চলে যাও। বেরিয়ে যাও। এখানে আসবার দরকার নেই। না, নেই। কিছুমাত্র না। কোনো ব্যবস্থার ত্রুটি রাখেনি। বাড়ি দিয়েছে, জয়েন্ট একাউন্ট দিয়েছে, ঘর খালি করে দিয়েছে। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, বলছি—'

সিঁড়ি দিয়ে আবার নামিয়ে নিল খাট।

চকিতে ছুটে এল মায়ালতা। বললে, 'একটু দেখি।'

কপালের থেকে মাথার চুলগুলি আস্তে তুলে দিল মাথায়। কানে-কানে বলার মত করে বললে, 'বিদেশে ট্রান্সফার হয়ে চলেছ। তুমি তো জানো, ছ-মাস পর্যন্ত স্ত্রীর টি-এ ভ্যালিড থাকে। এই ছ মাসের মধ্যেই নিয়ে যাবে আমাকে। টি-এ খেলাপ করবে না। ভুলবে না কিন্তু। জীবনে যত বারই তুমি হারো, শেষবার হারলে না। হেরেও জিতিয়ে দিলে মামলা। ঠিক নিয়ে যেও আমাকে। আমিই তোমার বিল-এর হিসেব নিখুঁত করে রাখব।'

৮২। মুচি-বায়েন

সব যাক, কিন্তু নামটুকু যেন না যায়। দেবতাগোঁসাইয়ের কাছে কত মিনতি করেছে, বিমুখ হয়ো না বাবা। অভাবে অসম্ভাবে থাকি, থাকব, কিন্তু নামটুকু যেন বজায় থাকে। গায়ে-বাছুরে সুখ থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়। যদি নামটুকু থাকে, হাতটুকু থাকে, তবে পয়সায় টানা পড়বে না কোনো দিন। হেই বাবা রুদ্দু দেব!

চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খেয়েছে আজ ভোলানাথ। রোজগারের পয়সা দিয়ে কাঁচি মদ কিনে খেয়েছে। থমথমে পায়ে বাড়ি ফিরেছে সনজেবেলা। নিঝ্‌ঝুমের মত।

নিশ্চয়ই দেখতে পাবে গোরাশশী ঘরে নেই। ঘরে তালা লাগিয়ে আঁচলে চাবি ঝুলিয়ে গেছে নিশ্চয়ই পাড়া বেড়াতে। বা, কারু ঘরে রসবিলাসের গল্প করতে। ঢুলন করতে।

এমন সময় ফেরবার কথা নয় ভোলানাথের। এবারে, এত দিনে, ঠিক ধরে ফেলবে কোরকাপ।

আর যদি একবার ধরে ফেলতে পারে—ভোলানাথের চোখ দুটো ঘুরন দিয়ে উঠল। গায়ে এল যেন বুনো দাঁতালের গোঁ।

যা ভেবেছিল। গোরাশশী ঘরে নেই। দরজা হাট করা। কাঁথা মুড়ি দিয়ে ছেলেটা ঘুমুচ্ছে অবেলায়। বোধ হয় জ্বর এয়েছে। আর সেই ফাঁকে—

'বাড়ি থেকে একবার বার হলে ঘরকে ফিরতে আর মনে সরে না, লয়?'

গোরাশশীর কান বড় খর। কাঁধ থেকে ঢোল নামিয়ে রাখতেই শব্দ পেয়েছে। ঘাটে গিয়েছিল সে বাসন মাজতে। ফিরতে তার এক পলক দেরি হল না।

'ফিরতে রাত হবে কথা ছিল। কিন্তুক—' ভোলানাথের গলাটা কেমন

ধরে এল। রাগ-বিরাগের ছোপ চলে গিয়ে মনে লাগল মন-খারাপের ছোঁয়া। বললে, 'আমি বাড়িতে না থাকলে তুর বেশ মজাই হয়, লয় বৌ?'

'ক্যানে?'

'আমি না থাকলে ইদিক-সিদিক করতে পারিস আধেক খানেক—'

'ক্যানে? আমার মন থাকলে তু কি বাড়িতে বসে আগলাতে পারিস? তুইই তো মাঠে-ঘাটে শহরে-বাজারে ঘুরে বেড়াস, কুথা কুন কীত্তিকম্ম করিস তা কে জানে?'

'না, ঝগড়া করবে না ভোলানাথ। গোরাশশী তার বুড়ো বয়সের সাঙা-করা পরিবার। রঙে-রসে ডগমগ যোবতী মেয়ে। যোবতী মেয়ে বলেই সন্দ করতে হবে না কি? ভোলানাথেরই মন ছোট, ছোঁচপড়া। 'কুকুর যদি রাজা হয় বসে সিংহাসনে, তল-চোখে তল-চোখে তাকায় ছেঁড়া জুতার পানে।'

ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি-দেশলাই বার করে ধরালে দাঁতে চেপে। ঢোল নিয়ে বসল। চাঁটি দিয়ে দেখতে লাগল বারে বারে। কোথায় কী বেকল হয়েছে। চামড়ার দলগুলিতে কি টান নেই? আওয়াজ কি জুড়িয়ে গেছে? হাতে আর সেই ফুর্তি ফোটে না?

'সি কি? সাত আজ্যি ঘুরে এসে আবার ই ঢোল নিয়ে বসেছিস? গয়ার পাপ! বলি খাবি নে?' গোরাশশী ঝংকার দিয়ে উঠল।

'যদি দিস তো খাই। পেচন্ড খিদে পেছে।' কিন্তু তার কোনোই প্রমাণ পাওয়া গেল না। চোখ বুজে চাঁটি মেরে কেবল বোল পরখ করছে। চোখ মেলে পরখ করছে আঙুলের গিঁটে-গিঁটে কিসের এ দুর্বলতা?

'খিদে পেছে তো পয়সা-টাকা দে। ঘরে চাল নেই। তুলসীর ঠেঁয়ে কিছু কিনে আনি গে।'

'সেই ফাঁকে একটু—'

'তোর রঙ্গ থো। গায়ে জ্বলুনি ধরে আমার। দে কি দিবি।'

পকেট থেকে সামান্য কিছু রেজকি বের করল ভোলানাথ।

'অনেক ওজকার করেছিস তো? এবার আর রূপদস্তার চুড়ি লোব না, সোনার ভাটিয়া চুড়ি চাই। বুললি?'

ঠাট্টার খোঁচাটা বুকের মধ্যে এসে ঠিক লাগল। ভোলানাথ বিড়িতে টান দিতে গিয়ে দেখল নিবে গিয়েছে। বললে, 'এবার ওজকার হয়নি। যাও হয়েছিল মদে ঠুকে দিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। ই রকম বেশি ঠুকতে গেলেই মাথামুড় নেপাট হয়ে যাবে।'

স্তি-লোক শুধু রোজগারই বোঝে। বোঝে শুধু সাধ-আমোদ। বোঝে কি করে একটু ডঙ্কা মেরে বেড়াবে।

আরে, টাকাই যদি সব, তবে ঢোল ফেলে দিয়ে লাঙল তুলে নিলেই তো হয়! বলি, মান-খাতিরটা কি কিছু নয় দুনিয়ায়? শুধু টাকা হলেই কি

মন ওঠে? পেট ভরলে কি বুক ভরে? দশটা গাঁয়ের লোক যবে সুখ্যাত করে, তার দাম কি টাকায় ধরা যায়?

কিন্তু কেন এমন হল?

'জানিস বৌ, আজ আমি হেরে গেইছি।' ভোলানাথ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ভেঙে পড়ল।

'কি হেরে গেইছিস? মামলা ছিল না কি কোটে? কই বলিসনি তো?'

'মামলা লয়, ঢোলের বাজনায় হেরে গেইছি।'

গোরাশশী হেসে উঠল ছল্‌কে-ছল্‌কে। বললে, 'ঢোল! ওটাতে তো বাজালেই শব্দ হয়, ওটার বাজনায় আবার বাহাদুরি কি! বলি, হালালি কার কাছে?'

'পাল্লাদার জুটেছে—ই ময়ূরপুর গাঁয়ের বাজিয়ে। নাম তারাপদ বায়েন। হাত বড় মিষ্টি রে, বাজানোর ঢংও বলেহারি। মাইরি, হেরে গেলাম উর কাছে। সবাই বললে হেরে গেলাম।' ভোলানাথ কাতর চোখে তাকাল স্ত্রীর দিকে।

গোরাশশীর সেই হাসি এখনো সরে যায়নি চোখের থেকে। আবার তাতে ঝিলিক পড়ল। বললে, 'ঢোলের আবার হারজিৎ কি। মামলা-টামলা হয়, লড়াই-যুদ্ধ হয়, বুঝি। তুইও বাজাবি ঢোল উ-ও বাজাবে ঢোল— দুজনের বাজনাতেই কানে তালা লাগবে—দুজনেই সমান ওস্তাদ। চোখ-খেগোদের বিচেরকে বলেহারি।'

গোরাশশী বুঝবে না তার অন্তরের দগ্ধানি।

কিন্তু কেন বুঝবে না?

'এমন তো লয় যে বায়নার টাকা কম দেছে। মদ খেয়ে উড়িয়েছিস, তা ঢোলের দোষ কি।' গোরাশশী আবার অন্তরটিপনি ঝাড়লে।

টাকা হলেই যে সব হয় না এ মোটা কথাটা গোরাশশী বোঝে না কেন? রূপ হলে কী হয় যদি অন্তরে না রঙ থাকে?

তারাপদ কত বাহবা পেল সভায়। মালা পেল। ইনাম-বকশিশ পেল। লোকে কত গুণ গাইলে। ভোলানাথের দিকে কেউ দেখেও দেখলে না।

'লে, থো এবার। ভাত আঁদা আছে, খাবি চ।'

গ্রাহ্য করে না ভোলানাথ। কেন এমন হল, বারে-বারে চাঁটি মারে ঢোলে। আঙুলে জং ধরে গিয়েছে। ভোমরার পাখার মত নাচে না আর।

না, সকাল-সনজে রোজ মহড়া দিতে হবে। ঐ মতিভ্রষ্ট স্ত্রীর কথায় কান দেয়া নয়।

'রাত-দিন ঠকর-ঠকর আর ভাল লাগে না।' একেক দিন জোর গলায় নালিশ করেছে গোরাশশী।

'ঠকর-ঠকর না হলে হপর-হপর স্যাবা চলবে কি দিয়ে?'

'তার চেয়ে কিষেন-মান্দেরি করলে লক্ষ্মীর পাঁজ পড়ত সংসারে।'

কৃষেন-মান্দেয়ির আবার নাম কি! মর্যোদা কোথায়? কিন্তু ঢুলীর নামে দিশ-বিদিশ আমোদ হয়। রাজ্যে ঢোল পড়ে যায়। দেশ-ঘাট থেকে কত লোক দেখতে আসে। মেলা-খেলায় কত লোক ঘাড়-মাথা নেড়ে-নেড়ে তারিফ করে। শিগগির আর তেহাই পড়তে চায় না। এ সবের দাম কি টাকায় হয়? টাকা দিয়ে কি অন্তরের সন্তোষ কেনা যায়?

গোরাশশীর ব্যাভারে ভোলানাথের বুকের মধ্যিটা গুরগুর করতে থাকে। মন মাতিয়ে ঘর-সংসার করতে সাধ যায় না। ইচ্ছে হয় কোন দিকে চলে যাই। যে স্ত্রী স্বামীর মনের দুখ-শোক বোঝে না তার সঙ্গে কি মন বসে?

অথচ যৌবনে দলমল করছে গোরাশশী। করুক। দোলন-হেলন ঠমক চমকে তার কী হবে যদি না পায় মনের প্রণয়!

সত্যি, গুরগুরিয়ে বাজে না আর ঢোল। নিজের মনেই আর জোর লাগে না বাজনা শুনে। কী হল ভোলানাথের! গুরুবল কমে গেল না কি?

হেঁসেলে-চাতালে বাজাগে যা।' গোরাশশী এবার পষ্টাপষ্টি খেঁকিয়ে উঠল : 'ছেলেটার দুপুরে জ্বর এসেছে হি-হি করে। ঘামন্ত গায়ে ঘুমুচ্ছে এট্টু এখুন। তুই রজ তুলে ওকে জাগিয়ে দিসনি খবরদার।' বলে চলে গেল অন্য কাজে।

গায়ের কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৌরহরি উঠে বসল ঘাই মেরে। ছ'সাত বছরের ছেলে। বুড়ো বয়সের নামলা ছেলে ভোলানাথের। বড় আদরের।

'জ্বর আর নেই বাবা। ঘাম দেছে। একটো বিড়ি দে কেনে এ ছামু।'

ভোলানাথ মুখের এঁটো বিড়িটা ছেলেকে এগিয়ে দিলে। তন্ময়ের মত ঢোলে চাঁটি মারতে লাগল।

'কী সোন্দর তুর বাজনা বাবা।' গৌরহরি উঠে পড়ল। দ্রুত কটা টান মেরে বিড়িটা ফেলে দিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'আমাকে ঢোল বাজানো শেখাবি তুর মত?'

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ভোলানাথ আলো দেখতে পেল। হ্যাঁ, ই ছেলেই তার নাম ফিরিয়ে আনবে—তার আর ভয় কি। পিছনে হাত বাড়িয়ে ছেলেকে পিঠের সঙ্গে জাপটে ধরে ভোলানাথ বললে, 'নিশ্চয় শেখাব।' দেখে লিস এমুন ওস্তাদ বানিয়ে দেব কেউ তোকে পাল্লা দিতে পারবে না। কিন্তুক—' হঠাৎ গলা নামাল ভোলানাথ : 'তুর মা কি আজি হবে? ঢোল যে উর দু চক্ষের বিষ।'

'মা না আজি হয়, মাকে তু ছেড়ে দিবি।'

কান বড় খর গোরাশশীর।

কি বুললি? হতভাগা আঁটকুড়োর বেটা। নামুনে, জকা, তিন্দুশে। তুর বাপ আমাকে ছাড়বে? তুর বাপকে আমি ছাড়তে পারি না? তুর বাপ একটা কী! ঢোলের পাল্লায় হেরে যায় উ কি মরদ? শ্যাল-কুকুর।'

হঠাৎ কি হয়ে গেল ভোলানাথ নিজেই বুঝতে পারল না। ঢোলের কাঠি

দিয়ে পিটতে লাগল গোরাশশীকে। কোথাকার কি এক নিরুদ্ধ যন্ত্রণা ফেটে পড়ল এতক্ষণে। অনেক মনস্তাপ, অনেক অপমান, অনেক দগদাগ।

'তুকে আমি ছাড়তে পারি না? এখুনি পারি। দূর হ মাগি ছেনাল, দূর হয়ে যা। যে পরিবার স্বামীর দুখ-সুখ বোঝে না তাকে দিয়ে লাভ কি পিথিমীতে?'

গোরাশশীও ছেড়ে দেবার পাত্তর নয়। হাতের কাছে যা পেল হাতা-লতা তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল ভোলানাথের গায়ে-মাথায়। মুখে খই-ফুটন্ত গালাগাল : 'বারোজেতে, বাঁশচাপা, কাঁচা-বাঁশে-যা—'

কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল গৌরহরি।

কাঁধে আসে কাঁধে যায়, উলটে পড়ে মার খায়।

ঢোলের মতই সম্মান ছিল গোরাশশীর, অথচ ঢোলের মতই সে পড়ে পড়ে মার খেল।

চৈত্রে গাজন-বোলান, রথে সারি, পাল-পরবে কবিগান—কত ডাক-হাঁক ছিল ভোলানাথের। নহবতের সঙ্গে সঙ্গত করতে তার আর কেউ জুড়ি ছিল না। দশখানা গাঁ তার নামে 'ম'-'ম' করত। সেই ঐশ্বর্যের দিনেই তো এসেছিল গোরাশশী। কিন্তু এক দিনে হঠাৎ সব উপে যাবে কেন? পর্বত এড়িয়ে এসে শেষে সর্ষে বিঁধবে?

আজ তিন দিন ভোলানাথ বাড়িছাড়া। সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে যখন সে যাবে তখনো কাঁধে তার ঢোল চাই।

'তুর বাবা যদি আজ আলছে তো আলছে, নইলে চ, কালকে আমরাও চলে যাই গোবরহাটি—তুর মামাবাড়ি।'

গোরাশশী বললে গৌরহরিকে।

'তাই চ।' স্বচ্ছন্দে ঘাড় নাড়ল গৌরহরি। বিজ্ঞের মত মুখ করে বললে, 'বাবা যদি ফিরে এসে তুকে দেখে, আবার না তোকে মারধোর করে।'

'উঃ, তুর বাবা এক পেকাণ্ড ঠেঙাড়ে এয়েছে! এবার তবে আমি বঁটি দিয়ে কোপা করব।'

মায়ের গা ঘেঁষে সরে বসল গৌরহরি। চিন্তিত মুখে গম্ভীর গলায় বললে, 'সেদিন লেবারণের মা কি বলছিল জানিস?'

'কি?'

'বাবা নাকিনি সাঙা করে বাড়ি ফিরবে।'

'ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি। তুর বাবা টাকা পাবে কুথা। বুড়ো হাবড়ার কাপ কত! একটা বো আনতে পারে না তায় আবার সাঙা! একবার ঘরকে ফিরুক না পোড়ারমুখো।'

'কিন্তু সাঙা করলে তুকে তখুনি তেড়িয়ে দেবে যে।'

'আমিও অমুনি পেহ্লাদ মুচিকে সাঙা করব। ফুটো কলসি আর বিড়-বিড়ে ভাতার লিয়ে আর ঘর করব না। চাষে-বাসে পেহ্লাদ মুচির সছল-বছল

অবস্থা, সুখে থাকব। আর থাকব এই গাঁয়ের উপরেই, তুর বাবার চোখের ছামুতে—'

হঠাৎ আঙিনায় কার ছায়া পড়ল।

আর কার! ভোলানাথের। সঙ্গে আবার ও কে?

'তুর লজ্জা করে সান কাড়তে হবে না।' মোলায়েম গলায় বললে ভোলানাথ : 'ইয়ার নামই তারাপদ—সিই নামকরা বাজিয়ে। লজ্জা নেই, উ আমার ভাই হয়, জাত-জ্ঞাত নয়, একেবারে আঁতভাই—বুললি? বলি, ভাত-টাত কিছু আছে?'

ঘোষহাজরাদের বাড়িতে কবিগানের বায়না জুটে গিয়েছিল ভোলানাথের। পাল্লাদার সেই তারাপদ। ঐ দূরের গোঁসাইপুরেও তারাপদের বায়না! এরি মধ্যে খুব নাম ছড়িয়েছে তো ছোকরা। ভোলানাথের মাথাটা ঠিক খাবে এত-দিনে। ভরা-ডুবি করাবে।

না, ল্যাজ গুটোবে না ভোলানাথ। এবারে ঠিক টক্কর খাওয়াবে ছোকরাকে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক এ কথা মেনে নেবে না কিছুতেই। একবার হেরেছে বলে বারে বারে হারবে এ বিধেন হতে পারে না। হেই বাবা রুদ্দু দেব!

গানের শেষে তারাপদ নিজেই এসে দাখিল হল ভোলানাথের সামনে।

'দাদা কি বাড়ি চললা আজই?'

'হেরে গেইচি, আমাকে আর খাতির করে কে নেমন্তন্ন করবে বলো? তুমার কথা আলাদা। তুমার ছোকরা বয়েস, সোন্দর চেহারা, তোমাকে পায় কে। তুমি এখুন ইনাম লেবা বকশিস্ লেবা তবে তো যাবা। আমি কালা মুখ দেখাতে থাকব ক্যানে এ ঠিঁয়ে?'

'উ শালোরা কী বোঝে শুনি?' তারাপদ রাগ করে উঠল : 'উয়ারা যে রায়ই দিক, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি ওস্তাদ। ওস্তাদ ছাড়া ওস্তাদের গুণ কেউ বুঝে না। তুমি আমার গুরু, আমি তুমার শিষ্য-সখা।' তারাপদ হেঁট হয়ে পা ছুঁতে গেল ভোলানাথের : 'কারু জলে যশ কারু দুধে ঠস। ও-সব বিচের-আচার কিছু লয়।'

ভোলানাথের মন মধু হয়ে গেল মুহূর্তে। ছেন্দা ভক্তি আছে ছোকরার। প্রবীণ লোককে মান্য করতে জানে।

'আমাকে তুমি শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও। তুমার পায়ের তলায় বসে আমি এখুনো দু-দশ বছর শিখতে পারি।' তারাপদ বললে গদগদ হয়ে। ওর সরলতায় ভোলানাথের বুক শীতল হয়ে গেল।

'পীরের চেয়ে খাদিম জিন্দে।' পথের লোক কে টিপ্পনি কাটলে।

সত্যিই তো। তারাপদ নিজে স্বীকার করলে কি হয়, দেখিয়ে দশ জন তো তা স্বীকার করছে না। তারাপদের নিজের স্বীকারে কী যায় আসে। ভোলানাথের প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে তো আর কিছু কম বাজাবে না বা হেরে যাবে না তো ইচ্ছে করে।

'চলো কেনে দাদা মদের দোকান পানে। গা'টা বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে—'

দুজনে গেল মাতালশালায়। গলা পর্যন্ত মদ খেলে। গলায়-গলায় ভাব হয়ে গেল দুজনের। তারাপদ ভবঘুরে বাউণ্ডুলে। চি-পুত্তু-ভাই-বুন কেউ নাই, নাই ঘর-দোর কপাট-চৌকাট। ইখানে-উখানে ঘুরে বেড়ায় আর ঢোল বাজায়। রং-টপ্পা গায়েন করে।

'বলেহারি বাবা ভোলানাথ, তু একটা গোটা মরদ বটে!' তাদেরই গাঁয়ের শুকদেব মদ খেয়ে 'ঢোল' হয়েছে। বললে জড়ানো জিভে, 'আঃ, কী মারটাই না মারলি! তা জব্দ করতে তুই জানিস বটে বাপ!'

'দূর দাদা।' তারাপদ নালিশ করে উঠল : 'মেয়েলোকের গায়ে হাত তুলবি ক্যানে? যা বলতে হয় লুলুপুতু করে বলবি। আগ চণ্ডাল! ঠিঁয়ে আঠিঁয়ে লেগে গেলে বাবা কী হয় বলা যায় না। কথায়ই বলে, মুখে এখে বাক্যি আর ঠাঁই দেখে মার।'

ভোলানাথ থমথমে গলায় বললে, 'ফদুরে মরুক চামচিকে বসে আছেন ছিরাধিকে। তুমি শালো যত খেটে মর বোর কিছুতে মন পাবে না। হাতে কি আর অনথক মার আসে?'

'মনের বেপারে কামটা কী আমাদের? যৈবন বৈমুখ না হলেই হল। কি বল?' কনুই দিয়ে পাশের লোকটাকে তারাপদ গুঁতো মারলে।

হঠাৎ ভোলানাথ উপর-পড়া হয়ে জিগগেস সরলে তারাপদকে : 'আমার বাড়ি যাবি?'

আড়ালে পেয়ে গোরাশশী ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ই আপদ জোটালে ক্যানে?'

ভোলানাথ বললে গম্ভীর হয়ে, 'আমার খুশি।'

'তুর মুণ্ডু। একে পিতিদিন ভাত এঁদে দিতে হবে না কি আমার?'

'হবে, নিশ্চয় হবে। উ আমার ছোট ভাই, আমার সাগরেদ।'

'ছুঁচোর সাগরেদ চামচিকে। আমি লারব ভাত আঁদতে।'

'লারবি তো পথ দ্যাখ। আমি আমার পথ আগেই দেখে লেছি।'

ধাপচালায় শোবার জায়গা হয়েছে তারাপদর।

নিশুতি রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কুটুরে পেঁচা ডাকছে কোথায় ঘাপটি মেরে। ঝাঁপ ঠেলে টুক করে ঢুকে পড়ল গোরাশশী।

বুকে যেন কে তার ঢেঁকি কুটছে। গলা ডুবিয়ে বললে, 'কি গো, লজরে ধরে আমাকে?'

তারাপদ আকাট, অসাড় হয়ে রইল।

'কি, আনারে ঠিক ঠাহর হলছে না? দিনমানে দেখে হিয়ের ভেতরটা খলবলিয়ে ওঠেনি এটটু? কি রে, আ কাড়িসনে ক্যানে? শরীলে সান নেই?'

তারাপদ যেন পাথারে পড়েছে। এ কবি-কালিদমন, সারিবোলান, ছড়া-পাঁচালি নয়। এ একেবারে অদ্ভুত! আরেক রকম!

'শুন, আমার গা ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে কর—এ তল্লাটে আর আসতে পারবি না। ই দেশ-গাঁ ছেড়ে চলে যাবি ভিন দেশে। কি, আজি?'

'আজকের ই আত ছাড়া আর সব ছাড়তে পারব।' ধরা-গলায় বললে তারাপদ।

'শুন, তুর জ্বালাতেই আমাদের সব যেতে বসেছে। ঘরে সুখ নাই মনে সুখ নাই। ক্যাবল ওজকারে কি হয়, যদি নাম না হয় ভোমণ্ডলে? ভেরেণ্ডা বনে শ্যাল-রাজা ছিনু, তু কেন বাদ সাধতে এলি? কথা দে, যদি পিতের পুত্র হোস, এ মুলুক ছেড়ে চলে যাবি নিবুনেদ হয়ে।'

'আর ল্যাই করিসনে। বুলছি চলে যাব, কথা রাখব।'

'তুর ভাবনা কি। তুর গুণ আছে, যেথা থাকবি সেথা ক'রে খেতে পাবি তু। আমাদের বড্ড অভাবের সংসার—দেখতেই পেছিস, তাই ব্যাগত্তা করছি তুকে—'

'তুর ভয় নেই। আমি ঠিক চলে যাব। ওস্তাদের সেঁথো আমরা, কথার লড়চড় জানি না।'

কুটুরে পেঁচাটাও থেমে গেছে এতক্ষণে। আঁধার যেন দম বন্ধ করে বসে আছে ঘন হয়ে।

'এই লে, টাকা লে।' তারাপদ একটা দশ টাকার নোট ধরল এগিয়ে।

'আ মর, টাকা লেব ক্যানে? তুর কাছে ই-র দাম দু-দশ টাকা বটে, কিন্তু আমার কাছে তার হিসাব নাই। তুকে হাটে গিয়ে দশবার বিচতে পারে এমুন নোকের অভাব হত না আমার কখুনো। বুলালি? কাল ঠিক চলে যাস কিন্তুক। চলে যাস বেপাত্তা হয়ে। মনে থাকে যেন। তুর ধর্ম তুর ঠাঁই।'

'কিন্তুক কি বলে চলে যাব? কিছু তো বলতে হবে দাদাকে।'

এক পলক স্থির হয়ে দাঁড়াল গোরাশশী। বললে, 'লোটটা তবে দে।'

সকাল বেলা চৌকাঠের নিচে আঙিনাতে গোরাশশী মাড়ুলি দিচ্ছে তারাপদ বেরিয়ে এল। বললে, 'চললাম, জন্মের মত চললাম—'

'ডাঁড়া, পাড়াশুদ্ধু লোক ডাকছি এখুনি, তোর এতবড় আস্পর্দা!' গোরাশশী ফণা-তোলা সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল : 'তু আমাকে টাকা দেখাস? হাড়হাবাতে পিণ্ডিখেকো, টাকা তুর বেশি হয়েছে, লয়? বেরো তু আমার বাড়ি থেকে—'

'আমি যেছি, তু কুট কাটিস নে। দে আমার টাকা ফিরিয়ে দে।' তারাপদ হাত বাড়াল।

'লে—খালভরা, নামুনে—' নখের ডগায় গোরাশশী নোটটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। উড়িয়ে দিল চার দিকে।

গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল ভোলানাথের। দেখল তারাপদ বাড়ি নেই : উঠানে ছেঁড়া নোটের টুকরো।

কী ব্যাপার?

'তুর সেই কমবক্তা বন্ধু আমাকে লোট দেখায়!'

'দেখাবেই তো। তাই তো উয়ার সঙ্গে কথা। ঘর-দরজা নেই, মা-বুন-স্তি-পুত্ত নেই, এইখানেই খাবে-থাকবে। ভাত-মদ দেব, যত্ন-আত্তি করবি। আর উ পাল্লাদারি করবে না। আমার মুখ ছোট করবে না, কালি দেবে না নামে। বায়না যদি লেয় বিদেশে লেবে, আমার ইলেকায় লয়। তু তাকে ভাগিয়ে দিলি? টাকা যদি দেয়, ভাড়া দিয়েছে আগাম। ইর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? আমাকে না দিয়ে তুকে দিয়েছে। স্বামীকে না দিয়ে তার পরিবারকে দিয়েছে। দেবেই তো একশো বার। যা রয়-বয় তাই হয়। তাই হবে। তাইতেই উ এয়েছে। উকে লিয়ে এসেছি। ইতে এত ত্যাজ ক্যানে? ঘরে ভাত নেই, ধম্মের উপোস!'

ভোলানাথ দু হাতে পিটতে লাগল গোরাশশীকে। আশ্চর্য, গোরাশশী উত্তর দিলে না এতটুকু। না সাড়া না ধারা নিথর হয়ে পড়ে রইল।

'হা টে শালি, আমার নাম বড়, না তুর নাম বড়?'

ভোলানাথের নাম বড়। গোরাশশী তা জানে। মর্মে-মর্মে জানে।

৮৩। জ্যাম

লোকটা ঘোড়া চেয়েছিল। ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় বসে দু হাত তুলে. রামজী, একঠো ঘোড়া দে, একঠো ঘোড়া দে, বলে কেঁদেছিল। প্রার্থনায় কোনো ত্রুটি ছিল, থাকা সম্ভব, ভাবতেও পারেনি। পায়ের মধ্যে নয়, হাতের মধ্যে ঘোড়া পেল লোকটা। চড়তে পেল না, বয়ে নিয়ে চলল। ঘোড়াই চেয়েছ, চড়তে তো আর চাও নি। সওয়ার না হয়ে কুলি হও।

লোকটা গাড়ি চেয়েছিল। প্রেস্টিজের ঠেলায়ই হয়েছিল চাইতে। রামজী জুটিয়ে দিয়েছে গাড়ি। কিন্তু গাড়িই চেয়েছ, চলতে তো আর চাও নি। সুতরাং গাড়ির মধ্যে বসে থাকো।

ঘোড়ার জন্যে লাগাম-চাবুক নেই; গাড়ির জন্যে—কলে-কব্জায় নিটুট-নিখুঁত গাড়ি, মবিলে-পেট্রলে সড়গড়—আসল জিনিস, রাস্তাই নেই।

হাওড়া ময়দান থেকে শেয়ালদা পর্যন্ত জ্যাম।

মঙ্গল ঘুরপথে বাড়ি যেত। সে কি, শর্টকাট করো না কেন? শর্ট-কাটে আপত্তি কী!

'বলছ যতীন দাস রোড দিয়ে যাব? সর্বনাশ। সোনামামা যে ঐ রাস্তায় থাকে।'

'তা—ভালোই তো।'

'সোনামামা লজঝড় এক গাড়ি কিনেছে। দেখা হলে রক্ষে নেই, বলবে, মঙ্গল, হাত লাগা। গাড়ি ঠ্যাল। গাড়ি ঠেলার ভয়ে যাইনে ও-পথ দিয়ে।'

যখন ও-পথ দিয়ে প্রথম গেল মঙ্গল, তখন নিজে সে নতুন গাড়ি কিনেছে। সে নিজেই গাড়ির চালক-পালক।

দেখলাম জ্যামের মধ্যে মঙ্গলের গাড়ি। হুইলে মঙ্গল বসে। আর কেউ ছিল কিনা গাড়িতে জানি না। থাকলেও নেমে পড়ছে। কেটে পড়েছে। বেলা প্রায় দুটো থেকে জ্যাম।

অন্তত আমি তো নেমে পড়েছি।

হাওড়ায় সভা করতে গিয়েছিলাম। শীতের দিন, তিনটে থেকে সভা। দুটোর আগেই বেরিয়েছিলাম, জ্যাম তখনো লাগেনি পুরোপুরি। সভাশেষে ফিরছি পাঁচটায়। হাজার হাজার গাড়ির গাদি লেগেছে। ট্রাম, বাস, স্টেটবাস, ফিটন, গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি, ঠেলা সাইকেল-রিকশা, টানা-রিকশা—আগা-পাশ-তলা ছয়লাপ। সামনে-পিছনে, এ-পাশে ও-পাশে, উত্তরে দক্ষিণে, বাইরে ভিতরে—এবেদং সর্বমিতি। সর্বং খল্বিদং রথং। একটাকে কাটাতে গিয়ে আরেকটার মুখোমুখি এসে পড়ছে। ব্যাক করতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বাঁকা হয়ে। সর্বত্র ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি গাদাগাদি লাগালাগি—তালগোল পাকানো অখণ্ড তাণ্ডব।

'আপনার গাড়ি করেই তো যাবেন—' বলেছিল সভার উদ্যোক্তারা।

'মোটেই না। আপনারাই বহন করবেন যোগক্ষেম। তাছাড়া আমার গাড়ি কই?'

'ঠিক আছে। আমরাই এসে নিয়ে যাব। পেঁছে দেব আবার।'

কিছুই ঠিক নেই। কেন্দ্র ঠিক নেই, সীমানা এলাকা ঠিক নেই। দণ্ড যাই থাক, মেরুদণ্ড ঠিক নেই। কাণ্ডটাই শুধু আছে, কাণ্ডজ্ঞান দেশান্তরী।

'আপনার উপায় কী হবে?' আমার সঙ্গের লোক, সভার লোক, আমার মুখের দিকে তাকাল।

'পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছি। বঙ্গে যখন আছি তখন কপালও সঙ্গেই থাকবে।'

নির্বন্ধন চললাম পদব্রজে। যত এগোই দশদিকে কেবল গাড়ি আর গাড়ি। পাহাড় আর পাহাড়। অচল আর অনড়ের স্তূপ।

ট্রাম-বাসের যাত্রীরা নেমে পড়েছে। কণ্ডাক্টররা জমায়েত হয়ে গুলতানি করছে। কিন্তু ড্রাইভারদের জায়গা ছাড়বার উপায় নেই। কখন দরজা খোলসা পায় তারই জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। তবু ওদের লঘু মন, যেহেতু চলা-বসা ওদের সমান। দু'অবস্থাতেই ওদের সমান ডিউটি। হয়তো বা ওভার-টাইম। তাই কেউ বা বিড়ি-সিগারেট ফুঁকছে, কেউ বা খইনি টিপছে তন্ময় হয়ে।

কিন্তু প্রাইভেট? তাকানো যায় না আরোহী বা চালক-পালকের দিকে।

প্রথমে ভেবেছিলাম অনুকম্পার বস্তু, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখলাম মর্মান্তিক কষ্টের।

যন্ত্রের শব্দটাই শুধু নয় স্তব্ধতাটাও এক [illegible]। হাহাকার।

মঙ্গলকে আমি কী ভাবে সাহায্য করতে পারতাম? ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাবার পর ও ওর প্রেস্টিজকে যখন ঠেলবে তখন পারতাম হাত মেলাতে। কিন্তু ঠেলবার জন্যেই বা জায়গা পাব কতক্ষণে?

পা চালিয়ে চালিয়ে পালিয়ে এলাম।

কে ভেবেছিল হাওড়া জজকোর্ট থেকে কলকাতা স্মলকজ কোর্ট পর্যন্ত পায়ে হাঁটব! পায়ে হেঁটে পেরোব হাওড়ার পোল! খালি পায়ে দাঁড়াব গঙ্গার উপরে!

বুঝতেই পাচ্ছেন সভাস্থলে জুতোজোড়া খোয়া গিয়েছে।

স্ট্র্যান্ড রোডের মুখে এসে দেখলাম অজগরে স্পন্দন এসেছে। কাছেই একটা চলতি ট্র্যাম পেয়ে উঠে পড়লাম লাফিয়ে।

দেখি যাত্রীছুট ফাঁকা কামরাটাতে এক কোণে বসে আছেন আমাদের সেই মফস্বলের অনাদি-দা। এমনভাবে র‍্যাপার মুড়ি দিয়েছেন যে, রাত্রে হোক প্রভাতে হোক, গাড়ি চললেই তিনি চলবেন, নচেৎ নয়। ভাড়া যখন একবার দিয়েছেন তখন আর ছাড়বেন না। আমার আর সময়ের দাম কী? আমার আবার ভাড়া কিসের? তাঁর ভাবখানা যেন এই রকম।

পাশে বসলাম। চিনতে পারলেন। শুধোলেন, 'কী হয়েছ?'

'কী হয়েছ মানে?' অবাক হলাম প্রশ্নে।

'স্বাধীন হও নি?'

'সে তো কবেই হয়েছি।'

'আহাহা, সেকথা কে জিজ্ঞেস করছে? বলছি হালের কথা। হালে রিটায়ার করনি?'

'না করে করি কী!'

'তাই তো বলছি স্বাধীন হয়েছ। স্বাধীন না হলে কি কারু সাধ্যি আছে খালি পায়ে হাঁটে, সেকেন্ড ক্লাস ট্র্যামে চড়ে?' দাদা পিঠ চাপড়ালেন।

একটুখানি গিয়েই ট্র্যাম থেমে পড়ল। আবার জ্যাম।

নেমে পড়লাম। হাঁটতে-হাঁটতে ড্যালহৌসী।

তারপর বাড়ি।

কয়লার ধোঁয়ার রাতের কলকাতা রুদ্ধশ্বাস অন্ধকূপ ছাড়া কিছু নয়। তবু অনায়াসেই এক নক্ষত্রস্পন্দিত উজ্জ্বল আকাশ কল্পনা করতে পারছি। কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক চলেছে ডাইনে বাঁয়ে উজানে-ভাঁটিতে।

কখনো জ্যাম হচ্ছে না।

৮৪। কুমারী

গৌরীকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘড়ির দিকে তাকাল কমলিকা। নটা বেজে পঁয়ত্রিশ। এমন একটা কিছু ঘোর রাত নয়। কত রাত এর চেয়েও অনেক দেরি করে ফিরেছে। সাড়ে দশটা-এগারোটাও হয়েছে। যখন ফাংশান ছিল। রিহার্সেল ছিল।

'তা আজকাল তো সারা বছরই ফাংশন।' বললে শিবনাথ।

কিন্তু সে সব প্রোগ্রামের দিন তো কমলিকাকে বলে গেছে। 'মা যাব?' এ ভঙ্গি নয়। 'মা, গেলাম।' এ ভঙ্গি।

তবু, যাহোক, জানিয়ে তো গেছে। কমলিকা জিজ্ঞেস করতে পেরেছে, কোথায়? সব সময়েই ঠিক উত্তর দিয়েছে হলফ করে বলা যায় না, তবু যাহোক, উত্তর তো দিয়েছে একটা। হয় বলেছে বন্ধু, নয় প্রোফেসরের বাড়ি, নয় সিনেমায়, নয় থিয়েটারে। কখনো কখনো বা পিকনিকে। খোঁজবার যাহোক একটা সুতো রেখে গেছে। কিন্তু আজ? আজ একেবারে বিধবার ললাট। ছোট একটা বিন্দু বা সরু একটি রেখাও কোথাও রাখেনি।

'তোকে কিছু বলেছে?' ছোট মেয়ে উমাকে জিজ্ঞেস করলে কমলিকা।

"আমি একটা মানুষ, আমাকে বলবে! দিদির সব সময়ের তো এই নাক-উঁচু ভাব।' এই ফাঁকেই একটু ঠুকে নিল উমা। পরে স্বরে উদ্বেগ এনে বললে, 'কখন যে বেরুল বাড়ি থেকে তাই দেখিনি।'

'তা দেখবে কেন? শুয়ে নভেল পড়ছিলে।' ঝাঁজিয়ে উঠল কমলিকা।

'মোটেই না। শরৎচন্দ্র পড়ছিলাম।'

'আহা, শরৎচন্দ্র কী আর নভেল!'

'মোটেই না। বাঙলা নভেল এখন ঢের ঢের এগিয়ে গেছে। তাই না কাকা?' উমা শিবনাথকে লক্ষ্য করল।

'হেমন্ত-বসন্ত চলে গিয়ে এখন গ্রীষ্মচন্দ্ররা এসেছেন।' শিবনাথ বললে, 'জগৎ সংসার পুড়ে যাচ্ছে।'

'মোটেই না। আলো হচ্ছে।' টিপ্পনী কাটল উমা। বললে, 'আলোই তো জীবনের বৃহৎ উত্তেজনা।'

বারো-তেরো বছরের ইস্কুলের মেয়ে, সেও উত্তেজনার খবর রাখে।

'যা না, ছাদটা দেখে আয় না।' বললে শিবনাথ।

'ওরে বাবাঃ, অন্ধকার!' ভয়ে গা-ছমছমানির ভাব করল উমা।

'ভয়ও তো একটা উত্তেজনা।'

'সে তোমার ভূতের ভয় নাকি?' উমা হাসতে চাইল 'সে অজানার ভয়।

'এ সব তোর দিদির কাছে শেখা বুঝি?'

গৌরীর উপর কোনো কটাক্ষ আসে তাই কমলিকা তাড়াতাড়ি বললে, 'ছাদ আমি ঘুরে এসেছি। ওখানে নেই। ওখানে কেনই বা যাবে?'

'তা ছাড়া আজ অজয়দা তো আসেনি।' উমা ফোড়ন দিল।

'অজয় মানে সেই কবিতা-লেখা ছোঁড়াটা?' ঘৃণার টান দিল শিবনাথ।

'কী যে বলো। অজয়দা আধুনিক কবিদের চাই।' উমা গদ্‌গদ হল : 'দিল্লিতে নাম গিয়েছে।'

'না, না, ও সব কী কথা!' পাছে অজয় খেলো হয় আর একটা বাজে ছেলের সঙ্গে মেশে বলে গৌরীকেও অকিঞ্চিৎ দেখায় তাই কমলিকা তাড়াতাড়ি বললে, 'এম-এ পাশ, ব্যাঙ্কে চাকরি করে—'

'কিন্তু সন্তোষদা উলটো।'

'ঐ যে ছেলেটা নাটক করে?' সুরে তাচ্ছিল্যের টান দিল শিবনাথ।

'শুধু নাটক করবে কেন, নাটক লেখে। ডিরেক্ট করে।'

তবুও যেন যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত শোনাল না মনে করে কমলিকা বললে, 'ঐ যে নতুন নাট্য প্রতিষ্ঠান হয়েছে, 'মৌনমুখর', তার যে কর্মকর্তা।'

কে জানি কে! অত তলিয়ে খবর নেবার পরিশ্রমে রাজি নয় শিবনাথ। উমাকে লক্ষ্য করে বললে, 'সন্তোষদা উলটো না কী বলেছিলি!'

'বলছিলাম অজয়দা ভাবপ্রধান আর সন্তোষদা বস্তুনিষ্ঠ।'

'তার মানে?' হকচকাল শিবনাথ।

'তার মানে অজয়দা ছাদ আর সন্তোষদা ঘর।' যেন সব জেনেছে সব বুঝেছে এমনি থেকে উমা বললে, 'ছাদে কাব্য জমতে পারে, কিন্তু নাটক জমে ঘরে, চার দেয়ালের মধ্যে। আর দিদি কী বলে জানো?'

পাছে গৌরীর উপর কোনো ছায়া পড়ে, কমলিকা চঞ্চল হয়ে উঠল। দোতলার রেলিঙ থেকে ঝুঁকে পড়ল নিচে : ঐ বুঝি এল গৌরী।

না, গৌরী নয় কে আরেকটা মেয়ে। চলে গেল ওখান দিয়ে।

'কী বলে দিদি?' উস্কে দিল শিবনাথ।

'দিদি বলে ঘর ছাড়া ছাদ নেই, ছাদ ছাড়া ঘর নেই।' উমা বললে, 'বাঁচতে হলে ঘর আর ছাদ দুইই চাই।'

'ঠিকই তো।' গৌরীকে সমর্থন করতে চাইল কমলিকা : 'বাঁচতে হলে কাব্য আর নাটক দুইই চাই।'

'মানে তোর দিদির অজয়দা আর সন্তোষদা দুজনকেই চাই।'

আর উত্তরে উমা, যে এর মধ্যে সব বুঝেছে সব জেনেছে, খিল খিল করে হেসে উঠল।

'কেন মাস্টার মশায়ের বাড়িও যেতে পারে।' কমলিকা সাহসে বুক বাঁধল।

'কোন মাস্টার?' শিবনাথ প্রশ্ন করলে : সপ্তাহে তিন দিন যে পড়াতে আসে?'

'হ্যাঁ, সু[illegible]বাবু। তাকে দিদি একদম দেখতে পারে না।'

'কেন, তার অপরাধ—'

'এক ঘন্টা পড়াবার কথা, দু ঘন্টা থেকে যায়।'

'দিদি বুঝি বেশিক্ষণ পড়তে চায় না!' শিবনাথ বুঝি বা একটু বাঁকা করে বলল।

এতে আবার গৌরীর উপর কালিমা পড়তে পারে ভেবে কমলিকা প্রতিবাদ করে উঠল : 'আহা, গৌরী যদি পছন্দ না করবে তাহলে ভদ্রলোক বাড়তি সময় থাকে কী করে? কত বড় পণ্ডিত। পড়ার কোর্সের বাইরেও কত জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, কত দেশবিদেশের গল্প—'

'অনেক উত্তেজনার খোরাক!' শিবনাথ আবার একটু খোঁচা মারল।

'বা ইউরোপ-আমেরিকা ঘোরা লোক।' গর্বের ভাব করল কমলিকা : 'কত তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। গৌরী বলে, তাঁকে শোনাই একটা মহৎ উত্তেজনার মধ্যে চলে আসা।'

'যার ফল, বাড়িতে না বলে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বাইরে কাটানো।'

'বাইরে রাত কাটানোটাও তো একটা মহৎ উত্তেজনা।' শিবনাথ বললে।

'তা মধ্যরাত্রি এখনো হয়নি।' উমা বাহাদুরি করতে চাইল।

'সত্যি, কটা বাজল?' উদ্বেগে চঞ্চল হল কমলিকা।

ঘরে ঘড়ির দিকে তাকাল শিবনাথ। বললে, 'দশটা বেজে দশ।' পরে তাকাল উমার দিকে : 'মধ্যরাত্রির এখনো কিছু বাকি আছে।'

'ওঁকে তো না জানালে আর নয়।' এ আরেক উদ্বেগে পড়ল কমলিকা।

গৌরী এখনো বাড়ি ফেরেনি, তার এখনো খোঁজ নেই তাই তার সম্বন্ধে এখন বিস্তৃত কথা উঠেছে। আর তারই জন্যে একটু এদিক-সেদিক জানতে পারল শিবনাথ। নইলে এ বাড়িতে থেকেও ভাসা ভাসা যেটুকু চোখে পড়েছে তার বাইরে আর কোনো তার জিজ্ঞাসা ছিল না, কৌতূহল ছিল না। নিজের কাজকর্ম নিয়েই সে মশগুল ছিল। তাছাড়া, কিছু শাসন-ত্রাসন করতে গেলেও তো ভারী মানত তাকে! তাছাড়া, যেখানে মাথার উপর দাদা-বৌদি বর্তমান আছে। কিছু বলতে গেলে বৌদিই হয়তো পাখা মেলে ঢাকত মেয়েকে। আর কে না জানে, অন্যের ব্যাপারে সুগন্ধই হোক দুর্গন্ধই হোক, নাক না ঢোকানোটাই সভ্যতা।

কিন্তু শঙ্করনাথের কানে খবরটা তুলতে দেখা গেল শঙ্করনাথ আদ্যোপান্ত অজ্ঞান। সে তার ওকালতি নিয়ে এত বিভোর, মেয়ের স্থিতিগতির ত্রিসীমানায়ও আসেনি কোনোদিন। শিবনাথ না হয় যুক্তাক্ষরটাই জানে না, শঙ্করনাথ একেবারে বর্ণজ্ঞানবিবর্জিত।

'গৌরী বাড়ি নেই।' বৈঠকখানা থেকে উপরে এলে কমলিকা বললে।

'বাড়ি নেই তো যাবে কোথায়?' কথাটা শঙ্করনাথ উড়িয়ে দিতে চাইল : 'দেখ ঘরে ঘুমিয়ে আছে।'

'দেখেছি। ঘরে নেই।'

'নিজের ঘরে না হয়, অন্য কোনো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে হয়তো।' গায়ের থেকে শার্টটা খুলল শঙ্করনাথ।

'দেখেছি তন্ন তন্ন করে। ছাদ বাথরুম বাগান সব খালি।'

'সব খালি? কী বুদ্ধি! সব খালি তো যাবে কোথায়?' শঙ্করনাথ খেঁকিয়ে উঠল।

'যাবার তার কত জায়গা আছে।' কমলিকা উদাস-সুরে বললে।

'কত জায়গা আছে মানে?' গেঞ্জিটা খুলতে যাচ্ছিল গা থেকে, মাঝপথে থেমে পড়ল শঙ্করনাথ।

'সে সব খুব সম্মানের জায়গা, তার জন্যে ভাবি না'—স্বামীর নিরেটত্বকে উপেক্ষা করতে চাইল কমলিকা।

আরো কী বলতে যাচ্ছিল শঙ্করনাথ ঝাঁপিয়ে পড়ল : 'ভাবো না মানে? ঘরের বাইরে মেয়েদের আবার সম্মানের জায়গা কী! বলি, যায় কোথায়?' এক টানে খুলে ফেলল গেঞ্জি।

'মেয়ে তোমার কবিতা লিখতে পারে, তার কবিতা ছাপা হয় ম্যাগাজিনে। সে সব কিছু খবর রাখো?'

'তাতে বাইরে যাবার কী!'

'বা, সম্পাদকের অফিসে যেতে হবে না?'

'সম্পাদকের অফিস কি রাত্রেও খোলা থাকে?'

'আহা কী বুদ্ধি! মাঝে মাঝে বাড়ি যেতে হয় না তদবির করতে? তদবির ছাড়া কি ছাপা হয়? শুধু গুণেই কি আর চাকরি পায় কেউ?'

'তদবির করতে বাড়ি গিয়েছে? তাও রাত্রে? সাড়ে দশটায়?' শঙ্করনাথ লাফিয়ে উঠল : 'তুমি সেই হতচ্ছাড়া সম্পাদকটার নাম বলো, থাকে কোথায়?'

'আহা, তার বাড়িতেই গেছে তা বলছে কে?' কমলিকা গর্বের গন্ধ মাখিয়ে বললে, 'তাছাড়া লিখে নাম করেছে, কত তাকে ডাকছে সভায়, আবৃত্তিতে কবিসম্মিলনে—'

'গ্রীক না ল্যাটিন, তুমি এ সব কী বলছ, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।' শঙ্করনাথ গা-ছাড়া অবস্থায় বসে পড়ল চেয়ারে।

'তুমি বুঝবে না তাতে আর আশ্চর্য কী! নজির ছাড়া কোনো নতুন পয়েন্ট তুমি বোঝো?' জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল কমলিকা। বললে, 'প্রোফেসারদের বাড়িতেও যেতে পারে।'

'রাত্রেও তারা পড়ায় নাকি? তারা ঘুমোয় না?'

'আকাট আর কাকে বলে?' কমলিকা ঝামটে উঠল : 'শুধু পড়তেই বুঝি যায়, তদবিরে যেতে হয় না?'

'সেখানেও আবার তদবির!' হাঁ হয়ে রইল শঙ্করনাথ।

'সেখানে তদবির ফার্স্টক্লাস পাবার জন্যে।'

'বলো বলো সে প্রফেসরের নাম বলো।' শঙ্করনাথ লাফিয়ে উঠল : 'আমি সেই হতচ্ছাড়াকে দেখে নেব।'

'বা প্রোফেসরের বাড়িই গেছে তা বলছে কে?' কমলিকা তাকাল এদিক-ওদিক : 'থিয়েটারেও যেতে পারে।'

'থিয়েটার দেখতে যাবে, তোমাকে ছাড়া? আমাকে ছাড়া?' বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে রইল শঙ্করনাথ, বসতে গিয়ে আটকে রইল মাঝপথে।

'কী বুদ্ধি, থিয়েটার দেখতে যাবে কেন? থিয়েটার করতে যাবে।'

'থিয়েটার করতে!' ধাক্কা মেরে চেয়ারে কে বসিয়ে দিল শঙ্করনাথকে : 'গৌরী থিয়েটার করে নাকি?'

'এ তোমার পেশাদার থিয়েটার নয়। এ অতিথি-থিয়েটার।'

'অতিথি-থিয়েটার?'

'হ্যাঁ, এমেচারের বাঙলা অতিথি। 'মৌনমুখর' বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে পার্কে প্যান্ডালে স্টেজ খাটিয়ে ছোটখাটো নাটক করে, তাতে প্রধান ফিমেল য়্যাকট্রেস তো গৌরীই।'

'মৌনমুখর?' শঙ্করনাথ মৌন হবে না মুখর হবে ঠিক করতে না পেরে ছটফট করতে লাগল : 'কী বলছ তুমি? গৌরী য়্যাক্ট করে?'

'কেন করবে না? তার য়্যাক্টিং দেখেছ? দেখলে তোমাকেও ক্ল্যাপ দিতে হত।'

'তুমি দেখেছ? দিয়েছ ক্ল্যাপ?'

'দিয়েছি বৈ কি।'

'সে তো মুখরে দিয়েছ, এখন তবে মৌনে দাও।' হুমকে উঠল শঙ্করনাথ : 'সেই প্রতিষ্ঠানটার কর্তা কে?'

'সেইখানেই গিয়েছে তা কে বললে?' কমলিকা কী ভাবতে চেষ্টা করল, বললে, 'আজ তো প্লে-র কোনো নোটিশ দেখিনি কাগজে। হলে নিশ্চয়ই আমাকে জানাত।'

'তুমিই তা হলে এ ব্যাপারে তার উৎসাহদাত্রী?'

'কেন দেব না শুনি? আমরা না হয় সে যুগে অপদার্থ ছিলাম, তাই বলে এ যুগের মেয়েকে মানুষ হতে দেব না?' প্রায় পেখম মেলল কমলিকা : 'আর্টে না থাকলে এ যুগের মেয়ে স্মার্ট হয় কী করে?'

'কিন্তু আমি তো এর বিন্দুও জানি না বিসর্গও জানি না।'

'তুমি কী করে জানবে? তোমার কি রুচি আছে, না রস আছে? তুমি কি হ্রস্ব দীর্ঘ বোঝ কিছু? তোমার শুধু নথি আর আইন আর টাকা।' কমলিকা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, 'ওর যাবার জায়গা একটাও খারাপ নয়, কিন্তু প্রত্যেকবারই আমাকে জানিয়ে যায়, কিন্তু আজ কিছু বললে না কেন?'

'তোমাকে জানিয়ে যায়, কই আমাকে তো জানায় না!'

'তুমি কি জানতে চাও কত ওর রূপ গুণ, চেয়েছ কোনোদিন জানতে? আজ নিমন্ত্রণ, কাল কবিসম্মিলন, পরশু সিম্পোসিয়াম, তুমি কোথায়? তুমি তোমার নথিতে-নজিরেই ভরপুর। তাই যেটুকু পেরেছি আমিই জেনেছি, আমিই উৎসাহ দিয়েছি।'

'সেই তোমাকেই বুঝি বলে যায়নি আজ? আর তাই আজ আমাকেও তোমার বলতে হল?'

'হ্যাঁ, নইলে কে তোমাকে ঘাঁটাতে যেত? আগে আগে আরো কত রাত্তিরে ফিরেছে, হয় তখন তুমি কাজে নয় ঘুমে, তুমি জানতেও পারোনি।'

'আজ জেনেছি। চরম জেনেছি। শিবনাথ!' গর্জে উঠল শঙ্করনাথ, 'থানায় যা, পুলিশে খবর দে।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল শিবনাথ, ঘরে এল।

'যা, থানায় যা শিগগির। খবর দে গৌরীকে নিয়ে গিয়েছে।'

'কারা নিয়ে গিয়েছে?' শিবনাথ আকাশ থেকে পড়ল।

'ঐ যে কে কবিতা লেখে, পত্রিকার সম্পাদক কী নাম লোকটার?'

'অজয় বাগচী।' উমা বললে।

'আর ঐ যে কে প্রোফেসর? পড়ায় গৌরীকে?'

'সুনীতীশ ঘোষ।' দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বললে কমলিকা।

'আর যেটা থিয়েটার করে বেড়ায়, 'গোণমুখ্য' না জানি কী কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তা?'

'সন্তোষ দাস।'

'ঐ তিনটেকেই য়্যারেস্ট করতে বল।'

'য়্যারেস্ট করবে কী! তারা কী করেছে?'

'কী করেছে তা য়্যারেস্ট করলেই বোঝা যাবে। যা, গিয়ে বলগে ঐ তিনটেকে আমরা সন্দেহ করি।'

কমলিকা স্তব্ধ হয়ে রইল।

শিবনাথ বললে, 'এখুনি থানায় যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'নিশ্চয়ই ঠিক হবে। যত দেরি হবে ততই এভিডেন্স ট্যাম্পার্ড হবার সম্ভাবনা।'

'কিন্তু ওদের নামে যে কেস করবেন মেটিরিয়্যালস কই?'

'মেটিরিয়্যালস ইমমেটিরিয়্যাল। পুলিশ এলেই ওদের থেকে পেয়ে যাবে মালমশলা। এখন তো কোনো প্রমাণের কথা নয়, এখন সন্দেহের কথা। তুই যা থানায়।' শঙ্করনাথ গেঞ্জিটার জন্যে হাত বাড়াল : 'তুই না যাস তো আমি যাচ্ছি।'

'ছি', কমলিকা বাধা দিতে চাইল : 'তুমি মিছিমিছি একটা সম্ভ্রান্ত মেয়ের সম্মান বিপন্ন করবে? বাবা হয়ে রাষ্ট্র করবে কুকথা?'

'এর আবার সন্ধ্যা কী! এ তো সর্বনাশ, সর্বনাশের কথা। রাত এগারোটা হল মেয়ের এখনো দেখা নেই। মেয়ে থিয়েটার করছে! এ তো আগুন লাগার কথা। এ কথা আর চাপবার কী, এ তো ছাদে উঠে চেঁচিয়ে দিগ্বিদিকে রাষ্ট্র করবার কথা—'

'আপনি কেন উত্তেজিত হচ্ছেন?' শিবনাথ এল শান্ত করতে : 'হয়তো কোনো ন্যায্য কারণেই আসতে পারছে না, কোথাও আটকা পড়েছে।'

'ঝড় নেই বৃষ্টি নেই প্রসেশন নেই, আটকা পড়বে কী!' ঘরের মধ্যে অস্থির পায়ে ছুটোছুটি করতে লাগল শঙ্করনাথ : 'ওকে বাঘে ধরেছে।'

'বাঘে! চোখ কপালে তুলল কমলিকা।'

'হ্যাঁ, ওকে কবিতে ধরেছে, নটুয়ায় ধরেছে, গুরুতে ধরেছে—'

'গুরু আবার তুমি কোথায় পেলে?' কমলিকা প্রতিবাদ করল।

'ঐ যে পড়ায় প্রাইভেটে, কানে তন্ত্রমন্ত্র উপদেশ দেয়, মাইনের উপরেও তদবিরের দক্ষিণা চায় সে গুরু নয় তো কী!' গেঞ্জিটা পরল শঙ্করনাথ : 'সব কটাকে আমি হাজতে পুরব। জগজ্জনকে জানাব এদের কীর্তিকলাপ। ফলাও করে বার করব কাগজে। ওড়িয়াস ভার্মিন কতগুলো।'

শিবনাথ আবার বাধা দিল। বললে, 'থানায় না গিয়ে আমার মতে হাসপাতালে যাওয়া উচিত।'

'হাসপাতালে!' শার্টটা গায়ে দিতে-দিতে থামল আবার শঙ্করনাথ।

'মানে কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কিনা তাই আগে খোঁজ নেওয়া দরকার।'

'সব পুলিশে খুঁজবে। আমরা কি চিনি সকল হাসপাতাল?'

কমলিকা পথ আটকাল। বললে, 'বারোটা পর্যন্ত দেখ। নাইট শোতে যদি কোনো সিনেমায় গিয়ে থাকে! কিন্তু', নিজের মনেই আবার গুঞ্জন করল কমলিকা : 'কিন্তু, আমাকে বলে যাবে না?'

'তুমি তখন কোন শো-তে ছিলে তার ঠিক কী! বলবার সময় পায় নি। ঠিক বলেছি, ওকে বাঘে নিয়েছে। বাঘের ঝাড় নির্বংশ করতে হবে।' পাগল হয়ে গিয়েছে শঙ্করনাথ।

অনেক কষ্টে তাকে বারোটা পর্যন্ত ঠেকানো গেল। একটা পর্যন্ত। ফিরল না গৌরী।

এর মধ্যে অনেক জায়গায় টেলিফোন করতে চাইল শঙ্করনাথ। কমলিকাই বাধা দিল। বললে, 'চতুর্দিকে আত্মীয়মহলে এখুনি এত জানাজানি করার কী দরকার। যদি তেমন কোনো আত্মীয়বাড়ি যেত তারাই জানাত ব্যস্ত হয়ে। হয়তো আসলে যা দেখা যাবে সামান্য ব্যাপার, তাই নিয়ে আগে থাকতে হৈ-হৈ করার কোনো মানে হয় না। ধৈর্য ধরতে শেখেনি, উকিল হয়েছে!'

দুটো পর্যন্ত কিছু নেই।

শুতে গিয়েও শুতে পারল না শঙ্করনাথ। আর চোখ ছলছল করে অন্ধকারে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল কমলিকা।

পোড়ারমুখো টেলিফোনটাও একবার বাজে না?

'শিবনাথ কোথায়?' রাত আড়াইটের সময় খোঁজ করল শঙ্করনাথ।

'সে তার ঘরে ঘুমুচ্ছে।' বললে কমলিকা।

'ঘুমুচ্ছে? তা হলে থানায় যাবে কে?' খাট থেকে নেমে পড়ল শঙ্করনাথ।

'থানায় যাবার কী দরকার! টেলিফোন করে দাও। তোমার সব তাতে একটা হুলস্থুল বাধানো। সবখানেই চেঁচামেচি।' গলা নামাল কমলিকা : 'আস্তে-আস্তে বলো মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, কখন বেরিয়েছে, এখনো বাড়ি ফেরেনি।'

টেলিফোন তুলে নিল শঙ্করনাথ।

'হ্যাঁ মশাই, প্রতিবিধান চাই, সব কটাকে জেলে পোরা চাই। নোটো নেচো চলবে না, চলবে না উড়ুক্কু পায়রা। আর তদবির ছাড়া ফার্স্ট ক্লাশ নেই এ কেমনতর প্রোফেসর? সব কটাকে টিট করুন। মেয়ে সাবালক কী বলছেন মশাই? একুশ বছর বয়স হলে কী হবে, একরত্তি বুদ্ধি। খালি এক বাণ্ডিল নার্ভ, এক প্যাকেট উত্তেজনা। ভুল বুঝিয়ে কেউ ফুসলিয়েছে নিশ্চয়—বাই ফোর্স অর ফ্রড—'

'অত চেঁচাচ্ছ কেন?' কমলিকা তড়পে উঠল।

'হ্যাঁ মশাই, চেঁচিয়েই বলব। যদি আগে থেকে টের পেতাম, চেঁচিয়েই সব বন্ধ করতাম। এখন যখন পরে জেনেছি চেঁচিয়েই জানাব সকলকে। আগুন লাগাব। চোরের পিছেও লোকে চেঁচায়। সর্বত্র গুজগুজ ফিসফিস বলেই এই কাণ্ড।'

'হ্যাঁ, বেশ তো, চেঁচামেচিতে আমরাও কসুর করব না। দেখি কদ্দুর কী পারি।' থানা বুঝি হেসে উঠল।

পরদিন সকালে ইনস্পেকটর মুখার্জি এল এনকোয়ারিতে।

প্রথমেই শিবনাথকে পাকড়াও করলে। নামধাম শিক্ষা দীক্ষা কর্মের বিবরণ সব বিস্তারিত লিখতে শুরু করল।

শঙ্করনাথ বিরক্ত হল। বললে, 'ও আমার ভাই। মেয়ের কাকা।'

'তাতে কী! যা দিনকাল পড়েছে বাবা-কাকারও নিস্তার নেই।' মুখার্জি মুখ তুলল : 'আপনাদের বুঝি মহাদেবের সংসার?'

'হ্যাঁ, আমি শঙ্করনাথ, আমার ছোট ভাই শিবনাথ। আমাদের বাবা ছিলেন ধূর্জটি। আমার ছেলে অমরনাথ লণ্ডনে। বড় মেয়ে শঙ্করী শ্বশুরবাড়ি আর ছোট দুই মেয়ে গৌরী আর উমা। শুধু ইনিই বিদেশিনী।' স্ত্রীর দিকে ইশারা করল শঙ্করনাথ।

মুখার্জি ত্রস্ত হয়ে তাকাল।

'ইনি কমলিকা।'

এত দুঃখেও কমলিকাকে অপাঙ্গে একবার ভ্রূকুটি করতে হল।

চকিতে বুঝে নিল মুখার্জি। এক রকম মা আছেন মেয়ের মধ্য দিয়েই যাঁরা পূর্ববঞ্চনার কৃতার্থতা খোঁজেন, ইনি হয়তো সেই জাতের। পথ্যে নেই নেপথ্যে আছেন।

'কিছু ঝগড়াঝাটি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ইনস্পেকটর।

'কিছুমাত্র না।' বললে কমলিকা।

'শেষ দেখেছেন কে? কটার সময়? কী অবস্থায়?'

'আমি তো দেখলাম, ছুটির দিন, দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে ঘরে গিয়ে শুল—'

'আমিও তাই।' কমলিকাকে সমর্থন করল উমা।

'তারপর বিকেলে চায়ের সময় টেবলে পেলাম না।' বললে কমলিকা, 'ভাবলাম বুঝি ঘুমুচ্ছে। সন্ধে হয়-হয় তবু দেখা নেই। তখন টনক নড়ল।'

'ঘরে গিয়ে দেখি দরজা খোলা, দিদি নেই।' লেজুড় জুড়ল উমা।

'তা হলে কী রকম সেজেগুজে বেরিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।' হাসল মুখার্জি: 'চলুন ওর ঘরটা দেখে আসি।' ক-পা এগিয়েই আবার থামল: 'হ্যা, একটা কথা, বাড়ির লোকজন সব মজুত আছে তো?'

'লোকজন মানে?' শঙ্করনাথ এগোল।

'লোকজন মানে ঠাকুর চাকর ড্রাইভার—'

'তা সবাই ঠিক আছে।'

'কিছু মনে করবেন না। আমরা পুলিশের লোক, একটু আনাচকানাচ দেখি। কোণাকুণি তাকাই।'

গৌরীর ঘরে এসে হাজির হল সকলে।

'এই ঘর? এতবড় ঘর? এই ঘরে কে কে থাকে?'

'গৌরী একা।'

'একা?' মুখার্জি অবাক মানল।

'ঘর বেশি থাকলে আবার এই দুর্দশা!' বললে শঙ্করনাথ: 'এম, এ পড়ছে মেয়ে, মাস্টার-টাস্টার আসছে, সিরিয়স স্টাডি, তাই একটা বড় ঘরই দিয়েছি ওকে। কিন্তু হায়, এত বড় ঘরেও কুলোল না।'

'ওমা, ও কী,' কী যেন পেয়েছে এমনি ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠল উমা, দিদি তার ব্যাগটা ফেলে গেছে।'

'এই একটাই ব্যাগ নাকি?'

'সম্প্রতি এটাই তো ব্যবহার করছিল।' কমলিকা বটুয়াটার মুখ খুলল। কী আশ্চর্য, ভিতরের সব জিনিস নিটুট আছে। এমন কি, যে ছোট আরেকটা টাকা-পয়সার ব্যাগ থাকে, তাও অক্ষত।

'পয়সাকড়ি নিতে হলে পুটলি বেঁধে বুকের মনিব্যাগেও নিতে পারে।'

মুখার্জির কথার ধরনে একটু বা বিরক্ত হল কমলিকা। বললে, 'কিন্তু সেভাবে যেতে তো ও অভ্যস্ত নয়।'

ক্ষমা চাওয়ার মতন করে হাসল মুখার্জি। বললে, 'হয়তো হালকা যেতে চায়। এমন জায়গায় যেতে চায় যেখানে হয়তো সামান্য লেডিজ ব্যাগটাও একটা প্রকাণ্ড বোঝা।'

'সে আবার কেমন জায়গা!'

পোশাক-আশাক সম্বন্ধেও একটু গবেষণা করল মুখার্জি। নানা কোণ থেকে আলো ফেলে এটা সিদ্ধান্ত হল তেমন কোনো সাজগোজ করেও যায়নি গৌরী। যেন এক বস্ত্রে চলে গিয়েছে। হয় তাকে যেমন পেয়েছে তেমনি কেউ হরণ করে নিয়েছে, নয়তো এমন বাঁশি সে শুনেছে যে সাজগোজ করবার সময় পায়নি।

'মেয়ে আমার এমনিতে এত সুন্দর যে সাধারণ শাড়ি একটু হবল্‌ দিয়ে পরলেই মনে হবে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।'

তাই মনে হচ্ছে। কোনো বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা করে যায়নি। তবে কি চুরি? ঘর খোলা পেয়ে ঘুমের মধ্যে থেকে কেউ তুলে নিয়ে গেল?

'দেয়ালে এরা কারা?' জিজ্ঞেস করল মুখার্জি : 'এসব কাদের ছবি?'

উমা ভাবীকালের মেয়ে, সেই যা হোক একটু ওয়াকিবহাল। বললে, 'ইনি ফিল্ম-আর্টিস্ট, ইনি সাহিত্যিক আর ইনি অভিনেতা।'

'এদের সকলেরই ব্যায়ামের ভঙ্গি কেন? ব্যায়ামের পোশাক কেন?'

খুক খুক করে হাসল উমা।

'সত্যিই তো।' চোখ লাগিয়ে দেখল শঙ্করনাথ। 'একজনের পরনে ল্যাঙট, আরেকজনের জাঙিয়া, আর উনি একেবারে উদাসীন।'

'আগে দেখেননি কোনদিন?' শঙ্করনাথের দিকে তাকাল মুখার্জি।

'কী করে দেখব? আমি কি কোনোদিন এ ঘরে ঢুকি?' শঙ্করনাথ মাথা চুলকোতে লাগল।

'কেন, হিরো ওয়ারশিপ কি খারাপ?' কমলিকা ফোঁস করে উঠল।

'তা, হিরোদের কি আর কোনো চেহারার ছবি নেই?'

'তা হয়তো আছে। কিন্তু সে সব তো মামুলি, একঘেয়ে। গৌরী চিরকালই একটু ও[illegible] ভক্ত। সেইটেই তো ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আজকালকার দিনে—'

কমলিকার বক্তৃতা শেষ হবার আগেই শঙ্করনাথ গর্জন করে উঠল : 'ও সব ফেলে দাও ছিঁড়ে, দেয়াল পরিষ্কার করে দাও।'

কটা দেয়াল পরিষ্কার করবে? এ দেয়ালে এরা কারা?

ওয়াকিবহাল উমা বললে, 'এটা অজয়দার, ওটা সন্তোষদার—'

'প্রোফেসরের নেই?' খিঁচিয়ে উঠল শঙ্করনাথ।

'এই যে আছে।' এই বলে মুখার্জি টেবিলের উপর থেকে একখানা বই

এগিয়ে দিল। খুলে দেখাল বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় মালিকের নাম লেখা, আর সে নাম সুনীতীশ ঘোষ।

'কী, কী বই?' উৎসুক হয়ে শঙ্করনাথ বইটা দেখতে লাগল। বললে, 'এ তো বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। বৈষ্ণবদের বই। রাধিকার সখী ললিতাকে নিয়ে লেখা।'

'কিশোরী ভজনের বই বটে, কিন্তু এ ললিতা সে ললিতা নয়, এ হচ্ছে লো-লি-তা।' অদ্ভুত করে হাসল মুখার্জি : 'পড়ে দেখবেন।'

'রক্ষে করুন।' শঙ্করনাথ ছুঁড়ে ফেলে দিল বইটা।

'আর এ সব বুঝি এলবাম?' টেবিলের গহ্বরে হাত ঢুকিয়েছে মুখার্জি।

'এ সব দিদির নানা পোজের ছবি। যত যেখানে নাটক করেছে তার।' স্তুতিভরা চোখে বললে উমা, 'আর এটা কাটিংসএর ফাইল। যত যেখানে দিদির সম্বন্ধে লিখেছে, মেনশন করেছে, তাদের টুকরো। আঠা দিয়ে পেস্ট করা।'

'আর আলমারিতে এসব কী বই?'

'ছবির।'

'তার মানেই সিনেমার ছবির?'

খুক খুক করে হাসল উমা।

'কই আমি তো এ সব কিছু জানি না।' গর্জে উঠল শঙ্করনাথ : 'শিশিবোতলওয়ালা ডেকে বিক্রি করে দে। নয়তো ছাই করে দে উনুনে।'

'এ বাড়িতে ঠাকুর ঘর নেই?'

ভূতের মুখে রামনাম শোনার মত মুখ করল শঙ্করনাথ। তাকাল স্ত্রীর দিকে। বাড়িতে এতগুলি ঘর, এমন একটা বিলাসের কথা মনে হয়নি তো?

'এমন একটা কোথাও ঘর নেই যেখানে দুদণ্ড বসলে মনটা ঠাণ্ডা হয়? নইলে আর ঠাকুর কী বলুন!' হাসল মুখার্জি : 'একটা মন শান্ত করবার যন্ত্র।'

'আমরা পুজো-টুজো করি না। আমরা পণ্ডিচেরির ভক্ত।' বললে কমলিকা।

মুখার্জি শঙ্করনাথকে লক্ষ্য করে বললে, 'আপনি কাকে সন্দেহ করেন?'

'সব কটাকেই সন্দেহ করি। ওদের মধ্যে কেউ পাচার করেছে মেয়েটাকে।' লাফিয়ে উঠল শঙ্করনাথ।

তিনজনকেই ডাকাল। বলে পাঠাল, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থানায়ই নিয়ে যেতে পারি, তবে এ বাড়িতে হলেই সুবিধে। যদি আসতে না চান আসবেন না। সেক্ষেত্রে এ বাড়ির জিনিসপত্র সব 'সীজ' করে আপনাদের সহ থানায় চালান করতে হবে। তাতে শুধু ঝামেলা বৃদ্ধি। আপনাদেরও হায়রানি।

আশ্চর্য, তিনজনকেই বাড়ি পাওয়া গেল। তিনজনই রাজি হল আসতে।

প্রথম ডাক পড়ল অজয়ের।

'গৌরী কোথায়?'
'তা আমি কী করে বলব?'
'এবার কটা রবীন্দ্রজয়ন্তী করেছেন?'
'তা ত্রিশ-চল্লিশটা হবে।'
'এবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর ফাংশান করতে গিয়ে কটা জাংশান—আই য়্যাম সরি—কটা বিয়ে হয়েছে জানেন?'
'কী করে জানব!'
'গোটা দশেক হয়েছে আমার জানা-মত। আপনি টিম কমপ্লিট করুন। এগারো নম্বরেরটা আপনি করে ফেলুন।'
'আমি?' অজয় বাগচী ফ্যাকাশে মারল। বললে, 'কাকে?'
'আর কাকে? গৌরীকে।'
স্থলে দাঁড়িয়েই খাবি খেতে লাগল অজয়। শঙ্করনাথ আর কমলিকার দিকে তাকাল ইঁদুরের মত। বললে, 'কী যে বলেন!'
'সে সাহস যদি নেই তবে গুচ্ছের প্রেমপত্র লিখেছেন কেন? এই যে এক বাণ্ডিল চিঠি?'
চমকে উঠল শঙ্করনাথ। কমলিকাও চোখে মুখে আতঙ্কের ছবি ফোটাল। উমা হাসতে লাগল আঁচল চেপে।
অজয় বললে, 'ও সবও একরকম গদ্য কবিতা। নিজের বাসনাকে এক্‌জস্ট করবার উপায়।'
'বৈধভাবে করলেই হত। আই মিন বিয়ে করে!'
'ওঁরা কি দিতেন?' অজয় ভীতু চোখে শঙ্করনাথের দিকে তাকাল।
'কক্‌খনো দিতাম না। ইডিয়ট, ফুল—', হাঁকার ছাড়ল শঙ্করনাথ।
'ওঁরা দিতেন না তো আপনি জোর করে নিয়ে যেতেন গৌরীকে। গৌরী সাবালিকা মেয়ে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাপ-মায়ের কিছু করার সাধ্য ছিল না, চাইতেন পুলিশ প্রটেকশান—'
'কিন্তু গৌরীই কি আর রাজি হত!'
হাসল মুখার্জি। বললে, 'যান, বাড়ি যান।'
'সে কি, য়্যারেস্ট করলেন না?' শঙ্করনাথ আবার লাফাল।
'ও নেয়নি গৌরীকে। ও জানে না কিছু। ও শুধু লিখে বাসনাকে এক্‌জস্ট করতে জানে। ওকে দিয়ে কিছু হবে না।'
নিচে, বৈঠকখানায়, আরো দুজন অপেক্ষা করছে।
এবার সন্তোষ দাসের ডাক পড়ল।
'গৌরী কোথায় জানেন?'
'জানি না। তবে যেখানেই আছে, বেশ ভিসুয়ালাইজ করতে পারছি, নাটক করছে।'
'নাটক করছে?' এক পলক থমকাল মুখার্জি।

'হ্যাঁ, নাটক ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। এই যে আপনার সঙ্গে আমার মিটিঙ, এটাও নাটক ছাড়া কিছু নয়।'

'তাই এলবামে এত নাটুকে ছবি আপনার। আর সবই গৌরীর সঙ্গে।'

'তাই তো হবে। একটা সঙ্ঘর্ষশীল বস্তুর সঙ্গে আরেকটা সঙ্ঘর্ষশীল বস্তু।' বাঁ হাতের তালুর উপর ডান হাতটা মুঠ করে রেখে বোঝাতে চাইল সন্তোষ।

'আর সব ছবিতেই গায়ে হাত!'

'ও আপনি মানুষ ভাবছেন কেন, চরিত্র ভাবুন।'

'চরিত্রই ভাবছি। তাই, যেমন এ ছবিতে, অভিমন্যু হয়ে যখন উত্তরাকে জড়াচ্ছেন, তখন সন্তোষরূপে কোনো সন্তোষই পাচ্ছেন না?'

'সন্তোষ অনুপস্থিত।' নাটকীয় ভাবেই ভঙ্গি দিল সন্তোষ।

'একবারটি উপস্থিত হন না। আপনার তো বস্তুনিষ্ঠ বলে খ্যাতি আছে। অভিমন্যু যখন বাস্তব তখন তার অনুভূতিটাও বাস্তব। আর সেটা সন্তোষেরই অনুভূতি। যেমন কেউ অভিমন্যুকে প্রহার করলে সন্তোষেরই ব্যথা লাগত। সেই সন্তোষের জন্যেই এত ছবি, এত ফ্ল্যাশ-বালব।'

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

'বলতে চাচ্ছি গৌরীকে ধরে-বেঁধে নিয়ে যান নাটকীয় ভাবে।'

'নেওয়াটা নাটকীয় হলেও, পরে একসঙ্গে থাকাটা নাটকীয় করি কী করে?' ফাঁপরে পড়ার ভাব ফোটাল সন্তোষ : 'সেই সব সিনগুলো ভাবতে হয়. কী রকম ফার্নিচার হবে, কী রকম ডায়লগ, কী রকম ব্যাকগ্রাউন্ড, কী রকম ব্যাকগ্রাউন্ড-মিউজিক—দু-এক দিনের কথা নয় মশাই—'

'যান। একটা গ্র্যান্ড এক্‌জিট দেখিয়ে চলে যান।' মুখার্জি হাসল।

একটা স্যালিউট করে চলে গেল সন্তোষ।

'সে কি, ওটাকে ছেড়ে দিলেন?' শঙ্করনাথ পিছু নেবার ভঙ্গি করল : 'ওটাকে ধরুন। হাতে হাতকড়া পরালে দেখা যেত কেমন পোজ মারে! ওর নাটকের দলেই কোথাও রেখেছে সরিয়ে।'

'ও না-টক না-ঝাল। একেবারে বিস্বাদ। কৃত্রিম।' মুখার্জি দৃঢ় হল : 'ওর কাছে গৌরী যায়নি।'

নিচে থেকে সুনীতীশ খবর পাঠাল আর কতক্ষণ বসে থাকবে।

'ছাত্রীর ঘরে ওভার-স্টে করতে বাধা নেই, যত যন্ত্রণা একা একা বৈঠকখানায় বসে!' শঙ্করনাথের দিকে পরামর্শের দৃষ্টিতে তাকাল মুখার্জি : 'আর ওকে ডেকে লাভ কী!'

'না, না, ওকে অন্তত য়্যারেস্ট করুন। কোমরে দড়ি লাগান।'

'ওর শুধু আনন্দ বই পড়িয়ে অনূঢ়া ছাত্রীকে কৌতূহলী করা, একটু বা করাপ্ট করার চেষ্টা করা—'

'সেটাই বা কম অপরাধ হল?'

'কিন্তু কিছু বলতে গেলেই চেঁচিয়ে উঠবে, তুমি পুলিশ, তুমি এক্‌সিকিউটিভ, তুমি সাহিত্যের বোঝ কী! ওকে ছেড়ে দি।'

'না, না, ছেড়ে দেওয়া নয়। কিছুতে নয়।' শঙ্করনাথ নিরস্ত হয় না।

'ওকে দিয়ে আর যাই হোক গৌরীর কিনারা হবে না। ও অথর্ব বেদের ভাষ্যকার।

'অথর্ব বেদ মানে?'

'মানে জড়, নিশ্চেষ্ট, যাকে বলে অকর্মণ্য, ও তার পণ্ডিত।' মুখার্জি উঠল।

কেঁদে পড়ল কমলিকা। 'আমার গৌরীর সন্ধান কী করে মিলবে?'

'মিলিয়ে দিচ্ছি।' কাগজপত্র সব কুড়িয়ে নিয়ে মুখার্জি নিচে নামল।

'ওটাকে আমি গুলি করব—' বন্দুকের জন্যে মরীয়া হয়ে উঠল শঙ্করনাথ। দু-হাতে শিবনাথ তাকে ধরে স্থির রাখতে পারছে না।

'আর গৌরীকে?' জিজ্ঞেস করল মুখার্জি।

'ওকে আমি নেপালে পাঠিয়ে দেব, তারো চেয়ে দূরে, তিব্বতে নির্বাসিত করব। ওকে আমি ঘরে তুলব না।'

'শুনুন। অস্থির হবেন না। যাবেন না খুনোখুনির মধ্যে।' মুখার্জি গম্ভীর হল : 'না, চেঁচামেচি করবেন না। ঘরে তুলব না, এ সব রব তুলবেন না। দেয়াল শুনতে পাবে। হাওয়া শুনতে পাবে। আর তুলবেন না কী, গৌরীকে তো বাড়িতেই পৌঁছে দিয়েছি। ও ওর ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ হয়েছে।' মুখার্জি একটা নিশ্বাস ফেলল : 'সেটাও বিশেষ নিরাপদ নয়। নিশ্চিন্ত হতে হলে—'

অনেক বকছে মুখার্জি। কমলিকা ধমকে উঠল : 'কোথায় ছিল গৌরী? কোথায় পাওয়া গেল ওকে?'

'ওঁকে বলেছি।' শঙ্করনাথকে ইঙ্গিত করল মুখার্জি : 'কলকাতার এক পাহাড়িদের ঝোপড়িতে।'

'কী বলেন?'

'যখন জিজ্ঞেস করলাম চাকর-বাকররা সব ঠিক আছে, উনি বললেন আছে, কিন্তু বুড়ো নেপালী দারোয়ানটা যে ছিল না তা বলেননি।'

'বা, সে তো ছুটিতে ছিল।'

'হ্যাঁ, ছিল, আর তার জোয়ান ছেলে বজ্র-বাহাদুরের সঙ্গেই ভেগেছে গৌরী।'

শঙ্করনাথ চেয়ারে বসে নিঃশব্দে কাঁপতে লাগল। গুলি-করব গুলি-করব মুখে না বলে বলছে কাঁপুনি দিয়ে।

'সে কী! সেদিন মোটে লেগেছে ছোঁড়াটা।'

'অনেকদিন থেকেই লেগেছে অনেকে।' নিষ্ঠুর স্বরে বললে মুখার্জি। 'কাব্য নাটকে সাহিত্যে তিক্তবিরক্ত হয়ে গিয়েছে। তাই সমতল ছেড়ে চলে এসেছে পাহাড়ে। ভেবেছিল, যা জেনেছি জেরা করে, সন্ধেসন্ধিই ফিরতে

পাবে, কিন্তু একেবারে পাহাড়ী ঝোপড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে, তাই বজ্র-বাহাদুর ছাড়তে চায়নি—'

'ধরেছেন তো ছোঁড়াটাকে?' কমলিকা প্রশ্ন করল।

'ধরেছি, রেখেছি জিম্মায়।'

'কী অকৃতজ্ঞ!' খেদোক্তি করল কমলিকা।

'ওটাকে জেলে পুরুন।' চেঁচানো বারণ, তাই কাতর স্বর বার করল শঙ্করনাথ।

'তা পুরছি। কিন্তু তার আগে আরেকটা কাজ করুন। গৌরীকে ঘরে না রেখে হাসপাতালে নিয়ে যান।'

'হাসপাতাল?'

'হ্যাঁ, ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখুন কোনো ড্যামেজ হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে—'

শঙ্করনাথ আর সম্বরণ করতে পারল না। লাফিয়ে উঠল, 'গুলি করব, খুন করব ছোঁড়াকে। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেব তিব্বতে কৈলাসে—'

'আর যদি ড্যামেজ না হয়!' কমলিকা বললে।

হ্যাঁ, সেই হাসপাতালেই যেতে হল শিবনাথকে। সেই গৌরীর জন্যে। গৌরীকে নিয়ে। চুপ চুপ চুপ চুপ।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল, কোনো ড্যামেজ হয়নি।

কিছুই হয়নি। সমস্ত কাহিনীটাই ভূয়ো, বানানো। হাওড়ায় পিসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। কথায় কথায় বাসওয়ালাদের স্ট্রাইক, রাত্রে ফিরতে পারেনি। পরদিন ফিরেছে।

বজ্র-বাহাদুর যদি চলে গিয়ে থাকে, ছুটির পর তার বাপ বীরবাহাদুর আবার কাজে লেগেছে বলে। হ্যাঁ, অজয় কবিতা লিখে ছাপাবে, কবিতা যদি গদ্য হয়ে উঠতে চায় লিখবে প্রেমপত্র, সন্তোষ একাঙ্ক নাটিকার সেট ভাববে আর সুনীতীশ এক ঘন্টার জায়গায় দু ঘন্টা থেকে পড়াবে আদিরস। আর কমলিকা মেডিটেশন করবে।

আর তুমি মুখার্জি, তুমি একটি স্কাউন্ড্রেল, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের নামে কেচ্ছা রটাতে ওস্তাদ। তোমাকে দেখে নেব। তোমার উপরওয়ালার কাছে নালিশ করব। তোমাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ব। আপাতত বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। ক্লিয়ার আউট।

মুখার্জি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

৮৫। দুর্মদ

এত চেষ্টা করেও ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

সেদিন তো ভ্যানে করে পুলিসই এসে পড়ল। বেঁটে-বেঁটে লাঠি-হাতে বেঁটে-বেঁটে প্যান্টে বেঁটে-বেঁটে কনস্টেবল। সারা গলি কম্পমান। ছোটাছুটি করে কতগুলি ঢুকল পাশ-গলিতে, কতগুলি খোদ বস্তির মধ্যে।

কোন ঘর? এটা না ওটা?

সব ঘর খোলা। ঢুকুন না, দেখুন না—

ভোঁ-ভাঁ। কিছু নেই। কড়া হাঁড়ি উনুন চোঙা নল ব্লাডার—একটা বোতল, গ্লাশ কি ভাঁড় পর্যন্ত নেই।

কী ধরি? কাকে ধরি?

'হুয়েভার ম্যানুফেকচারস পজেসেস আর সেলস—'

হাঁড়িতে বা বোতলে কিছু মাল পেলেও তো পজেশনের অজুহাতে ধরা যেত। বিনা লাইসেন্সে মদ চোলাই করছে এ চার্জ না চললেও মদ দখলে রেখেছে এ চার্জে ঠোকা যেত।

এ যে একেবারে হাওয়া।

'কিছু নেই।' অফিসর গাড়িতে গিয়ে উঠল।

'থাকবে কী করে?' রাস্তায়, ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল : 'পুলিস আসছে খবর পেয়ে আগেই সব সরিয়ে ফেলেছে।'

'খবর ঠিক পেয়ে যায় কিন্তু।' আরেকজন বললে।

'কেন পাবে না?' কে একজন বেপরোয়া বললে, 'পুলিসই থানা থেকে খবর পাঠায়। আমরা যাচ্ছি, মাল সরাও। তারপর হন্তদন্তর ভাব করে আসে। সার্চের প্রহসন করে।'

এসব ফালতু কথা শুনেও কানে নেয় না অফিসর। ভ্যান যেমন ডাঁটের মাথায় এসেছিল তেমনি ডাঁটের মাথায় চলে যায়।

না, সেবার সত্যি সত্যি ধরে নিয়ে গেল মিহিরলালকে।

কতক্ষণ পরে ছাড়া পেয়ে ফিরে এল মিহিরলাল।

'মজা মন্দ নয়,' মিহিরলাল বললে, 'আমি বস্তির বাড়িওলা, তাই মদের ব্যবসা আমারই হতে হবে। এখানে সাত-সাত ঘর ভাড়াটে, তাদের দখল তো আমার দখল নয়। বলি আমার ঘরে কিছু পেয়েছে? আমি বাড়িওলা বলে সব ঘরের কীর্তিকাহিনী আমাকে জানতে হবে? যারা মদ খেয়ে হল্লা করে তাদের জিজ্ঞেস করে দেখ না কে তাদের সাপ্লাই করে। তা হলেই তো কিনারা হয়। শুধু শুধু গরিবকে হয়রানি!'

সবাই বলাবলি করলে, পুলিসকে খাইয়েছে ভারী হাতে।

নয় তো, যদি সত্যি-সত্যিই তোদের ধরবার ইচ্ছে তবে রাত্রে, মাঝরাতে আয় না। মাতালরা যখন রাস্তায় ছড়িয়ে আছে। তাদের দু-একটাকে ধর না, জিজ্ঞেস কর না কে তাদের মদ বেচল? নিজেরা কেউ গুপ্তচর সেজে আয় না—তোদের কেউই একেবারে মদ খায় না এমন তো নয়—দ্যাখ না বস্তির কোন ঘর থেকে মদ আসে। 'হুয়েভার পজেসেস অর সেলস—'

'সব যোগসাজস মশাই, পুলিসের সঙ্গে পাইকিরি বন্দোবস্ত।' পাড়ার লোকেরা বলাবলি করে : 'নইলে এত বড় একটা মদের আড্ডা চলতে পারে?'

না, যেমন করে পারি ধরবই ধরব। ইন্সপেক্টর কোমর বাঁধে।

পাড়ার থেকে থানায় মাঝে মাঝে নালিশ যায়। মাতালেরা রাস্তায় অনেক রাত পর্যন্ত হল্লা করছে। রাত্রের ঘুম বিঘ্নিত হচ্ছে। সিনেমার নাইট-শোর পরে বাড়ি ফিরতে ত্রস্ত হচ্ছে মেয়েরা।

ইনস্পেক্টর তদন্ত করতে আসে। জনে-জনে প্রশ্ন করে।

'কোন ঘরটাতে সত্যি মাল মজুত থাকে?'

'তা আমরা কী করে বলব? আপনারা বার করুন।'

'তা করব। কিন্তু আপনাদের কার উপর সন্দেহ হয়? মানে কে এ সমস্তের মূলে?'

'আর কে? মিহিরলাল।'

'ধরে একদিন মার দিন না—'

'মার দেব?' সবাই থ হয়ে গেল।

'মানে প্রসিকিউশন করে সাজা দেওয়া ভীষণ কঠিন। ওষুধই হচ্ছে মার। পুলিস মারলে কমপ্লেন্ট হবে। পাবলিক মারলে কারু কিছু বলবার নেই। মার খেলেই মদের ব্যবসা তুলে দেবে নির্ঘাত।'

পরে এল বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসরের কাছে। আপনি কিছু জানেন?

'আমার তো বেশ ভালোই লাগে।'

'ভালোই লাগে?'

'হ্যাঁ, মন্দ কী, বিনা-টিকিটে জলসা দেখি—মাতালমেলা।'

ইনস্পেক্টার হাঁ হয়ে চেয়ে থাকে : 'মাতালমেলা?'

'দিব্যি উচ্চাঙ্গের গান শুনি বক্তৃতা শুনি—কেউ বলে আমি রাজা, আমি সুলতান, কেউ বলে আমি সুন্দরবনের বাঘ—'

'মারামারি হয় না?'

'মাঝে মাঝে হয়—সে তো আরো চমৎকার! দেখতে বেশ লাগে। ভাষা-টাসা যা বলে দেহে যৌবন ফিরে আসে।'

'বলেন কী?'

'একটা ঝাড়ুদার আছে, বউ নিয়ে রাত-বিরেতে খেতে আসে। যেমন ভাব তেমনি ঝগড়া। একদিন পুরুষটা ওথেলো হয়ে ডেসডেমোনার গলা টিপে

ধরে, আরেকদিন হ্যামলেট হয়ে ওফিলিয়াকে সে কী আদর! বিনা-টিকিটে এত সব দেখতে পাব কেউ?'

'ঘুমের ব্যাঘাত হয় না?'

'তা আপনার প্যাণ্ডেলের রেডিওর চেয়ে ভালো। রেডিওতে তো সেই একই রেকর্ড বাজছে, এখানে নিত্যনতুন ভ্যারাইটি। কেন এদের এই সুখের ব্যায়ামটুকু ভাঙবেন? ঐ বস্তি থেকে না পায় আরেক বস্তি থেকে খাবে। মাঝখানে আমাদের এই ফ্রি নৃত্যনাট্যটুকু দেখা হবে না। আরো কত দিকে লাইসেন্স ছাড়া লাইসেন্সাস আছে তাদের দেখুন না।'

এ সব কোনো কাজের কথাই নয়। বেআইনী ব্যাপার কিছুতেই চলতে দেওয়া হবে না। পুলিস নিষ্ক্রিয় বা অন্য কিছু—এ অপবাদ দূর করতে হবে।

একদিন সন্ধেসন্ধি পুলিস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বস্তিতে। একটা ঘরে কটা মদভর্তি বোতল আর কিছু হাঁড়ি-কুড়ি সংগ্রহ করল। ধরল মিহিরলালকে।

'হুয়েভার ইউজেস অর কিপস ইউটেনসিলস—'

সেই কেসই চলছে এখন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে।

'য়্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট স্যার, কোনোই কেস নেই।' মিহিরলালের মোক্তার বলছে কোর্টকে : 'যে ঘর থেকে পুলিস মদ সিজ করেছে, বলছে, সে ঘর মিহিরলালের দখলে নয়, নকুলেশ্বরের দখলে।'

'মদের বোতল তো পেয়েছে।' ম্যাজিস্ট্রেট হুমকে উঠল।

'তাও পায়নি, স্যার। য়্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, পুলিস এগুলি প্ল্যান্টিং করেছে। নকুলেশ্বর অন্য জিনিস খেতে পারে, মদ নয়।'

'সে খাবে কেন, সে বেচবে।'

'কিন্তু এখানে কেস স্যার, হুয়েভার সেলস নয়, হুয়েভার কিপস। য়্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট—'

'দেখা যাক। এভিডেন্স হোক।'

ছোট একটা লোক-ঠাসা রুদ্ধশ্বাস ঘরে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট।

হৈ-হাই-গোলমাল।

ফৌজদারি মামলা টুকরো টুকরো করে হয়, দেওয়ানির মত একটানা শুনানি নয়। আর—মামলার সংখ্যাও দিনে ডজন দুয়েক। এটায় একবার এক ছোবল ওটায় আবার এক খাবল, এমনি চলছে। এটার এভিডেন্স, ওটার ফার্দার এভিডেন্স, এটার জেরা, ওটার ফার্দার জেরা—চলছে এমনি ঢালা-উবুড়। ঠোঙায় বেচা মুদির দোকান।

'এটা কী একটা পচা কেস নিয়ে এসেছেন?' কোর্টবাবুকে লক্ষ্য করল ম্যাজিস্ট্রেট : 'মদ পচাই বলে কেসটাও কি পচা হবে?'

তখন আবার পক্ষদের মধ্যে গুনগুনানি শুরু হল—হাকিম টানে কিনা।

যদি টানে আসামীর পক্ষে যাবে, আর শুকদেব হয়, বলা যায় না কী করে।
কিন্তু যাই বলো, শুকদেবেরও সাধ্য নেই এমন মামলায় ঠোসে। বলে মোক্তারের মুহুরি, অনাথ মণ্ডল। সার্চ করে পেয়েছে বলে অথচ সার্চ-লিস্টে সার্চ-উইটনেসদেরই দস্তখত নেই।
তারা দস্তখত করেনি। না করলে কী করা যাবে? জোরজুলুম তো চলবে না।
'তার মানেই সাজানো মামলা। য়্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট—'
'স্যার, এভিডেন্স হোক।' কোর্টবাবুর জায়গায় পি-পি এসেছে।
'এর আবার এভিডেন্স কী! মাল ছিল ধরবার সময় যারা ছিল বলছেন তাদের সইই নেই।' ম্যাজিস্ট্রেট ধমকে উঠল, 'তারা যদি দেখেই থাকে তবে তারা সই করে না কেন? তার মানেই তো—'
অনাথ আশ্বাসের চোখে তাকাল মিহিরলালের দিকে। মানে এই ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে যাবে।
এভিডেন্সে আরো পাওয়া গেল দুটো সাক্ষীর একটাও বস্তির বাসিন্দে নয়। ধারে-কাছেও থাকে না। ওদের চাইতে ঢের-ঢের সম্ভ্রান্ত লোক ছিল পাড়ায়। সাক্ষীদের একজন থাকে অন্য রাস্তায়, আরেকজন তো দোকানদার। সে তার দোকান ফেলে সার্চ দেখতে এসেছে এ অবিশ্বাস্য।
'বানোয়াট কেস স্যার।' মোক্তার লাফিয়ে উঠল : 'ইয়োর অনার উইল সী—'
'এ সব সার্চে উইটনেস পাওয়া কঠিন।' সরকারী উকিল বললে গম্ভীর হয়ে, 'পাড়ার লোক সচরাচর এগিয়ে আসে না। দূর থেকেই আনতে হয়। প্রশ্ন, ওরা দেখেছে কিনা। ওরা বলছে দেখেছে।'
'বাজে কথা।' হাকিমেই রুখে উঠল : 'দেখেছে তো সার্চ-লিস্টে সই করেনি কেন? ওরা দুই জনেই তো সই করতে জানে।'
'সেটা না হয় একটা ভুল হয়ে গেছে,' বললে পি-পি, 'কিন্তু সাক্ষীরা যখন বলছে—'
'বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট হওয়া চাই, স্যার'—মোক্তার আবার লাফিয়ে উঠল : 'য়্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট স্যার—'
এতদূর নিয়ে এসেও মামলায় ফল হবে না—পুলিস-ইনস্পেক্টরের মুখ শীর্ণ হয়ে রইল।
এ কি একটা ইনভেস্টিগেশান হয়েছে? বারান্দায় বেরিয়ে এসে পি-পিও বিরক্তি প্রকাশ করলে। মিহিরলালের কিছু টাকা খরচ হল, এই যা সান্ত্বনা।
রায়ের দিন পড়ে গেল।
একটা দিনেই তিনটে রায়, পাঁচটা এভিডেন্স, সাতটা জেরা, আটটা জামিন—বুকজাঁতা ছোট ঘরে গিজ গিজ করছে মানুষ।

মিহিরলালের ডাক পড়ল।

কোথায় মিহিরলাল? মোক্তার তাকাল অনাথের দিকে।

এখনো আসেনি। আসবার কী-ই বা দরকার! মামলায় তো আসামী খালাসই পাবে। খালাসের অর্ডার তো আসামীর অনুপস্থিতিতেও দেওয়া চলে।

না, তবু একটা রীতি আছে। কোর্টের মান আছে। খালাস হলেও তার আসা দরকার। তার সামনে রায় হবে। দিনের দিন প্রতিদিন আসতে সে সর্তাবন্ধ।

'মিহিরলাল হাজির! মিহিরলাল হাজির।' চাপরাশি ডাকতে লাগল।

এই যে এসেছে এতক্ষণে। তড়িঘড়ি উঠল কাঠগড়ায়।

ম্যাজিস্ট্রেট বললে নথির দিকে তাকিয়ে : 'তুমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছ। তোমার তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হল।'

খাঁচার বাইরে কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল, সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিয়মমাফিক আসামীর কোমরে সে দড়ি জড়াতে গেল।

হঠাৎ একটা ছাদফাটানো চিৎকার উঠল : 'আমি না স্যার, আমি না স্যার—'

সবাই তাকাল সন্ত্রাসে।

কাঠগড়া থেকে আসামী করজোড়ে আর্তনাদ করছে : 'আমি মিহিরলাল না স্যার, আমি অনাথ—অনাথ মণ্ডল।'

'সে কী?' সমস্ত কোর্ট হকচকিয়ে উঠল।

'মিহিরলাল খালাস পাবে, এই সবই ভেবেছিলাম। তাই মিহিরলাল আসেনি দেখে আমি ওর বদলা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—আমি আসামী নই স্যার, আমি মুহুরি, আমি অনাথ—'

ম্যাজিস্ট্রেট নথি থেকে মুখও তুলল না। কনস্টেবলকে উদ্দেশ করে বললে, 'আসামীকে নিয়ে যাও।'

নিয়মমাফিক নিয়ে চলল কনস্টেবল।

কোর্টের বাইরেও শোনা গেল সেই দড়িবাঁধা আর্তনাদ : 'আমি কোনো দোষ করিনি। আমি অনাথ স্যার, আমি অনাথ—'

৮৬। তিরন্দা

সবার মুখের উপর সটান বলে বসলুম : বিয়ে যখন আমিই করছি, মেয়েও আমিই দেখতে যাবো। তোমরা সব পছন্দ করে এলে পরে আমি গিয়ে হয়কে নয় করে দিয়ে এলুম—সেটা কোনো কাজের কথা নয়। মাথার দিকে

হোক, ল্যাজের দিকে হোক পাঁঠাটা যখন আমার আমাকেই কাটতে দাও। যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী।

প্রস্তাবটায় কেউ আপত্তি করলে না। তার প্রধান কারণ আমি চাকরি করছি, আর সেটা বেশ মোটা চাকরি।

বাবা দিন ও সময় দেখে দিলেন, আমার মামাতো ভাই রাধেশ আমার সঙ্গে চললো।

বলা বহুলতরো হবে, সেদিনের সাজগোজের ঘটাটা আমার পক্ষে একটু প্রশস্তই হয়ে পড়েছিলো। ইদানি বিয়ের কথা-বার্তা হচ্ছিলো বলে আমি আমার কোঁচার ঝুলটা পঞ্চাশ-ইঞ্চিতে নামিয়ে এনেছিলুম, কিন্তু সেদিন যেন পঞ্চাশ ইঞ্চিতেও আমার পায়ের পাতা ঢাকা পড়ছিলো না। চাকরকে বিশ্বাস নেই। জুতোয় নিজেই বুরুশ করতে বসলুম। এবং রাধেশ যখন আমাকে তাড়া দিতে এলো, দেখলুম মুখটা নির্মূল নির্মল করে এক মুঠো কিউটিকুরা ঘষে আমি তার ছায়ায় এসেও দাঁড়াতে পারি নি।

ব্যাপারটা নির্জলা ব্যবসাদারি, তবু মনে নতুন একটা নেশার আবেশ আসছিলো। বলতে গেলে, বইয়ের থেকে মুখ তুলে সেই আমার প্রথম বাইরের দিকে তাকানো। শরীরে মনে এতো সচেতন হয়ে জীবনে এর আগে কোনদিন কোনো মেয়ের মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বিয়ে করবো এই ঘটনাটার মধ্যে ততো চমক নেই, কিন্তু মুখ ফুটে একবার একটি 'হাঁ' বললেই এতো বড়ো পৃথিবীর কে-একটি অপরিচিতা মেয়ে এক নিমেষে আমার একান্ত হয়ে উঠবে—এটাই নিদারুণ চমৎকার লাগছিলো। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে সঙ্গে করে আমার বাড়ি নিয়ে আসতে পারি, কারুর কিছু বলবার নেই, বাধা দেবার নেই। অহরহই তো আমরা 'না' বলছি, কিন্তু সাহস করে একবার 'হাঁ' বলতে পারলেই সে আমার।

গ্রহ নক্ষত্রদের চক্রান্তে অন্ধ, অভিভূত হয়ে রাধেশের সঙ্গে কালিঘাটের ট্রাম ধরলুম।

ভাগ্যিস রাধেশ গোড়াতেই আমাকে কন্যাপক্ষীয়দের কাছে চিহ্নিত করে দিয়েছিলো, নইলে তার সাজগোজের যে বহর, তাকেই তাঁরা পাত্র বলে মনে করতেন, অন্তত মনে করতে পারলে সুখী যে হতেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে পুরুষের শোভাই নাকি তার চাকরি, সেই ভরসায় রাধেশের ভ্রাতৃভক্তিকে ভূয়সী স্তুতি করতে-করতে ভদ্রলোকদের সঙ্গে দোতলায় উঠে এলুম।

যবনিকা কখন উঠে গেছে, রঙ্গমঞ্চে আমাদের আবির্ভাব হলো। প্রকাণ্ড ঘরটা যেন রুদ্ধশ্বাস নিঃশব্দতায় পাথর হয়ে আছে। মেঝের উপর ঢালা ফরাস, তারই মাঝখানে ছোট একটি চেয়ার। টিপয়ের উপর কড়া ইস্তিরি ফর্সা একটা ঢাকনি : একপাশে দোয়াত-দানিতে কালি-কলম, অন্য দিকে স্তূপীকৃত কতকগুলো বই। অদূরে ছোট একটি অর্গ্যান। সেটিংটা

নিখুঁত। ওধারে লম্বাটে একটা খালি টেবিলের দুধারে যে অবস্থায় মুখোমুখি কখানা চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে, মনে হলো ওখানে উঠে গিয়েই আমাদের মিষ্টিমুখ করবার অনুষ্ঠানটা পালন করতে হবে। মনে হলো, রিহার্স্যাল দিয়ে-দিয়ে ভদ্রলোকদের পার্টগুলি আগাগোড়া মুখস্ত।

টিপয়টার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে দুজন বসলুম।

অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শকের, সত্যি করে বলা যাক, দর্শিকার অভাব দেখলুম না। জানলার আনাচে-কানাচে মেয়েদের চোখের ও আঙুলের সঙ্কেতগুলি রাধেশের প্রতি এমন অজস্র ও অবারিত হয়ে উঠতে লাগলো যে হাতে নেহাৎ চাকরিটা না থাকলে তাকে জায়গা ছেড়ে সটান বাড়ি চলে যেতুম। রাধেশ যে বছর দুয়েক ধরে বি-এ পরীক্ষায় খাবি খাচ্ছে সেইটেই আমার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাঁচোয়া।

হ্যাঁ, মেয়েটি তো এখন এসে গেলেই পারে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে কখন থেকে হাঁ করে বসে আছি।

চক্ষু থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়টাই এখন দ্রুত ও তীক্ষ্ন কাজ করছে। অস্পষ্ট করে অনুভব করলুম পাশের ঘরেই মেয়ে সাজানো হচ্ছে—বিস্তৃত শাড়ির খস্‌খস্‌ ও চুড়ির টুকরো-টুকরো টুং-টাং আমার মনে নতুন বৃষ্টির শব্দের মতো বিবশ একটা তন্দ্রার কুয়াসা এনে দিচ্ছিলো। তার সঙ্গে অনেকগুলো চাপা কন্ঠের অনুনয় ও তারো অনুচ্চারিত গভীরে কার যেন রঙিন খানিকটা লজ্জা। সেই লজ্জা গায়ের উপর স্পর্শের মতো স্পষ্ট টের পেলুম।

রাধেশের কনুইয়ের উপর অলক্ষ্যে একটা চিম্‌টি কাটতে হলো।

কব্জির ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে রাধেশ বললে—বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে নটা পর্যন্ত ভালো সময়।

তাড়া খেয়ে ভদ্রলোকদের একজন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। ফিরতে তাঁর দেরি হলো না; বললেন : এই আসছে।

এবং নতুন করে প্রস্তুত হবার আগেই মেয়েটি ঢুকে পড়লো। ঠিক এলো বলতে পারি না, যেন উদয় হলো। অনেকক্ষণ বসে থাকার জন্যে ভঙ্গিটা শিথিল, ক্লান্ত হয়ে এসেছিলো, তাকে যথেষ্ট রকম ভদ্র করে তোলবার পর্যন্ত সময় পেলুম না। সবিস্ময়ে রাধেশের মুখের দিকে তাকালুম।

দেখলুম রাধেশের মুখ প্রসন্নতায় বিশেষ কোমল হয়ে আসে নি। তা না আসুক। আমি কিন্তু এক বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত হলুম। আর যাই হোক, মেয়েটি রাধেশের যোগ্য নয়। আর যাই থাক বা না-থাক, মেয়েটির বয়েস আছে।

টিপয়ের সামনে চেয়ারটা একেবারে লক্ষ্যই না করে মেয়েটি ফরাসের এককোণে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো। তার আসা ও বসার এই ত্বরাটা একটা দেখবার জিনিস। তার শরীরে লজ্জার এতোটুকু একটা দুর্বল আঁচড়

কোথাও দেখলুম না। প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, চঞ্চল সেই শরীর একপাত নিঠুর ইস্পাতের মতো ঝকঝক করছে। কোনো কিছুকেই যেন সে আমলে আনছে না, সব কিছুরই উপরেই সে সমান উদাসীন।

বৃথাই এতোক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে তার সাজগোজের শব্দ শুনছিলুম, আমার জীবনের আজকের ভোরবেলাটির মতোই মেয়েটি একান্ত পরিচ্ছন্ন, বোধহয় বা বিষাদে একটু ধূসর। পরনে আটপৌরে একখানি শাড়ি, খাটো আঁচলে দুই কাঁধ ঢাকা, হাতে দু-এক টুকরো ঘরোয়া গয়না। কালকের রাতের শুকনো খোঁপাটা ঘাড়ের উপর তখন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এই তো তাকে দেখবার। এড়িয়ে এসেছে সে সব আয়োজন, ঠেলে ফেলে দিয়েছে সব উপকরণের বোঝা; সে যা, তাই সে হতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু কেন এই ঔদাস্য? মনে-মনে হাসলুম। আমি ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে তার এই বিষাদের মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর তাকে লোলুপদৃষ্টি পুরুষের সামনে রূপের পরীক্ষা দিতে এসে ক্লান্ত, বিরক্ত, কলুষিত হতে হয় না।

গায়ের রঙটা যে রাধেশের পছন্দ হয় নি তা প্রথমেই তার মুখ দেখে অনুমান করেছিলুম। বিনয় করে লাভ নেই, মেয়েটি দস্তুররতো কালো। চামড়ার তারতম্য-বিচারের বেলায় এমন রঙকে আমরা সাধারণতো কালোই বলে থাকি, শুদ্ধ ভাষায় শ্যামবর্ণ বলতে পারো বটে, কিন্তু টুইডলডাম ও টুইডলডিতে কোনো তফাৎ নেই।

ভদ্রলোকের পার্ট সব মুখস্ত। একজন অযাচিত বলে বসলেন : এমনিতে গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, কিন্তু পুরীতে চেঞ্জে গিয়ে সমুদ্রে স্নান করে-করে এমনি কালো হয়ে এসেছে।

কিন্তু, মনে-মনে ভাবলুম, এর জন্যে এতো জবাবদিহি কেন? মেয়েরা যেমন শুধু আমাদের অর্থোপার্জনের দৌড় দেখছে, তাদের বেলায় আমরাও কি তেমনি শুধু তাদের চামড়ার বুনট দেখবো?

ভদ্রলোকের একজন আমাকে অনুরোধ করলেন : কিছু জিগগেস করুন না।

একেবারে অথই জলে পড়লুম। এমন একখানা ভাব করলুম, যেন আমাকেই যদি আলাপ করতে হয় তবে ঘরে রাজ্যের এতো লোক কেন?

ভদ্রলোকদের আরেকজন টিপয় থেকে একটা বই তুলে বললেন—কিছু পড়ে শোনাবে?

আমার কিছু বলবার আগেই রাধেশ এগিয়ে এলো : না। ফার্স্ট ডিভিশনে যে ম্যাট্রিক পাশ করেছে তাকে পড়াশোনার বিষয় কিছু প্রশ্ন করাটাই অবান্তর হবে। চেয়ারের মধ্যে রাধেশ উসখুস করে উঠলো, গলাটা খাঁখরে মেয়েটিকে জিগগেস করলে : তোমার নাম কি?

কী আশ্চর্য্য প্রশ্ন! ম্যাট্রিক পাশের খবর পেয়েও তার নামটা কিনা সে জেনে রাখে নি।

দেয়ালের দিকে মুখ করে মেয়েটি নির্লিপ্ত গলায় বললে,—সুমিতা ঘোষ।

মনের মধ্যে যুগপৎ দুটো ভাব খেলে গেলো। প্রথমতো, দিন কয়েক পরে নাম বলতে গিয়ে দেখবে তার ঘোষ কখন আমারই মিত্র হয়ে উঠেছে—দেহ-মনে এমন কি নামে পর্যন্ত তার সে কী অদ্ভুত পরিবর্তন। দ্বিতীয়তো, রাধেশের এই ইয়ার্কি আমি বার করবো। তার মাস্টারের এই সম্মানিত, উদ্ধত ভঙ্গিটা যদি সুমিতার পায়ের কাছে প্রণামে না নরম করে আনতে পারি তো কী বলেছি!

আলাপের দরজা খোলা পেয়ে রাধেশের সাহস যেন আরো বেড়ে গেলো। বল্‌লে,—খবরের কাগজ পড়ো?

সুমিতা চোখ নামিয়ে গম্ভীর গলায় বল্‌লে—মাঝে-মাঝে।

তবু রাধেশের নির্লজ্জতার সীমা নেই। জিগগেস করলে : বাঙলা গভর্ণমেন্টের চিফ সেক্রেটারির নাম বলতে পারো?

ভুরু দুটি কুটিল করে সুমিতা বললে,—না।

—উনিশ শো বাইশে গয়ায় যে কংগ্রেস হয়েছিল তার প্রেসিডেন্ট কে ছিলো?

সুমিতা স্পষ্ট বললে,—জানিনা।

রাধেশের তবু কী নিদারুণ আস্পর্ধা! জিগ্‌গেস করলে : আন্নামালায়ে যে একটা নতুন ইউনিভার্সিটি হয়েছে তার খবর রাখো? জায়গাটা কোথায়?

সুমিতা বললে,—কী করে বলবো?

রাধেশ যেন তার দু-বছরের পরীক্ষা-পাশের অক্ষমতার শোধ নেবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেখানে বসে তার কান মলে দেয়া সম্ভব ছিলো না, গোপনে আরেকটা চিমটি কেটে তাকে নিরস্ত করলুম।

সত্যিকারের দেখাটা মানুষের সুদীর্ঘ উপস্থিতিতে নয়, তার আকস্মিক আবির্ভাবে ও অন্তর্ধানে। সুমিতাকে তাই লক্ষ্য করে বললুম—এবার তুমি যেতে পারো।

যা ভেবেছিলুম তাই, তার সেই শরীরের নির্ঝরিণীতে ভঙ্গুর, বিশীর্ণ কটি রেখা মুক্তির চঞ্চলতায় ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠলো। বসার থেকে তার সেই দাঁড়ানোর মাঝে গতির যে তীক্ষ্ন একটা দ্যুতি ছিলো তা নিমেষে আমার দু-চোখকে যেন পিপাসিত করে তুললে। সুমিতা আর এক মুহূর্তও দ্বিধা করলো না, যেন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে, এমনি তাড়াতাড়ি পিঠের সংক্ষিপ্ত আঁচলটা মুক্তিতে আলুলায়িত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ঠিক চলে গেলো বলতে পারি না, যেন গেলো নিবে, গেলো হারিয়ে।

মনে-মনে হাসলুম। দিন কয়েক নেহাৎ আগে হয়ে পড়ে, নইলে ঐ তার পাখির পাখার মতো মুক্তিতে বিস্ফারিত উড়ন্ত আঁচলটা মুঠিতে চেপে ধরে অনায়াসে তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারতুম, কিম্বা আমিও যেতে পারতুম তার পিছু-পিছু। আজ যে এতো বিমুখ, সে-ই একদিন অবারিত, অজস্র হয়ে

উঠবে ভাবতেও কেমন একটা মজা লাগছে। যে আজ পালাতে পারলে বাঁচে, সে-ই একদিন আমার কণ্ঠতট থেকে তার বাহুর ঢেউ দুটিকে শিথিল করতে চাইবে না।

আমি যেন ঠিক তাকে চলে যেতে বললুম না, তাড়িয়ে দিলুম—ভদ্রলোকের দল চিন্তিত হয়ে উঠলেন। একজন বললেন—অন্তত গানটা ওর শুনতেন। স্কুলে ও উপাধি পেয়েছে গীতোর্ম্মিমালিনী।

আরেকজন বললেন,—এই দেখুন ওর সব সেলাই। স্কার্ফ, মাফলার টেপেস্ট্রি—যা চান।

আরেকজন যোগ করে দিলেন : অন্তত ওর হাতে লেখার নমুনাটা—

রুমাল দিয়ে ঘাড়টা সবলে রগড়াতে-রগড়াতে বললুম,—কোনো দরকার নেই। এমনিতেই আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

রাধেশের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম। তার চেয়ে তার পিঠে একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিলেও যেন সে বেশি আরাম পেতো।

পুরাঙ্গনারা, যারা এখানে-ওখানে উঁকি-ঝুঁকি মারছিলো, সমমুহূর্তে সবাই কলধ্বনিত হয়ে উঠলো। তার মাঝে স্পষ্ট অনুভব করলুম একজনের সুন্দর স্তব্ধতা।

তারপর সুরু হলো ভোজনের বিরাট রাজসূয়। এতো বড়ো একটা ভোজের চেহারা দেখেও রাধেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো না।

আমি যে কী ভীষণ অজবুক ও আনাড়ি, বাড়িতে ফিরে রাধেশ সেইটেই সাব্যস্ত করিতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। এক কথায় মেয়ে পছন্দ করে এলুম, অথচ খোঁপা খুলে না দেখলুম তার চুলের দীর্ঘতা, না বা দেখলুম হাঁটিয়ে তার লীলা-চাপল্য। সামান্য একটা হাতের লেখা পর্যন্ত তার নিয়ে আসি নি।

—তারপর, রাধেশ মুখ টিপে হাসতে লাগলো : এমন তাড়াতাড়ি ভাগিয়ে দিলে যে মেয়েটার চোখ দুটো পর্যন্ত ভালো করে দেখতে পেলুম না। দেখবার মধ্যে দেখলুম শুধু একখানা গায়ের রঙ।

বাড়ির মহিলারা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : কী রকম? আমাদের মিনির মতো হবে?

রাধেশের একবিন্দু মায়া-দয়া নেই। অভদ্র, রূঢ় গলায় বললে,—আমাদের মিনি তো তার তুলনায় দেবী।

আমার রুচিকে কেউ প্রশংসা করতে পারলো না। বাড়ির মহিলারা, যাঁরা তাঁদের যৌবদশায় এমনি বহুতরো পরীক্ষার ব্যূহ ভেদ করে অবশেষে আমাদের বাড়িতে এসে বহাল হয়েছেন, টিপ্পনি কাটতে লাগলেন : এমন মেয়ে-কাঙাল পুরুষ তো কখনো দেখিনি বাপু। এমন কী দুর্ভিক্ষ হয়েছে যে খাদ্যাখাদ্যের আর বাছবিচার করতে হবে না। সাধে কি আর পাত্রকে গিয়ে নিজের জন্যে মেয়ে দেখতে দেয়া হয় না? ডবকা বয়সের একটা যেমন-তেমন মেয়ে দেখলেই কি এমনিধারা রাশ ছেড়ে দিতে হয় গা?

প্রশ্রয় পেয়ে রাধেশ তার রসনাকে আরো খানিকটা আলগা করে দিলো : মা হয়তো বা কোনোরকমে পার হলেন, কিন্তু তাঁর মেয়েদের আর গতি হচ্ছে না, এ আমি তোমাদের আগে থাকতে বলে রাখছি।

সে অপরিচিতা মেয়েটির হয়ে শুধু আমি একা লড়াই করতে লাগলুম। তাকে পছন্দ না করে যে আর কী করতে পারি কিছুই আমি ভেবে পেলুম না। আমার চোখ না থাক, অন্তত চক্ষুলজ্জা তো আছে।

মা প্রবল প্রতিবাদ সুরু করলেন : কালো বলেই ওরা অতো টাকা দিতে চায়। কিন্তু তোর টাকার কী ভাবনা? আমি তোর জন্যে টুকটুকে বৌ এনে দেবো।

হেসে বললুম,—টাকা অবিশ্যি আমি ছেড়ে দেবো, মা, কিন্তু মেয়েটিকে ছাড়তে পারবো না। তাকে যখন আমি দেখতে গেছলুম, তখন তাকে বিয়ে করবো বলেই দেখতে গেছলুম। একটি মেয়েকে তেমন আত্মীয়তার চোখে একবার দেখে তাকে আমি কিছুতেই আর ফেরাতে পারবো না। তোমরা তাকে পরীক্ষা করতে পারো, কিন্তু আমার শুধু পছন্দ করবার কথা।

এই যে আমার কী এক অন্যায় খেয়াল, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সবাই সন্দিহান হয়ে উঠলো। কিন্তু বাবা আমাকে রক্ষা করলেন। বললেন : ওর যখন ওখানেই মত হয়েছে তখন ওখানেই ওর বিয়ে হবে।

তোমরা ঠাট্টা করতে পারো, কিন্তু বলতে আমার দ্বিধা নেই, সুমিতাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। কথাটা একটু হয়তো রূঢ় শোনাচ্ছে। কিন্তু ভালো লাগার একটা বিশেষ অবস্থার নামই কি ভালোবাসা নয়? তাকে এতো ভালো লেগেছে যে তার সমস্ত ত্রুটি, সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে আমি বিয়ে করতে চাই, এইটেই কি আমার ভালোবাসার প্রমাণ নয়?

সুমিতা কালো, এবং তারি জন্যে সমস্ত সংসার প্রতিকূলতা করছে, মনে হলো, এ-ব্যাপারে সেইটেই আমার কাছে প্রধান আকর্ষণ। সুমিতাকে যে আমি এই অপমান থেকে রক্ষা করতে পারবো, সেইটেই আমার পুরুষত্ব।

বাবা দিন-ক্ষণ ঠিক করে ওদের চিঠি লিখে দিলেন।

পাশাপাশি সে কটা দিন-রাত্রি আমার একটানা একটা তন্দ্রার মধ্যে দিয়ে কেটে গেলো। কে কোথাকার একটি অচেনা মেয়ে পৃথিবীর অগণন জনতার মধ্যে থেকে হঠাৎ একদিন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তারি বিস্ময়ের রহস্যে মুহূর্তগুলি আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। তার জীবনের এতোগুলি দিন শুধু আমারই জীবনের একটি দিনকে লক্ষ্য করে তার শরীরে-মনে স্তূপে-স্তূপে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুরীতে যখন সে সমুদ্রে ডুব দিতো তখনো সে ভাবেনি তীরে ত'র জন্যে কে বসে আছে। ঘটনাটা এমন নতুন, এমন অপ্রত্যাশিত যে কল্পনায় অসুস্থ হয়ে উঠতে লাগলুম। কাজের আবর্তে মনকে যতোই ফেনিল করে তুলতে চাইলুম, ততোই যেন অবসাদের আর কূল খুঁজে পেলুম না।

হয়তো সুমিতারো মনে এমনি দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিয়েছে। বাইরে থেকে কে কোথাকার এক অহঙ্কারী পুরুষ নিমেষে তার অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠবে এর বিস্ময় তাকেও করেছে মুহ্যমান। হয়তো সেদিনের পর থেকে তার চোখের দীর্ঘ দুই পল্লবে কপোলের উপর ক্ষণে-ক্ষণে লজ্জার শীতল একটু ছায়া পড়ছে, হয়তো আয়নাতে চুল বাঁধবার সময় তার শুভ্র সীমারেখাটির দিকে চেয়ে সে একটি নিশ্বাস ফেলছে, হয়তো আমারি মতো রাতের অনেকক্ষণ সে ঘুমুতে পারছে না।

বলা বাহুল্য, নইলে এ কাহিনী লেখার কোনো দরকার হতো না, সুমিতার সঙ্গে আমার বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ঘটে ওঠে নি।

কেন ওঠে নি সেইটেই এখন বলতে হবে।

বাবা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মেয়েকে পাকা দেখতে বেরোবেন, সকালবেলায় ডাক এসে হাজির। আমারই নামে খামে মোটা একটা চিঠি। মোড়কটা ক্ষিপ্রহাতে খুলে ফেলে নিচে নাম দেখলুম : সুমিতা।

বলতে বাধা নেই, সেই মুহূর্তটা আনন্দে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেলুম। বিয়ের আগে এমন একখানি চিঠি যেন বিধাতার আশীর্বাদ।

তারপরে লুকিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে গেলুম চিঠিটা পড়তে। মেয়ের চিঠি, তাই একটু বিস্তারিত। সুমিতা লিখছে :

মান্যবরেষু,

আপনাকে চিঠি লিখছি দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হবেন, কিন্তু চিঠি না লেখা ছাড়া সত্যি আর আমার কোনো উপায় নেই। রুঢ়তা মার্জনা করবেন এই আশা করেই চিঠি লিখছি।

আপনি যে আমাকে পছন্দ করবেন, কেউই যে আমাকে এইভাবে পছন্দ করতে পারে একথা আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারি নি। আপনার আগে আরো অনেকের কাছে আমাকে রূপের পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো, কিন্তু সব জায়গাতেই আমি সসম্মানে ফেল করে বেঁচে গিয়েছিলুম। শুধু আপনিই আমাকে এই অভাবনীয় বিপদে ফেললেন। আপনি আবার এত উদার, এতো মহানুভব যে আমার বর্ণমালিন্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভয়াবহ একটা টাকা পর্যন্ত দাবি করলেন না। সব দিক থেকেই আমার পালাবার পথ বন্ধ করে দিলেন। এর আগে আর কাউকে চিঠি লেখার আমার দরকার হয় নি, একমাত্র আপনাকে লিখতে হলো। জানি আপনি মহানুভব, তাই আমি এতো সাহস দেখাতে সাহস পেলুম।

আপনি আমাকে মুক্তি দিন, এই বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। বিয়ে করে নয়, বিয়ে না করে। পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম করে করে আমি ক্লান্ত, প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছি—কী যে আমি করতে পারি, কোনদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছি না। জানি, এই ক্ষেত্রে আপনিই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারেন, তাই কোনদিকে না চেয়ে শেষকালে আপনার কাছেই ছুটে এসেছি।

কেন বিয়ে করতে চাই না, তার একটা স্থূল, স্পর্শসহ কারণ না পেলে আপনি জানি। স কারণ আপনাকে জানাতে আমার সঙ্কোচ নেই।

আমি একজনকে ভালোবাসি—কথাটা মাত্র লিখে আমি তার গভীরতা বোঝাতে পারবো না। তার জন্যে আমাকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, যতোদিন না সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, ততোদিন, তারি জন্যে, আমাকে নানা কৌশল করে এই সব ষড়যন্ত্র পার হতে হচ্ছে। রূপের পরীক্ষার চাইতেও সে কী কঠিনতরো সাধনা।

আশা করি, আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনার কাছে আমি সহানুভূতি না পেলেও করুণা পাবো। আমার এই অসহায় প্রেমকে আপনি মার্জনা করুন। একজন বন্দিনী বাঙালী মেয়ে আপনার কাছে তার প্রেমের পরমায়ু ভিক্ষা করছে।

তবু এতোতেও যদি আপনি নিরস্ত না হন তো আমার পরিণাম যে কী হবে আমি ভাবতে পারছি না। ইতি।

বিনীতা
সুমিতা

চিঠি পড়ে প্রথম কিন্তু মনে হলো সুমিতার হাতের লেখাটি ভারি সুন্দর। লাইন কটি সোজা ও পাশাপাশি দুটো লাইনের অন্তরালগুলি সমান! বানানগুলি নির্ভুল, এবং দস্তুরমতো কমা, দাঁড়ি ও প্যারাগ্রাফ বজায় রেখে চিঠি লেখে। তার উপর শ্রদ্ধা আমার চতুর্গুণ বেড়ে গেলো এবং যে-পাত্রী আমি মনোনীত করেছি সে যে নেহাৎ একটা যা-তা মেয়ে নয়, সে-কথাটা বাড়ির মহিলাদের কাছে সদ্য-সদ্য প্রমাণ করতে এ-চিঠিটা তাঁদেরকে দেখাবার জন্যে পা বাড়ালুম।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়লো, তার চিঠির কথা নয়, চিঠির ভিতরকার কথা। সুখ হলো না দুঃখ হলো চেতনাটার ঠিক স্বাদ বুঝলুম না। খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ওদিকে বাবা দলবল নিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি চোখ-কান বুজে তাঁর কাছে ছুটে গেলুম। বললুম,—থাক, ওখানে গিয়ে আর কাজ নেই। ও-মেয়ে আমি বিয়ে করবো না।

বাবা তো প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন : সে কী কথা?

—হ্যাঁ, আমি আমার মত বদ্‌লেছি।

সে একটা বীভৎস কেলেঙ্কারিই হলো বলতে হবে, কিন্তু সুমিতার জন্যে সব আমি অক্লেশে সহ্য করতে পারবো।

কথাটা দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরলে : মত বদ্‌লাবার কারণ কী?

হাসবে না কাঁদবে কেউ কিছু ভেবে পেলো না। বল্‌লে,—বা, এই কালে

জেনেই তো এতো তড়পেছিলি! এই কালেই তো ছিলো ওর বিশেষণ! কালোই তো আলো আর ভালো একসঙ্গে।

কী যুক্তি দেবো ভেবে পাচ্ছিলুম না। বললুম,—আমার টাকা চাই।

—বেশ ছেলে যা হোক্ বাবা। তুইই না বলতিস বিয়েতে টাকা নেয়ার চাইতে গণিকাবৃত্তিতে বেশি সাধুতা আছে। ভদ্রলোকদের কথা দিয়ে এখন পিছিয়ে যাবার মানে কী?

বললুম,—বেশ তো, তাঁদের অকারণ মনস্তাপের দরুণ না হয় যথাযোগ্য খেসারৎ দেয়া যাবে।

সবাই বিদ্রূপ করে উঠলো : এদিকে পণ নিয়ে বিয়ে করবার মতলব, ওদিকে গরচা খেসারৎ দেয়া হচ্ছে। মাথা তোর বিগড়ে গেলো নাকি?

কিন্তু এদের পাঁচজনকে আমি কী বলে বোঝাই? শুধু নিজের মনকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বোঝাতে পারি : সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি।

সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি, নিশ্চয়, ভালোবেসেছি তার ঐ প্রেম। তাই, তাকে অপমান করব, আমার সাধ্য কী! তাকে যে আমার কেন এতো পছন্দ হয়েছিলো, এ কথা এখন কে বুঝবে?

আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনাটা সমূলে ভেঙে দিলুম। নিরীহ একটি মেয়ের অকারণ সর্বনাশ করছি বলে চারিদিক থেকে একটা নিদারুণ ধিক্কার উঠলো, কিন্তু আমি জানি, ঈশ্বর জানেন, আমার এই আত্মবিলোপের অন্তরালে কার একখানি বেদনায় সুন্দর মুখ সুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কাউকে ভালো না বাসলে আমরা কখনো এতোখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারি না। সুমিতাকে এতো ভালোবেসেছিলুম বলেই তার জন্যে নিজের এতো বড় ঐশ্বর্য অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে এলুম। আমার ত্যাগ তার প্রেমের মতোই মহান হয়ে উঠুক।

প্রাগ্‌বিচার করা বৃথা, জীবনে সত্যিই সুমিতা সুখী হতে পারবে কিনা; কিন্তু প্রেমের কাছে সুখের কল্পনাটা সূর্যের কাছে দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি। তার সেই প্রেমকে জায়গা ছেড়ে দিতে আমি আমার ছোট সুখ নিয়ে ফিরে এলুম।

তারপর বছর তিনেক কেটে গেছে, আমি বারাসত থেকে দুবরাজপুরে বদলি হয়ে এসেছি।

বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে আমার বৈবাহিক ব্যাপারটা সম্পন্ন হয়ে গেছে, এবং এবার অতি নির্বিঘ্নে। বলা বাহুল্য, এবার আমি নিজে আর মেয়ে দেখতে যাইনি, মা তাঁর কথামতো দিব্যি একটি টুকটুকে বৌ এনে দিয়েছেন। নিতান্ত স্ত্রী বলেই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত হতে পারছি না।

আমার স্ত্রী তখন তাঁর বাপের বাড়ি, আসন্নসন্তানসম্ভবা। আমার কোয়ার্টারে আমি একা, নথি-নজির নিয়ে মশগুল।

এর মধ্যে যে কোনো উপন্যাসের অবকাশ ছিলো তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

সেরেস্তাদার তাঁর এক অধীনস্থ কেরানির নামে আমার কাছে নালিশের এক লম্বা ফিরিস্তি পেশ করলেন। পশুপতির চুরিটা অবিশ্যি আমিই ধরে ফেলেছিলুম। আমারই শাসনে এতোদিনে সেরেস্তাদারের যা-হোক ঘুম ভাঙলো।

নতুন হাকিম, মেজাজটা সাধারণতোই একটু ঝাঁজালো, পশুপতিকে আমি ক্ষমা করলুম না।

আমারই খাসকামারায় পশুপতি দুহাতে আমার পা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়লো, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—হুজুর মা-বাপ, আমার চাকরিটা নেবেন না। এমন কাজ আর আমি কক্‌খনো করবো না—এই আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি।

পা দুটো তেমনি অবিচল কঠিন রেখে রুক্ষ গলায় বললুম,—তুমি যে-কাজ করেছ, আর শত করবে না বললেও তার মাপ নেই।

পশুপতি আমাকে গলাবার আরেকবার চেষ্টা করলো : ভয়ানক গরিব হুজুর, তারি জন্যে ভুল হয়ে গেছে।

আমারো উত্তর তৈরি : ভুল যখন করেছ, তখন ভয়ানক গরিবই থাকতে হবে।

কিন্তু পশুপতি আরো যে কতো ভুল করতে পারে তা তখনো ভেবে দেখে নি।

রাত্রে শোবার ঘরে লন্ঠনের আলোতে খুব বড়ো একটা মোকদ্দমার যোজনব্যাপী রায় লিখছি, এমন সময় দরজায় অস্পষ্ট কার ছায়া পড়লো। স্ত্রীলোকের মত চেহারা। অকুন্ঠ পায়ে ঘরের মধ্যে সোজা ঢুকে পড়েছে।

কোনো অফিসারের স্ত্রী বেড়াতে এসেছেন ভেবে সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হয়ে বললুম—আমার স্ত্রী তো এখানে নেই—'

স্ত্রীলোকটি পরিষ্কার গলায় বল্‌লে,—আমি আপনার কাছেই এসেছি।

লন্ঠনের শিখাটা তাড়াতাড়ি উস্কে দিলুম। গলা থেকে আওয়াজটা খানিক আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো : এ কী? তুমি সুমিতা? তুমি এখানে কী করে এলে?

তাকে চিনতে পেরেছি দেখে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুমিতা সামনের একটা চেয়ারে বসলো। ঘরের চারদিকে বিষণ্ন চোখে তাকাতে লাগলো যেখানে খাটে পাতা রয়েছে আমার বিছানা, যেখানে দেয়ালে টাঙানো রয়েছে আমার স্ত্রীর ফোটো।

আবার জিগগেস করলুম : তুমি এখানে কি করে এলে?

সুমিতা আগের মতো তেমনি চোখ নামিয়ে বল্‌লে,—ভাসতে-ভাসতে!

তার এই কথায় চারপাশে মুহূর্তে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠলো

তারই ভিতর দিয়ে তার দিকে তাকালুম। দেখলুম সেই সুমিতা আর নেই। যেন অনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে। আগে তার শরীরে বয়সের যে একটা বোঝা ছিলো তা-ও যেন খসে শিথিল হয়ে পড়েছে। সে আজ শুধু কালো নয়, কুৎসিত। পরনে সাড়িটাতে পর্যন্ত আটপৌরে একটা সৌষ্ঠব নেই। হাত দুখানি দুটি মাত্র শাঁখায় ভারি রিক্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে।

গলা থেকে হাকিমি স্বর বার করলুম : আমার কাছে তোমার কী দরকার?

ম্রিয়মান চোখ তুলে সুমিতা বল্‌লে,—আমার স্বামীকে আপনি রক্ষা করুন।

মনে মনে হাসলুম। একবার তাকে রক্ষা করেছিলুম, এবার তার স্বামীকে রক্ষা করতে হবে। আদালত সাক্ষীকে যেমন প্রশ্ন করে তেমনি নির্লিপ্ত গলায় জিগগেস করলুম : তোমার স্বামী কে?

সুমিতা স্বামীর নাম মুখে আনতে পারে না, চুপ করে রইলো।

শেষে নিজেকেই অনুমান করতে হলো : তোমার স্বামীর নাম কি পশুপতি?

—হ্যাঁ।

চিত্রার্পিতের মতো তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সেই সুমিতা আর নেই, হাসি মিলিয়ে যাবার পর সে যেন একরাশ স্তব্ধতা। তার ভঙ্গিতে নেই আর সেই ত্বরা। রেখায় নেই আর সেই তীক্ষ্ণতা। মুখের ভাবটি তৃপ্তিতে আর তেমন নিটোল নয়। তার জন্যে মায়া করতে লাগলো।

জিগগেস করলুম : কদ্দিন তোমরা বিয়ে করেছ?

যেন বহুদূর কোন সময়ের পার হতে উত্তর হলো : এই তিন বছর।

কথাটার বলবার ধরনে চম্‌কে উঠলুম,—শেষ পর্যন্ত তোমার সেই নির্বাচিতকেই পেলে?

—না।

—না? তবে পশুপতি তোমার কে?

সুমিতার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে উঠলো। বললে,—আমার স্বামী।

—হুঁ। ঢোঁক গিলে ফের প্রশ্ন করলুম : ওকে বিয়ে করলে কেন?

—না করে পারলুম না।

—ওকেও চিঠি লিখেছিলে?

—লিখেছিলুম, কিন্তু শুনলেন না।

—শুনলেন না?

—না।

চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বালা করে উঠলো : শুনলেন না কেন?

সুমিতা বল্‌লে—তাঁর দৃষ্টি ছিলো তাঁর নিজের সুখের দিকে।

—নিজের সুখ?

—হ্যাঁ, টাকা। বিয়ে করে কিছু তিনি টাকা পেয়েছিলেন।

রুক্ষ গলায় বললুম—তুমিই বা নিজের সুখ দেখলে না কেন? কেন গেলে ওকে বিয়ে করতে?

—পারলুম না হেরে গেলুম। একেক সময় মানুষে আর পারে না। সুমিতা নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়ালো।

বললুম—আমার বেলায় তো মরবার পর্যন্ত ভয় দেখিয়েছিলে, তখন মরলে না কেন?

হাসবার অস্ফুট একটি চেষ্টা করে সুমিতা বললে,—মরতে আর কি বাকি আছে।

—না, না, তোমার এই ফ্যাসানেবল্ মরা নয়, সত্যি-সত্যি মরে যাওয়া। প্রেমের জন্যে তবু একটা কীর্তি রেখে যেতে পারতে।

রূঢ় আঘাতে সুমিতা যেন আমূল নড়ে উঠলো। কথার থেকে যেন অনেক দূরে সরে এসেছে এমনি একটা নৈরাশ্যের ভঙ্গি করে সে বললে, —কিন্তু, সে-কথা থাক, আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান।

—তোমার স্বামীকে বাঁচাবো? তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আমার লাভ?

তবু কী আশ্চর্য! সুমিতা হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, বললে,—অবস্থার দোষেই এমন করে ফেলেছেন। এবারটি তাঁকে মাপ করুন। তাঁর চাকরি গেলে আমরা একেবারে পথে ভাসবো। জলে ভরা চোখ দুটি সে আমার মুখের দিকে তুলে ধরলো।

নথির দিকে চোখ নিবিষ্ট করে বললুম—তোমার মতো আমারো এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি আর তেমন উদার ও মহানুভব নেই।

—না, না, আপনি মুখ তুলে না চাইলে—

বাধা দিয়ে বললুম,—কার দিকে আর মুখ তুলে চাইবো বলো? তুমি আমাকে যে অপমান করলে—

—অপমান? সুমিতা যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো।

—হ্যাঁ, এতোদিন অন্য সংজ্ঞা দিয়েছিলুম। কিন্তু একে অপমান ছাড়া আর কী বলবো? তোমার জন্যে, তোমার প্রেমের জন্যে, আমি যে স্বার্থ ত্যাগ করলুম তুমি তার এতোটুকু সুবিচার করলে না, এতোটুকু সম্মান রাখলে না। শেষকালে পশুপতি কিনা তোমার স্বামী! তোমার স্বামী কিনা শেষকালে পশুপতি! এরপর তুমি আমার কাছ থেকে কী আশা করতে পারো?

—কিন্তু, সুমিতা আমার পায়ের কাছে বসে পড়লো : তবু, আপনি দয়া না করলে—

চেয়ার ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম,—কেন দয়া করতে যাবো? তুমি আমার কে?

—কেউ না হলে কি আর দয়া করা যায় না?

—না। তুমিই বলো না, কী দেখে আমার আজ দয়া হবে? কঠিন কটু গলায় বললুম—তোমার মাঝে দেখবার মতো আর কী আছে?

সুমিতা উঠে দাঁড়ালো। আজ তার বসার থেকে এই দাঁড়ানোর মাঝে কোনো দীপ্তি নেই। সঙ্কোচে নিতান্ত ম্লান হয়ে প্রায় ভয়ে-ভয়ে বললে,—সেদিনই বা কী দেখেছিলেন?

উত্তপ্ত গলায় বললুম—সেদিন দেখেছিলুম তোমার প্রেম।

নথি-পত্রের মধ্যে ডুবে যাবার আগে একটা হাকিমি ডাক ছাড়লুম : নগেন।

নগেন আমার পিওন।

বললুম,—এঁকে আলো দিয়ে পশুপতিবাবুর ওখানে পৌঁছে দিয়ে এসো। দেরি কোরো না।

মুমূর্ষু দীপশিখার মতো সুমিতা একবার কেঁপে উঠলো। কী কথা বলতে গিয়ে চমকে বলে ফেললে,—না, আলোর দরকার হবে না। আমি একাই যেতে পারবো।

দরজার কাছে এসে সুমিতা তবু একবার থামলো। ঘরের চারদিকে মৃত, শূন্য চোখ চেয়ে একবার চোখ বুজলো। কী যেন আরো তার বলবার ছিলো কিন্তু একটি কথাও সে বলতে পারলো না।

তার সঙ্গে অস্পষ্ট চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

৮৭। ঘর

তোমার উকিল আছে?

কোমর থেকে দড়ি আর হাত থেকে হাত-কড়া খুলে নিল কনস্টেবল। খাঁচায় গিয়ে দাঁড়াল মোজাহার। করজোড়ে বললে, গরিবগুর্বো লোক, উকিল পাব কোথায়?

চার্জ পড়ে শোনালেন পাবলিক-প্রসিকিউটর। বলো, দোষী না নির্দোষ?

নির্দোষ। আমি বিচার চাই।

একে-একে পাঁচ জনকে ডেকে নিয়ে তৈরি হল জুরি। পি-পি ঘটনার বর্ণনা শুরু করলেন—

তার পর সালিশ বসল।

এর আবার সালিশ কি! সালিশের কি দরকার!

এমনিতেই একটা ছেলের অসুখ করলে মুখ কালো হয়ে যায়। হাতে-রথে বল থাকে না। ছেলের অসুখ করেছে, ডাক্তার-বদ্যি করেও ভালো করতে পারছি না, মনে হয় কত যেন অপরাধ করেছি সংসারের কাছে! তারপর

ছেলে যদি মারা পড়ে, তবে কি ছেলের জন্যে কাঁদি? কাঁদি নিজের প্রতি ঘৃণায়। নিজের হেরে-যাওয়ায়। কাউকে মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে না।

এ তো আর কিছু নয়, কাটা গায়ে নুন বুলোনো। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া।

মাওলা বক্স বললে, তুমি বুঝছ না। সালিশ হলেই ওকে গাঁ থেকে তাড়ানো সহজ হবে।

কাকে? আঁতকে উঠেছিল মোজাহার।

আর কাকে! সদরালিকে। সাত দিনের সময় দেব। চলে যাবে দেশ ছেড়ে। তখন থাকতে পাবে শান্তিতে। জঙ্গল কাটবার সময় বাঘের ভয়ে থাকতে হবে না টোঙের উপর।

চলো। মোড়ল-মাতব্বরের ফরমান। পঞ্চ ভদ্রের মীমাংসা। সমাজের সম্মানী লোকদের মানতে হয়। সকলের বলেই একলার বল।

বেশ তো, করো না তোমরা সভা। যাকে তাড়াবার তাকে তাড়িয়ে দাও চুনকালি মাখিয়ে। আমাকে ডাকো কেন? আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।

বা, তা কি হয়? তোমার নালিশ, আর তুমি থাকবে না দশ-সালিশে? বাদীর অভাবে কি মামলা চলে?

নালিশ তো আমার একলার নয়। নালিশ তো শহরবানুরও।

আহা, সে পর্দার বিবি। সে কেন আসবে? পর্দার বাইরে তাকে নিয়ে যেতে চাইলেই তো সে আর বেপর্দা হয়ে যায় নি।

তার মানে, মোজাহার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তুমি একা গিয়ে দাঁড়াও। মার-খাওয়া ভিখিরির মত মুখ কালো করে চেয়ে থাকো। পাঁচ জনের খোঁচা-খোঁচা কৌতূহল মেটাবার জন্যে বলো সব কেচ্ছাকাহিনী। বলো কেমন টোকা মারত বেড়ার গায়ে। কেমন গান ধরত, 'মা আমার দে না বিয়ে, সাধের যৌবন ভেসে যায়।' হাট থেকে কেমন কিনে আনত রেশমী চুড়ি, পুঁতির মালা, কখনো বা এক শিশি সুশীল-মালতী—সেদিন তো একেবারে আস্ত-মস্ত শাড়ি একখানা। নকসি-পেড়ে নীলাম্বরী। কত বারণ করেছে মোজাহার, কানেও তোলেনি শহরবানু। বলো সে সব অক্ষমতার কথা। তোমার গরিবানার কথা। বলো, তুমি বুড়ো, তুমি অথর্ব, ঘাটের পাড়ের পচা খুঁটি। রঙ্গিলা পালের নাও এবার ছেড়ে দাও স্রোতের টানে।

বললেই হল? বারো বছর ঘর করেছি। চাষী জমি হোক, ঘাসী জমি হোক, নুনে-ভাতে লঙ্কায়-পান্তায় বশ রেখেছি বাহুবলে। বুকজোড়া ভালবাসায়। তিন-তিনটে ছেলে ধরেছে পেটে। কোবব্বাত, জিন্নাত আর বিল্লাত। ছোটটা মোটে ছ বছরের। ছেড়ে গেলেই হল? ঘর তুলেছি ওর জন্যে, মাটি কেটেছি, গাছ লাগিয়েছি। হোলই বা না খড়ের ঘর, বাঁশের বেড়া, তাতেই সাত রাজার ধন এক মাণিকের রাজত্ব। আমার মুকুট দিয়ে কি হবে যদি মালা পাই, বিবি দিয়ে কি হবে যদি বউ পাই মনের মত।

কোনো দিন মন্দ-ছন্দ কইনি। উ'চু রা করিনি। হাত তুলিনি। তবু, ওর কি দোষ? অত বিরক্ত করলে কে থাকতে পারে মন মজিয়ে? বারে-বারে আকাশ দেখালে পাখির কি দোষ! জানা বাসার চেয়ে অজানা বিদেশ বুঝি বেশি মনোহর!

নদীর ঘাটের কাছাকাছি গিয়ে ধরা পড়ল। গ্রামরক্ষীর দল শহরবানুকে পেঁাছে দিল ঘরে। ও যে ফের ঘরে ফিরেছে তাইতেই মোজাহারের সুখ। শুধু-পাওয়ার চেয়ে ফিরে-পাওয়ায় বুঝি বেশি ঝাঁজ।

ঘাট মেনেছে শহরবানু। নাকে-কানে খত দিয়েছে। কসম খেয়ে বলেছে যাবে না আর চৌকাঠ ডিঙিয়ে। এতেই মোজাহারের শান্তি। মোজাহারের দিলাসা।

'তোমরা ওটাকে গাঁয়ের বার করে দিতে পারো না?' শহরবানুও ঝামটা মারল : 'ওই তো যত নষ্টের গোড়া। পরের বাড়ির দোর ধরে বসে থাকে। তুমি কী করতে সোয়ামী হয়েছ! গায়ের রক্ত গরম হয় না তোমার? মেরে তুলো ধুনে দিতে পারো না বে-আক্কেলের?'

সত্যিই তো। প্রতিকার তো স্বামীই করবে। তারই তো দায় স্ত্রীকে কবজায় রাখা। কেউ যদি সেই অধিকারে দাঁত বসায়, আইন তো তাকেই সাজা দেয়, দুর্বল মেয়েটাকে নয়।

তবে তাই হোক। সালিশই হোক। অন্ন মণ্ডল আছে, আছে হাফেজ কবিরাজ। আলিম মুছুল্লি। সুরাহা একটা হবেই।

আমার মুখ কালো হয় তো হোক। কিন্তু ওর মুখে যেন রোদ ওঠে।

রায় দিল সালিশ। শহরবানু ঠান্ডা হয়ে থাকবে ঘরের ঘেরাটোপে। মোজাহার নেবে তাকে ধুয়ে-মুছে। আর, সাত দিনের ওয়াদা, সদরালি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, বেপাত্তা হয়ে।

সাতদিন কেন? গর্জে উঠল সদারালি : আজ, এখুনি, এই দন্ডে চলে যাব। আর একা যাব না। সঙ্গে নিয়ে যাব শহরবানুকে।

সত্যি-সত্যিই সে ডাক দিল। আর, চাঁদ দেখে জোয়ারের জল যেমন করে তেমনি করে ছুটে এল শহরবানু। এক বস্ত্রে। এলোচুলে। গা ঘেঁষে দাঁড়াল সদররালির।

মুহূর্তে কী হয়ে গেল মোজাহারের কে বলবে! উঠোনে পড়ে ছিল একটা বাঁশের মুগুর, তাই তুলে নিয়ে বসালে এক ঘা। এক ঘা-এর উত্তেজনায় আরো কয়েক ঘা পড়ল পর-পর।

লুটিয়ে পড়ল শহরবানু। মাথা ফেটে রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে। দেখতে-দেখতে ঠান্ডা হয়ে গেল।

প্রথম সাক্ষী অন্ন মণ্ডল। যারা সালিশে বসেছিল তাদের যে প্রধান। অকু প্রায় তাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। তারা সব স্বাধীন সাক্ষী।

বলো কি ঘটেছে। কি দেখেছ নিজের চোখে। উচিত-অনুচিতের কথা

নয়, ধর্মাধর্মের কথা নয়, আইন প্রত্যক্ষের কারবারী। সেই প্রত্যক্ষের খবর বলো।

যা ঘটেছে হলফান বলে গেল অন্ন মণ্ডল।

হাকিম জিগগেস করলেন মোজাহারকে, 'কি, কিছু জিগগেস করবে?'

একবার বাঁকা চোখে তাকাল মোজাহার। এই সব সত্যি ঘটনা? আর কিছু নয়? কিন্তু কি ভেবে চোখ নামিয়ে বললো, 'না।'

দশ-সালিশের লোকেরা কাঠ-বাক্সে উঠতে লাগল পর-পর।

জেরা নেই, তবু মূল জবানবন্দিতেই হল কিছু গরমিল। কেউ বললে, বাঁশের মুগুর নয়, কাঠের হুড়কো দিয়ে মেরেছে। কেউ বললে, কে যে মেরেছে বলা শক্ত—সদরালি আর মোজাহারে লেগেছিল হুড়দঙ্গল, দু'জনের হাতেই বাঁশের ডাণ্ডা, শহরবানু ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাঝখানে, কার ডাণ্ডা মাথায় পড়েছে দেখিনি ঠাহর করে। আরেক জন তো স্পষ্টই বললে, সদরালিই হয়তো মেরেছে ব্রহ্মতালুতে।

'জেরা করবে কিছু?'

'কিছু না। কাউকে না।' আওয়াজে এতটুকু উৎসাহ নেই মোজাহারের: 'যে যেমন বলতে চায় বলুক।'

আশ্চর্য, সদরালিও সাক্ষী দেবে?

কেন দেবে না? সত্যি তো সত্যিই। তার কাছে ন্যায় নেই, নীতি নেই। কী ঘটলে ভালো হত তার চেয়ে যা ঘটেছে তাই বেশি দামী।

দিব্যি বলে গেল মুখ ফুটে।

হ্যাঁ, নিয়ে গিয়েছিলাম বের করে। কোনো জোর ছিল না, জোচ্চুরি ছিল না, দিনের আলোয় সবার নাকের উপর দিয়ে নিয়ে গেলাম। আইনের চোখে দোষ ধরতে শুধু পুরুষের। মেয়েদের কি আর দোষ হয়? কিন্তু মেয়ে না পা বাড়ালে পথও যে পা বাড়ায় না। কিন্তু আটকালো রক্ষী লক্ষ্মীছাড়ারা। পুলিশচালানী কেস হতে পারল না, শহরবানু সাবালিকা আর সে নিজের ইচ্ছেয় বেরিয়েছে—

শ্রান্ত হয়ে কখন বসে পড়েছিল খাঁচার মধ্যে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মোজাহার। ইচ্ছে করে বেরিয়েছে? জানা ঘর ছেড়ে অজানা পথ কখনো বড় হয়? পুরোনো পুরুষের চেয়ে নতুন বিদেশী বেশি লোভের? কিছু একটা বলবার জন্যে হুঙ্কার দিয়ে উঠল মোজাহার।

পি-পি হাত তুলে বারণ করলেন। বললেন, 'এখন নয়, জেরার সময় জিগগেস কোরো যা খুশি।'

তাই সালিশ বসাল গাঁয়ের মাথারা। জবানবন্দির জের টানল সদরালি। ফয়সালা হল, শহরবানু ফিরে যাবে তার স্বামীর কাছে। আর আমি সাত দিনের মধ্যে বাস তুলে নেব গাঁ থেকে। দু-কানকাটার আবার ভয় কি। সে যাবে গাঁয়ের মধ্যিখান দিয়ে। সাত দিনের টালমাটাল কেন? এক্ষুনি, এই

দণ্ডে, চক্ষের পলক পড়তে-না-পড়তে চলে যাব। কিন্তু খালি হাতে নয়। সঙ্গে করে নিয়ে যাব শহরবানুকে।

শহর! হাঁক দিলাম উঁচু গলায়। চললাম দেশ ছেড়ে। সীমা ছেড়ে। সঙ্গে যাবে তো চলে এস এই দণ্ডে।

সত্যি-সত্যি চলে এল। সে কি আমি ডেকেছি, না, আর কেউ ডেকেছে? আর কেউ ডেকেছে। যে ডেকেছে তার নাম মরণ।

ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে এল মোজাহার। হাতে বাঁশের মুগুর। এখনো সেই মুগুরে রক্তের দাগ ও লম্বা কালো চুলের গুছি লেগে আছে। পিছন থেকে শহরবানুর মাথায় বসিয়ে দিল এক ঘা—

মিথ্যে কথা। উকিল লাগাতে পারলে মামলা ঠিক ঘুরিয়ে দিতে পারত। মিথ্যে কথা। সালিশের মীমাংসা মেনে শহরবানু ফের যখন স্বামীর ঘরে ঢুকল সেই থেকেই তুমি ক্ষেপে গিয়েছ। সাত দিনে গাঁ-ছাড়া হওয়ার চেয়ে তা কঠিনতরো অপমান। তাই তুমি প্রতিশোধ নেবার জন্যে শহরের মাথায় লাঠি মারলে। কিংবা জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে ফের, স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তিন ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সে 'না' করে দিলে। আর অমনি মাথায় তোমার খুন চাপল।

দাঁড়াও, জেরা আছে। জেরায় ইঙ্গিত দেওয়া চলবে। ইঙ্গিত না টিকলেও সেই কারণে আসামী দোষী বনবে না। সবল স্বাধীন সম্পূর্ণ প্রমাণ চাই। সঙ্গত সন্দেহের অতীত যে প্রমাণ।

'কি, জেরা করবে?' পি-পি প্রশ্ন করলেন।

দাঁড়িয়ে ছিল, আস্তে-আস্তে বসে পড়ল মোজাহার। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। না, জেরা করে কি হবে! জেরা করার আছে কি!

সুরতহাল তদন্ত করেছিল যে ইনস্পেকটর সে এল। লাশ যে সনাক্ত করেছে এল সে কনেস্টবল। ময়না-তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে যে ডাক্তার সেও হলফ নিলে।

তার পর এল, আর কেউ নয়, কোব্বাত। দশ-বারো বছরের সরল শিশু।

ও মা, তুইও সাক্ষী দিবি? বলবি বাপের বিরুদ্ধে?

কার বিরুদ্ধে সেইটে কথা নয়। কথা হচ্ছে সত্যের স্বপক্ষে। বলছি সমাজের স্বপক্ষে।

কিন্তু ও-ছেলে জানে কি সাক্ষী দেওয়ার? পুলিশ যা শিখিয়ে দেবে তাই বলবে বুঝি? তা কেন? যা ঘটেছে যা দেখেছে তাই ঠিক-ঠিক বলবে। এতটুকু নড়চড় হবে না।

আশ্চর্য, ঠিক-ঠিক বললে কোব্বাত। এতটুকু ভয় পেল না, গলা শুকিয়ে গেল না কাঠ হয়ে। সদরালির সঙ্গে চলে যাবার জন্যে মা বেরিয়ে আসতেই বা-জান মাথায় দিলে এক মুগুড়ের বাড়ি। শুধু কি একটা? পর-পর অনেকগুলি—মাথা ফেটে রক্ত বেরুল ফিনিক দিয়ে। মা পড়ে গেল মাটিতে—

'আমি জেরা করব।' উঠে দাঁড়াল মোজাহার।

পিতার সুপুত্র তুমি, বাপকে জেলে না পাঠালে তোমার সুখ নেই।

গলা-খাঁকরে জিগগেস করল মোজাহার : 'কেমন আছিস?'

বাপের দিকে চাইল করুণ চোখে। গলা নামিয়ে বললে, 'ভালো আছি।'

'জিন্নাত কেমন আছে?'

'ভালো।'

'আর বিল্লাত? কার কাছে শোয়? কাঁদাকাটি করে নাকি রাত্তিরে?'

হাকিম হুমকে উঠলেন : 'এ সব জেরা চলবে না। ঘটনার সম্বন্ধে কিছু জিগগেস করবার থাকে তো করো।'

মোজাহার ঢোক গিলল। বললে, 'কে রান্না করে দেয় তোদের?'

হাকিম ধমক দিলেন কোব্বাতকে : 'উত্তর দিও না।'

'খোরাকি পাস কোথায়? ঘরে কি কিছু ছিল ধান-চাল?'

কোব্বাতের মুখে কথা নেই।

'মাটি দেবার আগে গা থেকে জেওর কখানা খুলে রাখতে পেরেছিলি? ঘরে আছে যে শাড়ি-কাঁচুলি আয়না-কাঁকই ফিতে-কাঁটা নেয়নি তো চোরে-ডাকাতে? ঘর ছাইবার যে খড় কিনেছিলাম উঠোনে পচছে পড়ে-পড়ে?'

পি-পিও এবার হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বসে পড়ল মোজাহার।

কোব্বাত নেমে গেল। বসল শত্রুদলের সাক্ষীর এলেকায়। বসল পর হয়ে।

এবার তুমি এস। তোমার জবানবন্দি চাই। সাক্ষ্যপ্রমাণ সব শুনেছ, বলো, তোমার কী বলবার আছে।

মোজাহারের আর কিছুই বলবার নেই। হুজুর, আমি নির্দোষ।

সাফাইসাক্ষী আছে কিছু?

না।

আবার ফিরে গেল খাঁচায়।

সরকারী উকিল সওয়াল শুরু করলেন। এ মামলায় বেশি কিছু বক্তৃতা করবার নেই। প্রথম দেখুন শহরবানু খুন হয়েছে কিনা। আর খুন যদি হয়ে থাকে, মোজাহার করেছে কিনা। দুইই একেবারে প্রমাণ হয়েছে কাঁটায়-কাঁটায়। সাক্ষ্যবাক্য সব একতরফা। এদিক-ওদিক যেটুকু গরমিল হয়েছে, তা খুঁটিনাটি ব্যাপারে। সে সব উপেক্ষার যোগ্য। শাখা-পাতা ছেড়ে দিয়ে দেখুন মূল-কাণ্ড ঠিক আছে কিনা। তা যদি থাকে আপনাদের সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন।

এবার জুরিদের বোঝাতে বসলেন হাকিম। আইনের ব্যাখ্যা ঘটনার বিশ্লেষণ। গোড়াতেই জেনে রাখুন আপনারাই চূড়ান্ত বিচারক। প্রমাণের ভার সরকার পক্ষের। প্রমাণ কাকে বলে? আপনাদের কাছে যা বিশ্বাস্য আইনে তা প্রমাণিত। আসামীর পক্ষে উকিল নেই তাই বিশেষ সতর্ক হবেন। কিন্তু সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও যদি বিশ্বাস করেন মোজাহারই

মেরেছে তার স্ত্রীকে, তা হলে দোষী বলতে দ্বিরুক্তি করবেন না। এখন দেখুন, অবিশ্বাস করবার কি কোনো কারণ আছে? যদি বোঝেন মতলব করে ভেবে-চিন্তে মেরেছে তবে এক রকম শাস্তি, আর যদি বোঝেন ঝোঁকের মাথায় হলেও পরিণামে কি হতে পারে জেনে-শুনে মেরেছে তবে আরেক রকম শাস্তি—

কোর্ট-ঘর লোকে লোকারণ্য।

ঝাড়া দেড় ঘন্টা ধরে বক্তৃতা করলেন হাকিম।

জুরিদের কেউ ঘুমুচ্ছে কেউ হাই তুলছে কেউ বা কাগজে হিজিবিজি আঁকছে নয়তো বিলের অঙ্ক কষছে।

জুরিরা বেশি বোঝে। তাদের জন্য ভাবনা নেই। আইনে যা করণীয় তাই করে যাও।

'যান, আপনাদের সিদ্ধান্ত এনে দিন আমাকে। যদি পারেন তো এক-মত হোন।' জুরিদের ছুটি দিলেন হাকিম।

এতক্ষণ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল মোজাহার, এবার, জুরিরা চলে গেলে ভেঙে পড়ে কাঁদতে বসল।

একবার তাকাল চারদিকে। কাউকে ধরবার-আঁকড়াবার নেই। কোম্বাতের মুখখানিও কোথায় হারিয়ে গেছে।

অনেক প্রতীক্ষার পর এল আবার পঞ্চ জন। পঞ্চ জুরি।

'আপনারা একমত?' জিগগেস করলেন হাকিম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি আপনাদের সিদ্ধান্ত?'

'নির্দোষ।'

একটা স্তব্ধতার বজ্র পড়ল ঘরের মধ্যে। পি-পিতে আর হাকিমে একবার চোখ-চাওয়াচাওয়ি হয়ে গেল। যে ইনস্পেকটরের হাতে তদন্তের ভার ছিল সে হাত রাখল কপালে।

রায় দিলেন হাকিম। জুরিদের সঙ্গে একমত হলেন। যাও, জুরিবাবুরা তোমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেছেন। তুমি খালাস।

খাঁচা থেকে নেমে এল মোজাহার। উন্মুখ দড়ি আর হাতকড়ার ঘের বাঁচিয়ে। কনেস্টবলরা সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল।

কিন্তু কোর্টের সামনে বারান্দায় এসে ফের ভেঙে পড়ল মোজাহার। কাঁদতে লাগল শিশুর মত। এক শিশু নয়, তিন-তিন শিশুর কান্না।

ভিড় জমে গেল। কাঁদবার কী হয়েছে! কেউ-কেউ বললে, আসলে যে কি হুকুম হল বুঝতে পারেনি ঠিক মত।

স্বয়ং পি-পি এসে দাঁড়ালেন কাছে। ও কি, কাঁদছ কেন? ন্যায়বিচারে ছাড়া পেয়ে গেছ। আর কোনো ভাবনা নেই। ঘরে চলে যাও এবার।

যেন কোথায় ঘর এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাল একবার চার দিকে।

পি-পির দু-পা আঁকড়ে ধরে বললে, আপনি তো সব জানেন, কিন্তু বলুন তো আমি কাকে মেরেছি? শহরবানুকে না সদরালিকে?

কাকে মারতে কাকে?

৮৮। পরা বিদ্যা

জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে, ঠিক করতে পারছে না শ্রাবণী।

কতক্ষণ চোখ বুজে রইল। অনেকক্ষণ। ভাবতে চেষ্টা করল ঘুমিয়ে আছে। এমন নিশ্ছিদ্র ঘুম, গায়ে ঠেলা মারলেও ভাঙবে না। কিংবা খুব যেন কঠিন একটা অসুখ করেছে। পাশ ফেরবারও ক্ষমতা নেই। যে শাদা দেয়ালটার দিকে মুখ করে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে তাকেই সমুদ্র বলে ভুল করছে। না, সমুদ্র নয়, হয়তো শাদা পালতোলা কোন এক সওদাগরের নৌকো।

সমস্ত শরীরে চমকে উঠে ভীত-ত্রস্তের মত তাকাল শ্রাবণী। না, না, আছে, পাশেই পড়ে আছে নিরীহের মত। এক পিণ্ড বজ্র কিন্তু দেখাচ্ছে যেন ফুলের সারল্য।

হাতে আদর মাখিয়ে খামটা তুলে নিল শ্রাবণী। নিপুণ আঙুলে কোমল ভঙ্গিতে বার করল চিঠিটা। ভাঁজ করা চিঠিটা খুলে আরেক বার, আরো একবার পড়ল। ঠিক তেমনিই আছে সমস্ত, এতটুকু নড়চড় হয়নি, ধুয়ে-মুছে যায়নি। সেই কটি অক্ষর তেমনি হাসছে চোখের দিকে চেয়ে। শুধু হাসছে না, দেখছে, ধরছে, কথা কইছে কানে-কানে। চিঠির সামান্য কটা অক্ষর দেহে-মনে এত বড় একটা প্রলয় তুলে দিতে পারে ভাবতেও পারত না।

হঠাৎ জানলার দিকে মেঝের উপর চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলল শ্রাবণী।

উপেক্ষার চোখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

জানলা দিয়ে পিওন অমনিই ছুঁড়ে ফেলেছিল মেঝের উপর। আর-আর চিঠি ঠিক তাক করে টেবলের উপর এসেই পড়ে কিন্তু এটা যেন নিজের বেগে অনেক দূরে ছিটকে চলে এসেছে।

দেখি কতক্ষণ অমনি থাকতে পারে। দেখি হাওয়ায় কোথায় নিয়ে যায়। দেখি চাকর ঘর ঝাঁট দিতে এসে বাইরে ফেলে দেয় কিনা। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল শ্রাবণীর। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিল চিঠিটা। একেবারে বুকের আঁচলের নিচে, গভীরে, লুকিয়ে রাখল।

আবার ভয় হল ঘামে না চিঠির অক্ষর ঝাপসা হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বার করে আনল চিঠি। যেন ওটা ছোট একটা শিশুর হাত এমনি স্নেহে

একবার এ-গালে আরেকবার ও-গালে রাখল। রাখল কপালে। ঠোঁটের উপর। সামান্য কটা অক্ষর কে বলে? এক আকাশ তারা। এক-গা শিহরণ।
কিন্তু এত সুখ সে কী করে ঢেকে রাখবে, লুকিয়ে রাখবে!
কলেজে যেতেই এক নজরে ধরে ফেলল নীলাক্ষি। কি রে কী খবর?
'কী আবার খবর!' শ্রাবণী উদাসীন হবার ভাব করল।
'একেবারে উছলে পড়ছিস যে।' গায়ে ঠেলা দিল নীলাক্ষি : 'খুশি যে ধার ধরে না।'
'বা, চুপচাপ বসে আছি, খুশির তুই দেখলি কী!'
'সে আমি দেখেছি, আমি বুঝেছি।' কানের কাছে মুখ আনল নীলা, গলা ঝাপসা করল : 'কোনো খবর আছে?'
'আছে।' শ্রাবণী না বলে পারল না। অন্তরঙ্গ সুরটাই কথা টেনে আনল।
'কী?' নীলা আরো ঘেঁসে এল।
'চিঠি।'
এ একটা এমন কী বলবার মত! তবু নীলাক্ষি চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলে : 'কে লিখেছে?'
নাম বললে চিনতে পারবে। তাই একটু বুঝি দ্বিধা লাগল শ্রাবণীর।
'আমি কাউক্কে বলব না।' দরকার নেই, তবু নীলাক্ষি আশ্বাস দিল, বললে, 'আমাকে তুই বিশ্বাস করতে পারছিস না?'
'আহাহা, তা কেন?'
'তবে বল্, কে লিখেছে?'
নাম বললে চিনতে পারবে বটে কিন্তু বুঝতে পারবে না। শ্রাবণী এদিক-ওদিক তাকাল। বললে, 'আমার পুরুষ।'
বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খেল নীলাক্ষি। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে জিজ্ঞেস করলে, 'কী লিখেছে?'
'সাঙ্ঘাতিক।'
'কই দেখি।'
নীলাক্ষির হাতটা ঠেলে দিয়ে শ্রাবণী বললে, 'এখানে নিয়ে এসেছি নাকি? বাড়িতে আছে।'
কলেজের পর শ্রাবণীর বাড়িতে এসে হাজির নীলাক্ষি। কই, দেখা।
প্রশ্ন অবান্তর, তবু আবার জিজ্ঞেস করল শ্রাবণী : 'কাউকে বলবি না তো?'
'রাখ, কাকে আবার বলব।'
রঙিন খামের থেকে চিঠিটা বার করে দিল শ্রাবণী। লেটার-হেড ছাপানো চিঠি। নীলাক্ষি এক নজরে পড়ে নিল নামটা।
'বলিস কী, সেই—সেই ভদ্রলোক?'
তাছাড়া আবার কী। শ্রাবণী নীরবে গর্বের ঢেউ তুলল।

লোলুপ চোখে পড়তে লাগল নীলাক্ষি। আস্তে-আস্তে তার মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল। ভারী হয়ে এল নিশ্বাস।

'ছি ছি ছি ছি—'

শ্রাবণীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'এ যে নিদারুণ অশ্লীল।'

'অশ্লীল?' যেন সে-ই অপরাধী এমনি মুখ করল শ্রাবণী।

'এসব কী—এসব কী লিখেছে?' চিঠির কটা লাইন নীলাক্ষি আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করল: 'ছি ছি ছি ছি—এসব কেউ কাউকে লেখে?'

শ্রাবণী লাইন কটাতে চোখ বুলোলো। নিরীহের মতো হেসে বললে, 'তা আমাকেই তো লিখেছে।'

'তুই কলেজে-পড়া কুমারী মেয়ে, তোকেই বা লিখবে কেন? লোকটার এতটুকু শালীনতাবোধ নেই? এরকম কদর্য করে কেউ লেখে?' নীলাক্ষি রি-রি করে উঠল।

ওর হাত থেকে চিঠিটা টেনে নিয়ে খামের মধ্যে পুরল শ্রাবণী।

'টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফ্যাল।' ঝলসাতে লাগল নীলাক্ষি: 'অন্য কেউ দেখতে পেলে কেলেঙ্কারি হবে। লোকটা বড় চাকুরে হলে কী হবে, মন অত্যন্ত নোংরা, কুৎসিত। সব চিঠিই এইরকম নাকি?'

'না না, এই একটাতেই, আজকেরটাতেই একটু বেশি বলে ফেলেছে।' যেন আসামীর পক্ষে সাফাই দিচ্ছে এমনিভাবে শ্রাবণী বললে, 'ওকে এখানে আমার কাছে আসতে লিখেছিলুম কিনা—'

'আসতে লিখেছিলি?' কপালে চোখ তুলল নীলাক্ষি: 'তাইতেই এই চেহারা! সত্যি-সত্যি এসে পড়লে না জানি কী করে ছাড়বে! যার মনে এমন পাপ তাকে বিশ্বাস কী। একটা সরল বিশ্বাসী মেয়েকে পথের ভিখিরি করে দেবার মতলব। দেখি আগের চিঠিগুলি দেখি।'

'আগের চিঠিগুলি অনেক ভদ্র।'

'দেখি।'

লাল সুতো দিয়ে বাঁধা এক তাড়া চিঠি বার করে দিল শ্রাবণী। নীলাক্ষি পড়তে লাগল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। বললে, 'কই এতদিন তো দেখাসনি।'

'এগুলো দেখাবার কী আছে?' শ্রাবণী হাসল: 'এগুলো তো মামুলি। যেটা দেখবার—'

'হ্যাঁ, আজকেরটা।' নতুন টাটকা চিঠিটা আবার টেনে নিল নীলাক্ষি: 'এগুলো সব ধিকিধিকি, আজকেরটাই আগুন। হ্যাঁ, ছি ছি, এই জায়গাটা—' চিঠিটা খুলে নীলাক্ষি আবার পড়তে লাগল: 'কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোকের কলম দিয়ে এসব কথা বেরুতে পারে? কী নিদারুণ নির্লজ্জ লোকটা।'

'থাক। তোকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না।' চিঠিপত্র সব গুটিয়ে নিল শ্রাবণী।

'তাহলে এখন কী করবি?'

'দেখি।'

'ওর আসবার দিনক্ষণ ঠিক হলে আগে থেকে একটু জানাস।' উঠে পড়ল নীলাক্ষি : 'আড়ি পাতব।'

পরে এক পা গিয়ে আবার ফিরল। বললে, 'আমার তো মনে হয় সাবধান হওয়া ভালো। যে অমন সব অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারে সে মোটেই শ্রদ্ধেয় নয়, বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

কী আশ্চর্য, রমা-দি কী মনে করে।

এখানকার এক মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষিকা। নিজে কুমারী বলে পাড়ার তরুণী ছাত্রীদের বন্ধু, তার চেয়েও বড় কথা, মুরুব্বি। পরামর্শদাত্রী।

'সুধীর বোস তোমাকে চিঠি লিখেছে?' সরাসরি প্রশ্ন করে বসল রমাদি।

'ঈস!' একেবারে গাড়ির তলায় পড়ল শ্রাবণী : 'আপনি কী করে জানলেন?'

'আর কী করে জানলাম!' মুরুব্বির মত হাসল রমাদি : 'আচ্ছা এ কোন সুধীর বোস বলো তো? এখানে বছর তিনেক আগে ব্যাঙ্কে যে ছিল সেই ছোকরা? সেই যে ভালো য়্যাক্টিং করতে পারত। তোমাদের নিয়ে করেছিল কলেজে—'

'হ্যাঁ, সেই।' চোখ নামিয়ে সায় দিল শ্রাবণী।

'সে তো বেশ ভালো। স্মার্ট অফিসার।'

তাতে আর সন্দেহ কী। শ্রাবণী স্তব্ধ হয়ে রইল।

'কী লিখেছে?' গলাটাকে একটু ধূসর করল রমাদি।

শ্রাবণীর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। জানতে আর কিছু বাকি নেই, শুধু উপর-চাল। বললে, 'কতকগুলো অশ্লীল কথা লিখেছে।'

'অশ্লীল?' মুড়ের মত মুখ করল রমাদি।

'দেখবেন?' একটা চেয়ারে বসে ছিল শ্রাবণী, উঠে পড়ল।

'বা, তোমাকে লেখা চিঠি আমি দেখতে যাব কেন? ওরকম গ্রাম্য কৌতূহল আমার নেই।' শ্রাবণীকে নিরস্ত করল রমাদি। বললে, 'কিন্তু অশ্লীল—অশ্লীল তুমি কাকে বলছ?'

'এমন অশ্লীল যে মুখে উচ্চারণ করা যায় না।'

'নীলাক্ষি অবশ্যি উচ্চারণ করে শুনিয়েছে। এমনিতে হয়তো অশ্লীল, কিন্তু তোমার কাছে তা অশ্লীল হতে যাবে কেন?'

'কেন, আমি কি সৃষ্টিছাড়া?'

'নিশ্চয়ই। যে মুহূর্তে ও তোমাকে ভালোবেসেছে সেই মুহূর্তে ওর কাছে তুমি সৃষ্টিছাড়া হয়ে গিয়েছ।' পরম জ্ঞানীর মত হাসল রমাদি। বললে, 'আর তুমি যদি ওকে ভালোবেসে থাকো তোমার কাছে ও-ও সৃষ্টি-

ছাড়া। এক সৃষ্টিছাড়া আরেক সৃষ্টিছাড়াকে চিঠি লিখবে তাতে আবার শ্লীল-অশ্লীল কী! ভালোবাসা তো সর্বগ্রাসী। সে শ্লীলকেও ভালোবাসে, অশ্লীলকেও ভালোবাসে।'

'তাই বলে প্রকাশে শালীনতা থাকবেনা?'

'আর তুমি তোমার পুরুষের চিঠি তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে বেড়াবে সেইটেই বা কেমন শালীনতা?' একটু বা গঞ্জনার সুর আনল রমাদি : দেখিয়েছিলে বলেই তো উচিত-অনুচিত, শ্লীল-অশ্লীলের কথা উঠল। নইলে তোমার চিঠি একা তোমার কাছে থাকত, ওসব হাঙ্গামাই হত না, অনুচিতকেও ভীষণ উচিত, কুৎসিতকেও ভীষণ সুন্দর মনে হত। প্রেমের চিঠি কি কাউকে দেখাতে আছে?'

'ভাগ্যিস চিঠিটা দেখিয়েছিলি, ভাগ্যিস কথা পাঁচকান করেছিলাম—' ঝড়ের মত ছুটে এল নীলাক্ষি, উদ্বেল উত্তেজনায় ফেটে পড়ল : 'সেই এক —এক চিঠি, এক ভাষা, এক ভাব, এক টেকনিক। অবিকল—হুবহু।'

'কি, কী বলছিস তুই?'

'তোকে যেমন লিখেছে না, তেমনি অজন্তাকেও লিখেছে।' আবিষ্কারের আনন্দে জ্বলজ্বল করছে নীলাক্ষি : 'তুমিই আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার বৃষ্টির পারেকার রামধনু, আমার হিরন্ময় অন্ধকার—আরো কত কী—সব এক কথা। দ্যাখ মিলেছে, তোকেও এসব লিখেছে। হ্যাঁ, তুমি মাঠ —আমিই তোমার রাখাল নায়ক, তোমার সঙ্গীতসিন্ধুর ডুবুরি—আর কী জানি সেই কথাটা—তুমিই আমার অন্তিমা, শেষতমা—'

'লিখেছে?' যেন কোন আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনল, এমনি আর্তনাদ করে উঠল শ্রাবণী।

'তারপর সেই ঝড়ের রাত্রে তার ঘরে ঝড় হয়ে আসার প্রস্তাব—'

'সত্যি? দেখাতে পারিস?'

'তুই চল না অজন্তাদের বাড়ি। নিজের চোখে দেখে আসবি।'

কলেজের ছাত্রী যখন, অজন্তাকে চিনতে পেরেছে রমাদি। জিজ্ঞেস করল, 'অজন্তাও পার্ট নিয়েছিল থিয়েটারে?'

'কত মেয়েই তো নিয়েছিল—' তৈরি হতে-হতে বললে শ্রাবণী, 'অজন্তা, সাধনবা, রত্না, স্বপ্না, মাধবী, করবী, নন্দিতা—তাই বলে—' হাতের চিরুনিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে মারল, বললে, 'চল।'

'ভাগ্যিস আমার কোনো পার্ট ছিল না।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাল্কা হয়ে দাঁড়াল নীলাক্ষি। রমাদিকে লক্ষ্য করে বললে, 'আপনিও চলুন না, স্বচক্ষে দেখে আসবেন এক পদস্থ সরকারী কর্মচারীর কয়াপশন্।'

'না, না, আমি এর মধ্যে কী।' সম্ভ্রান্ত নির্লিপ্ততায় সরে দাঁড়াল রমাদি। বললে, 'যেতে হলে আমি পরে যাব।'

এক বাণ্ডিল চিঠি খুলে ধরল অজন্তা। সাত মাসে আটচল্লিশখানা।

নীলাক্ষির চোখে গোয়েন্দার আনন্দ আর শ্রাবণীর চোখে অপমানের জ্বালা।

একে-একে সমস্ত পড়ল শ্রাবণী। নিশ্বাসে আগুন ছুটতে লাগল। একই কার্বন-কপি। সেই, তুমিই আমার সন্ধ্যা-রক্তিমা, সায়ন্তনী হয়ে চিরন্তনী।

'আর এই দ্যাখ সেই একই কুপ্রস্তাব।' লাল পেন্সিলে চিহ্ন দেওয়া খামটা বার করল নীলাক্ষি।

'আর দেখবার দরকার নেই।' নীলাক্ষির হাতটা ঘৃণায় ঠেলে দিল শ্রাবণী। বললে, বুঝে নিয়েছি।'

'ভগবান রক্ষা করেছেন।' নীলাক্ষিও সমাপ্তির রেখা টানল।

'এখন কী অবস্থা?' অজন্তার মুখের উপর আয়ত চোখ ফেলল শ্রাবণী।

'ছেড়ে দিয়েছি।' অজন্তা বললে।

'কেন, ছাড়লি কেন?'

'আর কেন?' অজন্তা ক্লান্ত রেখায় হাসল। বললে, 'দেখলাম এরকম চিঠি রত্নাকেও লিখেছে।'

'রত্নাকেও লিখেছে?' উন্মাদ খুনীর মত চেঁচিয়ে উঠল শ্রাবণী।

'রত্নাকেও, রত্নাকেও।' নীলাক্ষি দুলে-দুলে হাসতে লাগল।

'সেই এক সুরে এক গান।' অজন্তা নিস্পৃহ স্বরে আওড়াতে শুরু করল : 'তুমিই আমার ধ্রুবতারা, আমার সর্বোত্তমা, মধুমত্তমা, শাশ্বতী ভাস্বতী—'

'একটা আকাশে কতগুলো ধ্রুবতারা রে!' নীলাক্ষি হেসে কুটি-কুটি হতে লাগল। শ্রাবণীর গায়ে ঠেলা মারল। 'চল রত্না ঘোষের বাড়ি যাই। চিঠি পড়ে আসি।'

'দরকার নেই।' শ্রাবণী অজন্তার চিঠিগুলির দিকে তাকাল : 'এতেই হবে।'

'তাছাড়া রত্না ওর চিঠি রাখেনি জমিয়ে।' অজন্তা বললে, 'সব পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'ও-ও বুঝি ছাড়ল যখন দেখল স্বপ্নাকে কি আর কাউকে ঝেড়েছে অমনি আরেক ঝুড়ি।' নীলাক্ষি খল খল করে হাসতে লাগল।

'হবে হয়তো।' বললে অজন্তা।

'কিন্তু তুই পাপ চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিস কেন' ফণা তুলল শ্রাবণী।

'রেখেও দিইনি, নষ্টও করিনি। জাস্ট থেকে গিয়েছে।' রাগও নেই অনুরাগও নেই এমনি গা-ছাড়া ভঙ্গি অজন্তার। বললে, 'লোকটা শঠ কিন্তু চিঠিগুলি সুন্দর। অঙ্ক নিয়ে কারবার করলে কী হবে, সাহিত্যে স্ফূর্তি আছে।'

'অমনি-অমনি ছেড়ে দিলি?'

'হ্যাঁ, চিঠি বন্ধ করে দিলাম। বারকতক গাঁইগুঁই করল, তারপর ও-ও বন্ধ করে দিল। বেঁচে গেলাম।'

'একটা প্রোটেস্টও পাঠালিনে? মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রবঞ্চক—গালাগাল করলি নে সরাসরি?' শ্রাবণীর সারা শরীর জ্বলতে লাগল : 'চুপচাপ সরে পড়তে দিলি?'

'গালাগাল করে কী হবে? সম্পর্কই চুকে গেল—'

'অন্তত ওর আফিসে একটি বেনামী পাঠালি নে?'

'আমি বাবা শান্তিপুরের মেয়ে, শান্তি চাই।' শান্তমুখে অজন্তা বললে, 'যা হারিয়ে যায় তা আর আগলে বসে থাকতে চাইনে। পুরোপুরি শেষ হয়ে যাওয়াই ভালো।'

'কিন্তু আমি এখানেই শেষ হতে দেব না, কক্খনো না।' রাগে ফুলতে-ফুলতে বাড়ি ফিরল শ্রাবণী। আর ফিরেই সুধীর বোসকে চিঠি লিখতে বসল।

'তুমি' করে লিখত, এবার লিখল 'আপনি' করে। কত নতুন পাঠ দিত মাথা খাটিয়ে, এবার পাঠ দিল 'সবিনয় নিবেদন।' এতদিন চলতি ভাষায় লিখে এসেছে, এবার লিখল সাবেকী শুদ্ধ ভাষায়।

যা লিখল একেবারে উলঙ্গ আগুন।

আপনি কপট, মিথ্যাবাদী, প্রতারক। আপনি দুশ্চরিত্র। মেয়েদের সর্বনাশ করাই আপনার ব্যবসা। আপনি প্রেমের কথা বলেন? আপনার সমস্ত ছলনা। সমস্ত অভিনয়। আসল অভিপ্রায় পশুত্ব। কিন্তু এখনো সংসারে ধর্ম আছে, তাই আপনার ছদ্মবেশ খুলে গিয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে আপনার ঘৃণ্য কঙ্কাল—

চার পৃষ্ঠা ভরে নির্জলা গালাগাল।

চিঠিটা ছেড়ে দিয়ে মনে হল আরো দু পৃষ্ঠা লিখলে হত। দেখি না কী উত্তর আসে। কী সাফাই গায়। তারপর ঝাড়া যাবে আরো দশ পৃষ্ঠা।

সব খোঁজ-টোজ নিয়ে কদিন পর রমাদি এসে হাজির।

'কি গো, তোমার সুধীর বোস এল?'

'কে আসবে?' খেঁকিয়ে উঠল শ্রাবণী।

'সে অমন সুন্দর একটা চিঠি লিখল, বর্ষারাতের অমন মিলনের বর্ণনা দিয়ে, তাকে আসতে লিখলে না?'

'ঐ ভণ্ডটাকে আসতে লিখব? ঐ কাপুরুষটাকে?'

'কেন, সে ভণ্ডামির করল কী!'

চোখ কপালে তুলল শ্রাবণী : 'ভণ্ডামির করল কী! রত্নাকে যা লিখল তাই লিখল অজন্তাকে, অজন্তাকে যা লিখল তাই লিখল আমাকে। কটা মেয়েকে সে ভালোবাসবে শুনি? দু বছরের মধ্যে এই শহরেরই তিনজন। অন্য শহরের খবর কে জানে। ভালোবাসা না কাঁচকলা। আগাগোড়া অন্যায়।'

'আমি তা মানতে রাজি নই।' রমাদি মুখে গাম্ভীর্য আনলেন : 'রত্না চলে যাবার পর অজন্তাকে ধরেছে। অজন্তা ছেড়ে দেবার পর তোমাকে।'

'আর আমি ছেড়ে দেবার পর—'

'তুমি ছেড়ে দেবে কেন? তুমি ওকে তোমার ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখবে।'

'আর ওই তো ওর চরিত্র।' শ্রাবণী ঘৃণার রেখা টানল মুখে। বললে 'ঘরে বন্ধ হয়ে থাকলেও ও জানলা দিয়ে বাইরে হাত বাড়াবে।'

'বাইরে হাত বাড়াতে দেবে কেন? ওকে বাহুর মধ্যে বন্দী করে রাখবে। ঘরে-বাইরে তুমিই একমাত্র হয়ে ওকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তখন দেখবে', রমাদির দুই চোখ করুণায় ভরে উঠল : 'তুমি ঠিকই ওর অন্তিমা, ওর শেষতমা, সর্বোত্তমা হয়ে আছ।'

'বাজে কথা। তাহলে অজন্তার বেলায় অমন হল কেন?'

'অজন্তার পর্বে অজন্তাই সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ছিল। অজন্তাটা বোকা, ছেড়ে দিল। তারপর ধরল তোমাকে। তোমার পর্বে তুমিই আবার সর্বশ্রেষ্ঠ হলে। বেশ তো, ওকে ডাকো, ওর চিঠির উত্তরে ওকে আসতে লেখ। তারপর ও এলে পর ওকে আটকাও। তোমার যত দড়িদড়া আছে সব দিয়ে ওকে বাঁধো অস্টেপৃষ্ঠে। ওকে চিরকালের করে তোলো। দেখবে তুমিও ওর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হয়েই রয়েছ। কি', শ্রাবণীর অসাড় চেতনায় নাড়া দিল রমাদি : 'কি, পাঠালে নিমন্ত্রণ?'

শ্রাবণী বললে, 'একটা ঝাঁটাপেটা চিঠি পাঠিয়েছি।'

'সে কি!' এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল রমাদি। পরে বললে, 'উত্তর এসেছে?'

'না। বুঝুন তবে কীরকম ভালোবাসা। উত্তর এল না বলে আরেকটা পাঠালাম। এবার একেবারে জুতোবুরুশ।'

'বা, তাহলে আর আসবে কেন?'

'না, আসবে। আনাব তাকে এখানে। এমন শক্ত করে জাল পেতেছি বাছাধনকে আসতেই হবে।' ক্রোধের নেশায় বিহ্বল হয়ে উঠল শ্রাবণী : 'তারপর তাকে পাবলিকলি অপমান করব। দরকার হলে পুলিসে দেব, ও কত বড় শয়তান—এক্সপোজ করব সকলের সামনে। ঐ, ঐ যে আসছে নীলাক্ষি।'

প্রায় ছুটে এসে নীলাক্ষি আনন্দে ফেটে পড়ল। বললে, 'কেল্লা ফতে। লিখিয়েছি চিঠি। ফোটোও দিয়ে দিয়েছি সঙ্গে।'

'পাঠ কী দিয়েছে?' শ্রাবণী ঘেঁসে এসে দাঁড়াল।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু।'

'আর, ভেতরে?'

'আমাকে কি আপনার মনে আছে? যদি চকিতে একটু মনে পড়ে তাই আমার এই ছবিটা পাঠালাম। দেখুন, একটা মাইনর পার্ট দিয়েছিলেন আমাকে, বেগমের সখীর পার্ট—'

'ঠিক মনে পড়বে।' শ্রাবণী টিটকিরি দিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'তারপর চাকরির কথা লেখেনি?'

'বা, সেইটেই তো আসল কথা। চাকরিটাই তো অছিলা।' যত না বলছে তার চেয়ে বেশি হাসছে নীলাক্ষি : 'তারপর লিখেছে দুঃখের কথা, দুঃস্থ-তার কথা। বি-এ পাশ করে বেকার বসে আছি। যদি কলকাতার আপিসে-টাপিসে একটা জুটিয়ে দেন তবে নিদারুণ উপকার হয়।'

'পরোক্ষে ওর কিছু প্রশংসা করেনি?'

'পরোক্ষে কেন স্পষ্টাস্পষ্টিই করেছে। লিখেছে, আপনি মহানুভব, আপনি কৃতী পুরুষ। আপনি চেষ্টা করলে অনায়াসেই পারেন একটা দুঃস্থা মেয়েকে স্থান করে দিতে।'

চাপা হাসির আভা ছড়িয়ে শ্রাবণী বললে, 'এতেই হবে। ইতিতে কী লিখেছে?'

'ইতিতে শুধু বিনীতা নন্দিতা।'

'ক্রমে-ক্রমে দুর্বিনীতা হয়ে উঠবে। পরে একমাত্র তোমারই।' মন খুলে হাসতে চাইল শ্রাবণী : 'দেখবি সব মিলে যাবে ধাপে-ধাপে। তারপর শেষ-পর্যন্ত কুপ্রস্তাব করে পাঠাবে—'

'কে নন্দিতা?' উদ্বিগ্ন সুরে প্রশ্ন করল রমাদি।

'নন্দিতা ভটচায। আপনি চিনবেন না বোধহয়।' জানলার দিকে সরে এল নীলাক্ষি। বললে, 'ঐ মাঠ পেরিয়ে দূরে যে ঐ একতলা বাড়িটা, ঐটেই নন্দিতাদের বাড়ি।'

রমাদি দেখেও দেখল না।

'এ আপনার শান্তিপুরের মেয়ে নয়, পদ্মাপারের মেয়ে।' শ্রাবণী দৃপ্ত-স্বরে বললে, 'ঠ্যাং ভেঙে দেবে।'

'প্রস্তাবটা একবার আসুক না।' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে নীলাক্ষিও দৃপ্ততার ভঙ্গি করল।

'তিন-চার মাসের মধ্যেই ঠিক এসে পড়বে, কিংবা তারো আগে।' বললে শ্রাবণী, 'যখন চাকরির কথা আছে, যাতে চটপট হয়, তাই চাইবে।

'ভাষায় একটু বেশি গদগদ হলেই প্রভু দিশেহারা হয়ে যাবেন।' বললে নীলাক্ষি, 'চলে আসবেন গুটিগুটি।'

'আর, আসামাত্র নন্দিতা, খান্ডার বাঙাল, ওর টুঁটি টিপে ধরবে।' শ্রাবণী বললে।

'আগে থেকে ট্রেনের টাইমটা জানা থাকলে', নীলাক্ষি বললে, 'আমরাও ঠিক গিয়ে পড়ব।'

'সব চিঠি-দলিল নিয়ে যাব সঙ্গে করে।' বললে শ্রাবণী, 'অজন্তার চিঠি, আমার চিঠি, সম্ভব হলে রত্নারও। তুমুল হৈ-হল্লা বাধাব। অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ব।'

'পাপ এক্সপোজ করে দেব।' নীলাক্ষি তর্জনী তুলল।

'বড়জোর তিন মাস ধৈর্য ধরুন, রমাদি,' শ্রাবণী পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললে, 'একটা চমৎকার নাটক দেখতে পাবেন। শুধু সুধীর বোসই পাকা অভি-নেতা নয়, আমরা পরিপক্ক অভিনেত্রী।'

'বেঁচে থাক নন্দিতা।' জয় দিয়ে উঠল নীলাক্ষি।

'আমি বাপু এ সব ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই।' রমাদি দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'মার্ডার সিন-টিন তোমরাই কর, তোমরাই দেখ। আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই।'

যা বলেছিল, ধাপে ধাপে ফলতে লাগল। মিলতে লাগল কাঁটায়-কাটায়।

নন্দিতার বেশি স্ফূর্তি। বন্ধুদের কথামত লিখছে প্রেমপত্র আর বন্ধুরা যেরকম বলে যাচ্ছে প্রায় ঠিক সেই রকমই আসছে উত্তর। যেন সব মুখস্ত, ছকে বাঁধা। নম্বরওয়ারি ফর্ম ছাপিয়ে রাখা।

তৃতীয় পত্রের পরেই 'আপনি' তুমি হয়ে গেল। দুটো সুচরিতাসু-র পরেই প্রীতিপ্রতিমাসু। কটা ঝাপসা-ঝাপসা রেখেই একেবারে প্রিয়তমাসু।

এ দিক থেকে, বন্ধুরা যা শিখিয়ে দিচ্ছে, ঠিক-ঠিক প্রতিধ্বনি।

তারপরে সেই সব বিশেষণের ফিরিস্তি। তুমি আমার সমস্ত রাত্রির ধ্রুব-তারা। আমার সোনা-গলা অন্ধকার। আমার শেষরাত্রির স্বপ্ন। আমার অন্তিমা. অন্তহীনা।

'এর পরেই প্রত্যক্ষে দেখতে চাইবে।' বললে শ্রাবণী।

'ঠিক তাই।' চিঠি দেখাল নীলাক্ষি : 'এই দ্যাখ। নন্দনা, কবে তোমাকে দেখব? কবে তুমি সশরীরে প্রস্ফুট হবে?'

'এই বারই আসতে চাইবে।' দৈবজ্ঞের মত মুখ করল শ্রাবণী : 'একলা ঘরের অতিথি হতে চাইবে।'

'ঠিক তাই।' হেসে নীলাক্ষি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল : 'নন্দনা এবার নন্দ হয়েছে। এই দ্যাখ। নন্দ, কবে তুমি আমাকে ডাকবে? কবে আসবে সেই ঝড়তুফানের রাত্রি? সকল ঘরের দুয়ার দেওয়া, শুধু তোমার দরজাই উন্মুক্ত। কবে? তারপর, দ্যাখ, সেই সব মারাত্মক ইঙ্গিত।'

'এইবার।' চোয়াল শক্ত করল শ্রাবণী : 'এইবার বাছাধন হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়েছে। এইবার বলি হবে।'

নন্দিতাকে পরামর্শ দিল, দুপুরের দেড়টার ট্রেনে আসতে লিখে দে। দুপুরটাই নিরিবিলি, নিরাপদ। প্রতিবেশীরা ঘুমে, উঁকিমারা দূরের কথা. কেউ জানতেও পারবে না। আবার সন্ধ্যার ট্রেনে যেতে পারবে।'

'হ্যাঁ, দুপুরেই ভালো।' নীলাক্ষি সায় দিল : 'দুপুরই রোমান্টিক।'

'স্টেশন থেকে তোর বাড়ি পৌঁছুতে ওর দুটো হবে।' শ্রাবণী হিসেব করতে বসল : 'আমরাও ঠিক ঐ সময়টায় গিয়ে চড়াও হব। ধ্রুবতারার দল —রত্না, অজন্তা, আমি। ওরা না আসে, অন্তত আমি, নীলাক্ষি, রমাদি।

আশে-পাশে আছে আরো লোকবল। মুখের উপর ওর জবাবদিহি চাইব, জবাবদিহি আর কী আছে, অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ব।'

'সকলের কাছে ওর চরিত্র এক্সপোজ করে দেব।' সায় দিল নীলাক্ষি।

কী সাহস, ঠিক দিনে ঠিক রওনা হল সুধীর বোস। পৌঁছুল ঠিক-মত। স্টেশনে কে আবার তাকে নিতে আসবে, সাইকেল রিকশা নিয়ে একাই বেরুল। চেনা জায়গা, নন্দিতাদের বাড়ি খুঁজে নিতে দেরি হল না।

বাইরেতে যত অবাঞ্ছিত হোক, অতিথি বাড়ির দরজায় এলে হাসিমুখেই তাকে ডেকে নিতে হয়। নন্দিতাও তাই মৃদু হেসে সুধীরকে ঘরে এনে বসাল। আর যতই অশ্রদ্ধেয় হোক, একটা অভুক্ত মানুষ দুপুরের রোদে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তাকে একটু সেবা করলে পাপ হবে না। নন্দিতা একটা হাতপাখা কুড়িয়ে এনে ধীরে-ধীরে সুধীরকে হাওয়া করতে লাগল।

নন্দিতা কী জানে! সে তো নিষ্পাপ, নিরীহ। প্রাক্তনীর দল যদি এসে হল্লা বাধায় তার কী করবার আছে। বরং যতক্ষণ ওরা না আসে ততক্ষণ ব্যবহার ত্রুটিহীন রাখাই সমীচীন। ষড়যন্ত্রের নামগন্ধও যেন টের না পায়।

তাই প্রাথমিক এক কাপ চা করে দিতে আপত্তি কী।

হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে নজরে পড়ল মাঠ পেরিয়ে তিনটে যুবতী এই বাড়ির দিকে আসছে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সুধীর। খোলা দরজার দিকে এগুলো।

'এ কী, কই যাও?' নন্দিতা এগিয়ে এসে বাধা দিল।

'কোনো হোটেলে গিয়া উঠি।'

'কোন্ দুঃখে?' সুধীরের একেবারে হাত ধরল নন্দিতা। বললে, 'আমি ডাকছি, আমার কাছে আইছো। আমার কাছেই থাকবা।'

'ঐ দেখ না কারা সব আইতে-আছে।'

'আসুক।' পরিপূর্ণ হাসল নন্দিতা : 'কারো সাধ্য নাই তোমারে আমার কাছথিকা ছিনাইয়া লয়। আমি যখন তোমারে ধরছি তখন তুমি তো আমারই হইলা।'

'উঃ, বাচাইলা আমারে।' সুধীর বোস চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে বসে পড়ল। বললে, 'আমারে আর প্রেমপত্র লেখতে হইব না। শোনো', নন্দিতার হাত ধরে কাছে টেনে আনল সুধীর : 'শোনো আমি স্নান কইরা আইছি। কী খাইতে দিবা কও।'

চোখে-মুখে করুণ মমতা নিয়ে নন্দিতা বললে, 'দুষ্টামি কইরো না। ঠাণ্ডা হইয়া বস। রান্না অখনও হয় নাই।'

'এত বেলা হইল, অখনও হয় নাই?'

'না, আগে বিয়াটা হউক।'

'তুমি কী লক্ষ্মী! কী সোনার মাইয়া! একমাত্র তুমিই বিয়ার কথাটা কইলা।' আরো, আরো কাছে টেনে আনল সুধীর।

বন্ধন শিথিল করে বেরিয়ে এল নন্দিতা। খোলা দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে।

কতক্ষণ পরে বাইরে থেকে দরজার উপরে শুরু হল করাঘাত। খোল্, খুলে দে। আমরা এসেছি। শ্রাবণী, নীলাক্ষি, অজন্তা।

খাণ্ডার বাঙাল নন্দিতা জানলা দিয়ে তার নিরীহ মিষ্টি মুখটা বার করে ধরল। স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'ভদ্রলোক বড় ক্লান্ত হইয়া আইছে। খাওনদাওন কিছু হয় নাই। তরা অখন যা। যদি পারস পরে আসিস।'

নন্দিতা জানলাটাও বন্ধ করে দিল।

৮৯। একটি আত্মহত্যা

সারা শহরে ঢি-ঢি পড়ে গেল। বিনয় সান্যালের বউ আত্মহত্যা করেছে।

কে বিনয় সান্যাল?

বিনয় সান্যালকে চিনতে বাকি আছে নাকি কারু? খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে গেছে।

কত লোকেরই তো বেরোয়। বল না কে?

রিলিফের বিনয় সান্যাল।

অত ভণিতার দরকার নেই। সোজাসুজি বল না কেন রেপ-কেসের আসামী।

কিন্তু বউটা মরল কিসে?

আর কিসে! গলায় দড়ি দিয়ে।

ভরদুপুরে গলায় দড়ি! চল দেখি গে।

সমস্ত শহর ভেঙে পড়েছে। পুলিশও এসে গিয়েছে সদলে, গাড়ি নিয়ে। ঐ বুঝি ডাক্তার। ডাক্তারের আর কাজ কী।

ঝুলন্ত দেহ নামানো হয়েছে। শোয়ানো হয়েছে খাটে। পুলিশের গাড়িতে এবার মর্গে নিয়ে যাবে বোধহয়।

কী সুন্দর দেখতে বল দিকিনি। আহা, মরল কেন?

আর কেন! লজ্জায়, ঘৃণায়, বিশ্বাসঘাতকতায়। অমন যার স্বামী। সমস্ত সংসারের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে।

আহা, আগে অপরাধটা প্রমাণ হোক। সবে তো দায়রা-কোর্টে এসেছে। জুরির বিচারে কী হয় কেউ বলতে পারে না।

আঁচলের খুঁটের গিঁট খুলে পাওয়া গিয়েছে চিরকুট।

পাওয়া গিয়েছে? মৃত্যুর কারণ তাহলে লেখা আছে তাতে।

আর কারণ! সব মুহূর্তের ভুল। মুহূর্তের অভিমান।

সে কি, আজ তো সকালের আদালতে নিজেই কোর্টে উপস্থিত ছিল। বসে ছিল আসামীর উকিলদের পাশে।

কাল রাতে সিনেমায় পর্যন্ত গিয়েছিল—

'আমি সিনেমা দেখার নাম করে এসেছি।' বললে মৃন্ময়ী।

'সঙ্গে আর কেউ আছে?' প্রভাকর জিজ্ঞেস করলে।

'না।'

'দূরে রাস্তায় অপেক্ষা করছে?'

'কেউ না।'

'একা-একা যান নাকি সিনেমায়?'

'চেনা সাইকেল-রিক্সায় যেতে কোনো অসুবিধে হয় না। কখনো-কখনো পাড়ার কোনো বউ-ঝিকে তুলে নিই—।'

'এখন সেই সাইকেল-রিক্সায় এসেছেন বুঝি?' চমকে উঠল প্রভাকর।

'না, পায়ে হেঁটে এসেছি।'

এ সব তো পরের কথা—গোড়াতেই তো প্রভাকর চমকে উঠেছিল যখন দেখল কম্পাউণ্ডের গেট ঠেলে স্যাণ্ডেল পায়ে একাকিনী এক মহিলা তারই অফিস-ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

সর্বনাশ আর কাকে বলে! মেয়ে যখন তখনই জটিলতা। কোনো মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে এলে তো জটিলই, এমনি খুচরো এলেও জটিল।

ভয়ে জড়সড় হয়ে ঢুকে পড়ল মৃন্ময়ী। এতক্ষণ পায়ের নিচে পাথরের কুচির খড়খড় শব্দ হচ্ছিল এখন ভারি মোলায়েম মনে হল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল পুরু কার্পেট। লোক শোবার জন্যে তোষক পায় না এ একেবারে পায়ের জন্যে বালাপোশ!

'কী চাই?' প্রায় মুখিয়ে উঠল প্রভাকর।

'আপনার কাছে একটা আবেদন আছে।'

তা প্রভাকর জানে এবং তা যে অযৌক্তিক আবেদন তাও জানে। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা বিমর্ষ হলেও সলজ্জসরল।

বললে, 'বসুন।'

মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল মৃন্ময়ী। কিন্তু কী বলবে কীভাবে বলবে ঠিক করতে পারছে না।

প্রভাকরও প্রতীক্ষা করতে লাগল। যদি তেমন কিছু বিপদ দেখে টেলিফোনের দিকে তাকাল, থানায় রিং করে দেবে।

আবেদনটা না শোনা পর্যন্ত প্রতিরক্ষার চেহারাটা ঠিক করা যাচ্ছে না।

আরো কতক্ষণ কুন্ঠিত হয়ে থেকে অস্ফুটে মৃন্ময়ী বললে, 'আমার স্বামীর বিষয়ে বলতে এসেছি। যদি একটু শোনেন—'

'কোনো কেস?'

আবার থেমে গেল মৃন্ময়ী।

যদি কেস হয় আবেদন যে নামঞ্জুর হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্যে সেক্ষেত্রেও সেটা আর প্রভাকরের ফাইলে রাখা যাবে না, কাল সকালেই অন্য কোর্টে ট্র্যান্সফার করে দিতে হবে। যদি আবেদন মঞ্জুরযোগ্য হয়?

কী, ঘুষ নিয়ে এসেছে? কোনো আপিল? কোনো ইনজাংশান? বিবাহ-বিচ্ছেদ? কাস্টডি?

তবু মুখ থেকে কথা বার করছে না মৃন্ময়ী।

'কে আপনার স্বামী? নাম কী?'

'বিনয় সান্যাল।'

'কোন্ বিনয় সান্যাল? রিলিফের? যে—'

'হ্যাঁ, সে-ই। কিন্তু—'

মৃন্ময়ীর ভরাট চুলে সিঁথিভরা ডগডগে সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে রইল প্রভাকর: 'কিন্তু, কী?'

'বিশ্বাস করুন কেসটা মিথ্যে।'

রাগে প্রভাকরের রক্ত গরম হয়ে উঠল। বললে, 'বিচার শেষ হবার আগে তা কী করে বলা যায়? আর এ জুরির বিচার।'

'আপনি জজসাহেব, আপনি যেমন বলবেন জুরিরাও তেমনি বলবে।'

'তার কী মানে আছে? ওপক্ষ যদি জুরিকে ঘুষ দেয়?'

'ওরা তা পারে। মেয়েটা ভীষণ বিচ্ছু—'

'কে মেয়েটা? ভিকটিম-গার্ল? বয়েস কত?'

'বয়স কমাতে চাইছে, কিন্তু আপনি দেখবেন পেকে ঝুনো হয়ে গেছে, কুড়ি-একুশের কম নয়। রিফিউজি মেয়ে, একটা চাকরি পাওয়া যায় কিনা তারই সন্ধানে আমার স্বামীর কাছে আসত। ম্যাট্রিকও পাশ নয়, কী করে চাকরি হবে? চাকরি হয়নি বলেই আক্রোশে এই মামলা সাজিয়েছে। কী অসম্ভব গল্প, বলে কিনা, ঘটনাটা আমাদের বাড়িতেই নাকি ঘটেছে। স্ত্রী বাড়িতে, এ অবস্থায় কোনো স্বামীর পক্ষে এ অপরাধ করা সম্ভব, বিশ্বাস-যোগ্য? যদি সত্যি হত, মেয়েটা চেঁচায় না কেন, আমাকে ডাকে না কেন?'

'সে সব বিচারকালে দেখতে হবে।'

'যদি ঘটনাটা হয়েও থাকে তাহলে ধরতে হবে, মেয়েটার সম্মতি ছিল। সম্মতি থাকলে তো আর ঐ অপরাধ হয় না।'

'যদি অবশ্য বয়সে না ঠেকে।'

'বয়সের গাছ-পাথর নেই যে ঠেকবে। মেয়েটা আগে থেকেই নষ্ট।'

'সে সব সাক্ষ্যপ্রমাণে ঠিক হবে।' প্রভাকর পাশ কাটাতে চাইল।

'কিন্তু আমাদের উকিল বলছে নষ্ট হলেও কেস হতে পারে। আসল হচ্ছে সরল সম্মতি। সম্মতি যদি থাকে তাহলে নষ্ট হলেও কিছু নয়, নষ্ট না হলেও কিছু নয়।'

অলক্ষ্যেই বুঝি, কেন কে বলবে, প্রভাকরের হঠাৎ সাহায্য করতে ইচ্ছে হল। বললে, 'হ্যাঁ, কিন্তু মেয়েটা যদি আগে থেকেই নষ্ট হয় তাহলে সম্মতিটা অনুমান করা সহজ হবে। কিন্তু—' আবার হঠাৎ গম্ভীর হল প্রভাকর : 'কিন্তু, আমি বলছি, সম্মতি থাকলেই কি এ পক্ষের অসংযত হতে হবে? একজন সরকারী কর্মচারী, তার সামান্য দায়িত্ববোধ নেই?'

'মুহূর্তে ভুল করে ফেলেছে।'

'এ সমস্তই বিচারের কথা, কোর্টের কথা'. চঞ্চল হয়ে উঠল প্রভাকর : 'তা এখানে কী!'

'আমি বিচার বুঝি না। আমি শুধু আপনাকে বুঝি।' চোখ তুলে তাকাল মৃন্ময়ী।

'আমি কী করব!'

'আমার স্বামী নির্দোষ, আপনি আমার স্বামীকে খালাস দিয়ে দেবেন। এর কম হলে চলবে না।'

টেলিফোনের উপর হাত রাখল প্রভাকর : 'জানেন থানায় ফোন করে দিলে পুলিশ এসে আপনাকে য়্যারেস্ট করতে পারে।'

'তাই করুন, আমাকে জেলে দিন।' কেঁদে ফেলল মৃন্ময়ী : 'আমার স্বামীর বদলে আমি যদি আসামী হতে পারতাম, কিংবা—ধরুন—ঐ ভিকটিম-গার্ল হতে পারতাম, তা হলেও আমার সহ্য হত। যে নির্দোষ তার লাঞ্ছনা আর অপমান তিলতিল করে দগ্ধ করত না।'

'আপনি যদি ভিকটিম-গার্ল হতেন!' চোখের কোণে প্রভাকর বুঝি দেখল বাঁকা করে।

'হ্যাঁ, তা হলে আমার স্বামী তো বাঁচত। নির্দোষের তো জেল হত না।'

'কিন্তু আপনার কী হত?'

'অবস্থার বিপাকে পড়ে যদি সর্বনাশ হয়ে থাকে. আমার স্বামী আমার পক্ষ নিতেন, ক্ষমা করতেন। না করলেও বিশেষ এসে-যেত না। তার তো জেল হত না, সে তো ছাড়া পেত।'

'নির্দোষ হলে এমনিতেই ছাড়া পাবে।'

'তা বলা যায় না. অনেক সময় বিচারে ভুল হয়।'

'সেই বিচারের ভুলেই হয়তো আসামী ছাড়া পেল।'

'যেমন করে হোক, পেলেই হল। তাই আমাকে উকিলবাবুরা বলছে কোর্টে গিয়ে বসতে, যদি আমাকে দেখে জুরিদের মায়া হয়. যদি এমন স্ত্রী থাকতে এমন ঘটনা অসম্ভব, দৈবাৎ অমনি মনে করে বসে। কিন্তু আমি সংশয়ে থাকতে চাই না, তাই আপনার কাছে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে এসেছি।'

প্রভাকর ছটফট করে উঠল : 'আমি—আমি কী করব! আমার তো একার বিচার নয়।'

'না, আপনার একার বিচার। আপনি একাই এক হাজার। আপনি

ইচ্ছে করলেই নয়কে হয়, হয়কে নয় করে দিতে পারেন। যেমন করে হোক, যে কোনো মূল্যে আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন। দোষী সাব্যস্ত করলে ওর শুধু জেলই হবে না, চাকরি চলে যাবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি তখন কোথায় দাঁড়াব? সবকিছু তো যাবেই, একটা হীনতম অপরাধী, জেলখাটা কয়েদী আমার স্বামী আমার সন্তানদের বাপ এ-কলঙ্ক নিয়ে বাঁচব কী করে? আমার স্বামীকে শুধু নয়, আমাকে, আমার শিশু সন্তানদের বাঁচান—'

তন্ময় হয়ে তাকাল প্রভাকর। আশ্চর্য, পাপ এমনি নিটোল হয়ে আসে! ঘুষ কখনো এমন সুগোল হয়!

নিয়তি কেমন সুন্দর করে সাজিয়েছে। বাড়িতে, উপরে দোতলায়, স্ত্রী, অদিতি—কে বলবে রূপসী নয়। আর অযাচিত সুযোগ স্বয়মাগত। সুসম্মত। আর সেও কিনা উচ্চতম সরকারী কর্মচারী। সংযমের ভাণ্ডার।

সবই মুহূর্তের ভুল। মুহূর্তের ভুলেই এই জগৎ। তেমনি, ঈশ্বর করুন, বিনয় সান্যালও মুহূর্তের ভুলেই ছাড়া পেয়ে যেতে পারে।

সব নিয়তির মর্জি।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ইলেক্‌ট্রিসিটি ফেল করবে এ কে ভেবেছিল? নিয়তিকে অন্ধ কে বলে, নিয়তি রূপদক্ষ।

অন্ধকার তো নয়, আশীর্বাদ।

সমস্ত ঘরদোর বারান্দা মাঠ-ঘাট-রাস্তা অন্ধকারে ভরে গেল, ভেসে গেল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মফস্বল শহরে এ দুর্নিমিত্ত তো হামেশাই হচ্ছে। বরং ভালোই হল, উপর থেকে অদিতি নামতে পারবে না। উদ্বিগ্ন হবারও কিছু নেই, প্রভাকরের হাতের কাছেই মজুত আছে টর্চ, ক্যান্ডেল, দিয়াশলাই—নিত্যিকার আয়োজন।

'কোনো ভয় নেই, আমি আছি।'

বরং মৃন্ময়ীরই ভয় পাবার সম্ভাবনা।

মৃন্ময়ীর মনে হল প্রভাকর যেন খুব কাছের থেকে বলছে। বলছে পায়ের নিচেকার কার্পেটের মতই নরম কণ্ঠে।

তাই মৃন্ময়ীকে স্বর অস্ফুট করতে হল : 'হ্যাঁ, আমি জানি, আপনি আছেন, আমার ভয় নেই। আমার স্বামীর জন্যে আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। পাগলের কিসের ভয়!'

কিন্তু প্রভাকর পাগল নয়। সে বিচারক। সূক্ষ্মরূপে বিচক্ষণ। এখানেও আবার সেই একাকিনী অভিযোক্ত্রী—সোল প্রসিকিউট্রিক্স—সাক্ষী কোথায়, প্রমাণ কী? তারপর কেন, কিসের জন্যে, সম্বন্ধ কী? কে বিনয় সান্যাল?

বিপদের কথা বিপদে বুঝবে, অন্ধকারের কথা অন্ধকার।

তারপর দশ দিক আলো করে জ্বলে উঠল সরলতা।

'আমি এবার যাই।' ত্রস্তব্যস্ত হয়ে দরজার দিকে এগুলো মৃন্ময়ী : 'কাল কোর্টে দেখা হবে।'

'হ্যাঁ, যাবেন। আপনার উকিলের পাশে বসবেন।' প্রভাকরও এক পা এগিয়ে এল দরজার দিকে : 'আপনার উকিল কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান। জুরির মন কখন কী দেখে টলে যায় বলা যায় না।'

'আমি জুরি বুঝি না, আমি জজসাহেবকে বুঝি। ওসব দেবদেবী না ধরে আমি স্বয়ং ঈশ্বরকে ধরেছি।' বিজয়িনীর মত মাথা উঁচু করে চলে গেল মৃন্ময়ী।

পরদিন একটু যেন সাজগোজ করেই কোর্টে গেল, বসল তার উকিলদের পাশটিতে। কিন্তু এ কার কোর্ট, বিচারাসনে এ কোন হাকিম? টাক মাথায় কে এ বুড়ো?

'এই কোর্টে বিচার হবে?' মৃন্ময়ী যেন নিজের মনেই আর্তনাদ করে উঠল।

'হ্যাঁ, এই কোর্টেই তো।' তার সিনিয়র উকিল বললে।

'তবে আমি যে জানতাম জজসাহেবের কোর্টে হবে।'

'এও তো জজসাহেব। তবে—য়্যাডিশনাল—' বললে জুনিয়র।

'এ জজবাবু।' মুচকে হেসে টিপ্পনী কাটল সিনিয়র : 'ডিস্ট্রিক্ট জাজকে বলে জজসাহেব আর য়্যাডিশনালকে বলে জজবাবু। জজসাহেব সর্বক্ষণ শার্ট-প্যান্ট পরে থাকে আর জজবাবু কোর্টের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় ধুতি-পাঞ্জাবি—'

'আমি যে শুনলাম জজসাহেব—' মৃন্ময়ী বাতাসের অভাবে হাঁপিয়ে উঠল।

'বাবু শুনতে সাহেব শুনেছেন, তাতে কিছু এসে যাবে না।' সিনিয়র চাইল আশ্বস্ত করতে : 'কাপড়টা খুলেমেলে পরলেই বাবু, পাক দিয়ে পরলেই সাহেব। হরে দরে সমান। আচ্ছা, দেখ তো। হঠাৎ সন্দিগ্ধ স্বরে জুনিয়রকে জিজ্ঞেস করলে 'দেখ তো আজই কেসটা এ কোর্টে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে কিনা।'

জুনিয়র রেকর্ড দেখল। না, গোড়াগুড়ি থেকেই এ কেস এ কোর্টে 'য়্যাসাইন' করা।

মুহূর্তের ভুল।

মৃন্ময়ী উঠে পড়ল। যাই একবার জজসাহেবকে তাঁর নিজের কোর্টে দেখে যাই।

মন্দিরে ঢুকতে না পারুক কোর্টে নিশ্চয়ই পারবে।

কিন্তু এ কী, ঘর খালি। কোথায় জজসাহেব?

অফিস বললে, ইনস্পেকশানে গিয়েছেন। সন্ধ্যায় ফিরতে পারেন, নাও পারেন।

না, সন্ধ্যায়ই ফিরছে প্রভাকর। আর ফিরেই শুনেছে বিনয় সান্যালের স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।

'কেন, মরল কেন?'

'আর কেন! লজ্জায়, ঘৃণায়, বিশ্বাসঘাতকতায়। অমন যার স্বামী—'

আরেকজন বললে, পুলিশ আঁচলের খুঁটে চিঠি পেয়েছে। মৃত্যুর কারণ লেখা আছে চিঠিতে।

'কী কারণ?' প্রভাকরও আর্তমুখে জিজ্ঞেস করল : 'কে দায়ী তার মৃত্যুর জন্যে? খোঁজ নাও কী লিখেছে?'

পুলিশের লোক, কে জানে কেন, নিজেই চলে এসেছে জজের কুঠি।

'কী ব্যাপার? কার নাম লিখেছে?'

'লিখেছে, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।'

নিশ্বাস ছাড়ল প্রভাকর। বললে, 'কত ডায়িং ডিক্লেরেশান দেখলাম। মৃত্যুর কাছাকাছি হয়ে মানুষ কেমন সত্য কথা বলে। কেমন হঠাৎ মহৎ হয়।'

৯০ । খেলাওয়ালী

'খোঁস-পাঁচড়া দাদ-চুলকানি হাজা-খুজলি—' বাদিয়ানীর দল ঝাঁকবাঁধা পাখির মত কলকলিয়ে উঠল : 'বাঁজা আর মড়াছেয়ে, বেরামী আর হামিলা। কই গো মা-জানরা! দেশ-বিদেশে কত নাম তোমাদের। নাম শুনেই এসেছি।'

ভুঁইয়া-সাহেবের বাড়ি। খাস জমিই প্রায় দুশো কানি। তার পর পত্তনপাট্টায় কত বলতে হলে ফর্দ লাগে। পঞ্চাশের আকালে ধান বেচে মোটা হয়েছে। কিন্তু সেই হাড়-কিপ্পিন। গায়ে নিমা, কাঁধে গামছা, পরনে খাটো লুঙ্গি, পায়ে দেশী মুচির বাদামী চটি। মাথায় তালের আঁশের তৈরি গোল টুপি, মাথার তেলে আন্ধেকটাই কালো। এত টাকায়ও দরাজ হয়নি তার মন-দিল।

'কই গো মা-জানরা, একটু পান-শুপারি সাদা তামাক দাও। খালের ফাঁড়ির মুখে নৌকো আমাদের। রোদ্দুরে আসছি অনেক হেঁটে-হুটে—'

ফাগুন মাস। ধান-চাল উঠে গেছে ঘরে ঘরে। বেচা-বিক্রি সুরু হয়ে গেছে। কাঠ-কুটা জোগাড় হয়েছে গৃহস্থের। মেয়েরা নাইয়র এসেছে, কর্তারা গলায় চাদর ঝুলিয়ে চলেছে বেয়াই-বাড়ি। পথে-ঘাটে জল-কাদা নেই। গ্রামের হালট খটখট করছে। হাটে-বন্দরে বেড়ে গেছে চলাচল। সেই সঙ্গে দিকে-দিকে বেরিয়ে পড়েছে ফেরিওয়ালা মুদিওয়ালা, মনোহারীওয়ালা, বেরিয়ে পড়েছে বেবাজিয়া বাদিয়ানীর দল।

'কই গো চাচীজান ভাবীজানরা! পান-তামুক না দিলে খেলা দেখাব না তোমাদের! গান ধরব কোন্ গলায়!'

দেশদেশী লোক নয়, বেজানা সুরে কথা কয়, ঝুড়ি-চুপড়ির মধ্যে সাপ নিয়ে এসেছে বুঝি, ভুঁইয়া-বাড়ির উঠোন ভরে গেল মেয়ে-পুরুষে।

একটা বুড়ি আর দুটো মেয়ে। কাঞ্চনী আর তরী। একটা ফলপাকান্ত, অন্যটা ডাঁসা।

মাথার ঝাঁকা নামিয়ে বসল তারা উঠোনে। বুড়ি তার থলের ভিতর থেকে হর-জিনিস বের করতে লাগল : ছোট-ছোট কাঠের খেলনা, দাবার বোড়ে, গেঁটে কড়ি, ফলের আঁটি, পাখির ঠোঁট, গোরুর শিং, মানুষের হাড়। বিছিয়ে রাখল একটা পুরোনো ময়লা ন্যাকড়ার উপর। বললে, 'নে, আগে গান ধর্।'

হাতের উপর গাল কাত করে তরী গান ধরল :

রে বিধির কি হইল!
আইস আইস কামার ভাই রে, খাও রে বাটার পান,
ভাল কইরা গইড়া দিও লোহার বাসরখান।
সোনার থালে পান ওরে রূপার থালে চুন,
মাইয়া-লোকের প্রথম যৌবন, ও যে জ্বলন্ত আগুন।
রে বিধির কি হইল!

বাড়ি-ঘর ভেঙে বেরিয়ে এল সাহেবানীরা। বেরিয়ে এল বাড়ির ধারের পড়শী। সবাই বললে, মিশশিকারী এসেছে। চল, চল, সাপ নাচাবে, বেউলা-লখাইর গান গাইবে, ব্যারাম নামাবে শিঙা টেনে।

'কার কি ব্যামো-পীড়া? কোমরে বাত? তলপেটে ব্যথা? অবিয়ন্ত আছে না কি কেউ বউরা? আমাদের ঠেঙে কোনো শরম নেই। আমরা মালবদ্যি। বিষ নামাই। ভূত ঝাড়ি। মন্তর-তন্তর জানি। ভোজবাজি দেখাই। ফকিরালি করি। বাঁজা ডাঙায়, ফসল ফলাই। বিষবদ্যি আমরা।'

ছোট একটা লোহার শলা বুড়ি তার ডান চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাঁ চোখের কোণ থেকে বার করে ফেলল। ভাঙা কাচ চিবিয়ে-চিবিয়ে খেয়ে ফেললে শুপুরির মত। ছোট একটা কাপড়ের থলের মধ্যে রাখলে তিনটে দাবার বোড়ে, একটা পাওয়া গেল বড় বিবির কোলের মধ্যে, দ্বিতীয়টা পাওয়া গেল মেজ বিবির আঁচলে বাঁধা, তৃতীয়টা ছোট বিবির খোঁপায় গোঁজা।

ভূঁইয়া-সাহেবের তিন বিবি। বড় বিবির কোমরে দরদ, মেজ বিবির সন্তান টেঁকে না, ছোট বিবির উপরে দেও-ভূতের দৃষ্টি পড়েছে, এরি মধ্যেই ভুঁইয়া-সাহেবের মন প্রায় চল-বিচল হবার জোগাড়।

'সব বতাস। বাতাসের কারবার।' বুড়ি বললে ঘাড় দোলাতে দোলাতে, 'সব নিষ্পত্তি করে দিচ্ছি। কই পান আনো, তামুক আনো, মন্তর-পড়ার চাল আনো।'

ডালায় করে পান এল, এক কলকি-বোঝাই তামুক। তিনটে সাদা পাতা। তিন মালসা চাল।

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল বুড়ি। কি যেন খুঁজছে আতি-পাতি করে। বললে, 'কি গো, পুরুষ-পোলা কেউ নেই বাড়িতে?'

বা, ইয়াসিনই তো আছে। ভুঁইয়া-সাহেবের বড় ছেলে। বয়েস কুড়ি-বাইশ। বাংলা-মতে লেখাপড়া জানে কিছু। প্যাঁচ না হয়ে খাড়া-খাড়া লেখা হলে পড়তে পারে থেমে থেমে। দু-দুটো বিয়ে দিয়েছে বাপ। দু-দুটোকেই ছাড়ান দিয়েছে। একটার নাকি চলন-ফিরন ভাল নয়, আরেকটা নাকি কাজ-কর্ম জানে না। দুটোই রোগা কাঠি, গোলসান চেহারা হল না কিছুতেই। পাশ-গাঁয়ে ভুঁইয়া-সাহেব গিয়েছে ছেলের জন্যে তেসরা বউয়ের তালাস করতে।

'আর আপনার বুঝি মাথাধরা?' বুড়ি একনজর তাকিয়ে বললে, 'ও আমি চোখ-মুখের চেহারা দেখে বলে দিতে পারি। আর এ মাথাধরা ঝাড়তে তিন শিকড় লাগবে। তাও নায়ে বসে। নায়ের দিব্যি-কোঠায়। আর দিন তিনেক আমরা আছি।' পরে আপন মনে ঝাপসা গলায় বললে, 'বড় কঠিন ব্যামো। ব্যামোর মধ্যে ছিনে জোঁক।'

'আমার মাথাধরা ঝাড়তে হবে না।' বিরক্ত মুখে বললে ইয়াসিন : 'গান ধরো তো শুনি।'

তরী গান ধরল :

বিয়া কইরা যান লখাই লোহার বাসর ঘরে,
পিদ্দিমেরি সইল্‌তাখানার বুক থরথর করে।
সোনার খাটে শুইছেন লখাই রুপার খাটে পা,
পাঙ্খা হাতে বাতাস করেন উদাস বেহুলা।
রে বিধির কি হইল!

যেন কোকিলা গাইছে। ইয়াসিন তাকাল তরীর দিকে, তাকাল ভরা চোখে। এক থালা জলের মত যৌবন তার সারা গায়ে যেন টলটল করছে, কাঁধার ছাপিয়ে পড়বে বুঝি উপচে। গায়ে আঁট একটা আঙিয়া, শাড়িটাতেও টান পড়েছে। দুটোই জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া। ছেঁড়াগুলো চোখ চেয়ে আছে নিরাশ্রয় অসহায়ের মত।

'ওকে আর দেখছ কি? নামাজ-টামাজ পড়তে শিখছে, কিন্তু একখানা ওর সাফ কাপড় নেই। পরদা-পসিদা মত থাকতে পারে না। সব সময়ে মুখ কালো করে থাকে। চাল-ডাল তো তবু সময়ে-অসময়ে পাওয়া যায়। কিন্তু শাড়িজামা পাই কোথা? দাও না কিছু ঘরের জিনিস। সাত পুরুষের গা ঢাকবে তোমাদের।'

'হাসছিস কেন?' শাসনের সুরে কাঞ্চনী হিস-হিস করে ওঠে।

'শরম লাগে।' দু হাঁটুর মধ্যে তরী মুখ লুকোয়।

'নইলে কাপড়-জামা হবে না। নে, উঠে দাঁড়া। উঠে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে গান ধরলেই শরম-ভরম চলে যাবে।'

তরী গলা ছেড়ে গান ধরল :

আমার বড় খিদা পাইছে বেহুলা সুন্দরী,
পার কিছু আইন্যা দেও ক্ষুধা তৃষ্ণা হরি।
এত রাতে কি আনিমু বেউলা বইস্যা কাঁদে,
শেষকালেতে বরণ-কুলার চাউলে ভাত রাঁধে।
রে বিধির কি হইল!

বড় বিবির কোমরে শিং লাগিয়ে ফু' দিয়ে ব্যথা নামানো হল। পাটাপুতা এনে শিকড় বেটে খেতে দিল মেজ বিবিকে। তাগা বাঁধা হল ছোট গিন্নির বাজুতে।

'এনার সাদি হয়নি?'

'হয়েছিল দু নম্বর। মনজাইমত হয়নি। বিয়ে ছুটে গেছে। দাও না ওকে একটা তাবিজ-কবচ। যাতে মিল-মানান ঠিক থাকে। উলফৎ থাকে চিরকাল।'

তরীর সঙ্গে ইয়াসিনের চোখাচোখি হয়।

'যাবেন আমাদের নায়ে।' বুড়ি মন্তর-পড়া গলায় বললে, 'ফাঁড়ির মুখে অশত্থ গাছের তলায় আমাদের বহর বাঁধা। খাঁটি পলার জ্যান্ত কবচ দেব। এবার এমন বিয়ে দেব অসতন্তর হয়ে থাকতে হবে না। হাঁড়ির মুখে সরার মত লেগে থাকবে।'

তরীর দিকে চেয়ে কাঞ্চনী চোখের কালোতে সাপের মণির ঝিলিক মারে। তরীর যেন বুঝজ্ঞান নেই, সারা গায়ে ঝিমকিনি লাগে। দেহের সরোবরে যৌবনের জল থমথম করে। এইবার বসে বসেই গান ধরে তরী :

কি অন্ন খাওয়াইলা বেউলা কি অপূর্ব লাগে,
এমন অন্ন খাইনি কভু মাতৃঘরে আগে।
এই যে অন্ন শেষ অন্ন অন্যে কেবা জানে,
ভাত খাইয়া তাকায় লখাই রাত-উপাসীর পানে।
রে বিধির কি হইল!

বড় বিবি পাঁচ টাকা বকশিস দিল। দিল সাত সের চাল, তিনটে ঝুনো নারকেল, এক সাজি শুপুরি। এক গোছা সাদা পাতা। এক গোল্লা মাখা তামাক।

কাঞ্চনী কেঠো গলায় বললে, 'কিছু কাঠ দাও না গো—'

'এ বাড়ির মুরগিগুলি তো বেশ তাজা।' তরী বললে গোলালো গলায় : 'পেট ভরে ধান-চাল খায় বুঝি। তাই একটা চেয়ে নাও না বুবু।'

তুই চাইতে পারিস না বড় মিয়ার কাছে? কাঞ্চনী ঝামটা দিয়ে ওঠে।

ঝুড়ি-চুপড়ি নিয়ে উঠে পড়ে বাদিয়ানীর দল। এত জিনিস বয়ে নেবে কি করে? তরী বললে, 'আমি নিচ্ছি কাঠের বোঝা।'

'না, না, তা কি হয়? নয়া বয়সের ভারই তুমি বইতে পার না, তুমি হবে কাঠের বোঝারি!' ইয়াসিন সেকেন্দরকে ডাকলে। সেকেন্দর বাড়ির হালিয়া,

মাস-ঠিকায় কাজ করে। তার মাথায় চাপিয়ে দিলে কাঠ, চালের ঝুড়ি, হাতে ঝুলিয়ে দিলে পা-বাঁধা মুরগি এক জোড়া। 'তাড়াতাড়ি করে দিয়ে আয় পোঁছে। মুনিব বাড়ি ফেরার পথে যদি দেখতে পায় এই কাণ্ড, তার খেসারৎ তুলতে গিয়ে আগেই তোকে খুন করবে।'

হংসগমনে চলেছে তরী। দেমাক ঠমক দিয়ে। তার পিছু ধরেছে ইয়াসিন। হাতে তার একটা কাপড়ের বোঁচকা।

বললে, 'কাপড়-জামা আছে এর মধ্যে। কাঁচুলি আর সায়া।'

তরী চোখ বড় করে রইল। বললে, 'আপনার বিবিজানেরটা বুঝি?'

'বিবি কই? সে সব কবে ঝুটা জরি ছেড়ে এখন আসল জহরতের তালাস করছি।'

কাঞ্চনী তরীর কানে বললে ফিসফিসিয়ে, 'নৌকোতে আসতে বলিস সাঁজের বেলা।'

'নোকোয় আসবেন। ফাঁড়ির মুখে বহর বাঁধা আমাদের।'

ইয়াসিন ইতি-উতি চাইল। উসি-পিসি করতে লাগল। চলে এল বাড়ি ফিরে। বললে, না, নৌকোয় কেন? চল আমার বাড়িতে। আমার শান বাঁধানো টিনের ঘরের বাসিন্দা হয়ে।

কত রাজ্যের জল ঠেলে-ঠেলে ভাসছে তারা—বাদিয়ানীরা। বাড়ি-ঘর নেই, জায়গা-জমি নেই, সীমানা-সরহদ্দ নেই। কেবল অফুরন্ত জল। নৌকোয়ই তাদের ঘর-সংসার, বিয়ে-সাদি, ইষ্টকুটুম। নৌকোই তাদের সমাজ। ওটা মামার বাড়ি, ওটা শ্বশুরবাড়ি, ওটা বান্ধবের বাড়ি। শুধু মরবার পর সাড়ে তিন হাত মাটির দরকার। মাটির সঙ্গে শুধু এইটুকু তাদের কায়েমী সম্পর্ক। আমলদখল নেই, স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই। নেই স্থান-স্থিতি। তারা সব দেশেই বিদেশী। তারা ভবঘুরে।

এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায়। একেকটা বহর। একেকটা জামাত। একেক মরশুমে একেক এলেকা। সাপ ধরে, দাওয়াই দেয়, খেলা দেখায়, গান বাঁধে, লোক ঠকায়। হাতসাফাই করে। জলে আঁক কাটে। জল দিয়ে মুছে দেয় জলের দাগ।

না, জল আর ভালো লাগে না তরীর। তার ইচ্ছে করে বেড়া-ঘেরা ঘরে গৃহস্থ হয়ে স্থিতু হয়ে যায়। মাঠ-মাটির কাজ করে। ধান ভানে, চাল কাঁড়ে, ঢেঁকিতে পাড় দেয়। গোবর দিয়ে উঠোনভরতি ধান রোদে শুকায়। তার উপরে হেঁটে-হেঁটে পা দিয়ে ওলটায়-পালটায়।

ইচ্ছে করে মাটিতে একটা বীজ পোঁতে নিজের হাতে। দেখে, কেমন করে জলজ্যান্ত গাছ হয়ে ওঠে একটা।

মাটির জন্যে এত মন পোড়ে তরীর। হাসিল-পতিত, ভিটাবাস্তু, দীঘি-পুকুর, বাগ-বাগান, ইট-ইমারত, বৃক্ষ-লতা, পাখি-পাখালি। জলে আর সুখ নেই।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ইয়াসিন চলে আসে নৌবহরের সীমানায়। নৌকো ঢেকে তাঁবুর মত ছই, ছইয়ের উপর বসে কাঞ্চনী আর তরী ছিপ ফেলে মাছ ধরছে।

'বড় মিয়া এসেছে!' তরী বললে ডগমগ হয়ে।

'আসতে দে।' কাঞ্চনী বললে ভারিক্কি গলায়।

প্রথমে দিশ পায়নি ইয়াসিন। কুড়ি-বাইশখানা নৌকো গায়ে গা লাগিয়ে বাঁধা। খালের পারে জাল বিছানো—ঝাকি জাল, খেটে জাল, ধর্ম জাল। কাঠ রয়েছে ভুর করা। মুরগি বোঝাই খাঁচা। তিন ইটের উনুন। হাঁড়ি-কুড়ি। পোড়া আর আপোড়া।

অনেক কণ্ঠের কলকল।

সাধারণ শাড়ি-জামা পরা বলে তরীকে প্রথমে ঠাহর হয়নি। যেন অষ্টপ্রহরের গৃহস্থ-বৌ মনে হচ্ছে।

'চিনতে পারিনি। আমার দেওয়া সেই জামা-কাপড় পরনি কেন?'

'ও বাবা! অত ভাল জিনিস কি আমরা পরতে পারি?'

কাঞ্চনী ভুরু টান করে বললে, 'ও আমরা তুলে রেখেছি প্যাঁটরায়। আটপৌরে যা আছে তাই পরে আছি কোনোমতে।'

আটপৌরেও তা হলে আছে দু-একখানা। বেশ আস্ত-মস্তই আছে। যেগুলো ছেঁড়াখোঁড়া সেগুলোই বুঝি পোশাকী। খেলা দেখানোর সাজ।

'কি, মাথা ঝাড়াবেন না?'

'তাই তো এসেছি। বুড়ি কোথায়?'

'আমাদের মা? সে গেছে বন্দরে। বাজার করতে।'

বাজার করতে মানে কাপড়-জামা বিক্রি করতে। চাল নারকেল বিক্রি করতে। আর যদি পারে কিছু চুরি করতে হাতের কায়দায়।

নৌকোর মধ্যে মাথা গলিয়ে ঢুকে পড়ল ইয়াসিন। নৌকোর মধ্যে ছোট-খাট একখানা সংসার সাজানো। রান্না-ঘর। শোবার ঘর। বাসন-কোসন, বিছানা-বালিস, চুলা-লণ্ঠন, সব-কিছু সরঞ্জাম।

'তোমাদের মা আসা পর্যন্ত বসতে হবে?' ভয়ে ভয়ে বললে ইয়াসিন।

'কেন, তা কেন? আমরা কি আর মন্তর-তন্তর শিখিনি কিছু? যা তরী, দিব্যির কোঠায় নিয়ে যা। আমি শিকড় নিয়ে আসি।'

'দিব্যির কোঠায়?'

'হ্যাঁ, দিব্যির কোঠায়।' কঠিন গলায় বললে কাঞ্চনী।

গলুইয়ের দিকে ছোট্ট একটি কোঠা। হ্যাঁ, এটাই দিব্যির ঘর। আর সব ঘর সংসারী ঘর। সে সব ঘরে শোওয়া-বসা খাওয়া-দাওয়া, সাধারণ জীবনযাত্রা। দিব্যির ঘরটা দুর্গের মত, দেবালয়ের মত। নৌকোপথ বড় বিপদের পথ। লুঠেরা-ডাকাত তো আছেই, ঘরের পুরুষই তো কত অত্যাচার করতে চায়। কত মারপিট, কত খুনজখম। তখন অবলা মেয়ে এই দিব্যির ঘরে এসে আশ্রয়

নেয়। এখানে একবার ঢুকলে গায়ে আর হাত তোলা যায় না, মেয়েমানুষ তখন চলে যায় একেবারে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

লম্বা একটা জংলা ঘাস নিয়ে এল কাঞ্চনী। দাঁত দিয়ে খুঁটে সাদা শাঁস বের করে দিলে তা তরীর হাতে। পাঁচ টাকা মজুরি নিয়ে চলে গেল।

সেই দিব্যির কোঠায় জড়সড় হয়ে শোয় ইয়াসিন। আলগোছে তার শিয়রে বসে তরী তার কপালে সেই ঘাসের শাঁস বুলিয়ে দেয়। আল্লা-রসুলের নাম করে। নাম করে মেহের-কালির, কামরূপ-কামাখ্যার—ফাঁকে ফাঁকে বলে তার দুঃখের কথা। এই একঘেয়ে জল আর ভাল লাগে না। ঘর বেঁধে সংসারি করতে সাধ যায়।

'নায়ে তোমাদের পুরুষ কই।' জিগগেস করে ইয়াসিন।

'মেনাজদ্দি ছিল অনেক দিন। জঙ্গলে সেবার বেকায়দায় সাপ ধরতে গিয়ে ঘা খেল কাঁধের উপর। সেই থেকে কাঞ্চনীর ঘর খালি।'

'নৌকা বায় কে?'

'আমরাই দু বোন। দাঁড় টানি, মাছ ধরি, কাঠ কাটি। মাকে বলি, পুরুষ না পাও চাকর রাখ একজন। মা বলে, যে পুরুষ সেই চাকর। এবার তোকে বিয়ে দিয়েই পুরুষ আনব নৌকোয়। মানিক সাঁইকে ডাকি, কোথায় কে। আমার মন আর বসে না বড় মিয়া, ভেসে ভেসে বেড়ায়।'

ধরা ছোঁওয়া যাবে না, কিন্তু গান শুনতে দোষ কি!

'গলা শুনতে পেলে কাঞ্চনী আরো টাকা চাইবে।'

'দেব টাকা।'

'আমাকে কিছু দেবে না উপরি? ও সব তো ওরা নেবে। আমি তবে কী পেলাম?'

'দেব। না যদি দিই তোমাকে, আমিই বা তবে পাব কী!'

তরী গান ধরল :

খনে জাগা খনে নেবা বাতি টিপটিপ করে,
গহীর রাতে ঘুমের ভাবে বেউলা ঢইল্যা পড়ে।
খাট ছাইড়া কেশের বোঝা মাটির উপর লোটে,
শেষ রাতে কালনাগিনী কেশ বাহিয়া ওঠে।
রে বিধির কি হইল!

ইয়াসিনের মনে হল, যেন নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। খাল ছেড়ে চলে এসেছে গাঙের ভরা জোয়ারে। এ মুলুক ছেড়ে চলেছে অন্য কোনো বেনামী মুলুকে। সারি-সারি নৌকো। সে আর ক্ষেতের মানুষ নয়, নৌকোর মানুষ। যেন সে আর দিব্যির কোঠায় শুয়ে নেই। চলে এসেছে সংসারী কোঠায়। জলের উপর সংসার। সমস্ত সংসার-সৃষ্টিই জল।

লখিন্দর আর বেহুলা। জুলেখা আর ইউসুফ।

বুড়ি ফিরেছে বাজার থেকে। জিগগেস করলে, 'এসেছিল ভুঁইয়ার পো?'

'এসেছিল। পনেরো টাকা আদায় করেছি।' কাঞ্চনী বললে।
'মোটে?'
'মাথাঝাড়া পাঁচ, গান পাঁচ, আর আমার দারোয়ানি পাঁচ। আবার আসবে বলেছে। মাথাব্যথা একদিনে সারবার নয়।'
'না, আরো বেশি করে আদায় করা দরকার। ঘড়া-ঘড়া টাকা ওই ভুঁইয়ার, শুনে এলাম পাকাপাকি। কী ছাই খেলা দেখাতে পারলি তবে?' বুড়ি ঝাঁজিয়ে উঠল : 'কি, দিব্যির ঘরে ছিল তো?'
'দিব্যির ঘর না হলে টিপে-টিপে বের করতে পারব কেন?' হাসতে-হাসতে বলল এবার তরী : 'এই দেখ আরো দশ টাকা। লুকিয়ে আদায় করে নিয়েছি বকশিস।' হাতের মুঠ খুলে তরী টাকা দেখাল।
আহ্লাদে উথলে উঠল বুড়ি। বললে, 'এই তো আমার আসল খেলাওয়ালী!' টাকা পঁচিশটা প্যাঁটরার মধ্যে রাখতে-রাখতে বললে, 'কালকে আরো বেশি চাই। পঞ্চাশ টাকা।'
তরী মার জন্য তামাক সাজে আর গুন্‌গুনিয়ে গান গায় :

কালনাগিনী সাক্ষী রাখে দেব দানব সব,
কি দোষে দংশিব আমি এমন মানব।
এখানে ওখানে কালি ঘুরে ঘুরে দেখে,
দোষ না দেখিয়া কালি বিড় পাকাইয়া থাকে।
রে বিধির কি হইল!

মাছ শিকারী বাদিয়ানীকে সাদি করবে এমন প্রস্তাবে রাজি হবে না ভুঁইয়া-সাহেব। কোথাকার কে এক খলিফার মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করে এসেছে। সেইখানেই রাজি হবে ইয়াসিন? কখনো না। কিন্তু মুখ ফুটে বলে এমন সাধ্য কি। দরকার নেই বলে-কয়ে নৌকোয় সে ভেসে পড়বে। নোট বোঝাই করে কলসী পুঁতেছে সে শান খুঁড়ে। শান খুঁড়েই বের করবে সে একটা।
তাই পরদিন মাথা ঝাড়াবার সময় ইয়াসিন মিনতি করল : 'চল আজ সংসারী ঘরে।'
ঘাসের ডগা বুলুতে বুলুতে তরী বললে, 'আমাকে নিয়ে চল তোমাদের ঘরে। সেই আমার সংসারী ঘর। নৌকোয় কি ঘর হয়? ছইকে কি ছাদ বলে?'
নতুন জোয়ারের কুলকুল শুনতে-শুনতে তরী গান ধরল :

পিরদিমখানা নিবু নিবু মিটমিটিয়া জ্বলে,
বেউলা বাড়ায় সইল্‌তাটারে কনিষ্ঠ অঙ্গুলে।
সেই যে তৈল মোছে বেউলা সিঁথির উপরে,
কালনাগিনী বলে এবার দোষ পেয়েছি ওরে।
রে বিধির কি হইল!

গান শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি ইয়াসিন। ঘাসের শাঁস ফেলে তরী ইয়াসিনের মুখে-কপালে আঙুল বুলুতে লাগল। চোখের পাতায়, চুলের মধ্যে।

এই হচ্ছে দ্বিতীয় কৌশল। দিব্যির কোঠায় ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে এই বলে আঁৎকে উঠবে তরী আর দারোয়ানী কাঞ্চনী ছোঁ মেরে আদায় করে নেবে জরিমানা। ব্যামো সারাতে এসে এ-সব কী কেলেংকারি। দিব্যির ঘরকে অশুদ্ধ করে তোলা!

কিন্তু, কই, তরী আজ আর শব্দ করে না কেন?

ইয়াসিনের মাথাটা তরী অতি নিঃশব্দে তার কোলের মধ্যে তুলে নিল। প্রায় তার নিশ্বাসের কাছাকাছি।

তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছে ইয়াসিনের। এই কি জল না মাটি! ঢেউ না পাহাড়!

'এ কোথায় আমরা, তরী? এ দিব্যির ঘর নয়?'

'চুপ, চুপ।' তরী নিশ্বাস বন্ধ করে আবছা গলায় বললে।

'দিব্যির ঘর, তবু তুমি আমাকে ছুঁয়ে রয়েছ', ধরে রয়েছ'—ইয়াসিনের গলায় বিবর্ণ ভয়।

মরা-গলায়, পাথুরে গলায় তরী শুধু বলছে 'চুপ, চুপ!'

কাঞ্চনীর কানকে ফাঁকি দেয়া গেল না। সে শুনে ফেলেছে, নিজের চোখে দেখে ফেলেছে।

'আমি নয়, তরী—' বলতে যাচ্ছিল ইয়াসিন। তরীর মুখে এক শব্দ : 'চুপ, চুপ!'

ইয়াসিন বেরিয়ে গেল চোরের মত। কাঞ্চনীর হাতে পঞ্চাশ টাকা গুনাগার দিলে।

কিন্তু কাল কি আর ইয়াসিন আসবে?

পরদিন ছইয়ে বসে মাছ ধরল না বঁড়শিতে, ডাঙা-পথে তরী ঘোরাঘুরি করতে লাগল। হাওয়ার ঝরা-পাতা উড়ছে, বলছে, চুপ-চুপ। বলছে ঐ পাখিটা। পারের কাছেকার জলের ঘুরুলি। নিশ্চুপ নৌকোর অন্ধকার।

ইয়াসিন আসবে না, কিন্তু থানা থেকে দারোগা আসবে তদন্তে। কে একটা মিশশিকারী মেয়ে ভূঁইয়া-সাহেবের ছেলেকে গুণ করেছে, ঐ মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে সে সাদি করবে না, তার থেকে টাকা খসিয়েছে নাকি অনেকগুলো। গুণ থাকলেই গুণ করে। হাতসাফাই জানলেই টাকা খসানো যায়। কিন্তু তা হলে কি, দারোগা সাহেবও টাকা খেয়েছে ভারি হাতে। এ অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেবে তাদের।

সকাল বেলার জোয়ারে বহর ছেড়ে দিল। তরী আর কাঞ্চনী হাল-দাঁড় নিয়ে বসল। পারে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন। জলে নামবে, না হাত ধরে তরীকে ডাঙায় তুলে নিয়ে আসবে, যেন দেহ-মনে দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

তরী গান ধরল :

কোথায় তুমি প্রাণপতি কোথায় তুমি স্বামী,
বিয়ার রাতে কাঞ্চা চুলে রাঁড়ী হইলাম আমি।
অফুরন্ত নদী-নালা এই ধারে ওই ধার,
চোখের পানি সান্তারিয়া যাইব পরপার।
রে বিধির কি হইল!

বুড়িকে কে তামাক সেজে দিচ্ছে। ঠাহর করে চেয়ে দেখল, তাদের সেই হালিয়া। সেকেন্দর।

'সে কি! তুই যাচ্ছিস কোথা?' ইয়াসিন চমকে উঠল।

'আমি চলেছি নৌকোর মানুষ হয়ে নয়, সাধারণ চাকর হয়ে। দাঁড় টানব, মাছ ধরব, কাঠ কাটব। মন্তর শিখব। বাদিয়া হয়ে যাব। আসবেন আপনি?'

'চুপ! চুপ!' চোখ পাকিয়ে তরী ধমক দিয়ে উঠল সেকেন্দরকে।

৯১। দুইবার রাজা

বাজে-পোড়া ঠুঁটো তালগাছটা উঠোনের পাশে দাঁড়িয়ে, যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশকে ঠাট্টা করছে। অথচ ম্রিয়মান, বিষণ্ন।

বুকের মধ্যে যেন একটা হাপর আছে, উঁচু তাকিয়াটায় ঘাড় গুঁজে উবু হয়ে শুয়ে অমর হাপানির টান্ টান্ছে। ডাক্তার খানিকটা ন্যাকড়ায় কি একটা ঝাঁঝালো ওষুধ ঢেলে দিয়ে বলে গিয়েছিল শুঁকতে। তাতে টান্ কমা দূরে থাক, রগ দুটো বাগ্ না মেনে একসঙ্গে টন্টন্ করে উঠেছে। বন্ধু সরোজ কতগুলি দড়ি পাকিয়ে মাথার চারপাশটা সজোরে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল। এখন ভীষণ লাগছে তাতে। কিন্তু খুলে ফেলতে পর্যন্ত জোরে কুলোয় না।

বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা ঝিমিয়ে পড়েছে। জাগাতে ইচ্ছে করছে না। পরিক্লান্ত ঘুমন্ত করুণ মুখখানি!

প্যাঁকাটির মতো লিক্লিকে দেহ,—একটা টিক্টিকি যেন। এই একটুখানি টিঁকে থাকার বিরুদ্ধে সমস্তটা দেহ ষড়যন্ত্র করেছে! তার কী আর্তনাদ! যেন একটা ভূমিকম্প বা বন্যা!

মার বিষাদস্নিগ্ধ মুখখানির পানে চেয়ে অমরের মনে পড়ল, হঠাৎ কবে কার মুখে গান শুনেছিল—'জানি গো দিন যাবে, এদিন যাবে', শেলিও এ কথা বিশ্বাস করে সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল—তারপর এক শ বছর এক এক করে খসেছে। দিন আর এলো না। বসন্ত যদি এলই,—মহামারী নিয়ে এল, নিয়ে এল চৈত্রের চোখ ভরে রৌদ্রের রোদন!

'আজি হতে শতবর্ষ পরে'—। সেদিনো পল্লবমর্মরে কোটি কোটি ক্রন্দন অনুরণিত হবে। প্লেটোও ত কত আগে স্বপ্ন দেখেছিল, বার্ণাড শও দেখেছে। 'সে কবে গো কবে?'

অমরের হঠাৎ ইচ্ছে করল একটা কবিতা লিখতে—সমস্ত বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করে। ভুয়ো ভগবান আর ভুয়ো ভালবাসা। যেমন ভুয়ো ভূত!—মনে পড়ে বায়রন, মনে পড়ে শোপেনহাওয়ার।

যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে অমর বেরিয়ে এল উঠোনে। সেই ঠুঁটো তালগাছটার গুঁড়ি ধরে হাঁপাতে লাগল। দুজনে যেন মিতা; একসঙ্গে আকাশের তারাকে মুখ ভেঙ্‌চে ভয় দেখাচ্ছে। সমস্ত আকাশে কিন্তু নিস্তরঙ্গ ঔদাসীন্য।

ঝড়ের পর যেমন অরণ্য!—টানটা পড়েছে।

মা বললেন—নাই বা গেলি কলেজে। একটা ছাতাও তা নেই। যে রোদ—

অমর বলছে—হাজিরা থাকবে না। তা ছাড়া মাইনে না দেওয়ার দরুন কি দাঁড়িয়েছে অবস্থাটা দেখে আসি।

অবস্থা আর এর বেশি কি সঙীন হবে? দু মাসের মাইনে দেবার শেষ তারিখ উৎরে গেছে দেখে নাম লাল কালিতে কেটে দিয়েছে।

সরোজ বললে—তুমি ফ্রি না?

দু হাত দিয়ে বুকের ঘাম মুছে অমর বললে—তা হলে সুপারিশ লাগে, —ঐ যে মোড়ের তেতলা বাড়ির বারান্দায় বসে যিনি মোটা চুরুট টানেন তাঁর। তিনি আর প্রিন্সিপ্যাল ত আমার মার এই ছেঁড়া কাপড়, বন্ধক-দেওয়া দু-খানি সোনার বালা, এই ঝুল-ঝোলা নোংরা দাঁত-বের-করা খোলার ঘরটা দেখতে আসেন নি। আরজি একটা করেছিলাম বটে, সুপারিশ ছিল না বলে বাতিল হয়ে গেল। সোজা হয়ে আজো যেন দারিদ্র্য তার সত্য পরিচয় দিতে শেখেনি। আর মহীনকে চেন ত?—বহিকে যে আসে—ফ্রি। বাড়ি থেকে মাইনে বাবদ যা টাকা আসে, তা দিয়ে 'পিকাডিলি' টিন কেনে, সেলুনে বসে দাড়ি কামায়।

মা হতাশ হয়ে বললে—উপায় কি হবে তবে? যেন হঠাৎ একটা বাড়ির ভিৎ খসে গেল; কাদায় বসে গেল চলন্ত গাড়ির চাকা!

অমর বললে, ভিজিট পাবে না জেনে ডাক্তার যখন ন্যাকড়ায় ভোঁটকা-গন্ধওলা খানিকটা নাইট্রিক য়্যাসিডের মতো কি ফেলে বলে গিয়েছিল এ রোগে কেউ মরে না, তখন আশ্বস্ত হয়ে আমাকে তোমার বুকে নিয়ে কি বলেছিলে? বলেছিলে—ঠাকুর তোকে বাঁচিয়ে রাখুন, এইটুকুই শুধু চাই। বেশ ত আবার কি! কাল যদি ফের টান্ ওঠে, তোমার এ ভুতুড়ে হাতুড়ে ডাটার না ডাকলেও বেঁচে উঠব।

পরে ঢোক গিলে ফের বললে—তোমার সেই ঠাকুর রান্নার ঠাকুরদের মতই বাজে রাঁধুনে, মা। হয় খালি ঝাল, নয় খালি নুন। পরিবেশন করতে পর্যন্ত ভালো শেখেনি।

জামাটা খুলে ফেললে। ছাবিবশ ইঞ্চি বুক, কাঞ্চির মতো হাত পা, পিঠটা কুঁজো, মাথার চুলে চিরুনি পড়ে না,—তবু মনে হয় যেন একটা উদ্যত তর্জনী।

মা পাখা করে ঘামটা মেরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। যেমন করে পুরুত তার নারায়ণ-শিলা গঙ্গাজলে ধোয়,—ততখানি যত্নে।

সরোজ বললে—তা কি হয়? সামান্য কটা টাকার জন্য কেরিয়ার মাটি করার কোন মানে নেই। আমি দেব টাকা, মাইনে দিয়ে দিয়ো ফাইনশুদ্ধু।

মার বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে অমর বললে—কিছু লাভ নেই তাতে। তা ছাড়া পার্সেন্টেজও নেই। হপ্তায় দু বার করে টান ওঠে। বানান ভুল নিয়ে ঘোষমাষ্টারের সঙ্গে তর্ক করা অবধি প্রক্সিও চলে না আর, খালি আমাকে জব্দ করার চেষ্টা। 'গোষ্ট'কে যদি অনবরত 'ঘোষ্ট' বলে চলে একঘন্টা ধরে,—তা আর যার সহ্য হোক্, আমার হয় না, ভাই। বিনয়সহকারে প্রতিবাদ করলাম, মাষ্টার ত রেগেই লাল। প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে নালিশ—আমি নাকি অপমান করেছি। আমি বললাম—উনি 'গোষ্ট'কে বলেন 'ঘোষ্ট', 'পিয়ার্স্'কে বলেন 'পায়াস'—তাই শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম ও উচ্চারণগুলি কি ঠিক?

সরোজ বললে—প্রিন্সিপ্যাল কি বললেন?

—বললেন, প্রোফেসার তোমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন। তাঁকে করেক্ট করবার তোমার রাইট নেই। ফের এমন বেয়াদবি কর ত ফাইন করব। অদ্ভুত! তা ছাড়া, আমি বিরক্ত হয়ে গেছি, সরোজ।

একটু থেমে বললে—আমি কী বিরক্ত হয়ে যে গেছি, তুমি তা ভাবতেও পারবে না। আমাদের যিনি পয়েট্রি পড়ান, তিনি আবার উকিল। চাপকান পরে ছুটতে ছুটতে হাজির, এক গাদা পানে মুখটা ঠাসা,—কীট্সের 'নাইটিঙ্গল্' পড়াবেন। ডাক্তার যেমন ছুরি দিয়ে মড়া কাটে ভাই, তেমনি করে কবিতাটা দলে পিষে দুমড়ে চটকে একেবারে কাদাচিংড়ি করে ছাড়লেন। ওঁর ব্যাখ্যা শুনে এত ব্যথা লাগল, যে মনে হল বেচারা কীটস যদি ছাত্র হয়ে শুনত ওঁর পড়া, ত বেঞ্চিতে কপাল ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করত। কী সে চেঁচানি, পানের ছিবড়ে ছিটকে পড়ছে,—ভয়ে নাইটিঙ্গেলের প্রাণ থ হয়ে গেছে। 'রুথ' এর কথা যেখানে আছে, সেখানটায় এসে ওঁর কী বিপুল হাত ছোঁড়া—ও জায়গাটা মুখস্ত করে এসেছিলেন নিশ্চয়ই। 'রুথ'-এর গল্প কি, বাইবেলের সঙ্গে কোথায় তার অমিল এই নিয়ে তুমুল তর্ক, তুমুল আস্ফালন। 'খুব সোজা' বলে বই মুড়ে কৌটোর থেকে গোটা চার পান মুখে পুরে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন আলপাকার পাল তুলে। বোধ হয় অনেক দিন বাদে একটা মোকদ্দমা পেয়েছিলেন।—তখনো ভালো ছাত্রেরা বইয়ের ধারে মাষ্টারের শব্দার্থ টুকে রাখছে ও পরস্পরে রুথের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পরামর্শ করছে। ভাই সরোজ, আর জ্যোৎস্নারাতে কীট্স পড়া চল্বে না কোনোদিন।

পরে মাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি ভাবছো মা যে তোমার ছেলে বি-এ পাশ করতে পারল না বলেই বয়ে গেল? নয় মা নয়। জান?—যারা খুব বড় হয়েছে তাদের শব্দের অর্থ জানতে মার গয়না বন্ধক দিয়ে কলেজে পড়তে আসতে হয় নি। এ দিন যাবে, এ কথা ত তুমিই বেশি বিশ্বাস কর। দিন যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি তার পর কালো ঝড়ো রাত্রিই আসে, তাতেও ভড়কাবার কিছু নেই। আমাকে জন্ম থেকে এমন পঙ্গু পক্ষাহত করে বানিয়েছেন বলে জবাবদিহি দিতে হবে বিধাতাকেই।

মা মিছরির জল ছেঁকে দুই কাঁচের গ্লাসে করে দুই বন্ধুকে ভাগ করে দিলেন। বললেন—আর একটা গয়নাও ত নেই—

—খবরদার, মা। আমার কলেজে পড়া এইখেনে খতম। আমি এই ফাটা ফুসফুস নিয়েই লড়ব। তুমি আমার মা, আর ঐ তালগাছটা আমার ছেলে-বেলার বন্ধু—কতকালের চেনা।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—কি করবে তা হলে এখন?

—কবিতা লিখব। তুমি হেসো না, সরোজ। কথাটা ভারি বেতালা শোনাচ্ছে, জানি। কিন্তু আমি সত্যিই লিখব এবার। আমার সমস্ত প্রাণ চেঁচিয়ে উঠতে চাইছে।

সরোজ হেসে বললে—তা হলে আর কবিতা হবে না।

—না হোক্। সোজা সত্য কথা বুক ঠুকে আমি খুলে বলে দিতে চাই। সৌন্দর্য্যের আবরণ দিয়ে কুৎসিত নগ্নতাকে ঢেকে রাখার জন্যেই না তোমরা ভগবান বানিয়েছ! যে কথা বায়রন, সুইন্‌বার্ণ বা হুইটম্যান পর্যন্ত ভাবতে পারেনি—

—তেমন আবার কি কথা আছে?

—দেখো। যে কথা ভেবেছিল খালি চ্যাটার্‌টন্।

সরোজ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সহসা পাংশু হয়ে বললে—খবরদার, অমর! ও রকম মারাত্মক ঠাট্টা করো না।

অমর উদাসীনের মতো বললে—মারাত্মক ঠাট্টাই বটে। জান, বিধাতা যদি তোমাদের প্রকাণ্ড কবি হন্, ত এই পৃথিবীটা তাঁর প্রকাণ্ড ছন্দপতন।

কিন্তু না, সত্যি সত্যিই সে রাতে অমর কালি কলম আর কাগজ নিয়ে বসল কবিতা লিখতে। মেটে মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে মা ঘুমিয়ে পড়েছে, ম্লান বাতির আলোয় সেই মুখখানির যেন তুলনা নেই। ঐ মার মুখখানি নিয়েই একটা কবিতা লেখা যায় হয় ত!

সল্‌তে ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে,—কিন্তু একটা লাইনো কলমের মুখে উঁকি মারছে না। 'বিট্'-এর পুলিশ খানিক আগে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে জুতোর ভারী শব্দ করে চলে গেছে। আবার সেই নিঃশব্দতা,—প্রকাশ করতে না পারার ব্যথার মতোই অপরিমেয়।

অমরের মনে হল, ভাষা ভারি দুর্বল, খালি ভেঙে পড়ে। লিখতে

চাইছিল—এই জীর্ণ পৃথিবী, এই দানবী সভ্যতা,—সব কিছুই প্রকাণ্ড ভুল বিধাতার,—এঁচড়েপাকা ছেলের ছ্যাব্লামি। এঞ্জিন-ড্রাইভার যেমন ভুল পথে গাড়ি চালিয়ে হায় হায় করে ওঠে,—তেমনি অকারণে ভুল করে খেলাচ্ছলে এই পৃথিবীটা বানিয়ে ফলে ভগবান তারায় তারায় চীৎকার করে উঠেছেন—অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। এত বড় যে ব্যবসাদার—সেও দেউলে হল বলে। কবে লালবাতি জ্বলবে প্রলয়ের! তারই কবিতা।

লেখা যায় না। খালি সল্‌তেটা পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হলে দীপ নিবে যায় মাত্র।

বিকেলের দিকে অমর সরোজের বাড়ি গেল। পাশেই বাড়ি,—লাগাও টিনের ঘরে একটা গাড়ি পর্যন্ত আছে।

শ্বেতপাথরের মেঝে,—দুটো দেয়াল প্রায় বইয়ে ভরা,—ছবি খান তিন চার, সেক্সপীয়র, শেলি আর বার্ণাড শ। একটা চেয়ারের ওপর বই গাদা করা,—মেঝেতে কাৎ হয়ে শুয়ে সরোজ এক্‌জামিনের পড়া পড়ছে। আর ঘরের এক কোণে ষ্টোভ জ্বালিয়ে তার বোন চায়ের জল গরম করছে আর দাদাকে বক্‌ছে সিগারেট খায় বলে।

অমরকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখে মেয়েটি আরো খানিকটা জল কেট্‌লিতে ঢেলে দিয়ে বললে—যাই বল দাদা, বোহিমিয়াটা আর যাই হোক, আমাদের বহরমপুরের মতোই খানিকটা। নইলে—

সরোজ উঠে পড়ে বললে—এস অমর বসো। তুই লক্ষ্মী দিদি, পরোটা ভেজে দিবি আমাদের? দেখ না চট করে—

বোন চলে গেলে সরোজ তাড়াতাড়ি দরজার পরদাটা টেনে দিয়ে শুধোল—এমনিই কি এসেছ, না কোনো কাজ আছে?

অমর সোজা হয়ে বললে—আমাকে কয়েকটা টাকা দাও,—এই গোটা কুড়ি।

সরোজ হাতের বইটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—লুসাই, লুসাই, ও লুসী!

বোন দু হাতে ময়দার ড্যালাটা নিয়ে এসে পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে বললে—কি হুকুম মশাইয়ের?

সরোজ বললে—চাবিটা দিয়ে দেরাজ থেকে কুড়িটে টাকা বার করে দে ত শিগগির।

ঘরে ঢুকে ময়দা চটকাতে-চটকাতে লুসী বললে—কিসের জন্যে শুনি?

—উড়োতে। তুই দে খুলে। ফপরদালালি করিস নে।

দেরাজ খুলতে খুলতে লুসী বললে—দাঁড়াও না। দিচ্ছি এবার। ঠিক মতো হিসেব দিতে না পারলে রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কে চা করে দেয় দেখব। বলে চলে গেল। পর্দাটা খানিক দুলে স্থির হল।

টাকা দিয়ে সরোজ বললে—যদি আবার বিপদে পড় বলতে সঙ্কোচ কোরো না।—

চা খেতে-খেতে অমর ভাবছিল সংসারে এ একটা কি চমৎকার ব্যাপার! উজ্জ্বল স্বাস্থ্য,—স্বচ্ছল অবস্থা,—কল্যাণী বোন! নাম তার লুসী!

পেছন থেকে কে অতি কুন্ঠিত কণ্ঠে বলছিল—একটা নতুন কাগজ বেরিয়েছে, যদি নেন্—

সরোজ মুখ ফিরিয়ে দেখলে—অমর। খালি পা, যে ন্যাকড়া দিয়ে কালি-পড়া লন্ঠন মোছে তেমনি কাপড় পরনে—হাঁপানির টানে ঝর্ঝরে পাঁজর দুটো ঝেঁকে উঠছে,—কথা কইতে পারছে না।

সরোজ তক্ষুনিই কাগজটা নিয়ে দাম দিল, কথা কইল না কোনো। বরঞ্চ ভারি লজ্জা করতে লাগল ওরই।

ট্রাম চল্‌ল। চলন্ত গাড়ি থেকে নাম্‌তে গিয়ে অমর পা পিছ্‌লে পড়ে যেতেই সবাই রোল করে উঠল। হাঁটুটা চেপে ধরে 'কিছু-না' বলে অমর কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে কাশতে লাগল। পরে ভিড়ের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল। সরোজ নেমে আর খোঁজ পেলে না তার।

ফুসফুসটা যেন কে চুষে শুষে ফেলেছে।

অমর একটা গাছতলায় দুটো হাত মাটিতে চেপে টান হয়ে বসে আকাশের বাতাস নেবার জন্যে গলাটা উঁচু করে ধরেছে। কে যেন ওর টুঁটিটা টিপছে, ভিজা গামছার মতো ফুস্‌ফুসটা চিপে ফেল্‌ছে।

কাগজের বাণ্ডিলটার ওপর মাথা রেখে শুতে যেতে দেখে—পাশাপাশি দুটো বিজ্ঞাপন। একটা এক ছাত্র পড়বার জন্যে, আরেকটা কোন্ অরক্ষণীয়া পাত্রীর জন্যে পাত্র চাই। যেমন-কে-তেমন হলেই চলে—ঠিক এই কথা লেখা।

টান্‌টা যদি একটু পড়ে বিকেলের দিকে,—অমর ভাবছিল,—তবে কোথায় গিয়ে আগে আরজি পেশ করবে? টিউশানির খোঁজে, না পাত্রীর?

আগে ভাবত—এক মুঠো ভাত, একখানি কুঁড়ে ঘর, আর একটি নারী। এখন মনে পড়ছে আরো কত কথা। হাঁপানিতে ভুগবে না, ঝড়ে কুঁড়ের চাল উড়ে যাবে না, ভাতে রোগের বীজ থাকবে না, নারীর ঠোঁটে কালকূট থাকবে না। এত! তবে।—

ক্লান্ত কাক ককায়, আর ককায় ও কাশে মাটির ওপর মায়ের ছেলে।

পাঁজরা দুটো খানিক জিরোলে তারপর কষ্টে পথ চলে। চল্‌তে চল্‌তে প্রথম ঠিকানাটাতেই ঠিক করে এল—যেখানে মাষ্টার চায়।

বাড়ির কর্তা ঘাড় বাঁকিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করে শুধোলেন—কদ্দুর পড়া হয়েছে?

অমর বললে—বি-এ পড়ছি।

—কালকে আই-এর সার্টিফিকেটটা নিয়ে এস। দেখা যাবে।

একদিন খুব জোরে হাঁপানি উঠলে মা রাগ করে অমরের গলার সব-গুলি মাদুলি ছিঁড়ে ফেলেছিল, আর অমর রাগ করে ছিঁড়ে ফেলেছিল—ম্যাট্রিক আর আই-এর সার্টিফিকেট দুটো।

মাদুলিগুলির মধ্যে একটা সোনার ছিল বলে মা তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে বাক্সে রেখে দিয়েছিল, অমরও ভালো হয়ে এক সময়ে সার্টিফিকেট দুটোর ছেঁড়া খণ্ডগুলি কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিল একটা চৌকো লেফাফায়। আঠা দিয়ে সেই সার্টিফিকেট আজ জোড়া দিতে বসল।

কর্ত্তা বহুক্ষণ সার্টিফিকেটটা নেড়ে চেড়ে দেখে জাল নয় প্রতিপন্ন করে বললেন—কিসে ছিঁড়ল?—

—একটা ছোট্ট দুষ্টু বোন আছে,—নাম লুসাই—দুষ্টুমি করে ছিঁড়ে ফেলেছে।

কর্ত্তা ঘাড়টা বার চারেক দুলিয়ে বললেন—আচ্ছা বাপু, বানান কর ত থাইসিস।

পরে বললেন—বেশ। বল ত ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কি? আকবর কত সালে জন্মেছিল? এখান থেকে কি করে ডিব্রুগড় যেতে হয়?

অমর বললে—আমি ত পড়াব ইংরিজি আর অঙ্ক। আমাকে এ সব প্রশ্ন কেন করছেন?

কর্ত্তা খাপ্পা হয়ে বললেন—আজকালকার ছেলেগুলো দু-পাতা মুখস্ত করেই পাশ মারে। আমাদের সময় আমরা কত বেশি জানতাম।

কর্ত্তার ছেলে পাশেই ছিল। একটু বেয়াড়া রকমের। বললে—যা যা জানতে তাই বুঝি জিজ্ঞেস করছ, বাবা? মাস্টারদের যে প্রশ্নটা ভালো করে জানা থাকে, সেইটেই পরীক্ষায় দেয়, আমি বরাবর দেখছি। যেন কাগজ দেখবার সময় অসুবিধেয় পড়তে না হয়।

বাপ একটু দমে গিয়ে বললেন—আচ্ছা, একটা ইংরিজি রচনা লেখ ত,—দেখি তোমার ইংরিজির কত দৌড়। একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয় ত টুনু।

কর্ত্তা বললেন—লেখ, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি। এক শ শব্দের বেশি নয়। এ রকমই আসে পরীক্ষায়।

টুনু একটু হেসে বললে—বাবা, ষোলো 'থিয়োরেম' থেকে একটা 'এক্সট্রা' দাও না কষতে।

বাপ চটে বললেন—যা, ও সব কি দেব? দেব মানসাঙ্ক।

টুনু জোরে হেসে বললে—ওটা বুঝি তুমি জান না?

কর্ত্তা রচনার কি বুঝলেন, তিনিই জানেন,—তবে দেখলেন হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার। বললেন—বেশ, তবে কি জান, ইতিমধ্যে একজন বহাল হয়ে গেছে। নইলে তোমাকে নিতুম।

টুনু অস্ফুটস্বরে বললে,—কিন্তু বাবা, ইনি ভালো, এঁকে আমার—

অমর শুধু বলতে পারলে—এ সব কেন লেখালেন তবে?

কর্ত্তা বললেন—লেখা ত তোমাদের অভ্যেস হয়েই আছে। কালে ত জীবনের পেশাই হবে। বরঞ্চ সাবেক কালের এণ্ট্রান্স পাশ করা বুড়োর

কাছে একটা রচনা দেখিয়ে নিয়ে তোমার লাভই হল। একটু প্রাকটিস হল লেখার। তা ছাড়া রচনার 'সাবজেক্ট'টা ত খুবই ভাল,—কি বল? জান হে বাপু, সে-কালের এন্ট্রান্স তোমাদের এ-কালের পাঁচটা এম-এর সমান।

অমর বললে এবার—উনি কততে পড়াবেন?

—পনেরো টাকা।

—আমাকে দশটা টাকা দেবেন না হয়। দরকার হলে দু বেলা এসেই পড়াব দু'ঘণ্টা করে।

টুনু বললে—হ্যাঁ বাবা, এঁকেই—

কর্ত্তা বললেন—বেশ, আসবে কাল। আর শোন, এ ফোর্থ ক্লাশে পড়লে কি হবে, এদের ইংরিজিটা বেশ একটু দাঁত-কামড়ানো। বাড়ি থেকে একটু পড়ে আসবে রোজ। আর আমি কাল সকালবেলাই একটা রুটিন করে রাখব,—কবে আর কখন কি পড়াতে হবে। বুঝলে? একটু ঝিমিয়ো কম।

রোজ শেষ রাত্রেই টানটা ঠেলে আসে। তাই নিয়েই অমর বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি, পাছে আগের ঠিক করা মাস্টার চেয়ার বেদখল করে নেয়—দশ টাকা থেকে ন টাকা বারো আনায় নেমে।

কেওড়া-কাঠের একটা থুখুরো তক্তপোষ,—ওপরে একটা চাটাই পর্যন্ত নেই। ফাঁকে ফাঁকে ছারপোকাদের বৈঠকখানা বসেছে।

কর্ত্তা একটা জল-চৌকি টেনে নিয়ে কাছে বসে বললেন—এই রুটিন করে দিয়েছি, দেখে নাও। ঐ চারঘণ্টা করে রইল,—সকালে দুই, বিকেলে দুই। নইলে ত সেই মাস্টারকেই রাখতাম,—দিব্যি চেহারা, দেখলেই মনে হয় ছেলে মানুষ করতে পারবে। এম-এ পাশ।

পরে বিড়বিড় করে বললেন—এখুনিই এসে পড়বে হয় ত। একটা ভাঁওতা মেরে দিতে হবে।

দরজা ঠেলে ভেতরে যে এল,—অমর তাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল—মহীন। বোধ হয় বেচারা অনেকদিন আউটরাম ঘাটে গিয়ে চা খেতে পারেনি, তাই বুঝি এ চাকরিটা বাগাতে চেয়েছিল।

অমর প্রশ্ন করলে—তুই কবে এম-এ পাশ করলি, মহীন?

মহীন সিল্কের রুমাল বার করে ঘাড়ের ঘাম মুছে বললে—তুই পাশ করিসনি নিশ্চয়। পনেরো তা হলে আর জোটেনি। 'থাইসিস' বানান পেরেছিলি ত? বলেই বাইক করে ছুট দিলে।

কর্ত্তা বললেন—দেখলে কাণ্ডটা। ভাঁড়িয়ে জোচ্চুরি করে ঠকাতে এসেছিল,—ভাগ্যিস রাখিনি। পরে চৌকিটা আরো একটু কাছে টেনে বললেন—পড়াও ত বাপু শুনি।

ছেলে বললে—তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে নাকি, বাবা?

কর্ত্তা বললেন—দেখি না কেমন পড়ায়,—মানেগুলো সব ঠিক বলতে পারে কি না। হ্যাঁ, আরম্ভ করে দাও,—

অমর বললে—কি ভাবে আরম্ভ করব, তাও যদি বলে দেন।

কর্ত্তা ঘাড় চুলকে বললেন—তা হলে আর তোমাকে মাস্টার রেখেছি কেন?

—কি হলে আপনার মনোমত হবে, তাও ত একান্ত জানা দরকার দেখছি। নইলে—

ছেলে রেগে বললে—আমি আজ কিছুতেই পড়ব না বাবা, তুমি এরকম করলে। তুমি যাও চলে।

তৃতীয় পক্ষের ছেলে। বাপ জলচৌকিটা নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়া মাত্রই ছেলে উঠে দরজায় খিল এঁটে একটা বালি-কাগজের ছেঁড়া খাতা বার করে বললে—একটা কবিতা লিখেছি, মাস্টার মশাই। শুনবেন? একটা হাঁস দুই সাদা ডানা মেলে জলে ভাসছিল—কতগুলি পাজি ছেলে তাকে ধরে কেটেকুটে কাট্‌লেট বানাচ্ছে—

সুকুমার ছেলে—দুটি কালো চোখে সুগভীর সুদূর কৌতূহল, যেন দুটি মণির প্রদীপ জেবলে অন্ধকারে কি অনুসন্ধান করছে।

অমর শুধু বললে—এখন ও সব থাক। এবার পড়ি এসো।

ছেলে অবাক হয়ে বললে—কেন বলুন ত,—বাবা কবিতার নাম শুনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খড়ম নিয়ে তেড়ে আসেন, মা পড়ে পড়ে কাঁদেন,—আর আপনিও কবিতা ভালোবাসেন না? তবে আমাদের বইয়ে এত কবিতা লেখা কেন? শুনেছি, আমাদের দেশে এক প্রকান্ড কবি আছেন, তিনি নাকি ছেলেবেলায় আমার মতো ইস্কুল পালাতেন। আমার ইস্কুল একটুও ভালো লাগে না,—যেন খানিকটা কুইনিন।

গায়ে খাকি রঙের সার্ট, পরনে ফিন্‌ফিনে কাপড়, কুচ্‌কুচে কালো পাড়,—খালি পা,—চোখের পাতার ওপরে বড় একটা তিল।

অমর জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি, ভাই?

—কিশলয়। বড়দি রেখেছিল। বড়দিই ত আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছিল। ওঁর মরার পর আমি একটা লিখেও ছিলাম,—দেখবেন সেটা? উনি দেখে গেলে কত সুখী হতেন যে, অন্ত নেই।

—তুমি কি আজ পড়বে না?

—রোজই ত পড়ি।—দেখুন, ছেলেবেলায় একটা কবিতা তারার বিষয়, ইংরিজিতে, আমার ভালো লাগেনি। তারাকে আমার কি মনে হয়, জানেন? যেন কারা অনেকগুলি বাতি জবালিয়ে নীচে মানুষদের খুঁজছে যারা বড়দির মতো কেঁদে কেঁদে মরে গেল। আমার এক এক সময় মনে হয় ঐ বড় তারাটা যেন বড়দি। এখান থেকে একজন যায়, আর আকাশে একটি করে বাড়ে। আমি ঐ তারাটাকে নিয়ে কতদিন একটা কবিতা ভাবছি, পারি না। হয় না।

অমর অঙ্কের খাতাটা মুড়ে রেখে বললে—নিয়ে এসো ত ভাই তোমার কবিতার খাতাটি।

পুরো মাস গুজরানো হয়নি,—দিন বারো পড়ানো হয়েছে মাত্র। পয়লা তারিখ অমর হাত পাতলে মাইনের জন্য।

কর্ত্তা বললেন—সাত তারিখের আগে হবে না।

হতে হতে সতেরো তারিখে এসে ঠেকল।

অমর অবাক হয়ে বললে—বারো দিনের মাইনে এই তিনটাকা সাড়ে তিন আনা?

কর্ত্তা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কেন হিসেবের এক চুলও ভুল বার করতে পারবে না। নিয়ে এসো ত কাগজ, একটা রুল অফ থ্রি কষে ফেল। দুদিন আসনি,—তা ছাড়া এক দিন সাত মিনিট আর দুদিন সাড়ে চার মিনিট লেট করে এসেছিলে—

অমরের ইচ্ছা হল মারে ছুঁড়ে টাকা তিনটা। কিন্তু মার পরনের কাপড়টা একেবারে ছিঁড়ে গেছে—পুরোনো বইয়ের দোকানে সস্তায় একটা খুব ভালো বই দেখেছিল, যাবার সময় সেটাও কিনে নিয়ে যেতে পারে।

সকাল বেলাতেই হাঁপানি উঠেছিল সেদিন। তবুও কুঁজো হয়ে ঢিকোতে ঢিকোতে পড়াতে চলল। কিশলয় বললে—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে? বুকে হাত বুলিয়ে দেব?

—দাও।

কতগুলি বই গাদা করে তার ওপর মাথাটা রেখে অমর শোয় আর কিশলয় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প শোনে—

শেলিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বায়রনকে দেশ থেকে। নুট হামসুন ট্রাম-কণ্ডাক্টারি করত। ডস্টয়ভস্কিকে ফাঁসিকাঠে তুলে নামিয়ে ন,—গোর্কি থাকত উপোস করে—মুসোলিনি ভিক্ষা করত পোলের তলায় বসে—

কিশলয় উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে বুকের আরো অনেক কাছে এগিয়ে আসে।

অমর ঐ সুকোমল সুচারু বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির পানে চেয়ে চেয়ে অনেক কথা ভাবে,—হয় ত এর মধ্যে ভবিষ্যতের ঋষি-কবি তন্ময় হয়ে আছেন।

হঠাৎ দুজনে শিউরে আঁৎকে উঠল—জানলায় কার পাকানো ঝাঁঝালো দুই চক্ষু দেখে।

কর্ত্তা বন্ধ দরজায় পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বললেন—খোল দরজা শিগগির—

কিশলয় ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলে।

কর্ত্তা এক ঝাঁকানিতে অমরের হাতটা টেনে শোয়া থেকে তুলে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলেন,—না পড়িয়ে শুয়ে শুয়ে উনি কবিতা শোনাচ্ছেন। গরচা পয়সা দেওয়া হয় কিসের জন্য শুনি? নবাবজাদার মতো তক্তপোষে গা ছড়িয়ে জিরোবার জন্য, নয়? যাও বেরিয়ে এক্ষুনি—

অমর বললে—তবে বাকি মাইনেটা দিয়ে দিন—

—মাইনে দেবে না আরো কিছু। যা বাকি ছিল, সমস্ত এই বেয়াদবির জন্য ফাইন,—কিছু পাবে না, যাও চলে।

দেনা টাকাটা দিয়ে নিশ্চয় আরেকবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে।

পশলা বৃষ্টির পর ঘোলা আকাশে চাঁদ উঠেছে,—মরা, মিউনো,—পথের পাঁককে ঠাট্টা করতে। হাঁপানির টানে কাঁকড়ার মত কুঁকড়ে অমর নিঃশ্বাসের জন্য ফুসফুসের কসরৎ করছিল। চোখ বুজে খালি একটি ছবি আজ ও দেখছে—বিষণ্ণ অথচ একটি সুকোমল ছবি।

বন্ধু মৃত্যুশয্যায়। অমর দেখতে গিয়েছিল। শেফালির মতো শাদা ধবধবে বিছানা,—তার ওপর এলিয়ে আছে ক্লান্ত তনুর কমনীয় কান্তি,—ভাটায় জলস্রোত যেন জিরোচ্ছে। চারপাশে রাশি রাশি ফুল স্তূপীকৃত হয়ে আছে,—বাতাস মন্থর হয়ে গেছে তাই। কারো মুখে একটি রা নেই. সবার মুখে নম্র বেদনার শীতল একটি ছায়া—সমস্ত গৃহে বিষাদপূর্ণ একটি মহাশান্তি। শিয়রের ধারে খানকয়েক বই—আত্মীয়ের মত স্তব্ধ বেদনায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে, আর কয়েকখানি পুরোনো চিঠি। নিষ্ঠুর ডাক্তার পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে আছে—মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে।

শুধু, পায়ের ওপর দুটি হাত রেখে একটি দুঃখী মেয়ে বোবার মতো বসে আছে—যেন বিসর্জনের প্রতিমা। মুখখানি ভারি মলিন ও উদাস, তাইতে এত সুন্দর।—মা নয়, বোন নয়, বউ নয়, যেন আর কেউ।

অমরের সেদিন মনে হয়েছিল,—মৃত্যুও একটা বিলাসিতা। মেয়েটির বুকের ব্যথাটি যেন এক অমূল্য বিত্ত। এ ত মরা নয়, মিশে যাওয়া। যেমন মিশে যায় ফুলের গন্ধ বাতাসে,—যেমন গলে যায় সূর্যাস্তলালিমা অন্ধকারে।

সন্ধ্যায় টানটা ফের পড়লে অমর বালিশের তলা থেকে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি বার করে ঠিকানা ঠাহর করতে চলল।

মা প্রশ্ন করলেন—কোথায় যাচ্ছিস?

—পাত্রীর খোঁজে। তোমার কত দিনের ইচ্ছা। অপূর্ণ রাখা অনুচিত মনে হচ্ছে।

এক কালে অবস্থা ভালো ছিল, বাড়ির চেহারা দেখলে বোঝা যায়। এখন একেবারে গঙ্গাযাত্রী বুড়ি।

এখনো পাত্র জোটেনি। অমরের যেন একটু আসান হল।

বহু কথা-বার্ত্তার পর শ্যামাপদবাবু বললেন—ছেলেটি কি করেন? কত চাহিদা?

—বি-এ পড়ে। এত দিন মার গয়না বাঁধা দিয়ে চলছিল—আর চলে না। চাহিদা,—পড়া খরচ দু বছর,—আর নগদ হাজার খানেক টাকা।

শ্যামাপদবাবু তাতেই স্বীকৃত ছিলেন। তার কারণ আছে,—দরাদরি করতে গিয়ে কেবলই দাঁও ফসকেছে। তা ছাড়া মেয়ের ইতিহাসও বড় ভালো

নয়; দেখতে ত নিতান্ত কুরুপাই,—এত কুৎসিত, যে, ঘাটের মড়ার পর্যন্ত নাকি দাঁতকপাটি লাগে।

অমর বললে—ছেলেটির কিন্তু এক ব্যারাম আছে হাঁপানি। প্রায়ই ভোগে।

শ্যামাপদবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন—এমন আর কি শক্ত ব্যায়রাম। ওতে ত আর কেউ মরে না। বয়েস কালে সেরেও যেতে পারে। তা, আপনি কি ছেলের বন্ধু, মেয়ে দেখে যাবেন একেবারে?

অমর বললে—আজ্ঞে না, আমিই পাণিপ্রার্থী,—ওটা একেবারে বিয়ের রাতে সেরে ফেললেই চলবে। দিন ঠিক করে খবর দেবেন, ঠিকানা রইল।

শ্যামাপদবাবুর মনে অনেক প্রশ্ন ঘুলিয়ে উঠলেও কোনোটাই আমোল দিলেন না। খালি মেয়ে পার করতে পারবেন,—তাও অবিশ্যি, বাষট্টি বছরের বুড়োর কাছে নয়,—এই খবর গিন্নির কানে দিতেই গিন্নি উলু দিয়ে উঠলেন। বাড়িতে সোরগোল পড়ে গেল। বাড়ির এক কোণে একটি কুৎসিত কালো মেয়ে দীপশিখার মতো কেঁপে উঠল খানিক।

মা বললেন—জানা শোনা নেই, কেমন না কেমন মেয়ে,—একেবারে কথা দিয়ে এলি?

অমর রাগ করে বললে—আর তোমার ছেলেই বা কি গুণধর মা, যে একেবারে পরী তার ডানা দুটো সগগে ফেলে রেখে ফার্স্ট ক্লাশ ফিটনে চড়ে তোমার পদ্মবনে এসে দাঁড়াবেন! শাঁখ বাজাও মা। গুণে গুণে হাজারটি নগদ দাকা,—আর দু বচ্ছর পড়া খরচ।

মা অপর্যাপ্ত খুসি হয়ে গেলেন। বিয়ে হয়ে গেলে কাশী যাবেন, এ সঙ্কল্পও সম্ভব হল।

অমর বললে—তোমার ছেলের এই ত চেহারা,—একটা আরসুলার চেয়েও অধম। তার ওপর বুকের পাঁজরায় ঘুণ ধরেছে। যা পাও, তাই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ো।

মা বললেন—মেয়ে যদি খোঁড়া হয়?

—কি যায় আসে তাতে? তোমার ছেলে যে কুঁজো। টাকাগুলি ত চকচকে হবে।

সরোজ বললে—কবে প্রেমে পড়লে হঠাৎ? ফরদা হাওয়ায় পর্দা বেফাঁস হয়ে গেল বুঝি?

লুসী সে ঘরে বসেই সেলাইয়ের কল চালাচ্ছিল, বললে—কবে পড়েছেন উনি পাঁজি দেখে তারিখ লিখে রেখেছেন কি না! আর জন্মে পড়েছিলেন, এ জন্মে পেলেন।

সরোজ বললে—পড়তে মন যাচ্ছিল না মোটেই, ঘুম পাচ্ছিল। লুসীকে বললাম,—কল চালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে, দিদি। এবার থামাতে পারিস, আমি অমরের সঙ্গে বেরোচ্ছি। দে ত চাবিটা।

দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল।

পিঠের ওপর চুল মেলা, মাদ্রাজি মেয়েরা যেমন করে শাড়ি পরে তেমনি ধরন শাড়ি পরার, দুটি হাতে সোনার কঙ্কণ, ছুঁচে সুতো পরাবার সময় চোখের কি তীক্ষ্ন দৃষ্টি। ললাটে আভা!

ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিসই সওদা করলে দুজন,—বাক্স বোঝাই করে। টোপর পর্যন্ত। তিনটে মুটে।

ফেরবার মুখে আরেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বয়সে কিছু বড়।

অমরকে জিজ্ঞাসা করলে—কি করছ আজকাল?

—বিয়ে করছি। চূড়ান্ত। আর তুমি? টিউশানি পেলে?

—পেয়েছি একটা। যৎসামান্য। ঐ গলির বাঁকের লাল বাড়িটা।

—ও! কত দেয়?

—কিঞ্চিৎ। ল-কলেজের মাইনে সাড়ে সাত টাকা।

সরোজ চোখ বড় করে বললে—সাড়ে সাত টাকা?

লজ্জিত না হয়েই বললে বন্ধু—হ্যাঁ, তাই সই। মাইনেটা ত চলে যায়। আর কি বেয়াড়া এঁচড়ে-পাকা ছেলেই পড়াতে হয়, ভাই। এইটুকুন বয়েস থেকে পদ্য মেলাতে শিখেছে। ভাগ্যিস বাপ মার 'নাই' নেই এতে, নইলে উচ্ছন্নে যাবার সুড়ঙ্গ খোঁড়া হচ্ছিল আর কি! মা বলে দিয়েছেন, ফের পদ্য মেলালে বেত মারতে। তিনটে খাতা প্রায় ভরতি করে ফেলেছে, ভাই। সবগুলি পুড়িয়ে ফেলেছি কাল।

অমর বললে—খুব কাঁদলে?

—বাপের চড় চাপড়ও ত কম খায়নি। মা তার হাতের নোড়া নিয়ে পর্যন্ত তেড়ে এসেছিল। কবিতা লিখতে গিয়েই না ছেলেটা এবার অঙ্কে একেবারে গোল্লা পেলে।

অমরের মনে পড়ছিল, সেই খাকি রঙের সার্ট, কোমরে কাপড়ের সেই ছোট আলগা বাঁধুনিটি,—সেই তরল জ্যোৎস্নার মতো দুটি চোখ সেই বালি কাগজের ছেঁড়া-খোঁড়া খাতাটি, পেন্সিল দিয়ে লেখা কবিতা, নাম—"বড়দি বা বড় তারা",—এক দিন ছোট্ট কচি হাতখানি দিয়ে বুকটা আস্তে একটু ডলে দিয়েছিল—

অমর ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললে—রোজ শেষ রাত্রেই হাঁপানিটা চেগে আসে। একটা ইনজেকশান দিয়ে দিন, যাতে অন্তত আজ রাতটা রেহাই পাই। আমার বিয়ে কি না।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন বটে। যাবার সময় অমর টেবিলের ওপর একটা নিমন্ত্রণপত্রও রেখে গেল।

বউ-ভাতে ত কাউকে খাওয়াতে পারবে না, তাই যার সঙ্গে একটি দিনের জন্যেও প্রীতি-বিনিময় হয়েছিল তাকে পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করলে। টাইম-অনুসারে একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে কি সুখ!

রাজা।

কেন নয়? সবার চেয়ে উঁচু জায়গায় আসন, সামিয়ানা খাটানো, তাতে তিনটে ঝাড়-লন্ঠন ঝুলছে, ফুলদানিতে বিস্তর ফুল, গলায় প্রকাণ্ড মালা, গায়ে সিল্কের দামী জামা, জীবনে এই প্রথম পরেছে, পায়ে চৌদ্দ টাকা দামের জুতো,—দু-মাস টিউশানি করে যা জোটেনি।

ছেলেরা চেঁচামেচি করছে, মেয়েরা প্রজাপতির মতো উড়ছে ও বর্ষার জলধারার মতো কলরব করছে। বন্ধুরা এসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে যাচ্ছে। চিকের পেছনে বর্ষীয়সী মেয়েদের ভিড় লেগে গেছে,—উলু দিয়ে গলা ভেঙে ফেলছে। উলু দিতে গিয়ে কন্ঠস্বরটা বিকৃত হয়ে গেল দেখে একটি মেয়ের স্রোতের মতো কি স্বচ্ছ হাসি!

এ বাড়িতে আজ সেখানে যা হচ্ছে সবই ত অমরের জন্য। খাবার নিয়ে আঁস্তাকুড়েতে কুকুরগুলি যে লড়াই বাধিয়েছে, তাও। যা কিছু বাজনা, যা কিছু হাসি, যা কিছু কোলাহল!

ঐ যে নিভৃতে দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী দুটি হাত তুলে চুলের খোঁপাটা ঠিক করে গুছিয়ে নিচ্ছে, চুলের কাঁটাগুলি ফের ভালো করে গুঁজে দিচ্ছে—সেও ত তার জন্য!—অমর ভাবছিল। নইলে আজ মেয়েটি কখনো এই নীল শাড়িটি পরত না, মাথায় কখনো গুঁজত না ঐ শ্বেতপদ্মের কুঁড়ি।

শুভদৃষ্টির সময় সবাই বললে বটে, কিন্তু অমর ঘাড় গুঁজে রইল, মুখ তুলে চাইল না। পাছে ভুল ভেঙে যায়! খালি একটি কথাই মনে পড়ছিল তখন।

লুসী জিজ্ঞাসা করেছিল—কি নাম আপনার বউয়ের?

অমর বলেছিল—মনোরমা।

লুসী খপ করে বলে ফেলেছিল—ওমা! আমারো ভালো নাম যে তাই। বলেই রাঙা হয়ে উঠে মুচকে হেসেছিল একটু।

পাছে তেমনি রাঙা হয়ে উঠতে না পারে। পাছে—

মনোরমা নিজে কুৎসিত হলেও আশা করেছিল ছবির পাতায় রাজপুত্রের যে ছবি দেখেছিল, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া না হলেও তেমনিই সুকান্ত হবে তার প্রিয়তম! ভাবলে—কড়ে আঙুল দিয়ে কপালে এক টোকা মারলেই ঘাড় গুঁজে পড়ে যাবে বুঝি।

তবুও ত স্বামী। ডাক্তার এসে আর দড়ি দিয়ে কপাল বেঁধে দেয় না, সারারাত্রি মনোরমাই কপাল টিপে দেয়। কখনো অনাবশ্যক বল প্রয়োগ করে বসে। রাগ করেই হয় ত।

অমর সব চেয়ে ঘৃণা করত নিজের কদর্য ব্যাধিটাকে। আর ঘৃণা করে, যে মুখটা তার সত্যিই বত্রিশটা দাঁত আছে কি না অন্যকে গুণে দেখাবার জন্য সর্বদাই মেলে রয়েছে,—সেই মুখটাকে। মনোরমা নাম বদলে নাম রেখেছে তিলোত্তমা!

মা কে'দেছিলেন বটে একটু, এক ফাঁকে এক এক করে নোটগর্নলি গর্নেও নিয়েছিলেন বার চারেক।

হঠাৎ এক দিন কয়েকখানি আঁচলের খর্টে বে'ধে কাশী চলে গেলেন। বলে গেলেন—বউ ত হয়েছে। রে'ধেও দেবে, বর্কে মালিশও করবে।

শ্যামাপদবাবর এসে মেয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। অমর আপত্তি করলে না। বললে—এ ক দিন না হয় কোনো একটা মেসেই থাকব। কারো হাত বর্লিয়ে না দিলেও চলবে। তবে শিগগিরই যেন আসে।

বাড়ি ফিরে এসে শ্যামাপদবাবর মনে মনে বলছিলেন—বাবাঃ, কাঁটাটা ত খসেছে গলা থেকে! বন্ধর্দের বললেন—দর্মণ বস্তাও পিঠে করে বওয়া যায়—কিন্তু এই কুৎসিত মেয়েটা কি হয়রানি করেই মেরেছিল! তবর যদি—

তারপরের ব্যাপারটা একটু আকস্মিক বটে কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

সন্ধ্যার দিকে রাস্তাতেই খর্ব জাঁক করে হাঁপানি উঠে গেল। একটা গাড়ি ঠিক করতে রাস্তার মধ্যে আসতেই বেহর্সের মত একটা মোটর অতি আচমকা একেবারে হর্ড়মর্ড়িয়ে পড়ল কাঁধের উপর। তারপর ঘষড়াতে ঘষড়াতে—

শ্যামাপদবাবর্র কাছে খবর গেল। মনোরমা একবার যেতেও চাইল কে'দে। বাপ বর্ঝিয়ে বললেন,—এখন গিয়ে কি আর এগোবে বল? গঙ্গায় না হোক কলতলাতেই শাঁখা ভাঙলে চলবে। পানটা আর চিবোসনি মা—

মার কাছে তার পে'ছিল না। ঠিকানা বদল করেছেন।

আরো একবার রাজা। সবার কাঁধের উপর।

ওর জন্যেতো আজকের সর্য অস্ত যাচ্ছে। ওর জন্যেই তো লর্সীর চোখে এক বিন্দর অশ্রর।

৯২। প্রাসাদশিখর

অনেক খর্জে-পেতে বাড়ি বের করেছে। সে কি একটা গলির মধ্যে তেতলার ফ্ল্যাট। ঢর্কতে যেমন মনে হয়েছিল উঠে এসে তত খারাপ লাগল না। বেশ ফাঁকা নিরিবিলি। এমনি একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পরিবেশেই সর্প্রিয়কে মানাবে বর্ঝেছিল গর্রর্দাস।

তিন রর্মের ফ্ল্যাট।

প্রথমে ঢুকেই বসবার ঘর। সর্প্রিয় আছে?

চাকর এসে বললে, বাবর পর্জোর ঘরে আছেন। বসর্ন।

দর্ঘণ্টার উপর বসে আছে গর্রর্দাস। উঠে যায়নি। বিরক্ত হয়নি। বই-পত্রিকা এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করেছে। এক সময় চা ও জলখাবার দিয়ে

গিয়েছিল চাকর, তাই খেয়েছে। সিগারেট পুড়িয়েছে গোটাকতক। এমনি বসতেই হবে দরকার হলে এমনি একটা সমর্পণের ভঙ্গি গুরুদাসের। কাজটা জরুরি।

চাকর এসে বললে, বাবু জিগগেস করলেন আপনার নাম কি?

নাম বললে।

চাকর ফিরে এল। আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন।

ছোট একটা প্যাশেজ পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকতে যেতেই সুপ্রিয় চেঁচিয়ে উঠল, জুতো খুলে এস।

জুতো খুলল গুরুদাস। খোলাই উচিত। যার যেমন শুচিতার রুচি তার মান রাখা দরকার।

পাশের ঘরেই সুপ্রিয়র শোবার ঘর। শোবার ঘর না শুভ্রতার মন্দির। একটি যুগল-শয্যার খাট, সামনে একটা ডিভান। গোটা দুই গদিমোড়া টুল। একপাশে টেবিলের উপর সুপ্রিয়র স্ত্রীর একটি বড় বাঁধানো ফটো। একপাশে রুপোর সিঁদুরের কৌটো। ফোটোর ললাটে সিঁদুর পরানোর দাগ।

ওদিকের ঘরটা পুজোর ঘর। পুজোর ঘরই বটে। সবচেয়ে ভালো ঘর। পুব আর দক্ষিণ খোলা। ভালো ঘরটি নিজের শোবার জন্যে না রেখে দেবতার জন্যে রেখেছে এটা একটু অভিনব লাগল। তা সুপ্রিয়র অনেক কিছুই অভিনব।

পুজোর ঘরের চারদিকে দেয়াল পটে-চিত্রে বোঝাই। মাঝখানে মেঝের উপর একটি কম্বল পাতা। আসনে দৃঢ়ীভূত হয়ে তন্ময় জপসাধনই আমার পুজা।

কী হয় এতে?

আর কিছু নয়, সুখ হয়! বাঁধাবরাদ্দের উপর সকলেই একটু উপরি-পাওনা খোঁজে। সেই উপরি-পাওনার সুখ।

ঈশ্বরকে পাবার মানে কি? কত লোকে, কত রকম প্রশ্ন করে। চাকরি পাওয়া বুঝি, বাড়ি পাওয়া বুঝি, বিষয় পাওয়া বুঝি—

ঠিক ঠিক। ও সব তো আছেই, তার উপরে এই একটু সুর পাওয়া, স্পর্শ পাওয়া। সেই মা আছেন অনেক ছেলের সংসারে, অন্নজল পরিবেশন করছেন সবাইকে, কে আর মায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করে সচেতন? এরই মধ্যে এক ছেলে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, মার মুখের কথা শুনল। অন্নজলের সংসারে একটু অতিরিক্ত সুর, অতিরিক্ত স্পর্শ আদায় করে নিল। সেই অতিরিক্তটুকুই ঈশ্বর।

কিন্তু যখন অন্নজল নেই?

ঈশ্বরও নেই।

গুরুদাস এসব তার্কিকের দলে নয়; সন্দেহ করে সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাও করে। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে সুপ্রিয় তার বন্ধু, আলাদা বিভাগে হলেও একই

প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, উঁচু ধাপের অফিসার সুপ্রিয়—এবং সর্বোপরি, আজকে তো তর্কের কথা উঠতেই পারে না।

কি খবর? বিশুদ্ধ চিন্তায় মনে যে লাবণ্য আসে সেইটিই কান্তি হয়ে ফুটেছে সুপ্রিয়র দেহে-মুখে।

তুমি ক্ষণু, ক্ষণিকাকে চেন?

কে ক্ষণিকা?

আমার ভাগ্নী—

চোখ বুজল সুপ্রিয়। সেই যার ডাকনাম টেঁপী।

হ্যাঁ, তার খবর শুনেছ?

না।

তার স্বামীটি মারা গেছে।

কদ্দিন?

এই বছর খানেক।

কিসে?

য়্যাকসিডেন্টে—

কি জাতীয় দুর্ঘটনা বিশদ করে বলতে চাইছিল গুরুদাস, সুপ্রিয় বাধা দিল। বললে, বুঝেছি। অপঘাত।

তুমি তার স্পিরিট—আত্মা আনতে পারো?

আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

ভীষণ দমে গেল গুরুদাস। গলার স্বর বেরুল কি বেরুল না: কেন?

প্রেতলোকের বাসিন্দেরা বারে বারে একটা খবরই দিয়ে গেছে, ঈশ্বর আছেন, তাঁকে ডাকো তাঁকে ধরো। আমাদের ডেকে আমাদের ধরে লাভ নেই।

সে খবরের জন্যে প্রেতলোকে যেতে হবে কেন?

না, ওরা বলে, আমরা রাজধানীর কাছাকাছি আছি, তোমরা আছ অজ পাড়াগাঁয়ে। আমাদের থেকে খবর নাও, লাটসাহেব আছেন। আমরাই নির্ভরযোগ্য খবর দিতে পারি। আমাদের কেউ কেউ দেখেছে তাঁর মোটর-গাড়ি তাঁর পাইকপেয়াদা। এই খবর পেয়ে এখন ওদিকে এগোও। তাই এখন সেই চেষ্টাই করছি। কিভাবে চেষ্টা করতে হবে তারও কিছু কিছু পাঠমালা পৌঁছে দিয়েছে দয়া করে—তা ছাড়া—

তা ছাড়া—কান খাড়া করল গুরুদাস।

তা ছাড়া, যাকে ধরবার জন্যে প্রেতচর্চা, তিনিই কখন-সখন দেখা দেন মূর্তি ধরে।

দেখা দেন? প্রায় লাফিয়ে উঠল গুরুদাস। কে, তোমার স্ত্রী?

হ্যাঁ। শাশ্বতী।

কদ্দিন মারা গেছেন?

দেহ রেখেছেন। এই দুবছর।

দেখা দেন, কথা হয় তাঁর সঙ্গে?

কথা হয় বৈকি। শুধু ছুঁতে দেন না। ছুঁতে চাইলেই নিষেধ করেন। কতদিন সিঁদুর দিতে গিয়েছি, সরে গিয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে এগোতে গেলেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

কে জানে কাব্যকথা হয়তো। তবু দিনের বেলায়ই কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল গুরুদাসের। বললে, তুমি অনেক উঁচুয় উঠে গিয়েছ। কিন্তু মেয়েটার প্রতি যদি একটু কৃপা করো।

খুব কান্নাকাটি করছে? খুব কান্নাকাটি করলে আসতে চাইবে না আত্মা।

না, এতদিনে সে ঝড়ের অবস্থাটা গেছে। তবু শোকের তো আর শেষ নেই। শেষ সময়ে কাছে ছিল না, একটা কথা বলে যেতে পারল না, শুনে যেতে পারল না—তারই জন্যে একটু আনতে চায় শুনতে চায়। যদি একটু সান্ত্বনা দিতে পারো—পরোপকার—

এই স্পিরিট আনার ব্যাপারটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। ঠিক রেডিওর কান্ড। এক পারে একটা ট্র্যানসমিটিং স্টেশন, আরেক পারে একটা রিসিভিং সেট। একটা পাঠাবার যন্ত্র, আরেকটা ধরবার। দুটোই নিখুঁত হওয়া চাই। যে আসবে তারও চাই ব্যাকুলতা আর যে আনবে তারও চাই তেমনি সুরবাঁধা দেহ। এপারের দেহ যদি শুধু কাঠ হয় ধ্বনি শোনা যাবে না, তেমনি ওপারের বিদেহ যদি উৎসুক না হন তা হলে অবস্থা হবে বাজনা আছে বাজিয়ে নেই। সুতরাং দুয়ের যোগ হলেই শুভযোগ। যদি কোথাও দেখ ফল হয়নি, জানবে যন্ত্রের গোলমাল। যন্ত্র যত জোরালো ততই নির্ভুল সাড়াশব্দ।

তা হলে তুমি একদিন বসো।

আমি বসলে হবে কেন? ক্ষণিকার স্বামী কি আমাকে চেনে? আমার কাছে আসতে তার আগ্রহ হবে কেন? ক্ষণিকাকে বসতে হবে।

বা, ক্ষণু তো বসবেই। কখন বসতে হবে বলো, কবে?

প্রথম একবার বসলেই কি পাওয়া যাবে? তার জন্যে আগে একটু কাঠ-খড় পোড়ানো চাই।

যথা?

একজন গাইড ধরতে হয়। আমাদের বৈঠকে পরিচিত এমন কেউ। সে আগে খুঁজে বের করবে কোন ঠিকানায় রয়েছে ক্ষণিকার স্বামী। কি নাম বললে?

শমীন্দ্রনাথ—

ওতেই হবে। খুঁজে পেলে তারিখ ও সময় ঠিক করে যাবে কখন তাকে আনতে পারবে পৃথিবীতে। সেই অনুসারে বসলে পাওয়া যাবে শমীন্দ্রকে। নচেৎ নয়।

এমন গাইড হবে কে?

ফ্রেন্ডলি গাইড চাই। সে আমার স্ত্রীকে বলা যাবেখন। সে আনতে পারবে খুঁজেপেতে। তুমি আগে শমীন্দ্রের [illegible] আমাকে দিয়ে যাবে। কবে কোথায় জন্ম, কবে কোথায় মৃত্যু, বাপ-ঠাকুরদার নাম কি, বাড়ি কোথায়, কি কাজ করত, কত বয়স, যতদূর যা সম্ভব। এসব একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে এনে বলে দেব। তিনি খুঁজে দেখবেন। কখনো-কখনো বের করতে দেরি হয় কখনো বা পাওয়াই যায় না, আবার কখনো বা চট করে পেয়ে যায় হাতের কাছে। খুঁজে পেলে তিনি জানাবেন কবে কখন বসতে হবে।

যে সব বিবরণ দরকার আমি এখুনি দিয়ে যাচ্ছি।

লিখে দাও। সম্ভব হলে শমীন্দ্রের একটা ফোটোও দিয়ে যেও। লোকটিকে দেখে যেতে পারলে আমার স্ত্রীর পক্ষে সুবিধে হবে।

তারপর দিনক্ষণ ঠিক হলে কি করতে হবে?

হ্যাঁ, আগে থেকেই বলে রাখি, একটি ঠাকুরঘর চাই বাড়িতে। আছে?

তা কোন না আছে?

নিশ্চয়ই নিচের তলার কোণের ঘরটিতে, সিঁড়ির নিচে, তাই না? হাসল সুপ্রিয় : যে তলাতেই থাক সে তলাতেই বসতে হবে।

আবার পুজোর ঘর লাগবে কেন?

বলা মুশকিল। কোথাও একটু শুচিতার পরিবেশ চায় হয়তো।

আর?

সেদিন বলে দেব। বিশেষ হ্যাঙ্গাম নেই। এস কদিন পর।

কদিন পরে খোঁজ নিতে এল গুরুদাস।

সব ঠিক আছে। শাশ্বতী দেখা পেয়েছে শমীন্দ্রের। আগামী বুধবার রাত নটার সময় আসবে।

আসবে?

তাইতো বলে গিয়েছে। ঘোরাঘুরি করতে হয়নি, সহজেই পেয়ে গেছে।

সত্যি? পাওয়া গেছে? ক্ষণিকার উৎসাহেরই যেন প্রতিধ্বনি করল গুরুদাস।

বসলেই বোঝা যাবে কতদূর কি হয়।

এখন কি করে বসতে হবে বলো।

কিছু নয়। একটা টেবিল যোগাড় করো। চারপেয়ে টেবিলেই চলবে। যে কোনো সাইজের যে কোনো ওজনের। বেশি বড় ও ভারি টেবিল নিলে বেশি শক্তিশালী রিসিভিং সেট দরকার। ওপারেও চাই বেশি স্পিরিটের জনতা। নইলে নড়বে কি করে? আর, না নড়লে স্থূলজ্ঞানে প্রমাণ হবে কি করে যে তারা এসেছে? সুতরাং ছোট দেখেই টেবিল নিও। কিছু ধূপকাঠি, গঙ্গাজল, লেখবার কাগজ, পেন্সিল—এই আর কি।

শুধু এই?

হ্যাঁ, দেখো ঘটা করে যেন বেশি লোক জমায়েৎ কোরো না। কৌতূহলীকে প্রেতাত্মারা ভীষণ অপছন্দ করে, ভালোবাসে বিশ্বাসীদের। কৌতূহলীর ভিড়ে আসতে চায় না, বিশ্বাসীর দলে আরাম পায়। এ ঠিক আমার তোমার মনোভাব। সেই আড্ডায় আমরা যেতে চাই না যেখানে আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখে। সেই আড্ডায়ই আমরা যেতে চাই যেখানে আমরা সুস্বাগত। কোথায় বসবে?

ক্ষণু এখন বাপের বাড়িতে আছে সেইখানে। কিন্তু কে কে বসবে?

ক্ষণিকা আমি তুমি ও আরেকজন।

ওরে বাবা, আমি পারব না।

কেন, ভয় কি। নিজের হাতে দেখই না অনুভব করে ব্যাপার কি।

আচ্ছা, শুনতে পাই সবই নাকি অবচেতন মনের কাণ্ড?

বেশ তো, দেখই না পরীক্ষা করে। কতটুকু অবচেতন মন কতটুকুই বা অলৌকিক। কতটুকু বিজ্ঞান, কতটুকুই বা অবিজ্ঞেয়। তা ছাড়া মনের মত অলৌকিক আর কি আছে, তারই বা একটু হদিস নাও।

আর কিছু নির্দেশ আছে?

হ্যাঁ, তোমার ভাগ্নীকে বলবে সেদিন যেন উপোস করে থাকে। ঠিক নির্জলা নয় একটু লঘু আহার।

তা আর বলতে হবে না।

আর যেন খানিকক্ষণ হরিনাম করে। যতক্ষণ সম্ভব। বা যতক্ষণ ইচ্ছে।

আবার হরিনাম কেন?

এই একটা কিছু অনুরাগের ধ্বনি। ঈথরে একটু অনুকূল কম্পন। ভালো বেহালা বা বাঁশী বা শঙ্খধ্বনি করলেও হতে পারে! কিন্তু বলো তেমন করে ডাকতে পারলে হরিনামের মত প্রিয়নাম আর কি আছে!

বেশ, বলব।

এই শরীরটাকে একটু সুরে বেঁধে নেওয়া আর কি। একটা সূক্ষ্ম সুর ধরবে একটু তৈরি করে নেবে না যন্ত্রটাকে?

বরাদ্দ দিনে সুপ্রিয় গিয়ে দেখল আটদশজনের ভিড়। সবাই বললে, আমরা বিশ্বাসী, সশ্রদ্ধ, কেউই কৌতূহলী নই।

চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় না। কিন্তু সবাই কনিষ্ঠ আত্মীয়, কাকে ছেড়ে কাকে বারণ করবে। বসুক দূরে-দূরে, দেখুক, বুঝুক—

সমস্ত কিছুকে আড়াল করেছে ক্ষণিকা নিজে। এককথায় বলা যেতে পারে, শোকশ্রী। দুঃখ একটা আশ্চর্য শক্তি। আয়ত চোখে নিস্পৃহ স্নেহ, মুখমণ্ডলে অসঙ্কোচ ভক্তি। সমস্ত ভঙ্গিটিতে বিশ্বাসের নম্রতা। একেবারে যে নিরম্বু বিধবার সাজ পরে নি তাতে শান্তি পেল সুপ্রিয়। হাতে সোনার চুড়ি, ধোপভাঙা শাড়ির পাড়টি ঢালা সবুজ। ঠিকই করেছে। মৃত্যু বলে কিছু নেই। এ ঘর আর ও ঘর। এখুনি প্রমাণ পাওয়া যাবে হয়তো।

বেশ বড় ঘর। জানলা-দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। পুড়ছে ধূপকাঠি। চারপেয়ে টেবিল পড়েছে মাঝখানে। চারদিকে চারখানা চেয়ার। কাছে একটা টুলের উপর কাগজ-পেন্সিল। গুরুদাসকে জোর করে রাজি করানো হয়েছে, যদিও সে বলতে চেয়েছিল উপোস-টুপোস ধাতে সয়না আর [illegible] বানান শিখিনি এ পর্যন্ত।

আর চতুর্থ, ক্ষণিকার ছোট ভাই বিজন।

সুপ্রিয় বললে, আমাদের দুজনের উপোসেই হবে, আমার আর ক্ষণিকার। তোমরা শুধু পাশে বসে একটু হাত রাখো টেবিলে। অর্কেস্ট্রার হালকা বাজনা তোমাদের দিচ্ছি। পাশের ঘরে বা প্যাসেজে যারা বসেছে তাদের উদ্দেশ করে বললে, চুপচাপ থাকুন। আর যদি ভয় পাবার কারণ ঘটে দয়া করে ভয় পাবেন না।

লঘু উপেক্ষায় হাসল একটু সকলে। গুরুদাস বললে, টেবিলের উপর হাত রেখে শমীনের কথা চিন্তা করতে হবে তো?

মোটেই না। নেমন্তন্নের কার্ড আগেই পাঠানো হয়েছে। তারা তৈরি। এখন গাড়ি পাঠালেই হয়।

গাড়ি?

হ্যাঁ, ধ্বনির গাড়ি, ধ্বনির গাড়ি পৌঁছুলেই রওনা হবে। তবে একটা কথা বলে রাখি, ক্ষণিকাকে লক্ষ্য করল, যদি আসে কাঁদতে পাবে না।

না।

কান্না বলে কিছু নেই। অনন্ত জীবন, অনন্ত যাত্রা।

আর দেরি করে লাভ কি? ব্যস্ত হয়েছে ক্ষণিকা। আলোটা নিভিয়ে দেব?

বড় ভালো লাগল। বুজরুকি কিছু আছে আলো জ্বালা থাকলেও লোকে ভাববে। তবু ঘর অন্ধকার করবে না বলেই ঠিক করেছিল সুপ্রিয়। ক্ষণিকার এই প্রশ্নে সাহস পেল। যেন মমতার গভীর স্পর্শ বেজে উঠল কণ্ঠস্বরে। যেন যারা আসবে তারাই বলল। প্রথমটা বেশি আলো ভালো লাগে না। বহুদিন পরে নতুন পরিচয় একটি ধূসরতাই আশা করে হয়তো।

দাও। তার আগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও সকলের গায়ে।

এ আবার কেন? বলে উঠল গুরুদাস।

সংস্কার। বাতাসের সঙ্গে গন্ধ যায় তেমনি আত্মার সঙ্গে সংস্কার।

আলো নিভিয়ে দিল। এপাশে ওপাশে দু-একটা না-জ্বললে-নয় আলো জ্বলছে বাইরে। তবু যারা জমায়েৎ হয়েছিল জলের ছিটেয় কেমন একটু শিউরে উঠল। থমথমে হয়ে উঠল বাড়ির ভিতরটা। বোমা-পড়ো-পড়ো কলকাতার আকাশের মত।

টেবিলের উপর আলগোছে হাত রেখে বোস। যদি মন শূন্য করতে না পারো সমুদ্র ভাবো—

গাড়ি ছাড়ল সুপ্রিয়। অর্থাৎ দরাজ গলায় নামকীর্তন শুধু করল।

সভ্য সমাজে কিছুমাত্র সঙ্কোচ না রেখে কেউ গলা ছেড়ে নাম করতে পারে এ একেবারে ভাবনার বাইরে। একটা বিলিতি অফিসে সাহেব সেজে কাজ করে তার এ কি দুর্গতি। ভাবতে না ভাবতেই কাজ হল। হাতের নিচে টেবিলটা নড়ে উঠল। শুধু নড়ে উঠল না, থরথর করে হাঁটতে লাগল ঘুরতে লাগল, দুলতে লাগল নৌকোর মত। গুরুদাসের মনে হল পা তুলে তার কোলের উপরেই উঠে আসে বুঝি!

ভূত, ভূত—লাফিয়ে উঠে আলো জেবলে দিল গুরুদাস।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হল টেবিল। কিন্তু আবার গুরুদাস স্থির হয়ে বসে টেবিলে হাত রাখতেই টেবিল ফের নড়া শুরু করলে।

আলো থাক। বললে সুপ্রিয়। আলো বরং ভালোই করবে। বলে আবার হরিনামের ঢেউ তুললে।

তাকাল একবার ক্ষণিকার মুখের দিকে। চোখদুটি বোজা, মুখ যেন পাষাণ। যেন কোন গভীরের প্রতিলিপি!

যেমন ছন্দে নাম করে তেমনি ছন্দে টেবিল নড়ে। টেনে-টেনে বললে বিলম্বিত, তাড়াতাড়ি বললে দ্রুততাল।

সাবকনসাস মাইন্ড—চেঁচিয়ে উঠল গুরুদাস।

অমনি হাত তুলে নিল সুপ্রিয়। যে-মন রয়েছে আঙুলের আগায় সে-মনকে সরিয়ে নিল। আর হাত তুলে নিতেই টেবিল হাঁটতে লাগল নিজের থেকে, এঁকে-বেঁকে ঘুরতে-ঘুরতে এগুতে লাগল প্যাসেজের দিকে।

প্যাসেজের লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল। কিন্তু কথা রেখেছে, চেয়ার সরানোরই যা শব্দ করেছে হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ করেনি। অজ্ঞান হয়ে পড়েনি।

কতদূর গিয়ে থেমে পড়েছে টেবিল। সুপ্রিয় উঠে গিয়ে তাতে আবার হাত রেখে নামের সঞ্চার করে দিল। আবার টেবিল শুরু করল চলতে।

ওদিকে যাচ্ছে কেন?

জিগগেস করো তো ওদিকেই ঠাকুরঘর কিনা।

ঠিক। প্যাসেজের পারেই ঠাকুরঘর। কি আশ্চর্য, কে সেটিকে বন্ধ করে রেখেছে বাইরে থেকে তালা দিয়ে। টেবিল নিজে থেকে দরজায় ধাক্কা মারছে। একবার দুবার—শিগগির খুলে দাও দরজা।

দরজা খুলে দিল। আবার তাকে ছুঁয়ে দিল সুপ্রিয়। টেবিল ছুটে উঠল গিয়ে সিংহাসনে। বাসনকোসন সব তছনছ করে দিল। প্রণামের ভঙ্গিতে পড়ল নত হয়ে।

দু-বাহুর মধ্যে করে টেবিলকে তুলে নিয়ে এল আগের ঘরে। সুপ্রিয় বললে, ঠাকুর-প্রণাম হয়েছে, এখন শান্ত হও।

ডাক্তার, ডাক্তার—কে কোথায় শান্ত হবে! কে একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। জল, জল, পাখা—

আবার আসন ছাড়ল সুপ্রিয়। কাছে গিয়ে বললে, কোনো ভয় নেই।

ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি। এ অবস্থায় কি করতে হবে, তা আমাকে শেখানো আছে। কেন যে সব ভিড় করতে আসে। বলে, বিশ্বাসী! বিশ্বাসী কখনো অজ্ঞান হয়? বলে সংজ্ঞাহীনের কানে কি মন্ত্র পড়ল সুপ্রিয়। মুহূর্তমধ্যে লোকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। বললে, না, কিছু না।

আবার এসে বসল চেয়ারে। বললে, আর জ্বালিয়ো না, এবার দুটো মনের কথা খুলে বলো। কাকে দিয়ে লেখাবে? আমি এক, গুরুদাস দুই বিজন তিন, ক্ষণিকা চার। টেবিলে শব্দ করে জানাও।

ঠক ঠক ঠক ঠক।

পর পর চারবার টেবিলটা নিজের থেকে বেঁকে গিয়ে পায়া ঠুকে শব্দ করলে।

এতটুকু ঘাবড়াল না ক্ষণিকা। কাগজ-পেন্সিল কুড়িয়ে নিল হাত বাড়িয়ে।

নিজের থেকে কিছু লিখো না। কেউ হাত ঘুরিয়ে লেখাতে চাইলেও বাধা দিও না।

তুমি কে? জিগগেস করলে ক্ষণিকা।

ক্ষণিকার হাতে লেখা হল : আমি।

আমি কে?

ক্ষণিকা আবার লিখলে : ও, গলার আওয়াজ তো তুমি শুনতে পাচ্ছ না। আমি—ইংরিজি-বাঙলায় বড় বড় হরফে ক্ষণিকা লিখলে : শমীন্দ্রনাথ—

তুমি যে সত্যি সেই, তা কি করে বুঝব?

নিজের হাতে লিখে যাচ্ছে ক্ষণিকা : আমার ম্যারেজ য়্যাণ্ড মর‍্যালস বইয়ের ফাঁকে দশ টাকার তিনখানা নোট গোঁজা আছে। দেখ, পাবে।

সে বই তো তোমাদের বাড়িতে। কি করে দেখব?

না। সে বই তুমি তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছ পড়বার জন্যে। তোমার বাক্সেই সেটা আছে। দেখ খুলে।

বাক্স খোলা হল। পাওয়া গেল বই। বইয়ের পৃষ্ঠার ভাঁজে তিরিশ-তিরিশটা টাকা।

আরো অনেক সব প্রমাণ। চশমার খাপে সোনার বোতাম পড়ে আছে দেখ। ফাউন্টেন পেনের কালির বাক্সের মধ্যে ড্রাইং-ক্লিনিংএর রসিদ। কার কাছে কটা টাকা পাবে। কোন ব্যাঙ্কে পড়ে আছে কিছু তলানি। অনেক সব অন্তরঙ্গ কথা। কেমন আছে? কোথায় আছে? ওটা কোনো রকম থাকা নাকি? কি করে? কি ভাবে? কেন চলে গেল অকালে?

আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো।

টেবিলটা নিজের থেকে লাফিয়ে উঠল দুবার। লেখা বেরুল ক্ষণিকার হাতে : এই দুর্লভ জীবন স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে নষ্ট কোরো না। জীবনে-যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মত বয়ে যাও হু হু করে।

বেশ বলেছ। মুখে বলল ক্ষণিকা। কোথায় আমার শান্তি? আমার আশ্রয়!

স্পষ্ট লিখছে ক্ষণিকা নিজের হাতে : যে মহদাশয় এসেছেন তোমার ঘরে তাঁকে ধরো, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নাও, নাম নাও, মন্ত্র নাও—সেইখানেই তোমার পরা-গতি, পরা-সিদ্ধি—

পেন্সিলটা থামাল জোর করে। বললে, আমাকে দেখা দিতে পারো?

লেখা হল : পারি।

পারো?

হ্যাঁ, তবে এ বাড়িতে নয়।

কোথায়?

সুপ্রিয়বাবুর বাড়িতে। সেখানে প্রেতাত্মারা আসে। তাঁর স্ত্রী আসেন। পুণ্যস্থান। সেখানে দেখা দেওয়াই সহজ। দিন-ক্ষণ আমি বলে দেব স্বপ্নে—

ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্ষণিকা। বললে, না, না, এখানে এ বাড়িতে দেখা দেবে। আমার নির্জন ঘরে। নয়তো ছাদের উপর। মধ্যরাতে শেষরাতে। স্বপ্নে নয়, স্বপ্নে দেখে শান্তি নেই। বাস্তব চোখে দেখতে চাই, ধরতে চাই—

হঠাৎ লেখা পড়ল : আমরা এবার যাব। মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

আর কারু কথা। সুপ্রিয় বললে, শাশ্বতীর।

এবার ছেড়ে দিন। পড়ল শেষ লেখা।

হাত ছেড়ে দিল। পুরো কথাটা শেষ হতে পারল না।

হাত তুলে নিতেই টেবিল আবার ছুটল ঠাকুরঘরের দিকে। ঠাকুর-প্রণাম করে যাবে। এবার ঘর খোলা, লোকজনের মন বিগলিত, সহজেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারল ভিতরে। নুয়ে পড়ে প্রণাম করল টেবিল।

গুরুদাস বললে, অপরিমেয় ব্যাপার।

ডিভানে বসে আছে শাশ্বতী।

আমি জানি আজ রাতে তুমি আসবে। দেখা দেবে। স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে কাল। পুজোর ঘর থেকে মাতালের মত বেরিয়ে এল সুপ্রিয়। গভীর ধ্যানের পর দেহে-মনে অপার্থিব মাদকতা আসে, পা টলে। দেয়াল ধরে ধরে এগুতে হয়।

ঘরে মৃদু নীল আলোটি জ্বলছে। চাঁদের আলোও মিশে গেছে নীল হয়ে।

এস, আজ দিনটি তো জানো, তোমাকে পরিয়ে দি সিঁদুর।

আর-আর দিন নড়ে-চড়ে ওঠে। আজ স্থির হয়ে বসে রইল। ছোঁয়ার ভয়ে পালিয়ে যায়, আজ যেন ছায়ারই প্রাণ নেই।

রুপোর কৌটো খুলে আঙুলে করে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল কপালে।

এ কি, স্পষ্ট ছোঁয়া যায় যে। কঠিন মাংসল কপাল। স্পষ্ট চুল, স্পষ্ট সিঁথি।

তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে ঝাঁজালো আলোটা জ্বালাল সুপ্রিয়।
চেঁচিয়ে উঠল নারীমূর্তি : এ কি, স্বপ্ন তো আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু আমি তো শাশ্বতী নই, আমি ক্ষণিকা।
কেন এ রকম হল কে জানে! আচ্ছন্নের মত বলল সুপ্রিয়, তবে, চিরকালই আজ যা ক্ষণিকা, কাল তা শাশ্বতী।

৯৩। তদবির

সতীপতি চোখ তুলে তাকালেন। লোকটাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।
'একবার একটা মামলা নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।' হীরালাল বললে হাতজোড় করে : 'আবার আরেকটা এনেছি।'
কাগজপত্রে এক পলক চোখ বুলিয়েই সতীপতি বললেন, 'এ মামলা আমার কাছে কেন? আমি তো উপরের কোর্ট।'
চোখ-মুখ অসহায় করল হীরালাল। বললে, 'আপনাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না।'
'এ মামলা হবে কোর্ট অফ ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে।'
'সেটা আবার কী!' হীরালাল হাঁ হয়ে রইল।
'মানে নিম্ন আদালতে।' সতীপতি হাসলেন : 'তারপর সেখানে হেস্তনেস্ত হবার পর আমার পালা।'
'এত টাকার দাবি, তবু নিচুতে যেতে হবে?' অপমানের মত লাগল বুঝি হীরালালের।
'আমার আপনার ইচ্ছেয় তো হবে না।' বললেন সতীপতি, 'আইন টেনে এলাকা ভাগ করে দিয়েছে। বিবাদীর সঙ্গে চুক্তি যেখানে, বিবাদী যেখানে নিয়ত বাস করে সেইখানকার নিম্নতম কোর্টে মামলা হবে—'
'তবে দয়া কোরে একজন নিচু উকিল ঠিক কোরে দিন।' কাতর চোখে তাকাল হীরালাল।
'নিচু মানে লোয়ার কোর্টের উকিল—'
'হ্যাঁ, তাই। কথাটা ছোট করে বলা আর কি।'
'সংক্ষেপ করে।' হাসলেন সতীপতি : 'যেমন ক্রিমিন্যাল উকিল।' বলতে বলতেই ফোন তুললেন। কাকে কী বললেন গুন-গুন করে। পরে লক্ষ করলেন হীরালালকে : 'যান, বলে দিলাম। প্রভাংশুর কাছে যান।' ঠিকানা বলে দিলেন।
'প্রভাংশুবাবু লোক কেমন?'
'লোক কেমন মানে?' বিরক্ত হলেন সতীপতি।

'মানে, ভালো লোক?'

'আপনার উকিল দরকার। আপনার প্রশ্ন হবে উকিল ভালো কিনা। ভালো লোক কিনা সে-প্রশ্ন উঠবে জজের বেলায়। তখন প্রশ্ন, ভালো জজ কি না নয়, ভালো লোক কি না। মানে মা-গোঁসাই কি না—'

কাগজপত্র কুড়িয়ে নিয়ে হীরালাল প্রভাংশুর চেম্বারে এল।

বললে, 'সতীপদবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, টেলিফোন পেলাম।' প্রভাংশু গম্ভীরমুখে বললে, 'কিন্তু ওঁর নাম সতীপদ নয়, সতীপতি।'

'সেটা একই কথা!' একটু বুঝি হাসল হীরালাল : 'পদ-তে আর পতি-তে তফাত নেই।'

কাগজপত্র দেখতে বেশি সময় নিল না প্রভাংশু। গম্ভীরতর মুখে বললে, 'এ মামলা নিতে পারব না।'

'সে কী?' হীরালাল প্রায় গাড়িচাপা পড়ল : 'পারবেন না নিতে?'

'না। এ মামলায় কিছু নেই। কিছু হবে না।'

'হোবে না?'

'ফল হবে না। হেরে যাব।' কাগজপত্রে ফিতে বাঁধল প্রভাংশু।

হীরালাল ফিরে এল সতীপতির কাছে।

বললে, 'অন্য উকিল ঠিক কোরে দিন। যার কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি বললেন, কিসসু হবে না।'

'বটে? আচ্ছা, কাগজ রেখে যান। আমি দেখছি। কাল আসবেন।' পরে হীরালাল চলে যেতেই টেলিফোনে প্রভাংশুকে ডাকলেন সতীপতি।

'মামলাটা নিলে না যে?'

'মামলাটা মিথ্যে।' ওপার থেকে বললে প্রভাংশু।

'মিথ্যে না সত্যি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কী দরকার?' সতীপতি ধমকে উঠলেন।

'মনে হচ্ছে চুক্তিটা ভুয়ো, দলিলটা জাল।'

'তুমি কি ওকালতি করতে বসেছ, না, বোকালতি?' সতীপতি ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

'কিন্তু যাই বলুন,' প্রভাংশু গলার স্বরটাকে বুঝি একটু তরল করল : 'এ মামলাতে কিচ্ছু হবে না।'

'হবে না আবার কী!' সতীপতি প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন : 'উকিলের অভিধানে হবে না বলে কোনো কথা নেই। তোমার হবে, আমার হবে, অ মক্কেলের যা হবার তা হবে।'

'নতুন উকিল, গোড়াতেই যদি হেরে যাই—' প্রভাংশু ঘাড় চুলকোল।

'তুমি আগাগোড়াই হারবে।' রাগ করে রিসিভার রেখে দিলে সতীপতি।

অগত্যা প্রভাংশু মামলা নিল। কিন্তু মনে তার সুখ নেই। কাজে-কর্মে সত্যের স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে না।

'আপনি ঘাবড়াবেন না।' হীরালালই আশ্বাস দেয়। বলে, 'ঠিক মত তদবির করতে পারলে ঠিক জিতে যাব মামলা।'

তদবির! এ আবার কী! প্রভাংশু লাফিয়ে উঠল।

এতে লাফাবার কিছু নেই। দেবতাকে তুষ্ট করতে চাওয়াকে কেউ অপরাধ বলে না। কিন্তু দেবতা কী রকম তার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। দেবতা কি আশুতোষ, না, শনিঠাকুর? যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য।

'কী বলতে চান আপনি?' চোখ-মুখ তীক্ষ্ম করল প্রভাংশু।

চেয়ারটা একটু কাছে টানল হীরালাল। বললে, 'যে এখন মামলাটা ধরেছে সে হাকিমটা কেমন?'

'যেমন হাকিমের হওয়া উচিত, ভীষণ কড়া।' প্রভাংশু মুখিয়ে এল : 'কিন্তু আপনার হাকিম দিয়ে কী কাজ! বলি আপনার মামলাটি কেমন তার খোঁজ নিন।'

'সব মামলাই তো গোলমাল।' হীরালাল আরো কাছে ঝুঁকল : 'রায় নিয়ে কথা। যিনি রায় দেবেন তিনি কিসে খুশি হবেন সেটুকু দেখতে দোষ কী।'

'আপনি হাকিমকে ঘুষ দিতে চান?'

'ছি ছি ছি।' নাক-কান মলে জিভ কাটল হীরালাল : 'ঘুষ বলছেন কেন? ঘুষ নয় খুশ। মানে যাতে দেওতা খুশি হন। এ আদালতে এমন কোনো উকিল নেই যে হাকিমের আত্মীয় কি প্রিয়পাত্র? জামাই কি শালা কি ভায়রাভাই? যাকে দেখলে মনটা ছুনছুন করে—'

'আপনি খোঁজ নিন গে।'

'তা নিচ্ছি।' বিনয়ে গলে গেল হীরালাল : 'যদি তেমন কাউকে পাই ওকালতনামায় শামিল কোরে নিই। আপনি তো আছেনই, অধিকন্তু—'

'তেমন কাউকে যদি প্রত্যক্ষ শামিল করে নেন,' প্রভাংশু বললে, 'হাকিম নিজের ফাইলে রাখবে না মামলা। অন্য কোর্টে চালান করে দেবে।'

'আহাহা, প্রত্যক্ষে রাখব কেন? সূক্ষ্মে রাখব।' একটু বুঝি সূক্ষ্ম করেই হাসল হীরালাল : 'আপনিই সব করবেন, সে মাঝে মাঝে আপনার পাশ ঘেঁষে এসে বোসে যাবে, ইঙ্গিতে বোঝাবে যে সে আপনারই লোক—'

'তেমন যদি পান তাকে দিয়েই করান।' সামনের টেবিলের থেকে হাত সরিয়ে নিল প্রভাংশু।

'আহাহা, চটেন কেন?' হীরালাল ভ্যাবাচাকা মুখ করল : 'তদবিরটা যত সরু করা যায়। আচ্ছা আপনি অঘোর শিমলাইকে চেনেন?'

'সে কে?'

'ইস্কুলে নাকি হাকিম সাহেবের হেডপণ্ডিত ছিলেন। তাঁকে নাকি

হাকিম খুব মানে, রাস্তায় দেখা হলে গড় হয়ে প্রেণাম করে। সে পণ্ডিত মশাই যদি বলেন একটু আমার হয়ে—'

'ওসবের মধ্যে আমি নেই মশাই।'

'আহাহা, আপনি থাকবেন কেন? আমি ওসব দেখছি।' হীরালাল কাশল: 'আচ্ছা, আপনি রোবীন্দ্রনাথ জানেন?'

'রবীন্দ্রনাথ!' প্রভাংশু থ হয়ে রইল।

'চারদিকে এখন তো রোবীন্দ্রজয়ন্তী চলেছে—'

'তাতে কী?'

'তাতে কিসু না। খোঁজ নিয়ে জেনেছি হাকিম খুব রোবীন্দ্রভক্ত।'

'খোঁজ নিয়ে জেনেছেন?'

'ঘোড়া ধরতে হলে খোঁজ নিতে হয় না?' বোকা-বোকা মুখ করল হীরালাল: 'তেমনি একটু ওয়াকিবহাল হওয়া। শুনেছি বাড়িতে রোবীন্দ্র-জয়ন্তী করছেন।'

'রবীন্দ্রজয়ন্তী করলে রবীন্দ্রভক্ত হতে হবে? কিন্তু, কেন, আপনি বলতে চাচ্ছেন কী?' প্রভাংশু অস্থির হয়ে উঠল।

'বলতে চাচ্ছি আপনার আর্গুমেণ্টে যদি কিছু রোবীন্দ্রনাথ কোট করেন!'

'রবীন্দ্রনাথ কোট করব? সঙ্গে উইকলি নোটস না নিয়ে সঞ্চয়িতা নিয়ে যাব?' এক মুহূর্ত কী চিন্তা করল প্রভাংশু। বললে, 'আচ্ছা, করব। একটা মাত্রই তো কোট করা চলে। তাই করব'খন।'

'সেটা কী?'

'সেটা হিং টিং ছট। বলব এ মামলা বিশুদ্ধ হিং টিং ছটের মামলা। দু' পক্ষের দু' উকিল আর হাকিম এই তিন শক্তি, তিন স্বরূপ। বলব চেঁচিয়ে, ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট। সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট।'

'আপনি চোটছেন।' মৃদু হাসল হীরালাল: 'কিন্তু রুগীর যখন সঙিন অবস্থা তখন সে তো কেবল ডাক্তার-কোবরেজই দেখায় না, টোটকা-টাটকি করে—কী বলেন, করে কিনা—তাকতুক ঝাড়ফুঁক কিস্‌সুতেই আপত্তি করে না। এমনকি ফকিরফোকরারও পায়ে ধরে—'

'আপনি ধরুন গে। আমার মশাই স্ট্রেট ড্রাইভ।' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল প্রভাংশু: 'হয় আউট নয় বাউন্ডারি।'

'কিন্তু মোশায়, লেগ-গ্লান্সও তো আছে।' হীরালাল তাকাল মিহি করে।

'দেখুন, সব অদৃষ্ট।' আপোসের স্বরে বললে প্রভাংশু, 'অদৃষ্টে যদি থাকে তো হবে।'

'সেটাই তো কথা।' উৎসাহিত হল হীরালাল: 'নইলে আমি আপনি হাকিম সব নিমিত্তমাত্র। তারই জন্যে তো ভোগ চড়াচ্ছি মা-কালীর মন্দিরে।

নবগ্রহের আখড়ায়। মানত করছি এখানে-সেখানে। ঢিল বাঁধছি। চেরাগ জ্বালাচ্ছি। সবরকমই করে রাখা দরকার। যেমন অ্যাকসিডেন্টের ঠাকুর আছে তেমনি আছে মামলামোকদ্দমার ঠাকুর। গভর্নমেণ্টকে কোর্ট-ফি দিতে হয়, ঠাকুরদের কিছু দিতে হয় ডাব-চিনি—'

'তাই দিন না যত খুশি। তাতে আর কী আপত্তি!'

আর্গুমেণ্ট হয়ে গিয়েছে। সাত দিন পরে রায় বেরুবে। হীরালালও বুঝেছে হালে পানি নেই। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

এসে বললে চুপিচুপি, 'দেখুন, স্ট্রেট ড্রাইভই ঠিক করলাম।'

প্রভাংশু হাঁ হয়ে রইল।

'দেখুন, আঁচলে জিনিস থাকতে কেন পাঁচিলে খোঁজ করি! হীরালাল কপালের ঘাম মুছল : 'ভাবছি হাকিমের বাড়িতেই সিধে ডালি পাঠিয়ে দি একটা।'

'ডালি পাঠাবেন?' প্রভাংশু আঁতকে উঠল। বললে, 'সিধে জেল হয়ে যাবে আপনার।'

'নির্দোষ ডালি মোশাই, ফ্রুটস অ্যাণ্ড ফ্লাওয়ার্স। এতে আর আপত্তি কী!'

'সাংঘাতিক আপত্তি। খবরদার, ওসব করতে যাবেন না। মামলা ডিস-মিস হয়ে যাবে।' প্রভাংশু টিপ্পনী কাটল : 'তা ছাড়া হাকিমের নামও পুণ্যব্রত।'

'তবে একটা উপায় তো কিসু করতে হয়। বেতদবিরে মামলা ভেসে যেতে দেব?' প্রায় কাঁদ-কাঁদ মুখ করল হীরালাল।

সন্ধের পর বাড়ি ফিরেছে পুণ্যব্রত। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল দোরগোড়ায় একটা ঝুড়ি।

'এ ঝুড়ি কে রেখে গেল?'

চাকর ছুটে এল। গিন্নি ছুটে এলেন। ছুটে এল ছেলেমেয়ের দল।

'কই, কেউ দেখিনি তো।'

আনারস তো দেখাই যাচ্ছে, তারপরে আম। আরো গভীরে দই, সন্দেশের বাক্স—ও কি, মুরগি নাকি?

'চাপা দাও, চাপা দাও,' আর্তনাদ করে উঠল পুণ্য 'বাইরে ফেলে দিয়ে এসো।'

বাইরে ফেললেই বা নিস্তার কোথায়? বাইরে ফেললে তো আরো জানাজানি। আরো কেলেঙ্কারি।

বাঘে ছুঁয়েছে কী আঠারো ঘা।

যখন হাত দিয়েছেন গিন্নি, আরো গভীরে যাবেন। শেষ পর্যন্ত বার করলেন একটি কার্ড। তাতে প্রেরকের নাম লেখা। প্রেরকের নাম জওলা-প্রসাদ।

কে জওলাপ্রসাদ?

পুণ্যব্রতর চট করে মনে পড়ল। আজই একটা মামলার রায় লিখছিল যার বিবাদী জওলাপ্রসাদ। হীরালাল বনাম জওলাপ্রসাদ। সেই জওলা-প্রসাদের এই কান্ড।

দাঁড়াও, দেখছি। ডালি দেওয়া বার করছি।

রায়টা ডিসমিসের দিকে যাচ্ছিল, পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়ে ফেলল পুণ্যব্রত, পুড়িয়ে ফেলল। নতুন করে লিখল আবার রায়। ডিক্রি করে দিল।

খুশিতে ফুটতে ফুটতে ছুটতে ছুটতে হীরালাল ঢুকল প্রভাংশুর চেম্বারে। 'কেমন আপনাকে জিতিয়ে দিলুম দেখুন।' ফি-এর বাকি বলে মোটা করে দিল কিছু বকশিস।

'আমাকে জিতিয়ে দিলেন?' অবাক মানল প্রভাংশু।

'তা ছাড়া আর কী। এর পরে তো আপিল আছে। সেখানে কী হয় কে জানে। কিন্তু আপনার তো শুধু এই কোর্টেই প্র্যাকটিস, আপনার জয়ই অক্ষয় হয়ে রইল।'

জওলাপ্রসাদ আপিল করেছে। হীরালালের হয়ে দাঁড়িয়েছেন সতীপতি।

ফোন এসেছে প্রভাংশুর। সতীপতি বলছেন ওপার থেকে, 'কি হে, হবেনা বলছিলে না? আলবত হবে। তোমার হবে, আমার হবে আর মক্কেলের যা হবার তাই হবে।'

৯৪। কলঙ্ক

প্রথমে টের পেল যখন চায়ের পেয়ালাটা সামনে নামিয়ে রাখতেই বিশ্বনাথ মুখ সিঁটকাল : 'এ কী বিচ্ছিরি চা!'

চা তো বিশ্বনাথের নিজেরই কিনে আনা। আর তৈরি তো শর্বাণী এ নতুন করছে না। তাছাড়া রঙটা তো বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। ধোঁয়াও উঠছে পেয়ালা থেকে।

'চুমুক না দিয়েই বিচ্ছিরি বলছ কেন?'

'চুমুক দিতে লাগে না, চেহারা দেখেই বলা যায়।' বিশ্বনাথ খবরের কাগজটা টেনে নিল মুখের সামনে।

তবু দাঁড়িয়ে রইল শর্বাণী। আস্বাদ না করেই অগ্রাহ্য করার মধ্যে যুক্তি নেই যেন এইরকম একটা ভঙ্গি সেই দাঁড়ানোয়।

অগত্যা বিশ্বনাথ পেয়ালাটা ঠোঁটে ঠেকাল। আর ঠেকাতে না ঠেকাতেই ওয়াক-থু ওয়াক-থু করে উঠল।

'কেন, কী হল?'

'ভীষণ মিষ্টি। কোনো ভদ্রলোক একে চা বলবে না।'

'আবার তা হলে করে নিয়ে আসি।'

দ্বিতীয়বার চা করে আনল শর্বাণী। অপেক্ষা করতে লাগল আবার একটা মুখ-ঝামটা শুনবে। হয় ভীষণ লাইট, নয়তো ভীষণ যাচ্ছেতাই। কিন্তু অতদূর যেতে হল না, টেবলে চা-টা রাখতেই গর্জে উঠল বিশ্বনাথ : 'এই ভাবে সার্ভ করে চা? পিরিচে চা কতটা চলকে পড়েছে দেখেছ?'

'তা ফেলে দিচ্ছি ওটা।'

ওটা ফেলতে গিয়ে আবার এক কেলেঙ্কারি।

বিশ্বনাথ এবার ক্রুদ্ধ না হয়ে গম্ভীর হল। বললে, 'দেখ খাঁটি কথা বলি। তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না।'

এ যেন একটা ঝি-চাকর, চলবে না বললেই চলে।

'চলবে না তো আমি কী করব?'

'না, তুমি করবে না। আমিই করব।'

বিশ্বনাথ একটা বাবুর্চি রাখল।

'তার মানে তুমি আমার হাতে খাবে না?'

'তোমার হাতে কেন কারু হাতে খেতেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার ঐ গেঁয়ো রান্না—শাক-শুক্তো-ঘন্ট—এ আমার পোষাবে না।'

'আগে-আগে তো পোষাত, যখন রানাঘাটে ছিলে।'

'তখন তো এ চাকরিটা হয়নি। আসিনি এ লাইনে।'

'আমি কিন্তু আমার আর ঊর্মির রান্না আলাদা করে করব।'

'হ্যাঁ, তাই কোরো।' আশ্বস্ত হবার ভাব করল বিশ্বনাথ : 'খেয়োও আলাদা। আমার সামনে আমার টেবিলে নয়।'

'ছুটির দিনেও নয়?'

'মিলিটারির আবার ছুটি কোথায়?'

'তবু, যখন পাওয়া যায় দৈবাৎ?'

'না, তখনো নয়।'

'রানাঘাটে তো আমরা খেতাম একসঙ্গে, এক টেবিলে।' শর্বাণীর চোখে পুরোনো দিনের মমতার ছায়া পড়ল।

'সে তো বাঙালির টেবলে মেখে-চটকে গরস পাকিয়ে শব্দ করে খাওয়া। আঙুল দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে কাঁটা তোলা, হাত চাটা। হিডিয়াস!' বিকৃত মুখভঙ্গি করল বিশ্বনাথ : 'তারপর ঢেঁকুর তোলা। ওসব ভুলে যাও।'

'আমরা কী করে ভুলব!'

'কিন্তু আমি ভুলব।'

খাওয়া-দাওয়া আলাদা হয়ে গেল।

শোওয়াও আলাদা করতে চাইল বিশ্বনাথ।

ঊর্মির আট-ন বছর বয়স হয়েছে, বড় হয়ে উঠছে, সেই কারণে আলাদা শুতে চায়, সেটা মন্দ কী! ঘুমের নিঃস্পর্শ আরামের জন্যেও এ ব্যবস্থা

অন্যায় নয়। কিন্তু, না, এ ব্যবস্থার মূলে স্বাস্থ্য বা শালীনতা নয়, শুধু ঘৃণা, আপাদমস্তক ঘৃণা।

গম্ভীর হল শর্বাণী। বললে 'এ বড় ঘরটায় খাট আলাদা করে নিলেই হবে। ঊর্মি আমার কাছে থাকবে, তুমি আলাদা খাটে শুয়ো।'

'খাট আলাদা নয়, ঘর আলাদা।' মিলিটারি কায়দায় হুকুম দেবার মত করে বললে বিশ্বনাথ।

'না, তা কী করে হয়!' ছোট্ট করে বললে শর্বাণী।

হয় কী, হল। বিশ্বনাথ ঘর আলাদা করল।

শর্বাণী বললে, 'একা শুতে আমার ভয় করবে।'

'কেন, রানাঘাটেও তো মেয়ে নিয়ে একা এক ঘরে শুতে?'

'সে আমার শ্বশুরবাড়ির জানাশোনা পুরোনো বাড়ি, সেখানে ভয় করবে কেন?'

'আর এ কলকাতা শহর, এখানেই বা ভয় করবার কী!'

'তবু শত হলেও নতুন বাড়ি—'

'বাড়িটা নতুন হলে কী হবে, পাড়াটা ভালো। য়্যাংলো ইন্ডিয়ানদের পাড়া।'

'কিন্তু কত দিন পরে তুমি এলে বলো তো।' কটাক্ষে একটি মদির রেখা আঁকল শর্বাণী।

'কত দিন? মোটে তো আঠারো মাস।'

'আঠারো মাস কম হল?' রেখাটাকে শর্বাণী আরো একটু গাঢ় করল।

'অসম্ভব। শোনো।' সরে যাচ্ছিল ফিরে দাঁড়াল বিশ্বনাথ। বললে: 'তোমার গায়ের গন্ধ আমার অসহ্য লাগে।'

'একদিন তো ভালো লাগত। চাঁপাফুল লাগত।'

'তখন প্রাণে প্রেম ছিল। এখন অসহ্য লাগছে। উলটিয়ে বমি আসছে। জানো, এই গায়ের গন্ধের জন্যেই বিলেতে বিবাহবিচ্ছেদ হয়।'

'ওখানে হোক।' নিশ্চিন্তের মত বললে শর্বাণী: 'তোমার কোন গন্ধটা ভালো লাগে সেই রকম সেন্ট-পাউডার কিনে দিলেই পারো।'

'শুধু সেন্ট-পাউডারে কী হবে? গালে ঠোঁটে রঙ মাখতে পারবে?'

'তুমি যদি সঙ সাজাও কেন পারব না?'

'চুল ছেঁটে ফেলতে পারবে?'

'চুল তো উঠেই যাচ্ছে। চুলের আর আছে কী। দাও না বিদেয় দিয়ে।' এতটুকু ভড়কাল না শর্বাণী।

'চোলি পরতে পারবে? এক ফালি পিঠ আর এক চিলতে পেট দেখাতে পারবে?'

'পেট-পিঠ? একটু থলথলে হয়ে গেছে না?'

'থলথলে মেয়েরাও দেখায়। পারবে?'

'তুমি যদি বলো। পারব। সব পারব। তোমার জন্যে কিছুতেই বাধবে না।'

তবু নরম হল না বিশ্বনাথ। বললে, 'না, সত্যি কথা বলতে কী, তোমাকে আর আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'বা, এ এখন বলা খুব সোজা!' শর্বাণীর গায়ের রক্ত তাতল না এতটুকু : 'একদিন তো পছন্দ করেই এনেছিলে।'

'সে কত আগের কথা। তখন তো মার্চেন্ট-আফিসে সামান্য মাইনের কেরানি ছিলাম—'

'ছিলে তো তাই থাকতে। মিলিটারিতে যাবার দুর্মতি হল কেন?'

'দুর্মতি?' ইংরিজিতে কী একটা গাল দিয়ে উঠল বিশ্বনাথ : 'জীবনে উন্নতি করতে মানুষ চেষ্টা করবে না? চিরকাল একটা পচা, নোংরা দুর্গন্ধ চাকরি আঁকড়ে পড়ে থাকবে?'

বিশেষণগুলো চাকরি সম্বন্ধে, না, তার নিজের সম্বন্ধে, শর্বাণী বুঝতে চাইল না। বললে, 'তাই বলে একেবারে তোমার বণ্ড সই করে দেবার মানে হয় না। দেবার আগে সকলকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।'

'সকলকে মানে তোমাকে?'

'মন্দ কী। দেখতে গেলে আমিই তো সকল।' শর্বাণী দরজাটা ধরল : 'তুমি তখন বিয়ে করে ফেলেছ। তোমার একটি মেয়ে হয়ে গিয়েছে।'

'যাও যাও, মিলিটারি অফিসরদের কী আর স্ত্রী-কন্যা থাকে!'

'থাকবে না কেন? সে-সব স্ত্রী-কন্যাও মিলিটারি স্ত্রী-কন্যা। কিন্তু আমি কেরানির বউ, ঊর্মি কেরানির মেয়ে। আমাকে যখন এনেছিলে তখন কেরানির বউ করবে বলেই এনেছিলে—আর ঊর্মি—'

'তুমি মেয়েকে টানছ কেন?" তড়পে উঠল বিশ্বনাথ।

'না, বলতে চাচ্ছি, ওর কী দোষ!'

'ওর দোষ কে বলছে? সব তোমার দোষ।'

'কিন্তু আমার মত নিয়ে তো আর মিলিটারি হওনি যে এখন আমার দোষ দেবে! হঠাৎ, বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ি থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলে। হঠাৎ আবার একদিন বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে একটা যুদ্ধের পোশাক পরে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে এসে দাঁড়ালে। সংসারে প্রলয়কাণ্ড বাধালে। সবাই ভাবলে, সাময়িক খেয়াল, যাত্রার দলের পোশাক ছেড়ে ফেলে আবার গৃহস্থ বনবে, ধরবে পুরোনো চাকরি। কিন্তু একেবারে একটা বণ্ড সই করে দিয়ে এসেছ তা কে জানত।'

'মানে তোমার বণ্ডেই চিরকাল বাঁধা থাকতে হবে?' বিশ্বনাথ খেঁকিয়ে উঠল।

'আমার সঙ্গে তোমার চাকরির সম্পর্ক কী?' শান্ত মুখে শান্ত স্বরে শর্বাণী বললে, 'তোমার চাকরি থাক বা না থাক, তাতে তোমার উন্নতি হোক বা না হোক, তাতে আমার কী। আমি আমি।'

'তুমি তুমি।' মুখ ভেংচে উঠল বিশ্বনাথ : 'তুমি একেবারে পার্মানেন্ট

ফিকশ্চার—নট নড়নচড়ন। শোনো—' এক পা এগিয়ে এল : 'জীবনের উন্নতির পথে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাই লাথি মেরে ফেলে দেব ছুঁড়ে। পুরোনো চাকরিটা তেমনি এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—'

'তেমনি আরেক বাধা পুরোনো এই স্ত্রী?'

নিজেই তো বুঝতে পেরেছ দেখছি।'

'অতএব তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

'উপায় কী তা ছাড়া! লোকে আজকাল স্ত্রী পোষে উন্নতির জন্যে। তোমাকে দিয়ে তো সামান্য সাজগোজই হবে না, তার উপর আছে আরো কত আনুষঙ্গিক! তুমি আমার উন্নতির পথের কাঁটা, কাঁটা শুধু নয়, তুমি আমার লজ্জা—সুতরাং—'

'অত সোজা নয় ছেড়ে দেওয়া।' মুখে এল, বলে ফেলল শর্বাণী।

সোজা নয়ই বা কেন? কে আছে শর্বাণীর পাশে এসে দাঁড়ায়? কে আছে তার হয়ে লড়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে? কী আছে তার. শত্রুকে বশ করে?

সেদিন রাত্রে বিশ্বনাথ মদ খেয়ে ফিরল। মুখে ইংরিজি গানের টুকরো।

'মিলিটারিতে এও খায় নাকি?' আহতের মত জিজ্ঞেস করল শর্বাণী।

'সিভিলেও খায়। তুমি একটু খাবে, দেখবে খেয়ে?' বিকট হেসে উঠল বিশ্বনাথ : 'তুমি তো আবার ইংরেজি জানো না। মদের বেলায়ও ইটিং বলো। ইটিং ওয়াইন! উইল ইউ ইট এ গ্লাস?' হাত তুলে গ্লাস দেখাল।

কথা কইল না শর্বাণী।

টলতে-টলতে নিজের ঘরের দিকে এগুলো বিশ্বনাথ। বললে, 'মদ পেটে গেলে সকলকেই টলারেবল লাগে শুনেছি, কিন্তু, কী আশ্চর্য, স্ত্রীকে, তোমাকে তাও লাগে না? একটা কাজ করবে এস। আমার ঘরে এস।'

শর্বাণী ঘরের সামনেকার বারান্দায় স্থির হয়ে দাঁড়াল।

'এস। আমার সঙ্গে বসে এক পাত্র মদ খাও। দেখি তুমি মদ খেলে, তোমার শরীরে নেশার রঙ ধরলে তোমাকে তখন ভালো লাগে কিনা।'

'আমি মদ খাব?'

'বলেছিলে না আমার জন্যে তুমি সব কিছু করতে পারো? ইয়া-ইয়া পরে নাচতে গাইতে বলছি না, লাফ-ঝাঁপ দিতেও না, শুধু কোয়ায়েটলি একটু ড্রিঙ্ক করা। তারপর আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটু তেরছা চোখে হাসা—'

'মদ খেতে পারলে আর তোমার দিকে তাকাব কেন?' শর্বাণী ঝলসে উঠল : 'বাইরে আর লোক নেই?'

'ফর গডস সেক, দয়া করে তাকাও না একবার বাইরের দিকে।' প্রায় উথলে উঠল বিশ্বনাথ : 'আমি ডিভোর্সের একটা গ্রাউন্ড পাই।'

শর্বাণী চুপ করে গেল।

নিজের মনে খুব খানিকক্ষণ হই-চই করল বিশ্বনাথ। কটা কী জিনিস ফেলল-ছুঁড়ল, গালাগাল দিল, তারপর জামাজুতো না খুলেই পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

শাদা চোখেও বিশ্বনাথের সেই কথা। তুমি সরে যাও তুমি দূরে থাকো।

একটা খামের চিঠি হাতে করে শর্বাণীর কাছে এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথ। বললে, 'তুমি রানাঘাটে শিগগির ফিরে যাও। মার অসুখ বেড়েছে।'

'অসুখ বেড়েছে তো মাকে এখানে নিয়ে এস।' শর্বাণী এতটুকুও উদ্বিগ্ন হল না : 'ছেলের কাছেও থাকতে পারবে, চিকিৎসাও ভালো হবে।'

'এখানে নিয়ে আসব কী! মাকে রিমুভ করা সম্ভব?'

'রিমুভ করা আমাকেও সম্ভব নয়।' গম্ভীর শর্বাণীর কণ্ঠ।

'সে কী! মার শেষ অসুখের সময় তুমি তাঁর সেবা করবে না?'

'এই তো সেদিন এলাম তাঁর কাছ থেকে। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন কোনো অবস্থাতেই আমি যেন আমার ঘরবাড়ি স্বামী সংসার না ছাড়ি।'

'ঘোরতর অসুখ হলেও নয়?'

'না। কে জানে সত্যি তাঁর অসুখ কিনা। না, চিঠিটা তোমার কারসাজি।'

'কারসাজি?' বিশ্বনাথের ইচ্ছে হল শর্বাণীর মুখের উপর একটা ঘুসি মেরে বসে।

'বেশ, কারসাজি নয়, সত্য চিঠি। কিন্তু আমি যদি অবাধ্য হই, আমি যদি যেতে না রাজি হই, কী করা যাবে? কত রকম ঠেকাতেই তো কত লোক যেতে পারে না।'

'যদি না যাও, জোর করে পাঠিয়ে দেব।।'

'কী করে জোর খাটাবে তা তো জানি না।' শর্বাণী ম্লান রেখায় হাসল : 'জোর করে ধরে বেঁধে পাঠাতে পারলেও সেবা করাবে কী করে?'

'সেবা করতে হবে না তোমাকে। তুমি যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও তা হলেই আমি কৃতার্থ হব।' বিশ্বনাথ হাত জোড় করে মিনতির ভঙ্গি করল।

'তাই বা কী করে হতে পারে?' শর্বাণী পরম নির্লিপ্তের মত বললে।

'ঘাড় ধরে রাস্তায় ঠেলে দিয়ে সদর বন্ধ করে দিলেই হতে পারে।'

'তাই বা হবে কেন!' কোথায় কী যেন তার একটা শক্ত আশ্রয় আছে এমনি শান্ত নিশ্চিন্ততায় শর্বাণী বললে, 'স্ত্রীর বয়েস বাড়লে বা তার যৌবন যাব-যাব হলেই তাকে বর্জন করতে হবে এর মধ্যে কোনোই যুক্তি নেই।'

আসল যুক্তি হচ্ছে প্রহার—অত্যাচার। কিন্তু তা দিয়ে সাময়িক উপশম হতে পারে। শেষ সমাধান হয় না। পথটাও দীর্ঘ, নিজেরও জখম হবার ভয় থাকে। তা ছাড়া কর্তৃপক্ষের কানে উঠলে অভিনন্দিত হবার কথা নয়।

অন্য পথ ধরতে হবে।

সেদিন রাতে মাতাল হয়ে বিশ্বনাথ যে বাড়ি ফিরল, একা নয়। সঙ্গে একটা সাহেব আর তিনটে ছুকরি মেম নিয়ে ফিরল।

বাক্সে-ঠোঙায় করে কী সব খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে তাই খেল কাড়াকাড়ি করে। গ্লাসে-গ্লাসে ঢালল রঙিন জল। তারপর এ-ওর কোমর ধরে-ধরে নাচ শুরু করে দিল। নাচতে-নাচতে বেরিয়ে আসতে লাগল বারান্দায়। তারপর কী উৎকট গান। উৎকটতর হাসি। বেলেল্লাপনা আর কাকে বলে!

বিশ্বনাথ ভেবেছিল শর্বাণী ঘরে দোর দিয়ে থাকবে। কিন্তু তা নয়, ও দিকটা যেন আলাদা ফ্ল্যাট এমনিভাবে নিজের গন্ডির মধ্যে চলাফেরা করতে লাগল। এত দৌরাত্ম্যকেও চাইল উপেক্ষা করতে। নিজের স্থানে স্থির থাকতে।

কিন্তু মেয়েটার জ্বর যেরকম বেড়েছে ডাক্তারকে না ডাকলেই নয়।

সাহসে ভর করে নিজেই বিশ্বনাথের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অকুন্ঠ মুখে বললে, 'মেয়েটার জ্বর খুব বেড়েছে। ডাক্তারকে খবর দেওয়া দরকার।'

তিনটে মেয়ের মধ্যে একটা ইংরিজিতে খ্যাঁক করে উঠল : 'অসুখ করেছে তো হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

এতে হাসবার কী আছে, সবাই হেসে উঠল সমস্বরে।

আরেকটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে এ?'

বিশ্বনাথই বললে। 'মেয়েটার আয়া।'

আবার একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

এততেও বিচ্যুতি নেই শর্বাণীর। কোথায় যাব? কে আছে? আর, যাবই বা কেন? আমার স্বত্বে অবস্থিত থাকব। ধৈর্য ধরে থাকলে একদিন ফল ফলবেই। সব সুগোল হয়ে আসবে।

এবার বিশ্বনাথ সত্যের পথ ধরল। সত্যের পথ মানে কান্নার পথ।

'আমাকে বাঁচাও।' শর্বাণীর হাত চেপে ধরল বিশ্বনাথ। কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বললে, 'তুমি ছাড়া কেউ নেই যে আমাকে বাঁচাতে পারে।'

'কেন, কী হয়েছে?' দুশ্চিন্তায় মুখ কালো হয়ে উঠল শর্বানীর।

'ঐ যে তিনটে য়্যাংলো মেয়ে দেখেছিলে সেদিন, তার মধ্যে যেটা সব চেয়ে ঢ্যাঙা, নাম গ্রেস, গ্রেসি—তাকে আমি ভালোবেসেছি।'

'ভালোবাসা তো ভালোই।' শর্বাণীর নয়, একটা পাথরের মূর্তির মধ্য থেকে আওয়াজ বেরুল।

'তাকে আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।'

'বিয়ে করবে?' পাথরের মূর্তিতে মৃদুতম রেখাও আর কোথাও রইল না : 'তা কী করে হয়?'

'হয়। তার পথ আছে। তুমি বললেই হয়।' মিলিটারি এবার গোবেচারির ভঙ্গি ধরল : 'বলো কি, তুমি আমার উন্নতির পথে বাধা হবে? তুমি কি চাও না আমি আরো বড় হই?'

'ঐ শিটে শুটকে মেয়েটাকে বিয়ে করলে তোমার উন্নতি হবে?'

'ও ভীষণ স্মার্ট মেয়ে, তুমি বুঝবে না, ইংরিজিতে যাকে বলে টিটিলেটিং। বিউটি-কম্পিটিশনে যাবে ও।'

'তা যাক।' পাথরের মূর্তি চাইল নিশ্বাস ফেলতে।

'তুমি বলতে না, আমার জন্যে তুমি সব কিছু করতে পারো,—এইটুকু করতে পারবে না?'

এইটুকু!

'কী করতে হবে?' একটা পরিত্যক্ত অন্ধকার গুহার মধ্যে থেকে যেন শর্বাণী বললে।

'আমাদের এই বিয়েটা ভেঙে দিতে হবে। বিয়েটা ভেঙে না দিলে আমার গ্রেসিকে পাওয়া হয় না।' মানোয়ারী জাহাজ গাধাবোট হয়ে গেল বোধহয়। বিশ্বনাথের স্বরে কান্নার টান।

'আমাদের বিয়েটা ভেঙে দেওয়া যায় নাকি?'

'যায়। আজকাল যায়।' আশ্বাসের সুর আনল বিশ্বনাথ : 'আমি খৃস্টান হলেই সহজ হয়ে যায়।'

'খৃস্টান হলে?' গুহার মুখটাও বুঝি বন্ধ হয়ে এল এবার।

'খৃস্টান না হলে গ্রেসিকে বিয়ে করব কী করে? খৃস্টান হওয়াটাই সব চেয়ে সহজ উপায়। তা হলে এ পুরোনো বিয়েটাও ভাঙা যায়, করা যায় আবার নতুন বিয়ে।'

'তুমি ধর্ম ছাড়বে?' সমস্ত গুহাটাই বুঝি অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ধর্ম?' সেটা যেন কোন একটা জিনিস, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল বিশ্বনাথ : 'সেটা আবার কী! সেটা কোথায়?' পরে শান্তস্বরে বললে, 'প্রেমের জন্যে মানুষ কত কিছু ছাড়ে, আর এ তো একটা ফাঁকা কথা—খানিকটা ধোঁয়া মাত্র।'

নিরেট স্তব্ধ হয়ে গেল শর্বাণী।

বিশ্বনাথ দিব্যি তার কাঁধের উপর হাত রাখল। বললে, 'আমি জানি কী হবে আমার অদৃষ্টে। তুমিও জানো। বিয়ের পর গ্রেসি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, আর কাউকে ধরবে। ঐ সব স্লিপ-আপ গার্ল এক জায়গায় বাঁধা থাকবে না। আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।' একটু বা আদর করতে চাইল বিশ্বনাথ : 'তোমার সতী শক্তিই আমাকে টেনে আনবে।'

স্বামীর দিকে একবার মুখ ফেরাল শর্বাণী, কান্নায় ভেসে-যাওয়া করুণ মুখ। যেন নিঃশব্দে বলতে চাইল : 'তাই যদি হবে তবে কেন মিছিমিছি—'

সরে এল বিশ্বনাথ। বললে, 'এ যে আমার কী যন্ত্রণা তোমায় কী করে বোঝাই?'

শর্বাণীর দূর সম্পর্কের মামা, কোন কোর্টের কে উকিল, শক্তিপ্রসাদ ঘোষ, ডাক পেয়ে সাহায্যে এল।

সব দেখল-শুনল কাগজপত্র। বললে, 'মেনে নিবি?'

'উপায় কী তা ছাড়া?' শর্বাণী দাঁড়াল চেয়ার ঘেঁসে : 'লড়তে গেলেও হায়রানির একশেষ। বাইরের বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারলেও অন্তরের বিচ্ছেদ ঠেকানো যাবে না। যার মন নেই তার সঙ্গে ঘর করা যায় কী করে?'

'তাছাড়া যে ধর্মান্তরী হয়েছে—' শক্তিপ্রসাদ টিপ্পনী কাটল।

'না, শুধু তাতে আটকাত না। কিন্তু যে জিনিসে লোভ করেছে তা পেতে যদি ওকে বাধা দিই, ও আমাকে খুন করে ফেলবে। কুচি-কুচি করে কেটে এক টুকরো এখানে আরেক টুকরো ওখানে রেখে দিয়ে আসবে। হয়তো মেয়েটাকেও আস্ত রাখবে না। আর যাই হোক, গায়ের জোরে তো পারব না। তা যখন যেতে চাচ্ছে, যাক। ঘুরে আসুক।'

'লাথি খেয়ে ফিরে আসবে।'

'তা ছাড়া মারই তো সব নয়, অপমান!' চোখ মুখ জ্বলে উঠল শর্বাণীর।

'মিস গ্রেস সব ফিরিয়ে দেবেন।'

'তাই বিচ্ছেদটা আপোসে হয়ে যাওয়াই ভালো।'

'আমিও তাই বলি।' সায় দিল শক্তিপ্রসাদ।

শর্বাণী-বিশ্বনাথ কোর্টে সংযুক্ত দরখস্ত করলে। স্বামী ভারতীয় খৃস্টান, স্ত্রী হিন্দু—এ বিবাহ কী করে বাঁচিয়ে রাখা চলে!

বিচ্ছেদের আরজি যখন পড়েছে তখন স্বামীস্ত্রী একত্র বসবাস করে কী করে? না, রানাঘাট ফিরে যাবে না শর্বাণী। কলকাতায়ই কোনোখানে থাকবে মাথা গুঁজে। তার মেয়েকে ঊর্মিকে মানুষ করতে হবে। তার আর জীবনে রইল কী! এই মেয়েটাকে মানুষ করে তোলাই তার একমাত্র স্বপ্ন। একমাত্র আকর্ষণ।

ভদ্র গৃহস্থ পাড়ায় একখানা ঘরের ভাড়াটে হল শর্বাণী। ঠিক হল এক বছর মাস-মাস একশো টাকা করে তাকে দেবে বিশ্বনাথ। টাকা নইলে শর্বাণী ও ঊর্মির ভরণপোষণ হবে কি করে? এই এক বছর করতে হবে অসঙ্গবাস। আইন অনুসারে এই অসঙ্গবাসটাই চুড়ান্ত বিচ্ছেদের ভূমিকা। এই এক বছরের মধ্যে যদি পক্ষেরা পরস্পরে আসক্ত হয়, সংলগ্ন হয়, তা হলে মামলা আর চলতে হল না, টেঁসে গেল। আর যদি এই এক বছরেও গোলমাল না মেটে, যদি এপার বন্যা ওপার বন্যাই থেকে যায় আগের মত, সেতু না পড়ে, তাহলে বিচ্ছেদের ডিক্রি চুড়ান্ত হতে পারবে।

দেখতে-দেখতে এক বছর কেটে গেল। বিশ্বনাথ এক মুহূর্তের জন্যেও শর্বাণীর ঘরের দরজায় উঁকি মারতে এল না।

'কেন আসবে? এখনো তো ও গ্রেসিতেই মশগুল।' বললে শক্তিপ্রসাদ। 'আগে মেয়েটাকে বিয়ে করুক, নাকের জলে চোখের জলে হোক, পরে বুঝবে আগের স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর স্বাদ কী! তখন যদি ফিরে না আসে তো কী বলেছি!'

এইবার আবার দুই পক্ষ মিলে আদালতে চুড়ান্ত দরখাস্ত দিতে হয়।

আমাদের বিরোধ মেটেনি। পারিনি পরস্পরে অনুরক্ত হতে। সুতরাং আমাদের ছাড়াছাড়িটা পাকা করে দিন।

শক্তিপ্রসাদ বললে, 'এইবার আপোসনামায় খোরপোষের টাকাটা বাড়িয়ে নিবি।'

'নিশ্চয়।' কোমর বাঁধল শর্বাণী : 'একশো টাকায় কী হয়? ঘর ভাড়াই ছত্রিশ টাকা।'

শক্তিপ্রসাদের বাড়িতে চূড়ান্ত দরখাস্তের মুশাবিদা হচ্ছে। শর্বাণী বললে, 'মাসে একশো ষাট টাকা চাই।'

বিশ্বনাথ ভেবেছিল যে একশো টাকা দিচ্ছিল তাই নথিভুক্ত হবে।

'না, সেটা নথির বাইরে একটা সাময়িক ব্যবস্থা বাবদ দেওয়া হচ্ছিল।' বললে শর্বাণী, 'এখন সমস্ত কিছু কোর্টের শিলমোহরের নিচে আসছে. একটা ন্যায্য টাকাই ধার্য হওয়া উচিত।'

দুই হাত শূন্যে তুলে দিল বিশ্বনাথ। বললে, 'ও যে অনেক টাকা। অত টাকা আমি দিতে পারব না।'

'অত হল কোনখান দিয়ে?' শর্বাণী বললে দৃঢ়স্বরে, 'মেয়ে বড় হচ্ছে. স্কুলে পড়ছে, বাস-এ যাচ্ছে—সে খরচ কত? মেয়ে ক্রমশই বড় হবে, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরবে, খরচও বাড়তে থাকবে। একশো ষাট টাকা মোটেই অসংগত হয় নি।'

'অত টাকা দিতে হলে আমি মরে যাব।'

দুপক্ষের লোকজন মিলে রফা করে দিল। একশো টাকা করে তো দিচ্ছিলই, এখন একশো ষাটটা একটু বেশি শোনাচ্ছে, একশো পঁয়ত্রিশ করে দিক। মেয়ে যে বড় হচ্ছে দিন-দিন এ তো আর মিথ্যে নয়।

বিশ্বনাথ তবু কী আপত্তি করতে যাচ্ছিল, তাকে সবাই নিরস্ত করল।

'না, টাকার কথা বলছি না।' বিশ্বনাথ উত্তেজিত হয়ে বললে, 'তবে একটা সর্ত বসান। আমি মাস-মাস ঐ টাকাটা দেব যদ্দিন পর্যন্ত শর্বাণী বিয়ে না করবে কিংবা অন্য পুরুষে উপগত না হবে। যদি অতঃপর শর্বাণী বিয়ে করে অথবা ব্যভিচারিণী হয় পাবে না সে মাসোয়ারা।'

'এ বলাই বাহুল্য।' সবাই এক বাক্যে সায় দিল।

'কিন্তু আমারো একটা দাবি আছে।' শর্বাণী বললে।

'কী দাবি?'

'আমি আমার সিঁথির সিঁদুর মুছব না, ছাড়ব না বিবাহিত পদবী।'

সবাই হেসে উঠল। বিশ্বনাথ বললে, 'তোমার যা ইচ্ছে তাই কোরো। এটা নথির বাইরে।'

চূড়ান্ত ডিক্রি হয়ে গেল।

'চলুন হোটেলে চলুন। একটু খাওয়া দাওয়া করা যাক।' বিশ্বনাথ দু'পক্ষের উকিলকে। শক্তিপ্রসাদকে—শর্বাণীকেও নিমন্ত্রণ করল।

যেন বিরাট কিছু একটা পেয়েছে সেই আনন্দেরই উৎসব করছে বিশ্বনাথ। শর্বাণীরও মুখ গোমড়া করে থাকিবার মানে হয় না। মামলা সেও জিতেছে। একশো টাকা একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় এনেছে। এক অর্থে সেও পেয়েছে স্বাধীনতা।

এটা-ওটা যতই ফিরিয়ে দিচ্ছিল শর্বাণী, ততই তার প্লেটে ঢেলে দিচ্ছে বিশ্বনাথ। এক সময় তার কানের কাছে মুখ এনে বললে, টাকাটা কম হয়েছে বলে মন খারাপ কোরো না। আমি আরো পাঠাব ঊর্মির জন্যে। ঊর্মিকে নিয়ে আসনি কেন? ওকে কতদিন দেখিনি।

গ্রেসিকে এবার স্থূলে-মূলে পাবে সেই আনন্দে শর্বাণীকে আজ বোধহয় ক্ষমার যোগ্য বলে মনে হচ্ছে বিশ্বনাথের।

'চলো তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

শর্বাণীকে এক পাশে ডেকে নিল শক্তিপ্রসাদ। গম্ভীর মুখ বললে, 'যার সঙ্গে যাচ্ছ, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে আর তোমার স্বামী নয়। সে পরপুরুষ।'

অল্প হেসে শর্বাণী বললে, 'জানি।'

মুখে 'জানি' বলল বটে, কিন্তু মনে যেন পাচ্ছে না মেনে নিতে। তার এতদিনের সেই পুরুষ, শরীরের সকল প্রদীপ জেবলে যার আরতি হয়েছে এতদিন, সে কলমের এক আঁচড়ে অন্যরকম হয়ে গেল? চেনা লোকটা বহু দিনের আদান প্রদানের পর অচেনা হয়ে গেল?

ট্যাক্সি করেই যাচ্ছিল দুজনে। একটা গলির মোড় আসতেই শর্বাণী বললে, 'আমাকে এখানে ছেড়ে দিলেই চলে যেতে পারব।'

ড্রাইভার ট্যাক্সি থামাতেই টুক করে নেমে পড়ল শর্বাণী।

একশো পঁয়ত্রিশ টাকা।

সাত তারিখ পেরোয় না কোনোবার, সাধারণত পাঁচ-ছয় তারিখের মধ্যেই এসে পড়ে। বিশ্বনাথ নেফাতেই থাক কি কাশ্মীরেই থাক, কিংবা বাঙ্গালোর, ডিক্রির নির্দেশ অনুসারে টাকা ঠিক পাঠিয়ে দিচ্ছে হেডকোয়ার্টার্স। ঝড় হোক, জল হোক স্ট্রাইক হোক কি রেল-দুর্ঘটনা ঘটুক, এক মাসও অন্যথা নেই। কোনো প্রমাণ নেই, কেউ নালিশ করছে না, শর্বাণী আবার বিয়ে করেছে বা অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে। টাকা তাই ঠিক নিটোল পৌঁচোচ্ছে শর্বাণীতে।

সে মাসে টাকার অতিরিক্ত একটা পার্শেল এসে পৌঁছুল। সন্দেহ কি, ঠিকানাটা বিশ্বনাথের হাতের লেখা। খুলে দেখল, রঙবেরঙের ছিটের কাপড়। আর তাতে পিন দিয়ে একটি তারিখ গাঁথা।

ধক করে বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল শর্বাণী। ঊর্মির জন্মদিনটা সে ভুলে গেলেও বিশ্বনাথ মনে করে রেখেছে।

কমাস পরে আরো একটা পার্শেল এল শর্বাণীর নামে। পার্শেলটা

খুলতে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগল শর্বাণীর। কী না জানি দেখতে পাবে ভিতরে।

ঠিক একটা রঙিন দামি শাড়ি বেরিয়েছে। আর তার পাড়ের দিকে ঠিক একটি তারিখ আঁটা।

আশ্চর্য, তাদের বিয়ের তারিখটা এখনো মনে করে রেখেছে বিশ্বনাথ।

দেয়ালে টাঙানো ছোট্ট আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালো শর্বাণী। কেন কে জানে, কোনো মানে হয় না, সিঁথির নিষ্প্রভ রেখাটা লালে গাঢ় করে তুলল। মনে কোনো দুরাশা নিয়ে নয়, এমনি বেশ সুন্দর দেখাবে বলে। সম্ভ্রান্ত দেখাবে বলে। মনে হয় এ যেন এক আগুনের শিখা, সমস্ত অসৎ ও অমঙ্গলকে দূরে রাখবে।

ক-মাস পরে এবার এক জলজ্যান্ত লোক এসে হাজির।

'মেজর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে এসেছি। এই সব জিনিসপত্র উনি আপনাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

সেই আবার শাড়ি আর ফ্রক। এবার বাড়তি এক বাক্স সন্দেশ। জিনিস সামান্য কিন্তু ইশারাটা অনেকখানি।

'আপনিই মিস—' শর্বাণীর কুমারী নামটা ধরতে চাইল ভদ্রলোক।

'আমি মিসেস ভটচায।'

'তার মানে আপনি ফের—' আবার ধাঁধায় পড়ল ভদ্রলোক।

'না, আমি যেমন ছিলাম তেমনিই আছি।'

'তার মানে অবিবাহিতই আছেন।'

'বিবাহিত বলেন অবিবাহিত বলেন, ঠিকই আছি।'

অসহায়ের মত হাসল ভদ্রলোক।

একটু কাছাকাছি হবার চেষ্টা করল তারপর। বললে, 'আমি ভটচাযের সঙ্গে একই দলে একই বিভাগে কাজ করি। মিলিটারি পোশাকে এলে নানারকম কথা ওঠবার ভয়ে শাদা পোশাকে এসেছি।'

'তা এসেছেন—ক্ষতি কী!' একটু বুঝি হাসল শর্বাণী।

'ভটচাযের খবর জানেন?'

'কী করে জানব? চিঠিপত্র তো লেখেন না।'

'জানেন গ্রেস—গ্রেসি ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

জানত, যাবে, তবু ধাক্কা খেয়ে শর্বাণী বললে, 'চলে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, ওদের ফের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। তারপর—'

বুকের মধ্যিখানটায় সিরসির করে উঠল শর্বাণীর।

'তারপর একটা সিলোনিজ, সিংহলী মেয়েকে বিয়ে করেছে ভটচায।'

'সিংহলী?' শর্বাণীর বুকের মধ্যিখানটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'সিংহলী খৃস্টান। নাম পামেলা। কিন্তু এটাও বেশিদিন টিকবে না বলে আমাদের ধারণা।' ভদ্রলোক বিজ্ঞের মত মুখ করল : 'আমাদের সকলের

ধারণা, তা আমরা বলেছিও ওকে, ওকে আবার এইখানে এই প্রথম বিন্দুতেই ফিরে আসতে হবে।'

মরা মুখে হাসল শর্বাণী।

ভদ্রলোকের আরো একটু কাজ ছিল, বাড়ির এ-দোরে ও-দোরে গিয়ে কান পাতল, শর্বাণীর সম্বন্ধে কোনো কুকথা আছে কিনা। কেউ একটা টুঁ শব্দও করল না। পাড়ায় একটু দূরে-অদূরে খোঁজ করল, তারাও জানাল, বিরুদ্ধে কিছুই জানি না মশাই। ছোকরাদের একটা জিমনাস্টিকের ক্লাব আছে, তারা জানাল, তারা ইন্টারেস্টেড নয়, ঊর্মি মেয়েটা আরো একটু বড় হয়ে উঠুক তখন দেখা যাবে।

চলে গেল ভদ্রলোক, প্রায় হতাশ হয়ে। নিষ্পুরুষ একা একটা স্ত্রীলোক থাকে, তার নামে কলঙ্ক নেই, এ কী অদ্ভুত কলিকাল! কলঙ্কের স্পর্শ থাকলেই তো মাসোয়ারার টাকাটা বেঁচে যেত বিশ্বনাথের।

তারপর একদিন সন্ধ্যের দিকে হুড়মুড় করে এসে পড়ল বিশ্বনাথ।

'বাবা!' কতদিন হয়ে গিয়েছে, তবু ঊর্মি চিনতে পেরেছে এক নজরে। জড়িয়ে ধরেছে অসঙ্কোচে।

ব্যস্ততায় টগবগ টগবগ করছে বিশ্বনাথ। বললে কোয়েম্বেটোর থেকে আসছি। আজ রাতটা এখানে থেকে কাল সকালেই দিল্লি চলে যাব। সমস্ত দিন প্রায় খাওয়া হয়নি। কিছু ভালো-মন্দ রাঁধো আমার জন্যে। দিশি মতে পাত পেড়ে হাত দিয়ে মেখে খাই। কতদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি। দাঁড়াও, আগে কিছু কিনে কেটে আনি—'

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল বিশ্বনাথ।

মাংস আলু পেঁয়াজ আদা গরম মশলা কিনে এনেছে। দই রাবড়ি সন্দেশও বাদ পড়েনি।

বললে, 'ছোটখাটো একটা ফিস্টি লাগিয়ে দাও। বাড়ির মধ্যে ঊর্মির যারা বন্ধু তাদেরকে নেমন্তন্ন করো। মানে যাকে যাকে তুমি ভালো বোঝো খাওয়াও। আমি আবার একটু বেরুচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সে পরে হবে।' আবার হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল বিশ্বনাথ।

এবার দোকান থেকে শাড়ি জামা নিয়ে এল। শর্বাণী আর ঊর্মি দুজনের জন্যেই। বললে, 'ঊর্মিটা কী সুন্দর হয়েছে! কোন ক্লাশে পড়ছে? কোন ইস্কুলে?'

রান্না নিয়ে মেতে গিয়েছে শর্বাণী। আর বিশ্বনাথ যত গল্প ফেঁদেছে মেয়ের সঙ্গে। পাশের বাড়ির রমার নেমন্তন্ন হয়েছে বলে সেও এসে বসেছে।

যুদ্ধের গল্প। এরোপ্লেনের গল্প। [illegible] গল্প। খুব জমিয়েছে বিশ্বনাথ।

কাজের মধ্যে একটু ফাঁক করে শর্বাণী জিজ্ঞেস করলে, 'অনেক কথা আছে বলছিলে না? কী কথা?'

'সে হবেখন পরে। খাওয়াদাওয়া চুকে যাক। নিরিবিলি হোক।'

'তবু—'

'সে এমনি গল্প বলা নয়। পরামর্শের কথা। হবেখন আস্তে সুস্থে।' গল্পের আবার খেই ধরল বিশ্বনাথ।

খাওয়াদাওয়া নিঃশেষে চুকতে রাত প্রায় এগারোটা। শীতের রাত, মনে হয় যেন কত দুঃসহ গভীর।

ঊর্মি বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে। তাই সে চলে গিয়েছে পাশের বাড়ি, রমার পাশে শুতে। তাদের একা ঘরে তিনজনের শোবার মত জায়গা কই, বিছানা কই?

শীতের জন্যেই দরজাটা ভেজানো ছিল। সময়মত শর্বাণীই খিল লাগাবে।

তক্তপোশের উপর বিছানা। বালিশ দুটো। লেপ একখানা। তাকিয়ে দেখল বিশ্বনাথ। তা একটা রাত চলে যাবে কোনোরকমে।

'মশারি নেই?'

'না।'

'মশা?'

'ঘুমিয়ে পড়লে টের পাইনা।'

'তোমার খুব ঘুম পাচ্ছে, তাই নয়?' বিশ্বনাথ হাসল। বললে 'সিগারেটটা শেষ করে আমিও এবার শুয়ে পড়ব। তখনই বলব তোমাকে কথাটা।'

সিগারেটটা শেষ করে উঠে পড়েছে বিশ্বনাথ, হাওয়ার ঝাপটায় হাট হয়ে হঠাৎ খুলে গেল দরজা।

'বন্ধ করো, বন্ধ করো।' বিশ্বনাথ চেঁচিয়ে উঠল : 'ভীষণ ঠান্ডা!'

দরজার দিকে এক পা-ও এগোলোনা শর্বাণী। আলনায় কোট ছিল সেটা তুলে নিয়ে এগিয়ে ধরল বিশ্বনাথের দিকে। বললে, 'তুমি এবার চলে যাও।'

কনকনে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্বনাথ আর্তনাদ করে উঠল : 'চলে যাব?'

স্পষ্ট স্বরে শর্বাণী বললে, 'হ্যাঁ, চলে যাও। তোমার টাকা কটাই শুধু আসুক।'

৯৫। অদৃশ্য নাটক

টেবল-ল্যাম্পটা খাটের থেকে দূরে, ঢাকা দেওয়া, তবু আলোটা জ্বলতেই জেগে উঠল অণিমা।

'এখন কেমন আছ?'

'আগের চেয়ে ভালো।' ক্লান্ত স্বরে বললে অণিমা।
'ব্যথাটা ?'
'কম আছে। তুমি এখুনি উঠে পড়েছ যে ?'
'ঘুম আসছিল না—'
'কটা বেজেছে ?'
'চারটে বাজতে দশ মিনিট।'
'টেবলে বসে কী করছ ?'
নিজের গালে একবার হাত বুলোল অবনীশ। বললে, 'দাড়িটা কামাবো কিনা ভাবছি।'
'কখন বেরুবে ?'
'আধঘণ্টাটাকের মধ্যে।'
'ড্রাইভার আসবে ?' অণিমার স্বরে একটু বুঝি উদ্বেগ।
'আসবে কী, কুঠিতে রেখে দিয়েছি। রাত্তিরে বাড়ি যেতে দিইনি।' অবনীশের বলায় বেশ খানিকটা কৃতিত্বের ছোঁয়া।
এমনিতে কোয়ার্টারকে বাঙলায় বাড়ি বা বাসা বলে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের বেলায় তার নাম হয় কুঠি।
ক্লান্ততর কন্ঠে অণিমা বলল, 'তুমি না গেলেই পারতে।'
'আগে আর কোনোদিন দেখিনি।' গর্বের ভাব করল অবনীশ।
একটা দেখবার মত দৃশ্য বটে। পাহাড়ে উঠে সূর্যোদয় দেখার মত। কিংবা হঠাৎ নীল একটা সমুদ্রের মুখোমুখি হওয়ার মত।
ক্রিং ক্রিং। টেলিফোন বেজে উঠল।
'হ্যালো।' একবার বাজতেই রিসিভার তুলে নিল অবনীশ।
ওপারে নারীকন্ঠ। প্রথমে নম্বরটা যাচাই করে নিল। পরে জিজ্ঞেস করলে, 'জাগিয়ে দিতে বলেছিলেন। জেগেছেন ?'
'অনেকক্ষণ আগে থেকেই জেগে বসে আছি। ধন্যবাদ।' অবনীশ রিসিভার রেখে দিল।
'কার ফোন ?' প্রশ্ন করল অণিমা।
'য়্যালার্ম কল। টেলিফোন অফিসকে ফোন করে রেখেছিলাম চারটের সময় জাগিয়ে দিতে। তাই দিয়েছে।' অবনীশ ঘড়ির দিকে তাকাল : 'ঠিক চারটে। কাঁটায়-কাঁটায়।' উঠে পড়ল অবনীশ : 'সব একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় হওয়া চাই।'
বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শেষরাত্রির শহর। আর কতক্ষণ পরেই উঠি-উঠি করবে। এখনো নীরব, নিদ্রাচ্ছন্ন।
সমস্ত মহৎ দৃশ্যই বুঝি নীরব। আকাশ নীরব, পাহাড় নীরব, হ্যাঁ, সমুদ্রও নীরব।
শব্দ শুরু হয়েছে।. গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করছে ড্রাইভার।

ড্রাইভারও ঠিক ঘড়ি দেখে নিয়েছে। সমস্ত কাঁটায়-কাঁটায়।

ভিতরে চলে এল অবনীশ। চটপট তৈরি হয়ে নিতে হয় এবার।

'আর কে যাচ্ছে?' কী রকম আতঙ্কিত অণিমার প্রশ্ন।

'সিভিল সার্জন।'

'তোমার বদলে আর কাউকে পাঠাতে পারতে না?'

'তার আর সময় নেই। তাছাড়া আমার ঝক্কি কী।' আশ্বাসের সুরে অবনীশ বললে, 'আমার শুধু দেখা আর সই করা।'

সব আধা-আধা পোশাক, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল অবনীশ।

'কতক্ষণে ফিরবে?'

অবনীশ হাতঘড়ির দিকে তাকাল : 'কতক্ষণ আর! ধরো সাড়ে পাঁচটা বড়জোর।'

'চা খেয়ে যাবে না?'

'ওরে বাবা, একদম সময় নেই।' অবনীশ আবার ঘড়ির দিকে তাকাল : 'সমস্ত কাঁটায়-কাঁটায়।'

'শিগগির শিগগির ফিরো।'

'ফিরব। তুমি ভালো থেকো।' সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল অবনীশ।

গাড়ি তৈরি। চলো।

অণিমার বুঝি ইচ্ছে, তার যখন হঠাৎ অসুখ করেছে, তখন অবনীশ কোথাও না গেল!

এ যেন বাড়িতে বসে গড়িমসি করবার মত একটা ব্যাপার। অন্তত দেরিতে গিয়ে উপস্থিত হবার মত। মোটেই তা নয়। এ এমন একটা কাজ যা সমস্ত কিছুর চেয়ে জরুরি। পাঁচটার এক মিনিট ও-দিকে যাবার অধিকার নেই। স্টেশন ছাড়তে ট্রেন দেরি করতে পারে, এ পারবে না।

ফটকে স্বয়ং সুপারইন্টেন্ডেন্ট দাসঘোষ দাঁড়িয়ে।

'এই যে এসেছেন।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দাসঘোষ।

'সিভিল সার্জন কোথায়?'

সঙ্গে-সঙ্গেই সিভিল সার্জন এসে উপস্থিত।

'যাক। এসে গিয়েছেন।' নিশ্চিন্ত হল দাসঘোষ। বললে, 'চলুন। প্রিজনারকে দেখবেন।'

আস্তে-আস্তে হেঁটে-হেঁটে সবাই চলল এগিয়ে।

সিভিল সার্জন, সান্যাল, দাসঘোষকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার জেলের ঘানির তেল পাচ্ছি না কেন?'

'সে কী? দাসঘোষ চমকাবার ভাব করল : পাচ্ছেন না? দাঁড়ান, দেখছি।'

'আর আমার মোড়া আর শতরঞ্চি কী হল?' জিজ্ঞেস করল অবনীশ।

'সে কী? দাঁড়ান, আজই সব ব্যবস্থা করছি।'

আলাপ-আলোচনা করবার কী উপযুক্ত বিষয়! দাসঘোষ ভাবল।

'বাঃ, সুন্দর ফুল ফুটিয়েছেন কিন্তু।' অবনীশ মুগ্ধের মত বললে।

'ফুল! ফুল দিয়ে কী হবে!' সান্যাল হাসল : 'তরকারি কোথায়?'

'ঐ দিকে।' দাসঘোষ বললে।

কিন্তু ঐ দিকে না গিয়ে দাসঘোষ অন্যদিকে নিয়ে এল সবাইকে। বললে, 'এই সব কনডেম্‌ড সেল।'

সার-সার কতগুলো ছোট-ছোট লোহার খাঁচা। বেশির ভাগই খালি। একটাতে মেঝের উপর একটা লোক ঘুমিয়ে আছে। আরেকটাতে আরেকটা লোক বসা।

সান্যাল জিজ্ঞেস করল : 'ফাঁসি যাবে কে?'

বসা লোকটাকে দেখিয়ে দিল দাসঘোষ। বললে, 'নামের বাহার আছে। নাম সংসারেশ্বর হাজরা।'

ছোটখাটো দেখতে। রোগাটে। শুধু একমুখ দাড়িতেই যা বিসদৃশ লাগছে। নইলে এমনিতে নিতান্ত শাদামাটা। বয়েস কত হবে? ত্রিশ-চল্লিশের মাঝামাঝি।

'বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই।' সান্যাল বললে বুদ্ধি খাটিয়ে।

'তা আর পারেনি?' দাসঘোষ হাসল : 'সামনেই জলজ্যান্ত ফাঁসিকাঠ। কাল রাতভোর কাজ করে এটাকে ফিট করা হয়েছে। দেখা হয়েছে টেস্ট করে। শব্দে-টব্দেই বুঝে নিয়েছে যেতে হবে ভোরবেলা।'

'ওরই যেতে হবে কি করে বুঝল?' এও সান্যালই জিজ্ঞেস করল।

'ওই যে একমাত্র তৈরি। আপিল-টাপিল সব গেছে। মার্সিপিটিশনও রিজেক্টেড হয়েছে। শেষ ইচ্ছেটিচ্ছেও চুকে গেছে। এখন যখন ফাঁসিকাঠ ফিট করা হয়েছে, ও বুঝে নিয়েছে এ সব ওরই জন্যে। দেখছেন না, ঘুমুতে পারেনি, জেগে বসে আছে।'

অবনীশের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। লোকটা জেগে বসে আছে মৃত্যুর অপেক্ষায় আর সে জেগে বসে ছিল হত্যার অপেক্ষায়। ও দেখবে মৃত্যু আর সে দেখবে হত্যা।

সান্যালের যত সব বেয়াড়া কৌতূহল। জিজ্ঞেস করল : 'শেষ ইচ্ছেয় কী চেয়েছিল ও?'

'হয়তো কারু সঙ্গে দেখা-টেখা, কিংবা কাউকে কিছু দেওয়া-থোওয়া— এই জাতীয়।' দাসঘোষ উপেক্ষার সুরে বললে : 'ওর সেই স্টেজ পেরিয়ে গেছে। ওর এখন শুধু—'

'আচ্ছা শেষ ইচ্ছেয় এমন যদি কিছু চায় যা পূরণ করা যায় না?'

'পূরণ হয় না। একবার একজন বলেছিল, আমার শেষ ইচ্ছে হচ্ছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অসুখে ভুগে মরব। নিন, পূরণ করুন শেষ ইচ্ছে।' দাসঘোষ শব্দ করে হেসে উঠল।

সান্যালও হাসল।

সমস্তই যেন একটা প্রাণহীন রুটিন। ডাক্তারের পক্ষে বড় জোর একটা রুগী দেখা।

সেলের সামনে এসে দাঁড়াল দাসঘোষ। বললে, 'সংসার, উঠে দাঁড়াও।'

আস্তে-আস্তে ক্লান্ত পায়ে উঠে দাঁড়াল সংসার। সকলের দিকে তাকাল শূন্য চোখে। যদিও কেউ বলেনি, হাত তুলে নমস্কার করল সকলকে।

'কী করেছিল?' যদিও এটা সহজেই বোধগম্য, খুন ছাড়া ফাঁসি হয় না, তবুও চেহারাটা দেখে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না অবনীশ।

'খুন করেছিল।'

'কী হে, খুন করেছিলে?' কোনো দরকার নেই, সান্যাল রসিকতা করতে চাইল।

'যদি বলি করিনি, অন্তত এটা করিনি, তা হলে কি ছাড়া পাব?' দিব্যি বিজ্ঞের মত হাসল সংসার।

ওয়ার্ডার তালা খুলতে লাগল।

দাসঘোষ বললে, 'সংসার, ভগবানের নাম করো।'

সংসার ঘৃণার চোখে তাকাল। বললে, 'আপনারা করুন, আমার সঙ্গে তো এক্ষুনিই দেখা হবে।'

ধীর শান্ত পায়ে সংসার বেরিয়ে এল। তাকে যেন আরো নিরীহ মনে হল। অবনীশ জিজ্ঞেস করল; 'এর কেস-হিস্ট্রীটা কী?'

'সে কী, রায়টা পড়ে আসেননি?' সংসার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর প্রায় মুখিয়ে এল : 'সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস! এখন অত সব বলবার সময় নেই। পরে জেনে নেবেন। না জানলেই বা ক্ষতি কী! নিন, কাজটা তাড়াতাড়ি হাসিল করুন।'

'চট করে চান করিয়ে নাও।' সিপাই-সান্ত্রীদের হুকুম করল দাসঘোষ।

'কী দরকার!' সংসার মৃদু আপত্তি করল।

'ভগবানের সঙ্গে দেখা হবে, শুদ্ধ হয়ে যাওয়া ভালো।' সান্যাল রসিকতা করল।

'তা হলে,' গালে হাত বুলোল সংসার, 'তা হলে তো দাড়িটাও কামিয়ে নিতে হয়! শুনুন, চান-টান থাক। শরীরে জ্বর-জ্বর ভাব।'

কয়েক মুহূর্ত পরে যে শরীর অবধারিত শেষ হয়ে যাবে তার আবার জ্বরজ্বর ভাব।

'কই দেখি।' সান্যাল সংসারের হাত ধরে নাড়ী দেখল, বললে, 'ও সেরে যাবে—সমস্ত সেরে যাবে।'

দু বালতি জল ঢালিয়ে চটপট স্নান করিয়ে নেওয়া হল, পরিয়ে দেওয়া হল নতুন কুর্তা আর জাঙিয়া। এবার চলো মঞ্চের দিকে। সময় পার করিয়ে দেওয়া যাবে না, কিছুতেই না। ঠিক পাঁচটার সময় ফাঁসি। কাঁটায়-কাঁটায়।

জগৎসংসার ঘুমুচ্ছে। যে জজ ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল সেও ঘুমুচ্ছে।

উপরের যে দুই জজ এই ফাঁসির আদেশ বহাল রেখেছে, তারাও। কে খোঁজ রাখছে সেই আসামী সংসার হাজরার কী হল, কবে কখন তার ফাঁসির লগ্ন! দড়িতে ঝোলবার আগে সে কী বলেছিল, কী করেছিল! ভিতরে তার কিসের জবর কিসের যন্ত্রণা!

কারুর কিছু খোঁজ নেবার দরকার নেই। ছটায় জেনারেল ওয়ার্ডের কয়েদীদের খুলে দেবার কথা। তার আগেই নীরবে ফাঁসিটা হাসিল করা চাই। যেন কেউ দেখতে না পায় বুঝতে না পায় ঘন্টাখানেক আগে কী হয়ে গেল!

স্বাভাবিক পা ফেলে সংসার হাজরা মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল।

'সংসার খুব ভালো লোক।' দাসঘোষ সার্টিফিকেট দিল।

তার মানে, সংসার কোনো গোলমাল পাকাচ্ছে না। কত কয়েদী, বললে দাসঘোষ, মঞ্চের দিকে এগুতে ভয় পায়, কান্নায় ভেঙে পড়ে; মরব না, মরতে পারব না বলে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। সে সব শায়েস্তা করতে কত হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। কতজন তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে যায়। তখন তাকে আবার সুস্থ করো।

আবার কেউ-কেউ ধীর দৃঢ় পায়ে ভদ্রলোকের মত মঞ্চের উপর গিয়ে দাঁড়ায়।

'বক্তৃতা করতে হবে না।' দাসঘোষের উপর হুমকে উঠল সংসার : 'তাড়াতাড়ি যন্ত্রণা শেষ করে দিন।'

'হ্যাংম্যান এসেছে?' খাটো গলায় জিজ্ঞেস করল অবনীশ।

'জজ ম্যাজিস্ট্রেট না হলে চলে কিন্তু ফাঁসুড়েকে আগে চাই।' বললে দাসঘোষ, 'ঐ যে হ্যাংম্যান।'

সংসারের চেয়েও নিরীহ। একটা আসামী নিজ হাতে আর কটা খুন করেছে, আর এই ফাঁসুড়ে নানা জেলার নানা জেলে ঘুরে-ঘুরে কত যে দড়ির টানে লোক মেরেছে তার কে হিসেব রাখে?

'রাত থাকতে আনিয়ে রেখেছি।' বিচক্ষণের মত বললে দাসঘোষ, 'মদ দিয়েছি। নইলে ও উত্তেজনা পাবে কিসে? ওই তো নাটকের হিরো। ও না থাকলে তো নাটকই নিরর্থক।'

ঠিকই তো। ওই তো সমাজকে ধরে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে। আইনে মৃত্যুভয় আছে বলেই তো খুনখারাপিটা সীমাবদ্ধ রাখা গিয়েছে। মৃত্যু যদি পৌঁছেই না দেওয়া যায় তাহলে মৃত্যুভয়ের মানে কী! ফাঁসির 'লেভার'টা যে ও ধরে রয়েছে তার মানেই ওর হাতে রাজ্যের হাল ধরা।

দক্ষ অভিজ্ঞের মত এটা দেখছে ওটা দেখছে। ফিনিশিং টাচ দিয়ে রাখছে। এমনি একটা ভাব দেখাচ্ছে ও-ও যেন যন্ত্রেরই একটা অংশ। ওর দোষ কী!

না, কারুরই কোনো দোষ নেই। যে হুকুম দিয়েছে, যারা সে হুকুম

বহাল রেখেছে, যারা সে হুকুম তামিল করছে, সবাই নির্দোষ। যে যার হৃদয় পকেটে রেখে যার যা কাজ তাই নির্বিকারে করে যাচ্ছে। একটা প্রাণ যায় তো যাবে। যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে।

তাই কেস হিস্ট্রিটা জানতে চেয়েছিল অবনীশ। হয়তো দেখবে কী ভীষণ অমানুষিক, কী নৃশংস নির্মমের মতই না জানি খুন করেছে। অনুকূলে তন্তুমাত্রও বলবার নেই বলেই তো যাবজ্জীবন না হয়ে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। যতক্ষণ আইনের চোখে সে খুনে ততক্ষণ তার প্রতি সমাজের হয়তো কোনো সহানুভূতি নেই, কিন্তু এখন যখন সে ফাঁসির দড়ি গলায় লটকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন কেন-যেন তাকে আর অন্যের প্রাণ-কাড়া খুনে বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে প্রাণপণে বাঁচতে-চাওয়া অসহায় একটা মানুষ। কী হয় যদি সংসারকে ছেড়ে দেওয়া হয়? যদি গলায় দড়িটা বেফাঁস হয়ে যায়?

শেষ মুহূর্তেও তো কত কিছু ঘটে যেতে পারে। একটা ভূমিকম্প হয়ে সব তছনছ হয়ে যেতে পারে। উপস্থিতদের মধ্যে কেউ মরে যেতে পারে থ্রম্বসিসে। শত্রু দেশ যদি এ সময়ে এয়ার-রেড করে তাতেই বা বাধা কোথায়?

অবনীশ মনে মনে হাসল। তার মনটা একটু নরম হয়েছে বোধহয়। সূর্য ওঠবার আগে আরেকটা সূর্য অস্তে চলে যাবে, আর কোনোদিন উঠবে না, এ ভাবতে মন যদি একটু নরম হয় তাতে আর দোষ কী।

হ্যাংম্যান-এর উদ্দেশে সংসার গালাগাল দিয়ে উঠল। বললে, 'শিগগির শেষ করো। এ যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না।'

না, আরো কিছু কৃত্য আছে। দাসঘোষ ওয়ারেন্ট পড়তে লাগল।

'তুমি সংসারচন্দ্র হাজরা, তোমাকে অমুক আদালত দণ্ডবিধি আইনে অত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে, দোষী সাব্যস্ত করে তোমাকে প্রাণদণ্ডে আদেশ দিয়েছে, সে আদেশ অমুক আদালত সমর্থন করেছে, দণ্ডাদেশে বিরুদ্ধে তুমি আপিল করেছিলে, সে আপিল ডিসমিস হয়েছে, তারপ তুমি—'

'থামুন, থামুন।' ঘোষণার মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠল সংসার : 'ও শুনিে আর লাভ কী। অনেক—অনেক শুনেছি। আর যন্ত্রণা দেবেন না। সইতে পাচ্ছি না—'

নিজের পরাজয়ের কাহিনীটা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নতুন করে শুনতে যেন সে প্রস্তুত নয়।

'দিন, দিন, তাড়াতাড়ি শেষ করে দিন।'

দাসঘোষ বললে, 'এ দেখি অদ্ভুত। বাঁচতে চায় না, মরতে চায়। শে হয়ে যেতে চায়।'

অবনীশ চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'তবে আর দেরি কেন?'

আরো একটু করণীয় আছে। নামাবলী গায়ে এক পণ্ডিত গীতা পড়তে সুরু করল।

দাসঘোষ হাসল। লঘু স্বরে বললে, 'এটিকেও আগে থেকে জোগাড় করে রেখেছি। কোনো কিছুতে কম না পড়ে।'

সংসার বুঝল তাকে বুঝি ধর্মকথা শোনানো হচ্ছে। সে দুহাতে তার দু কান চেপে ধরল। তীব্র স্বরে আর্তনাদ করে উঠল : 'শুনতে চাই না-শুনতে চাই না। আমার কথাটা শুনুন। তাড়াতাড়ি খতম করে দিন।'

একজন মৃত্যুপথযাত্রীর কান্নার কাছে গীতাপাঠ অর্থহীন।

পন্ডিত স্তব্ধ হয়ে গেল।

না, আর কিছুই করবার নেই।

ফাঁসুড়ে এগিয়ে এল। পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে সংসারের হাত বাঁধল। সংসার এতটুকুও বাধা দিল না। পরক্ষণেই খুলে দেবে এমনি আশ্বাসে শিশু যেমন মাকে হাত বাঁধতে দেয় তেমনি সহজেই সমর্পণ করল সংসার।

'তাড়াতাড়ি করো!' সংসার আবার গর্জে উঠল।

হ্যাংম্যান ঝুলন্ত ম্যানিলা দড়ির ফাঁসটা সংসারের মাথার মধ্যে গলিয়ে দিল। গলার কাছে টাইট দিল তারপর। না, কাউকে চোখ বন্ধ করতে হবে না। একটা কালো কাপড়ের থলে দিয়ে সংসারের মুখটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। না, কারুর ভয় পাবারও কিছু নেই। সব নীরবে সম্ভ্রান্তভাবে শেষ হবে।

দেখতে এসেছ, চোখ মেলে দেখ। সমস্ত মহৎ দৃশ্যই নীরব। মৃত্যুও নীরব।

সরে গিয়ে লেভারে হাত দিল হ্যাংম্যান। অবনীশের দিকে তাকাল। অবনীশ ইঙ্গিত করলেই টেনে দেবে লেভার। আর লেভার টেনে দিলেই সংসারের পায়ের নিচের পাটাতন সরে যাবে ও সংসারের মৃতদেহ নেমে যাবে নিচের গর্তে। শেষ হয়ে যেতে এক পলকের বেশি লাগবে না।

হ্যাংম্যান তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। হয়তো বা রুদ্ধ নিশ্বাসে।

অবনীশ ঘড়ি দেখল। পাঁচটা বাজতে এখনো পাঁচ মিনিট বাকি।

আরো পাঁচ মিনিট! কী দুঃসহ যন্ত্রণায় সে না জানি প্রতীক্ষা করছে। শেষ দিকে তার তো শুধু এই আর্তনাদই ছিল : তাড়াতাড়ি করো, শিগগির শেষ করে দাও। তার শেষতম আকাঙ্ক্ষাটুকু পূরণ করা ভালো। মৃত্যুর অপেক্ষায় এমনি বন্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখার যন্ত্রণাটাও অসহ্য।

হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল অবনীশ। হ্যাংম্যান লেভার টেনে দিল।

সার্টিফিকেটে যথারীতি ফাঁসির সময় পাঁচটাই লেখা হয়ে আছে। সই করবার সময় অবনীশ বললে, 'পাঁচ মিনিট আগে হয়ে গেছে।'

লঘু স্বরে দাসঘোষ বললে, 'ও কিছু নয়।'

সিভিল সার্জনের এখুনি যাওয়া চলবে না। ঘন্টাখানেক পরে মৃতদেহটা তুলতে হবে পিট থেকে, পোস্টমর্টেম করতে হবে। এ যেন কেউ সন্দেহ না করে ফাঁসি না দিয়ে কয়েদীকে অন্যভাবে মারা হয়েছে।

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের আর কোনো কাজ নেই। তার ছুটি।

তাড়াতাড়ি কুঠিতে ফিরে এল অবনীশ।

এসে দেখল তুমুল কাণ্ড। ব্যথার তাড়সে অণিমা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। তাকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। একটা গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না এতক্ষণে।

সে সব জবাবদিহি পরে হবে। অবনীশ পাগলের মত হয়ে উঠল। লোকজন নিয়ে, হুড়মুড় করে, অথচ ধীরে-সুস্থে গাড়িতে তোলা হল অণিমাকে। চলো সটান হাসপাতাল।

এ-ওয়ান ভি-আই-পি, অণিমা তক্ষুনি ভর্তি হয়ে গেল। সোজা অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে চলো। বড় ডাক্তার মুখার্জিসাহেব এসে গিয়েছেন। সাজ-সাজ রব পড়ে গিয়েছে চারদিকে। এখুনি, এই মুহূর্তে ছুরি চালাতে হবে।

ডাক্তার মুখার্জি বললে, 'পাঁচ মিনিট দেরি করে এলে বাঁচানো যেত না।'

পাঁচ মিনিট! অবনীশের বুকের ভেতরটা হঠাৎ যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। সংসার হাজরার জীবন থেকে পাঁচ মিনিট কেড়ে নিয়ে এসে সে অণিমার জীবনে, নিজের জীবনে পূরণ করেছে।

হ্যাঁ, খুনে, তুমিও খুনে—অবনীশের সমস্ত সত্তা নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠল। তুমি সংসার হাজরাকে হত্যা করেছ। একটা লোকের কয়েক বছরের জীবন শেষ করে দেওয়া যেমন খুন, একটা লোকের পাঁচ মিনিটের জীবন শেষ করে দেওয়াও তেমনি খুন।

পাঁচ মিনিটে কত কিছু হতে পারত। এয়ার-রেড হতে পারত, ভূমিকম্প হতে পারত, ম্যানিলা দড়িরও ফাঁস যেতে পারত খুলে। পরে হয়নি বলে তখন হতে পারত না এর কোনো যুক্তি নেই। মানুষের জীবনে অবধারিত বলে কিছু নেই। কত সময়ে দেখা গেছে শেষ মুহূর্তে ঘটে গেছে অঘটন।

হ্যাঁ, তুমি খুনে। তুমি পাঁচ মিনিট কম খেলিয়েছ। শেষ মিনিটে হুইসলের সঙ্গেসঙ্গেই গোল হয়ে যেত কিনা তুমি তার কী জানো।

তোমার শুধু খুন নয়, ডাকাতির সঙ্গে খুন। ড্যাকয়টি উইথ মার্ডার। তুমি শুধু খুন করনি, সংসারের বিত্ত চুরি করে এনে তোমার স্ত্রীর ভাণ্ডারে জমা দিয়েছ। তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাবার তোমার কী অধিকার ছিল? এখন তোমার নিজের যন্ত্রণায় অবসান ঘটাও।

'অপারেশান হয়ে গিয়েছে। সাকসেসফুল অপারেশান।' ডাক্তারের সহকারী ঘোষণা করল।

'জ্ঞান ফিরেছে?' ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল অবনীশ।

'জ্ঞান ফিরতে দেরি আছে।'

কে জানে ফিরবে কিনা। অবনীশ বাড়ি চলে গেল। জরুরি কিছু কাজ সেরে মাথায় দু-ঘটি জল ঢেলে দুমুঠো মুখে গুঁজে আবার হাসপাতালে ধাওয়া করলে।

'জ্ঞান ফিরেছে?'

'না, এখনো ফেরেনি।'

'কে জানে ফিরবে কিনা। কে জানে কেউ দয়াপরবশ হয়ে তার এ প্রতীক্ষার অবসান ত্বরান্বিত করবে কিনা।

কেউ না, কেউ না। কারো অমন নিষ্ঠুর দয়া নেই। যা হবে, ঠিক-ঠিক হবে। আগে পরে কিছু নেই। প্রতীক্ষা যদি করবার হয় প্রতীক্ষা করো। যন্ত্রণা কম করাবার তুমি কে?

এখন তোমার এ যন্ত্রণা অন্তহীন।

অণিমার জ্ঞান ফিরতে ফিরতে সন্ধে। হ্যাঁ, চোখ চেয়েছে, লোক চিনেছে, ভালো আছে। যে কালো থলেটার মধ্যে মুখ মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল তা খুলে নেওয়া হয়েছে। খুলে নেওয়া হয়েছে গলার ফাঁস, হাতের বাঁধন। যাও তোমার ছুটি। আরো কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি। এখনো সময় পুরো হয়নি, হয়নি কাঁটায়-কাঁটায়। জীবনের অন্তিমতম নিশ্বাসটুকু পর্যন্ত উপভোগ করো।

পাঁচ মিনিট! পাঁচ মিনিটেরই অগাধ দাম! তুমি জানো না শেষ মুহূর্তে হুইসলের সঙ্গে-সঙ্গেই গোল হয়ে যাবে কিনা।

গেটের সামনে একমাথা চুল ও একমুখ দাড়িওলা একটা ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে আছে দেখে থমকে দাঁড়াল অবনীশ।

'কী চাই?'

'আমাকে পাঁচ—' হাত পাতল ভিক্ষুক।

'কী পাঁচ? পাঁচ পয়সা, না পাঁচ টাকা?" মনিব্যাগে হাত রাখল অবনীশ।

'আমাকে আমার প্রাপ্য পাঁচ মিনিট ফিরিয়ে দিন।'

কে, সংসার হাজরা না? ধরো, ধরো। গার্ডদের উদ্দেশে হুমকে উঠল অবনীশ। কই, কে, কেউ না। আর, সংসার হাজরা কোথায়? তার তো আজ সকালেই ফাঁসি হয়ে গেছে।

'না, এখনো হয়নি।' অবনীশ উদ্ভ্রান্তের মত বললে, 'এখনো তার পাঁচ মিনিট বাকি।"

৯৬। ইনি আর উনি

একই ইস্কুলে পড়তো আর ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়েছে একই চাকরিস্থলে। গেজেটে যখন দেখলো সুরমা এখানে আসছে, খুশিতে উছলে উঠেছিল শিবানী। আর কে-কে অফিসর সেখানে আছে খোঁজ নিতে গিয়ে যখন জানলো শিবানী আছে তখন সুরমার আনন্দ আর ধরেনি। কী গলায়-

গলায় বন্ধুতা ছিল তাদের। নতুন জায়গার নতুন জীবনে আবার তাদের দেখা হবে। ভাবতেই কেমন ভালো লাগে।

বুঝতে কারু ভুল না হয়, এখানেই বলে রাখা ভালো, সুরমার স্বামী কৃষ্ণধন মুন্সেফ, আর শিবানীর স্বামী কুঞ্জবিহারী সার্কেল-অফিসর।

জায়গাটা চৌকি, গ্রামের উপর একটুখানি শহরের সোনার জল বুলোনো। 'মাগো, এ কোথায় নিয়ে এলে।' পাল্কিতে উঠতে প্রথম গুঁতো খেয়েই সুরমা আপত্তি জানালো, বললে, 'ভাগ্যিস বাণী আছে নইলে গিয়েছিলাম আর কি।' ওদিকে ইস্টিশানে ট্রেনের বাঁশি শুনে শিবানী বললে উৎফুল্ল হয়ে। 'বাবা, সুবোকে পেয়ে বাঁচবো এত দিনে।'

কিন্তু সমস্যা বাধলো, কে কার সঙ্গে আগে গিয়ে দেখা করে।

এক দিন দু দিন তিন দিন কাটলো।

আদালত থেকে পাওয়া কাঁঠাল কাঠের চেয়ারে বসে কৃষ্ণধন চা খাচ্ছিলো। বললে, 'কি গো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে না?'

সুরমা ঝাঁজিয়ে উঠলো : 'কেন, ও আসতে পারে না আগে?'

কৃষ্ণধন হাসল। বললে, 'তোমারই তো আগে যাওয়ার কথা। যে অফিসার নতুন আসে তারই আগে যেতে হয়। দেখনি রেল-ইস্টিশানে, যে ট্রেনটা শেষে আসে সেটাই আগে ছাড়ে। লাস্ট ইন ফার্স্ট গো। আগের আগের জায়গায় তো আগেই গিয়েছ দেখেছি।'

'ওর সঙ্গে কি আমার অফিসারের সম্পর্ক নাকি?' সুরমা আহত অভিমানের সুরে বললে, 'আমি এসেছি শুনেই ও ছুটে চলে আসতে পারত না? ঐ তো দু রশি দূরে বাসা। নতুন জায়গায় কি কি অসুবিধের মধ্যে এসে পড়েছি ও খোঁজ নিতে পারত না একটু? প্রথম দিনটা ওর ওখানে খাইয়ে দিতে পারত না আমাদের?'

কৃষ্ণধন বললে, 'সে কথা তো লেখনি ওঁকে। উনি জানবেন কি করে যে কবে আসছ!'

'আহা, ন্যাকামি শুনলে গা জ্বলে। সাত দিন ধরে সমস্ত শহর সরগরম, হাকিম আসছে, আর উনি জানেন না! পাল্কিতে যখন আসি তখন রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কাতারে-কাতারে, আর উনিই শুধু ওঁর বাইরের বারান্দায় একটু বেরিয়ে আসতে পারেন নি! আমি চিনি ওকে। ওর ভীষণ দেমাক, ছেলেবেলা থেকেই দেমাক। ইস্কুলে ওকে কেউ ওর বাপের নাম জিগগেস করলে নামের সঙ্গে ডেপুটি না বলে ছাড়তো না। কত তো শুনেছিলাম হ্যানো হবে ত্যানো হবে' সুরমা তার দু হাতের ভঙ্গিতে চিত্রাকার করে তুলল : 'শেষ পর্যন্ত তো সাবডেপুটির উপরে জুটল না!'

দৃশ্যান্তরে, টুর থেকে ফিরে, কুঞ্জবিহারী স্ত্রীকে জিগগেস করল, 'কি গো, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো? কেমন দেখতে? ছিপছিপে না গোলগাল?'

'যাও-না, নিজে গিয়ে দেখে এসো না।' শিবানী খেঁকিয়ে উঠল।

'আহা, চটো কেন, এ সব খবরগুলো লোকে স্ত্রীর মারফৎই জেনে থাকে। আমি নিজে আর যাই কি করে?'

'তবে আমি যাব, বলতে চাও?' শিবানী ফুঁসিয়ে উঠল।

'কেন, উনি আসেন নি এখনো দেখা করতে? আমি তো ভেবেছিলাম লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরে এসে হনুমান যেমন সবার আগে কৈকেয়ীকে দেখতে ছুটেছিল—তেমনি তোমার বন্ধু—'

'তুমি তো চেন না ওকে, আমি চিনি। হাকিমের বউ হয়ে ওর ভীষণ দেমাক বেড়ে গেছে। আগে এমন ছিল না, যখন বিয়ের আগে ও পেস্কারের মেয়ে ছিল। যে হাকিম ওর বাপের কাছে ছিল বিভীষিকা সেই এখন ওর হাতের মুঠোয়, আর ওকে পায় কে! যেন একেবারে হাওয়ার উপরে উড়ে চলেছে।'

কুঞ্জবিহারী একটা ঢোক গিলল। বললে, 'অতটা না-ও হতে পারে। নতুন এসেছেন, গোছগাছে হয়ত সময় পাচ্ছেন না। তুমিই না হয় গেলে, ক্ষতি কি!'

'কেন আমার কি মান-সম্মান বলে কিছু নেই?' শিবানীর গলা অভিমানে ভারি হয়ে এলো, 'মাইনে দু-টাকা কম পাই বলে কি মনুষ্যত্বটাও কম বলতে চাও?'

শিবানীর বড় মেয়ের নাম আভা। বারো-তেরো বছর বয়েস। একদিন বিকেলে সে এসে বললে, 'ওদের মালপত্র সব এসে গেছে মা। গিয়েছিলাম দেখতে। গুচ্ছের কতগুলো বাসন ছাড়া আর কিছু নেই। আমাদের মতন এমন সাজানো ড্রইং-রুম নেই, আর জানলা-দরজায় সব কাপড়ের পাড় সেলাই করে পর্দা করেছে।'

বাঁকা ঠোঁটে আভা হাসতে যাচ্ছিল, শিবানী হঠাৎ তার চুল টেনে ঘাড়ের উপর তীব্র চিমটি কেটে দিল। বললে, 'তোর আগ বাড়িয়ে যাবার কী হয়েছিল শুনি? ওরা আসে? ওরা এসেছে আগে?'

কাজটা যে সমীচীন হয় নি আভা সেটা বুঝতে পেরেছে। এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হলে ও-বাড়ির সমবয়সী গৌরীকে ছলে-বলে এ বাড়িতে নিয়ে আসা দরকার।

'যাব মা, ও বাড়ি?' গৌরী সুরমার মত চাইতে গেল।

যেতে পারে—সুরমা মনে-মনে বিচার করে দেখল। যেহেতু সাব-ডেপুটির মেয়ে আগে এসেছে এ-বাড়ি।

'শোন, কিছু খেতে দিলে খাসনে যেন। কি পড়িস জিগগেস করলে বলিস বাড়িতে পড়ি, আর যদি গান গাইতে বলে রেকর্ডের নতুন গান দুখানা শুনিয়ে দিস।' সুরমা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'আবার যেন গলা চেপে গেয়ো না।'

দুপুর বেলা কে একজন ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসেছেন।

সুরমা চিনতে পারেনি, আপ্যায়ন করে বসতে দিয়ে জিগগেস করলে: 'আপনি কে?'

ভদ্রমহিলা সুগম্ভীর মুখে সংক্ষেপে জানালেন যে তিনি জমিদারের এ-এলাকার নায়েবের স্ত্রী—আর তাঁর স্বামীর আয় না বলে জমিদারের আয় বললেন বছরে ষাট হাজার টাকা।

কথায়-কথায় ভদ্রমহিলা জিগগেস করলেন, 'সারখেল সাহেবের বৌয়ের সঙ্গে আলাপ হয় নি?'

প্রথমটা সুরমা বুঝতে পারে নি, পরে বুঝল সারখেলটা সার্কেলের অপভ্রংশ।

'না, কই, সুযোগ হয় নি এখনো।'

'ওমা, সে কি কথা? আসেনি এখনো?' ভদ্রমহিলা বিস্ময়ের ভাব দেখালেন। বললেন, হাঁটু-কাটারই তো হাঁটু-ঢাকার কাছে আগে আসা উচিত। মর্যাদা তো একটা আছে!'

বড় জোর গলা-কাটা বা বুক-ঢাকা শোনা গেছে, কিন্তু ও দুটো আবার কি জিনিস?

'ও! আপনি জানেন না বুঝি?' ভদ্রমহিলা মুখ টিপে হাসতে লাগলেন: 'ও দুটোর মানে হচ্ছে হাফ-প্যাণ্ট আর ফুল-প্যাণ্ট—বুনো ডেপুটি আর কুনো মুন্সেফ।'

কথাটা সুরমা উপভোগ করলো, যেহেতু 'হাফ'-এর চেয়ে 'ফুল'-কেই বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'কই, দেখি না তো আসতে।'

'দেমাক! একে মুটিয়েছে এখানে এসে, তায় শোবার ঘরে হয়েছে টানা পাখা।'

'আমার চেয়েও কি মোটা?' সুরমা হাসলো।

অপ্রতিভ হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আহা, আপনি আবার মোটা কোথায়? এই তো ঠিক ভারভাত্তিক হাকিম-হাকিম চেহারা।'

'টানা পাখা ওর টানে কে?'

'রাত্রে কে টানে বলতে পারি না, দিনের বেলায় টানে মাখন ডাক্তারের বৌ। শুধু পাখা টানে না, পিঠের ঘামাচি গেলে দেয়, মাথার উকুন মারে।'

'কে মাখন ডাক্তার?'

'এখানকার সার্জেন জেনারেল।' ভদ্রমহিলা হাসলেন মুখ টিপে: 'সারখেল সাহেব তার সাইকেলের পেছনে বেঁধে ওকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে নিয়ে খুব পসার করিয়ে দিয়েছে, তাই মাখন ডাক্তারের বৌয়ের গরবে আর গা ধরে না। শুধু কি তাই? গাঁয়ের প্রেসিডেণ্ট সাহেবেরা যখন মাছ দেয়, আর্দ্ধেকই যায় মাখন ডাক্তারের বাড়ি। বাড়ি যেমন গায়ে-গায়ে ভাবও তেমনি গলায়-গলায়।'

'কেন, ওর বাড়িতে হয় কি দিনের বেলা?'

'তাস খেলা হয়। কোনোদিন গোলাম-চোর, কোনোদিন টুয়েনটি নাইন। মাখন ডাক্তারের বৌয়ের খেলা-টেলা আসে না, তাই বসে-বসে পাখা টানে।'

'আর কে কে আসে ওখানে?'

'অনেকেই। চণ্ডী ঘোষের বৌ, পতিতপাবনবাবুর শালী—'

'ওঁরা কে?'

'ওঁরা এখানকার উকিল।'

'উকিল?' সুরমা এমন একখানা মুখ করলো যেন যুদ্ধের সময় মিত্র-দেশ হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে নাম লিখিয়েছে। 'কেন, উকিলরা ও-বাড়িতে কেন?'

'তা কি করবে বলুন। আপনার আগে যিনি হাকিম-গিন্নী ছিলেন, তাঁর বারো মাসই দশ মাস ছিল, রুই-পোনার ঝাঁকের মত অগুনতি কাচ্চা-বাচ্চা, চুপ করে বসতে পারতো না এক দণ্ড। নিজেরও ছিল নিত্যি অসুখ, সকাল সন্ধেয় মারতো কেবল চোঁয়া ঢেঁকুর, ভসভসিয়ে-ওঠা জল খেত খালি। লোকে আড্ডা গাড়বে কি করে?'

তারপর ভদ্রমহিলা যথাসময়ে হাজির হলেন শিবানীর দরবারে।

'গেছলুম মুন্সেফের বৌকে দেখতে। কি ধুমসো মোটা, যেন একটি আলকাতরার পিপে। ছেলেপিলেগুলো কালো কিটকিটে—ঠিক যেন ধান-সিজে হাঁড়ির তলা। ভাবি এই চারে মাছ এলো কি করে?'

'পেস্কারের মেয়ে যে। শুনেছি, পাছে হাকিম এসে খপ করে পকেটে হাত দেয় সেই ভয়ে ওর বাপ মাথায় পাগড়ি বেঁধে তার মধ্যে পয়সা গুঁজে রাখতো। একদিন এজলাসে উঠে হাকিমের কাছে কি পেশ করবার সময় টানা-পাখার বাড়ি খেয়ে পাগড়ি যায় খসে, মেঝের উপর ঝন ঝন করে ছিটিয়ে পড়ে টাকা সিকি আধুলির টুকরো। হাকিম নিজে উঠে কুড়িয়ে কুড়িয়ে গুনে দেখলো, আঠারো টাকা রোজগার, ভাবুন তার অবস্থাটা। মাছ তবে টোপ গিলবে না কেন?' শিবানী চোখ ঘোরালো।

'ধরে ফেলে হাকিম কি বললে?'

'বললে, পাগড়িটা খুব নিরাপদ নয়, এবার থেকে সনাতন ট্যাঁকেই গুঁজো—যদিও তাতে ভয় আছে—তোমার ধুতির যা বহর, ক্রমশই সেটা ছোট হতে হতে হাঁটুর উপর উঠে বসবে।' শিবানী হাসিতে লাগলো।

'সেই বংশেরই তো ঝাড়।' ভদ্রমহিলা মুখ বেঁকালেন: 'ভদ্রতা শিখবে কোত্থেকে? এখানকার মতো এ রকম গদিওলা চেয়ার আগের মুন্সেফেরও ছিল না বটে, তবু তার বৌ তার খাটের উপর নিয়ে গিয়ে বসিয়েছেন, কিন্তু এ শুধু দিলে একটা মাদুর পেতে। আর, কি কৃপণ বাবা বলিহারি, মাছ সাঁতলাতে নিশ্চয় তেল দেয় না, নইলে দেখ না, একটা পান দিয়েছে খেতে, তাতে চুণের বংশ পর্যন্ত নেই। আর কি বলব বলুন', নায়েবানী

তার ডান হাতের তালুটা দেখলো : 'পাখা করতে করতে হাতে কড়া পড়ে গেছে।'

'ওদের এমনি টানা পাখা নেই বুঝি?' এক কোণে বসে দড়ি টানতে-টানতে মাখন ডাক্তারের স্ত্রী বললে।

'একটা চেয়ার নেই বসবার—সব আদালতেরটা দিয়ে চালায়—তার আবার টানা পাখা!' নায়েবানী তার নাকটাকে উপরের দিকে ঠেলে তুললো : 'আর কি দেমাক যদি দেখতেন! বলে কি, সারখেল অফিসারের বৌ মর্যাদায় আমার চেয়ে অনেক নিচু, আগ বাড়িয়ে আমি কখনো যাবো না ওর বাড়ি। এমন ঠেকার-দেয়া কথা কখনো শুনেছেন জীবনে?'

রাগে শিবানী তার সর্বাঙ্গ ফুলিয়ে রইলো।

কৃষ্ণধন নাজিরকে ডেকে পাঠালো। নাজির বললে, এজলাসের পুরোনো পাখা আছে, সারিয়ে নিতে হবে।

লাফ দিয়ে এসে সুরমা বললে, 'তা দেবেন সারিয়ে।'

নাজির গম্ভীর হয়ে গেল। ঘরের দৈর্ঘ্যটা একবার অনুমান করে বললে, 'কিন্তু পাখাটা বড্ড বড়ো হয়ে পড়বে মনে হচ্ছে।'

'তা হোক। আপনাদের দেশে গরমটাও এমন কিছু ছোট নয়। আর শুনুন। যত দিন মাখনের বৌকে না পাই, আপনাদের স্টাফ থেকে পাংখা-পুলারও দিতে হবে চালিয়ে।'

নাজির মনে করলে, মাখনের বৌ বুঝি কোনো ঝি। বললে, 'ঝি যদি চান, সুধীরের মাকে দেওয়া যেতে পারে।'

সুরমা ঝলসে উঠলো : 'সম্প্রতি, যে পাংখাপুলারটা আপনার বাড়িতে চাকর খাটে তাকে দেবেন পাঠিয়ে।'

শোবার ঘরে পাখা খাটানো হলো—এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বাতাস গেল বন্ধ হয়ে।

কৃষ্ণধন বললে, 'তুমি তো হরতন-রুহিতন চেন না, তুমি আড্ডা জমাবে কিসের?'

'তাস না হয় জানি না, কিন্তু দশ-পঁচিশ জানি, গোলকধাম জানি, ষোল ঘুটি মোগল-পাঠান জানি—আড্ডা জমাতে বেগ পেতে হবে না। নিদেনপক্ষে লুডো চলবে। তুমি এক কাজ করো।'

কৃষ্ণধন চশমা কপালে তুলে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলো।

'আর কিছু নয়, চন্ডীবাবুর স্ত্রী আর পতিতপাবনবাবুর শালীকে শুধু জোগাড় করো—'

'তার মানে?'

'তার মানে, চন্ডীবাবু আর পতিতপাবনবাবুর দিকে একটু হেলে দাঁড়াও, একটু ঢিল দাও, একটু চোখ ঠারো। ওদেরকে টেনে নিয়ে এসো বৈঠকখানায়। আর, জানো তো কান টানলে মাথাও এসে উপস্থিত হবে।'

কৃষ্ণধনের অত কিছুই করতে হলো না। চণ্ডী আর পতিতপাবন দ্বারপ্রান্তেই বসেছিল প্রস্তুত হয়ে, হাতছানি দিতেই উঠে বসল তক্তপোষে। আর, একবার যে বসল, শিকড় মেলে ছায়া ফেলে বসল। মক্কেল বাড়িতে গিয়ে দেখা পায় না কোনো সময়। যখনই যায় তখনই নাকি শোনে, হাকিমের বাড়িতে আছে। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে তার পর মক্কেল যদি উঠে চলে যায়, তবে সে আর কোথাও যায় না, যায় আরো মক্কেল ডেকে নিয়ে আসতে। কেননা, তার বিশ্বাস, সমস্ত সকাল যে হাকিমের বাড়িতে, তুড়িতেই সে সব উড়িয়ে দিতে পারবে।

ভিতরে সব অর্ধাঙ্গিনীরা।

'এত দিনে ফের জলের মাছ জলে এলুম।' চণ্ডীবাবুর স্ত্রী বললে, 'আপনার আগে যেটি ছিল সেটি একটি চীজ। সব সময়ে নাক টানা। যেমন ছিল কর্তাটি কাঠখোট্টা, তেমনি তার পরিবার। এক ভস্ম আর ছার দোষগুণ কব কার।'

'তাই বুঝি সব বেপাড়ায় গিয়ে বাসা নিয়েছিলেন।' সুরমা টিপ্পনি কাটলো।

'কি করি বলুন। দুপুর বেলাটা একটু তাস-ফাস না খেলতে পেলে যে হাঁস-ফাঁস করি।'

'কিন্তু আমি যে তাস জানি না।'

'তাতে কি? আগডুম-বাগডুম খেলব, তবু বেপাড়ায় যাব না।'

'তাই বলো দিদি', চণ্ডীর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে পতিতপাবনের শালী বললে, 'এদিকটাই আমাদের লাইন। শত হলেও তো আমরা আইন-আদালত নিয়েই আছি—উকিল আর হাকিম। টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। লাগাম ছাড়া যেমন ঘোড়া নেই, তেমনি উকিল ছাড়াও হাকিম নেই। আমাদের সবার এক জায়গায় তাই একত্র হওয়া উচিত—আমরা যারা গাউন পরি। কি বলেন?'

সুরমা বললে, 'তা পতিতপাবনের স্ত্রী একথা বলতে পারতেন। আপনি তো—'

'উনিই এখন পতিতপাবনের স্ত্রী।' চণ্ডীর স্ত্রী সংশোধন করলো : 'আগে শুধু শালী ছিল, এখন দিদির মৃত্যুর পর সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।'

চণ্ডীর স্ত্রীর গায়ে আদরে একটা ধাক্কা দিয়ে পতিতপাবনের শালী বললে, 'কি যে তুমি বলো দিদি—'

'দেখ', চণ্ডীর স্ত্রী গম্ভীর মুখে বললে. 'এখানে ইনি ছাড়া আমাদের আর কেউ দিদি নেই। উনি আমাদের হাকিম-দিদি।'

সুরমার ঘাড়ে তিনখানা ভাঁজ পড়লো।

একে-একে সবাইকে টানা গেল, কিন্তু মাখনের বৌকে নড়ানো গেল না। কৃষ্ণধনের ছোট মেয়েটার অসুখ করলো, ডাক পড়লো শ্রীধর ডাক্তারের, মাখন দেখেও দেখলো না। বললে, মুনছুব দিয়ে আমার কি হবে। এমনি ভিজিট

তো দেবেই না, তবে পিরীত জমিয়ে লাভ কি? স্ত্রীকে বললে, 'তুমি টেনে যাও পাখা। একটু জোরে টেনো যাতে আগুনটা বেশ দাউ-দাউ করে জ্বলে।'

'ওদের আজকাল কি দুর্দশা হয়েছে যদি দেখ, হাকিম-দিদি', পতিতপাবনের শালী বললে একদিন হেসে-হেসে : 'তোমার নিজেরই কষ্ট হবে। ওদের আড্ডা গিয়েছে ভেঙে—ছি-ও-সাহেবের বৌ আর মাখন ডাক্তারের বৌ এখন হাত ধরাধরি করে নদীর পারে ঘুরে বেড়ায়।'

'পারে ঘুরে বেড়ায়?' সুরমা গরজে উঠলো : 'আমরা মাঝখানে ঘুরে বেড়াবো। জুন মাসের গোড়াগুড়ি আদালতের নৌকো এসে যাবে, তাতে করে আমরা বেরুবো প্রত্যহ। দেখি আমাদের সঙ্গে ওরা পারে কী করে?'

মফস্বল থেকে ফিরে এলে কুঞ্জবিহারীকে শিবানী জিগগেস করলে, 'ওদের আড্ডাটা ভেঙে দেবার কি করলে?'

কুঞ্জবিহারী তার চশমার ভিতর থেকে চোখ দুটো ছোট করে বললে, 'বেশি দেরি নেই। চণ্ডী আর পতিতপাবনই শুধু এখানে উকিল নয়। চিঠি এরি মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে দু-খানা।'

মৃণালিনী এখানকার মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা। বেকার অর্থাৎ অবিবাহিতা।

সুরমার সামনে খাতা মেলে ধরে বললে, 'আপনাকে মেম্বর হতে হবে।'

'মেম্বর?' সুরমা একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলো। তার অর্থ, শুধু মেম্বর? ইচ্ছে করলে কত কি হতে পারি।

'হ্যাঁ, আপনাকে ছাড়া চলবে না আমাদের সমিতি।'

'কি হয় আপনাদের সমিতিতে?'

'ফর্টনাইটলি সিটিং হয় ঘুরে-ঘুরে এক-এক মেম্বারের বাড়িতে। হাতে-লেখা একটা কাগজও চালাই মাসে-মাসে। নাম, অনাগতা। আসলে, কিছুই হয় না, শুধু চেষ্টা হয়।' মৃণালিনী হাসলো। পরে মুখে গাম্ভীর্য এনে বললে, 'সার্কেল অফিসারের স্ত্রী সমিতির প্রেসিডেন্ট, তারপর আপনাকেও যদি আমরা পাই, তবে এখানকার মেয়েদের মধ্যে খুবই একটা চাঞ্চল্য নিয়ে আসতে পারবো।'

সুরমা হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে খাতাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'ও-সব বাজে কাজে আমার সময় হবে না।'

মৃণালিনী স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। বুঝলো না, বেলুনের কোন জায়গায় ছুঁচ ফুটলো।

'আমাকে ছাড়াও চলবে আপনাদের সমিতি। আমার মতো হেঁজিপেঁজি লোক কত পাবেন আপনি এখানে।' বলে সুরমা মৃণালিনীকে সেই ঘরে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য ঘরে চলে গেল। আর বেরুলো না।

খোঁজ নিয়ে জানলো, মৃণালিনী উকিলের মেয়ে নয়, কবিরাজের মেয়ে। অতএব সুরমার এলাকার বাইরে।

'তাতে কি? আমরাও একটা সমিতি করবো।' চণ্ডীর স্ত্রী বললে : 'ওদেরটা বসে পনেরো দিন অন্তর, আমাদেরটা বসবে হপ্তায়-হপ্তায়।'

'কিন্তু হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা?' সুরমা কি ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

'তাও বার করব আমরা।' বললে চণ্ডীর স্ত্রী।

'কিন্তু হাতে কে লিখবে অত সব?' সুরমার মুখে আবার সেই হতাশার ভাব ফুটে উঠলো।

'তা আপনি ভাববেন না। হরিশ মাস্টারের মেয়ে হেনারাণীর সঙ্গে মৃণালিনীর তো ওই নিয়েই ঝগড়া। হেনার হাতের লেখাটা ভাল বলে তাকে দিয়ে মৃণালিনী লিখিয়ে নিতে চেয়েছিল তার 'অনাগতা', হেনা বললে, সম্পাদকী করবে তুমি আর আমি করবো নকলনবিশি? নামের বেলায় তুমি, আর ঘামের বেলায় আমরা?'

'তারপর?' সুরমার মুখে সেই হতাশার ভাব কেটে গেল। বললে, 'মাস্টারের মেয়ে যায় নি তো ও-দলে?'

'না। তাকে সম্পাদিকা করে দিলে সে খুশি হয়ে লিখে দেবে আগাগোড়া!'

'বা, সম্পাদিকা হবেন তো দিদি।' পতিতপাবনের শালী আপত্তি করলো।

'দিদি হবেন সমিতির প্রেসিডেন্ট। সব কিছুর উপরে। কি বলেন?'

সুরমার সস্পর্ধ নীরবতা তাই সমর্থন করলো।

'সবই তো হলো, কিন্তু লেখা পাবে কোত্থেকে?' সুরেশ ওভারসিয়ারের স্ত্রী বললে।

'কেন, যারা এখন লিখছে 'অনাগতা'য়, তাদেরকে ভাঙিয়ে আনবো।' বললে চণ্ডীর স্ত্রী।

'দরকার নেই। আমার মাসতুতো ভাই কোলকাতায় খবরের কাগজের আপিসে কাজ করে, তাকে বললে কত নামকরা লেখকের লেখা পাঠিয়ে দেবে, তাক লেগে যাবে ওদের।'

সুরমা আরেকটা গর্বিত ভঙ্গি করলো। বললে, 'কিন্তু পত্রিকার নাম হবে কি?'

'নবাগতা।' বললে চণ্ডীর বৌ। 'ওদেরটা এখনো আসেনি, আমাদেরটা এসেছে।'

'ঠিক হবে।' পতিতপাবনের স্ত্রী উল্লসিত হয়ে বলে উঠলো : 'দিদির সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে। দিদিও আমাদের নবাগতা।'

সুরমা হেসে বললে, 'কিন্তু থাকবো এখানে ধরুন তিন বছর, সব সময়েই আমি নতুন থাকবো নাকি?'

'কে বলে থাকবেন না। নিশ্চয়ই থাকবেন।' চণ্ডীর বৌ জোর দিয়ে বললে।

'কিন্তু যখন আমি থাকব না এখানে? যখন বদলি হয়ে যাব?'

'তখন পত্রিকার নাম বদলে দেব, 'তিরোহিতা'। আপনাকে ভুলতে পারবো না যে কিছুতেই।'

গম্ভীর হয়ে অনেকক্ষণ কি ভাবলে সুরমা। তার চলে যাবার পর পত্রিকার নাম তিরোহিতা হবে এ অসম্ভব, অথচ তার চলে যাবার পর আর কেউ 'নবাগতা'-নামের বন্দনা নেবে এ-ও অসহ্য। তাই সে বললে, 'পত্রিকার নাম এখন থেকেই 'তিরোহিতা' রাখুন। শুধু আসেনি নয়, এসে চলে গেছে! ঢের বেশি কঠিন অর্থ কথাটার।'

হেনা এসে বললে, 'অত ঘোরপ্যাঁচে লাভ কি। আমাদের পত্রিকার নাম হবে সুরমা, সমিতির নাম হবে সুরমা-মহিলা-সমিতি।'

'তাহলে তো কথাই নেই।' সুরমাই প্রথমে বললে।

'তাহলে তো কথাই নেই।' বললে আর সবাই।

কিন্তু এই নামের মধ্যে যে কি বিপদ প্রচ্ছন্ন ছিল বুঝতে পারেনি কেউ। 'অনাগতা' অবিশ্যি উঠে গেল, কষ্টে-সৃষ্টে একবার বেরিয়ে সুরমাও আর চলল না।

সেদিন রাখহরিবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন হেনা আর মৃণালিনীর ঝগড়া হয়ে গেল মুখোমুখি।

'কি গো, উঠে গেল তো পত্রিকা?' হেনা ঘাড় দুলিয়ে চোয়াল বেঁকিয়ে বললে।

'আর তোদেরটাই বা চলল কই?' বললে মৃণালিনী, কাঁচকলা দেখিয়ে।

'তোদের ধ্বংস করবার জন্যেই তো আমাদের আবির্ভাব, তোরা মরেছিস তাই আমাদেরও কাজ ফুরিয়েছে।'

'অনাগতা কখনো মরে না, তার পথ চিরদিনের জন্যে খোলা। মরে মরেছে তোর সুরমা। বলিস গিয়ে তোর মুন্সেফানীকে, সেই অক্কা পেয়েছে সেই চলল না এখানে।'

হেনা শেষ পর্যন্ত বললে গিয়ে সুরমাকে। সুরমার বুঝতে বাকি রইলো না, সমস্তটাই শিবানীর গায়ের জ্বালা, সেই শিখিয়ে দিয়েছে মৃণালিনীকে রাষ্ট্র করে বেড়াবার জন্যে। সুরমা এই ভেবেই এখন পুড়তে লাগলো, পত্রিকার নাম সে বুদ্ধি করে শিবানী রাখেনি কেন? তাহলে সেটা শুধু এমনি উঠে যেত না, সমারোহে চিতায় গিয়ে উঠতো! আর হেনা গিয়ে বলতো মৃণালিনীকে, 'ছোট ডাবটির মুখে আগুন!'

পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে মেয়ে-ইস্কুলে পুরুষচরিত্রহীন একটা নাটিকার অভিনয় হবে। নতুন হেডমিসট্রেসটি এ-সব বিষয়ে খুব উদ্যোগী, সব সময়েই দৃষ্টি কি করে কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে, যদিও বহু উদ্যোগেও আজ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে নি।

হেডমিসট্রেসকে ডেকে পাঠাল শিবানী। অর্ধেক রাস্তা এসে হেড-

মিসট্রেস ইস্কুলে ফিরে গেল, ছাতাটা সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু ভ্যানিটি-ব্যাগটা ফেলে এসেছেন ভুলে। দুটো একসঙ্গে না থাকলে চেহারায় যেন তেমন সম্পূর্ণতা আসে না।

শিবানী ঝলসে উঠল : 'হিরোয়িনের পার্টটা আভাকে দেন নি যে?'

প্রথমটা হেডমিসট্রেস কিছু আয়ত্ত করতে পারল না, মুখখানা গোলাকার করে রইল। পরে বুদ্ধিটা একটু তরল হয়ে আসতেই মুখে হাসি টেনে বললে, 'নাটকে হিরোই নেই, তার আবার হিরোয়িন কি?'

'হেডমাস্টার না থাকলেও হেডমিসট্রেস এসে থাকে ইস্কুলে।' শিবানী তুরুকজবাব দিল : 'সে কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে মেন পার্ট আভাকে না দিয়ে মুন্সেফের মেয়ে গৌরীকে দিয়েছেন কেন? সার্কেল-অফিসার যে আপনার ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট তা কি আপনার মনে নেই?'

এক নিমিষে হেডমিসট্রেস নির্বাপিত হয়ে গেল। বললে, 'আমি অতশত ভেবে দেখিনি। রঙ্গমঞ্চের কথাই ভেবেছি, নেপথ্যের কথা ভাবিনি। গৌরীর উচ্চারণগুলো ভাল আর মেয়েটি বেশ স্টেজ-ফ্রি, তাই—'

'স্টেজের আপনি কি দেখেছেন আর ফ্রিডমেরই বা আপনি জানেন কি! বেশ, নাটকের থেকে আমার মেয়ের নাম কেটে দেবেন, গানও সে একটি গাইতে পারবে না বলে দিলুম। আর, বেহালা-ব্যাঞ্জো যা দেব বলেছিলুম তা-ও পারব না দিতে। দেখি, কি করে চলে। দেখি', শিবানী শত্রুকে পশ্চাদ্বর্তী মনে করে চাবির গোছাশুদ্ধ আঁচলের প্রান্তটা পিঠের দিকে সবলে নিক্ষেপ করল : 'কলেক্টরের কানে তুলি একবার কথাটা।'

সুরমাও হেডমিসট্রেসকে তলব দিল। অর্ধেক রাস্তা এসে হেডমিসট্রেস ইস্কুলে ফিরে গেল, ভ্যানিটি-ব্যাগটা সঙ্গে আছে বটে কিন্তু বেঁটে ছাতাটা নিয়ে আসেনি। দুটো একসঙ্গে না থাকলে চেহারার কেমন মর্যাদার অভাব ঘটে।

সুরমা জলদগম্ভীর কন্ঠে বললে, 'নাটকে গৌরীর একটাও গান নেই কেন? আপনার কি ধারণা গৌরী গাইতে জানে না?'

'তা কেন!' এবারেও হেডমিসট্রেস প্রথমে হাসতে চেষ্টা করলো। তোয়াজ করে বললে, 'গৌরীর যে হিরোয়িনের পার্ট!'

'গৌরী হিরোয়িন হবে না তো হবে ঐ ছি-ওর মেয়ে!' সুরমা চোখ পাকিয়ে উঠলো : 'যত গান সব গাইবে ঐ আভা আর আমার গৌরী ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে? তার বেহালা নেই বলে কি সে একেবারে বেহাল?'

'তা আমি কি করব বলুন,' হেডমিসট্রেস সবিনয়ে বললে, 'তার জন্যে, নাট্যকারকে দোষ দিন। নায়িকার পার্টে গান সে দেয়নি একেবারে।'

'তবে অমন বই সিলেক্ট করেছেন কেন?' সুরমা মুখিয়ে উঠল 'আজকাল সিনেমায়-থিয়েটারে হিরোয়িনেরাই তো কথায়-কথায় গায়, যেখানে-

সেখানে গায়, কেউ মরেছে শুনলে কান্নার আগে তাদের গান বেরিয়ে আসে। এমন দিনে ঐ সৃষ্টিছাড়া বই আপনাকে কে বাছতে বলেছিল?'

'বেশ তো, গৌরীকে দিয়ে যদি গান গাওয়াতে চান, তবে আভার সঙ্গে পার্টটা বদলে নিলেই তো চলে যায়।' হেডমিস্ট্রেস সরল বিশ্বাসে বললে।

সুরমার ভঙ্গিটা হঠাৎ তেজস্কর হয়ে উঠল। বললে, 'তা হলে আপনি বলতে চান আভা হবে হিরোয়িন আর গৌরী হবে তার সখী! তার আগে গৌরী যেন গোমুখখু হয়ে বাড়িতে বসে থাকে, তার যেন ইস্কুলে গিয়ে পড়তে না হয়।'

'কিন্তু, এর তবে ব্যবস্থা কি?' হেডমিসট্রেস ফাঁপরে পড়ল।

'এর শুধু এক ব্যবস্থা।' সুরমা তর্জনী তুলে একটা দৃপ্ত ভঙ্গি করল। মনে হল মেয়ের বদলে সেই বুঝি হিরোয়িনের মহড়া দিচ্ছে।

আশান্বিত হয়ে তাকাল হেডমিসট্রেস।

'এক ব্যবস্থা। তা হচ্ছে এই, মাঝে-মাঝে জায়গায়-জায়গায় হিরোয়িনের পার্টের মধ্যে গান ঢোকাতে হবে। যে-সব গান গৌরীর শেখা আছে রেকর্ড থেকে, অন্তত সে কখানা।'

'তা কি করে হতে পারে?' হেডমিসট্রেসের মুখে হাসিটা কষ্টেরই একটা বিকৃতির মতো দেখাল : 'একদম খাপ খাবে না যে।'

'রাখুন আপনার অহঙ্কারের কথা। কত বড়-বড় বায়স্কোপে চিতা জ্বলবার সময় গান গায়, মোটর চাপা পড়ার পর কেত্তন ধরে, আর এই মেয়েদের নাটকে একটা-কিছু গান ধরলেই যত মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল!' সুরমা একটা সংক্ষিপ্ত হুঙ্কার করল।

'কিন্তু গৌরী যে ভাল গাইতে পারে না—'

'যত ভাল গাইতে পারেন আপনি আর আপনার ছি-ও সাহেবের বৌ।' সুরমা এবার একেবারে ফেটে পড়ল : 'বেশ নাটক থেকে নাম কেটে দেবেন আমার মেয়ের। দেখি, ইস্কুল কেমন চলে। দেখি আপনি শেষ কি গান গান!'

বলাবাহুল্য নাটক আর অভিনীত হল না। হেডমিসট্রেস ছুটির দরখাস্ত করল।

ভ্রাম্যমান একটা সিনেমা-কোম্পানি এসেছে শহরে। পরিত্যক্ত একটা পাটের গুদাম-ঘর ছিল, তাতেই আস্তানা গেড়েছে।

খুব উৎসাহ চতুর্দিকে। ছবিতে কথা কয়, শব্দ করে, হাসে, ঘুঙুর বাজিয়ে নাচে—কেবল ধরতে গেলেই যা ধরা যায় না। ছেলে-বুড়ো সব চঞ্চল।

'ওরা সব যাচ্ছে, আমরাও যাব।' কৃষ্ণধনের ছেলেমেয়েরা নাকে কেঁদে উঠল।

'সব?' সুরমা প্রশ্ন করল। 'আভার বাবা-মাও?'

গৌরী 'হ্যাঁ' বললেও সে বিশ্বাস করতে চাইল না। আর্দালি পাঠিয়ে ও-বাড়ির চাকরের কাছ থেকে গোপনে খবর আনল কথাটা সত্যি।

'ওগো, ছেলেমেয়েদের নিয়ে চল, আজ একটু বায়োস্কোপে যাই।' সুরমা কৃষ্ণধনকে প্রথমে অনুরোধ করল।

অভ্যাসবশেই কৃষ্ণধন 'না' বললে। 'যেমন কদাকার ঘর তেমনি কদাকার ভিড়। এক রিলের পর পাঁচ মিনিট অন্ধকার। তার উপর ডাইনামোর যা শব্দ, তাতে কথা আর কিছু শুনতে হবে না।'

'কিন্তু ও-বাড়ির কর্তা-গিন্নি আজ যাচ্ছে যে।'

'তাই নাকি?' কৃষ্ণধন লাফিয়ে উঠল। সেটা আর কালহরণ করা কর্তব্য নয় এমনি একটা সঙ্কল্পের ভঙ্গি।

সবচেয়ে মর্যাদাবান আসনের দাম কত খবর নিতে পাঠাল আর্দালিকে। আর্দালি এসে বললে, সবার জন্যে বড় এক বাক্স তৈরি করে দেবে, ষোলো টাকা, চায়—অনেক কষাকষি মাজামাজি করার পর দশ টাকায় রাজি হয়েছে।

কৃষ্ণধনের মুখ-চোখ শুকিয়ে উঠেছিল, সুরমা ধমকে উঠল। 'ঐশ্বর্য যদি না দেখাবে তো টাকা রোজগার করে সুখ কি! বিদেশে থার্ড ক্লাশে ট্রাভেল করো কিম্বা তীর্থ স্থানে গিয়ে ধর্মশালায় থাকো বুঝতে পারি, কিন্তু নিজের জায়গায় নিজের মান রাখতে হবে তো! তাছাড়া ওদের চেয়ে যে আমরা উঁচু সেটা না দেখালে চলবে কেন?'

লৌহবর্মাবৃত সর্বঘাতসহ যুক্তি। কৃষ্ণধন দাড়ি কামাতে বসল।

বায়স্কোপ-ঘরের সামনে এসে পেঁছুতে ভিড়ের মধ্যে ভয়ংকর হুড়ো-হুড়ি পড়ে গেল—তাদের পথ করে দেবার জন্যে। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ম্যানেজার এল হাঁ-হাঁ করে, বিনয়ে আভূমি নত হয়ে, খাতির করে নিয়ে গেল ভিতরে। সুরমার এই ভেবে দুঃখ হল যে, অভ্যর্থনার এই দৃশ্যটা ওরা দেখল না।

ওরা দেখবে কি, ওরা আগে থেকেই আরেকটা বাক্স সাজিয়ে বসে আছে। একেবারে পাশাপাশি দুটো বাক্স, মাঝখানে শুধু কঞ্চিতে জড়ানো লাল সালুর পর্দা। এমন গা ঘেঁসে এক লাইনে ওরা বসবে এ যেন অসহ্য! কিন্তু পাল্লা দিতে গিয়ে যদি বেশি পয়সা কেউ খরচ করে বসে, তবে সেই বেকুবিতে কি বলা যাবে? ল্যাজে ময়ূরের পাখা গুঁজলেই তো দাঁড়কাক ময়ূর হয় না।

'তোরা বুঝি টিকিট করে এসেছিস।' আভা সম্বোধন করল গৌরীকে। পরে কতক স্বগত কতক পরতঃ ভাবে বললে, 'ঠিকই তো। টিকিট না কাটলে ঢুকতে দেবে কেন? চেনে কে এখানে?'

'আর তোরা? তোরা এসেছিস বুঝি ভিক্ষে করে, পায়ে ধরে?' স্বতঃ-পরতঃভাবে গৌরীও বললে, 'ঠিকই তো। হাঁটু গেড়ে মিনতি না করলে ঢুকতে দেবে কেন? এমনিতে বাক্সে বসার তোদের মুরোদ কোথায়?'

'আজ্ঞে না। আমাদের পাস দিয়েছে, ফ্যামিলি-পাস।' আভা চোখ টান করে বললে, 'বাবাকে আর লাইনবাবুকে পাস না দিলে বায়স্কোপ এখানে চলবে কি করে? লাইসেন্স দেবে কে? বুঝলি, আমাদের নিজে থেকে

আসতে হয় না, আমাদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে আসে। তবে বোঝ, মুরোদটা কার বেশি।'

পাশ শুনে গৌরীর মুখ চুপসে গিয়েছিল বটে, তবু, সে আশ্চর্য রকম সামলে নিল নিজেকে। বললে, 'তোদের পাশ হচ্ছে ভিক্ষার ছাড়পত্র আর আমাদের টিকিট হচ্ছে ধনীর মানপত্র। তফাৎটা বুঝলি?'

'দ্রাক্ষাপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে শৃগালও তাই বলেছিল বটে।' বললে আভা।

'সিংহচর্মাবৃত গর্দ্দভ এখন কি বলে তাই হয়েছে ভাবনা।' গৌরী উত্তর দিল।

বাড়ি ফিরে এসে সুরমা বাঘাটে গলায় বললে, 'তুমি সইবে এ অপমান? সিনেমা-কোম্পানির নামে তুমি একটা ড্যামেজ সুট করে দাও।'

কিন্তু 'কজ অব য়্যাকশন' কি হবে, কৃষ্ণধন ঘাড় চুলকোতে লাগলো।

দুটি দিনও অপেক্ষা করতে হল না। চন্ডীবাবু তার মক্কেল ধরলক্ষ্মণ কুন্ডুকে দিয়ে এক ইনজাঙ্কশনের মামলা রুজু করে দিয়েছেন। যে-জমিতে সিনেমা-কোম্পানি তাদের ডাইনামো বসিয়েছে সেটা ধরলক্ষ্মণের, তার থেকে অনুমতি না নিয়েই নাকি বসিয়েছে তারা যন্ত্রটা। আর ফলে শুধু অনধিকার প্রবেশই হয়নি, সম্পত্তির অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা হয়েছে। অতএব অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা একটা এখুনি জারি হওয়া দরকার।

আর যায় কোথা! কলমের একটি আঁচড়ে সিনেমা-শো বন্ধ হয়ে গেল।

সুরমার নর্তন-কুন্দন তখন দেখে কে। ও-বাড়ির মুখোমুখি জানলার সামনে সে দাঁড়িয়ে বললে, 'ফ্যামিলি পাশ পেয়েছেন। যাও না এবার ফ্যামিলি নিয়ে। শো কেমন জমেছে দেখে এস গিয়ে।'

তারপর এখানে একদিন একটা প্রচন্ড ঝড় উঠলো—সত্যিকারের ঝড়। অনেক গাছ পড়লো, নৌকো ডুবলো, বাড়ি-ঘর ধূলিসাৎ হলো, গ্রামবাসীদের দুর্দশার সীমা রইলো না।

দেশের ডাকে মৃণালিনীর সঙ্গে হেনারাণী হাত মেলালো। তাদের পুরনো মহিলা-সমিতির তরফ থেকে একটা রিলিফ ফন্ড বা ত্রাণ-ভান্ডার খোলা হয়েছে। চাঁদার খাতা নিয়ে ঘুরছে তারা বাড়ি-বাড়ি।

ক্রমান্বয়ে তারা শিবানীর দ্বারস্থ হল। তালিকার উপর একবার চোখ বুলিয়েই শিবানী ছুঁড়ে ফেললো খাতাটা। ঝাঁজালো গলায় বললে, 'লিস্টিতে আমার নাম চতুর্থ কেন? চন্ডীবাবুর স্ত্রী দ্বিতীয়, পতিতপাবনবাবুর শালী তৃতীয়—বলতে চাও, তারাও কি আমার চেয়ে বেশি মানী?'

মৃণালিনী আমতা-আমতা করে বললে, 'লিস্টিটা হেনা তৈরি করেছে।'

'লিস্টিটা আমি কিছু ভেবে করিনি।' হেনা সপ্রতিভের মতো বললে, 'একের পর এক নাম লিখতে গেলে ক্রমিক নম্বর একটা দিতেই হয় লিস্টিতে। ওটা গুণানুসারে বা পদমর্যাদার তারতম্য অনুসারে লেখা হয় না। অন্তত এক্ষেত্রে হয়নি।'

'হয়নি তো [illegible] নামটা বা সব শেষে ঢুকিয়ে দাওনি কেন? তার নামটা কেন সবার মাথার উপর এনে বসিয়েছ?'

'সেটাও আকস্মিক। নইলে যদি গুণ বিচার করে নাম সাজাতে হয়, তা হলে এক হয়ত হয় একাত্তর আর চার হয় চুরাশি।' খাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে হেনা ছুট দিল।

বাইরে বেরিয়ে এসে মৃণালিনী বললে 'বলে দেব এককে তুই একাত্তর করেছিস।'

'বলিস। চুরাশির উপরে থাকলেই সে খুশি।'

দেখা গেল আপত্তি শুধু একা শিবানীর নয়। অনেক উকিল-গৃহিণীও গাল ফুলোচ্ছে। তাদের স্বামীদের সিনিয়রিটি অনুসারে তাদের নাম সাজানো হয়নি। ত্রিপুরাবাবুর স্ত্রী কেন চণ্ডীবাবুর স্ত্রীর নিচে যাবে? চণ্ডীবাবু তো সেদিনের ছোকরা আর ত্রিপুরাবাবুর চুল পেকেছে। কিন্তু ত্রিপুরাবাবুর স্ত্রীটি যে তৃতীয় পক্ষের, চণ্ডীবাবুর স্ত্রীর চেয়ে বয়সে যে সে অনেক ছোট এ যুক্তিটা মোটেই শ্রোতব্য নয়। তেমনি মাখন ডাক্তারের স্ত্রী খগেন ডাক্তারের স্ত্রীর নিচে কিছুতেই যেতে পারে না। মাখন ডাক্তার ক্যাম্বেলের আর খগেন ডাক্তার হোমিয়োপ্যাথি।

রাগ করে লিস্টিটা হেনা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলল। ত্রাণ পেল সবাই।

মৃণালিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনো ফল হল না।

মৃণালিনীকে হেনা বললে, 'কুটনি।'

হেনাকে মৃণালিনী বললে, 'ঢিপির মাকাল'।

ঝগড়াটা যে ঘরের কোণেই আবদ্ধ হয়ে নেই তা বলা বাহুল্য মাত্র। এখন যা দাঁড়িয়েছে, কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারী কেউ কারু মুখের দিকে তাকায় না, কোনো সভায় এ সভাপতি হলে ও যায় না, ও সভাপতি হলে এর অসুখ করে। সব চেয়ে বিপদ দাঁড়াল অফিসার্স ভার্সাস বারের বার্ষিক ফুটবল খেলার দিন। কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারী পাশাপাশি ফরোয়ার্ড খেললেও কেউ কাকে একটা পাশ দিলে না। অথচ যে-কেউ একজন যে ব্যাকে কি হাফব্যাকে খেলে খেলাটা বাঁচাবে তারো কোনো চেষ্টা নেই। যে ব্যাকওয়ার্ড খেলবে, অন্যের কাছে তারই তো অপমান।

কিন্তু ব্যাপার চরমে দাঁড়ালো প্রদোষবাবুকে নিয়ে।

প্রদোষ এখানকার একমাত্র গাইয়ে। ফেয়ারওয়েল পার্টিতে বলো, শোভাযাত্রায় বলো, সেই এখানকার একশ্চন্দ্র। আভা ও গৌরীর সে গানের মাস্টার।

আভার মাস্টার আছে বলে গৌরীর জন্যেও রাখতে হয়েছে, নচেৎ গৌরী গ্রামোফোনের রেকর্ড চালিয়েই যা মুখস্থ করে এসেছে এতকাল। প্রদোষ গৌরীকে শেখাতে আসতো সকালে, আভাকে বিকেল বেলা। ইদানিং চাহিদা তার খুব বেড়ে গেছে বলে টাইমটেবলটা তার কিছু অদল-বদল করতে

হলো। যার ফলে আভা থাকল ঠিক তার আগের জায়গায় পাঁচটা থেকে ছ-টা, আর গৌরী ছিটকে পড়লো সকাল থেকে সন্ধেয়, সাড়ে-ছটা থেকে সাড়ে সাতটায়।

সুরমা মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'ককখনো না।'

প্রদোষ বললে, আমাদের পাড়ার কয়েকটা জুটে গেছে, সকালের দিকে। তাই এ পাড়ার সবগুলিই বিকেলের দিকে রাখতে চাই।'

'তা রাখুন, তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে গৌরীকে পাঁচটা থেকে ছটা করে দিন, আর আভাকে নিয়ে যান তার পরে। আভাকে আগে শিখিয়ে এসে গৌরীর বেলায় আপনার গলায় আর জোর থাকবে না।'

প্রদোষ হাসল, জানাল, সময়ের এই সামান্য হেরফেরে তার আপত্তি নেই।

কিন্তু আপত্তি হল শিবানীর। সে বললে, 'বা,, তা কেন? আভা যেখানটায় আছে সেখানেই থাকবে—পাঁচটা থেকে ছটা! সকালে আপনার অসুবিধে হচ্ছে গৌরীকে আপনি যেখানে খুশি নিয়ে যান দিন-দুপুর থেকে রাত-দুপুরে। আমার জায়গা থেকে আমি নড়তে পারব না এক চুল। শেষকালে গৌরীর উচ্ছিষ্ট এনে আভাকে দেবেন তা হবে না।'

প্রদোষ পড়ল বিপদে। পরে ঠিক করল প্রথমে যা ঠিক করেছি, তাই ঠিক থাকবে। এতে চাকুরি যায় তো যাবে, কুছ পরোয়া নেই।

জানাল গিয়ে তা সুরমাকে। রাগে সুরমার ঘাড়টা হঠাৎ উবে গেল। মুখ ফুটে কিছু সে বলতে পারল না, কেন না, প্রদোষই এখানকার আদি ও অকৃত্রিম গানের মাস্টার।

সেদিন আভাদের বাড়িতে গান ধরেছে প্রদোষ, হঠাৎ সে একটা প্রচণ্ড গোলমাল শুনতে পেল। গলার গোলমাল নয়, বাজনার গোলমাল। ব্যাগপাইপের বাজনা নয়, ক্যানেস্তারা পেটানোর বাজনা। হার্মোনিয়ম ফেলে বেরিয়ে এল প্রদোষ। দেখলো কৃষ্ণধনের বাড়ির গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কোর্টের পিওনরা সমান তালে ক্যানেস্তারা পিটছে। জগঝম্পও ভালো, এ ব্যাঘ্রঝম্প!

কুঞ্জবিহারীও নিতে জানে প্রতিশোধ। যত ইউনিয়ন ছিল তার এলাকায় নিয়ে এল তাদের সব চৌকিদার আর দফাদার। নীল কুর্তা পরে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে গেল সব কোমরবন্দ এঁটে। গৌরীদের বাড়িতে প্রদোষ তখন সবে গলা ছেড়েছে, সবাই এক সঙ্গে ঘা দিয়ে উঠল সাত-সাতখানা টিনের উপর।

সুরমা বললে, 'না, থামবেন না, চালিয়ে যান—'

'আপনি পাগল হয়েছেন?' প্রদোষ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল 'শেষকালে রাজায়-রাজায় যুদ্ধে উলুখড়ের প্রাণ যাবে?'

প্রদোষ আর এ-মুখো হল না।

বড়দিনের ছুটিতে দু-পক্ষই কোলকাতা যাবে বলে রব উঠেছে। সুরমা

বলছে সেকেণ্ড ক্লাশে যেতে ওরা যাতে নাগাল না পায়। শিবানী বলছে সেকেণ্ড ক্লাশে যেতে ওরা যা ভাবতেও পারে না। কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারী বলছে, অযথা কতগুলি টাকার শ্রাদ্ধ। লম্বা ঢালা প্রকাণ্ড ইন্টার ক্লাশ দেয়, অনেক সহযাত্রী পাওয়া যাবে এ-সময়, কিছু ভাবনার নেই, চুপচাপ চলে যাওয়া যাবে ঠিকঠাক।

জমিদারের কাছারিতে ঝিনুকের কাজ করা পালকি ছিল একখানা, দু-পক্ষ এসে আবেদন করতেই জমিদারের নায়েব পালকিসহ বেহারাদের পাঠিয়ে দিল আর এক কাছারিতে।

সবচেয়ে ভালো যে গরুর গাড়িখানা, জোগাড় হয়েছে তা কৃষ্ণধনের জন্যে। গ্রামান্তর হতে কুঞ্জবিহারী আর একখানা জোগাড় করে আনালো যার বলদদুটো অনেক বেশি জোয়ান, ছইটা অনেক বেশি উ'চু। এক হাত মোটা যাতে খড় বিছানো। গ্রামান্তরের খবর কৃষ্ণধন জানে কি!

ইন্টার-ক্লাশের জানলার দিককার দুটো ধার দু'পক্ষ অধিকার করে বসল। সৈন্যবলে দু'পক্ষই প্রায় সমান। অস্ত্রশস্ত্রেও বিশেষ তারতম্য দেখা গেল না। দু'পক্ষেরই সেই জলের কু'জো, মিষ্টির হাঁড়ি, তরকারির বাস্কেট। যার-যার এলাকায় যার-যার লাইন ঠিক রাখবার জন্যে যে-যে ব্যস্ত। কেউ কারু দিকে অপাঙ্গস্ফুরণও করছে না।

গাড়ি তো ছাড়ল।

কুঞ্জবিহারী ধরাল সিগারেট, কৃষ্ণধন ধরাল চুরুট। শিবানী পড়তে বসল ইংরিজি খবরের কাগজটা নিয়ে, সুরমা বাক্স থেকে খুলে আনল একটা মোটা ইংরিজি অমনিবস; খুব টান-করে চুলবাঁধা আভা গান ধরলো—শতেক বরষ পরে, আর টাই-বাঁধা ব্লাউজ গায়ে গৌরী গান ধরলো—তার বিদায় বেলার মালাখানি।

অথচ কারু দিকে কারু ভ্রূক্ষেপ নেই।

একটা বড় স্টেশন থেকে গাড়ি বদল করে এক দঙ্গল লোক ঢুকে পড়ল কামরাতে। অনেক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিল এরা, অনেক গুটিয়ে নিতে হল। তবু সবার জায়গা করা গেল না।

মেয়েদের বসা অর্ধ পুরুষের অর্ধ শোয়া। তাই একজন প্রস্তাব করলে : 'ওঁদের দুজনকে একপাশে দিয়ে দিন না, তা হলেই দু জনের বসবার জায়গা হবে।'

কিন্তু যে উঠে যাবে অন্য পাশে তারই হবে পরাজয়, তাই সুরমা আর শিবানী দু'জনেই প্রাণপণে মাটি কামড়ে পড়ে রইল।

'আরে, আপনারা সবাই পাগল হয়েছেন নাকি?' কে আর একজন কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারীকে যুগপৎ সম্বোধন করল।

'অন্ধকারে দেখতে পাননি বুঝি? পাশেই তো ইন্টার ক্লাশ ফিমেল। একদম ফাঁকা গাড়ি। ওঁদেরকে ওখানে পাঠিয়ে দিন না।'

'ঐ দেখছেন না, দেয়ালের মাঝখানে ফোকর।' কে আর একজন ছিদ্র খুলে দেখিয়ে দিল ও-দিকের ঘরটা।

'আরে মশাই আপনারা তো এক স্টেশন থেকে আসছেন। তবে তো ওঁদের কোনোই অসুবিধে নেই এক কামরায় বসবাস্ করতে।' কে আর একজন বললে।

'দেয়ালের মাঝখানে ফোকর, সঙ্গে ছেলেপিলে, এক জায়গার বাসিন্দে, চেনাশুনো—এ তো মশাই সোনার সোহাগার উপর আরো কিছু।' কে আর একজন বললে : 'গাড়ি ছাড়ার এখনো ঢের দেরি, আস্তেসুস্থে ওঁদেরকে চালান করে দিন ও-ঘরে। এখানে থাকলে ওরাও স্বস্তি পাবেন না,, আমাদেরও ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।'

নির্বন্ধাতিশয্যটা ক্রমশই গা-জুরির মতো দেখাতে লাগলো।

কুঞ্জবিহারী আর কৃষ্ণধনের সাধ্য নেই বশ্যতা স্বীকার না করে পারে। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটা যে অকাট্য তাতে আর সন্দেহ কি।

সুরমা ফোঁস করে উঠল : 'তখনই বলেছিলাম সেকেন্ড ক্লাস কর।'

ও-পার থেকে শিবানীও উঠলো ঝামটা মেরে : 'সেকেন্ড ক্লাস বলতে যেন মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছিল।'

আর অস্ফুটস্বরে কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারী যুগপৎ বললে, 'সেকেন্ড ক্লাস গাড়িও মোটে একখানা এ লাইনে। সেকেন্ড ক্লাস হলেও দেখা হবার সেই সমান সম্ভাবনা ছিল দেখা যাচ্ছে।'

কেউ কারু দিকে না তাকিয়ে সুরমা আর শিবানী দুই দরজা দিয়ে নেমে গেল এবং পাশের ঘরে গিয়ে তাদের রণক্ষেত্র বিস্তৃত করলে।

গাড়ি আবার ছাড়ল।

পুরুষদের গাড়িটা লোকে লোকারণ্য। ভিড়ের চাপে কোণঠাসা হয়ে কৃষ্ণ আর কুঞ্জ দু বেঞ্চিতে বসে আছে চুপচাপ। দুজনেরই চোখ দূরবর্তী দেয়ালের মধ্যেকার ছিদ্রাবরণের দিকে। ডাকিনী-যোগিনীরা কি না-জানি ভীম-ভৈরব কাণ্ড বাধিয়েছে এতক্ষণে।

কৃষ্ণের ইচ্ছে করে, আবরণ অপসরণ করে দেখে নেয় চেহারাটা, কিন্তু ভিতরের বস্তু সব তার নিজের নয় ভেবে সাহস পায় না। কুঞ্জেরও যে সমান ইচ্ছে তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু তারও ভয়, একটা না আবার ইনজাংকশান জারি হয়ে যায়।

কারু দিকে কারু দৃষ্টিপাত নেই, অথচ কাষ্ঠাবরণটুকুও নড়ে না।

প্রায় মাঝরাতে, কি একটা স্টেশনে, হঠাৎ খুলে গেল সেই কাঠের ঠুলি। প্রায় একই সঙ্গে দেখা গেল দুটো মুখ—প্রথমে আভার, পরে গৌরীর। দুজনেরই চাউনি ভয়-বিহ্বল। কণ্ঠে এক স্বর ; 'বাবা, শিগগির এসো।'

কি না-জানি সর্বনাশ হয়ে গেছে। কুঞ্জ আর কৃষ্ণ এবার একই দরজা দিয়ে অবতরণ করল।

মেয়েদের কামরায় ঢুকে দু-জনেরই চক্ষু স্থির।

দেখলো, সুরমার কোলে মাথা রেখে কাৎ হয়ে শান্তিতে চোখ বুজে শুয়ে আছে শিবানী।

কুঞ্জবিহারী ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, 'কি, শরীর খুব অসুস্থ বোধ করছে নাকি? স্ট্রেচার এনে নামাতে হবে নাকি?'

শিবানীর চুলে হাত বুলুতে-বুলুতে সুরমা বললে, 'ব্যথা একটা উঠেছিল খুব। এখন আবার জুড়িয়ে গেছে। বোধ হয় এটা ফল্‌স্‌।'

'কোন্‌টা?' বললে কৃষ্ণধন।

'পেন্‌টা। আমার এই সেবাটা নয়।'

কুঞ্জবিহারী আর কৃষ্ণধন এক সঙ্গে তাকাল চারদিকে। দেখলো দুদলেরই ছেলে-মেয়েগুলো লাইন ভেঙে, আল-বেড়া ডিঙিয়ে, এখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছে, একই কমলানেবু থেকে কোয়া খুলে খুলে খাচ্ছে গৌরী আর আভা, আর বুকের কাছে শিবানীর মুঠির মধ্যে সুরমার একটা হাত ধরা।

'কি বলেন, নামিয়ে নেব এখানে?' কুঞ্জবিহারীর প্রশ্নটা এবার সুরমার প্রতি স্পষ্টীভূত হল।

'দরকার নেই। উলটে বিপদ বেড়ে যেতে পারে এখানে। শুভেলাভে কোলকাতা পৌঁছে যেতে পারব আশা করি।' অসঙ্কোচে বললে সুরমা, 'তাছাড়া আমিই তো আছি।'

শিবানী চোখ মেলে ঈষৎ সলজ্জ ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'সুরো যখন আছে কিছুই আর আমার ভয় নেই।' সুরমার হাতখানা আরো সে টেনে আনল কাছে, বললে, 'ভাগ্যিস ওকে পেয়েছিলাম।'

'চুপ কর, বাণী', সুরমা স্নেহে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বললে, 'মেয়ে হয়ে মেয়ের এই দুর্দিনে কেউ কখনো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে? নে, ওঠ, খা কিছু।'

মিষ্টির হাঁড়ি দুটো একাকার হয়ে গেল। জলের কুঁজোর জাত বাঁচানো গেল না।

সুখী পরিবার—ভাবলে কুঞ্জবিহারী।

ভাবলে কৃষ্ণধন।

কুঞ্জবিহারী সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরল কৃষ্ণধনের দিকে। বললে, মে আই—'

কৃষ্ণধন সিগারেট একটা নিয়ে সজোরে কুঞ্জবিহারীর কাঁধ চাপড়ে দিল। বললে, 'কনগ্র্যাচুলেশনস্‌ ওল্ড বয়।'

৯৭। গঙ্গাযাত্রা

'বলিসনে, উ কথা বলতে নাই। বমভোল আমাদের দেবতা। আমরা যদি ওদের কাজকম্ম না করব, তা হলে করবে ক্যারা? লে, ডাক, সব জুটেপুটে সকাল করে বেরিয়ে পড়—হাঁ রে, সুধীর আছে? আ কাড়ছিস না যে রে? ভাত খেঙেছিস তো, দে হুঁকো দে—'

হুঁকো দিয়ে পানু মোড়ল বললে, 'এই দ্যাখ দামুদা, তু আগাগোড়া না বুঝে হড়বড় করে বকে যাস। তাইতে বেজায় আগ-দুঃখ হয়। বামুনেরা যখন ঠেলায় পড়ে তেখুনি এই চাষাদিকিন ডাকে। আর অ্যান সময়ে, খাবার সময়ে, বলে, ও চাষা, হবে পরে হবে। বামুনদের অনেক উবকার করে দেখলাম। ওরা বেজায় বজ্জাত—'

'আরে এ তো ই-দিশি বামুন লয়, এ বামুন পাকিস্থলী হনে আলছে।'

সে আবার কি। পানু মোড়ল তাকিয়ে রইল।

'ঐ যে রে—পাপীস্থান না পাখীস্থান হয়েছে—সেই মুলুকের লোক। বাঙাল বামুন।'

যেই বামুনই হোক উপকার করতে নাই। বাঙাল তো, গাঁয়ের শ্মশানে পুড়িয়ে দিক না। গঙ্গায় যাবার সাধ হয় কেন? ওদের দেশে গঙ্গা দেখেছে কোনোদিন? বিভুঁয়ে যখন মরতে এসেছে তখন আবার গঙ্গা না পুকুরের গাবা অত দেখবার কী দরকার!

কি বলিস তার ঠিক নাই। যখন গঙ্গার সীমানার মধ্যে এসেই পড়েছে তখন কার না ইচ্ছে হয় গঙ্গাতীরেই দাহন হোক। তাই বুড়োর স্ত্রী চাটুজ্জে মশায়কে ধরেছে। আর চাটুজ্জে মশায়ের কথায় আমি তোদের কাছে এসেছি।

তা তুমি এসেছ ভালই করেছ। কিন্তু ঐ চাটুজ্জে মশায়ের কোনো কাজ করতে আমাদের মন সরে না।

'বলে কি জানিস? বলে চাষারা সব মড়া গঙ্গায় দেয় না, নদীতে ফেলে দেয়, নইলে কুমিরের গোলের মুখে মড়া রেখে গোয়ালদের বাথানে গিয়ে ঘুম মারে। এই সব কথা শুনে মন কেমন হয় বোল দিকিনি। কাজ কামাই করে তিন-চারদিন কষ্ট কস্তে লোক যাবে ক্যানে? আরো তো পাড়ার অনেক আছে—ডাকো সমাইকে, তারপর যা হয় তাই হবে।'

যে লোক সুপারিশ করতে এসেছে সে গাঁয়ের চাষাদের একজন মাথাল-মুরুব্বি। নাম দামোদর।

রামহরি চাটুজ্জে আবার তাকে ডেকে পাঠাল।

'কি ব্যাপার বলো তো? তোমরা থাকতে এ বিদেশী দুঃস্থ ব্রাহ্মণ গঙ্গা

পাবে না? শেষকালে শ্মশানে পাঠিয়ে দেব? সন্ধে হল, যা হয় কথার একটা শেষ কর। ভদ্দরলোকের স্ত্রী তো যা লাগে সব টাকা দিতে রাজি—'

'আচ্ছা, মড়া আপনি শ্মশানে পাঠিয়ে দিন। আমি দেখছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গাঁয়ের বাইরে একটা পতিত ডোবার ধারে শ্মশান। সেইখানে মুখাগ্নি করে লাশ পেশাদার মড়া-ফেলাদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। সব চেয়ে নিকট গঙ্গা এখান থেকে বারো তেরো মাইল, সারা রাস্তা বুনো ঝোপে-ঝাড়ে ভরা, কোথাও বা দ, কোথাও বা স্পষ্ট নদী! ডোঙাতে-নৌকোতে পার হতে হয় মড়া নিয়ে।

ভদ্দরলোকদের সাধ্যি নেই মড়া কাঁধে নিয়ে অতটা পথ হাঁটে, রাস্তার অত ঝঞ্ঝাট পোহায়। তাই টাকা কবলে পরের হাতে মড়া ছেড়ে দিতে হয়। মড়া-বওয়া লোকেরা ভাবে, একটা দাঁও জুটেছে।

ভুঁড়ি চুলকোতে চুলকোতে দামোদর মন্ডল আবার এসে দাঁড়াল মজলিশে। বললে, 'তোরা এ গাঁয়ের মান সম্মান আখবিনে? আমার মুখটা ছোট করে দিবি? আমহরি চাটুয্যের সঙ্গে ঝগড়া বলে ঐ বিদেশী বামুনের তোরা গতি করবি না?'

কানিকুড় লাফিয়ে উঠল। বললে, 'আমি যেতে আজি আছি, সব কটা আমাদের জাত হয়। ঐ যে তুমরার লবশাক—ও আমি মানতে চাই ন। শালা তাঁতির সঙ্গে এক কাঁধে মড়া বইব না। শালার তাঁতি বলে কী, সংগোপের চেয়ে তাঁতি বড়!'

'এ গাঁয়ে লোক কুলোয় না বলেই তাঁতি-তামিলি কামার-কুমার ধরতে ।'

'ক্যানে, ভিন্ন গাঁ থেকে আনাও, তাঁতি বাদে অন্য জাত লাও। তাও হবে নোকই বা চাই কত? ন-দশজন হলেই হবে। আমরা হব ছ জন, আর ন-চারজন হবে না? না হয় নাই হবে। ছ জনাতেই যাব। কষ্ট হবে, আর কি!'

'তা হলে বেরিয়ে পড় সব। তারা তো শ্মশানে চলে গেছে। তোমাদের বাইকে এক জায়গায় এক কথায় না পেলে আমি গিয়ে বুলব কি? সেটা ন্যাঝো?'

'শুধু আমাকে বললে তো হবে না। আর সব কই? আমার মনের কথা শুধু বললাম।'

'তোদের সব আক্কেল নাই?' দামোদর ধমকে উঠল : 'সব চালই বাইশ শুরী। টাকাও লিবি। আবার ঘোঁটও করবি। যা, সব ডাক, বেরো, তারপর দেখছি। ক'জন হচে, তারপর অন্য কাউকে ডাকবার বেবোস্তা। আমি ঠাকুরদের কাছে চললাম।'

মড়া শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়েছে রামহরি। দ্বিতীয় পক্ষের সব চেয়ে বড়

ছেলেটির বয়েস তেরো চোদ্দ। সে গিয়েছে মুখাগ্নি করতে। আর কটি কাচ্চা-বাচ্চা, একটি বাড়ন্ত গড়নের কুমারী মেয়ে, তাদের মাকে ঘিরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বিদেশী বাঙালের পক্ষে গলা ছেড়ে কান্নাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না। আর মা খালি মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে নিঃসাড় হয়ে। কেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারছে না এই তার লজ্জা।

মুনিষ এখনো জোগাড় হচ্ছে না। শীতের রাত, কনকনে হাওয়া দিয়েছে, এখন সবাই যেতে রাজি হলে হয়। সব তো গেছেই, বাড়ি-ঘর জোত জমি সংসার-গৃহস্থি—এমন কি ভবিষ্যতের জীবিকা—তারপর মরার পর এই একটু গঙ্গাপ্রাপ্তিও জুটবে না?

জুটবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এই সব এসে পড়ল বলে। তবে এ রাত্তিরে বেরুতে চাইবে না হয়ত। বেরুলেও রাস্তার মাঝে এক জায়গায় বসে থেকে রাত কাটাতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। মড়াটা গাছিয়ে রাখা যাক আজ রাতে। কাল ভোর ভোর ঠিক যাবে কেঁধো-রা।

'তুমি যা ভালো বোঝো—' রামহরির এদিকে অনেক ব্যবস্থা বাকি।

'কিন্তু টাকা কত দেবেন?' দামোদর মুখে একটা কুন্ঠিত ভাব আনল।

'তার জন্যে আটকাবে না।'

'আক্রাগন্ডার বাজার। কেঁধো দশ-বারোজন হবে—কাঠ-মোট আছে, ঘাটের ডোম্, চাল মুড়ি— বাজার আজকাল আর বসে নেই বাবু, খালি ছুটছে, ছুটছে, পই-পই করে ছুটছে—'

'সে একটা বিবেচনা করে দিতে হবে বৈকি। তোমার এখনো লোকই হল না।'

না হয়েছে। কানিকুড় এসে বললে, 'নোক সব ঠিক হয়েছে। আমরা সাত জন, কম্মকারদের দুজন, আর ভোপেন নাপিত— এই দশ জনাতেই হবে। পথ এখন খরাশুকনো বটে, তবে এ আত্রিতে কেউ যেতে চাইছে না, বলছে—খুব শীত, সারা আত্রি কষ্ট হলে দিনে তখন হাঁটব কি করে? মড়া আজকের মতন গাছিয়ে থুলে ভাল হয়। কাল ঠিক আত থাকতে সম-সম কালে উঠে পড়ব সবাই। নদীতে এখন পার-পারোয়ারী নাই, শাঁ-শাঁ করে চলে যাব এক বগগা।'

তাই ভালো। যে কজন মুনিষ জোগাড় হয়েছে সঙ্গে করে দামোদর শ্মশানে চলল। মুখাগ্নি সারা হতেই খাটুলি সমেত মড়াটা একটা আম-গাছের উপর খড়ের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখল।

যেখানে যা বিধি-ব্যাপার তাই পালন করতে হবে। সমস্ত পরিবার তাই কিছু জিজ্ঞাসা করে না, প্রতিবাদও করে না। এ অঞ্চলে তারা বিদেশী, তারা বাঙাল, যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, চোখেমুখে এমনি একটা ভয়খেকো অপরাধীর ভাব। যতক্ষণ শ্বাস আছে পরের দয়ার উপরই বাঁচতে হবে এমনি একটা নিঃসম্বল অবোলা প্রাণীর কৃতজ্ঞতা। এখানে এসে তাদের একজন যে হঠাৎ মরে গেল, এই যেন তাদের কত বড় ত্রুটি।

রামহরিই তাদের জন্যে যা করেছে। তাই রামহরির দিকেই তারা এগিয়ে থাকে।

'এমনি সব মড়াকেই গাছায়। এ কিছু নতুন নয়। শীতের রাতে কেঁধোরা যদি চলতে না চায় তবে মড়া এমনি গাছেই বেঁধে রাখে।' একটু কৈফিয়ৎ দেবার মত করে রামহরি বলে।

প্রমীলা আর তার নাবালক ছেলে-মেয়েরা অবোধের মত তাকায়।

'আমরা এবার তবে বাড়ি ফিরি।' বললে কানিকুড়।

'ঠিক-ঠিক সময় ডাক দিলে উঠবে তো? না, তখন ঘুমের ঘোর ছাড়বে না?'

'ঘোর ছাড়বে না—এ কি তামাসার কথা?'

'আমার মন বলছে এই রেতে গেলেই ভাল হত।' বললে ভূপেন নাপিত : 'পথে এক জায়গায় আগুন-টাগুন জেবলে একটু বিচরাম কল্লেই হত। তা আর সমারি মন সমান হল না।'

'তা যা হবার তো হল—এখন, বাবু দাদা, টাকা কত দেবেন বলুন দেখি।' সবার সামনেই দামোদর কথাটার আস্কারা করতে চাইল : 'গঙ্গাতীরে বেজায় খরচা। দোকানদাররা মড়াওলা দেখলেই দু পয়সার জিনিসে আট আনা দাম ধরে। হাতী বেকচ্চায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে আজকাল।'

'এক বস্তা চাল আর মুড়ি আর এক ঘটি গুড় আমি দিচ্ছি। আর—' ঘরের মধ্যে ফাটা লণ্ঠনের আলোতে প্রমীলাকে একবার দেখতে চাইল রামহরি : 'আর নগদ টাকা গোটা ষাট।'

দলের ভিতর থেকে রগচটা দুকড়ি ঝাঁজিয়ে উঠল : 'দশ জন নোক যাব—তাও কেও ঢোসা নোক লই, ঘেসো ভুঁড়ি লয়, সব জোয়ান মর্দ—দশ জন না হলে ঐ বুড়ো মড়া বেজায় ভারী হবে, টানব কি করে? ঐ ষাট টাকায় কি হবে? প্যাট পর্যন্ত নামবে না। প্যাট তো এখানে থুয়ে যাব না মশায়। সঙ্গে যদি কিছু যায় প্যাটই যাবে। প্যাটে দুটো না খেলে হাঁটব কি করে?'

খুব কড়া তাকেই রয়েছে আর সবাই। কানিকুড় বললে, 'বেশ, আপনারা একজন সঙ্গে চলুন কেনে ষাট টাকা ছেড়ে দশ টাকায় হয় আমাদের আপত্তি নাই। তিন বেলা আন্না, চারবেলা জল খাওয়া। ঘাটের ডোমের পাওনা কাঠ-মোট—ঘি—হিসেব কর্‌ন কেনে—'

'কত, চাও কত তোমরা?' রামহরি দামোদরের শরণ নিল।

দামোদর মুখ গম্ভীর করে বললে, 'ছ কুড়ির কম হবে না।'

'বিদেশী লোক, সব ফেলে-বেচে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছে—এদের বেলায় একটু কমসম করে না নিলে চলবে কেন দামুদা?' রামহরি তাকাল আরেকবার প্রমীলার দিকে।

প্রমীলা ততক্ষণ উঠে বসেছে মাটি ছেড়ে। পাড়ার মেয়েরা যারা তাকে ঘিরে বসেছিল এতক্ষণ, আস্তে আস্তে একে একে উঠে চলে গিয়েছে। ফাঁকায় একবার চোখোচোখি হয়ে গেল।

যেন বলল, আমি আর কি বলব? আমার আর কি বলবার আছে? দর-দামের আমি কি জানি? আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমার স্বামী যেন গঙ্গা পায়। লেখাজোখা নেই এত ধকল গিয়েছে তাঁর উপর দিয়ে। যেন গঙ্গাতীরে একটু শান্তি পান শেষ দিনে।

মরার আগে অনেক করে বলে গিয়েছে প্রমীলাকে, ভিটে-মাটি ছেড়ে যখন এদেশেই চলে এলাম, তখন মা-কালী করুন, যেন গঙ্গা পাই। জ্ঞান-গঙ্গা তো হবে না, অন্তত গঙ্গাতীরে দাহনের ব্যবস্থা কোরো।

স্বামীর অসুখ বাড়াবাড়ি হয়ে উঠতেই একশোটা টাকা প্রমীলা রামহরির কাছে জিম্মা রেখেছিল। বলেছিল, যখন যা দরকার খরচ করবেন। যতদূর সাধ্য, চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়। যে ভাবে পারেন, বাঁচিয়ে তুলুন ওঁকে–

বাঁচানো গেল না। অনেক করেছে রামহরি, তবু বাঁচানো গেল না। এখন মরণে অন্তত একটু আসান হোক। এ জন্ম তো গেল, যদি এর পরে আর কোনো জীবনজন্ম থাকে!

দলের মধ্যে সুধীরই খুব করিয়েকাম্মিয়ে। সে খেপে উঠে বললে, 'যদি মশায় টাকার ক্যাঁচ করেন তা হলে কেও যাবে না। সোজা কথা মাশায়। তা হলে মড়া নামিয়ে পুড়িয়ে দেন গা।'

'তা নয়তো সঙ্গে চরণদার দিন, সে দেখুক কোথায় কত টাকা লাগে–' দুকড়ি টিপ্পনি ঝাড়লে।

তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন হলে হত! কে আছে ওদের? এই কটা নাবালক শিশু। রামহরি স্নেহকরুণ চোখে তাকাল সবার দিকে।

'আর চরণদার দিলেই বা কি। যা বলবে ঘাটের ডোকল তাই আদায় করে লেবে। নইলে ঝিল সাজাবে না।' বললে কানিকুড় : 'ঘাটওলা দোকানওয়ালা, ওরা কি আমাদের থেকে কিছু আলাদা?'

'তোমাদের কি এদের মুখের দিকে চেয়ে একটু দয়া মায়া হয় না?' রামহরি আবার মিনতি করল।

'আমাদের মুখের দিকে কোনো শালো তাকায় তো কই দেখি না। যে সদগতি করে দেবে তারই বেলায় পয়সা নাই। ঐ যে বলেছে না, যে এল চ... সে থাক বসে, নাড়াকাটাকে ভাত দাও, থাক ঠেঁস ঠেঁসে। এখানে এসে দিবি তো একটুকরো জমি লিয়েছে, ঘর তুলেছে একখানা—পয়সা নাই তা মানব কেনে? বললে সুধীর।

ভূপেন নাপিত একটু মোটা-বুদ্ধি। বললে 'তুইই যখন গেলি তখ... জমি-বাড়ি এখে লাভ কি? যার জমি-বাড়ি তার কাজেই খরচ হয়ে যাক এতেই তো শেষ লয়, এর পর ভোজফলারেরও তো জোগাড় দেখতে হবে–'

পুড়ে ছাই! দরকার নেই গঙ্গায় গছিয়ে। শ্মশানেই দাহ হয়ে যাক। কি মনে করে রামহরি নিজেকে আবার ভঙ্গুনি গুটিয়ে নিল। না, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল লোকটার। এই যে না-জানা রাস্তা ধরে চলে আসা, এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে—এটাকে সে একটা তীর্থযাত্রার মূল্য দিতে চেয়েছিল। যদি মরি যেন গঙ্গাতীরে দাহ হয়। উদ্বাস্তু-উদ্ধারিণী গঙ্গা।

'বেশ, মুনিষ সব তোমরা ঠিক থেকো। যাও, ঘ্যানরঘ্যাং কোরো না—আশি টাকাই দেব। আশি টাকাই আমার কাছে আছে।' রামহরি বললে শেষ কথা।

'হেরজা হোরজা করে পাঁচ কুড়ি টাকাই দিয়ে দেবেন।' বললে দামোদর। 'সব ব্যালেক্ মার্কেট মাশায়, সব ব্যালেক। আঙ্গার-ধোঁয়াও ব্ল্যালেক।'

'না, এর বেশি আর এক পয়সা নয়।' রামহরি হুমকে উঠল।

সব চেয়ে বড় ছেলেটিও যেন তাতে সায় দিয়ে রামহরির পাশ ঘেঁসে দাঁড়াল।

কানিকুড় বললে ছেলেটিকে লক্ষ্য করে : 'গঙ্গার দেশে এসে গঙ্গা দিতে না পারাটা অধর্ম্ম। তা এখন বাপু কি করবা? দেশের আজকাল বোলচালই এই রকম। তাছাড়া বাবা তো বারে বারে আসবে না। এ দায়ই তো একবার—'

'না, তোমাদের দিয়ে হবে না। আমি মাতুনগর যাচ্ছি।' রামহরি নিজের বাড়ির দিকে এগুতে লাগল : 'সেখানে আমাদের প্রজা আছে খাতক আছে। ওদিকে ধরলে নিশ্চয়ই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। তোমাদের মত তারা এমন অমানুষ নয়।'

মাতুনগর এখান থেকে প্রায় তিন পো রাস্তা। তা হোক গে। বাড়িতে বাঁধা মুনিষ আছে, তার হাতে একটা লন্ঠন আর নিজের হাতে একটা তেলে-পাকানো লাঠি নিয়ে সটান চলে যাবে রামহরি। সে যখন মনে করেছে তখন সমাধা সে করবেই।

বাজি চটিয়ে দেয়া হল নাকি হে?

রেখে দাও। মাতুনগরের লোকেরা দেড়শ টাকা চাইবে। তার এক আধলা কম নয়।

আর ও অমনি মাতুনগর যাবে তুমি বিশ্বাস করলে? ও শুধু একটা ভুজুং দিয়ে দর নামাবার চেষ্টা।

তাছাড়া আবার কি! সেখানে ওর কত প্রজা, কত খাতক! খাজনা বলতে দু আনা তিন আনার কোর্ফা আর খাতক বলতে চার-পাঁচ টাকার হ্যান্ডনোট। যত বারফট্টাই ঐ বাঙালদের সামনে কোরো। আমাদের চোখে ধুলো দিতে হবে না।

হ্যাঁ বাবা, খুঁটি আঁকড়ে পড়ে থাক। আমাদের দর ঠিক মেনে নেবে।

বড় ছেলেটি এসে দামোদরকে ডেকে নিয়ে গেল মার কাছে।

'দামুর কথা হামু-হামু। পাঁচ কুড়ির কম হবে না। তাই লেখ্য টাকা।'

'ওঁর হাত থেকে আপনারা আশি টাকাই নিন, বাকি কুড়ি টাকা আমি লুকিয়ে দিচ্ছি।' ছেলেকে দিয়ে প্রমীলা বাক্স খোলাল। টাকা দেওয়াল কুড়িটে। বললে, 'মুখে-মুখে ওঁর কথাটা মেনে নিন—মোটমাট আপনাদের পাওনা ঠিকই মিটে গেল। বাড়তি টাকা পাবার কথাটা ওঁকে জানতে দেবার দরকার নেই। কাজটা ভালয়-ভালয় সেরে দিন'। ওঁকে আমরা অনেক কষ্ট দিয়েছি—'

'না না, কষ্ট কি। কাজ আমরা ঠিক উদ্ধার করে দেব।' দশ টাকার নোট দুখানা দামোদর কাপড়ের খুঁটে গিঁট পাকিয়ে-পাকিয়ে বাঁধল।

সুধীর বললে, 'নগদ টাকা মাইরি—আগাম। চল, সনজের ঝোঁকে দু-পাত্তর আগে হোক—'

দামোদর একবার ভাবলে রামহরির সঙ্গে রফানিষ্পত্তিটা আগে সেরে রাখি। মাতালশালার নাম শুনে মনটা অন্যদিকে ভেসে পড়ল। কিন্তু যার-যার ভাঁড় তার তার পয়সা। এ টাকা এজমালি।

সব শুতে যাবে-যাবে এমন সময় মাতুনগরে পৌঁছুল রামহরি।

দু হাঁটুর ফাঁকে হুঁকো চেপে ধরে মাথা হেঁট করে আস্তে-আস্তে 'ব'-টান দিচ্ছে অধর, রামহরি কাছে এসে দাঁড়াল।

একি, চাটুজ্জে মশায়? এত আতে? কি মনে করে? 'ব'--টানের পরে ছোট করে 'শু'-টান আর মারা হল না, অধর হুঁকো গুটোল।

তোমাকে কজন 'কাঠুরে' জোগাড় করে দিতে হবে। গাঁয়ের লোক কেউ গঙ্গা দিতে যাবে না। অসম্ভব টাকা হাঁকছে। তাই বিপদে পড়ে তোমার কাছে আসা। তুমি আমার আপ্তজন।

মরেছে কে?

"পাক-স্থলী"-র এক বামুন। সর্বস্ব খুইয়ে এসেছিল বিভূঁয়ে, শেষ-কালে নিজের দেহটাও ছেড়ে গেল। তেমনি করে আমরা যারা পড়শী, গ্রামবাসী, আমাদের কি ছেড়ে দেওয়া উচিত?

পাকস্থলী-পূর্বস্থলী যে থলিরই হোক, বামুন যখন, তখন যেমন করে হোক, দায় উদ্ধার করবই। কোন ভয় নাই। যা লোক লাগে আমি সব জোগাড় করে দিচ্ছি।

'কত টাকা লেবে?'

'আমরা তো চামার নই যে গলা কাটব! ওরা যা চেয়েছে তার চেয়ে দশ টাকা কম দেবেন।'

'কথাটা ঠিক হল না। ওরা যদি এখন দুশো টাকা চায়, তোমাদের তা বলে একশো নব্বুই দেব?'

'আরে মশাই, অত হিসেব কি আমরা জানি?' অধর ফিরল : 'কত দিতে চান আপনারা?'

কম করেই আরম্ভ করা ভাল, ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে উঠবে না-হয় শেষে।

'সত্তর দেব।'

'তাই দেবেন। বিদেশী বিপন্ন লোক জুলুমবাজি ঠিক লয়। আপনি বসুন কেনে ঐ মোড়াটায়, আমি লোক দেখি।'

অধর পাড়ায় বেরিয়ে পড়ল। কিছু দূর এগুতেই দ্বিজপদর বাড়ি। তাকে তুললে ডাকিয়ে' বললে, শল্যাপরামর্শটা দাও দেখি। কি কর।'

'মড়াটা গোছতে হবে বৈকি।' বললে দ্বিজপদ : 'টাকা কম হয় আসবার সময় ময়রার দোকানে মড়ার নামে খাতায় বাকি রেখে ডবল পুষিয়ে লোব। সেই বাকি টাকা মড়ার ওয়ারিশানরাই দিক বা রামহরি চাটুজ্জেই দিক তা আমাদের জানবার কথা লয়।'

'আরে, ময়রার দোকান তো সব আমাদের চিনহা হে—ঠিক হবে।'

জন আষ্টেককে রাজি করানো গেল।

'টাকা বেজায় কম হচ্ছে অধরদা। এই শীতের রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে আলাম—একটা বিবেচনা করতে হয়।'

দ্যাখ, মড়া গঙ্গায় দিয়ে আসা—এর মত বড় কাজ আর নাই ভোমণ্ডলে। আগের দিনে গাঁয়ের লোকেরা নিজের ঘরে থেকে চাল মুড়ি টাকা চাঁদা করে দিয়ে কাঁধ বদ্‌লে-বদ্‌লে মড়া গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে দিয়ে আসত। আজকাল অবস্থা দোষে এ কাজ আমাদের ব্যবসা-রোজগার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাই বলে একে একটা দাঁও ঠাওরানো ঠিক নয়। বুক-চাপ হয়ে কাজ বাগানো অধর্মের কথা। এদিকে মড়া যায় স্বর্গস্থলীতে, আমরা নরককুন্ডে।

'নরম মাটি দেখলেই বেড়াল আঁচড়াবে এ কি লজ্জার কথা! আচ্ছা বাবু, বোলচাল করে ছোঁড়াগুলোকে আমি পটিয়ে লিচ্ছি, আপনি আর দশটি টাকা বেশি দিন।' অধর মুরুব্বির মত বললে, 'একেবারে বিছানা হনে উঠে আলছে, একটু বড় তামাক-টামাক চাই আর কি। ভূত তাড়াবার জন্যে হরিবোল আর ঘুম তাড়াবার জন্যে বড় তামাক।'

'দেব আরো দশ টাকা, মোটমাট আশি। এখুনি বেরুবি তো?' রামহরি সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'এখুনি বেরুব। এই দণ্ডে। শীত বর্ষা মানি না আমরা। কি রে', অধর দূরের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'কি রে, তোরা আবার বসলি কেনে? একেকজনে একেক রকম ফ্যাচাং তোলে। যাই, শুনে আসি, শুদিয়ে আসি।'

দুটো লোকের সঙ্গে কি-কতক্ষণ কানাকানি করল অধর। তার পরে গলা উচু করল। ছি ছি ছি, একি কথা! আমাদের যে মালিক আমাদের যে মহাজন, তাকে অবিশ্বেস! টাকা তোরা আগে চাস? কে কবে কাঠুরে-ভোজনের পর টাকা না দিয়ে বলেছিলো এই ভোজনেই টাকা উশুল হয়ে গেল, তার সঙ্গে চাটুজ্জে মশায়ের তুলনা? ডোম-ডোকলের টাকা কাঠ-মোটের টাকা আগে লিবি বই কি। না, বেশ, খাই-খরচের বাবদেও কিছু লে। আর যেটা নিছক

মজুরি বা বিদেয় সেটা না হয় ঘুরে এসে বুঝসুঝ করালি। দু পক্ষেরই আসান কর। পঞ্চাশ আগে লে—ওরে বাবা, একেবারে যে ফোঁস-চক্কর একেকটি। সব টাকা এক মুস্তে না পেলে পা তুলবি না কেউ? অমনি গতরে জং ধরে গেল?

'পুরোপুরি আশি টাকাই আগাম দিচ্ছি।' রামহরি টাকা বের করতে লাগল গেঁজে থেকে : 'যাও, বেরিয়ে পড়। আর তানানানায় কাজ নাই।'

অধরের দল হাজির হল সেই শ্মশানের আমতলায়। গাছ থেকে খাটুলি-সমেত মড়া নামিয়ে আবার বাঁধলে দড় করে। বল হরি—হরি বোল—চার কাঁধে ফেলে চলল গঙ্গামুখো পথ ধরে। একজনের মাথায় চাল-মুড়ির বস্তা একজনের হাতে গুড়ের ঘটি, একজনের হাতে হেরিকেন আর একজনের হাতে লাঠিসোটা।

গঙ্গা, ভীষ্মজননী—গঙ্গাযাত্রীদের রওনা করিয়ে দিয়ে রামহরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

রাত আড়াইটে তিনটে হতেই দামোদর তার দলের লোক গোল করলে। বললে, আমি আর কানিকুড় চাল-মুড়ি আনতে চললাম, তোরা মড়া নামা গে যা। কই রে, সুধীর কই?

চাটুজ্জে মশায়ের বাড়ির দরজায় ডাকাডাকি করতে লাগল দামোদর। সাড়াও নাই শব্দও নাই—সব নিটুট নিঝুম। এর মানে কি? সুধীর কিংবা পানু এসে তবে কি সব চুকিয়ে নিয়ে গিয়েছে? পানু তো আর সবার সঙ্গে শ্মশানেই গেল। তবে, ঠিক, সুধীরেরই এই কাণ্ড, আগ বাড়িয়ে লাফ দেওয়া। সুধীরই এতক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। চল, সেখানে গিয়েই সব খোলসা হবে।

শ্মশানে গিয়ে সবার চক্ষু স্থির। গাছে মড়া নাই।

সবাই গাছের দিকে তাকিয়ে। কেউবা আশে-পাশের ঝোপঝাড় খুঁজছে. কেউ বা হাতিয়ে দেখবার জন্যে উঠছে গাছের উপর। ফুস! কোথাও কিছু নাই।

কি সর্বনাশ! মড়াতে শ্মশান চাপল নাকি?

'আমাদের কথায় ওরা মড়া গাছিয়ে থুলো। আর, মড়া নাই?' দামোদর আকাট বনে গেল।

'উঁহু। এ কারু চালাকি। বুঝলে, অন্য লোকে এসে লিচ্চয় মড়া লিয়ে চলে গিয়েছে।'

'এখন করা যায় কি! আমার হাতে টাকা,—কি ব্যাপার!' দামোদর জনে জনে তাকাতে লাগল মুখের দিকে।

'দাও টাকা, কুড়ি টাকা কুড়ি টাকাই সই।' বললে কানিকুড় : 'আমরা পথ ধরব, মড়া ধরব গিয়ে রাস্তায়। আর কিছু লয়, শালা তাঁতিতে যুক্তি করে লিচ্চয় মড়া লিয়ে পালালছে। চল তো সব দৌড়ে, দেখি আমাদের মড়া লিয়ে শালারা কদ্দুর যায়!' কানিকুড় পিছন ফিরলে : 'তুমি মোড়ল বাড়ি যাও।'

আমরা চললাম গঙ্গাতীর—হকের মড়া ছাড়ব না কিছুতেই। আর তোরা এক সঙ্গে। লাঠি লে।'

আরেক দল মড়া নিয়ে চলেছে এ পথ দিয়ে।

ওরে, হাঁটার বেগ কিছু কমিয়ে দে ছোঁড়ারা। পথিমধ্যে অন্য মড়ার সঙ্গে হওয়া ভাল লয়।

'তোমরা কোন গাঁয়ের হে?' জিগগেস করলে অধর।

'আমরা আসছি জটারপুর থেকে।'

'যাচ্ছ কোন্ ঘাটে?'

'সাঁটুয়ের ঘাটে যাব মন লিছে। চল না একসঙ্গে যাই।'

'না ভাই তোমরা আগিয়ে চল, আমাদের আবার এক জনার পায়ের গোলুই ছেড়েছে, আবার আরেকজন রাতকানা। আমাদের অনেক দেরি।'

'বেশ তো, এসো কেনে, একসঙ্গে কোথাও বসে জিরোই। পরে ভোর হলে যাওয়া যাবে একসঙ্গে।'

'ওরে বাবা, আমরা যাব কাঁট্‌লের ঘাটে। মাঝখানে এক আপ্তজনকে মড়া দেখিয়ে যেতে হবে আমাদের—এখন কতক্ষণে ভোর হয় কিছু ঠিক নাই। আমাদের লেগে বোসো না। তোমরা এগোও।'

পিছনের মড়ার দল চলে গেল এগিয়ে।

ক্রোশ দুই প্রায় হাঁটা হয়েছে, এবার বোসো কেনে এই বটগাছের তলায়। আগুন না পোহালে চলছে না। ঠাণ্ডার ধারে হাত-পা সব কেটে-কেটে যাচ্ছে। তামাক সাজ, লন্ঠনটা জ্বালা, ঘুমুতে চাস যদি কেউ কেউ, শুয়ে পড়।

রাত্রি প্রায় শেষ হয় হয়। লিকলিকে চাবুকের মত বাতাস বইছে শাঁ শাঁ করে। ওরে, আবার কোনো মড়াওয়ালা আসছে নাকি? মানুষের গলার শব্দ শুনছি না? কে জানে, বিদেশী পথিকও হতে পারে।

কানিকুড়ের দল খুব তেড়ে-ফুঁড়ে ছুটে আসছে। নজর রাখছে চারদিকে। বেশি দূর যেতে পারবে না। পাখি তো নও যে উড়ে পালাবে। ঠিক ধরব।

'হ্যাঁরে, ঐ গাছের গোড়ায় একটা আলো দেখা যায় না?'

'হ্যাঁ, ঠিক হবে, ঐ শালারাই হবে।'

'এই দ্যাখ, হুঁ করলেই পানু আর ভোপেন দুজনার খপ করে মড়া তুলে নিয়েই পথ ধরবি।' বললে কানিকুড় : 'তারপরে যা হয় আমরা দেখে লোব।'

'কাঁধ খালি, বিদেশী পথিকই কেউ হবে, অধরের দল নির্ঝঞ্ঝাট হল।

'কারা গো?' হাঁক দিল কানিকুড়।

'আমরা মাতুনগরের। দেবেশপুরের কে এক-বাঙাল বামুন মরেছে তাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাব। তোমরা কোথাকার?'

'আমরা কোথাকার?' লন্ঠনের আলোর এলাকায় মধ্যে এসে পড়ল কানিকুড় : 'তোমরা কি রকম চলে এলে বল দিকি? আর যদি এলেই তো, আমাদিকে একটু সংবাদ দিতে পারলে না? আমরা মড়া গাছিয়ে থুলাম,

কথাবাত্রা ঠিক হল—তোমরা ভিন গাঁ থেকে উপরপড়া হলে কি রকম? তোমরা তো খুব ভদ্দ লোক—'

'আমরা কি জানি?' অধরও গলা মোটা করল : 'আমরা ভাল মন্দ কি জানি। বললে, গাঁয়ের লোক আজি হলছে না, তাই তোমাদের কাছে আলছি। দায় উদ্ধার করে দাও। আমরা কি জানি। লের্ষ্য টাকা দিলে আমরা আজি হলাম—'

'তাই বলে আমাদের গাছানো মড়া তোমরা নামাবে হাতে ধরে? আমাদের যজমান তোমরা কেড়ে লেবে?'

'মড়ার আবার শিষ্য যজমান কি! যে কাঁধে করবে তার।'

'যে কাঁধে করবে তার! বেশ, তাই—হুঃ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—' সংকেত ঝাড়ল কানিকুড়।

আর অমনি চকিতে পানু আর ভুপেন দুজনেই খাটিয়াশুদ্ধু মড়া নিয়ে সামনের দিকে ছুট দিলে।

'পালালছে, পালালছে—আমাদের মড়া নিয়ে পালালছে—' অধর মরা কান্না জুড়ে দিলে।

ছোকরাদের ঘুম ছুটে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটে ধরে ফেলল, খাটুলি জোর করে নামিয়ে ফেললে মাটির উপর। বললে, 'আমাদের মড়া চুরি করে লিয়ে পালালছিস—'

'তোদের মড়া! আমরা চুরি করেছি?' পানু ঘাড়ের গামছা মাথায় বাঁধল।

'মড়া লিয়ে এতটা পথ আলাম—বিশ্রাম করতে একটু শুয়েছি কি না-শুয়েছি, কওয়া বলা নেই, খাটুলি তুলে লিয়ে ছুট দিলি—এ চুরি করা লয়?'

'আর আমাদের গাছের মড়া না বলে-কয়ে নামিয়ে নিয়ে এলি বাঁধন কেটে—তোরাই তো পয়লা চোর। গেছো চোর।' ভুপেন নাপিতও তেরিয়ার মত ভঙ্গি করলে।

'আমরা কি জানি! আমাদের বায়না-বরাত দিয়েছে, মড়া লামিয়ে লিয়ে এসেছি। মড়া যখন আমাদের জিম্মা তখন মড়া আমাদের।'

'হ্যাঁ রে, তোদের জিম্মা হলে মড়া আমরা গাছালাম কি করে?' এবার সুধীর এল ফণা তুলে।

'তবে তোরাই তখন গেলি না কেনে। আমাদিকে ডেকেছিল, না, আমরা আপনা থেকে গেলছিলাম? কাঁধে করে এতটা পথ যে হেঁটে এলাম এ শুধু তামাসার জন্যে?'

'হা হে, তুমি তো খুব বুলছ।' কানিকুড় এগিয়ে এল : 'বলি এ কাদের গাঁয়ের মড়া? আমাদের গাঁয়ের মড়ার আমাদের জোর বেশি না ভিন গাঁয়ের লোকের জোর বেশি?'

'আমাদের জোর বেশি।' বললে মাতুনগরের ছোকরা : 'কেননা এ মড়া আমাদের স্বত্বদখলী।'

'যা দেওয়ানিতে মামলা কর গা, ডিক্রি লে গা মড়া-পোড়ার। চল, তোল কাঁধে খাটুলি। মড়া আমরা গাছিয়েছি। এ মড়া আমাদের সম্পত্তি।

পানু আর ভূপেন নাপিত আবার খাটুলি তুলল কাঁধের উপর। পিছনে মাতুনগরের ছোকরাদের উদ্দেশ করে বললে, 'ওপর-পড়া হয়ে যেমন গেলছিলি তেমনি এখন ফেন-চাটার মত পেছু-পেছু আয়—'

হঠাৎ মাতুনগরের এক ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল : 'ও শালাদিকে ঠেঙিয়ে মড়া কেড়ে লাও। জোর জুলুম নাই, যত সব ভেড়ুয়া জুটেছে। ধারও নাই ভারও নাই—যত সব গোল গোবর ঢিপ। তোদের কোলের মাগ কেড়ে লিয়ে গেলেও ও মুখে বাক্যি বেরুবে না। যত সব বাঁদীর বাচ্চা—' বলতে না বলতেই এক গাছা লাঠি তুলে নিয়ে ভূপেন নাপিতের পিঠে বসিয়ে দিলে।

মড়াশুদ্ধু খাটুলি ছিটকে পড়ে গেল রাস্তার ঢাল বেয়ে।

'তবে রে—আজ চরম হবে—'

'ঐ খাটুলিতে একা ঐ মড়াই শুধু যাবে না, আরো কাউকে যেতে হবে।'

লেগে গেল লাঠালাঠি। উঠন্ত সূর্যের লালিমায় রক্তের ছোপ লাগল।

'ওরে। তোরা থাম। কার জন্যে লড়াই করছিস? মড়া কই?' অধর চেঁচিয়ে উঠল—এবার আর ভয়ে নয়, উল্লাসে।

সত্যিই তো, মড়া কই?

খাটুলি শুদ্ধু মড়া মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তার পাশে। রাস্তার পাশে নালার মধ্যে।

বেশ জায়গায় পড়েছে। এখানেই থাক ও হতচ্ছাড়া। পাক-স্থলীর বামুন, ওর আর অন্য কোথায় জায়গা হবে? আহা, শেয়াল-শকুনের খোরাক হোক।

তবে মিছিমিছি আর মারামারি করে ফয়দা কি? যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই! মড়া রইল নালায় পড়ে, আর তোরা কিলোকিলি করে কাঁটাল পাকাচ্ছিস?

সত্যি তো! কানিকুড়ো আর অধরে হাসিহাসি চোখ-তাকাতাকি হয়ে গেল। রতনে রতন চেনে। এসো বাপু রফা-নিষ্পত্তি করে ফেলি। আপন শাক-বেগুন পরে খায়, পরের শাক-বেগুন তুলতে যায়। কী দরকার? বিরানা বিদেশীর জন্যে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঝগড়া বাধানো? হ্যাঁ বাবা, বাড়লে চাষা বামুন মারে। উপায় নাই। আগে নিজের কাজ গুছোও, পরে পরের কাজ। তুমি কে-না-কে বামুন, তোমার জন্যে আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হতে পারব না। এরা-আমরা চিরকেলে বন্ধু পাতানো।

এ খুব সৎবুদ্ধির কথা। তোদের দিয়েছে কত? আশি? আমাদের দিয়েছে কুড়ি। আয়, সমান-সমান ভাগ করে ফেলি। তোদের গাঁ পঞ্চাশ আমাদের গাঁ পঞ্চাশ। ঘাটের ডোকলকে টাকা খাইয়ে লাভ নেই।

একবার কৃষ্ণানন্দে হরি হরি বল। হরিধ্বনি দিয়ে উঠল সবাই। লড়াই-ফ্যাসাদ বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। টাকা ভাগ হয়ে গেল আধাআধি।

পাকা-কাঁচা কি মদ আছে সঙ্গে বের কর। একটা কেড়ামাতন জুড়ে দি। দুপদ গায়েন করি গলা ছেড়ে।

কিন্তু যাই বলো, একেবারে চলাচলের রাস্তার ধারে মড়াটাকে আরাম করতে দেয়া হবে না। তাতো বটেই, তাতো বটেই। ঐ তিরপুনির মাঠে নদীর একটা দ আছে, তারই গাবায় পুঁতে থুয়ে আসি। কোলগত করে রেখে আসি। তাই চলো পা চালিয়ে। শীতের সকালে কুয়াসার কম্বল গায়ে জড়পুঁটলি হয়ে আছে মাঠঘাট। রাস্তায় জনপ্রাণীর দেখা নাই কোথাও।

এই বেলা সেরে নাও চটপট। নইলে আবার আরেক রাত্রের আঁধারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

দু গাঁয়ের লোক হাতে-হাতে হাত মিলিয়েছি। একের বোঝা দশের লাড়ি। খাটুলিশুদ্ধ মড়াটাকে নিয়ে চলল দুজন—দেবেশপুরের সুধীর আর মাতুনগরের দ্বিজপদ। দহের একটা বুনো-ঘাসে-ভরা নিরালা কোণ বেছে নিয়ে মড়াটাকে কাদার মধ্যে দাবিয়ে গুঁজে-পুঁতে দিলে। দশে মিলি করি কাজ, হারিজিতি নাই লাজ।

কি করবে বল। কপালের লিখন, গোপথে মরণ। খণ্ডাবার কেউ নাই। নইলে অমন আস্তমস্ত সোনার দেশ তাই বা খণ্ড-খণ্ড হয় কেন? উপায় নাই। অভাগার বৈকুন্ঠে গেলেও সুখ হয় না। গঙ্গানদীর দেশে এসেও মজা বিলের জল খেতে হয়।

বেশ হয়েছে। যেমন বিয়ে তেমন বাজনা। সস্তা করতে গিয়েছিলে পস্তাও এবার। আমাদের কি। যেমন কলি তেমনি চলি।

আগুন করে গোল হয়ে বসে হাত-পা সেঁকতে লাগল সবাই।

অধর বললে, 'আমাদের তবু একবার গঙ্গাতীরে যেতে হয়। কি বলো হে বেয়াই?'

'নিশ্চয়। তোমাদের তো ফিরে এসে পরতাল করতে হবে।' সায় দিলে কানিকুড় : 'কিছু সাক্ষীপ্রমাণ চেনাচিহ্নং আনতে হবে বৈ কি।'

'আর তোমরা?'

'আমরা ফিরে যাব। গিয়ে বলব, মাতুনগরের দল মড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ—ধরতে পারলাম না। কাগ হয়ে কাগের মাংস খাব না আমরা।'

'কেমন সুন্দর ফায়সালা হয়ে গেল বলো দিকিনি।'

'যার শেষ ভাল তার সব ভাল।'

কানিকুড়রা ফিরে চলল গাঁয়ের দিকে আর অধররা সাটুইয়ের পথ ধরল।

গঙ্গাধারের মাটির বাসন কিছু কিনলে—কলসী কুঁজো কলকে আর পাঁচচোরো, ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা করার ছোট জাঁতা, আর ভাবঘড়া। আর কান্দির বাজার থেকে [illegible] খোলা আর ঝাঁটার খিল আর ফুলকপি।

তিন দিনের মাথায় ফিরে এল দেবেশপুরে—রামহরি চাটুজ্জের বাড়িতে। পরতাল করতে।

পাশাপাশি বাড়িতে প্রমীলা কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করলে আর তাকে কাঁদতে দেখে তার ছেলেমেয়েরা।

'হ্যাগো কেমন দাহন হল?' জিগগেস করল রামহরি।

'ওরে বাবা মড়া ভারী কত! যেন পাষাণ চেপেছে!' হাঁপ ছাড়ার মত করে বললে দ্বিজপদ।

'এই বয়সে অনেক মড়া বয়েছি, কিন্তু এত ভারী মড়া কখনো বয়নি।' একেবারে যেন লোহা, শিশের মত ভারী, কাঁধ কেটে বসে গেলছে।' বললে খুদু মোড়ল।

'আর অমন পোড়াও কাওকে দেখিনি—ধন্যি পোড়া!' বললে অধর : 'একেবারে মাহাতাপের মতন আগুনের রং। জমাট করে এক জায়গা ফাটে আর কড়-কড় করে চর্বি বেরিয়ে দপ-দপ করে পাঁচ হাত খাড়াই হয়ে আগুন উঠে পড়ে। ঐ একবার কাঠ দিয়েই হয়েছে, আর নাগেনি।'

'তা অমন পুড়বে না কেনে?' দ্বিজপদ বুলি ঝাড়তে সুরু করল : 'দাদাঠাকুর সারাজন্ম দুধ ঘি খুব খেয়েছেন মনে হলচে—হাড় পেকে ঠিক হয়ে আছে—চর্বিও খুব! কাজে-কাজেই অমনি পুড়েছেন। সৎকার খুব ভালই হয়েছে। এত ভারি মড়া আমরা বলেই নিয়ে গেলছি, আর কোনো মামু হলে পারতে হত না।'

'কই নিজের গাঁয়ের নোক তো এল না—এল সেই ভেন্না গাঁয়ের মানুষ!' বললে অধর : 'আর এ শুধু এয়েছি বললে হল না, মরণ স্বীকার করে মড়া গঙ্গা দিয়েছি—'

মিষ্টি-জল খেলে কাঠুরেরা। এবার দিনের দিন কাঠুরে ভোজন করাও।

কানিকুড়ের দল খাপ্পা হয়ে উঠল যখন শুনলে মাতুনগরের ওদেরকেই শুধু নেমন্তন্ন করেছে। সে কি কথা? মাতুনগরের ওরা এ নেমন্তন্ন নেয় কি করে? টাকা যখন ভাগাভাগি হল তখন ভোজও ভাগাভাগি করতে হবে।

সব বুঝে-সমঝে দামোদর ঠাণ্ডা করতে গেল। বললে, 'মালিকের চোখে আসলে মাতুনগরের ওরাই তো মড়া পুড়িয়েছে। ওরাই তো পরতাল করলে। তোরাও তো বলে গেলি চাটুজ্জে মশাইকে যে মাতুনগরের কেঁধোরা ঠিক নিয়ে গেলছে মড়া। এখন খাওয়া নিয়ে দাদ-বেদাদ করতে গেলে চাতরে হাঁড়ি ভাঙা হয়ে যাবে।'

'হোক হাঁড়ি-ভাঙা। ভোজ আমরা ছাড়তে পারব না। ওরা যদি আমাদিকে ফেলে খায় তবে কুলের কথা সব ফাঁস করে দেব। যা হবে সব একসঙ্গে হবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল ঘটতে দেবো না। কখনও না।'

'গাঁয়ে-ঘরে হলে পরেসপর উবকার করতে হয়—তা আমরা করি, করেছি। আমাদের গাছানো মড়ায় আমাদেরই ষোল আনা ভাগ উচিত ছিল, তা ওদিকে

দিছি আট আনা। আর আজ ভোজের আট আনা ওরা দেবে না? খিটকেল হয় তো হবে। চো, দেরি করিসনে শালোদের দেখে লোব।'

মাতুনগরের কাঠুরেদের চিঁড়ে-ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে। চিঁড়ে, দই, গুড় আর সন্দেশ।

পাত পেড়ে কেবল বসেছে অধর আর তার সাকরেদরা, হৈ হৈ করে এসে পড়ল কানিকুড়ের দল। প্রায় লাঠি উঁচিয়ে।

'কিহে, হা হে, আমাদের ফেলে তোমরা একা-একা ফলার মারতে বসলে যে?'

'তা আমরা কি জানি। আমাদের লেমন্তন্ন করেছে আমরা খেতে এয়েছি।'

'তোমরা এই লেমন্তন্ন লাও কি বলে? তোমরা যদি কাঠুরে হও আমরাও কাঠুরে।'

'তোমরা কাঠুরে হও কি করে হে?' রামহরি এসে পড়ল।

বলার ভঙ্গি নকল করে ভূপেন নাপিত বললে, 'ওরা কি করে হল হে?'

'ওরা মড়া বয়েছে।' বললে রামহরি।

'আর মড়া আমরা গাছিয়েছি। আমাদের মড়া চুরি করে লিয়ে যত হামখোদাই। চোর মোঙলা কোথাকার!'

'চোর বলবি তো, চোয়াল চ্যাপটা করে দেব।' দ্বিজপদ লাফিয়ে উঠল।

'আহাহা, বিবাদ করবার সময় এটা নয়।' রামহরি শান্তভাবে ব্যাপারটা মেটাতে চেষ্টা করল : 'মড়া আমি মাতুনগরের লোকদের হাতে গছিয়েছি, টাকাও দিয়েছি ওদেরকে। ওরাই মড়া বয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাতীরে দাহন করে এসেছে। আমার জানিত মত ওরাই মড়ার কাঠুরে।'

'আপনি যা জানেন আপনি ঠিকই করেছেন।' বললে কানিকুড় : 'কিন্তু ও শালোরা তো জানে আসল ঘটনা কি। তবে ওরা কোন সাহসে অধম্ম করে এসে ধম্মের ঘরের ভোজ খায়?'

'অধম্ম—অধম্ম কোথা রে হারামজাদা?' পাত ছেড়ে অধর ফের লাফিয়ে উঠল।

'অধম্ম লয়? পাক-স্থলীর সেই বাঙালকে তুরা পুড়িয়েছিস?' সুধীর এক আছাড়ে হাঁড়ি ভেঙে দিল : 'শালো, বাঁশচাপা, এখনো সেই নদীর দ-তে পাখমারার ডোবে গেলে বামুনের চেহৎ মিলবে—শেয়ালে-শকুনে এখনো হয়তো সবটা সাবাড় করতে পারেনি। এই তোমার দাহন? এই দাহনের জোরে খ্যাঁট মারতে এয়েছ? শালো জায়জাতা, টাকা বাঁটতে পাল্লে, আর ভোজ বাঁটবে না? কাঠুরে সেজে একা-একা ফলার করে যাবে?—'

হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। মারামারি, লাঠালাঠি পাত ছেঁড়াছিঁড়ি ভোজ-কাজ আর কিছু হল না। গাঁয়ের প্রধানরা এসে ঝগড়া-কাজির মিট করে দিলে।

'হ্যা বাপু, খাব না তো কেউ খাব না—আর যদি খাবই দু দলেই খাব। তোদের যেমন কীর্ত্তিকম্ম, আমাদেরও তেমনি কীর্ত্তিকম্ম—' তখনো বাই ঠুকছে সুধীর।

একজন প্রধান গলা নামিয়ে বললে, 'যা হয়ে গেলছে তা বয়ে গেলছে। ওরে মুখখু, আর সে-কথা তুলিসনে। ফৌজদারি হবে।'

দামোদর আরো গভীরে গেল। বললে, 'ওরে, গত কম্মের বিধি নাই। পরের লেগে আমাদের গাঁয়ে-গাঁয়ে কেন গণ্ডগোল হবে? কেন পরেসপরের বিরুদ্ধ হব?'

নতুন করে মৃত্যুশোক হয়েছিল প্রমীলার। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে রামহরিকে ডেকে পাঠাল। জিগগেস করলে : 'এখন কী করব?'

মনে-মনে ভাবল কোথায় তাদের সেই বাড়ি-ঘর, নারকোল-শুপারির বাগান—আর কোথায় এই পাখমারার ডোব? কোথা থেকে কোথায়!

রামহরি মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল। এক, পুলিশে খবর দেওয়া যেতে পারে। তাতেও হাঙ্গামা কম পড়বে না ওদের। কিছুই সুরাহা হবে না।

'এখন তবে কুশপুত্তলী দাহ করতে হয়। পুরোত নেই আপনাদের গাঁয়ে? পুরোত ডাকুন—বিধি নিন—'

এর পর আবার পুরোত! পুরোতরা তো কাঠুরেদের চেয়েও বেশি চশমখোর। কাৎ হয়ে শুয়ে মরেছে, না, চিৎ হয়ে শুয়ে মরেছে—তার উপরে পয়সা নেবে। কি বার, কেমন সময়, কোন শিয়রে শুয়েছিল—সবার উপরে হিসেব!

'আপনি মিছিমিছি উতলা হচ্ছেন। ওরা ঠিকই আপনার স্বামীকে গঙ্গাতীরে দাহন করেছে। শুধু ভোজ খাওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধাবার জন্যে অমনি এক আজগুবি গল্প ফেঁদেছে। এমনিতরো হামেসাই হয় আমাদের গাঁয়ে-ঘরে। শুধু ঝগড়া বাধানোর জন্যে কেচ্ছা বানানো।'

'আপনি বলছেন গঙ্গাতীরে আমার স্বামীর দাহন হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বলছি বৈ কি। দাহন না হলে মাতুনগরের ওরা কাঠুরে সেজে ভোজ খেতে আসবে কেন?'

বিশ্বাস করতে বড় ইচ্ছা হল প্রমীলার। ম্লানকণ্ঠে বললে, 'কিন্তু সুধীর নামে ঐ ছোকরাকে ডেকে আমি কটা টাকা দিয়েছি।'

'কেন? ভোজ খেতে?'

'না। ঐ পাখমারা ডোব থেকে আমার স্বামীর—যদি খুঁজে-পেতে পায়—এক-আধটা অস্থি আনবার জন্যে।'

'হয়তো কোনো জন্তু জানোয়ারের হাড় নিয়ে আসবে।'

'আনুক। তবু বিশ্বাস করে তাই আমি নিজের হাতে করে গঙ্গায় গিয়ে ফেলে আসব।'

রামহরি মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল প্রমীলার দিকে।

প্রমীলার দু চোখ কান্নায় ভরে গেল : 'উনি যদি এতটা বিশ্বাস করতে পারেন আমি কি তবে সামান্য এই এতটুকু করতে পারবনা?'

৯৮। প্রতিমা

দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটাকে দেখে পরিমল থমকে দাঁড়াল। শ্যামলা রঙ, মুখখানি কচি, চোখ দুটি চঞ্চল, ছিপছিপে টান-টান চেহারা, চোখে কীরকম ভালো লেগে গেল। যাকে ভালো লাগে, এক পলকেই লাগে, সহস্রবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে হয় না।

কত সহজ—সটান ঢুকে পড়ল পরিমল। চোখে লাগা মেয়েটাকে ইশারা করল উঠে আসতে।

'চলো।'

আশ্চর্য দরদস্তুর না করেই একেবারে ঘরে নিয়ে এল প্রতিমা। ঘরে একবার ঢুকলে টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়?

দোতলায় মধ্যবিত্ত ঘর। খাটে পুরু বিছানা, মেঝেয়ও ফরাস পাতা, আয়না, ব্র্যাকেট, কাঠের দুটো চেয়ারও আছে একদিকে। তাকে বাসনকোসন, দেয়ালে ক্যালেণ্ডার, দেবদেবীর পট।

'বসুন।'

পরিমল একটা চেয়ারে বসল।

দরজা ভেজিয়ে দিল প্রতিমা। বললে, 'টাকাটা দিন।'

'কত?'

'কতক্ষণ বসবেন?'

'তুমিই বলো।'

'এই এক ঘন্টা।'

'এক ঘন্টা না আরো কিছু! এখুনি চলে যাব।'

'পাঁচ টাকা।'

মনিব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ফরাসের উপর ছুঁড়ে মারল পরিমল। নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রতিমা জিজ্ঞেস করলে, 'সিগারেট আনতে দেব?'

'সিগারেট আমার সঙ্গে আছে।'

'কিন্তু আমি এক-আধটা খেতাম।'

'সিগারেট খেতে বিচ্ছিরি দেখাবে। নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে! এমনি চুপচাপ বসে থাকো।'

'চুপচাপ বসে থাকা যায়?' প্রতিমা উসখুস করে উঠল : 'বিয়ার আনব?

'আমি ওসব খাই না।'
'বিয়ারে কী দোষ!'
'ইচ্ছে হলে তুমি খাও। আজকাল কত মেয়েই তো খায়।'
'আমার একা-একা খেতে বয়ে গেছে।'
'তা হলে খেয়ো না। যা বলেছি, চুপচাপ বসে থাকো।'
ফরাসের উপর বসল প্রতিমা। বললে, 'গান শুনবেন?' খাটের নিচে একটা বক্স-হারমোনিয়ম ছিল, তার দিকে হাত বাড়াল।
'রক্ষে করো। সে যে কী ছিরির গান হবে বুঝতে পাচ্ছি।'
অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল প্রতিমা। এ কেমনতরো লোক। দিব্যি সুস্থ-সমর্থ যুবক, অথচ এ কেমন আজগুবি ব্যবহার!
'তা হলে—'
'কী তা হলে!'
ভেজানো দরজায় খিল চাপাল প্রতিমা। বললে, 'উঠুন, খাটে চলুন।'
'খাটে এখুনি উঠব কী!' পরিমল হাসতে চেষ্টা করল।
প্রতিমা গম্ভীরমুখে বললে, 'হ্যাঁ, আমার সময়ের দাম আছে।'
'ঐ নোংরা খাটে আমি শুই না।'
'তা হলে যেখানে বসে আছেন ঐ চেয়ারটাও তো নোংরা।'
'না, চেয়ার বেশ ভদ্র। তুমি যদি আরেকটা চেয়ারে বস, দিব্যি ভাবা যাবে যে আমি মাস্টার তুমি ছাত্রী।'
'আপনি বুঝি প্রফেসর?'
'আর তুমি বুঝি ছাত্রী?'
হাসল প্রতিমা।
'বরং ভাবা যেতে পারে তুমি মাস্টারনী আর আমি ছাত্র।'
প্রতিমা হঠাৎ কাছে সরে এল। ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আপনার কী হয়েছে?'
'তার মানে তুমি কি ডাক্তার, স্টেথিস্কোপ দিয়ে আমার বুক দেখবে? যাও।'
প্রতিমা সরে দাঁড়াবার আগেই উঠে পড়ল পরিমল।
'এখুনি যাবেন!'
'তোমার টাকা তো পেয়েই গেছ।'
'তা হোক। এ টাকায় আরো কতক্ষণ থাকা যায়।'
'সময়ের দাম তো আমারও থাকতে পারে।'
'কোথায় যাবেন?'
'বাড়ি যাব বললে বিশ্বাস করবে?'
'না। ভাবব আরেক ঘরে গিয়ে উঠবেন। এ রকম আছে। এক ঘরে সাধু অন্য ঘরে গিয়ে শোধ তোলে।'

'নিজেরা যা তাই তো ভাববে। আমার টাকা অত সস্তা নয়।'

দরজার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল প্রতিমা। বললে, 'আবার কবে আসবেন?'

'কি বললে?'

'আবার কবে আসবেন?'

'কখনো না, ও কথাটা তুমি করে বলতে হয়। বলতে হয়, আবার কবে আসবে!'

'বেশ, তাই বলছি। আবার কবে আসবে?'

'দেখি কবে সময় হয়।'

'আবার একদিন এস।'

'ছি ছি, তুমি আমাকে ছুঁয়ে ফেললে?'

প্রতিমার মুখ এতটুকু হয়ে গেল : 'কেন, ছুঁলে কী হয়?'

'অনেক কিছু হতে পারে। কোথায় কী আছে, নিশ্বাসে হতে পারে। কী দরকার! দূরে-দূরে থেকে ভালোবাসা হয় না?' পাশ কাটিয়ে চলে গেল পরিমল।

কদিন পরে আবার এল এ পাড়ায়। দেখল প্রতিমা বসে আছে। পরিমলকে দেখে উঠে একটু ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু পরিমল ঢুকল না। থাক প্রতীক্ষা করে। কতক্ষণ পারে দাঁড়াতে!

আরেক দিন দেখল সদরে নেই।

প্রতিবেশিনী বললে, ঘরে লোক আছে।

এ সময়েই যেন ওকে বেশি দরকার। পরিমল বন্ধ দরজায় টোকা মারল।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্রতিমা। বললে, 'এখুনি চলে যাবে। তুমি একটু ঘুরে এস। এই আধ ঘণ্টা।'

'আচ্ছা।'

'আসবে তো ঠিক?'

'আসব।'

পরিমল এল না।

তারপর যেদিন এল আগের মতই নোট ছুঁড়ে দিয়ে বললে 'কিছু খাবার আনাও তো, ভারি খিদে পেয়েছে।'

'কী খাবে? চপ কাটলেট?'

'না। লুচি আলুরদম মিষ্টি।'

একটা কিছু করতে পেয়ে খুশি হল প্রতিমা। চাকরকে পাঠাল দোকানে। চাকর ঠোঙা ভর্তি খাবার নিয়ে এল।

প্লেটে করে খাবার সাজিয়ে দিল প্রতিমা। গ্লাসে জল গড়াল। বললে, 'খাও।'

'আমি খাব না।'

'সে কী?'
'তুমি খাও।'
'আমি তো খাবই। আমার জন্যে আছে।'
'না, আমার খাওয়া হবে না। তুমি প্লেট সাজাতে গেলে কেন? ঠোঙাটা দিয়ে দিলেই তো হত।'
'আছে তো ঠোঙা।'
'তুমি তো ছুঁয়ে দিয়েছ। বেশ্যার ছোঁয়া আমি খাই না।'
'বেশি বাহাদুরি করতে হবে না।' একটা মিষ্টি আঙুলে করে মুখের কাছে তুলে ধরল প্রতিমা।
শুধু মুখই ফিরিয়ে নিল না, প্রতিমার হাতটা জোরে ঠেলে দিল পরিমল।
'আবার খাবার আনাই।' প্রতিমা বললে।
'আমার খাবার শখ মিটে গেছে।'
'যাদের এত ঘেন্না তাদের কাছে আসা কেন?'
'নইলে আর যাবার জায়গা কোথায়?' পরিমল উঠে পড়ল। মনিব্যাগ থেকে আরো দুটো টাকা নিয়ে ছুঁড়ে দিল ফরাসে : 'খাবারের দাম।'
'টাকা লাগবে না।'
'টাকায় আবার তোমাদের অরুচি হয় কবে?'
এগিয়ে দিতে এসে প্রতিমা বললে, 'আবার কবে আসবে?'
'বা সুন্দর বলেছ তো। দিব্যি টানটুকু এনেছ তো!'
'শোনো, দেরি কোরো না।'
'যদি বিরক্ত না কর তা হলে আসব।'
'না, বিরক্ত করব না।'
পরের দিন যখন এল তখন ঢোকামাত্রই দরজায় খিল চাপিয়ে প্রতিমা একেবারে পরিমলের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে, 'সত্যিই তো, আর জায়গা কোথায়! আর কোথায় আসবে? আমরা যেন মানুষ নই। আমরা যেন ভালোবাসতে পারি না।'
হঠাৎ একটা করুণ আর্তনাদ করে উঠল পরিমল, শারীরিক আর্তনাদ। মুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল প্রতিমা। পাংশুমুখে বললে, 'কী হল?'
'আমার বুকে ব্যথা। আচমকা এমন কদর্যভাবে জড়িয়ে ধরলে না—'
ম্লান হয়ে গেল প্রতিমা। একটা পাখা কুড়িয়ে এনে হাওয়া করতে লাগল। বললে, 'আমি বুঝি নি—'
'একটু ভদ্রভাবে থাকতে পারো না? নামটা তো খুব সম্ভ্রান্ত করেছ, ব্যবহারটা—'
'ভুল হয়ে গেছে।'
উঠে পড়ল পরিমল। বললে, 'চৌবাচ্চায় পরিষ্কার জল আছে?'

'কেন?'
'স্নান করব।'
'তোমার বুকে না ব্যথা?'
'তা হোক। স্নান না করলে এ জ্বালা যাবে না।'
'সে জল তো বেশ্যা-বাড়িরই জল হবে। তাতে কি জ্বালা যাবে?'
'ঠিক বলেছ। বাড়িতে কোথাও গঙ্গাজল আছে? গায়ে একটু ছিটিয়ে নিলেই হবে।'
'না, নিজের বাড়ি গিয়েই স্নান কোরো।' প্রতিমা হাত বাড়াল : 'হ্যাঁ, টাকাটা—বেশ্যা কি আর তার টাকা ভোলে?'
'ও, হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে, এই নাও—'
'হাতে করে দিলে ছোঁয়া লেগে যেতে পারে, ফরাসের উপর ছুঁড়ে দাও।'
তাই দিল ছুঁড়ে।
'আবার কবে আসবে?'
'আর আসব না।'
'না, এস, বিরক্ত করব না, দূরে বসে গল্প করব।'
তাই আবার এসে চেয়ারে বসল পরিমল। নিচে, ফরাসে, পায়ের কাছে, দূরে বসল প্রতিমা। বললে, 'কী করতে হবে বলো।'
'উদাস হয়ে চুপচাপ বসে থাকো।'
'উদাস হয়ে!' হাসল প্রতিমা : 'ও কখনো পারা যায়?'
'যায় না তো, তোমার আগের জীবনের গল্প বলো।'
'সে তো নিতান্ত মামুলি। তার চেয়ে তুমি বলো তোমার কী হয়েছে।'
'থাক, আমার জন্যে মায়ায় কাজ নেই। হোক মামুলি, তবু তোমার ইতিহাসটা বলো। তুমি কী করে এ পথে এলে?'
'একটি ছেলেকে ভালোবেসেছিলাম।'
'কী করেছিলে?'
'ভালোবেসেছিলাম।'
হেসে উঠল পরিমল। বললে, 'বেশ্যার আবার ভালোবাসা!'
'বা, তখন তো আমি কুমারী।'
'রাখো, আগে পরে সব সমান।'
'যাও, বলব না—'
'কী বলবে? বলবে ছেলেটা ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। আর তুমি কিছু করলে না, তুমি তাকে ভাসালে না। পরে তার উপর শোধ নিতে গিয়ে এ পথে চলে এলে—'
'আজ্ঞে না। এখন এ পথে তুমিই আবার আমাকে ভাসাবে দেখছি।'
'কেন, আমি তোমার ন্যায্য টাকা দিই না?'
'শুধুই টাকা?'

'বেশ্যার কাছে টাকা ছাড়া আর কী আছে?'

'আচ্ছা বলো তো বারে বারে ওকথাটা শোনাও কেন?'

'সত্য কথা শুনতে ভয় করে বুঝি?'

'না, যে খোঁড়া তাকে বারে-বারে খোঁড়া বলতে হয় না। সে মনে ব্যথা পায়।'

'সে খোঁড়ার মন আছে বলে। বেশ্যার আবার মন কী! শুধু টাকা। শুধু উন্নতি, উচ্চতর পাত্র। তোমাকে যখন ভাসিয়ে দিচ্ছি তখন আজ কিছু বেশি নাও।' ব্যাগ খুলে পনেরো টাকা ছুঁড়ে দিল পরিমল।

'আবার কবে আসবে?'

কোনো দিন দিনক্ষণ বলে না, এমনি যখন খুশি আসে, আজ হঠাৎ বলে দিল, বুধবার আসব।

বুধবার গেল না। ইচ্ছে করেই গেল না। কী, তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে প্রতিমা? উচাটন হয়ে রয়েছে? গেল না বলে একটু কি হতাশ হবে?

ছাই হবে। ওদের আবার প্রতীক্ষা! ওদের আবার হতাশা!

পরের বুধবার গেল। দোরগোড়ায় দেখল না। প্রতিবেশিনীরা বলতে পারল না ঘর ফাঁকা কিনা। বলতে পারল না মানে বলল না। ওরা আজকাল প্রতিমার ভাগ্যকে হিংসে করছে।

গিয়ে দেখল ঘর খোলা, অন্ধকার। 'প্রতিমা!'

'তুমি এসেছ?' একটা ক্লান্ত কন্ঠস্বর আকুল হয়ে উঠল : 'এস।'

'ঘরে লোক আছে?'

'না।' নিজেই উঠে সুইচ টিপল প্রতিমা। বললে, 'দরজা খোলা, তবু কিনা লোক থাকবে! আজ বুধবার না?'

'তা তোমাদের বিশ্বাস কী! কিন্তু এ কি, তোমার কী হয়েছে?'

'জ্বর। এতক্ষণ শুয়ে ছিলাম।'

'নাও, নাও, শুয়ে থাকো।' চেয়ারে বসল পরিমল।

'বললে না, তোমাদের আবার জ্বর!'

'তা জ্বর হতে আপত্তি কী! পশুপাখিরও তো জ্বর হয়।'

সত্যি সত্যি শুয়ে পড়ল প্রতিমা, খাটে না গিয়ে, নিচে, ফরাসে। বললে, 'মাথায় খুব যন্ত্রণা!'

'ওষুধ-বিষুধ খাওনি কিছু?'

প্রতিমা চুপ করে রইল।

'ডাক্তার ডাকলে আসে না?'

প্রতিমা হাসল। বললে, 'আসে। এসেওছে।'

'সে এলে তাকে উলটে টাকা দিতে হয়। তা আর কী করা! যার যেমন ব্যবসা।' পরিমল ব্যাগ থেকে টাকা বের করল : 'তা ডাক্তার যখন এসেছে তখন ভালো হয়ে যাবে।'

'কই আর হচ্ছি। গাটা পুড়ে যাচ্ছে। খুব ব্যথা।'

'প্রথম দিকটা ওরকম হয়।' চেয়ার থেকে এতটুকু নামল না পরিমল : 'ও কিছু নয়। টাকা কটা রাখো।'

আজ বুঝি আরো কিছু বেশি দিল। হাত বাড়িয়ে কোনোদিন নেয় না, আজ বুঝি নিতে গেল প্রতিমা। কিন্তু কায়দা করে হাত সরিয়ে নিয়ে নোট দুটো ফেলে দিল ফরাসের উপর।

উঠে বসবার চেষ্টা করল প্রতিমা।

'না, না, উঠো না, অমনি শুয়ে থাকো। যৌবনের অহঙ্কারগুলো একটু কমেছে, দেখতে মন্দ লাগছে না।'

'না, ফুলওলা এসেছে।' উঠে বসল প্রতিমা।

হাতে ও ঝোলায় বিস্তর ফুল নিয়ে ঢুকল ফুলওলা। বললে, 'সেদিনের চেয়ে বেশি ফুল এনেছি। আজ বাবু যখন নিজেই আছেন, নিশ্চয়ই বেশি করে কিনবেন।'

'না, না, ফুল দিয়ে কী হবে?'

খোলা চুলে উঠে বসল প্রতিমা। বললে, 'চুলটা বেঁধে ফেলি। তুমি সেই এক বেণী ভালোবাসো, তারপর বলো তো খোঁপা করে জড়িয়ে নেব।'

'না, না, অসুখের মধ্যে ফুল কিসের?' উঠে পড়ল পরিমল : 'ফুল তো লাগে সেই ফুলশয্যায়। উঃ, পাগল না হলে মানুষ কী করে যে ফুলের মধ্যে শুয়ে ঘুমোয়?'

কিছু দিন ফাঁক দিয়ে আবার এসেছে পরিমল।

দেখল প্যাসেজের খানিকটা দূরে সরে দাঁড়িয়ে প্রতিমা আরেকটা বাবুর সঙ্গে দরাদরি করছে। ওদের পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল পরিমল। যদি আগেভাগে ঘরে গিয়ে বহাল হতে পারে তাহলে দেখা যাবে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়। দেখা যাবে প্রতিমার ভালোবাসার দৌড়।

পরিমলকে দেখেই প্রতিমা বাবুকে ছেড়ে দিয়ে ভিতরে চলে এল।

'ওকি, ও বাবুকে ছাড়লে কেন? পুরোনোর জন্যে কি কেউ নতুনকে ছাড়ে? যাও, যাও, ডেকে আনো।' পরিমল ব্যস্ত গলায় বললে।

'না, তুমি চলো।'

'বা, আমি তো ঘরে যাবার জন্যে আসি নি। আমি শুধু জানতে এসেছি কেমন আছ।'

'ভালো আছি।'

'কিন্তু রোগা হয়ে গিয়েছ। বেশ দুর্বল দেখাচ্ছে। তা এখুনি—এরি মধ্যে দরজায় দাঁড়ানো কেন?'

'নইলে চলবে কী করে?'

'আহা, শাঁসালো বাবুটিও চলে গেল।'

'তা তুমি—তুমি চলো—'

'আমি শাঁসালো নই বাবুও নই। আমি অমনি দেখতে এসেছিলাম ভালো হয়ে উঠেছ কিনা।'

কিন্তু সেদিন একেবারে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল পরিমল। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করল। দরজা বন্ধ করেই খাটের উপর আঁট করে পাতা বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল।

প্রতিমা তো স্তব্ধ!

'এ কি, কী হল তোমার?'

'প্রচণ্ড জ্বর। সারা গায়ে ব্যথা—'

'তা এখানে এ নোংরা বিছানায় শুয়ে পড়লে যে।'

'যে অসুস্থ অজ্ঞান তার আবার নোংরা কী। সে তো মাঠে ঘাটে ফুটপাতে হাসপাতালেও শুতে পারে।'

কাছে বুঝি একটু ঝুঁকে এল প্রতিমা। বললে, 'এ কি, তোমার গায়ে কী সব বেরিয়েছে!'

'হ্যাঁ, মায়ের দয়া।'

'আস্তে কথা বলো। কেউ যেন না শুনতে পায়। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

আর সে কী ব্যবস্থা! খাটে মশারি ফেলে পরিমল শোয়। নিচে খোলা ফরাসে প্রতিমা। উঠে-উঠে রুগীর নানা খেজমত খাটা, নানারকম উপশমের উপায় খোঁজা। দিনের বেলায় নিজের হাতে স্পঞ্জ করে দেওয়া, নিমপাতা দিয়ে হাওয়া করা, পথ্য করে এনে নিজের হাতে খাওয়ানো। তারপর এ ও তা যে যা বলছে তাই নির্বিবাদে মেনে চলা। আহার নেই, ঘুম নেই, রোজগার নেই, লোকজন নেই, শুধু অকূল নদীতে লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভাসা।

গোড়ায় বলেছিল, 'তোমার বাড়িতে খবর দাও।'

'থাকি মেসে। ওরা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে সেই ভয়েই তো পালিয়ে এসেছি।'

'তাহলে তোমার দেশের বাড়িতে তো জানানো দরকার।'

'রাখো। অসুখ হয়ে একটা বেশ্যাবাড়িতে পড়ে আছি এ খবরে তাদের মান বাড়বে না।'

'কিন্তু এখানে অন্য কোনো আত্মীয়—'

'উঁকি মারতেও আসবে না। বলবে চিনি না, নাম শুনি নি।'

'কিন্তু যদি কিছু হয়?'

'তুমিই যা পারো ব্যবস্থা কোরো।'

অন্য বাসিন্দেরা আপত্তি করেছিল। প্রতিমা বলেছিল, 'আমার নিজের হলে কী হত? হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতিস? সেখানে একা-একা মরতে দিতিস?'

আশ্চর্য, যুক্তিটা মেনে নিল বাসিন্দেরা। সকলের সহানুভূতি প্রতিমার সঙ্গে। সত্যিই তো তার নিজের হলে আমরা কী করতাম?

এ যাত্রায় হয়েছে সে বুঝি প্রতিমাই।

আস্তে আস্তে সেরে উঠেছে পরিমল।

মুক্তিস্নানের পর ভাত খাচ্ছে।

প্রতিমাই রান্না করে এনেছে।

বেশ তৃপ্তি করেই খাচ্ছে পরিমল।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রতিমা সলজ্জ মুখে মিষ্টি হেসে বললে, 'এখন বিশ্বাস হয়?'

'কী?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

ঢোঁক গেলবার আগেই হেসে উঠল পরিমল। বললে, 'বেশ্যার আবার ভালোবাসা!'

কথা কইল না প্রতিমা। চুপ করে রইল। বাকি ভাত কটি খেতে দিল পরিমলকে।

তারপর এঁটো থালা নিয়ে চলে গেল কলতলায়।

আঁচিয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছে পরিমল, শুনতে পেল আতঙ্কিত আর্তনাদ : আগুন! আগুন! ফায়ার ব্রিগেড!

ফায়ার ব্রিগেডের আগুন নয়, বাথরুমে দরজা বন্ধ করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজের শাড়িতে আগুন লাগিয়েছে প্রতিমা।

দরজা ভাঙতে দেরি হয়ে গেল বলেই প্রতিমাকে বাঁচানো গেল না।

প্রতিমার দগ্ধ শরীরের দিকে পাথরের মত তাকিয়ে রইল পরিমল। মনে হল প্রথম প্রেমের পর আরো প্রেম আসে কিন্তু প্রথম মৃত্যুর পর আর মৃত্যু নেই।

তারপর কী হবে পরিমল সমস্ত জানে। পুলিস আসবে, তাকেই গ্রেপ্তার করবে। ফুলওলা আসবে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে ফুলের মধ্যে শুইয়ে দেবে বাসিন্দেরা। মুখখানা নিটুট আছে, পরিমলের ছুঁতে খুব ইচ্ছে করবে, হয়তো বা একটু আদর করতে। কী জানি, হয়তো তার প্রার্থিত চুম্বনটি রাখতে তার কপালে। সব—সব তার জানা আছে, খবরের কাগজে সে হেডলাইন হবে। শেষ পর্যন্ত অনেক হুজ্জত হাঙ্গামা করে পুলিসের হাত থেকে বেরিয়েও আসবে। কিন্তু এইটুকুই শুধু জানা নেই প্রতিমাকে কী করে ফের প্রতিমা করা যায়!

৯৯। মৃত্যুদণ্ড

কেন কে জানে একটু একা থাকতে ইচ্ছে করছিল।

একা থাকবার অসুবিধে কী! কাউকে না ডাকলেই হল। কেউ যদি দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়, বলে দিলেই হবে, এখন না।

তা ছাড়া লাঞ্চ-টাইম তো প্রায় হয়ে এসেছে। উঠে লাঞ্চের টেবিলে গিয়ে বসলেই তো হয়। কতক্ষণ বেশ থাকা যায় নিরিবিলি।

আশ্চর্য, একটা সিগারেট ধরাবার কথাই এতক্ষণ মনে আসে নি।

অভ্যস্ত সিগারেট ধরালাম। তাকালাম ইজিচেয়ারের দিকে। গা-হাত-পা মেলে তলিয়ে গেলেই বা মারে কে! বরং এখনই তো বিশ্রাম করবার সময়। একটানা কম বকে আসি নি। একটা সিগারেট শেষ করবার মত সময় তো অন্তত ইজিচেয়ারে ব্যয় করা যায়।

না, চঞ্চল হবার আছে কী।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। পাইচারি করলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর একটু নড়ে-চড়ে বেড়াতেই এখন ভালো লাগছে। একলার মতন এত বড় ঘর আর পাব কোথায়?

ঘুরতে-ঘুরতে বড় জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেবদারু গাছগুলো নতুন পাতায় সতেজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় বসে একটা কোকিল ডাকছে। গা বেয়ে কটা কাঠবিড়ালী ছুটোছুটি করছে। কী আশ্চর্য, কোত্থেকে একটা হনুমান এসে পাঁচিলের উপর বসেছে।

নিচের দিকে তাকালাম।

অজস্র লোকের আনাগোনা। সবাই ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। কী যেন হবে, হতে চলেছে এক্ষুনি এক্ষুনি হয়ে যাবে। অথচ কী যে হবে কেউ বলতে পারছে না। একে-ওকে জিজ্ঞেস করছে, খোঁজ করছে এখানে-ওখানে। নিচে না উপরে এ-ঘর না ও-ঘর, জানা-র ভাব করে সবাই যাচ্ছে-আসছে, উঠছে-নামছে, কিন্তু আগাগোড়া সমস্তই অজানা।

মোটা কার্পেটের উপর পা ফেলে-ফেলে চলতে বেশ আরাম আছে। সমস্ত পথটাই যদি এরকম হত।

এরকম হবার নয়। একটা মানুষ তার হাজার রকম সমস্যা। আর তার নিদারুণতম সমস্যা বুঝি এইখানে।

এইখানে। এই মুহূর্তে।

বাকি সিগারেটের টুকরোটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরে এলাম। না, ইজিচেয়ারের দিকে গেলাম না, মূর্তিমন্ত খাড়া চেয়ারটাতেই বসলাম।

একটু চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আসলে চিন্তা করবার আছে কী। সমস্তই তো মুখস্ত।

মুখস্ত?

তা ছাড়া আবার কী। যদি 'না' বলে, এক কথায় হয়ে যাবে। আর যদি 'হ্যাঁ' বলে, তাহলে—বইটা একবার খুলে দেখব কী! সেলফের দিকে হাত বাড়াতে চেয়েও বাড়ালাম না। নিজের মনে হাসলাম। সমস্ত মুখস্ত। কিছু অবশ্য বাড়তি কথা জুড়তে হবে কিন্তু তাও জলের মত সোজা।

সোজা?

তাছাড়া আবার কী। নিশ্বাসের মত সোজা।

কলিং বেল টিপলাম। চাপরাশি এসে দাঁড়াল।

'ঘর ফাঁকা?'

'না। সবাই বসে আছে।'

কিন্তু কী সাংঘাতিক স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কোনো কাজকর্ম নেই তবু কোথাও একটা টু শব্দ পর্যন্ত হচ্ছে না।

'পাবলিক প্রসিকিউটার কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিজের চেম্বারে গেছেন বোধ হয়।' চাপরাশি বললে, 'অ্যাসিস্টেন্ট কোর্টে আছে। ডাকব?'

'না, ডাকতে হবে না।' লাঞ্চ-টেবিলের দিকে ইশারা করলাম : 'একটু চা দাও।'

'খাবেন না?'

'দেখি—পরে খাব। কখন ওরা ফিরে আসে তার ঠিক কী।'

ফ্লাস্ক থেকে পেয়ালায় চা ঢেলে দিল চাপরাশি। একবার বোধ হয় বলতে চাইল, যা বিষয়, ফিরতে দেরি হবারই সম্ভবনা কিন্তু আমার কথার উপর কিছু মন্তব্য করতে সাহস পেল না। চা দিয়ে চলে গেল।

চা-টা শেষ করলাম। সঙ্গে আরেকটা সিগারেট।

তবু পাশের ঘরে কোনো শব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই। স্তব্ধতা পাথরের চেয়েও পাথর হয়ে আছে।

কলিং বেল টিপলাম। চাপরাশিকে বললাম, 'জরুরি সই থাকে তো নিয়ে আসতে বলো।'

হ্যাঁ, কিছু অন্য কাজ করা যাক। ধরা যাক অন্য সুর।

চাপরাশি ফিরে এসে বললে, 'কোনো সই নেই।'

বাজে কথা। তার মানে আমলারাও প্রতীক্ষা করে আছে। কাজে মন দিতে পারছে না।

কাজে-অকাজে কত লোক তো দেখা করতে আসে। এখন কেউ এলেও তো পারত। খানিকক্ষণের জন্য যাওয়া যেত অন্য চিন্তায়। কেমন যেন সবাই বুঝে নিয়েছে এটা দেখা করার সময় নয়। হয়তো দেখা করাটা সঙ্গতও নয়।

বা, তাই বলে কাজ-ছুট হয়ে বসে থাকতে হবে? ওরা কতক্ষণে ফিরবে তা কে জানে। কোনো তো ঘড়ি বাঁধা টাইম নেই। সন্ধ্যে করে দিয়ে ফিরলেই বা ওদের মারে কে?

ততক্ষণ নির্জন কারাবাসে বন্দী হয়ে থাকব? উপায় কী তা ছাড়া? কাজ কই যে কাজ করব? কাজ করাবার মানুষ কই? মন কই?

কাউকে ডাকব নাকি গল্প করে যেতে? কাকে ডাকব? কে আসবে? আর, যে প্রসঙ্গে এই স্তব্ধতা তার বাইরে এ মুহূর্তে আর গল্প কোথায়?

চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার পাইচারি করলাম। আবার এসে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। নেবালাম। আবার ধরালাম।

তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ টের পেলাম পাশের ঘরে এক সঙ্গে অনেকগুলি চেয়ার টানার শব্দ হচ্ছে। বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল।

ঘরে ঢুকে চাপরাসি বললে, 'এসেছে।'

তবে আর কথা কী। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লাম। কোর্টে-গাউনে পুনরায় সজ্জিত হলাম। এক ঢোঁক জল খেলাম। তারপর নিজের মুখটা নিজেই চিনতে পারি কি না দেখবার জন্যে তাকালাম আয়নায়।

ধীর পায়ে এজলাসে এসে বসলাম।

কী ভীষণ নীরব এই মুহূর্ত! নিশ্ছিদ্র নীরব।

প্রকাণ্ড ঘরটা লোক দিয়ে ঠাসা। অনেকে বসে, অনেকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কারুরই যেন নিশ্বাস পড়ছে না, চোখের পাতা নড়ছে না। এই মুহূর্তের জন্যে সমস্ত বিশ্ব সংসার ভুলে গিয়েছে। স্তব্ধতা শুধু ছোঁয়া যায় নয়, স্তব্ধতা বুঝি শোনাও যায়।

ডিফেন্সের উকিলই যেন বেশি উদগ্রীব। সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে চাইছে জুরি আসামীকে নির্দোষ বলুক। মামলায় প্রতিপক্ষতা করতে করতে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে যে আসামীকে মিথ্যে জড়ানো হয়েছে, আসামী আসলে নিষ্পাপ। বিশ্বাস না হলেই বা কী, যে কোনো কারণেই হোক, জুরির ভার্ডিক্ট আসামীর অনুকূলে গেলেই তো সে জয়ী, বিশ্বজয়ী। তার তখন কত নাম, কত প্র্যাকটিসের উন্নতি। বয়সে এখনো সে প্রবীণ নয়, তাই তার প্রতীক্ষাটাই সূচ্যগ্রতম। পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রতীক্ষায় তেমন কোনো তীব্রতা নেই—যা হবার তা হবে। আসামীর কনভিকশানই হোক এমন কোনো তার ধনুর্ভঙ্গ পণ নেই, তবে এতক্ষণ সুকৌশলে মামলা চালিয়ে এসে শেষটায় ভেস্তে যায় এ সে চায় না। তাই আসামী ছাড়া পেলে তার হতাশা নেই বটে কিন্তু দণ্ডিত হলেই সে তৃপ্ত হয় নিঃসন্দেহ।

কিন্তু আমি—আমি কী চাই?

দর্পণেই আত্মদর্শন না সেরে গভীরতম মনের মধ্যে তাকালাম। আমি কী চাই? যাতে হাঙ্গামা কম পোয়াতে হয়, কম লিখতে হয়, সহজেই আলগোছ হওয়া যায়, তাতেই আমি খুশি।

আর এরা সব কী চায়? এই যারা গায়ে গা লাগিয়ে ঘর-বারান্দা জুড়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? তাদের কোনো প্রত্যাশা নেই। তাদের শুধু কী হয় এমনি একটা নিরবয়ব উত্তেজনা। আসামী ছাড়া পেলেও তারা উত্তেজিত, ফাঁসির হুকুম হলেও তারা উত্তেজিত।

ক্ষুরের ধারের উপর বসা কী একটা বিনিশ্চল মুহূর্ত!

সকলের চোখ এখন আমার উপর। আমি ফোরম্যানকে প্রশ্ন করব আর তার পরেই ফোরম্যান উত্তর দেবে, দোষী না নির্দোষ!

প্রশ্ন করতে আমিই কি কিছু দেরি করছি? .

আসামীর কাঠগড়ায় রামেশ্বরের দিকে তাকালাম। খাঁচার রেলিঙ ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম প্রথম দু-হাত জোড় করে দাঁড়াত। বলেছিলাম সহজ আরামে যেমন করে দাঁড়ায়, তেমনি করে দাঁড়াও। ঐ দীনহীন মিনতির ভঙ্গি কেন? তুমি কি দয়া ভিক্ষা করছ? মোটেই নয়। তুমি বিচার চাইছ। সেটা তোমার দাবি, প্রার্থনা নয়।

রামেশ্বরের সঙ্গে চোখাচোখি হল। দুজনের কেউ জানি না কী হবে! কেউ জানে না।

কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে আরো একটু দেরি করলাম।

'আপনারা সকলে একমত?' তাকালাম ফোরম্যানের দিকে।

'একমত।' ফোরম্যান বললে।

'আসামী দোষী না নির্দোষ?'

'দোষী।'

শুধু এ সিদ্ধান্তেই তো হবে না, এখন আমি কী করি! জনতা একবার দুলে উঠে পরমুহূর্তেই ফের তন্ময় হয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমি সেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আর জুরি যখন একটুও এদিক-সেদিক করল না, অন্য কোনো ধারায় নেমে এসে অপরাধকে লঘু করতে চাইল না, আমি সরাসরি রামেশ্বরের ফাঁসির হুকুম দিলাম।

লিখলাম আসামীর অনুকূলে কিছুই বলবার নেই। তাই তাকে চরম দণ্ডই দিতে হল।

সুন্দর হস্তাক্ষরে সুন্দর লিখলাম। হাত এতটুকুও কাঁপল না।

আদেশ শুনিয়ে দিলাম আসামীকে। স্পষ্ট কণ্ঠে মন্ত্রপাঠের মত বললাম, 'রামেশ্বর, তুমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছ। তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হল।'

না, দরাজ গলা এতটুকুও কাঁপল না। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ—আইনের যা চাহিদা তাই পূরণ করলাম।

শুধু দেখলাম, রামেশ্বর ধীরে-ধীরে বসে পড়ল।

ফিরে এলাম খাসকামারায়। গাউন-কোট থেকে মুক্ত হলাম, খুলে ফেললাম ব্যান্ডকলার। সাধে কি আর এই কলারকে টুঁটিটেপা কলার বলে? গলায়-ঘাড়ে হাত বুলিয়ে নিলাম। ওটা তো সব সময়েই করি। ওটা তো অভ্যেসমাত্র।

না, জল খাবার কী হয়েছে। একটা সিগারেট খাওয়া যায়। সিগারেট তো অনবরতই খাচ্ছি। পাখা? পাখা তো তখন থেকেই চলছে, বন্ধ হয়নি এক মুহূর্ত।

আয়নায় আরেকবার আত্মদর্শনের কি দরকার আছে? এ মুখে কী আছে আর দেখবার? তবু কেন কে জানে মনে হল আয়নায় তাকালেই যেন আর কার মুখ দেখব!

পেশকারকে ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে কাঁদছে?'

পেশকার কান খাড়া করল।

'আসামীর আত্মীয়স্বজন এসেছে বুঝি কেউ। দেখুন তো—'

কিন্তু কে কতক্ষণ কাঁদবে? কাঁদবে আর ভুলে যাবে। আবার কাঁদবে আবার ভুলে যাবে। মানুষের বিস্মৃতিটাই তো নিয়তির পরিহাস।

পেশকার ফিরে এসে বললে, 'কই কেউ কাঁদছে না তো। ঘর-বারান্দা সব তো এখন ফাঁকা।'

'আত্মীয়স্বজন কেউ আসেনি? স্ত্রী-পুত্র?'

'দেখলাম না তো কাউকে।'

দুপুরের খাওয়াটা ফেলা যেতে পারে না তাই বলে। চাপরাশি তারই ইঙ্গিত করল। খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। কিন্তু খাদ্যবস্তুগুলো কেমন যেন ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ বলে মনে হল। চাপরাশিকে বললাম, বরং এক পেয়ালা কফি আনো।

এখানে কেউ না আসুক, আসামীর বাড়িতে এতক্ষণ খবর পৌঁছে গিয়েছে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই কাঁদছে ওর আত্মীয়স্বজন। অন্তত কেউ-কেউ কাঁদছে। আমার বাড়িতে—আমাদের বাড়িতে সকলের বাড়িতেই তো আমাদের মৃত্যু-দণ্ডের কথা পৌঁছে গিয়েছে, কিন্তু কই কেউ কাঁদছে না তো! কোথাও নেমে আসে নি তো বিষাদের শূন্যতা!

কেন আসেনি? কেন সবাই কাঁদছে না মুখ গুঁজে? কিসের আশায় চলছে-ফিরছে কাজ করে যাচ্ছে?

চাপরাশিকে বললাম, আপিসের দস্তখত নিয়ে আসতে বলো।

সেরেস্তাদার বললে, কাল করলেও হবে।

দু একটা ম্যাটার ছিল না যা খাসকামারায় বসে শোনা যায়? হ্যাঁ, এই তো আছে। উকিলবাবুদের ডাকান।

'এখনো কাজ করবেন?' একজন এসে জিজ্ঞেস করলে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। বললাম, 'কেন করব না? এখনো ঢের টাইম আছে।'

আরেকজনও এসে গেছে। বললে, 'আজ থাক।'

'আপনারা যদি রেডি না থাকেন, সে কথা আলাদা। কিন্তু কাজ ছাড়া মানুষ থাকে কী করে? যার যা কাজ তা ঠিকঠাক করে যেতে হবে। কাজের

কাছে অন্য কোনো বিবেচনা নেই। আর যে বসে থাকে থাকুক, কাজ বসে থাকতে জানে না।'

উকিলদের উপদেশ দেওয়া বৃথা। তারা বসেই থাকল।

অগত্যা বাড়িই ফিরে গেলাম।

কপাউণ্ডে ছেলেরা ব্যাডমিন্টন খেলছে তাদের একজনের একটা র‍্যাকেট চেয়ে নিয়ে খেললাম কতক্ষণ। আমার অক্ষমতাটা সকলের সম্ভোগ্য করে তুললাম। আমিও কম হাসলাম না।

আরতি বললে, 'আজ এত সকাল-সকাল?'

'এক-একদিন ভাগ্য কী দয়া করে বসে। কাজকর্ম কমিয়ে দেয়। ছুটি দিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি। শোনো—' একটু গাঢ় হতে চেষ্টা করলাম : যখন সময় পাওয়া গেছে চলো সিনেমায় যাই।'

'সত্যি?' আরতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'হঠাৎ এই উৎসাহ?'

'কত দিন দেখি না—'

চায়ের তদারক করতে এসে আরতি টের পেল লাঞ্চ কিছুই খাইনি।

'এ কী, কিছুই খাও নি যে?'

'পেটটা সুবিধের নয়। তবে এখন—না, থাক। শুধু এক কাপ চা-ই দাও।'

আরতিকে সব বললে হয়! কত দিন কত মামলার বিষয় ওর কাছে গল্প করেছি, কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাহিনী। আজকের মত এত বিরাট ব্যাপার তো একটাও ঘটেনি। একটা বলবার মত ঘটনা। কিন্তু বললেই ও বিষণ্ণ হয়ে যাবে। বারে-বারে খোঁচাবে, তোমার একটুও মায়া দয়া নেই, ফাঁসি না দিয়ে যাবজ্জীবন দিতে কী হয়েছিল?

ওকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না; এতে দয়ামায়ার প্রশ্ন নেই, সবটাই বিশুদ্ধ আইনের প্রশ্ন। আইন নিরপেক্ষ। নিরঞ্জন। প্রকৃতির আইন ভাঙলে প্রকৃতিও মার্জনা করে না।

এতে নিরস্ত হত না আরতি। বলত, একটা জীবন দিতে পারো না, জীবন নিতে ওস্তাদ!

উত্তরে বলতাম, তা আমি কী করব! ন জন জুরি, সমাজের মাথা, একবাক্যে দোষী বলেছে।

যেমন তুমি বুঝিয়েছ তেমনি তারা বলেছে। পালটা বলত আরতি। তাছাড়া আরো বলত, সিদ্ধান্তটাই ওদের, চরম আদেশটা তো তোমার। ইনিয়ে-বিনিয়ে একটুঘ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যাবজ্জীবন দিয়ে দিলেই তো হত

আমি ছাড়তাম না, কঠিন হতাম।. বলতাম, অযোগ্য ক্ষেত্রে কোমল হতে গেলে উপরের কোর্ট তিরস্কার করত।

করলে করত। যা করবার উপরালা। তুমি কেন প্রাণ নিতে যাও?

এ প্রাণ নেওয়া নয়, এ বিচার করা।

বিচার? মানুষটাকে যদি মেরেই ফেললে তবে আর কার বিচার, কার শাস্তি? এমনি আরো কত কথা বলত আরতি।

আমি তখন শেষ কথা বলে পাশ কাটাতাম, এরই জন্যে মেয়েরা বিচারক হতে পারে না।

কথাটা ভাঙলে তাই লাভ হত না। বরং অশান্তি বাড়ত। সমস্তক্ষণ ছটফট করত আরতি। বেজার হয়ে থাকত। আমরাও ঘুমটুকু নষ্ট করে দিত। বারে বারে এসে জিজ্ঞেস করত, বল না রামেশ্বরের কে-কে আছে, ও চলে গেলে ওর সংসার কী করে চলবে? ওর সংসার কী দোষ করেছিল, আইন তাকে কেন শাস্তি দেবে?

তার চেয়ে এ অনেক ভালো হল। কোনো তর্ক নেই প্রশ্ন নেই পর্দায় যা দেখেছ তাতেই পরিপূর্ণ নিমগ্ন থাকতে পারছে। কে সহসা অকালে চলে গেল। পৃথিবী ছেড়ে, কার অভাবে কোন সংসার অচল হল এ সব চিন্তা কল্পনার ধারে-কাছেও আসতে পারছে না। আর আরতির আনন্দেই আমি যেন উত্তাপ খুঁজছি।

বাড়ি ফিরে এলে আরতি বললে, 'হালকা কিছু খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো, তোমার শরীর ভালো নেই।'

'না, না, এখুনি শোব কী। কত কাজ! শরীরের কথা কে ভাবে, শরীর ঠিক আছে।'

যথারীতি রাত্রে নিচে বাইরের ঘরের টেবিলে কাজ নিয়ে বসলাম। কর্তব্যের থেকে ভয় পেয়ে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে ভাবতেও হাসি পায়। সমস্ত কান্না ভোলবার জন্যেই তো কাজ কিংবা কে জানে কাজটাই হয়তো কান্না।

মুখোমুখি খোলা জানলার ওপারে গাছপালার ঝাপসায় ছায়া-মতন একটা লোকের আভাস পেলাম।

কে?

কেউ না। মনের ভুল হয়তো। হাওয়ায় নড়া একটা লতার ডগাকেই বোধ হয় মানুষ বলে ভেবেছি।

শুধু জানলা কেন, দরজাও খোলা আছে। লোক যদি হয় বাইরে কেন, ভেতরেও তো চলে আসতে পারে। তবে কি কোনো খারাপ মতলব নিয়ে এসেছে? অন্ধিসন্ধি খুঁজছে? রামেশ্বরেরই কেউ নয় তো? বুকটা ধক করে উঠল। আবার হাঁকলাম : কে?

কোনো উচ্চবাচ্য নেই।

তবে কি জানলা-দরজা বন্ধ করে দেব? উপরে পালাব?

মনে-মনে হেসে আবার নথিতে ডুব দিলাম। কাল সকালে স্টেনো আসবে, রিটন্ চার্জ প্লেস করতে হবে, তারই জন্যে নূতন করে তৈরি হওয়া দরকার। পালালে চলবে কেন?

কতক্ষণ পরে কী নিগূঢ় আকর্ষণে কে জানে জানলার দিকে তাকালাম। এ কী! স্পষ্ট লোক। স্পষ্ট রামেশ্বর।

সে কী? রামেশ্বর কী করে আসে? তার তো এরই মধ্যে ফাঁসি হয়ে যায় নি যে তার ভূত আসবে! সে তো জেল-হাজতে। জেল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে? সেটা কখনো সম্ভব? আর, বেরিয়ে পড়ে আসবে সে আমার বাড়ি? দুনিয়ায় আর তার পালাবার জায়গা নেই?

কিন্তু আবার তাকালাম—সত্যি রামেশ্বরই তো। প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুটি হাত একত্র করে দাঁড়িয়েছে। যেমন কাঠগড়ায় প্রথম দিকে দাঁড়াত। বলেছিলাম, বিচারের প্রার্থনা নয়, বিচারের দাবি। তারপর সোজা হয়ে সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখন আবার হাতজোড় করেছে কেন? আমার কাছে ও কী চায়? আমি কী দিতে পারি?

কতক্ষণ পরে দেখি আরতি ব্যস্ত পায়ে নিচে নেমে এসেছে। চলো ঘুমুতে চলো—কত রাত হয়েছে খেয়াল আছে? এমনিতে তো ঘুমের মধ্যে কথা বলো, এখন আবার জাগা মানুষ একা-একা কথা কইবে—এ তো ঠিক নয়। এত কী কাজ! প্রায় হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেল আরতি।

কিন্তু শুলেই কি আর ঘুম আসে?

দিনে-দিনে সমস্ত ফিকে হয়ে আসার কথা কিন্তু রামেশ্বরকে ভুলতে পারছিলাম না। অথচ তার কী হল কোথায় গেল কোনো খবর নেই।

আমার কাছে ওর কাজ ফুরিয়েছে, ও-ও ফুরিয়েছে। শুধু জেগে আছে ওর কাতর মুখের চাউনি আর সেই প্রার্থনার জোড়হাত।

সেদিনও রাত্রে বাইরের ঘরে কাজ নিয়ে বসেছিলাম। বৃষ্টি হচ্ছিল বলেই বোধ হয় টের পাই নি কখন একটা লোক বারান্দায় উঠে একেবারে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কে?

লোকটা দরজা ডিঙিয়ে ভিতরে চলে এল নির্ভয়ে। নত হয়ে নমস্কার করে বললে, 'আমি রামেশ্বর।'

রামেশ্বর? তীক্ষ্ণ-ত্রস্ত চোখে তাকালাম। হ্যাঁ, সেই তো বটে। কিন্তু সে এখানে আসে কী করে? তবে কি তার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে? আর এ তার প্রেতচ্ছায়া?

'তা তুমি এখানে কেন?' প্রায় হুমকে উঠলাম।

'হাইকোর্ট আমাকে খালাস দিয়ে দিয়েছে।'

'খালাস দিয়ে দিয়েছে!'

'হ্যাঁ, আমি আপিল করেছিলাম।'

'বেশ করেছিলে। কিন্তু আমাকে সে খবর দেবার কী দরকার?'

'আপনার দয়াতেই তো ছাড়া পেলাম। তাই আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।'

'আমার দয়া!

'আপনার চার্জে নাকি অনেক ভুল ছিল—আর অত ভুল ছিল বলেই—'

রামেশ্বর কথাটা শেষ করতে পেল না। আমি গর্জে উঠলাম : 'যান, যান এখান থেকে। আমার ভুলের খবর আপনাকে দিতে হবে না।'

দারুণ যে বিরক্ত হয়েছি বুঝতে পেরেছে রামেশ্বর। আন্তরিকতার ভরা বিনম্র স্বরে বললে, 'ওরা ভুল বলুন, আমি বলব আপনার দয়া, আপনার দয়াতেই আমি ছাড়া পেলাম।'

আবার একটা নুয়ে-পড়া নমস্কার করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল রামেশ্বর।

একটা রিকশা করে এসেছিল, রিকশা করেই ফিরে চলল। মনে হল রিকশা-সুদ্ধু লোকটা লরি-চাপা পড়ুক। ছাতু হয়ে যাক।

কী হয় রামেশ্বরের মত একটা বাজে লোক যদি মরে যায়! কত শত লোক নিত্যি মরছে, কত শত বিচিত্র উপায়ে। অসুখে-বিসুখে তো বটেই, দুর্ঘটনায়। আর দুর্ঘটনা কি একটা? গলায় দড়ি দিয়ে মরাও যা, ফাঁসিকাঠে ঝুলে মরাও তাই। মরণ—মরণ, তার আবার ধরন কী! রামেশ্বর গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারত না? আরো কত সামান্য কারণে মরতে পারত। বাজ পড়ে মরতে পারত। ওর বাঁচার জন্যে আমার একটা চার্জ—রায়কে ভুল হয়ে যেতে হবে?

ও টিকবে বলে আমার রায় টিকবে না?

সারারাত বিছানায় ছটফট করে কাটালাম। আমার রায় আর রামেশ্বর। আমার বিচারে সুনাম আর রামেশ্বর।

কী আসে যায় যদি সংসারে একটা রামেশ্বর কম পড়ে!

ভোরবেলা উঠে পুবের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, এতটুকু মেঘ নেই, ছাড়া-পাওয়া রামেশ্বরের নমস্কারের মতই সমস্ত আকাশ আনন্দিত। ক্ষতি নেই ক্ষোভ নেই, প্রাণের রোদে মৃত্যুদণ্ড মুছে গিয়েছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে রামেশ্বরের নমস্কার ফিরিয়ে দিলাম।

১০০। দ্বিতীয় জীবন

মারপিট, দাঙ্গা সুরু হয়ে গেছে। আগুন লেগেছে বস্তিতে। দোকানপাট লুট হচ্ছে। পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ছে। জনতা পাল্টা ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে। পুলিশ এবার বুঝি গুলি চালায়।

পালাও! পালাও।

যে-যেদিকে পারল ছুট দিল।

নরহরি আর হিমানীও ছুটল।

কাছেই একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে দিকবিদিক না তাকিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল হিমানী। পিছনে নরহরিকে উদ্দেশ করে বললে, 'চলো এটার মধ্যে ঢুকি।'

হঠাৎ এই জনতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল তারা। ভেবেছিল বুঝি মামুলি মিছিল। কিন্তু হঠাৎ যে এমন প্রলয় কাণ্ড করে তুলবে হিসেবের মধ্যেই আনেনি।

নরহরিই এদিকে নিয়ে এসেছিল বেড়াতে। হিমানী তো অন্য প্রস্তাব এনেছিল। বলেছিল, চলো আজই রেজিস্ট্রিটা করে ফেলি।

আজই? তুমি বলছিলে না একটা দিন দেখতে পাঁজিতে—পরশু খুব ভালো দিন।

দরকার নেই দিনে। ঝলসে উঠেছিল হিমানী। এখুনি চলো। শুভস্য শীঘ্রং। সব পাকা করে ফেলি। বাবা মাকে দলিলটা দেখাই ওদের স্তব্ধ করি। চলো আর দেরি নয়। যা অবধারিত তাকে স্থগিত রাখবার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু আজ, এক্ষুনি, সাক্ষী কই?

রাস্তার থেকে দুটো লোক ডেকে নিলে হয় না?

কী যে বলো। আমার কলেজের দুই 'কলিগ' সাক্ষী হতে রাজি হয়েছে। পরশু তাদের পাওয়া যাবে।

উঃ। পরশু! আরো দুটো দিন!

দুটো দিন আর কতটুকু।

না, আমার আর দেরি সইছে না। আমার নির্বাচনই যে চূড়ান্ত, তার উপর যে আর কারু বিচার চলে না এটার সরকারী প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। না, সে ব্যারিস্টার নয়, এঞ্জিনিয়র নয়, বড় কোনো চাকুরে বা ব্যবসাদার নয়, সে একজন সাধারণ প্রফেসর, হ্যাঁ, দেখতে সে রাজপুত্র নয়, অবস্থাও তার বড় নয়, হ্যাঁ, তার নামটাও খারাপ—তবু সেই আমার সমস্ত—এটা আর মুখের কথায় নয়, কাগজে-কলমে দাখিল করতে চাই বাড়িতে। আমি যা প্রতিজ্ঞা করি তা যে রাখি, আমার যে যেমন কথা তেমন কাজ, তার যে নড়চড় নেই, তার সার্টিফিকেটটা হাতে পেলে পর আমার জ্বালা মিটবে। হ্যাঁ, আর দু-দিন। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।

চলো আজ তবে একটা অন্য দিকে যাওয়া যাক।

ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, আর কী কুক্ষণেই যে হাঁটা ধরেছিল তারা। বুঝতে পারেনি দু-ঘন্টার মধ্যে কী সব ঘটে যেতে পারে।

'চলে এস।' পিছনের লোককে আবার তাড়া দিল হিমানী।

যে এসে হিমানীর পাশে এসে দাঁড়াল, অন্ধকার হলেও বেশ ঠাহর হল সে নরহরি নয়। একটা প্যান্ট-শার্ট পরা অচেনা ভদ্রলোক।

'এ কী! আপনি! আপনি কে?' হিমানীর মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

'আমি!' সঞ্জয় বললে, 'কেন আমাকে কি ঠিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে না?'

'কিন্তু আপনি এখানে কেন?' হিমানীর প্রায় কান্না-কান্না।

'এ তো আমারও প্রশ্ন হতে পারে, আপনি এখানে কেন?'

'আমি আশ্রয়ের জন্য ঢুকেছি।'

'আমারও সেই কথা।'

'এখান থেকে বেরুব কী করে?'

'এখন বেরুনো ঠিক নিরাপদ নয়—এখনো গুলি ছুঁড়ছে। পুলিশ টহল দিচ্ছে। এখন চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে থাকাই মঙ্গল।'

'বা, এখানে থাকব কী।'

'বিপদে পড়ে মানুষ আরো কত জঘন্য জায়গায় থাকে, বনেবাদাড়ে, স্লিট ট্রেঞ্চে, ড্রেনে-নর্দমায়—'

'কিন্তু আমার সঙ্গে যে ছিল সে কোথায় গেল?'

'আমিই তো আপনার সঙ্গে ছিলাম—'

'আপনি তো এই শেষকালে এসে জুটলেন।'

'শেষকালে যে জোটে সেই-ই তো আসল। শেষের সঙ্গীই সঙ্গী।'

'কিন্তু কী হবে?' ছটফট করে উঠল হিমানী।

'রাত ভোর হবে। কেন ভয় পাচ্ছেন? চলুন না—মস্ত বাড়ি—দেখি না এখানে কী আছে। কী করা যায়।'

'না।' হিমানী স্বর দৃঢ় করবার চেষ্টা করল।

'না, কী। আপনি এমনি দাঁড়িয়ে থাকবেন?' সঞ্জয় শাসনের সুরে বললে, 'ভেতরে চলুন।'

'আমি আপনাকে চিনি না।'

'দুনিয়ায় কে কাকে চেনে? আমিই কি আপনাকে চিনি? কিন্তু বাইরে থেকে আপনাকে দেখে ফেললে বিপদ আছে, পুলিশ ধরে নেবে। শুধু আপনাকে নয়, আপনার জন্যে আমাকেও। আমরা দুজনে এখন এক নৌকোর সোয়ারী।'

'আমাকে ধরবে কেন? ধরলে আপনাকে ধরবে।'

'আমাকে ধরলে তো এই এম্পটি হাউসে অন্য চার্জে ধরবে। আপনার জবানবন্দি লাগবে। তাতেও আপনার রেহাই নেই। তাছাড়া পুলিশ কেন, গুণ্ডারাও হয়তো ঘোরাফেরা করছে, তারা এমন জিনিস দেখলে কী করবে কে জানে।'

ভিতরের দিকে সরে গেল হিমানী।

দেখা গেল নিচের কোণের দিকের ঘরে কটা নেপালী ছোকরা দিব্যি সংসার সাজিয়ে বসেছে। খিলখিলে হাসিতে গুলতানি করছে প্রাণ খুলে।

ওরা কারা?

ওরা বললে, ওদের একজন এ বাড়ির দারোয়ান, বাড়ির মালামালের তদারকি করে আর দুজন ওর জ্ঞাতভাই। আপনারা কে?

'দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম সিনেমা দেখব বলে' স্বাচ্ছ মুখে বললে সঞ্জয়, 'হঠাৎ এই ভিড়ের মধ্যে আটকে পড়েছি এখন ফিরি কী করে?'

'রাত্রে বাইরে বেরুনো যাবে না। এ অঞ্চলে কার্ফু পড়েছে।'

'কার্ফু! কই জানি না তো।'

'হ্যাঁ, সন্ধ্যে সাতটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত।'

'সর্বনাশ! আজ তাহলে বাড়ি ফেরাই বন্ধ!' যেন সমস্ত অপরাধ সঞ্জয়ের, এমনি ভ্রূকুটিভয়াল চোখে তাকাল হিমানী।

'তাতে কী। একটা রাত একটু অন্য রকম করে কাটিয়ে দেব।' সঞ্জয় সুখী উদাসীনের মত বললে। তারপর লক্ষ্য করল দারোয়ানকে : 'কোন জায়গাটা ভালো হবে বলো তো?'

'উপরে যান। এই টর্চটা নিন।' ছোট একটা টর্চ দিল দারোয়ান।

'উপরে ঘর আছে?'

'ঘর মানে ছাদ-দেয়াল আছে।' যেন সব বুঝতে পেরেছি, এমনিভাবে হাসল দারোয়ান : 'জানলা-কপাট বসেনি এখনো। ঐ সিঁড়ি—'

'এই যে, এস, চলে এস—' উপরে উঠতে লাগল সঞ্জয়।

তবু দ্বিধা করতে লাগল হিমানী। উপরের সঙ্গীটা বাঞ্ছনীয়, না নিচের এই লোকগুলো, স্থির করবার আগেই দারোয়ান বললে, 'যান উপরে।'

অগত্যা উপরে উঠল হিমানী। ক্রুদ্ধ মুখে বললে, 'আমাকে তখন 'তুমি' বললেন কোন হিসেবে?'

'তাতে কী হয়েছে!' একেবারে উড়িয়ে দিতে চাইল সঞ্জয়, 'আপনি তো আমার চেয়ে বয়েসে ছোটই হবেন— ছোটকে 'তুমি' বলা যায় না?'

'না। ভদ্রমহিলার মান রেখে কথা বলা উচিত।'

'আপনি বুঝছেন না, মানের জন্যেই তো তুমি বললাম। ওরা বুঝল আপনি আমার আত্মীয়, বাড়ি থেকে এক সঙ্গে বেরিয়েছি—একসঙ্গে বেরুবার মত আত্মীয়—'

'তাহলে 'তুই' বললেই পারতেন— ছোট বোনটোন ভাবত।'

'তুই! ওরে বাবা, ওটা সব সম্পর্কেই চলে, প্রেমের সম্পর্কে তো ওটা নিদারুণ ব্যঞ্জনা। তারপরে ছোট বোন। ছোট বোনকে নিয়ে সিনেমা যাবার দিন আর আছে নাকি? যাক, আপনার যখন আপত্তি, 'আপনি' করেই বলব কিন্তু দেখুন তো—এ ঘরটাই বুঝি ভালো—ভালো মানে দেয়ালের অংশ বেশি, ফোকরের অংশ কম—'

হিমানীর মায়ের কথা মনে পড়ল। কী একটা সমান বয়সী ছেলে

বিয়ে করবার জন্যে ঝুঁকেছিস? বয়েসে বেশ একটু বড় না হলে কি শ্রদ্ধা আসে? আর মনে শ্রদ্ধা একটু না থাকলে কি ভালোবাসাটা টেঁকসই হয়? এক সঙ্গে এক ক্লাসে যে পড়ে তার সঙ্গে বন্ধুতাটা যেমন স্বাভাবিক, তুইতোকারিও স্বাভাবিক। হিমানী বলেছে এ সব বিবেচনা বৃথা, আমার নির্বাচনে চলবিচল নেই।

'কী ভাবছেন?' হিমানীকে চিন্তিত দেখে সঞ্জয়ই আবার জিজ্ঞেস করল।

'আপনার সঙ্গে আমি এই ঘরে থাকব নাকি?'

'না, না, আপনি একা থাকবেন, আমি অন্য ঘরে থাকব।'

'যেখানে জানলা-দরজা নেই সেখানে আবার আলাদা ঘর কী। আপনি তো অনায়াসে হেঁটে চলে আসতে পারেন।'

'তা তো পারিই। না হেঁটে উপায় কী। বসবার জায়গা-টায়গা তো দেখতে পাচ্ছি না। মেঝেও তৈরি নেই—'

'সারা রাত আপনি হেঁটে বেড়াবেন?'

'আপনাকেও হেঁটে বেড়াতে হবে। কেননা থামলেই, বসলেই তো এক ঘরে থাকা হয়ে যাবে।'

'সত্যি,' শিউরে উঠল হিমানী, আকুল স্বরে বললে, 'দেখুন না বাইরে বেরুনো যায় কিনা।'

'শুনলেন না কার্ফু—'

'ওরা কী জানে! বানিয়েও বলতে পারে।'

'দেখছেন না রাস্তাঘাট নিঝুম, গাড়ি-টাড়ি তো নেই-ই, একটা রিক্‌শাও যাচ্ছে না। লোকজন সমস্ত উধাও, বাড়িঘর বন্ধ, শুধু মিলিটারি জিপ যাচ্ছে আর পুলিশের বুটের শব্দ।'

'কী হবে?'

'যা হবার তাই হবে।'

যেন আরো ভয় পেল হিমানী। বললে, 'আমি তাহলে নিচে যাই।'

'নেপালীদের আড্ডায়? ওদের কাছে কুরকি আছে।'

'সত্যি, যদি ওরা আমাদের আক্রমণ করে?'

'করলে আমাকে করবে। আপনার কেশস্পর্শও করবে না। মানে, যদি করে, আমাকে মেরে ফেলে পরে করবে।'

'কী বলছেন, আমার জন্যে আপনি প্রাণ দেবেন?'

'মানে, মুখে বলতে, মুখে-মুখে দিতে বাধা কী। সত্যিকার বিপদ এলে উপস্থিত বুদ্ধিতে কী করে বসব তা কে জানে।'

'দেখুন, সত্যি, একটু কাছে-কাছে থাকবেন, খুব বেশি দূরে যাবেন না।'

'বুঝেছি। কদাচ এক ঘরে নয়।'

'আচ্ছা', হিমানী গা ঝাড়া দিয়ে উঠল : 'বাইরে বেরিয়ে পড়লে ক্ষতি কী।'

মালটার গুলি করতে পারে।'
'যদি হাত তুলে সারেন্ডার করি। এরেস্ট করতে পারে না?'
'তাও পারে। ধরে নিয়ে যেতে পারে থানায়।'
'তাই চলুন না। এর চেয়ে থানায় থাকা অনেক নিরাপদ।'
'আপনার যদি তাই মনে হয় আপনি যান।'
'আমি একা যাব?'
'আপনি বেশ।' সঞ্জয়ের স্বরে বুঝি একটু অভিমান লাগল : 'যাবার বেলায় একসঙ্গে আর থাকবার বেলায় অন্য ঘর! আপনি তো স্বাধীন, আপনি চলে যান না নিজের পথে। আমি এমন আশ্রয় ছাড়ি কেন? একা আছি, একাই কাটিয়ে দিতে পারব।'
'কী সাংঘাতিক!' হিমানী একটা আতঙ্কিত আওয়াজ করলে। সঞ্জয়ের প্রস্তাব শুনে নয়, দুটো নেপালী নিচের থেকে একটা দড়ির খাটিয়া উপরে তুলে এনেছে দেখে।
'খুব ভালো! খুব আচ্ছা!' সঞ্জয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হিমানীকে বললে,' আর চাই কী। এবার বোসো পা তুলে। ইচ্ছে করলে গা মেলে শুয়েও পড়তে পারো।'
নেপালী দুটো হি-হি করে হাসতে লাগল।
'আচ্ছা ভাই একটা ক্যান্ডেল হবে?' সঞ্জয় হাত পাতল, 'আমার সঙ্গে দেয়াশলাই আছে।' সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে এনে দিলে দুজনকে।
'আমাদের হেরিকেনটাই আপনাদের দিচ্ছি।'
'আর ভাই, একটা চট দিতে পারো?'
'দরজার ফাঁকে ঝোলাবেন? দেখি—'
একজন হেরিকেন, আরেকজন একটা চট দিয়ে গেল।
'বসুন।' বললে হিমানীকে।
'তার মানে চট টাঙিয়ে আপনি দরজার ফাঁক ঢাকবেন?'
'না, না, ভাঁজ করে নিয়ে মেঝের উপরে পেতে বসব। ঐ একটা খাটে দুজনে তো বিশ্রাম করা যাবে না।'
চট পেতে যোগাসনে বসে থাকবে, ভাবতে কী রকম যেন একটু মায়া হল হিমানীর। বললে, 'কিন্তু বসতে আপত্তি কী। বসুন না।' হিমানী পা তুলে বেশ আরাম করে বসল দেয়ালে হেলান দিয়ে।
'না বাবা, দরকার নেই। আপনিই বসুন। খাটটা ছোট।'
'আহা, দিব্যি বসা যায় দুজনে।'
বসল সঞ্জয়। বললে, 'বসলে দোষ কী জানেন? বসলেই শুতে ইচ্ছে করে।'
'না, বিলাসিতা অতদূরে প্রসারিত করলে চলবে না।'

'বিলাসিতা! কিন্তু ক্লান্তিকে আপনি কী বলবেন? ক্লান্ত মানুষকে প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় কী। ক্লান্ত ঘুমন্ত মানুষ তো একটা শিশুর মত নিষ্পাপ।'

'বেশ তো শোবেন, আমি মেঝেতে চটের উপর বসে থাকব।'

'তার মানে আপনার কথমত কাছাকাছিই থাকবেন। কিন্তু আমার কী রকম ঘুম তা তো জানেন না।'

'কী রকম ঘুম?'

'মড়ার মত ঘুম। শত চিৎকারেও আমি জাগি না।'

'তার অর্থ?'

'তার অর্থ, আমাকে ঘুমন্ত দেখে কেউ যদি আপনাকে চুরি করে নিয়ে যেতে চায়, আপনি চেঁচামেচি করলেও আমি জাগব না।'

'কিন্তু গায়ে জোরে ঠেলা মারলে?'

'তাহলে জাগতে পারি বটে, কিন্তু ওরা কি আপনাকে সেই চান্স দেবে?'

'তাহলে কারুরই শুয়ে দরকার নেই। আমরা দুজনেই জেগে থাকব।'

'দুজনে জেগে থেকেই বা করবেন কী?'

'গল্প করব।'

'গল্প করারও বিপদ আছে—আপনি কখন আপনা থেকেই তুমি-তে চলে আসবে। কিন্তু তার আগে কিছু খাবার জোগাড় করা যায় কিনা দেখা যাক।' উঠে পড়ল সঞ্জয়।

হিমানীর মনে হল আপনি থেকে তুমিতে আসার মধ্যে একটা নতুন রকম আস্বাদ আছে। অচেনা দুজনের যখন বিয়ে হয় তখন গোড়াগুড়ি থেকেই তুমি বলে আর নরহরি ও তার মত এক ক্লাসের ছাত্র হলে সেই তুমিই, নয়তো তুই—কখনো আপনি নেই, আপনি থেকে তুমিতে হঠাৎ ঘনীভূত হওয়া নেই—না এ পক্ষে, না বা ওপক্ষে।

সঞ্জয়কে সত্যি সিঁড়ির দিকে এগুতে দেখে হিমানী বাধা দেবার মত করে বললে, 'কে খাবে?'

সঞ্জয় ফিরল। বললে, 'তুমি ছেলেমানুষ, তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, তুমি খাবে।'

আশ্চর্য কেমন অবলীলায় ছেলেমানুষ বলল। নরহরি কোনোদিন তাকে ছেলেমানুষ বলেনি, বলবেও না, পারেও না বলতে। কেউ কাউকে বলবে না। তাদের অভিধানে ও সুন্দর শব্দটা নেই। তারা সামান-সমান।

'থাক, বাহাদুরিতে কাজ নেই।' দিব্যি বলতে পারল হিমানী।

'বাহাদুরি মানে? কত দূর দুর্গম জায়গায় কনস্ট্রাকশনের কাজ করেছি, রাতে ফিরতে পারিনি, সাইটেই রাত কেটেছে না খেয়ে—'

'কী কাজ করা হয়?'

'এই মিস্ত্রির কাজ—হেড মিস্ত্রি।'

'আপনি এঞ্জিনিয়র?'

'যাদের দিন পড়েছে আজকাল অথচ যাদের কেউ দেখতে পারে না, অর্ধশিক্ষিত মনে করে—'

'বাজে কথা। আমার বাবা খুব এঞ্জিনিয়রের ভক্ত আর আমার মা ব্যারিস্টারের। এ কী, আপনি উঠলেন কেন? বসুন।'

সঞ্জয় আবার বসল এক কোণে। জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কার ভক্ত?'

'আমি কারু ভক্ত নই। আচ্ছা আপনি যে বাড়ি ফিরছেন না আপনার স্ত্রী ভাববেন না?'

'যেমন আপনার স্বামী ভাববেন।'

দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

'আমার জন্যে আমার বাবা-মা ভাববেন।' হিমানীর কেন কে জানে আর কারু কথা মনে এল না।

'আমার জন্যে তাও নেই।'

'কেউ নেই?'

'এই মুহূর্তে আপনি ছাড়া কেউ নেই। যাই ওদের কাউকে ডাকি। ওদের তো একটাই নাম—বাহাদুর।' সঞ্জয় উঠে পড়ল। সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাকল—বাহাদুর!

দারোয়ান এসেই হাসল : 'কী। চট টাঙাননি?'

'না। শোনো, কিছু খাবার জোগাড় হবে? দোকান তো সব বন্ধ।'

'হ্যাঁ, আপনাদের জন্যে রুটি আনছি। রুটি আর ভাজি—'

'আর দুটো গ্লাস আর এক কুঁজো জল।'

'গ্লাস একটাই যথেষ্ট।' হিমানী বললে।

যা বলে তাতেই দারোয়ান রাজি। আর সেই আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

'উঃ, তুমি কী ভালো। ইনি উলটে কেবল তোমাদেরই ভয় করছেন।' সঞ্জয় মুখ গম্ভীর করল।

'না, না, কিছু ভয় নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন। চট টাঙাবার দড়ি-পেরেক লাগবে?'

হিমানীর দিকে চেয়ে হাসল সঞ্জয়। বললে, 'চট না টাঙালেই বা কী। উপরে তো কেউ আসবে না।'

'না, না, কেউ না। আমরা নিচে সারা রাত পাহারা দিই। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবেন।'

দুটো প্লেটে করে রুটি আর ভাজি নিয়ে এল দারোয়ান আর তার এক ভাইয়ের হাতে জলভর্তি কুঁজো আর গ্লাস। মেঝেতে নামিয়ে রেখে প্লেট দুটো দুজনের হাতে তুলে দিয়ে চলে গেল দুজন।

'আর কী চাই! খাদ্য, পানীয় আর শয্যা—আর কী চাই।' খেতে সুরু করল সঞ্জয়।

'আচ্ছা আপনাকে কে বলেছে আমি আপনার চেয়ে নেপালীদেরই বেশি ভয় করছি?'

'না, কে বলেছে? আমাকেই তো বেশি ভয় করা উচিত। তাই যা বলছি শুনুন। খেয়ে নিন। খাওয়া পর্যন্ত ভয় নেই। তার পরেই ভয়।'

'মানে?'

'মানে ঘুমুনো নিয়ে ভয়।'

'দেখছেন না সব ওরা কেমন সমান-সমান ভাগ করে দিয়েছে। আলাদা-আলাদা প্লেটে দুখানা করে রুটি। যার যা, তার তা।'

'কিন্তু দেখছেন তো,' সঞ্জয় জিৎপার্টির মত হেসে উঠল, 'খাটের বেলায় দুখানা নয়, খাটের বেলায় একখানা। আপনি যেমন গ্লাস একটা চেয়েছেন, খাটও একখানা। তার মানে আধখানা আমার, আধখানা আপনার।'

'অসম্ভব।' প্লেটটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল হিমানী : 'আমি হেঁটে বেড়াব।'

'বেশ তো। খেয়ে নিয়েও তো হেঁটে বেড়ানো যায়। তুমিও হাঁটো আমিও হাঁটি।'

খেতে লাগল হিমানী। ভরামুখে বললে, 'আপনি সাংঘাতিক লোক।'

'আর এ একটা নির্জন পুরী। অন্ধকার। একটিমাত্র হেরিকেন নিবে গেল বলে। রাস্তায় লোকজন নেই, আলো নেই, আশেপাশে বাড়ি সব বন্ধ, পুলিশ ডাকা যাবে না—'

'ভালো হচ্ছে না কিন্তু।'

'ভালোর তো কিছুই দেখছি না।'

'আমাকে ভয় পাইয়ে দেবেন না।'

'তাহলে লক্ষ্মীটির মত শুয়ে পড়ো। ঘুমোও।'

'আর আপনি?'

'আমি চটের আসনে চটে-মটে বসে থাকব।'

'ওরে বাবা। আমি ঘুমুব আর আপনি দেখবেন? সেটা ভীষণ অসহায় লাগবে।'

'জেগে থেকেই বা তুমি এমন কী সসহায়? বেশ তো, তবে খাটটা ছেড়ে দাও, আমি ঘুমুই, তুমি জেগে থাকো।'

'এখন মনে হচ্ছে সে বুঝি আরো ভয়ের।'

'তাহলে, শোনো, যার জন্যে, যে কথা ভেবে এত ভয়, সেই ভয়টাকে দুজনে শেষ করে দি। তার মানে খাটটাকে আধখানা করি। অবশ্য মনে মনে, কাটাকাটি না করে। এক আধখানায় আমি শুই আর আধখানায় তুমি শোও। মানুষ দুজন হলে যেমন শোয় আর কি।' দিব্যি হাসতে লাগল সঞ্জয় : 'তাহলে আর ভয়টয় কিছু থাকে না। ভয়ই তখন ভয় পায়।'

'বলিনি আপনি ডেঞ্জেরাস—'

'বলছি তো সব মুখে। তাই সমস্ত খাটটাই আপনাকে ছেড়ে দিই।' এক ঝটকায় উঠে পড়ল সঞ্জয় : 'আপনি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। এখনো অনেক রাত পাড়ি দিতে হবে।'

বাহুতে মাথা রেখে কাৎ হয়ে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল হিমানী। ভাবল বোধহয় কতক্ষণ পরে ভদ্রলোকও আস্তে আস্তে শুয়ে পড়বে। কিন্তু না, লোকটা একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরে-বাইরে পাইচারি করতে লাগল। এতক্ষণ হিমানী জেগে ছিল বলেই বুঝি তার সামনে সিগারেট ধরায়নি। কিন্তু কী আশ্চর্য, লোকটা বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসে তাকে দেখে যাচ্ছে না? খানিক-ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে না? তার চেয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তারাঢালা স্তব্ধ আকাশ দেখতে বুঝি বেশি সুখ।

কতক্ষণ পরে ঘরে ফিরে আসতেই সঞ্জয়ের উপর হিমানী ঝামটে উঠল : 'চুপ করে বসুন না এই খাটের কোণে। বলেছি না কাছাকাছি থাকবেন।'

'তুমি এখনো ঘুমোও নি!'

'কী করে ঘুম আসে যদি ভূতের মত পায়চারি করে বেড়ান।'

'আচ্ছা আচ্ছা, বসছি খাটের কোণে।' সঙ্কীর্ণ হয়ে পায়ের প্রান্তের কাছে বসল সঞ্জয়।

'পা যদি গায়ে লাগে আমাকে কিন্তু কিছু বলতে পারবেন না।

'না, না, বলব না কিছু। তুমি মনের সুখে পা লম্বা করে দাও।'

ঘুমের মধ্যে এক সময়ে পা বুঝি লম্বাই করে দিয়েছিল হিমানী কিন্তু কোথাও একটু বাধা পেল না বলে চোখ চেয়ে দেখল লোকটা মেঝের উপর চট পেতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে।

নরহরি কি কখনো পারত অমন ঘুমোতে? কিন্তু হিমানীর কোনো সাড়াশব্দ করতে ইচ্ছে হল না। যদি ওর ঐ ঘুমটুকু নষ্ট হয়। আহা, ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। ক্লান্ত ঘুমন্ত মানুষ একটা শিশুর মত নিষ্পাপ।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল হিমানী।

জেগে উঠতেই তার ভয়-ভয় করতে লাগল। ঘরে কেউ নেই, আলো জ্বলছে না, শুধু ভাঙা রোগা চাঁদের পাণ্ডুর মুখটা দেখা যাচ্ছে।

নাম জানে না ধাম জানে না হিমানী হঠাৎ ডেকে উঠল : 'তুমি—তুমি কোথায়?'

'এই তো এখানে।' পাশের ঘর থেকে চলে এল সঞ্জয়।

'আপনি শোন নি?' উঠে বসল হিমানী।

'আহা, কী আপনার প্রশস্ত খাট—প্রশস্ত হৃদয়!'

'এবার আপনি শোন, আমি জাগি।' হিমানী খাট থেকে নেমে পড়ল।

'আহা কী দয়া! কী স্নেহ!'

'আপনি কী! এরকম করে বুঝি বলে! আমাকে দেখলে হৃদয়হীন নির্দয় মনে হয়?'

'কিছুই মনে হয় না। মনে হয় পৃথিবীতে এ এক দ্বিতীয় জীবন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল হিমানী। ভাবল, নরহরিকে কি সে বলতে পারত দয়া বা স্নেহের কথা? নরহরিই কি দিতে পারত দ্বিতীয় জীবনের সংবাদ।

'এখন কটা?' জিজ্ঞেস করল হিমানী।

'প্রায় পার করে এনেছি। আর একটা স্টেশন।'

'স্টেশন?'

'মানে আর এক ঘণ্টা।' সঞ্জয় হাসল : 'পৃথিবীটা ট্রেন আর ঘণ্টাগুলি স্টেশন।'

চুপ করে বসে থাকতে থাকতেই ভোর হল। কাক ডাকল। বাহাদুর এক মুখ হাসি আর দু বাটি গরম চা নিয়ে এল।

ছটা বেজেছে।

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

'ওদের কিছু বকশিস করলে হত না?' হিমানী নিজের ব্যাগেই হাত দিল।

'না, কিছু ঋণ থাক।' বাধা দিল সঞ্জয়। বললে, 'সব একেবারে শোধবোধ করে যাওয়া ঠিক নয়। ওরা কি ঐ সব পয়সার জন্যে করেছে?'

'সত্যি। মানুষ এমনিতেই কত সুন্দর কত ভালো।' হিমানী পূর্ণ পেলব চোখে তাকাল : 'আপনার নামটাও জানা হল না। আর আমার নাম—'

'না, না, থাক। সব এক রাত্রেই রেখা টেনে সমাপ্ত করে দেবার অর্থ নেই। আরো আছে। পরে হবে।'

'পরে হবে?'

'যা হয় কিছুই হয় না। সব পরে হয়। দ্বিতীয় জীবনে হয়।' সঞ্জয় চলে গেল অন্যদিকে।

দ্বিতীয় জীবনে হয়। হিমানীর মনে হল তার দ্বিতীয় জীবন শেষ হতে আর শুধু দুই দিন বাকি।